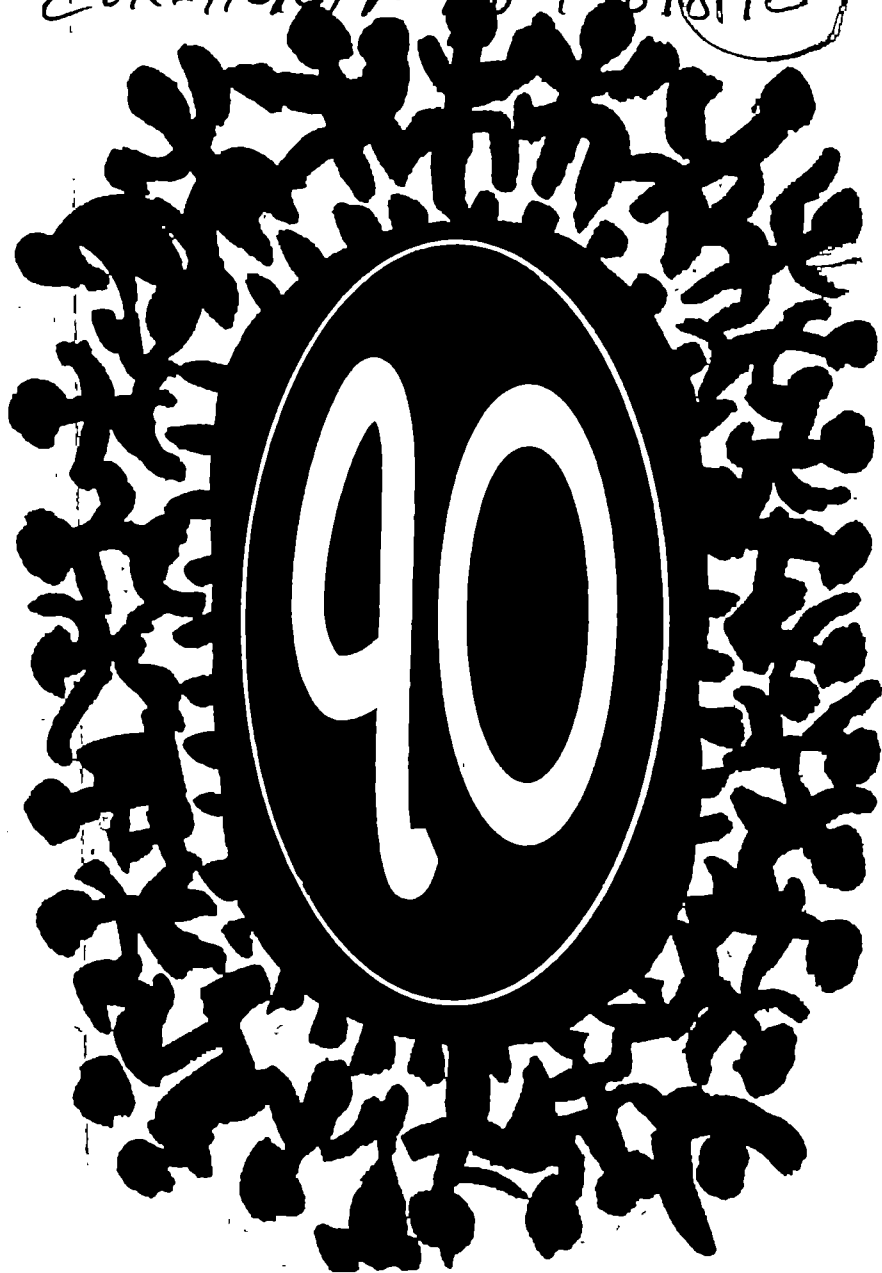


শারদীয় ১৪০৭

পরিষদ

Col-14076/9-118-19878/18





অনুনা প্রাপ্তিযোগ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান প্রকাশনা

Rarivahy Des Philosophical Essay : Ramprasad Das	150.00
Economic Theory, Trade and Quantative Economics	
Asis Basu & Biswajit Chatterjee	200.00
পূর্ববঙ্গের কবিগণ সমগ্র ও পর্যালোচনা : ডাঃ বীণেশচন্দ্র সিংহ	৩০০.০০
কলার বইল : কিতিমোহন সেনগুপ্ত	৩০.০০
উনবিংশ শতাব্দীর কল্যাণচিন্তা ও স্বকীয়তা : সুমিত্রা সেন তট্টালার্ঘ্য	৯০.০০
কবিকল্পন-চর্চা : শ্রী অক্ষুয়াব স্বন্যোপাধ্যায় ও শ্রীকিশোরী চৌধুরী	১২৫.০০
বঙ্গো ভবাতত্ত্বের ভূমিকা : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৬০.০০
শান্ত পদ্যকলী (চরম) : শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু	৭০.০০
জবা-পাঠে সঙ্করন : প্রবন্ধ-সংগ্রহ জবা পাঠ-পর্বের কর্তৃক সম্পাদিত সঙ্করন	৪০.০০
বৈক্যন পদ্যকলী (চরম) : অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র, শ্রীসুখুমার সেন, শ্রীকিশোরী চৌধুরী ও শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত	৬০.০০
একালের ছোটগল্প সঙ্করন	৬০.০০
একালের কবিতা সঙ্করন	৪০.০০
একালের প্রবন্ধ সঙ্করন	৭০.০০
আঞ্চলিক কলো ভাবের অভিধান : ডাঃ অসিতকুমার স্বন্যোপাধ্যায়	১০০.০০
অমর বোম্বিনী পত্রিকা : ডাঃ ভরতী রায়	১৫০.০০
আত্মতত্ত্বের মুখোপাধ্যায়ের বিলা চিন্তা : ডাঃ বীণেশচন্দ্র সিংহ	৭৫.০০
পূর্ববঙ্গের কবিগণ : ডাঃ বীণেশচন্দ্র সিংহ	৯০.০০
মরমনিবন্ধ পত্রিকা : বাহুবল্লভ বীণেশচন্দ্র সেন	৯০.০০
প্রবীণ কবিতাশালার পাল : ডাঃ শ্রীকুমার পাল	১২৫.০০
শ্রীপদ্যকলীসমূহ : ডাঃ উমা রায়	১৬০.০০
কলো কলো নারীদের প্রকাশ : কলক মুখোপাধ্যায়	২৫.০০
A Dictionary of Indian History: Sachchidananda Bhattacharyya	250.00
Element of the Science of Language	
Irach Jahangir Sorabji Taraporewala	60.00
A History of Saha Literature : S. N. Dasgupta	60.00
Agarian System of Ancient India : U. N. Ghosal	15.00
The Science of Saha : B. B. Dutta	40.00
Studies in India Antiques : H. C. Roychoudhury	55.00
Studies of Accounting Thought : G. Sinha	100.00
Reading Kests Today : Prof. Sarabhi Basu	60.00
Dynamics of the Lower Troposphere :	
D. K. Sinha, G. K. Sen & M. Chatterjee	150.00
Political History of Ancient India : Hemendra Roy Choudhury	70.00
The History of Bengal : Narendra Krishna Sinha	200.00
An Enquiry into the Nature & Function of Art : S. K. Nandi	80.00
Romance of Indian Journalism : Jitendranath Basu	75.00
Yoga Philosophy of Patanjali with Bhāsvati : Hariharananda Aranya	400.00

আজ্ঞা বিশদ বিবরণের জন্য :

Pradip Kumar Ghosh, Superintendent Calcutta University Press
48, Hazra Road, Calcutta-700 019

বিক্রয় কেন্দ্র : আত্মতত্ত্বের ভবনের একতলা, কলকাতা ট্রিট চত্বর।

756.3
017/8

পরিচয়

পরবর্তী সংখ্যা

118

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১০০

VICTORIA MEMORIAL HALL

(AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE)

1, QUEEN'S WAY, CALCUTTA-700 071.

PH : 223-1869-91/6142. FAX : 223-5142

A : SOUND AND LIGHT SHOWS AT VICTORIA MEMORIAL GROUND ON PRIDE AND GLORY—THE STORY OF CALCUTTA.

SHOWING TIMES :

OCTOBER TO FEBRUARY

FROM 6.15 PM.—7 PM (BENGALI SHOW)

FROM 7.15 PM.—8 PM (ENGLISH SHOW)

MARCH TO JUNE

FROM 6.45 PM.—7.30 PM (BENGALI SHOW)

FROM 7.45 PM.—8.30 PM (ENGLISH SHOW)

RATE OF TICKETS : Rs. 10/- AND Rs. 20/- AND STUDENTS Rs. 10/-

CHILDREN ABOVE THREE YEARS FULL TICKETS

ENTRY FROM CHURCH GATE

TICKET COUNTER OPENS AT 12 NOON—12.30 PM

B : RECENT PUBLICATIONS :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Charles D'olvy's Calcutta—Album I and II | Rs. 40.00 each |
| 2. J. B. Fraser's Calcutta | Rs. 35.00 |
| 3. Calcutta in the eyes of Thomas Daniell | Rs. 35.00 |
| 4. Indian in the eyes of Daniells | Rs. 40.00 |
| 5. India as seen by Simpson | Rs. 40.00 |
| 6. Select views of India | Rs. 40.00 |
| 7. Picture Post Card set A, B, C | Rs. 03.50 |
| | Rs. 10.00 each |
| 8. Picture Folio No. 2 | Rs. 01.00 |
| 9. Picture Folio No. 3 | Rs. 02.00 |
| 10. Ceramic Tiles (views of St. Andrew's Church) | Rs. 32.00 |
| 11. Bulletin of the Victoria Memorial VII—XIII | Rs. 07.50 each |
| 12. Chakraborty, Himen : An Urban Historical Perspective for the Calcutta Tercentenary | Rs. 35.00 |
| 13. Greig, Charles : Landscape Paintings in the Victoria Memorial | Rs. 150.00 |
| 14. Ray, M. R. : Bengal Newsels | Rs. 20.00 |
| 15. Bopa, Choudhurn and Bhaskar Chandra : A Comprehensive Catalogue of Water Colours, Pencil sketches and Pen and Ink drawings in the collection of Victoria Memorial. | Rs. 15.00 |
| 16. Urdu Guide Book | Rs. 05.00 |
| 17. Ganguly, K. K. : Modern Masters | Rs. 35.00 |
| 18. Catalogue of busts and statuary | Rs. 02.00 |
| 19. Calcutta Gallery—India's first City Gallery | Rs. 50.00 |
| 20. The First Spark : Story of the Revolt of 1857 | Rs. 75.00 |
| 21. Contemporary Art of Bengal. | Rs. 375.00 |
| 22. Hillscapes of India | Rs. 70.00 |
| 23. Victoria Memorial 2000 Millennium Calendar
(12 reproductions from John Flemings' Album) | Rs. 100.00 |
| 24. Victoria Memorial 2000 Natural History Painting Album Series 1—3 | Rs. 90.00 |

C : FORTHCOMING EXHIBITIONS DURING 2000-01

1. Life and Times of Tipu Sultan
2. Hillscapes of India at Agartala
3. Daniells' Oriental Scenery : 200 years of India's Architectural and Cultural Heritage, November 2000
4. Exhibition of Restored Paintings January—February 2001

বিশ্বভারতী * সাম্প্রতিক প্রকাশনা

রবীন্দ্রনাট্য-সংগ্রহ
১ম বন্ড ৩০০ টাকা * ২য় বন্ড ২৭৫ টাকা
শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী ৮০ টাকা
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ও পঞ্চকবি ৬০ টাকা
সম্পাদনা শ্রীসোপালচন্দ্র রায়
রবীন্দ্রসঙ্গীতে অন্নাদিকুমার ৬০ টাকা
সম্পাদনা অমিতাভ সৈয়দুরি
সাহায্য রত্নালয় ও রবীন্দ্রনাথ ৯০ টাকা
রুদ্রসাদ চক্রবর্তী
শান্তিনিকেতন স্থাপত্য পরিবেশ
এক রবীন্দ্রনাথ ১০০ টাকা
শ্রীঅরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
বিক্রেতানাথ ঠাকুরের বাস্তবমিতি ৬০ টাকা
শ্রীঅরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

FAREWELL MY FRIENDS Rs. 80
Rabindranath Tagore
Translated by K. R. Kripalani
THE RELIGION OF MAN
Rs. 110
Rabindranath Tagore
GITANJALI (Bi-lingual Edn.)
Ordinary Rs. 125 * Cloth Bound
Rs. 175
DEAR MR. TAGORE Rs. 140
Edited by A Aronson
VISION & CREATION Rs. 350
Nandalal Bose
FUNDAMENTALS OF
ENVIRONMENTAL STUDIES Rs. 200
D. K. Sinha & A. D. Mukherjee



বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কলিকতা - ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকতা ৭০০ ০১৭

With best compliments from :

TECHNO DEVELOPMENT CORPORATION

205, Block-B
Bangur Avenue
Calcutta-700055।

পঞ্চাশে পা দিয়েছে সংসদ

সংসদের অভিধান
রচনাবলী
স্মরণীয় সাহিত্য সংগ্রহ
ছাড়াও
ছোটদের পড়া শেখা
লেখা শেখা
ছবি আঁকা
আর
ছড়া, গল্প, রূপকথার সঙ্গে
বিজ্ঞানের
বিচিত্র সব বই

সাহিত্য সংসদ

শিশু সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড * কলকাতা ৯

ফোন ৩৫০-৭৬৬৯/৩১৯৫

শুদ্ধ বাংলা

জানতে, লিখতে গেলেই পড়তে হবে

আকাদেমি

বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান

২য় সংস্করণ প্রকাশিত ১৬০

বাংলা ভাষা চর্চাকারীদের পক্ষে

অপরিস্রব গ্রন্থ। তিরিশ হাজারের

উপর শব্দের ব্যুৎপত্তিসংগত অর্থ সমন্বয়

ও ব্যাকরণগত তথ্য সরিবেশিত

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

পরিভাষা প্রকাশন (৩য় স্র) ২৫

বাংলা বানানবিধি (৩য় স্র) ৫

আকাদেমি বানান অভিধান ৭০

সীতভালি-বাংলা সমন্বয়

অভিধান ১০০ কুমিরাম দাস

সাহিত্যের শব্দার্থকোষ ৪০ কৃষ্ণ কল্যাণ

ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা ১৮ সুভাষ ভট্টাচার্য

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

সংবাদ-সাময়িক পত্রে উল্লিখিত শব্দের বাঙালি

সমাজ ২৫০ খণ্ডন কবু • মজলুম-জীবনী ১৬০

অরুণকুমার কবু • এই শব্দের বাংলা ৬০

শব্দ কোষ • শতবার্ষিকীর আলোচনার ৪০

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত • লেখাজোবার

কায়খানাত ৪০ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় •

হাজার বছরের বাংলা কবিতা ৬০ অরুণকুমার

সিকদার • ভাষার বনিয়াদ : কিছু প্রশ্ন ৪০

রমণীন্দ্র দাস • বাঙালি কি আত্মজাতি ও

অন্যান্য রচনা ৬০ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত •

কনকর বিজ্ঞান ৪০ বীরেন্দ্রনাথ রায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রচনাসমগ্র

৪র্থ খণ্ড ১৬০ টাকার

৭ম খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে

সংকলন গ্রন্থ

রবীন্দ্র প্রবন্ধ ১০০ অরুণকুমার কবু সম্পাদিত • মিষ্টি ছড়া টাপুর টুপুর ৪০ • আকাশ প্রদীপ

১০০ শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত • সত্যের বেদলি পোয়েমস ৩০ শীলা রায় অনুবিত •

বেদলি শিষ্টাচারের ৬০ অরুণকুমার রায় ও শীলা রায় • প্রবন্ধ সংগ্রহ ৪৫ কনকর

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

১/১ আজর্ষ জগদীশচন্দ্র কবু রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০

প্রতিস্থান

কইবর (কলোজ ট্রিট কবি হাউস এক রবীন্দ্রসদন চত্বর), আকাদেমি ভাটার ১১৮ হেক্টর নম্বর

রোড, কুলবাগান কইবর, দীনবন্ধু মল্লিক, শিলিগুড়ি • ন্যাশনাল বুক এজেন্সি • সে বুক স্টোর

• উবা পাবলিশিং হাউস • নরা উদ্যোগ • স্বকসারিক বোধ্যবোধ্য :

দূরস্বা ২২০-৯৭৮ ০৫০-০৪০ কাল (০৩০) ২২০-০৯৪০ ই-মেইল : belademi@vsnl.com

ICA 3748/2000

আলাকিত হোক আগামী দিবের পথ

জাতীয় সমৃদ্ধি ও অর্থনীতির স্তম্ভ হল বিদ্যুৎ। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার বরাবরই বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে বিদ্যুতে। শিল্প ও গার্হস্থ্য প্রয়োজন মেটাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে প্রতি বছরই। সম্প্রতি বহু প্রতীক্ষিত বক্সেঞ্চর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে নির্ধারিত সময়ের আগেই। অষ্টম যোজনার শেষে বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে চালু হয়েছে ৬৩০ মেগাওয়াটের ৩টি ইউনিট। এছাড়াও সৌরশক্তিতে পশ্চিমবঙ্গ এখন প্রথম স্থানে। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে গঠন করা হয়েছে 'গ্রামীণ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম'। তৈরি হয়েছে 'বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন'।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ্য :

- বৈদেশিক সহযোগিতায় বক্সেঞ্চর প্রকল্পের ৪ ও ৫নং ইউনিট চালু। খরচ ১৬২১ কোটি টাকা।
 - বক্সেঞ্চর প্রকল্পের অধীনে জাপানি প্রযুক্তিতে গড়ে উঠবে ৩২টি সাব স্টেশন।
 - ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি ইউনিট চালু হবে সাগরদীঘি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে।
 - ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ইউনিট শুরু হবে বলাগড়ে।
 - জাপানি কারিগরী সহযোগিতায় চালু হবে পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প (২২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি ইউনিট)।
- এই সব লক্ষ্য পূরণ হলে সুনিশ্চিত হবে রাজ্যে শিল্পের পুনর্জাগরণ ও গ্রামীণ সমৃদ্ধি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণে উন্নয়নের দিশারী

ত্পশিলী জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার গত ২৩ বছর অনলসভাবে কাজ করে চলেছে। যেসব সরকারী উদ্যোগে অনগ্রসর শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : খাস জমি বিলি, সরকারি কৃষি জমি দান, গৃহহীনদের বাস্তুভিটা দান, ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি, ভরণপোষণ ভাতা প্রদান, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সুযোগ ও চাকুরিতে আসন সংরক্ষণ। কৃষি, প্রাণীসম্পদ-বিকাশ, ক্ষুদ্রশিল্প ও মাছচাষেও এদের বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ভাষাকে ষথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়াও তাঁদের সংস্কৃতির বিকাশ, কুসংস্কার দূরীকরণ ও বিজ্ঞানচেতনা বাড়ানোর সময়োপযোগী সরকারি উদ্যোগেও এই অনগ্রসর মানুষেরা প্রগতির আলো দেখেছেন।

অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন অব্যাহত
রাখতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আসুন গড়ি এক পরিচ্ছন্ন, সবুজ

এবং

সুন্দর কলকাতা

কলকাতা—আশা আর আনন্দের নগর, যেখানে স্বপ্ন
রূপ পায়

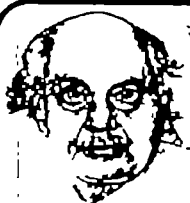
কলকাতা—এক কোটিরও বেশি মানুষের যেখানে
বসবাস

কলকাতা—তিনশো বছরেরও বেশি পুরোনো ইতিহাস
যেখানে প্রাণ

কলকাতা—শিল্প সংস্কৃতির পীঠস্থান, যেখানে দেশ,
কালের সীমানা নেই

কলকাতা আমাদের আশা
আমাদের ভবিষ্যৎ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার



কল্যাণী কাছী ও রবিকুল ইসলাম সম্পাদিত

নজরুল শ্রেষ্ঠ সংকলন ১০০

কল্যাণী কাছী সম্পাদিত

শতকথায় নজরুল ১০০

নজরুল শ্রেষ্ঠ কিশোর সংকলন ৩৫

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত

নজরুল স্মৃতি ২০

নজরুল বিচিত্রা ৩০

নজরুল বীথিক ৪০

নজরুল গল্প সমগ্র ৩০

সুনির্বাচিত নজরুল গীতি ৪০

নজরুল পদ্মাবলী ৩০

নজরুল নির্বাচিত কবিতা ৪০

সুনির্বাচিত নজরুল গীতিমালা ৪০

বিশ্বনাথ দে ২০

নজরুল প্রেমের কবিতা ২০

সুনির্বাচিত নজরুল গীতিগুচ্ছ ৪০

কাছী অনিরুদ্ধ সম্পাদিত

১০১টি সুনির্বাচিত নজরুল গীতির স্বরলিপি (১-৫ খণ্ড)

সুনির্বাচিত নজরুল গজল স্বরলিপি

সুনির্বাচিত নজরুল ভক্তীগীতির স্বরলিপি

কল্যাণী কাছী □ সুনির্বাচিত কাব্য-গীতির স্বরলিপি

প্রতিটিতে ১০১টি করে গান। প্রতিটি স্বরলিপি ৫০ টাকা

কমল চৌধুরী সম্পাদিত ছবির অ্যালবাম

কবি নজরুল ৫০

নির্মল বুক এজেন্সী □ ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

মনীষা প্রকাশিত কার্যকটি বই

	গল্প	
শ্রেষ্ঠ গল্প :	ম্যাক্সিম গোর্কি	৫০.০০
কলিমুল্লের গল্প :	সোমনাথ লাহিড়ী	২৫.০০
	উপন্যাস	
বঁাদী :	গোলাম কুদ্দুস	৪০.০০
	কাব্যনাট্য	
একগুচ্ছ কাব্যনাট্য :	রাম বসু	৮৫.০০
	প্রবন্ধ	
কালিদাস সমীক্ষা :	সুত্রেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৫.০০
	স্মারকগ্রন্থ	
তত্ত্ব ও সংগ্রামের প্রতীক :	বিশ্বনাথ মুখার্জী	৯০.০০

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩বি, বকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

আসানসোল পৌরনিগম

আসানসোল

বামফ্রন্ট সরকারের নগরোন্নয়ন কর্মসূচীর সার্থক লক্ষ্যে বার্ণপুর নোটিফায়েড এরিয়া অধরিটি, আসানসোল পঞ্চায়েত সমিতি ও শতাব্দী প্রাচীন আসানসোল পৌরসভাকে নিয়ে গঠিত হয়েছে এই পৌরনিগম। এই ১২৭.২৩৭ কিমি বিস্তীর্ণ পৌরালয়ে পানীয় জল সরবরাহে, আবর্জনা দূরীকরণে, স্ট্রীট লাইট রক্ষণাবেক্ষণে, সাক্ষরতা অভিযানে বা জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণে—আমরা আছি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। পৌর পরিষেবায় আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা ও নির্ধারিত সময়ে পৌরকর জমা দেওয়া আমাদের একান্ত কাম্য।

শ্যামল কুমার মুখোপাধ্যায়
মেয়র

আসানসোল পৌরনিগম

বাংলা অনুবাদে বিদেশী সাহিত্য

একস্তম্ভ শিলা (ফরাসি) আঁরি মিশো-র নির্বাচিত রচনা অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য ৪০ টাকা	গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত (ইংরেজি) অনুবাদ : লীলা মজুমদার ৮০ টাকা
শব্দ (ফরাসি আত্মজীবনী) জঁ পল সার্ত্র অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য ৫০ টাকা	পোড়ো জমি ও চৌতাল (ইংরেজি) টি. এস. এলিঅট অনুবাদ : জগন্নাথ চক্রবর্তী ৩০ টাকা
শীর্ণ তোরণ (ফরাসি উপন্যাস) আঁদ্রে জিন অনুবাদ : চিত্তর গুহ ৫৫ টাকা	সর্প ও রজ্জু (ইংরেজি উপন্যাস) রাজা রাও অনুবাদ : রূপকনাথ কল্যাণাচার্য ৮৫ টাকা
আতালী ও সিদ (ফরাসি নাটক) জঁ রাসিন ও পিয়ের কর্নেই অনুবাদ : সমীরকান্ত গুপ্ত ৬০ টাকা	ছায়াবোধ (ইংরেজি উপন্যাস) অমিতাভ ঘোষ অনুবাদ : মোসুখী কু ৮৫ টাকা
বাঁড় ও কিস্র (স্পেনীয়) লোরকার নির্বাচিত কবিতা অনুবাদ : দেবীসাদ কল্যাণাচার্য ৬৫ টাকা	আন্তিগোনে (গ্রিক নাটক) সোক্রেস অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ২০ টাকা
নিয়তি ও দেবযান (জার্মান) হোশারলীনের নির্বাচিত কবিতা অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৪০ টাকা	ব্যাণ্ডের কেন্দন (গ্রিক নাটক) আরিস্তোফানেস অনুবাদ : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২০ টাকা
হাজার সারস (জাপানি উপন্যাস) রাসুনোরি কাওআবাতা অনুবাদ : সঙ্গীপ ও এইকো ঠাকুর ৪৫ টাকা	নির্বাচিত কবিতা (গ্রিক) অর্জ সেফেরিস অনুবাদ : শিশিরকুমার দাশ ৮০ টাকা



সাহিত্য অকাদেমি

জীবনভাড়া, ২৩৫/৪৪ একুস, ভরমণতহারবার রোড

কলকাতা ৭০০০৫৩, দূরভাব ৪৭৮১৮০৬

প্রাতিষ্ঠান ॥ অকাদেমি দপ্তর, দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, উবা পাবলিশিং
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ইত্যাদি

With

Best

Compliments

from :

FRIENDS TRAVELS

**NEW ROAD
KULTI
DIST. BURDWAN**

Phone Nos.

(0341)-52 1014

52 1499 (Office)

52 1496

(0341)-521055

(Residence)

CONTACT FOR TOURIST LUXARY BUSES

40 years in the service of the people

পানিহাটীর সমস্ত জনগণের কাছে একটি ঘোষণা

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্য স্মৃতি বিজড়িত পানিহাটীর গঙ্গার পাড়ে ছাতুবাবুর বাগানবাড়ী “গোবিন্দকুমার হোম” এর সংস্কার প্রকল্পে পানিহাটী পৌরসভা, জেলাশাসক উত্তর ২৪ পরগনা এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ উদ্যোগ বহন করেছে। প্রয়োজনীয় অর্থ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে এবং সংস্কারের কাজও শুরু হয়ে গেছে। শতাব্দী প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী ইমারত পানিহাটীর গৌরব বহন করে চলার পথে পানিহাটীর সকল মানুষের সহযোগিতা কামনা করি।

পানিহাটী পৌরসভা
পানিহাটী, উত্তর ২৪ পরগনা

শ্রীমনোরঞ্জন সরকার
পৌরপ্রধান

বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন
ইহাই ভারতবর্ষের অস্তুর্নিহিত ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন



পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্বে

১২ বি বি ডি বাগ, কলকাতা-৭০০ ০০১

খাদি কমিশনের মার্জিন মানি প্রকল্প

গ্রামীণ শিল্প স্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করুন।

☐ যে কোন গ্রাম বা শহর এলাকা
(যেখানে ২০ হাজারের কম মানুষের
বাস) এই প্রকল্পের আওতায় আসবে।

☐ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে
প্রকল্প মূল্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

☐ সংস্থাগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে
প্রকল্পমূল্য ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

কিছের সুযোগ
খনিজ, কল, কুবি ও খাদ্য, পলিমার ও
রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অফিসিট শক্তি,
টেক্সটাইলস্ ও পরিবেশ নির্ভর শতাধিক বিভিন্ন
শিল্প ইউনিট গড়ার জন্য।

অনির্ভরতার এই সুযোগ নিতে এখনই যোগাযোগ
করুন :

বিভিও/পঞ্চদ্রোহি এম ডি আই সি/খাদি ও
গ্রামীণ শিল্প পর্বেদের জেলা কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট
ক্যাম্পেব হাটীর শাখা।

তপশ্চিনী জাতি/উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, পার্শ্বত্ব এলাকার
অধিবাসী এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রকল্প মূল্যের ৩০ শতাংশ ভর্তুকি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে
২৫ শতাংশ ভর্তুকি।

‘গ্রামীণ’-এর যে কোন শোকসম সব রকম লিঙ্গ ও স্ত্রী বন্ধে ২০% থেকে ৩০% পর্যন্ত
বিশেষ বিক্রে ০৪.০৯.২০০০ থেকে দেওয়া হচ্ছে।

উৎসবে উপহারে
লক্ষ তাঁত শিল্পীর রঞ্জে রাঙানো
বাংলার সেরা তাঁত বস্ত্র সস্তার



বাংলার তাঁত
বাংলার শাড়ি

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

যারা কাজ করে . . .

যাদের জন্য পাখার হাওয়া

যাদের জন্য বাতি

যাদের জন্য উদ্ভাসিত

শহর গ্রামে রাতি

তাদের শ্রমের ফসল ফলে

যাদের কৃষি ক্ষেত্রে

তাদের জন্য পূজার সবাই

উঠবে আলোর মেতে

পূজায় যখন বলমলে রাত

উৎসবে ভরপুর

তাদের কাটে বিরাম বিহীন

রাত্রি ও দুপুর

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

: प्रकाशित :

শুভক ও ক্যাসেট ডাবিকা

লোকায়ন চৰ্চাৰ ভূমিকা	: অৰুণকুমাৰ ৰায়॥ ৩০ টকা
লোকসংস্কৃতিৰ নন্দনতন্ত্ৰ	: পবিত্ৰ সৰস্বতী॥ ২৫ টকা
সাঁওতাল কাহিনী বনবীৰ পাখা	: লোকনাথ দত্ত (অৰুণ চৌধুৰী সম্পাদিত)॥ ৫০ টকা
লোককথা	: দিব্যজ্যোতি মজুমদাৰ॥ ৪০ টকা
হৌ	: ইন্দ্ৰাণী দত্ত সংলগ্নী॥ ৪০ টকা
ডোমনি	: সুবোধ চৌধুৰী॥ ৬০ টকা
লোকসংস্কৃতি গ্ৰন্থ ও নিবন্ধগুণ্ডি	: পদ্মব সেনগুপ্ত সম্পাদিত॥ ১০০ টকা
লোকশিল্প বনাম উচ্চমাগীৰ শিল্প	: ব্ৰতীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়॥ ৬০ টকা
গ্ৰাম নামেৰে উৎপত্তি : বাঁকুড়া	: ৰামশংকৰ চৌধুৰী॥ ২৫ টকা
ভাওৱাইয়া	: সুখবিনাস বৰ্মা॥ ১২৫ টকা
বস্তুবাদী বাউল	: শক্তিনাথ ৰা॥ ২০০ টকা
গ্ৰামীণ গীতি সংগ্ৰহ	: দিনেন্দ্ৰ চৌধুৰী॥ ২০০ টকা
বুৰুৱ	: নৱনাৰায়ণ চট্টোপাধ্যায়॥ ৭০ টকা
চুসু	: শান্তি সিংহ॥ ১৫০ টকা
'লোককৃতি' প্ৰবন্ধ সংকলন	: মিহিৰ ভট্টাচাৰ্য সম্পাদিত॥ ২০০ টকা
সূৰী প্ৰধান স্মাৰক গ্ৰন্থ	: মালিনী ভট্টাচাৰ্য সম্পাদিত॥ ২০০ টকা
লোককৃতি-১২, ১৩, ১৪	: প্ৰতিটিৰ দাম॥ ২৫ টকা
লোককৃতি ১৫	: ৪০ টকা
Santhal Architecture	: Rs. 200.00

11-10-73 06:00 107 2 6 2. 300 733 601 2 6 2.

100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 79% 78% 77% 76% 75% 74% 73% 72% 71% 70% 69% 68% 67% 66% 65% 64% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% 55% 54% 53% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

প্রতিটির মূল্য—৩৫ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ * পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশিত বই

ঐক্যবন্ধক :

নটনট্যকার বোম্বেশব্দে চৌধুরী
কবিতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
নটসূর্য অমিয় চৌধুরী
পেরাসিম শিবেশ্বর
নট্যোৎসব শিশিরকুমার
শক্তিমান সেনগুপ্ত
কলার নটনট্য (৪৭ পৃষ্ঠা)
নট-নট্যকার-নির্দেশক বিজয় ভট্টাচার্য

ড্রেসিং ট্রেস্ট ও আধুনিক থিয়েটার
নট্য ইতিহাসধর্মী :

কলকাতার নটচর্চা
ঊষা থিয়েটারের কথা
কবীর নটশ্যালার ইতিহাস
কল্যা রত্নসহরের ইতিহাসের উপাখ্যান
(১৯০১-১৯০৯)
কল্যা রত্নসহরের ইতিহাসের উপাখ্যান
(১৯০৯-১৯১৯)
কবীর নটশ্যালার

প্রবন্ধ ও বক্তৃতাশব্দ :

অমৃত হুগো চুলি (২য় সংস্করণ)
কল্যা নটকে নবকল ও ঊষা পল
নট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ১
প্রবন্ধ ও দৃশ্য, শব্দ ও নটকে
নট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ২
পঞ্চনটক : সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা
নট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ৩/থিয়েটারে কবিতা
নটক :

সর্বদার হাসি নট্য সঙ্গ্রহ (সকল সং)
শব্দ-সংস্কৃতি ও সুরের শিল্পধর্মী

নীলগার্ম (বিরোধিতা)

পত্রিকা :

নট্য আকাদেমি পত্রিকা ৩
নট্য আকাদেমি পত্রিকা ৫
নট্য আকাদেমি পত্রিকা ৬
নট্য আকাদেমি পত্রিকা ৭ (বিশেষ ব্রেক্ট সংস্করণ)

কুমার রায়
কুমার রায়
গণেশ মুখোপাধ্যায়
ড. হারাণ মাসুম
শব্দক ভট্টাচার্য
ড. অমিতকুমার ঘোষ
মেকানিক্যাল তত্ত্ব
লেখা : সকল রায়চৌধুরী
সম্পাদনা : কুশল সাহা
সম্ভব অধ্যাপনা

রবীন্দ্র চক্রবর্তী
মেকানিক্যাল তত্ত্ব
কিরণকর দত্ত
সম্পাদনা : প্রমোদকুমার দাস
শব্দক ভট্টাচার্য

শব্দক ভট্টাচার্য
সম্পাদনা : অভিষেক ভট্টাচার্য
ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
সম্পাদনা : ড. বিজু কল

উৎপল দত্ত
ড. ব্রজমোহন ঈশ্বর
ড. অমিত কুমার ঘোষ

শিশির সেন, জোহন হুগো
কল্যা মুখোপাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচার্য
কুমার রায়

সম্পাদনা : কুশল সাহা
উপসংহার দাস
সম্পাদনা : ড. মহম্মদ হোসেন সাহা
সম্পাদনা : সুবী ব্রহ্মন

প্রতিষ্ঠান : বইঘর, কবি হাউস, কলকাতা ট্রাষ্ট, রবীন্দ্রসমন চকর, বাংলা আকাদেমি ভবন,

১১৮ হেমচন্দ্র নবর রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০

ICA 3748/2000

আমাদের লক্ষ্য কলকাতাকে আরো
সুন্দর করে গড়ে তোলা, আরো
উন্নত নাগরিক পরিষেবা

এ কাজে চাই সকলের আন্তরিক
সাহায্য ও সহযোগিতা



তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসংস্থা



বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য এবং বার নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান।

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্র্যামো ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সূভাষ রোড, (৪র্থ তলা) কলিকাতা-৭০০ ০০১

চারী ভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট মানের কৃষি উপকরণ সরকার সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হবে।

ক) একর. এম. টি./মহিলার/এলকটন/মিসুবিশি ট্রাকটরস। খ) কয়লা/মিসুবিশি/প্রসি/বাফানা/ডি.এস.টি.বি.এইচ-১০০ পাওয়ার টারবস। গ) 'সুজল' ৫ অর্ধশক্তি ডিজেল পাম্পসেট। ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গারহালা প্রতিপালন সরঞ্জাম। ঙ) সার, ইজ ও ইউরেনিয়াম ওষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের ভারতীয় কৃষকের পব মেরামতি ও সেবা শোনার দায়িত্ব নেতবা হয়। যন্ত্রপাতিব তগগত মননব বা মেরামত করাব বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অবা হেত অফিসে (ফোন নং ২২০-২৩১৪/১৫) বোগযোগ ককন।

জেলা অফিস : ২৪-পবপথা (দক্ষিণ) : ১৪, নিউ তারাতলা বোড, কলিকাতা-৮
□:২৪ পরগণা (উত্তব) : ২৭নং বণোর রোড, বারাসাত □ হলদী : সাহাপুৰ রোড, তাবকেমব, আবামবাণ, হুঁচুড়া/পুরতবা □ বর্মান : ৫নং বামলাল বোস লেন, রাধানপব পাড়া, টেপন রোড, মেমারি, বর্মান □ বাঁকুড়া : লালবাজার, বাঁকুড়া টেপন রোড, বিকুপুৰ □ মেদিনীপুৰ (ত্তরেট) : সূভাব নগর, মেদিনীপুৰ □ মেদিনীপুৰ (ইট) : পীপকুড়া রেলওয়ে টেপন বোড, চৌধুরী কুটির, পোঃ পীপকুড়া □ শ্রীবহুম : সিউড়ি, বড়বাগান □ মালদা : মনরামনা বোড, মালদা □ মুর্শিদাবাদ : ১৬, শহীদ সূৰ্য সেন ষ্ট্রীট, বহরনপুৰ □ জলপাইগুড়ি : 'সবরি' কাছারি রোড, জলপাইগুড়ি □ দাখিাি : বাবা বতীন পার্ক, শিলিগুড়ি □ কুচবিহার : এন এন. বোড, কেচবিহার □ পুুলিরা : নীলকুটি ভালা রোড, পুুলিবা □ নদীরা : ৫/২, অনন্ত হরি মিম রোড, কুন্দনপর, নদীরা □ উত্তব শিনাজপুৰ : সুপান মার্কেট কমপ্লেক্স □ পশ্চিম শিনাজপুৰ : বালুপ বাট।

With Best Compliments from :

Phone : 25-2227

ASANSOL MINES BOARD OF HEALTH

An age old Organisation to protect the people of the Mining Settlement Area against Health Hazards like—Gastro-enteritis/Malaria/Leprosy/Other diseases.

Provided with :

- (1) Maternal & Child Health care system.
- (2) Conservancy & Sanitary works etc.
- (3) Public Health Laboratory facilities.

With Best Compliments from :

W. C. SHAW PVT. LTD.

HUTTON ROAD
HAWKERS MARKET
ASANSOL

With Best Compliments from :

A

WELL

WISHER

সম্পাদকীয়

শারদ সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় সস্তর বছরে পা দিল। একটি সম্পূর্ণ অবাণিজ্যিক সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রের এহেন দীর্ঘজীবনের কোনও নজির এ-দেশে নেই। বলা বাহুল্য, দশকের পর দশক পেরিয়ে এই পথ সব সময় সুগম হয়নি। তবে, পরিচয় কখনও নিছক ব্যক্তিনির্ভর-প্রকাশনা ছিল না, আজও নয়। বহু মানুষের নিঃস্বার্থ সহযোগ ও আত্মদানে পরিচয়-এর আজ সস্তর। বঙ্গদর্শন থেকে পরিচয়—এক কথায় বাঙালীর মনন ও সৃজনচর্চার ধ্রুপদী ধারাবাহিকতাকে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখেছে।

এ-বছর আগস্ট মাসে এক সপ্তাহের ব্যবধানে আমাদের উপদেষ্টামণ্ডলীর দুজন প্রবীণ সদস্য এবং বাংলা সাহিত্যের তিরিশ ও চল্লিশ দশকের দুই বিকপাল কবি অরুণ মিত্র ও মণীন্দ্র রায় প্রয়াত হলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁদের পরামর্শে ও প্রতিভার-অন্তর্দানে তাঁরা পরিচয়-কে সমর্থ করেছেন। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয়পত্রী-রাও গভীর বেদনা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

পরিচয়-এর পরবর্তী সংখ্যা—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—১০০। কবি সুধীন্দ্রনাথ আমাদের পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করে তাঁর জন্মের শতবর্ষপূর্তি সংখ্যার শুরু দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই পরিচয়-এর ওপর অর্পিত হয়েছে। আশা করি, আমাদের সহযোগী ও অনুরাগীরা এই কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে সার্বিকভাবে সাহায্য করবেন।

এই উপলক্ষে পরিচয়-এর লেখক-পাঠক-গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের এবং বিশেষতঃ আমাদের অভিন্ন-বন্ধু অশোক মজুমদার-কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অমিতান্ত দাশগুপ্ত

সম্পাদক, পরিচয়

পরিচয়

আগষ্ট—অক্টোবর ২০০০

শ্রাবণ—আশ্বিন ১৪০৭

১—৩ সংখ্যা ৭০ বর্ষ

● প্রবন্ধ :

আমার জীবন : আমার সময় □ অরুণ মিত্র / ১

ভিড় করে আসা কিছু ভাবনা □ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় / ১১

বাস্তবী কোন পথে? □ রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত / ২০

সাম্প্রতিক অস্তিত্ব ও মার্ক্সবাদ □ সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী / ২২১

ওরিয়েণ্টালিজম □ রমাকান্ত চক্রবর্তী / ২২৯

কেউ তোলে না কেউ তোলে □ অরুণকুমার বসু / ২৩৬

মশা □ শ্রীপাহু / ২৬০

কেন্দ্র, রাজ্য ও উন্নয়ন □ অনিবার্ণ চট্টোপাধ্যায় / ২৬৭

শনিবারের চিঠি, সজ্জনীকান্ত ও গোপাল হালদার □ অমির ধর / ২৮২

নতুন মুখোশ □ গৌতম রায় / ২৭৪

শতবর্ষে সুকুমার সেন □ পবিত্রকুমার সরকার / ২৯২

মিছিলের রাজনীতি □ বাসব সরকার / ৩০৬

● গল্প :

হুনন আশ্রয়ন : মেয়েদের কথা □ জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় / ৪৯

পুষলের জন্ম □ লীনা গঙ্গোপাধ্যায় / ৬৫

কবির লড়াই □ সোহরাব হোসেন / ৭৫

মানুষে কুকুরে □ পার্শ্বপ্রতিম কুণ্ডু / ৮৭

বেরাল □ কার্তিক লাহিড়ী / ১০২

মানুষ ও মেনিনের জীবন □ অমর মিত্র / ১০৯

সীতা □ সাধন চট্টোপাধ্যায় / ১২১

এসব কথা আচ্ছ কে না জানে □ সমীর রক্ষিত / ১৩২

ধূলিহর □ কিস্বর রায় / ১৪৪

মা □ মলয় দাশগুপ্ত / ১৫৮

উপাখ্যানের দ্রাণ □ বড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় / ১৬৭

পেখম মেলেছে নীলরতন □ রবিশংকর বসু / ১৭৫

● কবিতাশুচ্ছ : এক

৩১-৪৮

মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম কসু, চিত্ত ঘোষ, কৃষ্ণ ধর, সিদ্ধেশ্বর সেন, তরুণ সান্যাল, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রশব চট্টোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, বিতোব আচার্য, প্রফুল্লকুমার দত্ত, বাসুদেব দেব, রুপজিৎ সিংহ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, শ্যামসুন্দর দে, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী।

● কবিতাশুচ্ছ : দুই

১৮২-২২০

অমিতাভ দাশগুপ্ত, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, গলেশ কসু, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অনন্ত দাশ, সত্য শুভ, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, শুভ কসু, রুপজিৎ দাশ, তুলসী মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ ভট্টাচার্য, সুশান্ত কসু, দীপেন রায়, সুরজিৎ ঘোষ, ব্রত চক্রবর্তী, অমিতাভ গুপ্ত, জিয়াদ আলী, আনন্দ ঘোষ হাজরা, পার্শ্ব রাহা, উপাসক কর্মকার, স্বচ্ছরেশ চক্রবর্তী, অজিত বাহিরী, গৌতম ঘোষদত্তিদার, বিশ্বজিৎ রায়, দুলাল ঘোষ, শান্তি সিংহ, নির্মল হালদার, রাণা চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা রায়, বিশ্বনাথ কয়াল, কাজল চক্রবর্তী, পুণ্যশ্রোক দাশগুপ্ত, নাসের হোসেন, নীরদ রায়, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, শতরূপা সান্যাল, জয়ন্তী রায়, সৌগত চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর কসু, গৌতম দাশগুপ্ত, মৌসুমী মুখোপাধ্যায়, অনিবার্ণ দত্ত, প্রবালকুমার কসু, রাহুল পুরকায়স্থ, প্রবীর ভৌমিক, পঙ্কজ সাহা, প্রদীপ পাল, কমল চক্রবর্তী, অমি ভৌমিক, অপূর্ব কর

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক
বাসব সরকার বিশ্ববজ্র ভট্টাচার্য

কর্মস্বাক্ষ
পার্শ্বপ্রতিম কুণ্ড

সম্পাদকমণ্ডলী
ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী পরমেশ আচার্য
শুভ বসু অমিয় ধর

উপদেশক মণ্ডলী
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় রাম বসু

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

১৭৪৭৮

রঞ্জন ধর ব ক বাণীরাণী প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে
মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, বাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

আমার জীবন : আমার সময়

অরুণ মিত্র

[বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিক অর্থনের সংকতি চর্চার প্রেরণা প্রীতিপ্ৰসূনাথ কর-এর কাছে একটি প্রতিক্রিয়া প্রকাশের জন্য দীর্ঘকাল আগে কবি অরুণ মিত্র নিম্নোক্ত লেখা ও দুটি কবিতার অনুবাদ পাঠিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত না হওয়ায় এই পাতুলিপি প্রীকর-এর কাছে রক্ষিত ছিল। অরুণ মিত্র শ্রমাত হওয়ার পর তিনি লেখাটি পরিচয় দখত্রে পাঠিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানায়োর কোনও ভাষা আমাদের নেই।

স. পা.]

আমি জন্মেছিলাম ১৯০৯ সালের শেষ দিকে যশোর শহরে। অনেকেই জানেন সেইকালের ময়মনসল শহর মাসে নগরে ও গ্রামে মেমোশি। এখনকার মতো আধুনিকতার প্রাণে তার ওপর পড়েনি। শহরে যেমন পাকা রাস্তা ছিল (অবশ্যি পিচঢালা নয়, খোরাই ইটের)। তেমন ছিল মাটির কাচা পথ, দালানকোঠার পাশাপাশি ছিল কুড়ের, যেমন ছিল বাধানো ঘাটের পুকুর তেমন খানাজোবা, আর চারদিকেই কোপকাড় গাছগাছালি, কচুবন বাঁশবন নারিকেল সুপুরি তাল খেজুরের একঠেঙে ছটলা। এবং শহর থেকে একটু পা বাড়ালেই নির্ভেজাল গ্রাম। ফলে আমরা গ্রামের ছেলে ছিলাম না শহরের, তা বলা কঠিন। বসবাসের অনুভূতিটাও মেলানো মেমানো ছিল। আমরা যখন দল বেঁধে বেয়োতাম তখন যেমন কোনোদিন চলে যেতাম শহর কেন্দ্রে আপিসকাছারি জন্মম্যাজিস্ট্রেটের বাংলা একাধিক অথবা ফুটবল মাঠে, তেমনি আবার কোনোদিন চলে যেতাম পাশেই গ্রামের মতো। কোনো কোনো পাড়া থেকে গানের দুরত্ব ছিল শহর দুরত্বের চেয়ে কম। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বেশি অভিজ্ঞত করত গোঁয়ো আবহাওয়া। কেউ কেউ বলেছেন আমার কবিতায় নাকি বাংলার জলমাটি অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে। তা হতে পারে। কেননা আমার শৈশব ও কৈশোর তাদের সংগ্রহ করে রেখেছিল।

আমি অবশ্যি যশোরে একটানা থাকিনি। বালক বয়সেই সেখান থেকে চলে আসি, এবং আমার লেখাপড়া জীবনযাপন বরাবর কলকাতায়। কিন্তু কলকাতায় এসে যশোরের সঙ্গে আমার বাঁধনটা আলগা হওয়ার বদলে আরো শক্ত হল। তার ওপর আমার টান বহুকাল পর্যন্ত অত্যন্ত তীব্র ছিল। সেই nostalgia কলকাতায় আমাকে চেপে থাকত। যশোরে যাবার সুযোগের অপেক্ষায় ভেতরে অস্থির হয়ে থাকতাম, প্রত্যেক ছুটিতেই যেতাম। আমার সত্যিকার সঙ্গী সাথী বলে যাদের মনে

করতাম, তাদের সবারই বাস সেখানে। সেখানে পৌছলেই আমার মনে হত আমি নিজের জায়গায় এলাম। আমার শরীর ও মনের গড়ে-ওঠাকে সেখানকাব পরিবেশই নিয়ন্ত্রিত করেছিল। একটু ব্যাখ্যা করি। ওই যে বলেছি শহর-গ্রামের মেশামেশি ছিল শরীর-মনের তৎপরতায়, আমার কাছে এ দুয়ের কোনো শ্রেণীভাগ ছিল না, যেমন আদ্য আমার দৃষ্টিতে ও অনুভূতিতে সাহিত্যিক ও সাধারণ মানুষের শ্রেণীভাগ নেই। সকলকেই আমার সমান কাছাকাছি মনে হয়। আমি যশোরে যাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশতাম তাদের মধ্যে এক দিকে যেমন ছিল দুর্ব্বল দুঃসাহসী সব চরিত্র, তেমনি অন্যদিকে ছিল তারা যাদের বলা যেতে পারে মনন-পন্থী, যারা লেখক, সাহিত্যানুরাগী এবং দেশকর্মী। আমার অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় বেপরোয়া বন্ধুরা যখন ফল চুরি, পাঁঠা চুরি ইত্যাদি অপকর্মে উদ্যোগী হত, আমি তার অংশীদার হয়ে যেতাম। তাদের সঙ্গে জলে ঝাপঝাপি (সীতার) কাটা এসবও করতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেই সময় আমি গাছে চড়াও রপ্ত করি। মোটামুটি ভালোই পারতাম গাছে চড়তে। দুটো ঘটনা মনে আছে। একবার জাম গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম নিচে। জামের ডাল তো খুব পল্কা হয়—এক থোকা পাকা জামের লোভে যখন আমি একটা সরু ডালের উপর দিয়ে এগিয়েছি, সেটা আমাকে নিয়ে ভেঙে পড়ল মাটিতে। ডালটা বেশী উঁচু ছিল না তাই রক্ত, চোঁট অল্প লেগেছিল। অন্য ঘটনাটা ডাব পাড়াব। আমি চড়েছিলাম এক নারকেল গাছে। একেবারে মাথায়, যখন উঠে গিয়েছি তখন বিপর্যয়, পাতার ঝড়ে ছিল লালসে পিপড়ের বাসা; তারা আমার সারা শরীর ছেকে ধরল, অসহ্য কামড়। আমি তাড়াতাড়ি লাথি মেরে কয়েকটা ডাব বসিয়ে দিয়ে নামতে সাগলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুক আলগোছে রেখে নামা গেল না, গাছের গা বেঁধে শরীরটা ছেড়ে দিতে হল, ফলে বুকের ছাল উঠে এক বিশ্রী ব্যাপার। আমার দুরন্ত ঐ বন্ধুদের সঙ্গে একবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম, ট্রেনে স্টীমার লৌকায় হেঁ হেঁ করে বেড়িয়ে কয়েক দিন পরে ফিরেছিলাম।

এরই সমান্তরালে অন্য একখারা। আমার-মামার বাড়িও যশোর শহরে। সে বাড়ির আবহাওয়া ছিল যাকে বলা যায় সাংস্কৃতিক। প্রবাসী, ভারতবর্ষ পত্রিকা আসত গ্রামোফোন এবং গানের অনেক রেকর্ড ছিল, এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটেনিকা ছিল, আর ছিল নানারকম বই; কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গোয়েন্দা কাহিনী, প্রবন্ধ। আমারও এক স্বভাবগত আকর্ষণ ছিল ঐ দিকে। সুতরাং যাক পেলোই আমি সেখানে গিয়ে, আস্তানা গাড়তাম। এ বাড়ি তরুণদের মিলনক্ষেত্রও ছিল, আমার বয়েসী এবং আমার চেয়ে কিছু বৃদ্ধদের। তাদের মধ্যে গেলে আমি বাইরের জগতের স্পন্দন অনুভব করতাম। কেননা দ্ব্যতীয় ভাবধারার স্পর্শে ঐ তরুণরা উজ্জীবিত ছিল। সম্রাসবাদী, গান্ধীবাদী এবং সাম্যবাদী সংগঠনের সঙ্গে এদের অনেকের যোগ ছিল। তার উপর কেউ কেউ আবার ছিল সাহিত্যে উৎসাহী। যশোর জেলার অন্য অঞ্চল থেকে প্রকাশিত এক

সাহিত্য-পত্রিকায় তারা ছড়িত ছিল। বোধ হয় এই অনুপ্রেরণাতেই কিছুকাল পরে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে কলকাতায় এক স্বল্পায়ু মাসিক পত্র বের করেছিলাম। তার আগে আমার এক কবিতা বেরিয়েছিল বিদ্যবীন্দ্রের পরিচালিত কিশোর পত্র

১) 'বৈশু'তে আমার প্রথম মুদ্রিত রচনা।

সাহিত্য যে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, নিছক শব্দের খেলা নয়, জীবনের অভিঘাতেই যে কবিতা তথা যে কোন সৃজনী শিল্পের জন্ম, আমার এই বিশ্বাসের ভিত্তি মনে হয়, আমার অজ্ঞাতসারে সেই সময়েই গড়ে উঠেছিল এবং তারই অঙ্গ হিসাবে এই বোধেরও যে, সাহিত্যিকরা উচ্চতর কোন শ্রেণী নয় সর্বসাধারণেরই এক অংশ যার একটা বিশেষ প্রকণতা ও ক্ষমতা আছে। যেমন অন্যান্য অংশের অন্যান্য বিশেষ প্রকণতা ও ক্ষমতা আছে। আমার মেলামেশায় ও আচরণে সেই বোধই আপনা থেকে রূপ নিত। কোন জ্ঞাত বিচার আমার মনে ছিল না।

মামার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের বয়োভ্রাতৃ একজন থাকতেন। নাম ফকীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে এই তরুণদের অন্যতম প্রেরণাদাতা বলে বর্ণনা করা চলে। তিনি এদের অনেকের শিক্ষক ছিলেন, শুধু লেখাপড়ার ব্যাপারে নয়, শরীরচর্চাতেও। সেইজন্য সবাই তাঁকে 'স্যার' বলত। আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু কলকাতা থেকে নিয়মিত গিয়ে তাঁর সাঙ্গিধ্যে থাকতাম বলে আমিও তাঁকে স্যার বলতাম। ফকীন্দ্রবাবু সংস্কৃতের সব বিভাগে ছিলেন সুপণ্ডিত এবং সেই সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যেও আগ্রহী। সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য তিনি নিজেও ছিলেন লেখক। উপন্যাস ও গল্প লিখতেন। সে-লেখা কেমন হত তা আজ আমি স্মৃতি থেকে বলতে পারব না। তবে যতদূর মনে পড়ে, কম্বোলে এবং ভারতবর্ষে তাঁর লেখা ছাপা হয়েছিল এবং একটা উপন্যাসও তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর রচনার শুভাশুভ ঘাই হোক, সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এক জীবন্ত আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। আমার মনে আছে একবার তিনি কয়েকদিন কলকাতার কাটিয়ে ফিরে গিয়ে আমাদের কাছে দীনেশ দাশের কম্বোলী আচ্ছাদ্যের বিবরণ দিলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলাম।

আমার স্থায়ী বাস ছিল কলকাতায়। কবিতার প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রবল। তখনকার কবিতা অনুরাগী সব বাঙালী ছেলের মত আমারও প্রথম প্রেম রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কবিতা পড়ে আমি আমি আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম। বালক বয়সে রবীন্দ্রদর্শনে গিয়ে আমার একটা সোনার হাত-খড়ি খোঁজা গিয়েছিল। কিন্তু আমি তাতে কিছুমাত্র দুঃখ পাইনি, এ ঘটনার কথা আমি ইতিপূর্বে এক ভায়গার বলেছি। অন্যদের কবিতাও আমি পড়তাম। যেমন নজরুল, মোহিত মজুমদার, সত্যেন দত্ত। কিছু অন্য রকম লাগত ঠিকই, তবে তা আমাকে অভিভূত করত না। সেই সময় থেকেই আমার কবিতা লেখার চেষ্টা। আরম্ভকালের পর কয়েক বছর আমি নিয়মিত যা লিখতাম, খাতাবন্দী করে রাখতাম। সে-সব রচনা তেমন কিছু হত না বোধ হয়, কিন্তু সে-

প্রশ্ন নিয়ে আমার মাথা ব্যথা ছিল না। লিখতেই বেশ ভাল লাগত আমার। ছাপানোর বিশেষ চেষ্টা করিনি; শুধু আশ-পাশেব দু'একজনকে শুনিয়েছি।

আমার বছর উনিশ বয়সে একটা মেটা খাতায় অনেক কবিতা জমেছিল। সেটা বাসা বদলে কোথাও হারিয়ে যায়। এখন আমি সে-রচনা সম্বন্ধে একটা কৌতূহল বোধ করি; কবিতাগুলো থাকলে বুঝতে পারতাম প্রাথমিক প্রকাশটা কেমন ছিল। আসলে তখন লেখার বা ছাপার হরফ ছাড়িয়ে যে-জীবন সেটাই আমাকে বেশি কৌতূহলী ক'রে রাখত। নানা বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল যার অনেক খানি অবশ্য এখনো টিকে আছে। সঙ্গীত তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

রাগ সঙ্গীত আমাকে খুব টানত। লালচাঁদ বড়ালের স্মৃতিতে তাঁর বাড়িতে সঙ্গীত-অনুষ্ঠান, মুরারি স্মৃতি-উৎসবের অনুষ্ঠান, আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে শ্রোতাদের মধ্যে কোন উপায়ে জারগা করে নিয়ে গান-বাজনা শুনতাম, কখনো কখনো রাতভর। লালচাঁদ উৎসবে আমি শুনেছিলাম অতুলনীয়া মুশ্‌তরী বাই-এর গান। বস্তুতঃ সেকালে ভারতবর্ষের বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ যারা কলকাতায় এসেছেন তাঁদের প্রায় সকলেরই গান বা বাজনা আমি শুনেছি।

আর, এখনকার সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড তফাৎ ছিল আমাদের জীবন-অনুভূতিতে। পরাধীনতার যন্ত্রণা এখন নেই যা ছিল আমাদের প্রতিদিনের যন্ত্রণা। পরশাসন এবং নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা ও সংগ্রাম ছায়া ফেলে থাকত আমাদের পুরো মানসপটে। এঁহ সমস্ত নিয়ে যে জীবন, সাহিত্যকে তারই এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে আমার মনে হ'ত, তার বেশী নয়।

কম্মোল সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ছিল, কিন্তু কবিতার বিষয়ে তার প্রতি তেমন কোন আকর্ষণ বোধ করিনি। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ঐ পত্রিকার মাধ্যমে কবিতার কোন নতুন সামান্য লক্ষণ আমার চোখে ধরা দেয়নি। এখন বুঝি, আমার কাছে সমস্যাটা সব সময়েই ছিল ব্যক্তিগত। দলগত বা সম্মিলিত কাব্য আন্দোলন আমার আগ্রহ ছিল না।

কম্মোল প্রসঙ্গে সম্প্রতি আমাকে এক প্রশ্ন করা হয়, আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রাচীন মনে করতাম কিনা এবং করে থাকলে তা কীভাবে অতিক্রম করেছি। সাহিত্যে কাউকে প্রাচীন মনে করা আমি অবাস্তব ভেবেছি, এখনো তাই ভাবি। কেননা কবিতার সমস্যাটা আমার চোখে বরাবরই অন্যরকম। তা হল নিজের পক্ষ থেকে কথা বলার উপযুক্ত উপায় অন্বেষণ এবং তার অবলম্বনে অন্যকে সে-কথা জানানো। আমার সামনে যে-সমস্যা ছিল তা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার নয়, তা, কবিতা লেখারই। প্রতিভাশালী পূর্বগামীরা যা করে যান তা স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীদের ঐতিহ্য হয়ে যায়। কবিতা তো কাউকে অতিক্রম করার জন্য লেখা হয় না, লেখা হয় নিজের অনুভূত অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার জন্য এবং তা অন্যের মনে পৌঁছে দেওয়ার

জানো। কী করে নিজের কথা ঠিক মতো কলা যায়, এ চেষ্টা সব কবিরই। কিন্তু অন্যের কাছে পৌছানোর সমস্যাটা বড় বিপাকাত্মক। আমাকে সেটাই সবচেয়ে পীড়া দিয়েছে, আশ্রয় দেয়। এই পৌছানোর সীমাবদ্ধতার প্রতিহত হয়ে আমি বারে বারে এক ব্যর্থতাবোধে কবিতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। অবশ্য সেভাবে বেশী দিন থাকতে পারিনি, আবার তার দিকে ফিরেছি। সে-সময় এ সমস্যার মূল কারণগুলো বুঝিনি। আজ কতকটা বুঝি। ফলে সংযোগ স্থাপনের সমস্যা যদিও আমাকে পীড়িত করে, তবু ব্যর্থতাবোধ আমাকে চেপে ধরে না।

স্নাতক হওয়ার পর ছাত্রাবস্থাতেই আমি সাংবাদিকতার কাজ নিলাম আনন্দবাজার পত্রিকায়। আমার চাকরী করা দরকার হয়ে পড়েছিল। আনন্দবাজারের কার্যালয়, তখন ছিল গোলদীঘির পূর্ব দিকে শ্রী গৌরাস্থ প্রেসের উপর। সে কবেকার কথা। কিন্তু আনন্দবাজারের কাজকে চাকরী বললে ঠিক কলা হয় না। তা ছিল আমার এক নতুন উদ্দীপনার ক্ষেত্র। ভারতীয় সংবাদপত্র তখন ছিল মুক্তিকামী জাতির দৈনিক মুখপত্রের মতো। জাতির সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আত্মশোধন সবেরই প্রতিফলন হত সেখানে। আমাদের ব্যক্তিগত আবেগ তাতে যুক্ত ছিল। সেই সঙ্গে আমরা অন্যতম সমস্ত পৃথিবীর স্বরূপসন্দন, সময় কোথা দিয়ে ক্রেটে বেত আমরা টের পেতাম না। আমাদের যেন দেশা সেগে থাকত। আর কাজের আবহাওয়াও ছিল অত্যন্ত জ্বলন্ত। আনন্দবাজারে আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি এবং নানা বিভাগে। এখন যে শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের এত রেওয়াজ, আমার বিশ্বাস আনন্দবাজার তার প্রবর্তক। এই শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের কাজেও আমি অংশ নিয়েছি।

সাংবাদিকতা করে শেষ পর্যন্ত ইংরিজি সাহিত্যে পরীক্ষাটা আর দেওয়া হল না। তখন মাথার মধ্যে ভাবনার এমন টালমাটাল যে, ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের চিন্তা সেখানে ঠাইও পেত না।

সংবাদপত্রে কাজ করার জন্য জাতীয় আন্দোলন ছাড়াও বে ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার সুযোগ আমার হয়েছিল, তা হল ফ্যানিজমের অভ্যুদয়।

কীভাবে সারা পৃথিবী এক ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে চলেছে তা দিনের পর দিন যেন চলচ্চিত্রের মত চোখের সামনে দেখেছি। বিপদটা অবশেষে এসেই পড়ল, বেখে গেলে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ। এই বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যে আমার দৈনিক সাংবাদিকতার সমাপ্তি ঘটে। আনন্দবাজার পত্রিকার কার্যালয়, তখন বর্মন স্ট্রিটে, আনন্দবাজারের পদত্যাগী সম্পাদক ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'অরপি'। সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত এই সাপ্তাহিকের সঙ্গে গোড়া থেকেই আমার যোগ ছিল, এখন আমি পুরোপুরি তার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। সে আর এক উদ্দীপনাময় অভিজ্ঞতা। শ্যাত-অশ্যাত কতজন সহযোগিতার এগিয়ে আসতেন। কত বনিষ্ঠতা পড়ে উঠত। এক উচ্ছল সহমর্মিতার পরিবেশে আমরা কাজ করে যেতাম।

পুরোনো লেখকরা নতুনত্ব নিয়ে দেখা দিতেন, নতুন লেখকরা আবিষ্কৃত হতেন। যতদূর জানি, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা ‘অরণি’তেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রকাশিতদের মধ্যে সিদ্ধেশ্বর সেনও একজন।

ফ্যাশিভম্-এর শ্রুতি দানবীয় মূর্তি পাশ্চাত্যের শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রথম থেকেই উদ্ভিগ্ন করে তুলেছিল। রম্যা রলার নেতৃত্বে বহু বিশিষ্ট লেখক ও মনীষী তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এখন ঐ বিপদ বাস্তব রূপে আমাদের সামনে এসে পড়ায় আমাদের এখানেও শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা বিচলিত হলেন। ফ্যাশিভম্, যা হ’ল সাম্রাজ্যবাদ ও ছাতি-সত্ত্বের চরম নম্র প্রকাশ, তা যদি জয়ী হয় তা হলে সমস্ত মানবিক মূল্য, সংস্কৃতির সমস্ত কীর্তি ধ্বংস হয়ে যাবে, অতএব সেই বিপদ সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করতে হবে এবং তাৎ প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হতে হবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হল ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। অনেকে তাতে যোগ দিলেন। আমিও। সম্মিলিতভাবে শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির অভিপ্রায় তাতে ছিল না। শিল্প সাহিত্য সৃজন যে যৌথ উদ্যমের বিষয় নয়, একক সাধনার বস্তু সে-ধারণা অধিকাংশের মত আমারও ছিল। এ উদ্যম ছিল শিল্পী ও সাহিত্যিকের বিবেকের দায়, মানব মূল্যকে রক্ষার প্রয়াস।

আমার আর এক আকর্ষণের কথা এতক্ষণ বলা হয়নি। যা আমাকে অন্য এক পথে নিয়ে গিয়েছে এবং যা থেকে আমার সাহিত্যিক চিন্তা ও মনোভাব পুষ্টি আহরণ করেছে। তা হ’ল ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আমার আকর্ষণ। আমার বয়স যখন অল্প, তখন থেকেই তারা আমাকে টেনেছে। কেন তা ঠিক বলা মুশকিল। মনে হয় ছোট বেলায় ডিকতর যুগের এক উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ পড়ার ফলে এটা ঘটেছিল। ভুল উচ্চারণে বাংলা অক্ষরে উপন্যাসটির নাম ছিল ‘লা মিজারেবল’। যুগের উপন্যাস তখন আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, তাঁকে বিরাট কবিরূপে জেনেছি অনেক পরে। ফরাসী ভাষা শিখতে আমি চেষ্টা করেছি নানাভাবে। সে সময় বাংলা দেশে চন্দন-নগরের বাইরে ফরাসী শেখা সহজসাধ্য ছিল না।

আমি নানাভনের কাছ থেকে এলোমেলোভাবে কিছু কিছু শিখে নিতাম।

সেইভাবে বই পড়া আরম্ভ করি। কলেজ ম্যাগাজিনে ইংরাজীতে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম ফরাসী লেখক আলফ্রেস বোদে সম্বন্ধে। পরে কলকাতায় আলিরাঁস ফ্রাঁসেজ স্থাপিত হলে সেখানে আমি নিয়মিত শিক্ষার সুযোগ পাই। বিশ্বযুদ্ধের শেষে এখানকার ফরাসী মহলের সঙ্গে যোগাযোগ বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আলিরাঁস ফ্রাঁসেজ গ্রন্থাগারে সহকারী হিসাবে আমি কিছু দিন কাজ করি। তারপর বৃত্তি নিয়ে চলে যাই ফ্রান্সে।

সরবন অর্পাৎ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করে কিছু শিক্ষাগত সাফল্য অর্জন করি। দেশে ফিরে ফরাসী অধ্যাপনার কাজ পাই

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর একটানা অনেক বছর আমি সেখানে ছিলাম। ছিলাম বটে এলাহাবাদে, কিন্তু সত্যিকার বাসিন্দা ছিলাম কলকাতার। ঠিক যেমন ছোটবেলায় থাকতাম কলকাতায় কিন্তু বাস করতাম যশোরে। প্রত্যেক ছুটিতে আমি এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছি এবং এলাহাবাদে ফেরার সময় মনে করেছি ছুটিতে বাইরে যাচ্ছি। বরাবর অনুভব করেছি আমার সমস্ত শিকড় এই কলকাতায় এই বাংলা দেশের মাটিতে গাথা রয়েছে। এই অনুভূতির কথা আমার একাধিক কবিতায় প্রকাশও করেছি।

শিক্ষকের দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেছি দীর্ঘকাল এবং বিনিময়ে ছাত্রদের ভালবাসাও পেয়েছি। কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক আমি নই। কেননা শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে সাধারণভাবে কোন চিন্তা আমার মাথায় আসত না, আমার মনে যুরে কিয়ে আসত কবিতার ভাবনা আর মানুষের সৌহার্দ্যের আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ার ইচ্ছে। প্রবাস থেকে কলকাতায় যখন আসতাম, তখন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎই ছিল আমার সেরা আনন্দ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কবি-সাহিত্যিক* কিন্তু সাহিত্যের ভিত্তিতে তাঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা নয়, ঘনিষ্ঠতা মানুষ হিসেবে। কবিতার সূত্রে যেখানে আলাপ পরিচয়, সেখানেও শেষ পর্যন্ত সেটা যেন গৌণ হয়ে গিয়েছে। মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বন্ধুতা। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, কবিতাকে আমি বরাবরই আমার একলার ভাবনা হিসেবে নিয়েছি। কেননা সাহিত্যিক দলে আমি ভিড়িনি। এর ফলে অনেক অসুবিধেও আমার হয়েছে প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির দিক থেকে। কিন্তু আমি তাতে খুব বিচলিত হইনি। কারণ সংগঠিত মহেছে আমার অকিঞ্চাস মজ্জাগত। আমার হিসেবটা সোচ্ছা; যদি আমার লেখায় কোন পদার্থ থাকে তাহলে এক সময় তা নিশ্চয় স্বীকৃত হবে, যদি না থাকে তবে তার বিলোপে সাহিত্যের ক্ষতি নেই। আমার এই মনোভাব খুব ছোট পেয়েছে ফ্রান্সের কাছ থেকে।

অমন অটল সাহিত্যিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। স্বভাবতই এর বিপরীত আচরণ আমার কাছে প্রীতিকর নয়। কোন উপায়ে নামজারি করা, ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগকে সাহিত্যিক মূল্যায়নের ছাপ দেওয়া, এ সব অবশ্য যথেষ্টই দেখি চারদিকে। কিন্তু সেটাই যে পুরো ছবি নয় তার প্রমাণও পাই। সেইখানেই আমার আশা বেঁচে থাকে। তবে সর্বসাধারণের সঙ্গে সংযোগের অভাবে এক এক সময় মন ধারাপ হয়। কিন্তু আপাতত সে সম্বন্ধে কিছু করা তো যাবে না। অনেক বড় সামাজিক প্রশ্ন তাতে জড়িত, কারো একলার হাতে তার সমাধান নেই। সুতরাং আমার একমাত্র করণীয় আমার নিজের কাজ করে যাওয়া। আমার নিজের অন্তিমতা ও অনুভূতি নিয়ে আমি পথ ভেঙে চলেছি। বাংলা কবিতায় আমি যেন এক নিঃসঙ্গ পথিক। কিন্তু সত্যিই কি নিঃসঙ্গ? তা মনে হয় না যখন দেখি আমার কনিষ্ঠ কবিদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে, যখন দেখি আমার কাছে ধীরা এগিয়ে আসছেন তাঁরা কেউ আমার নিকট-বয়সী নন। তাঁরা সব উজ্জ্বল মুখক।

দুটি আফ্রিকী ফরাসী কবিতা

অনুবাদ : অরুণ মিত্র

[আফ্রিকা মহাদেশ এবং তার স্বল্পবিচ্ছিন্ন নিম্ন প্রান্ত মাদাগাস্কার খেতাব সাম্রাজ্যবাদী শাসনশাষণের ক্ষেত্র ছিল কলকাল। এখনো সেই পাশবিকতা মূর্ত রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। অসহনীয় পরপদানত অবস্থার মধ্যেই আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা তাদের সহজাত শৈল্পিক সংবেদনাকে নিরন্তর রূপায়িত করেছে নৃত্যে, গীতে এবং কাব্যে। স্বভাবতই তাদের কাব্যের প্রধান প্রকাশ ঘটেছে নিজের নিজের মাতৃভাষায় কিন্তু যারা বিবিধ শিকাগাভের সুযোগ পেয়েছে তাদের কাব্যরচনার বাহন হয়েছে বিদেশী শাসকদের ভাষা যা মাতৃভাষার মতোই তাদের অধিগত, যেমন ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ। ফরাসী ভাষায় এই কৃষ্ণাঙ্গ রচনা ফরাসী সাহিত্যেরই এক বিশিষ্ট উজ্জ্বল অংশ। শুধু আফ্রিকারই নয়, অন্য উপনিবেশের নিগ্রো অধিবাসীরাও তার অংশীদার। একাধিক সমাদৃত নাম উল্লেখ করা যায় এ প্রসঙ্গে, যেমন জেওগল্দু সেন্দার সাঁগর, এমে সেজের। কৃষ্ণাঙ্গ কবিত্বদয়ের আবেগ, ঐতিহ্য-স্মৃতি, দেশ ও জাতির অবস্থার অনুভব, অব্যবহৃত বিচিত্র নিসর্গ ও প্রাণীজগতের স্পর্শ এই কাব্যকে তার বিশিষ্টতা দিয়েছে। আধুনিক বুদ্ধিজীবী লেখকেরা—মূলত সেজের এবং পরে সাঁগর—‘নেগ্রিট্যুদ’ নাম দিয়ে তার এক দার্শনিক স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তবে সাধারণভাবে কৃষ্ণাঙ্গ-রচনায় তার প্রকাশ কোনো দর্শন-তত্ত্বের মুখোপেক্ষী নয়, তার উদগম সহজাত। এখানে দুটি আফ্রিকী রচনা মূলত ফরাসী ভাষা থেকে অনুবাদ করে দেওয়া হল। একটি সরল অনাড়ম্বর, অন্যটি গহনাচারী, কিন্তু হৃদয়ধ্বনিতে দুইই প্ররমায়ী।]

জন্মভূমি

আব্দুল কাদের কেরে

(উপর-ভোলতা)

আমি যে দেশে জন্মেছি
সেখানে সূর্যোদয় এত সুন্দর
সেখানে সূর্যাস্ত এত উজ্জ্বল,
সে দেশের যেখানেই থাকি যাক
প্রকৃতি হাতে নাগালে ধরে দেয়
তার রূপ তার রহস্য
তার গুঢ় সঙ্কেত,
বাচ্চরা আর খানের সীমাহীন ক্ষেত্র থেকে

ব'য়ে চলে তাদের সোনার ঢেউ
 আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে,
 তার ওপারে ছায়া ঝোপ
 লম্বা শরবন, অন্তরের রাজ্য,
 বোকা হায়না থেকে শুরু করে
 মহীয়ান সিংহ পর্যন্ত সবাই
 আমাদের রাতজাগা গল্পকে
 শোভাময় করে তোলে।

বংশীবাদ

বী-কোজেন্স রাবেনারিভেলো
 (মাদাগাস্কার)

তোমার বংশী
 তুমি তা বানিয়েছো বলবান ষাঁড়ের পায়ে হাড় দিয়ে
 এবং তুমি তা পালিশ করেছো
 রোসে কলসানো উঁবর পাহাড়ে ঘ'বে।
 তার বংশী
 সে তা বানিয়েছে হাওয়ায় কাঁপা নলবাগড়া দিয়ে
 এবং সে তাতে ছিন্ন করেছে জ্যোৎস্নার স্বপ্নে আচ্ছন্ন
 প্রবাহিনীর তীরে।

গহন সন্ধ্যায় তোমরা এক সঙ্গে তাদের বাজাও
 যেন আকাশের কূলে ডুবন্ত গোল ডিস্কটাকে
 তোমরা বাঁচাতে চাও,
 যেন তার নিয়তি থেকে
 তোমরা তাকে উদ্ধার করতে চাও।
 কিন্তু তোমাদের আকুল সুর কি শুনেতে পান
 হাওয়ার দেবতা
 মাটি আর বনের দেবতা
 বালির দেবতা?

তোমার বাঁশী

ধে-সুর ফোটায় তাতে শোনা যায় এক জুড়ি বাঁড়ের ক্ষুরধ্বনি
যে দৌড়ে যায় মরুভূমির দিকে
আবার সেখান থেকে দৌড়ে ফেরে
কিন্তু তৃষ্ণায় আর ক্ষুধায় চর্জর হয়ে
যে অবসাদে ভেঙে পড়ে,
ছায়াহীন ফলহীন পত্রহীন
এক গাছের গোড়ায়।

তার বাঁশী

যেন এক নলখাগড়া যা দুরাগত এক পাখির ভারে
নুয়ে পড়ে,
কোনো শিশু ধরে ফেলেছে এমন পাখি নয়
এবং যার পালক উন্মোচনো নয়,
এমন পাখি যে তার আপনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন
যে সাক্ষনার জন্যে প্রোতবিনীর জলে
নিম্বের ছায়া দেখে।

তোমার বাঁশী

এবং তার বাঁশী

তারা তোমাদের দুঃখ যন্ত্রণার গানের মধ্যে
তাদের আদিজন্মের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

ভিড় করে আসা কিছু ভাবনা

মোপাল হামদার, বিষ্ণু দে, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরূপে
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯০০-১৯০১ 'পরিচয়' পরিচালকদের বিপুল ব্যস্ততার একটা সময়, কারণ পত্রিকার জনক ও প্রাণপুরুষ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র জন্ম ১৯০১ সালে। কিম্বদন্তী-কোবিদ, সুধীন্দ্রর অন্যতম অন্তরঙ্গ, সুশোভনচন্দ্র সরকারেরও জন্মবর্ষ ১৯০১। 'পরিচয়'-এর প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা ও লালনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ও নীরেন্দ্রনাথ রায়, বাদের জন্মশতবর্ষ অনতিপূর্বে পালিত হয়েছে। তাছাড়া এই পত্রিকার স্থাপনা ও সম্পাদনা ব্যাপারে একেবারে আদি থেকে পরিপূর্ণভাবে যিনি জড়িত ছিলেন আর আমৃত্যু বহু বিশ্বব্যাপী সম্মেদে সংলাপ রাখতে পেরেছিলেন, নিজের সম্রাজ্যে যেন এর সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছিলেন, আর অন্তরালে থেকেও যিনি ছিলেন বাংলা গদ্যের স্বয়ংসিদ্ধ শিল্পী, সেই গভীরতাসম্বানী অথচ সহজ, সরল, সদাশাস্যময় প্রাণোচ্ছল হিরেন্দ্রকুমার সান্যাল-এর জন্ম থেকে শতবর্ষ পূর্তি এই শারদীয় সংখ্যার মুখ্য বিষয় বলে চেনেছি। তাঁকে নিয়ে গোটা প্রবন্ধ লেখার জন্য দরকারি মালমশলা (আর সঙ্গে সঙ্গে আরও দরকারি 'মেজাজ' বলে বস্তুটি) জোগাড় করে উঠতে পারছি না বলে আমার দুঃখ। নিজের অক্ষমতার সাফাই হিসাবে একটু যেন ঝাঁক দেবার মতলবেই আমার ক্লাস্ত মনে ভিড় করে আসা কতকগুলো ভাবনা 'পরিচয়'-এর পাতার হাজির করছি। আর এই সুযোগে স্মরণ করছি তিন ধরাত সুহৃদকে, বাদের স্বকীয় অবদান 'পরিচয়'-এর পাতাতেই ভাব্য হয়ে রয়েছে। এই বয়স্ক অথচ আজও অবসাদজর্জর হ'তে অস্বীকৃত আর কস্ববিধ প্রতিকূলতায়ও অপরাহৃত পত্রিকার চারিদিক নির্মাণ ও বিকাশে তাঁদের ভূমিকা আমাদের মতো অনেকের মনে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

পুরোনো বই খাঁটিতে খাঁটিতে পেলাম সম্রাতি ধরাত আমাদের কবিদের বহু ও সহকর্মী জ্যোতি ভট্টাচার্য-এর একটি রচনা। এই সুদর্শন, সুভদ্র, বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী, প্রতিভাভরদের অকালমৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি তা পূরণ হবার নয়। যাকে কলতে পারি ধন্যবাদ, তাই নিয়ে অতি সাক্ষীলভাবে দু'হাজার তিনশো বছর আগেকার ভারতবর্ষে পুণ্যপ্রদ 'সম্রাট' অশোক খ্রিস্টপূর্বের এক শিলালিপি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : "কল্যাণং দুঃকরং। যো আমিকসরী কল্যাণস সো দুঃকরং করোতি"। অর্থাৎ কল্যাণ করা সহজ নয়, দুঃকর। কোনো কল্যাণকর্ম যে প্রথম করে, সে এক দুঃকর কর্ম করে।

এর পর জ্যোতি ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত টীকা : অশোক এক বিপ্লবের স্বপ্নই দেখেছিলেন—শান্তি সমৃদ্ধিভরা এক মানুষের সমাজ। সে স্বপ্ন বাস্তব হয়নি। আজ অশোকের লালিত পতাকা উড়িয়েও সে-স্বপ্নকে বাস্তবে লালিত করাই হচ্ছে।

ভাবতে অলো লাগে ১৯২০ সাল নাগাদ সময়ে তৎকালীন বিশ্বখ্যাত মনসী H. G. Wells তাঁর বিপুল “The Outline of History” গ্রন্থে জগতের ইতিহাসে ছয় শ্রেষ্ঠমনের একটি বাছাই তালিকা দেন : গৌতম বুদ্ধ, অ্যারিস্টটল, অশোক, যীশুখ্রীষ্ট, রজার বেকন, এব্রাহাম লিঙ্কন। সেদিনের দুশ্মী, পরাধীন ভারতবাসী হিসাবে বিদেশী মনীষীর সিদ্ধান্ত কত পুলকিত করত, গর্ব এনে দিত, তা মনে পড়ছে। তবু ভালো যে আজকের কল্পিত আন্তর্জাতিক পরিবেশেও পশ্চিম জগতের বিচারে গণতন্ত্রসম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে একদিকে কার্ল মার্কস অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীর নাম পরম প্রশংসায় উচ্চারিত হয়েছে।

কিছুকাল আগে কলকাতা লেখক শ্রবণ সিংয়ের একটি রচনা থেকে জেনেছিলাম এক মহীয়সী বিদেশিনীর কথা। ১৯১৩ সালে সুইটসরল্যাণ্ডে জন্মেছিলেন, হসেরিয়ন পিতার গুণে Eva Yvonne Linda Maday-la-Maros (পুরো দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসূচক নামটি দিলাম), যিনি তুয়ারস্কে জীড়ার (ski-ing) সুবাদে ষানোলকর নামক সমরশিকার ব্যাপ্ত এক তরুণ মহারাজার সঙ্গে পরিচিত হন এবং উভয় পরিবারের বৈরিতা উপেক্ষা করে বিবাহ করেন। এদেশে এসে নাম নেন সাবিত্রী-বাই, নিজেকে বলতেন “married to India”। সুইটসরল্যাণ্ডে জন্মে জার্মান, ফরাসি আর ইতালিয়ান ছিল তাঁর মাতৃভাষাগুলি, এদেশে শেখেন সংস্কৃত, মারাঠি এবং হিন্দী (ইংরেজি আগেই জানা)। অবিশ্বাস্য ধীশক্তি বলে সেনাবাহিনীর মধ্যে কল্যাণ কর্মে লিপ্ত থাকার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার নাম (“Unames”) নিয়ে একটি অভিধান রচনা করেন, মহারাজার সাধুসন্তদের নিয়ে গ্রন্থ লেখেন, মহাভারত নিয়ে গোটা বই প্রকাশ করেন, দু’খণ্ডে আত্মজীবনীও লেখেন। স্বামীর (যিনি ‘জেনারেল’ পদে আসীন ছিলেন) মৃত্যুর পর সরকারের অনুরোধে এই বিদেশিনী আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক সম্মান ‘পরমবীরচক্র’-এর স্বর্ণপদক পরিকল্পনা করেন, যার একদিকে দশাচির চক্র, অন্যদিকে শিবাজীর ‘ভবানী’ তলোয়ার। (হসসংক্রমে, এই পরমবীরচক্রের প্রথম প্রাপক হলেন তাঁরই জামাতা সোনি শর্মা মরণোত্তর সম্মানরূপে। ১৯৯০ সালের নভেম্বরে এসেছেই এই মহীয়সীর জীবনাবসান ঘটে।)

এটা জানতে পেরে আমার মনে এসেছিল আর এক মহীয়সীর কথা যিনি বাংলার লেখকশিরোমণি অন্নদাচরণ রায়-এর সহধর্মিণী লীলা রায় এবং সেজন্য নয়, নিম্নলিখিত সমাদৃত ও সর্বজনপ্রিয়। “নকসই পেরিরে” (১৯৯৬) গ্রন্থে অন্নদাবাবু লিখছেন : “ভারতীয়কে বিয়ে করার ফলে তাঁকে হারাতে হল আমেরিকান ন্যাশনালিটি, পিতামাতার সম্পত্তি, নিজের মনোনীত পিয়ানো বাদনের জীবিকা। বিবাহের সময়ই পাগলটি (অর্থাৎ অন্নদাবাবু) পাগলিকে বলে রেখেছিল যে সে একদিন সাহিত্যের জন্য চাকরি ছাড়বে।” (পৃঃ ১২) শুধু এই নয়—অন্নদাবাবু নিজেই

জানিয়েছেন যে তিনি বিবাহের পূর্বে ‘শর্ত’ করেছিলেন যে স্ত্রীকে বাংলা শিখতে হবে, ‘গেরহালি’ করতে হবে, একেবারে বাঙালি কেতায় ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি—প্রায় যে ‘male chauvinist’ চেষ্টা! মা-বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চুকে যায়, বাবা মুখদর্শন করতে চাননি আমৃত্যু, মা অতটা কঠোর না হলেও অনেক পরে একবার যখন মেয়ে দেশে যেতে পারে আর মার কাছে যায় তখন মা এমনই অসুস্থ যে চিনতেই পারেননি সন্তানকে। কী অসাধারণ, প্রায় অসাধ্য কৃষ্ণসাধন করেন এই মহীয়সী, সর্ব অর্থে স্বামীর সহধর্মিণী হয়ে আদর্শ জীবনযাপন করে গেছেন, উপরন্তু বাংলায় গদ্যপদ্য রচনায় কীর্তি রেখে গেছেন, দুই ভাষায় সার্থক অনুবাদকর্ম করেছেন, স্বামীর পাশে থেকে শুধু সংসারধর্ম প্রতিপালন নয় বহুবিধ কল্যাণকর্মে থেকে আর ভারতবর্ষীয়দের মুক্তিকামনা ও সর্ববিধ অধিষ্ট সাধনে লিপ্ত থেকেছেন।

সাবিত্রী বানোক্তক আর লীলা রায়-এর ক্ষেত্রে অবশ্যই দাম্পত্য প্রেম ছিল মূল অনুপ্রেরক তাদের বিশিষ্ট গৌরবাধিত জীবনে। কিন্তু শুধু কি তাই? সঙ্গে সঙ্গে ছিল নাকি ভারতবর্ষের এক অত্যন্তুত মায়ী, যার জালে উত্তর মহীয়সী জড়িত হয়েছিলেন? প্রয়াত মনসী নীরদচন্দ্র চৌধুরী এ দেশকে ‘Continent of Citce’ বলে থাকুন না কেন, এই দুই মনসিনীর চোখে কেমনভাবে প্রতিভাত হয়েছিল ভারতবর্ষ? এর জবাব সহজে মিলবে না, কিন্তু যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ যেমন আকর্ষণ করেছে লোলুপ পরদেশী আক্রমণকারীকে, তার চেয়ে ঢের বেশি গভীরভাবে টেনেছে একেবারে শ্রেষ্ঠ গুণাধিত অগণিত বিদেশী গুণীকে। এজন্যই বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথ একবার শ্রীমতী হেনস্তাবালা দেবীকে চিঠিতে লেখেন ‘মহাভারতবর্ষ’ বিষয়ে, যার প্রথম ডব্লিউস তিনি সেখান বিজয়ী বিদেশাগত মুসলমান শক্তি পূর্বতন আক্রমণকারীদের তুলনায় বহুগুণে বলধারী শুধু নয়, স্বকীয় অতি-বিশিষ্ট সম্ভার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েও এদেশে এসে এখানকার যেন আকাশে বাতাসে মিশিয়ে থাকা এক সমন্বয়সূত্রের সন্ধান পেয়ে সাড়া দিতে কুণ্ঠিত হল না আর দেখা দিল ‘ইস্পো-মুসলিম’ সংস্কৃতি যার শোভা ও গৌরব অসংখ্য পারস্পরিক বিবেচ্যাত কুর্কম মাঝে মাঝে (এবং এখনও) মান করলেও বিলীন করতে পারেনি। তাই সেখি স্বামীর স্বস্ব থেকে দারানিকোহ থেকে, মহাত্মা কবির থেকে, লালন শাহ থেকে, ওয়ালিউল্লাহ থেকে আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি দুর্ভাগ্য মহাজন নিয়ে হিন্দুপ্রধান এই ভারতবর্ষের এক অপরাপ্ত গৌরবমণ্ডিত মূর্তি। এটারই কি সন্ধান পেয়েছিলেন নিজেদের প্রতিভাওণে লীলা আর সাবিত্রী? এরা কি উপলব্ধি করেছিলেন এমন কিছু যার আভাসও পাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতে নিহত তরুণ ইংরেজ কবি Alan Lewis-এর উক্তিতে : “এদেশে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অনেক কিছু ঘটে বা ক্রুদ্ধ করে; সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক কিছু বা সম্ভব করে; কিন্তু আছে এমন একটা বিশ্বজনীন ক্ষেত্র যেখানে মাথা নত হয়ে আসে।” আজও এই মনুবাদী, মাদ্ধাতাগমী, অসংখ্য ক্ষুদ্রতা ক্রুরতা অমানবিকতার অকুহল এই দেশে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে ইতিহাসসম্ভ্রাত এক মহিমা যে জন্য রম্য রঞ্জার মতো মহাশয় মনসী ভারতের চিন্তাকে অবিনশ্বর (“eternally glorious”) বলে বর্ণনা

করতে পেরেছেন। এদেশবাসী যেন “মহাকালের কাছেও নতিস্বীকার করেনি” (“bidding defiance to Time”)। সংশয় নেই যে অতুষ্টি করে চলেছি, উচ্ছ্বাসের বাহুল্য ঘটিয়ে বসছি। কিন্তু সর্বদাই তো চিন্তার একই প্রশ্নর স্তরে অবস্থান চলে না। তাই জীলা রায় আর সাক্ষিত্রী ঞানোল্কর-এর কথা ভেবে না হয় একটু স্বদেশবন্দনাই করলাম।

সম্প্রতি সমাপ্ত মাধ্যমিক পরীক্ষায় গ্রামের একটি মুসলমান ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করায় স্বভাবতই চাকল্য (সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মতো অনেকের মনে একটা অপ্রত্যাশিত অথচ বহু দিন ঈর্জিত আনন্দ) ঘটেছে। তুলনীয় হল বছর তিনেক আগে একটি বাঙালি মুসলমান তরুণ অর্ধপদ্য হলেও ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হওয়ার পর যে আনন্দ পেরেছিলেন। এদের নাম এখনই মনে পড়ছে না, কিন্তু এরা তো স্বরশীল বটেই। বলাছি এজন্য যে বহু বৎসর ধরে সেখাে আসছি আর যত্নশা বোধ করছি যে স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের মতো অগ্রগামী (এমনকি কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত) অঞ্চলে মুসলমানরা জনসংখ্যার ২৫/২৬ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও এত দূর পশ্চাৎপদ হয়ে থাকতে বাধ্য রয়েছে যে, বছরের পর বছর নানাবিধ প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় তাদের সাক্ষ্য প্রায় নেই। এই রাজ্যের সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোথাওই আজও মুসলমানের স্থান প্রায় নেই। এখনই হাতের কাছে নেই এ বিষয়ের খুঁটিনাটি, কিন্তু বেশ কয়েকবার আমি এ প্রসঙ্গে আমার মনোবেদনা জানাতে চেয়েছি, বছরের পর বছর হিসাব করে দেখেছি যে—দৃষ্টান্তস্বরূপ—শিক্ষাজগতের পরীক্ষায়, চাকুরী ব্যাপারে পরীক্ষায় ও অনুরূপ ক্ষেত্রে সফল মুসলমানের অস্তিত্ব প্রায় নেই। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রুতি পরীক্ষায় যারা সফল তাদের প্রথম একশোজনের মধ্যে মুসলমান খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। এটা ঘটে চলেছে বছরের পর বছর ধরে। আর শুধু মুসলমান কেন, হিন্দুদের মধ্যেও যাদের বলা হয় নিম্নবর্ণ, ‘তপশীলী’ জাতি উপজাতি থেকে উদ্ধৃত যারা, তাদের সংখ্যাও এই ‘সফল’-দের তালিকায় প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। যদি ভনি যে বিদ্যা বা অনুরূপ গুণের পরীক্ষা যেখানে, সেখানে জাতিধর্ম বর্ণ ইত্যাদি নিয়ে ভাবনা আসে কেন? আসে এই জন্য যে, অত্যন্ত স্বাধীন দেশে, বহুকাল ধরে, শুধু তাই নয় যুগযুগান্ত ধরে, যারা রিক্ত লালিত দলিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়ে থেকেছে, তাদের সামনে সমসুযোগের সমাজের চিহ্নমাত্রও কি এতদিনে দেখা যাবে না? থাক্ এ প্রশ্ন; আশা করি আমার বক্তব্যের কর্মবর্ষ ঘটবে না।

দুঃখের সঙ্গেই বলাছি যে, সমাজের মধ্যে এই ক্রুর কর্তার অসাম্য আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকেও কলুষিত করে চলেছে। পাঠকেরা একটু মজা পাবেন আশা করি জেনে যে ‘পরিচয়’-সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্তকে কিছুকাল আগে সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে বহু কবির স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে কোনও মুসলমান বা তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু কবির নাম না দেখে কার্ডটি আমি ‘পরিচয়’ দফতরে পাঠিয়ে দিই। প্রায় বছর দশেক হল বাংলা আকাদেমির বার্ষিক সভায় অনুযোগ জানাই যে তার

দুটি কর্মসমিতিতে প্রায় সত্তর জনের মধ্যে ‘শোভা’ পাচ্ছেন একমাত্র গোলাম কুদ্দুস। এখনও অনুবোধ করি প্রতি বছর রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী ও অনুরূপ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কবি আর গায়কগায়িকাদের দীর্ঘ তালিকায় মুসলমান নাম প্রায় নেই দেখে। অবশ্য কয়েকটি মুসলমান নাম থাকে, বাংলাদেশ থেকে যারা আমন্ত্রিত, তাদের। তবে কি পাকিস্তান আর পরে বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটেছে বলে এটা সম্ভব হল? তবে কি মনেতে হয় যে দেশভাগের মতো অভিশাপ এই পূর্ব ভারতের মুসলমানদের পক্ষে একটা দুর্ঘটনা নয়, সুঘটনা, যাকে ‘শাপে-বর’ বলা চলে? ভাবতেই আতঙ্ক হয়, কিন্তু এটাই কি ঘটনা? তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ছেলেমেয়েরা ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত’ কি করে না, যদিও বাংলাদেশে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচলন একটা বিরাট ব্যাপার? এর জবাব জানি না, কিন্তু যদি তাই হয়, তাহলে আমরা কি নিশ্চিত হয়ে বসে আছি? আমাদের স্বীকনব্যবহার এত বড়ো একটা অসঙ্গতি, এমন একটা কিসাট, অথচ আমাদের টনক কি নড়ে না?

অনেক কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেত কিন্তু থাক। বর্তমানে সবই কেমন বেন বিকৃত হয়ে গেছে। মাঝে কথা উঠল মেয়েদের পার্লারসেন্ট ও বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠর জন্য আইন করা হবে। এ নিয়ে কিছুকাল ‘লক্ষ্যবাম্প’ চলল (বিশেষত সংসদে) কিন্তু ‘কাগজের কাজ’ আজও হল না, লক্ষণও তেমন নেই। ইংরিজিতে একটা কথা আছে : ‘It must be worse before it is better’. জানি না আর কত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেলে তবে একটু আলোর সন্ধান পাব। হয়তো কিছু অবিবেচক বরপের কথা বলে ফেলেছি। কিন্তু আশা করি ভুল বোঝাবুঝি ঘটবে না।

কত্রেক হুন্সা আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখলাম যে হাওড়ায় কত্রেকজ্ঞান বিধান মহাকবি কালিদাস বাঙালি ছিলেন কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করছেন। মনে পড়ে গেল আমার ছেলেবেলার আমার বাবার কাছে প্রায়ই আসতেন পণ্ডিত মশমথনাথ কাব্যতীর্থ আর নানা প্রশ্নের মধ্যে তারবরে জানাতেন যে কালিদাসের কাব্যের ছাঁটনাটি বিচারে প্রতিপন্ন হয় যে তিনি ছিলেন বাঙালি। এটা যে মাত্র একজনের ধারণা সিদ্ধান্ত তা বলা যেত না কারণ তিনি সেকালে এ বিষয়ে অনেক লিখতেন, বক্তৃতা করে বেড়াতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হাওড়ানিবাসী দুর্গাদাস লাহিড়ী যিনি “পৃথিবীর ইতিহাস” বহুবার সংকলন করেছিলেন অনেকের সহায়তা নিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্বেদের সঠিক বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন, সম্ভবত একটি মাসিকপত্র চালাতেন, আর মজা লাগে ভাবতে—নিজেরই কাগজে নামের পিছনে “শূন্যনীয়” শব্দটি অম্লানকনে ছাপাতেন। তিনিও আমার বাবার কাছে প্রায়ই আসতেন আর নানারকম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমাবেশের ব্যবস্থা করতেন। আমাদের প্রত্যেক বাড়িতে বইয়ের ভিড়ে “পৃথিবীর ইতিহাস” ইত্যাদি ছিল, হয়তো সেসব গ্রন্থে খুঁত ছিল অনেক, কিন্তু বাংলার অত বৃহৎ ইতিহাস প্রচেষ্টা পরে চোখে পড়েনি। দুর্গাদাস লাহিড়ী-র বিষয়ে বলীর সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে অনেক কিছু খুঁজে পাবার কথা, কিন্তু সেদিকে কারও নজর গিয়েছে বলে জানি না। পণ্ডিত মশমথনাথ

কাব্যতীর্থ-র “কালিদাস বাঙালি ছিলেন” প্রচারে তিনি ছিলেন প্রধান সহায়ক।

আজকের দিনে এই প্রসঙ্গ কেন তুললাম তা বলছি। যখন পার্লামেন্টে ছিলাম (১৯৫২-৭৭ পাঁচ বছর সেখানে কাটিয়েছি) তখন দেখলাম যে বাংলা থেকে কল্পে অবস্থিত কেরালা রাজ্য দাবি করে যে কবি জয়সেব ছিলেন কেরালীয়, ‘মালয়ালি’! একটু আশ্চর্য হতাম যে এ দাবি বেশ গর্বের সঙ্গেই এ-কে-গোপালনের মতো প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতাও করতেন। যখন তাদের বলেছি যে আমরা জানি জয়সেব বাঙালি, ক্ষেত্রে তঁার জন্মস্থানে মেলায় আসে অজ্ঞপ্ত মানুষ। তখন তারা একটু হতবুদ্ধি হয়ে বলে : ও সব বুঝি না, কিন্তু জয়সেব হলেন কেরালার সন্তান’! এ বিষয়ে উড়িষ্যাও দাবি রয়েছে। সসন্দেহ আমাদের সহকর্মী ছিল ওড়িয়া সাংবাদিক চিত্তামণি পাণিগ্রাহী (প্রথমে কম্যুনিষ্ট, পরে কংগ্রেসে গিয়ে মন্ত্রী আর শেষে ত্রিপুরার রাজ্যপাল, সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন)। তার ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত বই আমি পেয়েছি, জয়সেব যে উৎকলবাসী এটা নিশ্চিতভাবে বোঝানো যোযিত। একলা বাংলা ভাবাতোও জয়সেব বাঙালি কিনা প্রশ্ন নিয়ে কিছু বিদগ্ধ আলোচনা হয়েছিল জানি, কিন্তু এখনও স্থির সিদ্ধান্ত ষটেছে কি? জানি, ইতিহাস বিষয়ে ভারতীয় মনের মজ্জাগত অনীহা—আজও ঠিক জানি না রামমোহন রায়-এর জন্ম ১৭৭২ কিম্বা ১৭৭৪-এ। আর এই সেদিনও রাজাগোপালাচারির মতো সুবিখ্যাত আধুনিক ভারতীয় বলতেন যে তঁার জন্ম তারিখ নিশ্চিতভাবে জানেন না, কারণ তেমন ‘record’ নেই! “সত্য সেলুক্স, কী বিচ্ছিন্ন এই দেশ!”

তবু ভাবি, কেনই বা এ ধরনের প্রসঙ্গ তুলছি। আমরা বাঙালি হই বা মালয়ালি হই। একটা জায়গায় আমরা ভারতবর্ষীয়। জানি বাংলার “নবজাগরণ” ইত্যাদি ফ্রান্সিয়ারা তোলেন তারা কিন্তু হবেন এটা শুনে। আমার বিবেচনায় কিন্তু বাঙালিত্ব ও ভারতীয়ত্ব মিশে রয়েছে না বুকলে আমাদের সমস্ত সম্ভাবনা পাব না—যে ভারতবর্ষ হল একটু আগে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের “মহাভারতবর্ষ”। এরই কারণে কি বিদেশে একবার আমাদের যখন হঠাৎ, বিনা ‘নোটিশে’ আর ভাব্যার সময় না দিয়ে বাংলা কবিতার কয়েকটা সর্বশ্রেষ্ঠ পংক্তি শোনাতে বলা হয় আর হতচাকিত অবস্থায় আমি আওড়াই বিদ্যাপতি থেকে : “জনম অবধি হন্ রূপ নেহারনু...”。 কলকাতার মৈথিলীদের সভায় বিদ্যাপতি বিষয়ে ভাষণ দিতে হয়েছে আর দেখেছি বিদ্যাপতিকের নিয়ে তাদের কত গৌরব। কলকাতা শহরে বিদ্যাপতির নামে একটি ‘বিষ্ণু’ আছে, একটু গৌণ অঞ্চলে হলেও এটা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু আমার কি এজিয়ার ছিল বিদ্যাপতিকের বাংলা ভাবার এক মহাকবি ধরে নিয়ে বিদেশী বন্ধুদের কাছে মুখ রক্ষা করার? ‘পরিচয়’-এর বিচারে সাজা পাব কি না জানি না, কিন্তু আমি ‘ভানুসিংহ’-এর দেশবাসী, বিদ্যাপতিকের আপন না মনে করে পারি না।

আজ ষাট বছরেরও বেশি কাল ধরে আমার একটা ‘দূর্নাম’ বে অধুনা তিরোহিত সোভিয়েট দেশ বিষয়ে আমার অতিরিক্ত ‘দুর্বলতা’। হয়তো তাই, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। বরং পুরোনো কাগজপত্রের মধ্যে স্টালিন সম্পর্কে একটা কথা

চোখে পড়ায় ভাবলাম ‘পরিচয়’-কে জানাই। সচরাচর একটা ধারণা আছে যে, স্টালিন তেমন সুবক্তা ছিলেন না আর ব্রিটেনের চর্চিল তো ছিলেন বক্তা হিসাবে জগজ্জয়ী। তবু সেধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে স্টালিন অল্প কয়েকটি কথাই সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন, যার সাক্ষ্য মেলে চর্চিলের লেখা “Triumph and Tragedy” গ্রন্থে তার আশ্চর্য্যকার মতো। ব্রিটেন আর আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি নিয়ে সোভিয়েট ছিলারী অক্রমশঃ বন্ধন পরাজিত করে (এই বিজয়ের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ কৃতিত্ব ছিল সোভিয়েটের, যদিও বর্তমানে সেদিনের ইতিহাস থেকে সোভিয়েটের কীর্তিকথা মুছে দেবার দুর্বৃত্ত চক্রান্ত পশ্চিমী বিশ্বাসেরা করছেন!) তখন ব্রিটেন-আমেরিকার ‘দ্বিতীয় ফ্রন্ট’ খোলা নিয়ে বর্ষদিন ধরে ‘গড়িমসি’ আর অন্যান্য অসহযোগিতায় তিস্তবিরক্ত হয়েও স্টালিন সবাইকে আশ্চর্য্য করে কয়েকটি কথা শোনান। এটা ঘটে Yalta-তে, যেখানে (সোভিয়েট ক্রাইমিরাতে) রুজভেল্ট আর চর্চিলের সঙ্গে স্টালিনের আলোচনা হয় (মার্চ ১৯৪৫)। সাহেবী কেতায় নৈশভোজের পর পরস্পরের মঙ্গলকামনা করে ঈষৎ মদ্যপান কালে যে বক্তৃতা করার রেওয়াজ সেই অনুযায়ী স্টালিন বলেন : “I want to drink to our alliance...In an alliance the allies should not deceive one another. Perhaps it is nai’ve? Experienced diplomats might say : ‘Why should I not deceive my ally?’ But I as a naive man, think it best not to deceive my ally even if he is a fool. Possibly our alliance is so firm just because we do not deceive each other, or is it because it is not so easy to deceive each other? I propose a toast to the firmness of our three-power alliance. May it be strong and stable? May we be as frank as possible!” (“আমাদের মিত্রশক্তির মঙ্গলকামনার প্রস্তাব করি সবাই একটু মদ্যপান করি...যে কোনো মৈত্রীতে মিথেরা যেন পরস্পরকে প্রবঞ্চনা না করে। হয়তো নির্বোধের মতো বলছি? অভিজ্ঞ কূটনীতি বিশারদেরা বলতে পারেন : ‘আমার মিত্রকে বোকা দেব না কেন?’ তবু একজন বোকা মানুষ হিসাবেই আমি মনে করি যে আমার মিত্র বোকা হলেও তাকে না ঠকানোই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। সম্ভবত আমাদের মৈত্রী এমনই সুদৃঢ় যে আমরা প্রবঞ্চনা করি না। অথবা এটা কি এই দৃঢ়তার কারণ যে আমাদের মধ্যে পরস্পরকে ঠকানো তেমন সহজ কর্ম নয়? যাই হোক, আমি চাইছি আমাদের ত্রিশক্তির মৈত্রীবন্ধনকে সুদৃঢ় করার সংকল্প নিয়ে এখন পানপায়ে চুমুক দিই। আমরা পরস্পর যেন বথাসম্মত স্পষ্টবাদী হই।”

মিষ্টি কথার আবরণে এমন কড়া কথা স্টালিনকে হয়তো বলতে হয়েছিল নিজেরই স্বভাববশে আর বাস্তবসুলভ বাগাড়ম্বরে অভ্যস্ত বলে চর্চিল ঠিক এর আগে অনুদ্রুপ “toast” প্রস্তাব করেছিলেন স্টালিনের নাম করে—“most precious to the hopes and hearts of us” (“আমাদের সকলের প্রত্যাশা আর হৃদয়ের কাছে সবচেয়ে মহাবর্ধ”) বলে স্টালিনের প্রশংসা করেন, তাৎক্ষণিক মতলব হাঁসিল করতে চেয়ে, যিনি, অর্থাৎ চর্চিল, ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের আরম্ভ থেকে দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধকালেও (এবং পরবর্তী সময়েও) শুধু স্টালিন কেন গোটা সোভিয়েট দেশকে সবংশে নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা থেকে কখনও সরে আসেননি, 'ভাঁওতা'-বাজিতে যার প্রায় তুলনা নেই। কতকটা অনুরূপ ছিল ১৯৩৪ সালে H. G. Wells-এর সঙ্গে স্টালিনের কথোপকথন, যেখানে স্টালিনকে তাচ্ছিল্য করতে গিয়ে, বিদ্যাগর্ভী প্রতিভাধর Wells সাহেব বৈদ্যের ধার ধারে না এমন এক জর্জিয়ান (অর্থাৎ এশিয়াবাসী) বিপ্লবীর কাছে তর্কে একেবারে 'জব' হয়েছিলেন। সেই সময়ে এ নিরে Bernard Shaw যে কৌতুক করেছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আজীবন অবিরাম নিরবচ্ছিন্নভাবে একাত্ম দুরূহ কঠোর আর কষ্টবিশিষ্ট বিরোধিতায় প্রায় অসম্ভব ও অসাধ্য বিপ্লবশ্রমাসে শিশু থেকেছিলেন স্টালিন—একা অকণা নয়, বিপ্লবকর্ম একক ব্যাপার নয়, কিন্তু এই নিয়ত বিতর্কিত অথচ অবিচল মানুষটির একাকিত্ব ভুলে যাবার নয়। রাষ্ট্রশাস থেকে সাম্যবাদের মুক্তি মানুষ ঘটাতে পারবে কিনা তা নির্ভর করছে মানুষেরই সংকল্প ও সার্থক সংগ্রাম সম্ভাবনার উপর। ইতিমধ্যে শেনিন-স্টালিন এবং সোভিয়েট বিপ্লবের প্রকৃতি ও পরম্পরাকে সমূলে বিকৃত ও ক্রমশ মানুষের স্মৃতি থেকেও বিদূরিত করার যে 'গণতান্ত্রিক' অভিযান চলেছে তাকে পরাস্ত করার লক্ষ্য তেমন দেখছি না। আগে একবার বলছি কি : "It must be worse before it is better"?

সেই বছর হল ঢাকায় হঠাৎ (আর আমার চোখে অকালে) চলে গেলেন দুই বাংলার এক অদ্বিতীয় মনীষী, চর্যাপদ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'জরীপ' যিনি করেছেন, সেই 'আচার্য' আহমদ শরীফ, যার সঙ্গে না দেখে আমার প্রথম পরিচয় আর মাত্র বার তিনেক কিছু সময় প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও গভীর সখ্য, বার মৃত্যুর পর কলকাতায় বাংলা আকাদেমিতে একটি স্মরণ সভা ছাড়া তাঁর মতো তেজস্বী, অকুতোভয় (বিশেষত বাংলাদেশের পরিবেশে), মুক্তমতি বিদ্বানকে নিরে তেমন আলোচনা দেখলাম না। বিপুল পাণ্ডিত্য আর 'মাটিলাগ' (তঁারই উদ্ভাসিত শব্দ) মানবিকতা নিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনার মামুলি ধারার 'শোল নলচে' বদলে দেবার দুঃসাহসে কুণ্ঠিত তিনি হননি। সমগ্র রচনা ও ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে এক মুক্ত মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা, গদ্যরীতিতে স্বকীয়তা, অনুপ্রাস বাস্তবের মধ্য দিয়ে একটা সুর সৃষ্টি করার ক্ষমতা আর সবকিছুর মধ্য দিয়ে প্রকাশমান এক চারিত্র্য বাকে বহিমান বলতে সংকোচ করি না। আমার আশা, কাঁঠালপাড়ার সম্প্রতি স্থাপিত বঙ্কিম গবেষণা কেন্দ্র (যেখান থেকে 'বঙ্গদর্শন' নবরূপে প্রকাশ হয়েছে) থেকে আহমদ শরীফ-এর বঙ্কিমচন্দ্র-বিবরণ রচনা একত্র সংগৃহীত এবং আলোচিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকে অগাধ প্রশ্রয় মাধ্যম রেখেও যে প্রবর গভীর সমালোচনা সম্ভব ও সমীচীন, তা আহমদ শরীফের স্বাদু সরস স্তোভ লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠে আনন্দ দেয়। তাঁর জীবনদর্শন, বাকে বিশ্ববীক্ষা বলা যায়, টেনেছিল মার্ক্সবাদের দিকে, যদিও দলগত ছাপ তিনি পছন্দ করতে পারেননি। তিনি চাইতেন বিদ্যার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত জ্ঞান, সূচু সমাজচেতনা। যে সমাজব্যবস্থা দুনিয়া

ছুড়ে অসংখ্য মানুষকে চেপে রাখে, তবে খায়, তার অন্তরের মহিমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে করে ফেলে, সেই ব্যবস্থাকে জনশক্তি বলে উৎখাটিত করে নতুন শোষণমুক্ত জীবনের আবাহন আমৃত্যু তিনি করে গেছেন। এমন মানুষকে পশ্চিমবঙ্গ যেন চিনল-ই না, আর বাংলাদেশও বহু অনুরাগী থাকা সত্ত্বেও সেখানকার কর্তৃত্বভোগীরা তাঁকে কখনোই সুনজরে দেখেনি। ‘পরিচয়’ একে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করলে সুখী হব।

সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আহমদ শরীফের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করছি তাঁর ‘প্রত্যয় ও প্রত্যাশা’ বই থেকে : “বৃগসৃষ্ট বঙ্কিম যুগোত্তর প্রতিভা নিয়ে বৃগপ্রপ্তা হবার গৌরব থেকে বেচ্যায় ও সানন্দে নিজেকে বঞ্চিত রাখলেন। হিন্দুকণ্ঠ্য স্ববি হবার লোভে তিনি বেচ্যায় বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিনিধিত্বের আসন ত্যাগ করলেন। বঙ্কিম-ইকবাল এভাবে আমাদের বঞ্চিত ও নিজেদের বঞ্চনা করেছেন।” কথাগুলি বিতর্কের প্রচুর অবকাশ ঘটাবে, কিন্তু এর গভীর ব্যঙ্গনা যে অনুশীলন দাবি করে, তা বঙ্কিম গবেষণা কেন্দ্রে হতে পারে।

ঢাকা থেকে ১৯৭৯-এ প্রকাশিত “প্রত্যয় ও প্রত্যাশা” গ্রন্থে রয়েছে বহু চিন্তানীল সুখপাঠ্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ। তারই শেষ দিকে বর্তমান “জটা-জটিল” পরিস্থিতিতে বলেছেন “আজকের গণমানবের জীবনের দুর্যোগ-মূর্তোগ-দুর্দিন ঘূচাবার জন্যই কলিত (applied) সাহিত্যের বড়ো প্রয়োজন”। “শোবিত, পীড়িত, নিঃস্ব, নিরক্ষর ও নিঃসহায় গণমানবের দুঃখ-দুর্দশা-নৈরাশ্যের এবং আশার, প্রত্যাশার ও আশ্বাসের কথা তাদের দুঃখ-দুর্দশা-মূর্তোগ মোচন লক্ষ্যে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করা, রঙে-তুলিতে চিত্রিত করা, নাচে ফুটিয়ে তোলা, গানে ধ্বনিত করা, বাজানায় অভিব্যক্তি দেওয়া— আজ তাই লিখিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে সবারই পবিত্র মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এমন মানুষ এ সমাজে আরও বহুকাল কচিৎ মিলবে তবু এ-প্রত্যয় ও প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকব।”

বঙ্কিমচন্দ্র একবার বহু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন : “বাজালিসের মধ্যে ‘মানুষ’ বলতে তো মেরোই।” ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন : “তোমরা মনে করো পতিবিরোগ হইলোই স্বীজাতির শরীর পাবাশময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, বজ্রা আর বজ্রা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্ভয় রিপুবর্গ একটানে নির্মূল হইয়া যায়। যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই ধর্ম নাই সদসদ্ বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সেদেশে অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।” অন্য স্তরের ও অন্য ধাতুতে গড়া ঈশ্বরচন্দ্র শুণ্ডের মুখে শুনি : “আর কবে ভাই মানুষ হবে? সেখো তোর আকার একার আচার-বিচার / মানুষ কবে, মানুষ কবে?”

“পরিচয়”—এর বয়স হল সত্তর। তার মধ্যে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর এর সামীপ্যে থেকেছি। এবার “পেয়েছি ছুটি / বিদায় দেহ ভাই / সবারে আমি প্রশাম করে যাই।”

বান্ধালী কোন্ পথে?

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

পাঁচশি বৎসর পূর্বে যে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে কলিকাতা শহরে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন সেই বঙ্গদেশ এবং সেই কলিকাতা যেন এখন আর দেখি না। আমার বয়সের মানুষের কাছে অতীত বড় সুন্দর এবং বর্তমান পীড়াদায়ক। কিন্তু আমার ঠিক সেই ভাব হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। আমি বলি না যে সেকালের সকল বান্ধালী ছিল বৃষ্টিটির আর একালে বান্ধালী মাঝেই দুর্বোধ্যন। সেকালেও আমি দুর্বোধ্যন-স্বভাব বান্ধালী একটিও দেখি নাই এমন কথা বলিতে পারি না। তবে প্রশ্ন এই যে একালের বান্ধালী কোন দিক হইতে সেকালের বান্ধালী হইতে পৃথক বা অপকৃষ্ট। এই প্রশ্নের উত্তরে বলি একালের বান্ধালীর হৃদয় শুকাইয়া গিয়াছে। একালে হৃদয়বান বান্ধালী দেখি না এমন কথা বলিতে পারি না, তবে মোটের উপর বলিতে পারি বান্ধালী আজ বড় হৃদয়হীন হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এই হৃদয়হীনতা আমি কোথায় দেখিতেছি, এই হৃদয়হীনতার প্রমাণের অভাব নাই। আমার হিসাবে ইহার প্রথম প্রমাণ এই যে আজ বান্ধালী বান্ধালীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই হত্যার সংবাদ নিত্য কাগজে পড়ি এবং ইহার ছবি নিত্য দূরদর্শনে দেখি। আমার মনে হয় এই হত্যার পরিমাণ লক্ষ্য করিয়াই শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় তাঁহার একটি জনপ্রিয় ছড়া লিখিয়াছিলেন :

মারতে মারতে মরতে মরতে

থাকবে না কেউ বর্তে,

মর্তের লোক স্বর্গ পেলে

স্বর্গ নামবে মর্তে।

সেকালে বান্ধালী ইংরাজ শাসক দলের কোন কোন বিশিষ্ট ইংরাজকে হত্যা করিত। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা আদর্শে বিশ্বাসী হইরাও আমি ইহাদের দেশকর্মী বলিয়া প্রশংসা করিতাম, এবং ইহাদের ফাঁসির সংবাদ শুনিয়া অশ্রুজলে ভাসিতাম। এখন দেশে ইংরাজ শাসক নাই। এখন বান্ধালী বান্ধালীকেই হত্যা করে। কিন্তু ওই হত্যার জন্যেই আমি বান্ধালীকে হৃদয়হীন বলি না। আজ বান্ধালী আচার আচরণে, তাহার সকল কর্মে হৃদয়হীন,। কোমল স্বভাব, মৃদুভাষী বিনয়ী, সুভদ্র মানুষের এই বঙ্গদেশে বড় অভাব। যিনি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্যর্থ জীবন বান্ধালীকে তুলে করেন। যিনি ধনী তিনি আর দরিদ্রের কথা ভাবেন না। ইহার একটি কারণ এই যে এই যুগ Competition-এর যুগ। Bertrand Russell তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে এই Competition-এর ভাব সমাজের পক্ষে হানিকর। আমি এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমরা দুই ভাই এক ইকুলে এক ক্লাশেই পড়িতাম।

বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বৎসর আমাদের এক সহপাঠী প্রথম হইতেন। আমরা দুই ভাই প্রতি বৎসর আমাদের পিতাকে ওই সংবাদ দিতাম। তিনি হাসিয়া বলিতেন এবারও তপন প্রথম হইয়াছে, উহাকে একদিন লইয়া আসিস, মিষ্টি খাওয়াইব। তিনি কখনও আমাদের বলেন নাই, 'তোরা কেন প্রথম হইতে পারিস না? তোদের কি বই কিনিয়া দিই না?' এবিষয়ে আমাদের পিতা যে অসাধারণ মানুষ ছিলেন তাহা বলি না। সেকালে কোন পিতামাতাই সন্তানকে বাহাদুর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন না। আমাদের বাড়ীর আগন্তুকদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন আমি বড় হইয়া কি করিব। আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতাম না। একদিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি বড় হইয়া কি করিব?' তিনি উত্তর করিলেন, 'সেই বিষয়ে এখন চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।' আমি বখন বলিলাম আমাদের অতিথির মধ্যে কেহ কেহ আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিলেন, 'তুই বলিবি আমি আলু-পটল বেচিব।' আমি এই কথাটিকে অদ্ভুত কথা বলিয়া মনে করি নাই। ইহার পর বখন আমাকে কোন আত্মীয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই বড় হইয়া কি করিবি?' আমি উত্তরে বলিলাম, 'আলু-পটল বেচিব।'

এই বিষয়ে আরও একটি গল্প বলিতে পারি, যদিও নিজের কথা এত বলিতে ইচ্ছা হয় না। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Postgraduate ইংরাজি বিভাগে Tutor হিসাবে কর্মজীবন আরম্ভ করি। ১৯৩৮ সালে এই কাজে যোগ দিয়াছিলাম। ১৯৪৫ সালে একদিন পিতাঠাকুরকে গল্পচ্ছলে বলিলাম যে আজ সাত বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইতেছি কিন্তু এখনও প্রশ্নপত্র করিবার সুযোগ পাইলাম না। আমি খুব অভিযোগের সূত্রে এই কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। পিতাঠাকুর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য যে এত অল্প বয়সে এম. এ. পড়াইবার সুযোগ পাইয়াছ। প্রশ্নপত্র করিতে হইলে যে maturity-র প্রয়োজন তোমার এখনও তাহা হয় নাই।'

নিজের সম্বন্ধে লজ্জাসঙ্কোচ না করিয়া দুইটি কাহিনী উপস্থিত করিলাম 'ইহা' বৃহৎ হইতে যে সেকালে আমাদের গ্রীষ্মে একটা ঘোর প্রতিযোগিতার ভাব ছিল না। একালে এই ভাব যেন চরমে উঠিয়াছে। কে কাহার চাইতে এক ইঞ্চি দীর্ঘ তাহা লইয়াই আমরা ব্যস্ত। কে কত মাহিনা পার তাহাও আজ এক কুটিল ঔৎসুক্যের বিষয়। কে কাহাকে ধরিয়া কতদূর উঠিতে পারে এই চিন্তাই এখন একমাত্র চিন্তা। উৎকর্ষের সাধনা বড় সেবি না। পদাধিকার লাভ করিবার ইচ্ছাই এখন প্রবল। শিক্ষক হিসাবে একালের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি কিছু জানিবার বা বুঝিবার চেষ্টা করি। আমি একালে অন্ততপক্ষে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন করে কক্ষন অধ্যাপকের কথা জানি বাহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ হিসাবে গণ্য হইতে পারে। একথাও স্বীকার করি যে ইংরাজি সাহিত্য চর্চায় বাঙ্গালী আজ যে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করিয়াছে তাহা আমাদের কালের কোন ইংরাজির পণ্ডিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তবু বলি বঙ্গদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন বেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সেকালের

ইস্কুলের মত কোন ইস্কুল একালে নাই। আমি যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন আমার এক ইংরাজ অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ক্লেমায় কোন ইস্কুলে ইংরাজি শিখিয়াছি। আমি তখন বলিলাম আমি কলিকাতায় একটি ইংরাজি উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তিনি যেন একটু বিস্মিত হইলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া আমি বলিলাম যে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা Oxford-এ পড়িতে আসে না। আমার ইংরাজির বিদ্যা তাঁহাদের ইংরাজি বিদ্যার সমতুল্য হইতে পারে না। ইহা শুনিয়া আমার সেই অধ্যাপক আমাকে আমাদের ইংরাজি শিক্ষার প্রশালী ও প্রকরণ সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলেন। আমি আমাদের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ইংরাজি পড়াইবার রীতি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিলাম। আমি বলিলাম যে আমাদের হেডমাস্টার মহাশয় আমাদের ইংরাজি গদ্যও মুখস্থ করিতে বলিতেন। ইনি বলিতেন ইংরাজি গদ্য ও পদ্য মুখস্থ করিয়া তাহা আবৃত্তি না করিলে ঐ ভাষা আমাদের রক্তস্রোতে প্রবেশ করিবে না। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে Washington Irving-এর The Widow and Her Son নামক একটি গল্প ছিল। আমাদের হেডমাস্টার মহাশয় সেই গল্পটির প্রত্যেকটি লাইন নানাভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের বুঝাইতেন। তিনি বলিতেন প্রত্যেকটি লাইনের meaning বা অর্থ বুঝিবে এবং তাহার music বা সঙ্গীত উপভোগ করিবে। ঐ গল্পের একটি লাইন ছিল যেটি তিনি বার বার আমাদের পড়িয়া শুনাইতেন। সেই লাইনটি আমার আজও কানে বাজিতেছে। লাইনটি এই : 'There is something in sickness that breaks down the pride of manhood softens the heart and brings it back to the feelings of infancy'. প্রথমে তিনি 'manhood' শব্দটি কেন ব্যবহার করিলেন, তাহা বুঝাইলেন। ইহার পর 'man' শব্দটি সম্বন্ধে প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন। আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন 'man' শব্দের অর্থ কি; এবং আমরা যখন বলিলাম man শব্দের অর্থ মানুষ বিশেষ করিয়া পুরুষ মানুষ, তিনি বলিলেন কখনও কখনও 'man' শব্দ 'woman'-ও বুঝাইতে পারে। উদাহরণ দিয়া বলিলেন 'Man is mortal' এই কথাটির অর্থ মনুষ্যসমাজে পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলেই mortal। তাহার পর man শব্দের নানা ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিলেন, man, manliness, unmanliness এইসব শব্দের অর্থ বুঝাইয়া বলিলেন, man শব্দটি ক্রিয়াপদ হিসাবেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। উদাহরণ দিয়া বলিলেন, This ship is well-manned। এই প্রসঙ্গে unmanned শব্দটিও বুঝাইলেন। বলিলেন I am unmanned কথাটির অর্থ এই যে আমি বড় nervous হইয়া পড়িয়াছি। তাহার পর বলিলেন man শব্দটির অর্থ ভৃত্য অথবা স্বামী। My man বলিতে বুঝায় আমার ভৃত্য, আবার কোন মহিলা তাহার স্বামীকেও My man বলিতে পারেন। এই কথাটি একটু হাসিয়া বলিলেন ঐ একই কথা। অর্থাৎ স্বামীও ভৃত্যের মত। আমরা তখন প্রথম শ্রেণীতে, একালের ভাষায় দশম শ্রেণীতে পড়ি। হেডমাস্টার মহাশয়ের রসিকতাটি ধরিতে পারিয়াছিলাম। ইহার পর 'man' কথাটি বুঝাইলেন। বলিলেন

Wellington's men বলিতে বুঝায় Wellington-এর সৈন্য। কোন workshop-এর কর্মী বা শ্রমিকদেরও 'man' বলা হয়। আমরা ডাক্তার 'man' শব্দের আলোচনা বোধহয় এই শেষ হইল। কিন্তু হেড মাস্টার মহাশয় তখন জিজ্ঞাসা করিলেন man শব্দের Latin adjective কি? আমরা বলিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন 'human' শব্দটি আমরা জানি। কিন্তু উহা যে man শব্দের Latin adjective তাহা আমরা জানি না। তিনি বলিলেন Latin ভাষায় man হইল homo এবং ইংরেজিতে এই homo শব্দ হইতেই human শব্দটি উৎপন্ন। এই human শব্দটির নানা ব্যবহার বুঝাইলেন। humanise, dehumanise humanization, dehumanization প্রভৃতি শব্দের অর্থ বুঝাইলেন, এবং ইহার পর 'humane' শব্দটির অর্থটি বুঝাইলেন। humanity শব্দটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন বহুবচনে humanities শব্দের অর্থ Greek এবং Latin। এবং এই শব্দটির ব্যবহারের উদাহরণ হিসাবে বলিলেন He is a professor of humanities.

আমাদের ইচ্ছা শেষ period ছিল তিনটা কুড়ি হইতে চারটা। হেডমাস্টার মহাশয় এই period-এ পড়াইতেন এবং সাড়ে চারটা পর্বত আমাদের ক্লাশে আটকাইয়া রাখিতেন কিন্তু কোনদিন ক্লাশে আমরা ক্লাস্তবোধ করিতাম না। তিনি একঘণ্টা পড়াইয়া আধঘণ্টা আমাদের পড়া লইতেন। একটি প্রশ্ন করিতেন এবং উহার উত্তর তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে দিতে হইত। কুড়ির মধ্যে কুড়ি না পাইলে শূন্য পাইতাম। হেডমাস্টার মহাশয়ের প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া অন্য প্রসঙ্গে যাইব। ইনি দেখিতে বড় সুন্দর ছিলেন। দীর্ঘ শরীর, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উন্নত ললাট এই মানুষটির মুখখানি কাঁচা-লাকা দাড়িতে আবৃত ছিল। আমরা তাঁহাকে যেমন ভয় করিতাম তেমন ভক্তি করিতাম। একদিন পড়া শেষ হইলে ব্যুটি আসিল। তিনি ঐ ব্যুটির মধ্যে আমাদের বাহিরে বাইতে বারশ করিয়া বলিলেন, 'একটি গান শোন'। ইনি ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্ম সঙ্গীত এমন সুন্দর গাইতেন তাহা আমরা কেহ জানিতাম না। সুসঙ্গীত কণ্ঠে 'যদি হে আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু' এই গানটি গাইলেন। আমরা এই গানের ভক্তিরস যে আশ্বাস করিতে পারিয়াছি এমন কথা বলিতে পারি না। তবু কেন যেন গানটি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিল। লক্ষ্য করিলাম গানটি গাইবার সময় হেডমাস্টার মহাশয়ের চোখ দুইটি অর্ধ হইয়া উঠিল।

হেডমাস্টার মহাশয়ের সম্বন্ধে এত কথা লিখিলাম এইজন্য যে ঐ সময় আমাদের জীবনে তাঁহার একটি বিশেষ স্থান ছিল। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি এমন হেডমাস্টার একালে বঙ্গদেশে কমন্সন আছেন? আমাদের হেডমাস্টার মহাশয়ের পড়াইবার রীতি সম্বন্ধে যখন আমার ইংরাজ অধ্যাপককে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলাম তখন তিনি আমাকে বলিলেন, 'Such headmasters are rare in England today.' আমি ইংরাজি ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছি এমন কথা বলিব না। কিন্তু এই ভাষা যতটুকু শিখিয়াছি তাহা হেডমাস্টার মহাশয়ের কাছেই শিখিয়াছি। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তো ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি, ইহার কিয়দংশ বোধহয়

বুঝিয়াছিও, কিন্তু ইংরাজি ভাষার গঠন সম্বন্ধে কোন নতুন কথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে ইংরাজি ভাষা সম্বন্ধে আমি ইচ্ছুক কি শিখিয়াছি, তাহা হইলে বলিব যে হেডমাষ্টার মহাশয় আমাদের বুঝাইয়াছেন যে একটি ইংরাজি বাক্যের মধ্যে meaning-এর সঙ্গে music মিশিয়া থাকে। সুন্দর ভাষা যেমন অর্থপূর্ণ তেমন সঙ্গীতময়।

সেকালের বাঙ্গালী জীবনে, বাঙ্গালীর আচরণে যে একটা মাধুর্য ছিল তাহা যেন আজ আর বড় দেখি না। সঙ্কলের কথাই কানে মধু বর্ষণ করিত এমন কথা বলি না। আর একালেও যে কোন কোন বাঙ্গালী চরিত্রে মাধুর্যের অভাব নাই তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু মোটের উপরে এই কলিকতা শহরে সাধারণ মানুষের আচার-আচরণে একটা কর্কশতা লক্ষ্য করি। আমরা সকলেই যেন নিজেকে লইয়া এত ব্যস্ত যে অপরের মনের কথা ভাবি না। আমার মনে হয় এই জন্যই বঙ্গদেশে কলহ, বাকবিতণ্ডার মাত্রা বাড়িতেছে। বিশেষ করিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ দেখিতে পাই যে আমরা যত চিংড়ার করি তত চিন্তা করি না। এখানে সেকালের বঙ্গদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে পারি। সে যুগ ছিল চিন্তাশ্রম, সূত্রোদ্ভাষণ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শরচ্চন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসুর যুগ। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক জীবনে কোন বিরোধ ছিল না এমন কথা বলিতে পারি না। আমরা জানিতাম যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং সুভাষচন্দ্রের মধ্যে জোর মতবিরোধ ছিল। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী এবং সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শ ছিল ভিন্ন। কিন্তু এই বিরোধ কখনও কোন হিংসাত্মক ঘটনার সৃষ্টি করে নাই। আমি দুইজনের বক্তৃতাই শুনিয়াছি। কাহারও মুখে প্রতিপক্ষের নিন্দা শুনি নাই। বিপিনচন্দ্র পালকে আমি তাঁহার শেষ বয়সে দেখিয়াছি, তাঁহার বক্তৃতাও শুনিয়াছি। তিনি একজন যথার্থ মনীষী ছিলেন। একালের রাজনীতিতে আমি মণীষার অভাব লক্ষ্য করি। কোন জননায়কের কথা শুনিয়া মনে হয় না যে তাঁহার দেশ সম্বন্ধে কোন গভীর উপলব্ধি বা নিবিড় অনুভূতি আছে। সকলেই যেন নিজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লইয়াই ব্যস্ত। দেশকর্মে আত্মত্যাগের কোন স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের সোশালবোধ আজ এক ধরনের আত্মপরতা হইয়া উঠিয়াছে। এই আত্মপরতার জন্যই পার্টির সংখ্যা বাড়িতেছে, কলহ বিরোধ বাড়িতেছে, আমরা সর্বনাশের পথে চলিতেছি। এই প্রসঙ্গে এক ইংরাজ কবির একটি কথা মনে পড়িতেছে। তিনি গীতার নিষ্কাম আদর্শের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া একখানি নাটক লিখিয়াছেন। সেই নাটকের নায়ক বলিতেছেন:

'To do the right deed for the wrong reason.'

'Ambition comes behind and unobservable

Sin grows with doing 'good.'

'For those who serve the greater cause may make the cause serve them,

Still doing right : and striving with political man

May make that cause political, not by what they do
But by what they are.'

আম্বকে অবশ্য একেবারে বিসর্জন দেওয়া যায় না। কিন্তু সকল কর্ম, সকল চিন্তা, সকল কথা যখন এক আত্মপন্থতার প্রকাশ হইয়া গুঠে তখনই বুদ্ধি অমঙ্গল আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলি করি অপমান। আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরি মরি পলে পলে।'

এই কথা কয়টি আমি আমাদের politicianদের মনে রাখিতে বলি।

আমার মনে হয় সেকালের রাজনীতিতে ক্ষুদ্র আমি ছাড়া দেশকর্মীদের মনে একটি বৃহৎ বস্তু ছিল। সেই বস্তু আমাদের বঙ্গবোধ, ভারতবোধ। সেই বোধের কথা আজ বেন বড় শুনি। বাঙ্গালার এই বঙ্গবোধ স্বদেশী আন্দোলনের সময় গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের সকল কর্মে, সকল মননে এই বঙ্গবোধ তথা ভারতবোধ আমাদের উদ্দীপ্ত করিত। ১৯২১ এর অসহযোগ আন্দোলনের মূলে ছিল এই বঙ্গবোধ ও ভারতবোধ। ১৯৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে আমি কলেজে পড়িতাম। তখন বে কোন রাজনৈতিক সভার দেশাত্মবোধক গান রুত শুনিতাম। কখনও শুনিতাম 'বঙ্গ আমার জননী আমার' আবার কখনও শুনিতাম 'ভারত আমার ভারত আমার'। পরে বুদ্ধিলাস এই বঙ্গবোধ স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্বে বাঙ্গালী জীবনে সেবা দিয়াছিল। বাঙ্গালীর চিন্তে যে বঙ্গবোধ এবং ভারতবোধ এক হইয়া গিয়াছে তাহা ১৮৬৪ কি ১৮৬৫ সালে লিখিত মাইকেলের একটি সনেটে দেখিতে পাই 'জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারত রতনে'। এই লাইনটির ভাব ও ভাষা আমাকে মুগ্ধ করে। আজ জিজ্ঞাসা করি আমরা বঙ্গদেশকে জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টা করিতেছি কিনা। আজ বঙ্গদেশ যে ভারতরত্ন হইয়া উঠিতে পারে সেকথাও আমরা ভাবিতেছি কিনা। এখন আমি যেন কোথাও কোন মহৎ আদর্শের মহৎ উচ্চারণ শুনি না। স্বদেশী আন্দোলনের চার বৎসর পূর্বে কল্পনানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থের নাম ছিল 'বঙ্গমঙ্গল'। একশত বৎসর পূর্বেও দেখি এই বঙ্গীয় কবি আমি আজ যাহা বলিতেছি তাহাই বলিয়াছেন :

সভ্যতলে জনতার করতালি সাথে

আপনার প্রশংসায় স্বর্গ পান হাতে।

কথায় হবে না কিছু—বৃথা আত্মশ্লান।

ধনিয়া তুলিতে হবে প্রাণের স্পন্দন।

তবু বলি আজ হইতে শতবর্ষ পূর্বে বাঙ্গালীর হৃদয় ছিল এবং তাহার মহৎ চিন্তা তাহাকে মহৎ কর্মে প্রেরণা দিত। ইহার বড় প্রমাণ বাঙ্গালীর সার্থক স্বদেশী আন্দোলন। ১৯৮০ সালে ভাবিয়াছিলাম এই আন্দোলনের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আমরা ইহার মাহাত্ম্য একালের বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া দিব। কিন্তু আমি ঐ সময়ে এমন কোন উৎসাহের লক্ষণ দেখি নাই। আজও দেখি সাধারণ বাঙ্গালী সেকালের কথা ভুলিয়া যাইতেছে। সেকালের ভাবমূর্তি একালের বাঙ্গালীর কাছে তেমন স্পষ্ট বলিয়া

মনে করি না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী আত্মবিশ্বস্ত ভ্রাতৃ। কথাটির সত্যতা এখন যেন বুঝিতে পারি। আমাদের আজ কে বুঝাইয়া বলিবে যে আমরা ঠিক এমন ছিলাম না।

আমি বাঙ্গালীর হৃদয়ের কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। ইহার কারণ এই যে আমি মনে করি হৃদয়ই মানুষের সকল গুণের উৎস। হৃদয়বান মানুষ বিবেকবান, বুদ্ধিমান, ও পরহিতব্রতী। বঙ্গমঙ্গল কাব্যগ্রন্থে করুণানিধান জিজ্ঞাসা করিয়াছেন : 'একটা কি প্রাণ নাই এত বড় দেশে?' আজও আমাদের সেই কথা। দেশে প্রাণের সাড়া কৈ? প্রাণময় উদ্যোগ কৈ, সকলকে লইয়া চলিবার ইচ্ছা কৈ? আজ কাহার ডাকে কে সাড়া দিবে, আজ আমাদের কে শিখাইবে এবং কি শিখাইবে, একটি নূতন কথা কে শুনিবে, একটি নূতন ভাবের কে সৃষ্টি করিবে, এক নূতন চেতনা কোথা হইতে আসিবে? সেকালে অতুলপ্রসাদ সেন গাইলেন : 'ভারতে জনম পুনঃ আসিবে সুদিন— এই দেখ প্রভাত উদয়।' সেই প্রভাতের উদয় হইল কৈ?

আমি কোন অর্থেই একজন সমাজতাত্ত্বিক নহি। সমাজের উত্থান-পতন কি নিয়মে হইয়া থাকে তাহা আমি জানি না। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক জার্মান দার্শনিক Oswald Spengler বলিয়াছিলেন পাশ্চাত্যের অধঃপতন ঘটিয়াছে এবং এই কথা বুঝাইয়া দুই খণ্ডের একখানি বই লিখিয়াছিলেন, *The Decline of the West* সমাজতাত্ত্বিক Sorokin এই কথা মানেন নাই। আর আমাদের দেশে বিনয়কুমার সরকার তাহার একটি প্রবন্ধে লিখিলেন : 'If winter comes can spring be far behind.' পৃথিবীর ইতিহাসে দেখি সকল যুগের মানুষই তাহার যুগকে এক আদর্শ যুগ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। যে প্রাচীন গ্রীসকে আমরা বলি ইউরোপীয় সভ্যতার জনক সেই প্রাচীন গ্রীসের মানুষ কিন্তু তাহার বদশের নিন্দা বড় কম করে নাই। অ্যারিস্টোফেনিস তাহার দেশের শ্রেষ্ঠ Politicians-দের দারুণ নিন্দা করিয়া কতগুলি Comedy লিখিলেন। যে Industrial Revolution ইউরোপে এত সম্পদের সৃষ্টি করিল সেই revolution আরম্ভের কিছু পরেই এক ইংরাজ কবি লিখিলেন :

Ill fares the land to hastening ills, a pray where wealth accumulates and men decay.

এই কথাই যেন Kenneth Galbraith তাহার *The Affluent Society* গ্রন্থে বলিয়াছেন, সকল যুগের কথাই যেন এই—অনেক হইল কিন্তু আসলে কিছুই হইল না। কিন্তু এই কথায় আমাদের সাক্ষ্য নাহি। আজ বাঙ্গালীর বড় দুর্দশা, এবং এই দুর্দশা যে এক চরম দুর্দশা তাহার বড় প্রশ্ন এই যে আমাদের মধ্যে এই দুর্দশার বোধ এখনও জন্মে নাই। বাহারা দীনহীন, বাহাদের অন্ন নাই, বাসস্থান নাই; রোগের চিকিৎসা নাই তাহারা মুক এবং বাহাদের অবস্থা ইহা হইতে একটু ভাল তাহাদেরও কিন্তু অস্বস্তির অন্ত নাই। তাহারা জননারকদের ডাকে সভায় সমবেত হইতে পারে, মিছিলে যোগ দিতে পারে, তাহারা আর কিছু করিতে পারে না, আর বাহারা বিভ্রাট

তাহারা এই বিস্তীর্ণ লোকদের চালিত করিয়া রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা করেন। ইহাতে দাঁড়াইল এই যে আমাদের দুর্দশা লইয়া এক Politics-এর সৃষ্টি হইল। সেই Politics আমাদের দুর্দশা দূর করিবে না, Politics-এর আসর জমাইবে। দুর্দশা দূর করিবার পথে Politiciansরা নিজেদের মধ্যে খুনাখুনী করিবে। এই খুনাখুনীতে যথার্থ leadersদের প্রাণ যাইবে না, কিন্তু তাহাদের অনুগামীদের অনেকে প্রাণ হারাইবে। বঙ্গদেশের Politics এখন এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং এই অবস্থার জন্য প্রত্যেকেই প্রত্যেককে দোষী বলিয়া চিহ্নিত করিতেছে। আর আমাদের মতন সাধারণ মানুষ ভাবিতেছে ইহা আমাদের কপালের দোষ।

এখন প্রশ্ন হইল এই আমরা কিভাবে কেন পথে এই অবস্থার অবসান ঘটাইব। রাজনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা অনেক চিন্তা করিয়াছি, অনেক ত্যাগ করিয়াছি এবং সেই চিন্তা ও ত্যাগ সার্থক হইয়াছে। কিন্তু নৈতিক উন্নতির জন্য এখন কি করিতে পারি। এই বিষয়ে একটি কথা স্তব্ধসিদ্ধ। দারিদ্র্য অশিক্ষা, অপুষ্টি ইত্যাদি দূর না হইলে দেশের কোন নৈতিক উন্নতি হইতে পারে না। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই পঙ্কাজ বহরের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে যেখানে চারিত্র্য নাই সেখানে সংবিজ্ঞতা, সংকর্ম নাই সেখানে কোন উন্নতি নাই। এই চারিত্র্য কোথা হইতে আসিবে? বাউল গানে শুনি : ‘কোথার গেলে পাব তারে’। কিন্তু সে তো আধ্যাত্মিক কথা, সেই প্রসঙ্গ করিতেছি না। কোন মহা সত্যের প্রসঙ্গ এখানে অবাস্তব। আমরা মানুষ হইব কিভাবে সেইটাই প্রশ্ন। কবির কথা ছিল ‘আবার তোরা মানুষ হ’। আর এক কবি বলিয়াছিলেন, ‘মানুষ আমরা, নহিত মেঘ’। কিন্তু নিরাশ হইলে চলিবে না। আত্মদ্রাব্যের প্রথম সোপান আত্মপ্রত্যয়। দ্বিতীয় সোপান, আত্মবিশ্লেষণ। আমাদের প্রথম সকলকে ডাকিয়া বলিতে হইবে জ্ঞাপ্তি হিসাবে আমাদের পুনর্জাগরণ সম্ভব এবং সেই জাগরণ আমাদের চেষ্টারই আসিবে। প্রথম প্রয়োজন এই আত্মপ্রত্যয়ের সৃষ্টি করা। আমার বোধ হয় বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যদি আমাদের একটি নূতন বোধের সৃষ্টি হয়, বঙ্গদেশ কেবল নিজেই জাগিবে না সারা ভারতবর্ষকে জাগাইবে, সারা পৃথিবীকে এক নূতন আদর্শের পথে চালাইবে, তাহা হইলেই আমরা এক নূতন উৎসাহ লইয়া নূতন কর্মপথে অগ্রসর হইতে পারিব। আমাদের কত কবি, কত মনীষী আমাদের কত উৎসাহ দিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের কোন কথা আমরা কানে ধরিয়া রাখি নাই, আমাদের হৃদয়ে স্থান দিই নাই। আজ আর কেন সেই গানগুলি শুনি না। মনে হয় আমাদের শিক্ষিত সমাজ আজ মনে করেন এই সব sentimentalism দিয়া কোন কাজ হইবে না। আমরা এখন বড় হইয়াছি, মা মা করিয়া কাঁদিবার সময় পার হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু হৃদয়কে বাদ দিয়া আমরা কিন্তু কোন নূতন চিন্তা বা নূতন কর্মের পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। Bertrand Russell-এর মতন এক বোর rationalist পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে প্রথমে হৃদয়বৃত্তি তাহার পর মস্তিষ্কের চালনা। আমার মনে হয় আমরা কোন নূতন চিন্তা করিতে পারিতেছি না কারণ আমাদের হৃদয় শুকাইয়া যাইতেছে। হাজার বছরের বঙ্গদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে দেখি বাঙ্গালীর হৃদয়ই বাঙ্গালীকে নূতন

চিন্তায়, নূতন কর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু সেই ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। আমরা বিংশ শতাব্দীর কথা জানি ঊনবিংশ শতাব্দীর কথাও জানি, কিন্তু বঙ্গদেশের হাজার বছরের এক অংশও ইতিহাস আজিও লিখিত হয় নাই। ইহা বুঝিরাই বোধহয় বহুমুখের আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই। আমিও সেই ইতিহাস জানি না। তবে বাংলা সাহিত্যের দ্বারা হিসাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে বাংলা ভাষীর, বাংলা দেশের অধিবাসীর ইতিহাস যদিও এক হাজার বছরের বেশী প্রাচীন নহে, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি তিন হাজার বছরের সংস্কৃতি। ইহা বলিবার কারণ এই যে পাল যুগে যখন বঙ্গদেশের মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিল তখন সে দুই হাজার বছর পূর্বের প্রাকৃত-আর্য্য সংস্কৃতির সম্পদ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। ভাবাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার কসু আমাদের এই কথাই নানা যুক্তি ও প্রমাণ দিয়া বুকাইয়াছেন। পাল-সেন যুগের বঙ্গ সংস্কৃতি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির এক বঙ্গীয় রূপ। ইহার পর বলিব বাঙ্গালী সেই সংস্কৃতিকে এক নূতন পথে লইয়া গিয়াছে। পাল-সেন যুগের অর্থাৎ ৭০০ সাল হইতে ১২০০ সাল পর্যন্ত এই পাঁচশত বছর বাঙ্গালী এক উদার নব্যভারতীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করিয়াছে। পাল যুগ ছিল বৌদ্ধ যুগ। কিন্তু পাল যুগের বৌদ্ধ নৃপতিগণ হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা করিতেন। আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বৌদ্ধ গানগুলি পালযুগের সৃষ্টি। এই চর্যাপদগুলি বঙ্গসংস্কৃতিকে এক বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে। চর্যাপদের মন্ত্র একটি পদের উদ্দেশ্য করিতেছি—‘নিয়জিঁ বোহি দূর মা জাহি’, অর্থাৎ তোমার পরম জ্ঞান তোমার কাছেই আছে, দূরে যাইতে হইবে না। এই কথাই আমাদের বাউলের মুখে শুনি—‘ও তোর মনের মধ্যে আছে মানুষ ডাকলে কথা কর’।

ইহার পর সেন যুগে, অর্থাৎ হিন্দু যুগে এক ধরনের হিন্দু-বৌদ্ধ সমন্বয়ের সৃষ্টি হইল। দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষণ সেনের সভাকবি এক পরম বৈষ্ণব হইয়াও তাঁহার গীতগোবিন্দের অন্তর্গত দশাবতার স্তোত্রে লিখিলেন :

নিন্দসি যত বিধেরহহ শ্রুতি জাতং

সদয় হৃদয় দর্শিত পণ্ডিতাতম

কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে

অর্থাৎ হিন্দু বৈষ্ণব কবি বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মানিলেন। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম তখন প্রায় নির্বাসিত। এই বুদ্ধদেবের সদয় হৃদয়ের কথা জয়দেব বলিলেন। অর্থাৎ তিনি বুকাইলেন হৃদয়ের সদয়ভাব এক দিব্যভাব।

ইহার পর পাঠান আমলে বৈষ্ণব ধর্মের সৃষ্টি হইল। বৈষ্ণব পদকর্তা চণ্ডীদাস বলিলেন : ‘তনহ মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’। ইতালীয় ভারততত্ত্বকিন Tucci বলিয়াছেন ইহাই humanism-এর শেষ কথা, এবং এমন কথা ইউরোপের Renaissance-এর কোন কবি বা দার্শনিক এমন স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।

চৈতন্যমুপের বঙ্গসংস্কৃতির কথা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি। অতএব সেই প্রসঙ্গ আর করিলাম না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শান্ত কবি রামপ্রসাদ সেনের একটি মহৎ কথা এখানে উপস্থিত করিতে পারি :

মন রে কুবি কাজে জ্ঞান না

এমন মানব জমিন রইল পতিত

আবাদ করলে ফলতো সোনা

এই কথা কয়টি বেন একালের বাঙ্গালীর কানে এক বিশেষ অর্থ বহন করে। আমাদের মনের গোড়া জমিতে আবাদ করিবার সময় আসিয়াছে। আমার এই কথাগুলি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে আজ বঙ্গসংস্কৃতির একখানি অংশ ইতিহাস রচনা করিবার সময় আসিয়াছে। সেই ইতিহাসখানি আমরা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে দিয়া বলিব ইহা পড়িয়া নিজেকে চিনিয়া লও। কিন্তু সহজ সরল বাংলায় এই ইতিহাস আজ কে লিখিবে? কাহার কলমে বাঙ্গালীর কথা ছবির মত ফুটিয়া উঠিবে। এরকম মল্লীশী আমাদের মধ্যে অবশ্যই কয়েকজন আছে, আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

এখন আমার শেষ কথাটি বলি। আমাদের জাতির এই দুঃসময়ে আমাদের প্রধান কর্তব্য সার্থক জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আমি এখানে ইকুলের শিক্ষার কথাই বলিতেছি। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তুলিতেছি না। মানুষ কৈশবে, কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে যাহা শিখে তাহাই আসল শিক্ষা। এই শিক্ষার মাধ্যম অবশ্যই হইবে আমাদের মাতৃভাষা। আমরা ইংরাজি ইকুলে কতখানি শিখিব সেই কথা এখানে তুলিতেছি না। উচ্চশিক্ষার কথাও এখানে বলিতেছি না। স্বামী বিবেকানন্দ যাহাকে manmaking education বলিয়াছেন, আমি সেই education-এর কথাই বলিতেছি। এই শিক্ষার জন্য আমরা ছাত্র-ছাত্রী পাইব। কিন্তু শিক্ষক কোথায় পাইব? আমাদের দেশের শিক্ষার এখন মূল প্রশ্ন এই—কি শিখিব, কে শিখাইবে। আমি কখনও কখনও একালের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলিবার সুযোগ পাই। শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে বহন কথা হয় তখন ছাত্র-ছাত্রীরা একটি শব্দ ব্যবহার করে আমাদের কালে আমরা কখনও ব্যবহার করিতাম না, কোন একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলে তাঁহারা বলেন এটা Scoring subject না, অর্থাৎ এই বিষয়ে পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়া যাইবে না। নম্বরই দেখিতেছি এখন শিক্ষার প্রধান কথা। পরীক্ষায় কে কত পাইল, কাহার কি স্থান হইল ইহা লইয়া আমরা ব্যস্ত থাকি। পরীক্ষায় যাহারা প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পান তাঁহাদের আমরা সভা করিয়া অভিনন্দন জানাই, বছরের পর বছর আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা এইরূপ প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পাইয়া আসিতেছেন। দেশ কিন্তু তেমন শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা শুনিতে পাই অমুকে Harvard-এর Ph.D. লাভ করিয়াছেন, আর অমুকে D. Phil. লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সারা দেশে এমন মল্লীবার দৈন্য কেন? আমরা শিক্ষিত হইতেছি, উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছি, কিন্তু সমস্ত দেশটা শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে না। আমরা Scientists

এবং technologists অবশ্যই সৃষ্টি করিতেছি, তাহাদের সংখ্যাও বড় কম নয়। কিন্তু তাহাতে দেশ কতখানি অগ্রসর হইতেছে। ব্যক্তির উন্নতি, গৌরব অবশ্যই হইতেছে। কিন্তু সারা দেশ ইহাতে কতখানি লাভবান হইতেছে? আমরা কত Seminar বা Workshop ও প্রবন্ধ পড়িয়া প্রশংসা লাভ করি, কিন্তু সামাজিকজীবনে আমরা যাহা শুনি বা যাহা দেখি তাহাতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছাপ দেখি না, সুন্দর বাংলায় সুন্দর কথা বলে এমন বাসালীর সংখ্যা অসুলিমের। এই কলিকাতার শহরে আমি কলরব শুনি, কথা শুনি না। আমাদের কালে কথা শুনিয়াছি, কলরব বড় শুনি নাই। শান্ত, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল সরস ব্যক্তিদের মানুষ আজ বঙ্গদেশে বিরল হইয়া উঠিতেছে।

শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিতে চাহিতেছি। আমি যদি সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি সে শিক্ষা আমি কেবল ইকুলে লাভ করি নাই, সে শিক্ষা আমি বাড়ীতে লাভ করিয়াছি, পল্লীতে লাভ করিয়াছি, আমার সমাজে লাভ করিয়াছি, ইহা বুঝাইয়া বলিবার স্থান নাই এবং সেই যোগ্যতাও বোধ হয় নাই। আমার কথা এই যে সুশিক্ষার উৎস সমস্ত সমাজ এবং ইকুল এই সমাজের অন্তর্গত। এই সমাজ বোধ আজ আমরা একেবারে হারাইয়াছি। আমরা যখন বড় হই সমাজ তখন বড় হয় না। সমাজ যেমন আমাদের কিছু শিখায় না তেমন আবার আমাদের শিক্ষার ভাগ পায় না। আমরা বড় শও, ছিন্ন, বিক্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। দেশের যে কোথাও কোথাও Secessionist আন্দোলন হইতেছে তাহার কারণ এই যে আমরা একটি মুক্ত, বদ্ধ সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। আমরা যে বাহার পথে চলিতেছি, অর্থাৎ আমরা যথেষ্টাচারী হইয়া উঠিয়াছি। আমি যে শিক্ষার কথা বলিতেছি তাহা এক সুসংবদ্ধ সমাজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা। তাহা হইলে এখন প্রশ্ন হইল এই যে, আমরা আগে সুসংবদ্ধ সমাজের সৃষ্টি করাবি, না আগে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিব? সুশিক্ষা ছাড়া সুসংবদ্ধ হইবার উপায় দেখি না। অতএব আমাদের এখন প্রথম কর্তব্য দেশময় ধনী, মধ্যবিত্ত দরিদ্রের জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই ব্যবস্থা কে করিবে? একালে সকল কর্মের কর্তা সরকার, সমাজের কোন অস্তিত্বই বোধহয় আজ আর নাই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বুঝাইয়াছিলেন সমাজই সমাজের উদ্ধারকর্তা। কিন্তু সমাজ কৈ? আমরা সরকারমুখী, সমাজমুখী মানুষ আমাদের মধ্যে কয়জন? সারা পৃথিবীতে আজ যেন সরকার সমাজকে গ্রাস করিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান কোথায় আমি জানি না। তবে এই কথাও ঠিক সমাজ যদি একমুখী হইয়া কোন মহৎ আদর্শের উচ্চারণ করে সেই উচ্চারণ সরকার শুনিবে। কিন্তু আমাদের সমাজে আজ মহাপ্রাণ মূর্খা কয়জন? যদি একজনও থাকে আমি তাহার কঠোর শুনিবার জন্য বসিয়া থাকিব।

মণীন্দ্র রায়ের শেষ কবিতা

চাবি

একান্ত তোমার জন্যে নির্ধারিত আমি
কত যুগের লাসল কাঁধে যাচ্ছি মাঠের দিকে
যবের থেকে গমের থেকে ধানের থেকে
প্রাগৈতিহাসিক শব্দ তোলে দুই যুবতীর টেকি
পুরোডাস বা পাঁউরুটি বা নবাসের পিঠেপুলি
কবি বলেন এক চাবিতেই সব দরজা খুলি।

এ-অন্ধকার

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকারকে পেছনে ঠেলে এগিয়ে যাব, উপায় তো নেই কোনোমতেই।
অন্ধকারটা জড়িয়ে আছে পায়ের বেড়ি, হাতের হাতকড়াটাও সেই।
চোখের কালি আর নাড়ির ঘোড়দৌড়; রক্তচাপের পারার লাক অন্ধকার
মনের দশলস্বত্ব নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-ফিক্‌ব্যথাটার হলুতুল এক অন্ধকার
ঘরে-বাইরে দিনে-রাতে গজেন্দ্রগমনের পিঠে হাওদা
অন্ধকারের রাজা চলেছেন যম-শিকারে, চলে যত্রতত্র মনের সওদা।
দূরের-কাছের আশপাশের লোক—মনের আনাচকানাচ অন্ধকারের বাসা
হাসিকামা-ভালোবাসার ভেতর-ভেতর ঈর্ষা-কুৎসা-রুগ্ন অহঙ্কার ঠাসা।
পরহিতের লম্বাচৌড়া ব্রতকথা, চোজা ফুঁকে দিনবদলের হৈ-হৈ হাঁক
শুনে মনটা করে যাই-যাই, করে আলো দেখি-দেখি :

কেবল কান আর চোখের মাঝমধ্যে থাকে দু'মুঠ ফারাক।

আর ওই ফাঁকটুকুর ফক্কিকারে বসে আছেন 'সবার-সেরা আমি'

আমি-আমির বাহান্ন নম্বর পীঠে আপ্তগরজী আত্মানন্দস্বামী।

অধ্যাত্মিক-বৈজ্ঞানিক-কবিলেখক-দার্শনিক

চোরপুলিশ আর কেজো লোকের আস্তিনগোটানো হাত

পেয়ে গ্যাছে সকলেই চরম পরম বিষম এক বীজমন্ত্র :

গুরুভাই-সব, চল একসাথ।

চল একসাথ হিন্দু-মুসলিম-জৈন-খ্রিস্টান কানে নিয়ে আমি-তুমির জ্বর জৈব মন্ত্র
পায়ে মাড়াও গীতা-অবেস্তা-বাইবল-কোরান
গুলিয়ে দাও কাকে বলে স্বৈরতন্ত্র-গণতন্ত্র-ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র।

এ-অন্ধকার অনেক কালের আঁটোঁসাঁটো জীর্ণ জ্বালা
গা থেকে খুলব, উপায়টা কই?
আলোর ফিতেয় আকাশ মাপার দরজি পাই কোথায় পছন্দসই—
নিজের মধ্যে নিজে-নিজেই বেড়ে ওঠার রাস্তাটা বৈ।

একা

রাম বসু

ঢেউ

পাড় ভাঙে ক্রমাগত
ওপড়ায় স্মৃতির খুঁটি
পায়ের গভীর দাগ মুছে দিয়ে যায়।

অবুঝ জোনাকি তবু লঠন জ্বালিয়ে ঝোঁজে
যাকে সে কখনো পাবে না।

পাবে না জেনেও ঝোঁজা তার স্বভাব হয়তো
বাধ্যবাধকতা
জীবনের
যার নাড়িতে বন্যতা।

জেগে থাকে সারারাত গাছের গোড়ায়
ঝরে পড়ে নশ্ব ফুল
চেয়ে তাকে তার দিকে।

মেঘের ভেতর থেকে ঝাপসা ফুটে ওঠা
নক্ষত্রের বর্ণমালা পড়বো বলে জেগে থাকি আমি
গাছের গোড়ায়
একা।

জোনাকির জন্যে বজ্র হ হ করে মন।

প্রচ্ছন্ন

চিন্তা ঘোষ

ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের উপলব্ধি
জলে লেগে আছে নদীর গায়ের গন্ধ
দরজার কাছে অযাচিত পদশব্দ
শিলাবতী মুখে আঘাতের গাঢ় চিহ্ন।

দুপুরের ছায়া সকালের রোদ
হওয়ার মধ্যে না-হওয়ার স্রোত
কি দিয়ে কি হবে কে জানে
আকাশের গায়ে তারা ফুটে ওঠে
ভর সন্ধ্যার আঙ্গানে।

জোয়ারের মুখে উচ্ছল নদী
সিমিত ঊঁটার টানে
সন্ধ্যার মেঘ অন্ধকারকে
অস্ত্রে টেনে আনে।

অন্ধকারেও দেখা যায় তারা
ওপরে আকাশ আছে
চূর্ণ নিমেষ পাখি হয়ে যায়
পৃথিবীর গাছে গাছে।

অন্ধকার চূড়া

কৃষ্ণ ধর

আলোর মোড়ক ফুঁড়ে দেখা দেয় অন্ধকার চূড়া
হয়তো অবাক হচ্ছে ভেবে এমন হয় নাকি
স্বপ্নে দেখোনি হয়তো এখন হামেশা হয়
এক ফুঁয়ে জ্বরদস্তি আলো নিভে যায়
ভেসে উঠে অন্ধকার চূড়া

দেখছো না অন্ধরে ছেপে গৃহযুদ্ধ বানায় তাহারা
জলের ভিতরে অস্ত্র ছড়ায় হিংসার বীজ, বিষকমলি

শস্য পোড়ে, মন পোড়ে, জ্বলে ঘরবাড়ি
দ্যাশোনি স্বচক্ষে? তুমি নিশ্চয় মুদ্রণে দেখেছো কিংবা বৈদ্যুতিনে
চারিভিতে অন্ধকার চাপ চাপ, প্যাচার কোটরে
তুকে গেছে গাঢ়তর অমানিশা
অন্ধকার দাপিয়ে বেড়ায় রণপায়ে নদী ও প্রান্তর

চন্দ্রগ্রহণের কথা কাগজে পড়েছো
গ্রামের ভিতরে গ্রাম, মানুষের শিয়রে মানুষ
যেন ভূতগ্রস্ত হয়ে দেশে আকাশে ধ্বিস্ত চাঁদ
মুখ বাঁধা, সেলোটেপে চোখ বন্ধ, অবয়বহীন
একচক্ষু দানবের মতো অন্ধকার সর্বত্র ছড়ায়।

মুঘলপর্বের পর

সিঙ্কেল সেন

মুঘলপর্বের পর এই হতমান দ্বারকার স্মৃতি :
কী জানি অদেখা ছিল,
মনে করো, তাই—
তোমাতে-আমাতে অন্ধযুগে দেখা,—একী!

বা যুগের অনাচারে—
ডুবন্তনগরে তবে বেঁধেছি বাসর।

দৃষ্টিতে কুৎসন ছিল, কৃষ্ণকেশ রৌপ্যে
কপালে বাড়তি কিছু রেখা,
—পরস্বাপহারকও।

পাখির নখের চিহ্ন
সময়ের ডালে,

—জরা কিম্বা ব্যাধ—
 শরবনে মৃগতৃষ্ণিকায়
 কালধর্ম ফেরে—
 শিকারী অন্তত।

দেহে-মনে এতকাল দেখেছি যা,
 বিস্থিত বসুধা—

বিশ্বের রহস্যপটে আচ্ছ তুমি,—সখা, রথী,
 কিন্তু সারথিহীনের—

মুক্তিতৃপ্তের এ-মূৰল নিপাতে
 সে-বিশ্বরূপও সংবরণে আমিও—
 সৃষ্টির ব্যাখ্যার অনুগত।।

২০০০

তরুণ সান্যাল

সে কোন মাটিতে গেলি চাষ দিতে
 ফুল ফুটি-ফুটি হয়তো,
 আশুন শ্রীময় পাপড়ি ঝিমোয়
 মে-জ্বুনে দহনও সয়তো।
 অথবা ছড়ানো শিশিরে গড়ানো
 চুনিমুক্তার গয়না,
 দাহিকা দারুণই, নীহারে বারুণী
 এক ঢোকও গেলা সয় না।

শিশির শিশির যা অমানিশির
 ঘাসে ও পাতায় আর্দ্র
 জীব পেতে রাষি মেদিনীও সাকি
 ধরে থাকে পানপাত্র,
 আর মহাকালে সময় গড়ালে
 ঘোরা অঘোরার চিস্ত

তারারীজে চাব খলখল হাস
হৃদয়তলে নৃত্য।

ও শিশিরও নাকি উড়ু উড়ু পাখি
এ ডালে ও ডালে বসতি
নাকি তা আতপ তৃষ্ণা ধাতব
প্রবাহ সিনানে স্বস্তি,
নাকি কাঁচামাটি কুমোর থালাটি
পুড়িয়ে করলে আছুরা
কেউ বলে নাচ বা মারণ আঁচ
ভাঙরা খিঙরা কাঙরায়।

ওরে ও নিখাদি শুধু চাখাচাখি
এর ঠোঁট ওর ওষ্ঠ
এর গাইগুলি ঘনালে গোখুলি
ওর বাঁড় ছাড়ে গোষ্ঠ,
আর তা ওড়ানো চুমকি পড়ানো
মস্ত আকাশে মস্তি
এঁড়ে বাহুরের মেড়ার সুরের
গজ-কচ্ছপে সোপ্তি।

বিশাল ত্রিকোণ স্বদেশ নিকোনো
হলো কি গোময়ে, তাই কি
ঝাণ্ডা ওড়ানো আশুনে পোড়ানো
স্টেইন বাবা দুটি ভাইকে?
নাকি রাজসভা করে আছে শোভা
বৃদ্ধ বৃদ্ধা ক্ষত্র
আমিষ গন্ধে কিছু কবন্ধ
কিন্তু যত্রতত্র।

আয়রে বিজনে হুড়াই বীহন
শিশিরে নিশিত ইন্দু
যা উৎকৃষ্ট করুক তৃপ্ত
পদ্মপাতার সিঁদ্ধ,
এমনি তো তোর প্রণয় আদর

শোণিতে শাণিত ঘর্ম
বা সিঁধেল চোর হাড়ের আগর
ভাগারই ধর্মকর্মের।

হায়রে মাটিতে শুবে বৃষ্টিতে
বিন্দু শ্যাওলা বর্ণা,
নাকে ও বাছতে নাকি তা আয়ুতে
রসকলি লেখা ধর্না।
অধুনা সে শ্রেম নিকষিত হেম
রঙ্গ বঙ্গ নয়না,
দড়িতে খোঁটায় কি বুলি ফোঁটায়
খাঁচা-খোলা পোষা, ময়না।

কুক্কেশিনী সক্ষেদবেশিনী
অলকে চূর্ণ কুন্দ
তাকে ভাঁঙে গঁড়ে কামছুরে পোড়ে
সুন্দ ও উপসুন্দ।
গরলে তরলে সরল ভরলো
আকর্ষ ঐতিহ্য,
তুই বলেছিস ক্ষমতাও বিব
ঋদ্ধ সিদ্ধ তীর্থক?

ভয়

সময়েক্রে সেনগুপ্ত

আকাশে আজ নানান চ্যানেল, স্ক্রীল অস্ক্রীল
মেঘেরও যথেষ্ট উর্ধ্বে স্যাটেলাইট ছুঁয়ে ছুঁয়ে একই সঙ্গে আসে।
একদিন নীলকে কি অসম্ভব শক্তি মনে হতো—ভাসমান চিল
দেশে মনে হতো সে একাই শূন্যতা নাড়াচ্ছে,
এখন তো জেনে গেছি আর যেখানেই থাকুক—আকাশে
কখনো কোনো শূন্যতা ছিল না, একদিন

পাহাড়কেও দেখেছি নীলিমা নিয়ে উপমা বানাতে, একদিন
 চাঁদের চারপাশে নক্ষত্রের ভীড় দেখে মনে হয়েছে ওরা
 চাঁদেরই দলবল, যদিও নক্ষত্র নাকি চাঁদ থেকে বড়—যারা
 এসব বলেছে তারা কি চ্যানেল জানতো, স্যাটেলাইট, মোবাইল?
 আমি যে কোথায় তাকাবো এখন -
 হে আমার জ্ঞান হয়ে আসা চোখ, সারা পৃথিবী যখন
 আমার ঘরের মধ্যে আচ্ছন্ন মারে, নাচে, গায়, ন্যাংটো হয়
 কোন শব্দে তখন লিখবো এসব শবের অসময়।

এই এখানে নদী ছিল

প্রবচন চট্টোপাধ্যায়

কেউ জানতো না
 এই এখানে নদী ছিল
 হাছতাসের পলি জমা
 অথচ নদীর নামে গল্প ছিল
 সাক্ষী ছিল বটবৃক্ষ
 কন্যার তখন বুকের কুঁড়ির
 থর থর ফুটে ওঠা
 রক্তবর্ণ ফল ঝরে যায়
 বটবৃক্ষের শরীর থেকে
 নদীর বুকোও রক্ত ছিল
 এপার ওপার নৌকাবাইচ
 আলতারঙা পায়ের পাতা
 পাতার বাঁশি
 চাষ আবাদে গোপন কথা
 কাঙাল ছবির অস্ত্রগুলির
 ঘরের নামে নদীর নামে
 এসব নিয়ে গল্প ছিল।

সৌভ্রাত্র আমাদের

শান্তিকুমার ঘোষ

নিষ্কিন্ত হয়েছি আমরা এই নৌকায়
এই নৌকাই দেশ আমাদের
আর সমুদ্র আমাদের আশ্রয়

যদিও অঙ্ককার দিয়ে অঙ্ককার ঢাকা
‘তম আসীৎ তমসা গুঢ়মগ্নে’
তবু কানে আসে তীরতট থেকে
ধীবরের গান
যখন অর্থহারা জয়-পরাভব—
গোটা পাশা-খেলার ছক
একমুখী ছুটছে সময়ের তীর
পাল্টে যাচ্ছে চালচিহ্ন, শুধু সৌভ্রাত্র আমাদের
রয় যে ক্ষয়হীন

অন্তরঙ্গ

বিতোষ আচার্য

বহিরঙ্গে স্থির ছায়া কী অক্লেশে
একদম দোলে না
অন্তরঙ্গ এখনও হাঁ-মুখ :
জল জমে যে বর্ষায় অন্তর্হিত তা অবহেলায়
—পাল্টে যাচ্ছে ছু-প্রকৃতি, চারিত্র্য, মানুষ
সব কিছু

বড়ই সংকেটে কাটে ইদানীং, এত যে ব্যয়েস
দিনাবসানের ঘোর তখনও সরে না
ঘুরি, ঘুপচিগলি-ঠেলাগাড়ি
চোলাই-এর ঠেক পার হয়ে
বেলফুলের গন্ধে গন্ধে মাতাল স্মৃতিতে
সদর দরজায় পৌছে আর পা চলে না :

সারা জীবনের ইষ্ট এভাবে ধুলোয় যাবে মিশে।
 অন্তরঙ্গে আঁধার সেই তুঁত অধর
 গুহুবে গুহুবে শুভতে চায়
 মানব-নিলয়ে জমা যাবতীয় নৈবেদ্য-সুধাণ

বরিহঙ্গে ছায়া তো সুস্থির, শুধু
 অন্তরঙ্গ এখনও হাঁ-মুখ।

কবিতার জন্মবৃত্তান্ত

প্রফুল্লকুমার দত্ত

এক-একটি কবিতার জন্ম দেয় কবি বুক চিরে—
 বুঝে নিয়ে, প্রগ্ন কোরে দেখেছি জনৈকা প্রসূতিরে,
 সন্তান ফুমিষ্ঠ হোতে কী রকম ব্যাপক প্রস্তুতি?
 কতো তীর সে-আনন্দ প্রসবযন্ত্রণা অনুভূতি?
 সে বলেছে ঢেকেটুকে, যতোটুকু মুখে বলা যায়;
 এক-একটি কবিতার জন্মযন্ত্রণার বর্ণনায়
 কবি কিন্তু অপারগ, প্রায়শ্চাত্তী সে কবিতা ধিরে—
 এক-একটি কবিতার জন্ম দেয় কবি বুক চিরে।

কবিতার জন্মদাতা বাস্তব ভাবনা ও অভিজ্ঞতা;
 যে-সবের কোনো নাম বিশ্বকোষে না-থাকারই কথা।
 তথাপি সে-সব নাম কবি কিন্তু প্রকাশ্যে আনে না—
 কবি অর্ধনরীশ্বর কবিতার পিতৃমাতৃ-সেনা
 একাই মিটিয়ে যায়। সমাজে কবিতা সত্যকাম,
 বেশ্যার সন্তান। জন্মসূত্রের জানে না কেউ নাম।
 সমস্ত সৃষ্টির মূলে প্রকরণ—মৌল আদিমতা;
 কবিতার জন্মদাতা বাস্তব ভাবনা ও অভিজ্ঞতা।।

পাথর ভাঙার গান

বাসুদেব দেব

আক্রোশে অন্ধ উত্তেজনার উন্মাদ
 একদল বেপরোয়া মানুষ ইতিহাস লণ্ডভণ্ড করে
 আক্রমণ করছে ভবিষ্যৎ
 এত শেকল তাদের হাতে পায়ে
 ভাঙছে তারা পাথর, পাথরের পর পাথর
 তারা সন্ধান পেয়েছে সেই ঝর্ণার
 তুফান কাঁটার তবু গান গাইছে তারা
 পাথর ভাঙছে, পাথরের পর পাথর
 ভয় হয় তারাও পাথর না হয়ে যায় একদিন
 ঝর্ণায় তাদের ফেলে যাওয়া শেকল
 পথের নুড়ির সঙ্গে বাজতে থাকে সারা সকাল
 আলো ছায়ার সঙ্গে মিশে সেই অফুরান শব্দে ফেরি
 ডাকতে থাকে আমাদের ডাকতে থাকে

সেই ঝর্ণার কাছে গজিয়ে উঠেছে আজ
 সৌখিন পর্যটন কেন্দ্র, চোখে রোদ চশমা
 হাতে ক্যামেরা শীতের রোদে চলছে হৈ হুমোড়

গলায় বকলেস একটি নিরীহ ইতিহাস
 পাথরের আড়ালে থেকে দেখছে এইসব, দেখছে...

মৃত কবির হাড়

রাজিৎ সিংহ

মৃত কবির হাড় পড়ে আছে জ্যোৎস্নার মাঠে।

হাওয়া বয়। শূন্য হাওয়া। সমুদ্রের স্বাদবিহীন, অরণ্যের মর্মরবিহীন,
 জনপদের বার্তাবিহীন—শূন্য হাওয়া বয় নিরন্তর।

এই কি সেই কবি।

ফিরিয়ে দিয়েছিল রাজসভার নিমন্ত্রণ।

এই কি সেই কবি।

আগত রাজদূতকে প্রশস্তি আওড়াতে দেয়নি।

এই কি সেই কবি।

রাজপুরীর মচ্ছবে কবিতা পড়তে যায়নি।

এই কবি রাজার শিরোপা নেয়নি কোনো। রাজনটীর হাত ধরে

এই কবি প্রাসাদের উপবনে ঢোকেনি। রাজনগরীর সম্রাট

নাগরিক তালিকায় ছিল না এই কবির নাম।

সে শিশুদের খেলার সবসময়ের সঙ্গী ছিল। আর্তের হৃদয়ের

কাছকাছি চলে যেত। আর নারীর ভাণ্ডারের দোরে দোরে

অষ্টগ্রহর ভিখারির মতন হাত পেতে বেড়ানো ছিল তার বৃষ্টি।

এইসব ঐশ্ব্যের জোরে সে মাথা উঁচু করে চলে ফিরে বেড়াত।

শুণ্ডচরের কালো খাতার কথা ভাবেনি। সাদা পোশাকের

নজরদারির তোয়াক্কা করেনি। কোটালের পাতা ফাঁদের পরোয়া

না করে চলে এসেছিল এই মাঠে।

মৃত কবির হাড় জ্যোৎস্নায় হীরকখণ্ড হয়ে জ্বলে।

সেতুরক্ষার ভার

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সেতুরক্ষার ভার তোমাকে দিলাম

বলো নেবে কি না

মেঘের কেশর মাথা নাড়ে

মাথা নাড়ে তামস দৃষ্টিহীনা

চামর ছটাছুট মাথা নাড়ে

জ্বলন্ত বিদ্যুতের সাপ

পাথরে বাঁধানো সেতু

পুণ্যপদপাতে ঘোচোনাকো অভিশাপ?

সেতু দিয়েছিলাম কবে

আজ দিচ্ছি রক্ষার ভার

ভালোবাসলে প্রাণ দিতে হয়
 অস্ত্র কোনো দখিচীর হাড়
 কবেই তো ভেসে গেছে চর
 সঙ্গে তার শস্য গোলা খর
 যুদ্ধে রক্ষা পাবো কি পাবো না
 সেতু যদি রক্ষা করো
 রক্ষা পাবে অকৌহিনী সেনা

রশাসনে বড় ধুলোয় ভরেছে মুখ
 দাঁতে শিরশির করে বালি
 রক্তে অগ্নিশিখা দিয়ে ওঠে করতালি
 অস্ত্র ঘাস মাটি ভিজে কাদা
 এরই মধ্যে যুদ্ধ শুধু
 যদি যায় একটি মাল্য গাঁথা
 দুপাশে পাহাড় উঁচু ঘূণা
 বর্ষলে নেমে আসে ধস
 নদী নামে পাথরের ঠোকরে ঠোটে কষ
 এত বৃষ্টিপাতে তুমি
 ছেড়ে যাও যদি যুদ্ধতুমি
 সেতুরক্ষার তবে থাকবে না কেউ
 অগ্নিবৃষ্টি হবে
 ফুঁসে উঠবে মৃত্যুর ঢেউ।

কবিতা কা তরে

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

॥ এক ॥

নিরুপমব সাবানের ফেনার মতো
 প্রতিদিনই একটু আখটু ঘটনা ঘটছে
 তারপর নিস্তরঙ্গ নীলিমায় নিরঞ্জন
 কেউ দেখছে, কেউ দেখছে না
 কেউ ভাবছে না, কেউ ভাবছে

॥দুই॥

যখন সমস্ত দিন ছায়া ফেলে রাত্রির তাণ্ডব
স্তব—স্তব্ধ হয়ে থাকে
রহস্যের বুক চিরে খসে পড়ে নক্ষত্রের শব্দ
শব্দ মুখ ঢাকে;
তখন তোমার প্রতি করজোড়ে অঞ্জলি-প্রতিম
অঙ্কুরে নামে শুধু হিম।

॥তিন॥

তোমার অশ্রুবা আমি মথার জন্মেছি
শীতল নির্ভুর এক পানপাত্র ধরে রাখে ঠোটে
হলাহল পান করে ওগুণাবো অমৃত
তুমি পরভূ, আমি চিরকাল থাকি পরভূত।

॥চার॥

যতটুকু প্রেম চাই তার চেয়ে বেশি চাই খেলা
ছাদের কার্নিশে ঝোলে মলমাস আর বারবেলা।

॥পাঁচ॥

একটি চোখ গাঁথাই ছিল অ-পাঠকের দিকে
একটি চোখ পাঠক খুঁজে মরে
অমচিন্তা তুচ্ছ করে অমরতার লোভে
চমৎকারা ভাবছে বসে কবিতা কা তরে॥

ক্যানভাসের বাহিরে

নন্দদুলাল ভট্টাচার্য

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ নিরন্তর
মনের মধ্যে লড়াই
একটা অস্থির ঘুরী আগুনের হুকায় পাক খাচ্ছে
বনবাদাড় পাহাড় ভাঙছি
মাটি দুর্বাধাস শস্যক্ষেত্ৰখামার নদী সাঁকো
কখনো সমতল চড়াই উৎরাই
হাঁটার ক্রান্তি নেই

কয়েক যোজন ঘুরে এলাম
সামনে ছায়াকারা কার
প্রতিকৃতি আমার
পক্ষপ্রতিপক্ষ একাকার

পটে হাতের আঙ্গুলি থামাও
বর্ষময় তুলি বুলিয়ে না আর
ফ্রেম ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে এসো
ক্যানভাসের বাইরে
একটু দূরে তোমার সৃষ্টির সামনে দাঁড়াও
দ্যাখো ব্যবধানে
ধ্যানে দৃষ্টির প্রতিফলনে
আত্মপ্রতিকৃতি চলমান জীবন

এক দীতালো বুনো শুন্নোরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে
তীক্ষ্ণ তীরের ফলা।।

ফেরার বেলা

শ্যামসুন্দর দে

দিনান্তের রোদ জানলায় এসে বসে
আমি যাই—
শেব হয়েছে আমার কাজ
এবার আকাশ খিরে সমুদ্র আসর
তারায় তারায় নৃত্য-তাল
ভালোবাসার উল্লাসে ঢাকা নীড়ে
ঘরে ফেরার কাকলি
রাতের মেদুর ছায়া
দিগন্তকে জুড়ে।

আমার কাজ ফুল ফোটানো
আমার কাজ জীবনের জঙ্গমতা
তাইত ঘুম ভাঙাই

আলোর পরশ দিয়ে
 সকালের পথ চলার সূচনা।
 সারা দিন ধরে
 কত কথা আর কত না কাহিনী
 আমি লিখে যাই
 ইতিহাসের পাতায়
 অসহ্য যাতনা আনে
 পরস্পর রোদের স্পর্শে
 সে সব সড়ক পার হয়ে
 তবেই আসে বিকেলের কাল।
 এখন বিদায় বেলা
 আসা-যাওয়া অজ্ঞান নিয়মে
 রাতের পরে হবে
 ফিরে দেখা।

আগুন লোফালুফি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সারা রাত রাতটাকা ঢুকছে ট্রাক—লোহালকড়ের
 বাজনা, বিস্ফোরণ—সারা রাত খেপে খেপে।
 অভ্যেসে বেয়েই আজও ভোর নাইব বলে।
 এই নাকি সে ভোর? সরু সুতোর মতন জল পড়ছে কলমুখে।
 বালতি ভরে না। তবু ছড়িয়ে বসে আছে কটা কাগ
 এরই মধ্যে। বালতি ভরে না, তবু পাঁচিলের ওপারে
 এরই মধ্যে আগুন লোফালুফি খেলতে এসেছে লঙ্কারা।
 জিমের মাষ্টারের পেটা দেহটা পাঁচ হাতে ছুঁড়ে দিল
 পাঞ্জাব ট্রাকের পায়ে। বালতি উপচে ওঠে লাল হয়ে।
 বুঝি জ্বাকুসুমসঙ্কাস সূর্য উঠল অবশেষে।
 এই নাকি সূর্য? কাঁধ ধরে ঝাকছে, বাহ চেপে ধরে,
 মনে হয় দু-দুটো ট্রাকের চরকি ঘুরে উঠল হঠাৎ রাস্তায়।
 ঘুরছে, তার ঘূর্ণির ভেতরে ঢুকে যায় যত ভোর, জলধারা।

লোকটাও ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে, যেন ঝড়কাটা কলের
পাঁজ হয়ে ছড়িয়ে যায় চারপাশে উপুরিউপুরি।
ছড়িয়ে বসে আছে এসে কটা কাগ। পাঁচিলের ওপারে
আশুন লোফালুফি খেলছে তখনও লকারা।

একটি কবিতা

জয় গোব্বামী

এসো আমার সীমান্তে, গায়ে গা লাগিয়ে বোসো, এই একই
বেড়ার কাঁটাতার আমার পিঠ তোমার পিঠ ঝুঁড়ে দিয়ে
আটকে রাখুক দু'জনকে—
এই বত রসবিচার বত জলিফুল ভাসান, মারকাঙ্গরি তিল ফুল বত
বত ময়ূরপেশ্বম প্রাণবাতী গানের পর্দা মামনি সাবান
এইবার সেইখানে একটু রামধনু ঢেলে দাও, বাস্ অগ্নি সব মিলে
কতকিছুই তো হতে পারে
এই ভয়ে তোমার নাম বদলে অন্য নাম রাখলাম তুমি আমার
মুণ্ড খুলে নিয়ে অন্য মুণ্ড পরিয়ে রাখলে দেখ ব্যাপারখানা
কি চমৎকার-ই না দেখাচ্ছে এখন
নাই বা বললে এসব কথা নাই বা নাই বা আরে যা বলছি
কোনও না কোনও-ও উঁহ তাই তো না তোমার
মাসীমাকে বোলো না তোমার প্রাণের বন্ধু মিতা বসীকেও নয়
এসব কথা তো জোর গলায় বলা যায় কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করে
বলতে নেই যে অনেক প্রাণপাত করার পর অনেক রক্ত ফেলবার
অনেক মঞ্জুরিত হবার সুযোগ ফক্কানোর পর এই
সুড়ঙ্গ আমরা পেলাম এমন সীমান্ত
এখন যে কেউ এসে পড়তে পারে এখানে আর সময় নষ্ট
কোরো না যা করবার তাড়াতাড়ি করো এবার
পিঠ থেকে পিঠ খুলে নিয়ে উন্টে ঘুরে যাও
মুখোমুখি তুমি আমার পিঠে কাঁটার গর্তে আঁতুল টিপে ধরো আমি তোমার
পিঠে আমার গাল রাখলাম আর আমাদের কিছু করার
থাকলো না আমরা নিজেদের এ ওর দিকে পিষে নেবার মাঝখানে
তারকাটা তারকাটা তারকাটা আমাদের গাঁথলো
যেন জয়ের মালা

আমাদের মুখ উপচে বেরিয়ে এলো গোজনি এক বিশ্ফোরণের চূড়ার
একই সঙ্গে অবিশ্বাস্য প্রাণবায়ু ছুটে গেল আমাদের

আমাদের শরীর থেকে খোঁয়া উঠছে
সীমান্তে সাদা বাষ্পের মতো পূর্বাকাশে
ম্রবমান চাঁদ
কত কত বছরের মৃত লোকালয় আমাদের
দু'পাশে—ভাঙাবাড়ি বালিছমা কুয়ো
পুরনো ইটের পাঁজা অকেছো টিউক্স
মর্চে ধরা নিঃশ্বাস ফেলছে আমাদের
দু'পাশে—
আমরা যে পরস্পরকে শান্তিতে
বধ করতে পারলাম আত্ম
এই আনন্দে
গাছগুলোর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথার ভেতর থেকে
আকাশে ছিটকে উঠলো পানি
রক্ত লাগলো মেঘে
সকাল হলো

হনন আত্মহনন : মেঘের কথা

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

সকালের পর থেকে, দুপুরের কাছাকাছি পৌছেই, মেঘ অমূল্য। এখন আকাশ সততই মলিন রঙে ছাওয়া থাকে, নীল প্রায় দেখাই যায় না, গেলেও এখানে ওখানে টুকরো টুকরো। টুকরোগুলোও বেশিক্ষণ নীল থাকে না। প্রথমে মেঘের ছায়া, তারপর হালকা ব্রেট রঙের পাতলা পর্দার মতো মেঘ তাদের নীলের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে উড়ে উড়ে যায়। যেতে যেতে কোনওটি যায়ও না। থেকে যায়। নীল রঙে অল্প কালচে রঙ লাগে। তারপর আরও একটা ওড়া মেঘ চেপে বসে। তারপর আর একটি। একসময় আর কোনও নীল দেখা যায় না। তাকে বিরে তার দশ দিকে অর্ধে ওঠা কালচে মেঘের মধ্যে বিলীন হয়ে তারই অংশ হয়ে যায়। সেই মেঘ ক্রমশ ঘন হয়। হঠাৎ ঝড়ের মতো বাতাস নৈঃশব্দ কোণ থেকে উঠে এসে সেই ঘন, ক্রমশঃ ও দ্রুত আরও ঘন হয়ে ওঠা মেঘের ঝটলা ভেঙে না দিলে, ভেঙে খণ্ড খণ্ড করে সঙ্গে করে উড়িয়ে না নিয়ে গেলে ব্রেট রঙ কালো হয়ে উঠতে থাকে। সব নীল শেষ হয়ে ক্রমাগত গাঢ় হয় কালো। তখন আকাশের সেই নিক থেকে সেই কালো আকাশটুকু থেকে চোখ ফেরানো যায় না, কেমন ঘোর লাগে, যেন কোনও যাদুতেই। সমগ্র আকাশ থেকে আকাশের এইটুকু সম্পূর্ণ আলাদা। যেন অন্য আকাশ। গাগারিন কিংবা নীল আর্মস্ট্রং যে-আকাশ দেখেছিল মহাশূন্যে গিয়ে, চাঁদে গিয়ে। চাঁদের সে-আকাশ যেন নেমে এসেছে পৃথিবীতে। পৃথিবীর আকাশ ভ্রান হয়ে গেছে তার বিশালতা নিয়ে। কোথাও খণ্ড খণ্ড নীল, তা-ও যায় যায়, কোথাও ছাই ছাই বর্ণহীনতা যাকে গাভীর বলেও চালানো কঠিন। সবটুকু জুড়ে, বিস্তীর্ণ আকাশে শুধু মলিনতা, যেন ভীষণ দরিদ্র, দারিদ্র রেখার একেবারে নীচে। ঘন হুত হুত আরও গাঢ় হয়ে ওঠা কালো আকাশ যেন তার আভিজাত্যে কলমল করে। আভিজাত্যে নয়, রাজকীয় ঐশ্বর্যমায়ার এবং শক্তিতে। কৃকবর্ণ রাজকীয়তা আকাশের মুকুট হয়ে সমগ্র আকাশকে শাসন করে। তাকে বিরে থাকে দীর্ঘ এক রুশোলী রেখা। সে রেখা মাঝে মাঝে কঁপে কঁপে ওঠে, যেন নেচে নেচে ওঠে। চারপাশ লুপ্ত করে সবকিছু ভাসিয়ে দেওয়ার অসীম ক্ষমতা যার মুঠায় সেই রাজকীয় কৃকবর্ণ দ্যুলোকে-দ্যুলোকে শাসন করে বলেই যেন সে দেবতা। দেবতা বলেই তার মাথার পেছনে আলোর বলয়। সে বলয়

দেখা যায় না, ঢাকা থাকে কৃষ্ণবর্ণে, শুধু তার হটা চোখে পড়ে রূপোলী রেখায়।

তানিয়াও অটিকে যায় সে যাদুতে, কালোর ম্যাজিকে। এ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মুখটা দেখতে দেখতে তার দৃষ্টি আনন্দের বাকঝাকে কাঁচ থেকে সরে গিয়ে, যেন ধায় পিছল্লেই সরে যায় জানলার দিকে। জানলার ওপারে তখন সব কিছু কালো হয়ে গেছে। আকাশ, আকাশের নীচে দূরের বড় বড় গাছ, কিছু কিছু ঘরবাড়ি, কাছের সুপুরির সারি, তাদের মাথার ওপর আতঙ্কিত ডানায় উড়ে বেড়ানো দু'চারটে পাখি, পাখিদের খুঁটে খাওয়া ধানখেত, আশেপাশে দু'একটা পুকুর, পিচাচালা পথ, তার গা থেকে বেরোনো মাটি আর মোরামের ছোট ছোট পথ, তারপর আলপথ, সব কালো হয়ে গেছে।

তানিয়া খেয়ালই করেনি বাইরে, তার জানলার পাশেই এত কাণ্ড ঘটে গেছে। এখন সব চোখে পড়ে যাওয়ার পর আর সে চোখ ফেরাতে পারে না, যেন মোহবদ্ধ। ধীরে ধীরে গিয়ে প্রথমে সে আলো নিভিয়ে দেয়। দিতেই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে যায়। আকাশের কালো এক লাফে নেমে আসে ঘরে। ঘর, ঘরের দেওয়াল, দেওয়ালের রঙ, দেওয়ালের ছবি, আলমারি, দরজার কপাট, ক্যালেন্ডার, মূর্তিটুর্তি সব কালো হয়ে যায়। অন্ধকার হয়ে যায়।

ধীরে, যেন অন্ধকারে পা টিপে টিপে তানিয়া জানলার গিয়ে দাঁড়ায়। তার খেয়ালও থাকে না এ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মুখের একটি ভুরু তখনও করা হয়নি।

আকাশভরা কালোর দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, আজ কি তবে আকাশের সবটুকুই কালো হয়ে গেছে? ছায়ে গেলে, ন'তলার উঁচুতে উঠলে হয়তো জানা যায়, খানিকটা জানা যায়। এই কালোর, এই আকাশের সব জানার নয়, সব জানা যায় না। মাথার ওপরে দেখা যায়, ডাইনে বা বাঁয়ে, সামনে বা পেছনেও হয়ত দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও কোথাও, যেখানে দিগন্ত দেখা যায়। কিন্তু তার ওপারে দেখা যায় না। পায়ের নীচে পৃথিবীর আর এক দিকে যে-আকাশ তা-ও দেখা যায় না।

তানিয়ার মনে হয়, ওই কালোর মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে, ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে হয়ত দেখা যায়, হয়ত জানা যায়। হয়ত ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা দেখেছিল। ছোটবেলার পুজোর স্টল থেকে বাবার কিনে দেওয়া তেরেশকোভার জীবনী পড়েছিল তানিয়া। তেরেশকোভাই এ পৃথিবীর প্রথম মেয়ে যে জেনেছিল সমগ্র আকাশ কৃষ্ণবর্ণ হলে ঠিক কেমন দেখায়। কিন্তু সেই কালো থেকে কি বৃষ্টি নামে? বৃষ্টি কি ভেজার কোনও মাটি?

বৃষ্টিভেজা মাটির কথা মনে হয় না তানিয়ার। সে মাটির সৌন্দর্য কেমনও

গন্ধও পায় না। আকাশের কৃষ্ণমুকুট আর সে-মুকুট ঘিরে থাকা রূপোলী রেলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সব ভুলে যায় সে। আজ কী বার, কত তারিখ, কোথায় কোথায় যাওয়ার কথা তার, সঙ্গেবেলায় রাসবিহারী কাকুর চেঁচারে...তার আগে যদি...কিছুই মনে থাকে না। কৃষ্ণবর্ণ আকাশ যেন তার ভেতরের সবকিছু শুষে নেয় এক নিঃশ্বাসে। নিজে আরও কালো হয়ে যায়। কিছুই পড়ে থাকে না আর তানিয়ার ভেতরে। তবু, শূন্য হয়ে যেতে যেতেও তার একবার মনে হয়, আমিও তো হতে পারতাম তেরেশকোভা। আমিও তো যেতে পারতাম মহাকাশে। মহাকাশময় কালো আকাশের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পারতাম এই পৃথিবীকে ঠিক কেমন দেখায়। কে যেন গিয়েছিলও, গিয়ে দেখেছিল পৃথিবীকে। নিজের দেশকেই তার মনে হয়েছিল সারে জীহী সে আচ্ছা। যারা দেখেছে তারা যা বলেছে সে তো তাদের দেখা, তাদের বলা। তাদের কেউ কি আমার মতো করে দেখতে পারে? আমার দেখা তো আমারই দেখা। আবার মনে হয় তার, হতেও তো পারতাম।

কেন যে এসব কথা তার মনে হয় বুঝতে পারে না তানিরা, শুধু বোঝে, তেরেশকোভা হওয়া বা না-হওয়া কোনও ব্যাপার নয়। আসলে এই কালো তার ভেতরে ঢুকে পড়ছে, তার বকের একেবারে মধ্যে এবং তার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনকে কিছুতেই খারাপ হতে দেওয়া বাবে না, আজ দেওয়া যাবে না। আজ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, উকিলকাকুর চেঁচারে যেতে হবে।

দেখো মা, ওদের উকিল স্পষ্টই বলে দিয়েছে তা হলে মিউচুয়াল হবে না। মিউচুয়াল করতে হলে ওদের টার্মস-এই করতে হবে।

কিন্তু...

কিন্তুর কোনও রূপ নেই, তোমাকে যেহে নিতে হবে। কোনটা বাছবে সেটা তোমার ডিসিশন, আমি তোমার ডিসিশন অনুযায়ী আইনের নিকট...

আজ মন খারাপ করার দিন নয়, আজ নয়। আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

হঠাৎ তার চৈতন্য কথা মনে হয়। সে কি তার সিদ্ধান্তও নিয়েছিল এইখানে, এই জানলার দাঁড়িয়ে? বাবা তো ছিল না তার পাশে আর। বাবার সঙ্গে কথা বলেই তো সে নিত সব সিদ্ধান্ত। কিন্তু সেই আশুন তাকেও তো একা করে দিয়েছিল। কত একা? আমার চেয়েও একা? আমার মতোই বিশম? সিদ্ধান্ত নিতে তার কতক্ষণ লেগেছিল? কতদিন? তারপর চলে গিয়েছিল। আমার হাতে তো আর দিন নেই। সব দিন শেষ। আজই নিতে হবে সিদ্ধান্ত? কী সিদ্ধান্ত নেব? কার সঙ্গে কথা বলে নেব? বাবা নেই। মার কাছে...তা হয় না। আর হয় না। আকাশের দিকে চেয়ে তানিয়ার মনে

হয়, এই কালো বাবা কি দেখেছিল? এই বিষাদ? একা একা? নাকি চৈতীও ছিল সঙ্গে?

তখনই কোথা থেকে কে জানে গান বেজে ওঠে। শ্রাবণের পবনে আকুল বিষম সন্ধ্যায়...তানিয়া ঠিক ধরতে পারে না গানটা কোথা থেকে আসছে। উল্টোদিকের ফ্ল্যাট থেকে নয়। ওপাশের কোনও শব্দ, দরজা খুলে না দিলে এপাশে আসতে পারে না। ওপরে আটতলা থেকে আসে, বা নীচে ছ'তলা কিংবা পাঁচতলা থেকেও আসে, একই দিকে সব জানলা আর জানলা তো খোলাই থাকে। তানিয়া ধরতে পারে না কিন্তু আসে। সাধীহার্য ঘরে মন আমার...তনিয়ার চেনা গান। তারা যখন বহুদিনের ওপারে ছিল তখনকার চেনা। তাদের গলি কালো করে মেষ জমলে বা টিনের চালে টুপটাপ শব্দ শুরু হলে মা গাইত। জানলায় দাঁড়িয়ে গলির শেষে তাকিয়ে বা খাটে হেলান দিয়ে পা শুটিয়ে বসে দু'হাতে হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরে মা চোখ বুজে গাইত, প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায় / দূরকালের অরণ্যছায়াতলে। এমনভাবে গাইত, এমন চোখ বুজে, হাঁটুদুটো এমনভাবে জড়িয়ে ধরে, যেন চোখ খোলা থাকলে বা পা-দুটো ধরে না রাখলে চলেই যেতে হবে, চলে যাবেই, প্রবাসী পাখির সঙ্গে সঙ্গে। কোথায় যেতে চাইত মা? কোথায় ছিল তার অরণ্যছায়াতল?

তার পরেও গানটা অনেকবার শুনেছে তানিয়া। সামনে বসে নীলিমা সেনের গলায়, অর্ধ্য সেনের কাছে, ক্যাসেটে বহুবার শুনেছে সুচিত্রা মিত্রের গলায়, এই সেদিনও শুনে এসে, পরপর দু'বার, কলাকুঞ্জে সন্জীবা খাতুন আর রবীন্দ্র সদনে রাজকুমারী ভট্টাচার্যের কাছে। তবু এ গান কানে এলেই তার মা-র গলাই কানে আসে। মেঝেতে বসে চোখ বুজে মা গাইছে, বৃষ্টির জোর বাড়ছে, একটু দূরে মা-র পায়ের কাছে বসে আছে সে। খুব ইচ্ছে করছে মা-র কাছে যেতে। মা-র বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দিতে। চারপাশ অন্ধকার হয়ে এলে যত ভয় বৃকে জমে সেই সব ভয় আর হাহাকারে কেঁদে ওঠার সব ইচ্ছা মা-র বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে। কিন্তু যেতে পারছে না। অন্য এক ভয়, চেনা ভয়, চেনা আড়ম্বর্তা তাকে টেনে ধরছে পেছন থেকে। মা চোখ বুজে গাইছে, গেয়েই যাচ্ছে, তাকে দেখছেও না, যেন সে নেই, মা-ও যেন নেই সে ঘরে।

গান শেষ হয়ে গেলেও মা হাত বাড়াত না। চূপ করে বসে থাকত। তানিয়াও কাছে যেত না। কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকার পর সে আর পারত না। টানটান শুয়ে পড়ত মেঝেতে। তারপর গড়তে আরম্ভ করত, ঘরময়। মেঝে কি তখন সিমেন্টের হয়ে গেছে? তার গায়ে কি তখন জমা থাকত? খালি গায়ে মেঝেতে গড়াতে দিত মা? ধমকাত না? তোমাকে কতদিন

বলেছি...বোঝাত না, মিষ্টি করে? অমন করতে নেই মা, ওঠো, লক্ষ্মীটি, এসো আমার কাছে এসো...

গান ছাড়া, মা চোখ বুজে গাইছে এই গান, সেই চোখবোজা মুখটা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না তানিয়ার। কেন মনে পড়ে না? কেন মনে নেই?

বাহিরে ঘন কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে এইসব কথা ভাবতে ভাবতে তানিয়ার মন আবার খারাপ হয়ে যেতে থাকে। ভারি হয়ে যেতে থাকে।

আমার কি আছে কোনও অরণ্যহায়াতল? ছিল কি কখনও? কোথায় ছিল? কার মনে? কোন প্রেমে? তালিকা ঘটতে হচ্ছে করে না আর। স্মৃতিতে, কল্পনায় বা স্বপ্নে। আমার তো সবই শূন্য। একমাত্র হায়াতল, তা-ও। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুন কেন বেছে নিল বাবা? আরও তো পছন্দ ছিল।

অন্ধকার অপরাহ্নের সেই জানলায় দাঁড়িয়ে, কালো আকাশের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে শূন্য হয়ে যেতে যেতে তানিয়ার আসলে একা লাগে। মনে হয় আকাশের এই কালোর সবটুকুই তার একাকীত্ব। সেই একাকীত্বের সঙ্গে অনুভূতের মতো কিছু যুক্ত হয়ে সবকিছু শূন্য করে দেয়। সে শূন্যতায় তার বাবার কথাই শুধু মনে হয়। বাবাই কি দায়ি আমার এই একাকীত্বের জন্যে? একা তো ছিলামই আমি, একাই ছিলাম। অমন করে বিয়ে দিয়েছিল বাবা, কাগজে কত কথা, কত কেজা, লোকের মুখে মুখে তার চেয়ে বেশি। ও বাড়িতেও একাই ছিলাম। সমীর তার মতো, আমি আমার মতো। কেউ নাক গলাই না কারও ব্যাপারে। কোনও ব্যাপারেই। তবু বাবা ছিল। হয়ত কম দেখা হতো, ইদানিং আরও কম, মাঝেমাঝেই বাড়ি ফিরত না। এই ফ্ল্যাটে থেকে যেত। তবু ছিল তো। বাবা ছিল, সব ছিল। বাবা নেই, বেন কিছুই নেই আর। নেতা নয়, চেয়ারম্যান নয়, ছ'ফুট লম্বা এক টগবটে ঘোবনের শ্রোত্র নয়, শুধু বাবা। কিছু ষটলে পাখির ঠোঁটে খবর পেয়েই এসে দাঁড়াবে। হাতটা ধরবে শক্ত করে। কান্না মুছে। শান্ত করে, নিজে হাসবে, আমাকেও হাসিয়ে ছাড়বে। প্রশ্ন পরে। কী করত কিংবা করত না সে সব নয়, বাবার থাকাটাই আসল কথা। বাবা বেন সেই নৌকো, যে-নৌকো কিছুতে ডোবে না, ডোবায়ও না কাউকে কখনও।

আকাশে তখন কোনও নৌকো নেই। সব মেঘ কালো হয়ে লীন হয়ে গেছে পরস্পরে। বিপুল বিশাল এক কালো হির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ জুড়ে, যেমন থাকে বিস্ফোরণের আগে। তার মধ্যেই তানিয়া একটা ছবি দেখে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ভিজতে ভিজতে দু'হাতে জলের দুটো বালতি নিয়ে দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ একজন কাঁচা মাটির গলিতে চলেছে।

লুসিটা হাঁটুর কাছে তোলা। গায়ে এঁট গেছে গেঞ্জি। বালতিদুটো ভারি। প্রতি পদক্ষেপে শরীরের প্রতিটি পেশী কঁপে কঁপে উঠছে। খালি পা। জলে-কাদায় পা টিপে টিপে হাঁটতে হচ্ছে। মানুষটির পেছনে ছোট্ট একটা মেয়ে। তার হাতে ছোট্ট একটা বালতি। বালতিতে জল।

বাবা, আর পারছি না।

পারছ, পারছ, খুব ভালো পারছ।

আর পারব না বাবা, পড়ে যাব।

পারবে, ঠিক পারবে, শক্ত করে ধরো, আর পা টিপে টিপে হাঁটো। সাবধান।

সত্যিই পারে মেয়েটি। কষ্ট হয় কিন্তু পেরে যায়। তবু কথাগুলো সে বলে কারণ, তার বাবা জানে, মেয়েটি তার সোহাগ চায়, তার সমর্থন চায়। সে যে পারছে সেই কথাটির স্বীকৃতি চায়। আর মেয়েটি পেরে যায় বাবা সামনে আছে বলে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বলে। তার ভালো লাগে, তার গায়ের জোর বেড়ে যায় এমন সব কথা বাবা বলেছে বলে।

সেই নৌকোটাই ডুবে গেল সবচেয়ে আগে, অকস্মাৎ। এবং ডুবিয়ে গেল। এখন কী করব আমি? কার কাছে যাব? ভাবতে ভাবতে তানিয়ার রাগ হয়। সেলফিশ। ভয়ংকর সেলফিশ। নিজের কষ্টটাই বড় হলো, নিজের যত্নপা? যেন আর কারও কোনও কষ্ট নেই, যত্নপা নেই। জ্ঞানলার বাইরে তাকিয়ে তানিয়ার মন বিড়বিড় করে।

শুধু সেলফিশ নয়, স্টুপিডও, সম্পূর্ণ নির্বোধ এক গাঁহিয়া। যতই ফিটফাট স্যুট পরো, ঝকঝকে গাড়ি চড়ো, ফাইভ স্টারে খাওদাও। যদি চিবোতে না পারো, দাঁতে জোরই না থাকে, গিলতে না পারো, গলায় বাধে, কঠিনালীতে আটকে যায় যদি, মুখে তোলা কেন অত কিছু! অত লোভ কেন? আরও কতজন খায়দার, দিব্য চিবোয়, গিলে ফেলে, হজমও হয়ে যায় অনায়াসে। সবাই পারে, তোমার ডাইসডেয়ারম্যানরা পারে, ডেপুটিরা পারে, বোর্ড মেম্বররা পারে, অফিসাররাও কেমন পেরে যায় হাসতে হাসতে, শুধু তুমি পারলে না। না-ই যদি পারো তবে সাধ কেন অত? নিজে ডুবলে, ডুবিয়ে গেলে সবাইকে আর আমি এখন একেবারে একা, আদিগন্ত একা।

তার মন আবার বিড়বিড় করে ওঠে, আই হেট ইউ। আই হেট ইউ! যত যুগ সে উগরে দিতে চায়, ততই আকাশের কালো তার ভেতরে ঢুকে পড়ে। সে যেন আরও একা হয়ে যায়। তার মন আরও তার হয়ে যায়। অধচ মনকে আত্ম স্বাধীনতা দেওয়া যাবে না। ভালো বা খারাপ হতে দেওয়া যাবে না। শুধু শক্ত রাখতে হবে। বাবার মতো, কঠিন সময়ে বাবার

কঠিন চোয়ালের মতো। আজ অনেক কাজ। আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
বাবারও কি ছিল না কোনও ছায়াতল? শুধুই আগুন? খুবই কি একা
ছিল বাবা? আমার মতোই, নাকি আমার চেয়েও?

অত লোকজন, ভক্ত, স্তাবক, শত্রু, সমালোচক, আত্মীয়বন্ধু, অত ভিড়,
অত কাজ, চৈতীর মতন এক রমণীয় নারী, ভালো ভালো অত মদ, ব্যাংকের
টাকা, এতসব আয়োজন কিছুই কি দূর করতে পারত না তার একাকিত্ব?
মাটি শক্ত হলে সহজেই দাঁড়ানো যায়, কোনও আয়োজন লাগে না। জলে,
কাদায়, ধ্বসে পাতের তলাটা পিচ্ছিল হয়ে গেলে দাঁড়ানো কঠিন হয়। তখন
দরকার হয় নানা আয়োজন আর নানা কৌশলের। তখনই একা লাগে
মানুষের।

তবে কি ভয়ংকর সেই একাকিত্বের কারণেই অত সব আয়োজন?
হতাশার আকাশটা মেঘে ঢেকে দিতে? নাকি অতসব আয়োজনের কারণেই
অত একাকিত্ব? প্রমোদের রাত্রি কি সকলের সম? কে জানে। হয়ত দুটোই
ঠিক। একটি বাড়িয়ে গেছে অন্যটিকে, ক্রমাগত।

সে একাকিত্বে যত্নশা ছিল, বিবের যত্নশা, কারণ নিজেই নিজেকে সে
একা করে ফেলেছিল। সে যত্নশা ভাগ করে নিতে পারে এমন কাউকে সে
কাছকাছি রাখে নি কোথাও। সে যেমন কাউকে রাখে নি, তার কাছে থাকেও
নি কেউ—তেমন কেউ যে হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিতেও পারত আগুন,
হয়ত পারত।

অথচ বিবেক থেকেই গিয়েছিল, হয়ত ছিল শুধু তার শেব রেশটুকু,
তবু ছিল, বুকের ভেতরেই ছিল। ফলে যত্নশাই বেড়েছিল শুধু, ক্রমাগত।
শুধু হয়ে গিয়েছিল দুই মুখের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত
হওয়াটা ছিল ভবিষ্যৎ।

তানিয়ার মনে হয়, বাবা কি জানত সে কথা? বুঝতে পেরেছিল কি
সে যুদ্ধের ফলাফল কী হবে, কী হতে পারে? ঠি কবে বুঝেছিল? কবে
থেকে? কোন ঘটনা বা কোন কথার পর থেকে? কার কথা? পাটির?
নেতার? মায়ের? অথবা নিজেরই কোনও কথা বা অনিবার্যভাবেই উঠে
আসে বলা-না-বলা বহু কথার তলদেশ থেকে টাইটানের মতো, যোজন
যোজন জল ঠেলে ঠেলে?

সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাবা কি ধরেই নিয়েছিল হেরে যাচ্ছে?
নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধের আঘাতে আঘাতে জীর্ণ হয়ে যেতে যেতে, ক্ষয়
হয়ে যেতে যেতে সে কি জেনে গিয়েছিল অনিবার্য পরাজয়ের কথা? সবার
কাছে, পৃথিবীর কাছে, নিজের কাছেও পরাজয়ের কথা? সারা জীবন যে শুধু
জিতেই এসেছে, সমস্ত পরাজয় চিরকাল বার কাছে এসেছে জয় হয়ে, সবাই

যাকে শুধু জিততেই দেখেছে, সে যখন হেরে যায়, এবং সে-হার যখন একেবারে ভেতর থেকেই আসে, সে হার ভয়ংকর হার হয়ে ওঠে। সে তখন একা হয়ে যায়, সম্পূর্ণ একা, পরাভূত মানুষের সঙ্গে কে-ই বা থাকতে চায়। কে আছে পরাজিতের দলে? হতাশের নিম্নলের দলে?

নিজের কাছে অমন করে হেরে যাওয়ার যন্ত্রণা, অমন সম্পূর্ণ একা হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, চোখের সামনে নিজেকে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখার যন্ত্রণা কত তীব্র? কত ভয়ংকর?

সে যন্ত্রণা কি এতই যন্ত্রণাময় যে তাকে মারতে আশুনেরই প্রয়োজন ছিল? অন্য কোনও পন্থা সে যন্ত্রণাকে স্পর্শই করতে পারত না? ভেতরের সে যন্ত্রণা কি এমনই প্রবল যে দম্ব হয়ে ছাঁই হয়ে যেতে যেতেও একবারও চেষ্টায়ে ওঠে নি, কাউকে ডাকে নি, কোনও নাম উচ্চারণ করে নি? কাছেই তো ছিল অনেকেই। চোদ্দটা সিঁড়ি পেরিয়ে আসতে কতক্ষণই বা লাগে? কিন্তু কেউ টেরই পায় নি, বুঝতেই পারে নি কিছু, ঘোঁষায় চোখ জ্বলে ওঠার আগে পর্যন্ত। ভেতরের তুলনায় বাইরের যন্ত্রণা যেন যন্ত্রণাই নয়। বিপুল এক অভিমানও কি মিশেছিল তার সাথে? একাকিত্ব থেকে যেমন অভিমান জন্ম নেয়?

তখনই তানিয়ার মনে হয়, মৃত্যু ছাড় আর কেউ-ই কি পারত না বাবাকে শান্তি দিতে? অস্ত্রত যন্ত্রণার কিছু উপশম করতে? মা, চৈতী, বাবার বন্ধুরা? নেতারা? আমি কি পারতাম কিছু করতে?

যেন খুব ভয়ে ভয়ে, খুব নিঃশব্দে, নিজে-কেই প্রশ্ন করে তানিয়া, একেবারে শেবে।

আমি তো আমার কণ্ঠ আর সমস্যা-ই নিয়ে যেতাম বাবার কাছে। তাতে কি বেড়ে যেত বাবার ভার? সে ভার কি বাড়াত যন্ত্রণা? তবে কি আমিও দায়ি? যতটুকু হোক কিছু দায় কি আমারও থাকে না? পারি বা না পারি চেষ্টা তো করতে পারতাম।

কিছু করতে হলে বুঝতে হয় আগে। বাবাকে কি বুঝতাম আমরা কেউ? আমি, মা, অবনী জেঠু, পার্টির অন্যান্য সহকর্মী বা নেতারা? বুঝতে হলে সময় দিতে হয়, সঙ্গ দিতে হয়, ভাবনা দিতে হয়। বাবার জন্যে এর কোনওটাই কি দিয়েছিলাম কেউ? দিয়েছি তো দু'হাত ভরেই, দিয়েছি কতটা? এখন দিচ্ছি শুধু গাল। অধ্যাপন। কি অধ্যাপন। তানিয়ার চোখদুটো জ্বালা করে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে তানিয়ার মনে হয়, এত কালো সবই কি মেঘের রঙ? শুধুই মেঘের? নাকি দূরে কোথাও আশুনও লেগেছে? বনে বা কোনও জঙ্গলে বা বড় কোনও জনপদে। তার ঘোঁষাতেই কালো হয়ে গেছে আকাশ? সেই ঘোঁষাতেই জ্বলছে চোখ?

তানিয়া সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আজ নয়, আজ অনেক কাজ, খুব জরুরি কাজ, আজ কিছুতেই নয়। তানিয়া দু'হাত দিয়ে দুই কাঁধ ধরে নিজেকে ঝাঁকতে থাকে। আজ নয়! আজ নয়!

আলো জ্বলে, আবার আয়নার সামনে দাঁড়ায় তানিয়া। একটা ভুরু এখনও বাকি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। আয়নায় নিজেকে দেখে, যেন অচেনা কেউ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ভালো করে চিনে রাখতে চায়। এমন করে যাতে ভুলে না যায়। পরেও দেখা হলে যেন চিনতে পারে।

তানিয়ার নাকটা টানা, বাবার যেমন ছিল। মুখটা গোল হলেও থুতনির কাছটা এমনভাবে নেমে ঘুরে গেছে, লম্বার একটা আদল আসে। থুতনিটা চেরা, মায়ের মতো। দেখেই মনে হয় অহংকারী ভেতরের অসহায় মানুষকে লুকোতে এই মুখ খুব কাজে লাগে।

মুখ তৈরি হয়ে গেলে আয়নার একেবারে কাছে গিয়ে মুখটা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। লিপস্টিকটা তুলে নিয়ে নীচের ঠোঁটের বাঁ দিকে আলতো করে ছোঁয়। ঠোঁট দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে টানটান করে দেখে, মুখটা ছড়িয়ে, ভেঙে, কেমন বেকুচুরে যায়। ঠিকই তো আছে।

কথাটা সে মনে মনে বলে, না উচ্চারণ করে বলে, নাকি সে আদৌ বলে না, অন্য কেউ বলে, সে শুধু শোনে, বুঝতে পারে না তানিয়া। আমিই কি বললাম কথাটা? কেমন যেন ধন্দ লাগে তার। অন্য কেউ কি বলল, ঠিকই তো আছে? আমি শুধু বললাম? আমি ছাড়াও কেউ কি আছে এই ক্ল্যাটে। খুব ধীরে, একটু একটু করে, সে পেছন ফেরে। কেউ নেই। থাকার কথাও নয়। কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার পর বিরাটের বাড়িতে যখন গবেষণা শুরু হয়েছিল কী করে এ ক্ল্যাট খালি করা যায়, চৈতী তার জিনিসপত্র শুকিয়ে নিয়ে নিজেই চলে গিয়েছিল।

এই আয়নার সামনে চৈতী যখন ঠোঁট টান করে লিপস্টিক হাতে নিয়ে খুব নিবিষ্ট হয়ে... বাবা কি কখনও এসে দাঁড়াতে পেছনে? কানের কাছে ফিসফিস করে বলত, ঠিকই তো আছে?

বাবা নেই। চৈতীও নেই। আর কেউ নেই। আমিই শুধু আছি। একা আমি। একেবারে একা। না, আছে, মা আছে। চোদটা সিঁড়ি নীচে, বিরাটের বাড়ির সেই ঘরে, মা আছে। মা-ও কি একা? আমার মতোই? কিংবা আমার চেয়েও? নাকি নিজের কাজকর্ম, ক্ষমতায়, ব্যক্ততায়, কাজের সঙ্গীদের মধ্যে ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে খুঁজে তার সেই অরণ্যছায়াতল?

ভাবতে ভাবতেই তানিয়ার মনে হয়, পেয়েছে কি? অত সহজে কি পাওয়া যায়। পাওয়া কি যায় আদৌ?

আয়নায়, চৈতীর পেছনে তখন কেমন দেখাত বাবাকে? দু'হাতের পেশী

কি শক্ত হয়ে যেত? মুখটা কেমন লাগত? এদানিং কঠিন চোয়াল তার ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল সুখের চর্বিতে আর মেদে। অথচ বাবা বলতেই চোখে ভাসে, এখনও ভাসে, কঠিন চোয়ালের শক্ত একটা মানুষ। বীর বীর। পৃথিবীর যে-কোনও শত্রুকে এবং পরিস্থিতিতে যে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে অনায়াসে, নিতান্ত হেলায়। জানাতও। জীবনভরই জানিয়েছে।

সেই মানুষটা কেমন সুখী সুখী হয়ে যাচ্ছিল ক্রমাগত। সুখ ফুটে ফুটে বেরোত সারা মুখে, আরামের গোল মুখে। সুখী সুখী পরিতৃপ্ত মুখ অতীব বিচ্ছিরি। দু'চক্ষে দেখতে পারে না তানিয়া। কেমন ভৌদামার্কী বোকাবোকা লাগে।

অথচ এমন তো ছিল না সে। কোনওদিনই ছিল না। কে বা কী তবে অমন করে ফেলল তাকে? কারা তারা? অথবা কী তা? যে-কোনও শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রস্তুত যে-মানুষ, প্রস্তুতি জীবনভরই এবং তা প্রমাণিত হয়ে গেছে বারবার, শুধু কথায় নয়, ভাষণে নয়, হাতেকলমে, প্রাত্যহিক কাজে প্রতিদিন প্রমাণিত বহুদিন ধরে, কে তাকে করে তুলল আড়ল-চাটা-সোভী? কারা তারা? প্রমোটার, ঠিকোদার বা অফিসারের দল? নাকি পার্টিই? পার্টির সংগঠন, তহবিল, নেতৃবৃন্দ? পার্টির আদর্শ? নাকি আদর্শ থেকেই স্বপ্নন? কতই তো স্বপ্নন চারপাশে। কত রম্ভের, কত রকম। আদর্শ কি পারে না ঠেকাতে? পারে না পায়ে নীচে মাটি শক্ত রাখতে? কেমন আদর্শ তবে? নাকি কোনও ফুটো ছিল আদর্শেরই গোড়ালিতে, যেমন ছিল অ্যাকিলিসের?

এমন ঘটনা কি ছিল অনিবার্য? এই দেশে, এই পৃথিবীতে, এই সমাজে বা ব্যবস্থায়? এমন ঘটবেই? এমনই ঘটবে? আশুন করে দেবে ছই? তিনি যত বড় বীর হোন, রামচন্দ্র হবে না কেউ। অর্জুনও নয়। হতে হবে একদলব্য, সূতপুত্র কর্ণ বড়জোর।

বাবার বুদ্ধিতেও কি সুখের চর্বি আর মেদের পরত পড়েছিল? নইলে অমন কাণ্ড কেউ করে? অমন ভীষণ এবং বীভৎস? তানিয়ার মনে হয়, কে জানে সে কাণ্ডও হয়ত এক চ্যালেঞ্জই। কাকে চ্যালেঞ্জ? বাইরের লোকজনকে, যারা অনেক কথা বলতে আরম্ভ করেছিল? বোর্ডের মেম্বারদের যারা ঠিকই করে ফেলেছিল আর চেয়ারম্যান রাখবে না? নাকি মাকে? মা। মা। মা যদি আর একটু বোঝার চেষ্টা করত বাবাকে। নীতিবাগীশ হয়ে শুধু অধঃপতন অধঃপতন করে না গজরাত। কী চায় বাবা কেন চায়, সে-চাওয়া পূরণ করতে কী করতে হচ্ছে, তাকে কেন করতে হচ্ছে তাকে, কেন করতে হচ্ছে, তার কোনও খবর কি রাখত মা? মার নিজেরই কি কোনও অভাব ছিল যে-অভাব কাছে টানার বদলে দূরে ঠেলে দিত বাবাকে? বাবা কি সেই জন্যেই...নাকি নিজেরই ভেতর থেকে এসেছিল চ্যালেঞ্জটা? দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর

মধ্যে? সুখী সুখী সুখের সঙ্গে কঠিন চোয়ালের? একজন কী করে সহ্য করে আর একজনকে? কী করে দুজন থাকে একই সুখে। অথচ মুখ তো দুটো নয়, একটাই। যখন চলে যেতে হলো চলে গেল দুটো মুখই।

পাশের ঘরে গিয়ে ম্যাকসিটা খুলে ফেলে তানিয়া। ব্রা এবং প্যান্টি পরা হয়ে গেলে নীল জিন্সটাতে ঢুকিয়ে দেয় একটা পা। আগেই বেছে রেখেছিল প্যান্টটা। কিন্তু এখন, একটা পা জিন্সের পায়ে, একটা পা নয়, হঠাৎ তার মনে হয়, আত্মা বলে সত্যিই কি আছে কিছু? আত্মা নাকি মুক্তি চায়। মুক্তিতে সে মিশে যায় পরমাশ্বার সঙ্গে। মুক্তি না হলে সে ছটফট করে, কষ্ট পায়, ঘুরে মরে।

এসব কি সত্যি? মা মানে না। অনেক আত্মীয়স্বজন বলা সহ্যও... দেখো বোমা, হাঙ্গার হলেও অপঘাতে 'ইয়ে' তো! মা রাজি হয়নি শ্রদ্ধ করতে। তানিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিল,

তুমি কি চাও?

তানিয়া কিছু বলেনি।

কিছু বলো!

কী বলব?

তুমি কি মানো এসব? ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, পুনর্জন্ম এইসব? তোমার বাবা মানত না। আমিও মানি না। তুমি মানো?

জানি না।

জানি না মানে?

মানে জানি না।

মানো কি মানো না?

জানি না।

তার মানে মানো?

না জানলে কী করে বলব? ওসব আছে কী নেই না জেনে কী করে বলব মানি কি মানি না। বললাম মানি, তারপর যদি জানা যায়, নেই? কী মানে দাঁড়ায় সে মানার? কিংবা বললাম মানি না, তারপর দেখা গেল আছে, সবই আছে, তখন?

মা হাঁ করে তাকিয়ে ছিল তার মুখের দিকে, যেন আগে কোনওদিন দেখেনি এ মুখ।

এখন জিন্সটা দুহাতে ধরে তানিয়ার মনে হয়, আত্মা কি আছে সত্যিই? বো আত্মা মুক্তি না পেলে ছটফট করে, ঘুরে মরে?

কে বলল কথাটা, ঠিকই তো আছে? আমিই বললাম, মনে মনে? কিংবা সোচ্চারে? এবং আমিই শুনলাম?

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে তানিয়া। ডিভোর্সের কথাবার্তা বলতে, পেটের বাচ্চাটা রাখা যাবে কিনা, রাখতে চাইলে কী কী হবে এবং কী কী হবে না এইসব আলোচনা করতে উকিলের কাছে, সে উকিলও বাবারই বন্ধু, জিন্স পরে যাওয়া যায় না। তানিয়া প্যাণ্টের পা থেকে টেনে বের করে নেয় পা। কালো রঙের একটা প্যারানাল পরে। ওপরে সাদা রঙের ঝালরের কাজ করা একটা টপ।

ঠিকই তো আছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে তার মনে হয়। কিন্তু আগে তো ডাক্তার। যাবতীয় পরীক্ষার রিপোর্ট এসে যাওয়ার কথা আজ। আজই তারিখ ঠিক করে ফেলতে হবে। নইলে খুব দেরি হয়ে যেতে পারে। না, না, সে রিসক আমি নিতে পারি না। এমন ভাবে বলেন ডাক্তার মিত্র যেন তাঁরই বৌ কিংবা মেয়ের অ্যাবর্শন নিয়ে কথা হচ্ছে। ভালো ডাক্তার। ব্যবহারও ভালো। শুধু বুকের দিকে তাকিয়ে ছাড়া কথা বলতে পারেন না। নাঃ এটা চলবে না।

তানিয়া আবার ওষুধে চলে যায়। সব খুলে ফেলে হালকা গোলাপী রঙের শালোয়ার-কামিজ পরে। চিকনের কাজ করা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের মধ্যে ব্রাশ চালাতে চালাতে, বয় কাটে ব্রাশই যথেষ্ট, চিবুশি না হলেও চলে, দু'আঙুলে কপালের কাছের চুল আলতো এলোমেলো করে দিতে দিতে ডাক্তারের মুখটা মনে পড়ে তানিয়ার। মাছির মতো চোখ উড়তে উড়তে এঁটেই থাকে শুড়ের হাঁড়িতে। পূর্ণদাস বাউলের গানটা মনে পড়ে যায় তার। চিটে শুড়ে পড়লে পিমড়েও নড়তে চড়তে পারে না। আপনমনে হাসে তানিয়া। গুণগুণ করে ওঠে, হাম্ম বুঝি তার খবর পেলে না...

আবার সে পাশের ঘরে ফিরে যায়। কামিজটা খুলে, ব্রা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে আসে আয়নার সামনে। পেটে চর্বি জমেছে, দু'পাশে ভাঁজ। একদম ভান্নাগে না। বুকদুটো ঝুলে যাচ্ছে। দু'হাত দিয়ে আলতো করে ওপরে ঠেলে তুলে ডুক কুঁচকে দেখে তানিয়া। ঠিক! এইরকম হচ্ছেই ঠিক হতো। আর হবে না। একদম ভান্নাগে না।

প্যাণ্টি আর নাড়ির মাঝখানটার চোখ পড়ে তানিয়ার। ঈষৎ শিথিল হয়ে গেছে। বাচ্চা হলে আরও টিলে হয়ে যাবে। লম্বা লম্বা ফাটা ফাটা দাগ হবে। অনেকের তলপেটে দেখেছে তানিয়া। এ পেটেও হবে? এমন মসৃণ, ফর্সা, উজ্জ্বল স্বক ভরে যাবে ফাটা ফাটা দাগে? ভান্নাগে না! কামিজটা গলিয়ে কাঁধের ওপর চেইন টেনে দিয়ে লক্ষ্য করে তানিয়া। আউটলাইনটা এখন ঠিকই লাগছে; কোমরটাও... খবর ঠিক পেয়ে যাবে যার পাওয়ার, যে পেতে চায়।

ব্যাগ হাতে নিয়ে, অল্প দিলের চটিতে পা গলিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসে তানিয়া। ব্যাগ খুলে চাবিটাবি দেখে নিয়ে দরজা টেনে দেয়। বাবা শিখিয়েছিল এটা।

আধুনিকতার যেমন সুবিধে আছে, কিছু সমস্যাও আছে। ধরো এই দরজা। টেনে দিলেই বন্ধ। সিকিওর্ড। কেউ ঢুকতে পারবে না। শুধু টেনে দিলেই। কিন্তু তুমি নিজেও ঢুকতে পারবে না যদি চাবিটি হাতে না থাকে। কাজেই নাকের ডগায় দরজা বন্ধ করে দেওয়ার আগে অলওয়েজ নিজের ব্যাগটা দেখে নেবে, চাবিটা আছে তো?

হি ওঅজ্ঞ আ নাইস ম্যান। অ্যাণ্ড অ্যান একসেলেস্ট ফাদার। শুধু মা যদি একটু বুঝত আর বাবা যদি অত ইমোশন্যাল, অত প্যাননেট না হলে একটু প্র্যাকটিক্যাল হতো। একটু ট্যাকটিক্যাল হতো। অত হামসেট না হতো। নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে না উঠত। আর মা যদি অত নীতিবাগিশ না হলে, আর একটু বৈধ ধরে... অধঃপতন।

লিফট থেকে বেরিয়ে, গেট পেরিয়ে রাস্তার পড়ে বাস স্টপের দিকে যেতে যেতে তানিয়া দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে। অধঃপতন—মাই ফুট! শো মি ওয়ান সিঙ্গেল বাস্টার্ড য়ার কখনও কোনও পতন ঘটেনি। তারা তো কই কোনও যন্ত্রণার কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় না, আশুন তুলে নেয় না হাতে। তুমিও ভালো আমিও ভালো সবার চাইতে খেতে ভালো... চেটেপুটে সব শুদ্ধ খেয়ে সাধু সাধু সুখী সুখী মুখ করে বেঁচেবর্তে থাকে দিবি। পরম সুখে ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে যার। এবং মাঝেমাঝেই মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈতিকতার বিপর্যয়, সত্যতার জর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে ভাষণও দেয়। হিপোক্রিসিট বাস্টার্ডস।

ওই চ্যালেঞ্জ নিতে, কঠিন চোয়াল আর সুখী মুখের দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে, বুকের পাটা লাগে, কবজির জের লাগে, ভেতরের সত্যতা লাগে, আর হিম্বং লাগে। সবগুলোই ছিল আমার বাবার। হি রিয়্যালি ওঅজ্ঞ আ বিগ ম্যান, অ্যাণ্ড অ্যান একসেলেস্ট ফাদার।

বাস স্টপের দিকে যেতে যেতে তানিয়া দেখে কৃষ্ণবর্ণ সেই মুকুট প্রায় সমগ্র রাজ্য জিতে নিয়েছে। সাত তলা থেকে বা দেখা যাচ্ছিল এখান থেকে তা দেখা যায় না। এখানে রাস্তার দুপাশে বাড়ি। উঁচু এবং মাঝারি বাড়ি, পরপর। ফলে আকাশটা লম্বাটে। তার প্রায় সবটাই কালো হয়ে গেছে। বোঝাই যায় যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। মাটিতে যদিও বাস স্টপে দাঁড়িয়ে কোনও মাটি চোখে পড়ে না।

এই সব এলাকা শুধু মাটিই ছিল। গ্রাম ছিল। এই পথ ছিল গোরুর

গাড়ির চাকায় চিরে চিরে গভীর গর্ত হয়ে যাওয়া মাটির রাজ্য। দুপাশের জমিতে ধান হতো। অনেক পুকুর ছিল। পুকুরে মাছ হতো। ক'বছর আগেও।

ডি-আই-পি রোড, সপ্ট লেক আর রাজারহাট টাউনশিপের কল্যাপে এখানে জমির দাম ধক ধক করে বেড়েছে। আর শান্ত শুমন্ত গ্রামকে তুড়ি মেয়ে উড়িয়ে দিয়ে ঝপ ঝপ করে উড়ে এসে সবকিছু জুড়ে বসেছে উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি, বিশাল বিশাল অফিস, ধোয়াহীন কারখানা, বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অনেক মালটিন্যাশনাল, সরকারি অফিসের চোখ জুড়নো অট্টালিকা। এখন বিশ্বায়নের সময়। ফলে গ্রাম দ্রুত শহর হয়ে যাচ্ছে। গোরুর গাড়ি উধাও। রিকশা, অটো, ট্যাক্সি, মিনিবাস, মিডিবাস, ম্যাকসিবাস এসে ছাড়ির। এই শহরের পেছনেই গ্রাম আছে এখনও, যে-কদিন থাকা যায়। কিন্তু যে গ্রাম দেখতে হলে শহরের মাথায় চড়তে হয়। শেষ সারির দিকে ছ'তলায়, সাত তলায়, আট তলায় উঠতে হয়। সেখান থেকে দেখা যায় গাছগাছালির ছবি, মাঠের সবুজ।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে নিজেদের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তানিয়ার আবার মনে হয়, কাছটা মা করে ফেললেই পারত। থাকতেও তো পারে। আমরা জানি না বা মানি না, অতএব আশ্বা নেই, এ যুক্তি তো ভুলও হতে পারে। যদি থাকে? বাই চাল যদি থাকে? তা হলে তো ছটকট করেই বেড়াচ্ছে। এটাও তো একটা রিস্ক নেওয়াই হলো। অ্যাড্‌মিডেবল অ্যাণ্ড আননেসেসারি রিস্ক। না থাকলেও, কাছটা যদি করো, ক্ষতিটা কী হবে, কিছু টাকাকড়ি খরচ হওয়া ছাড়া? কিন্তু যদি থাকে? কী সাংঘাতিকা

একটু পরেই বৃষ্টি নামে। প্রথমে এক ফোঁটা। তারপর আর এক ফোঁটা, তারপর ফোঁটায় ফোঁটায়। ফোঁটাগুলো ক্রমশঃ বড় হয়, দ্রুত পড়ে। বৃষ্টির জোর বাড়ে, সঙ্গে বাতাস দেয়। শুমোট কেটে গিয়ে চারপাশ হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অবশেষে বজ্রপাতের কড়কড় আওয়াজের সঙ্গে তাল দিয়ে মুষলধারায় নামে। সে ধারা এত দ্রুত, এমন ঘন, আকাশের অন্ধকার যেন নেমে আসে পৃথিবীতে। চারপাশ কালো হয়ে যায়। বাস স্টপের সবাই পক্ষায়েত আমলে তৈরি হলে পড়া শেডের তলায় চুকে পড়ে। সকলকে আঁটে না। আঁটা-না-আঁটাতে কিছু আসে যায় না। বাতাস পাক খেয়ে খেয়ে বৃষ্টির ধারা ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে। সকলেই ভেজে। শুধু তারাই বেঁচে যায় যারা মানুষের আড়াল পায়। তানিয়া বেঁচে যায়। তার শায় প্রতি ইচ্ছিতেই আড়াল। এত বৃষ্টি এবং ভিজে বাতাসেও তার গরম লাগে, ষাড়-কপাল-গলায়-গালে ঘাম জমে।

এ মাথা, ও ষাড়, অন্য পিট, ওই কাঁধের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে তানিয়া বোকার চেষ্টা করে বাস কতদূর। ঘন বৃষ্টি আর অন্ধকার পার হয়ে তার

দৃষ্টি বেশি দূর যেতে পারে না। তানিয়া ভাবে, বাবা থাকলে কী বলত? কী বুদ্ধি দিত? পেটের ভেতর জ্বালা একটা মানুষ, তাকে মেয়ে ফেলতে মত দিত? দিলে, ওদের শর্ত মেনে নিলে, নিশ্চিন্ত ডিভোর্স। নিরাপদ জীবন। স্বচ্ছল দিনযাপন। তারপর প্রেমকে বিবাহ পর্যন্তও নিজে যাওয়া যাবে, যদি চাই। কোনও বাধা থাকবে না। অন্যদিকে, একটি শিশু নিয়ে, ছোট বিজ্ঞাপন কোম্পানির ছোট চাকরির রোজগারে মামলার মুখোমুখি হওয়া। দিনের পর দিন হাঁটাইটি, ডেটের পর ডেট, খরচের পর খরচ, অন্তহীন ভোগান্তি। ওরা ভুগবে। সঙ্গে আমাকেও...

এটা তো অর্ডিনারী মামলা নয় মা, ডিভোর্স কেস। এর অনেক হ্যাপা। খরচটরচ ভোগান্তিটোগান্তি ছাড়াও আরও অনেক কিছু। সেসব সইতে পারবে তো? তুমি পারলে আমি...

সেই লড়াইতেই কি যেতে বলত বাবা? বলতে পারত? কোন মুখে বলত? কঠিন চোয়ালের মুখে, না সুখী গোলা মুখে? দুই মুখের লড়াই সামলাতে না পেলে নিজেই তো শেষ হয়ে গেল! এখন আমি কসর কাছে যাব?

তখনই দেখতে পায় তানিয়া। ষাড়-গলা-কান-মাথার ফাঁক গলে তার দৃষ্টি এমনভাবে যায় বেন সন্ন একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে। সুড়ঙ্গের ওপারেও অন্ধকার, অন্ধকারে বৃষ্টির কোনও কোনও ফোঁটা চকচক করে। সেই বৃষ্টি আর অন্ধকারের শেষ প্রান্তে আশ্রনের ঝলকানি দেখতে পায় তানিয়া। হেডলাইট ফ্লেসে বাস আসছে। ঝলকানিটা ক্রমশঃ কাছে আসে, ক্রমশঃ বড় হয়। তানিয়ার মনে হয় বেন জানলাময় আশ্রন, চারপাশে ঝোঁয়া, ঝোঁয়ায় আচ্ছন্ন সবাতুধুআশ্রনটা ক্রমশঃ বাড়ে, বড় হয়, কাছে আসে। কেউ কিছু টের পেল না চোদ্দটা সিঁড়ি দূরে বসেও?

চাকা দিয়ে দুপাশে অল ছড়াতে ছড়াতে বাস এসে দাঁড়ায় শেডের সামনে। এখানে রাস্তাটা নীচু, একটুতেই অল অমে যায়। ডিঙিতে ডিঙিতেই ভিড়টা ছড়মুড় করে উঠে পড়ে বাসে। তানিয়াকে উঠতে হয় না। ভিড়ই তুলে দেয়। শুধু তুলে দেয় না, ধিরেও রাখে। বাইরেটা দেখতেই পায় না তানিয়া। টিকিট!

দরজার কাছ থেকে ভাড়া নিতে নিতে একসময় তার সামনে এসে পৌছয় কণাকটর।

কত ভাড়া?

কোথায় যাবেন?

তানিয়া ভাবে, কোথায় যাব? ডাক্তার মিত্র না রাসবিহারী কাকু? রাসবিহারী কাকু না ডাক্তার মিত্র?

আগে ঠিক করুন কোথায় যাবেন! যন্ত্রেসব...ঝাঁঝিয়ে ওঠে কণ্ঠকণ্ঠে।
গেটের কাছ থেকে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে ওঠে,

কী হলো শুরু, খ্যাকাছ কেন? এত বিষটিতেও ঠাণ্ডা হলে না?

ঠাণ্ডা হবে কী বে, একেবারে জ্বালিয়ে নিজে। কীসব দিনকাল...

বলতে বলতে হেসে ফেলে। হাসতে হাসতে তানিয়াকে কনুই দিয়ে সরিয়ে
তার পেছনে হাত বাড়িয়ে দেয়।

এই যে দাদা, টিকিটটা দিন।

দিচ্ছি বাবা দিচ্ছি, তুমি তো দেখি মাথা খারাপ করে দেবে।

মাথা ঠিক রাখতে চাইলে দিয়ে দিন টিকিটটা।

টিকিট তো চাইছি, এদিকে জানলা দিলে জল এসে যে একেবারে...

ভগোয়ান যদি আকাশ থেকে জল ছাড়ে জানলা দিয়ে কি কসা মাংস
আসবে? নিন নিন, কথা না বাড়িয়ে ভাড়াটা ছাড়ুন। অনেকক্ষণ থেকে আপনি
ভ্যানতারা করছেন।

খানিকক্ষণ পরেই বসার জায়গা পেয়ে যায় তানিয়া। গেটের পাশে
আড়াআড়ি দুজনের সিট। তিনজনে একটু গাদাগাদি হয়। তবু বসতে পেয়ে
যেন বেঁচে যায় তানিয়া। এমন ঘেরাও হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে
আসছিল। এখন বসে একটু শ্বাস নিয়ে বাইরেটা দেখতে ইচ্ছে হয়। কাঠের
জানলাগুলো টেনে তোলা। গেট দিয়ে কিছু দেখা অসম্ভব, এত ভিড়।

শরীরটা ঝাঁকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পিঠের কাছের জানলাটা একটু তুলে ধীরে
ধীরে নীচে নামায় তানিয়া। বৃষ্টির ছাট আসছে না তো। আরও একটু নামায়।
তারপর সম্পূর্ণ নামিয়ে দেয়। বাস তখন কলকাতায় ঢুকছে। এর মধ্যেই
এসে গেলাম। তানিয়া অবাক হয়ে ভাবে। এবং আরও অবাক হয়ে দেখে,
কোথাও কোনও বৃষ্টি নেই, মেঘ নেই, অন্ধকার নেই। আলোয় ঝলমল করছে
কলকাতা, এখনও রোদ্দুর আছে, অনেক।

কয়েক কিলোমিটার আর কয়েক মিনিট দূরেই এত আলো! এত রোদ্দুর!
বাবা কি জানত? আহা, যদি জানতে পারত বাবা।

পুষণের জন্ম

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

সন্ধ্যা নামল। দিন আর রাতের চরম বিন্দু। তাঁর মনে হয় এই একটা সময় যখন নিকট এবং দূর তাদের অব্যবহিত নয় কেবল, অনির্দিষ্ট সীমাহীনতাসহ এর ভেতর ঢুকে যায়। তাই, সন্ধ্যা যেন দিনরাতের যে কোনও সময়ের চাইতে অনেক ছড়ানো, মাখানো।

কৃষ্ণপঙ্কের অঙ্ককার একটু একটু করে অবশিষ্ট আলোর রেখাগুলি মুছে দিতে থাকে। কৃষ্ণচূড়ার মাথার ওপর দিয়ে শেষ কয়েকটি পাখি দিগন্তরেখা ধরে উড়ে চলে যায়। আকাশে দুটো একটা তারা ফুটছে। মাঠ পার হয়ে ছায়ামূর্তির মতো হেঁটে চলে যাওয়া পথচারী, দূর থেকে দূরান্তে মিলিয়ে যাওয়া তাদের কথা, কখনও কথা থেকে আলগা হয়ে খসে পড়া দু-একটি অসংলগ্ন ধ্বনি সহসা চারপাশকে আরও নির্জন করে তোলে। শেষ বসন্তের অস্থির বাতাস গাছপালা পার হয়ে, মাঠ পার হয়ে তার গায়ে এসে আছড়ে পড়ে। কিছু সময় পরে তা নিজেই গতিহীন হয়ে স্থিমিত হয়। এই সময় আকাশকেও ভারি নিরিবিলি দেখায়।

তিনি উদাস চোখে, সবে দু-একটি তারাদুলা, নিরিবিলি অঙ্ককার আকাশ, সামনের মাঠ, মাঠের শেষে ঘন হয়ে গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ, দূরের ওই রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলেন।

মৃত্তিকা এখনও ফেরেনি। টুকটাক কেনাকাটি সারতে গেছে। হয়ত কয়েকদিন চলার মতো সজ্জি বাজার, মাছ-টাছও। তিনি ঠিক জানেন না। মৃত্তিকা থাকলে এতকপে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠত। সুগন্ধী ধূপকাঠি। মৃদু সুরে রেকর্ডারে কোনও যন্ত্রসঙ্গীত। তাঁর ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রং, তুলি, ক্যানভাস, মৃত্তিকার সূচক হাতের স্পর্শে যথাস্থানে।

তিনি এই খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। এক হাত দূরত্বে সুইচ বোর্ড। ইচ্ছে করছে না। অন্য অনেক কিছুর মতোই। আজকাল তাঁর এরকম হয়। যখন যেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে বা যে কোনও অবস্থানেই থাকুন না কেন, মনে হয় হাত, পা, পিঠ, বুক, গলা, পাজর, কোমর, হাঁটু, গোড়ালি শরীরের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই জায়গার সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে, তাদের আর কোনও ভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এইরকম সময়ে তাঁর ভয় হয়, তিনি বোধহয় আগেকার অভ্যাস কোনও ভঙ্গীই নতুন করে আয়ত্রে আনতে পারবেন না। আর এই ভয় থেকেই তিনি আরও অনড়, আরও

নিশ্চল হয়ে থাকেন। যেমন এখন। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক তিনি এই খোলা বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এক এক সময় মনে হচ্ছে অবস্থানের বদল ঘটলে ভাল লাগত। এই তো, বসার ঘরেই সুন্দর করে সাজানো কয়েকটি বেতের চেয়ার, তিনি তো একটা চেয়ার সেখানে থেকে তুলে এনে এখানে, এই উন্মুক্ত বারান্দায় পাততে পারেন। তারপর এতক্ষণকার দাঁড়ানোজনিত পরিশ্রমের লাঘব ঘটিয়ে তাতে বসে আরাম পেতে পারেন। কিন্তু, তিনি ভয় পাচ্ছেন, অবস্থানের বদল ঘটলে যদি তেমন ভয়ংকর কিছু হয়, কি যে সেই ভয়ংকরতা, তা তিনি জানেন না অবশ্য। হয়ত জানলে, এতটা ভয়ও পেতেন না।

তিনি প্রাণপনে চাইছেন মৃত্তিকা এখন বাড়ি ফিরে আসুক। তাঁর সঙ্গে কথা বলুক। অনেক সময় অন্য মানুষের উপস্থিতি, কষ্টস্বর তাঁকে এই হুবিরতা থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু, মৃত্তিকাকে তো তিনি কখনও বলেননি তার এই সমস্যার কথা। বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত, আত্মীয়স্বজন কাউকেই না।

এই তো সেদিন, কলকাতার বাড়িতে বাধকরমে স্নান করছিলেন। মৃত্তিকা বাড়ি ছিল না। নগ্ন হয়ে স্নান করা তাঁর অনেকদিনের অভ্যাস। শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে আশরীর ভিজেছিলেন। উল্টোদিকে দেওয়াল জেড়া আয়নায় চোখ পড়ল হঠাৎ। খেয়ে গেল তার গোটা শরীর। এমনকি মৃদু অঙ্গুলি সম্মালনও। তিনি নিজেই নিজে দেখছিলেন। যে নগ্নতা উপযুক্ত লগন ছাড়া একান্ত নিজের মানুষের কাছেও উদ্ঘাটন করা যায় না, সেই নগ্ন তিনি, হয়, একেবারে গাঢ় রোদ ঝলমলে দুপুরবেলাতেই সেই স্নানঘরে একটু একটু করে প্রোথিত হয়ে যেতে থাকলেন। কাচের শারির ভেতর দিয়ে তখনও একটুকরো রোদের ফালি স্নানঘরের মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছিল। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। আর কোনওদিন দরজার বাইরে যাওয়া হবে কিনা। তাঁর আর কখনও মৃত্তিকার সঙ্গে দেখা হবে কিনা। এমনকি তিনি ভয়ে তার চোখ-দুটিও বুজে ফেলতে পারছিলেন না। এইরকম সময়ে চোখ বুজলেই, বন্ধ চোখের ভেতর থেকে উঠে আসে একটি অসম্পূর্ণ ছবি। সেই নিরাপায় অন্ধকার তাকে সেই ছোট্ট অশ্বের মুখোমুখি দাঁড় করায়। যে অশ্বটি ছুটে ছুটে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙেচুরে মুখ ধুবড়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে যা তিনি অনেক বছর আগে থেকেই আঁকতে চেয়েছেন, পারেননি। এখনও। অথচ সেই অনেক বছর ধরেই তো অন্য সব কাজের ফাঁকে, ফাঁকে, অন্য সব চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে, অন্য সব ছবির ফাঁকে ফাঁকে এই ছবিটা আঁকতে চাইছেন। আঁকে চলেছেন।

মৃত্তিকা আর তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন। তখন সবে বিয়ে হয়েছে। ঠিক প্রাথমিক স্থানিমূন নয়। অয়পুরে একটা গয়ার্কর্ষণ ছিল। সেখান থেকে

রাজস্থান। ষোড়ার পিঠে উঠেছিলেন দুজনে। সাবলীল, তেজী, উদ্ধত অসম্ভব সুন্দর সেই অশ্ব। তার গায়ের হলুদ এমনই উজ্জ্বল, তাঁর মনে হয়েছিল ঠিক খানিকটা রং লেগে যাবে তাঁদের গায়ে।

যে তিনদিন ছিলেন, নেশাচ্ছন্ন মানুষের মতো সকাল থেকে সন্ধ্যা সেই অশ্বের মালিকের সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছিলেন। পরের দুটো দিন একাই। মৃত্তিকা হাঁটা পথে ঘুরে বেড়িয়েছে এদিক, সেদিক। সারাক্ষিট হাউসে ফিরে অভিযোগ জানিয়েছে অন্য কিছু দেখা হল না। সারাদিন ওই ষোড়াকে নিয়ে মেতে রইলো। তোমার পরের সাবজেক্ট, তাই না?

তিনি হাসিতে ঝলমলে হয়ে মাথা নেড়েছেন—ঠিক ধরেছ। এরকম লাইভলি ষোড়া জীবনে দেখিনি। এবার কলকাতায় গিয়ে ষোড়ার সিরিজ করব।

আক্কেপ করেছেন—হাতে পরসা থাকলে কিনে নিতাম। মৃত্তিকার তখন প্রথম প্রথম। শিল্পীদের নানারকম খেলার কথা জানত। তাছাড়া প্রতিভাবান আর্টিস্ট হিসেবে তিনি সবে নাম করছেন। কয়েকটি এগজিবিশনের রিভিউ বেরিয়েছে। তাতে সম্ভাবনার আশাস। তাই, ততটা অবাক হয় নি সে। মিষ্টি হেসে প্রসঙ্গ ঘুরিয়েছে।

কলকাতায় ফিরে তারপর থেকেই তো চেষ্টা করে যাচ্ছেন, এমনকি, আজ পর্যন্ত। অন্য ছবি, অন্য কাজ প্ররোচিত হয়েছে। এখন তো তিনি একজন নারী শিল্পী। একটাকে লোকে চেনে। কিন্তু, সেই অশ্ব? আজও মনোমত হয়নি। তাই, ক্রমাগত কাটাকুটি, ক্রমাগত ইজেক্স বোর্ডের সাদা হয়ে যাওয়া, তা থেকে ধারাবাহিক অসন্তোষ, বিপর্যয়, অসহায়তা।

মৃত্তিকা বৃদ্ধি করে বছর কয়েক আগে এখানে, এই শান্তিনিকেতনের একেবারে প্রান্তিক এলাকায় একটি দু-ঘরের ছোট বাড়ি কিনেছে। কলকাতায় হই হই, কোলাহল আর অন্যান্য কাজের ভিড়ে তিনি যখন নিশ্বাস নিতে পারেন না, তখন তাঁকে নিয়ে দিন কয়েকের জন্য চলে আসে এই নিরালায়। এবারও যেমন।

এখন সন্ধ্যা আরও অনেক ঘন। চারপাশ আরও শান্ত আরও নির্জন। দূরে দূরে দু-একটি বাড়িতে আলো। লোকজনের নড়াচড়া। তাঁর মনে হচ্ছে, মুকাদ্দিনয়। আলোর রশ্মি জানলা দিয়ে তেরছাভাবে ছিটকে এসে পড়েছে সামনের মাঠে। ফলে, আলোর সীমানার বাইরেরকার অনাবৃত ভূমি আরও গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা।

ভয় তাঁকে এমনই অবশ করে দেয়, মনে হয় আর খানিকক্ষণের মধ্যেই তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। এইভাবে, তাঁর যাবতীয় কাজ অসম্পূর্ণ রেখে,

মৃত্তিকার সঙ্গে শেষবারের মতো কথা না বলে, তার অসমাপ্ত অশ্বকে এই পৃথিবীর মাটিতে একসা রেখে, এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মরে যাবেন তিনি। এখন তো তিনি আর আকাশের অঙ্ককারের দিকেও তাকাতে পারছেন না, কারণ, তাহলেই তো তাঁকে চোখ ঘুরাতে হবে, তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, স্নায়ুমণ্ডলী এখন তো আর সে অবস্থায় নেই। তাই, তিনি এখন সামনের প্রসারিত অঙ্ককারের দিকে তাকিয়ে সারা বুক ফাঁকা করে চিৎকার করে উঠতে চাইলেন। সেই চিৎকার কান্নাও হতে পারে। এমন চিৎকার বা এমন কান্না যা এখন এই মেঠো পথ বেয়ে আকাশের দিকান্তরেখার পথ ধরে উড়ে চলে যাবে দূরে, দূর থেকে অনিশেষ দূরে। আর যাওয়ার পথে পথে সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে পাহাড়ের সানুদেশ, সমুদ্রের অতল গভীরতা, মরুভূমির বুকে হেঁটে যাওয়া সেই অশ্ব, কোনও নিঃসঙ্গ সমাধি ফলক, মন্দিরের ঘণ্টা এবং এইরকম আরও কিছু...

পারছেন না তিনি। ভেতর থেকে সমস্ত সংহত শক্তির প্রাণপণ প্রচেষ্টায় তাঁর গলার শিরা ফুলে ওঠে। দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, মুখমণ্ডল হাঁ হয়ে বুকের দিকে ঝুলে পড়ে। তবু শব্দ বের হয় না। এই প্রবল শারীরিক কসরতের ফলে তাঁর দু-চোখ চুইয়ে জ্বল নামে। নীরব অশ্রুপাত। যদিও তাঁর কাছে এখনও খুব পরিষ্কার নয়, তার অশ্রুর উৎসকথা। তা কি নিছক শারীরিক কসরত? বহুদিন একটা না পারা-জনিত ব্যর্থতা, যাকে বলা যেতে পারে শৈল্পিক, তা নয়?

এই দারুণ সংকট সময়ে মৃত্তিকা ফিরল। রিকশার ভাড়া মিটিয়ে বারান্দায় উঠল। তার দু-হাত ভরতি সওদা। সেসব বারান্দায় নামিয়ে সুইচ অন করল। আলো জ্বলে উঠল ঠিকঠাক। তাঁর কাছে এল। মৃত্তিকা জানে এরকম তন্ময়তার সময় তাঁকে নাড়িয়ে দিতে হয়। সে শরীর স্পর্শ করতেই মৃত্তিকা ঘটে যায় তাঁর। তিনি শুনতে পাচ্ছেন মৃত্তিকার কণ্ঠস্বর—এতক্ষণ আলো না জ্বালিয়ে অঙ্ককার করে রয়েছ? তিনি কি যেন বলতে চাইলেন। পারলেন না এবারও। মৃত্তিকার হাতের ওপর তার চোখের জল ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা।

আলো নেভার আগে মৃত্তিকা তাঁর কাছে এল। শিয়রে বসল। কপালের ওপর অবিন্যস্ত চুলগুলো ঠিক করতে করতে বলল—মাঝে মাঝে কি হয় তোমার?

—জানি না। তাঁর দৃষ্টি এখনও দূরমনস্ক।

—এবার ফিরে গিয়ে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ নিতে হবে। তিনি এই কথার উত্তর দেন না। নীরবে তাকিয়ে থাকেন। মৃত্তিকা তাঁর মুখ ঘুরিয়ে

আনে নিজের দিকে—তাকাও আমার দিকে। কতদিন আমাকে ভাল করে দেখনি।

—তুমি তো এখনও দারুণ সুন্দরী।

—সে তো অন্যরা বলে।...আজ আমার আসতে দেরি হয়েছে বলে রাগ করছে?

—না তো।

—ওরকম চূপ করে ছিলে। তোমার চোখে জল ছিল।

—আমার একা থাকতে ভাল লাগে না।

—ভয় করে?

—জানি না।

—আমার আসতে দেরি হল কেন, জান?

—কেন?

—বাজারে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হল। মাঠের কোণাকুনি যে সাপা রঙের বাড়িটা তালাবন্ধ পড়েছিল এতদিন, ওদের বাড়ি। আজ সকালে কলকাতা থেকে এসেছেন। জোর করে বাড়ি নিয়ে গেলেন।

—

—জান, ওরা খুব দুঃখী। চোদ্দ বছরের একমাত্র ছেলে। থ্যালাসেমিয়া। কলকাতায় বাড়ি। মাঝে মাঝে আসেন।

—ট্রিস্টেন্ট...?

—চিকিৎসা চলছে। মাঝে মাঝেই রক্ত বদলাতে হয়। কিছুদিন ভাল থাকে, আবার..., এইভাবে যদি চলবে।

—ও।

—ছেলেটাকে দেখলে মায়া হয়। টানা টানা বড় বড় চোখ, ধপধপে গানের রং। দেখলে বোকাই যায় না ভেতরে অতবড় অসুখ।

—ওপর থেকে দেখে সবসময় কি আর ভেতরের অসুখের আন্দাজ পাওয়া যায়?

—তোমার কথা ওঁরা খুব বলছিলেন। বাচ্চাটাও তোমাকে দেখতে চায়।

—আমাকে? কেন?

—বাহ, তুমি একজন নাম-করা শিল্পী। এত কাছে রয়েছে। আলাপ করতে চায়।

মুস্তকি ধামে না। আলো নিবিছে তাঁর পাশে শোয়। তারপরেও অনেক কথা বলে। শরীর দিয়েও। সে তার বাবতীয় অস্তিত্ব দিয়েই মানুষটার নৈশশয্যা

ভাঙতে চায়। ঘরে হালকা নীল আলো। সাদা মশারির ভেতর তার প্রচ্ছায়া। মৃত্তিকার পাতলা জলরঙের রাত পোশাকের বাহিরে তার নিরাভরণ দুটি ফর্সা হাত, পায়ের খানিকটা ফাঁকা অংশ, গলা বুক ও মুখের উন্মুক্ত জায়গাগুলিতে আলোকপাত, ছায়াপাত। তিনি আর মৃত্তিকা এখন দাম্পত্য নৈকট্যে। মৃত্তিকার শরীরের ওপর তাঁর দু-হাতের ভর। নিজে থেকে উন্মুক্ত করছে মৃত্তিকা। তাঁকেও। তিনিও চাইছিলেন নিজের শরীরের এই অসহ ভার মৃত্তিকার মধ্যে ভাগ করে দিয়ে কিছুটা হালকা হতে। মৃত্তিকার সহযোগিতার আশ্বাস তার গলায় ফুটে ওঠে বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই—পারবে, ঠিক পারবে। বিয়ের পর পর একটা রাতও চলত না আমাকে ছাড়া। মনে পড়ে না সেসব দিনের কথা?

—আমি তো এখনও চাই। আগের মতোই।

—দেখো, এত বছরেও আমার শরীর একটুও ভাঙেনি।

তিনি মৃত্তিকার নগ্ন শরীরে মুখ ডুবিয়ে রাখলেন। আর মনে মনে হিসেব কবতে লাগলেন, কিভাবে তাঁর শরীরের ওজন প্রথমে নিজের কোমরে সন্নিবদ্ধ করে তারপর দুই পায়ের ভেতর ছড়িয়ে দেবেন এবং ক্রমশ মৃত্তিকার ভেতর। এই সূক্ষ্ম হিসেবের ফাঁকে তাঁর সক্রিয় হতে চাওয়া দুই হাত কখন যেন মৃত্তিকার বকের ওপর থেকে আলগা হয়ে বুলে পড়ে দুপাশে। তিনি ভয় পাচ্ছেন। হাত দুটো যখন আর তাঁর বশে থাকছেই না, তখন বাকি শরীর...? এই ভয় থেকেই তিনি আবার স্থির হয়ে গেলেন। এগোতেও পারছেন না, পেছোতেও। কিন্তু, তিনি এই অনড় অবস্থাতেও আর থাকতে পারছেন না। তাঁর কোমরের ওপর সারা শরীরের ওজন পড়েছে বলে তার পা দুটো ভেঙে আসতে চাইছে।

মৃত্তিকার মনে এতক্ষণে একটা অভিমান তৈরি হয়েছে। তার তো শারীরিক গুণগোল নেই। সবকিছু ঠিকঠাক থাকতেও তার প্রতি কোনও উত্তেজনা বোধ করেন না কেন তিনি? দিনে দিনে তাঁর নিলিঙ্গি আর উদাসীনতা বেড়েছে। আর এখন তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যখন মৃত্তিকার হচ্ছেতেই মাঝে মাঝে এই ধরনের অসম্মান, পরাজয়, যত্নশা আর আত্মঘাতিকারের মুখোমুখি হওয়া।

শেষ বসন্তের হাওয়া আনন্দের পরদা উড়িয়ে দিচ্ছে বারবার। মৃত্তিকা তাঁকে নেমে যেতে সাহায্য করেছে। তাঁর আপাদমস্তক ব্যাধাহত শরীর এখন কেমন এলিয়ে পড়ে আছে। অথচ তাঁর তো কোনও প্রতিরোধ ছিল না। তিনি তাঁর গোটা, অকৃত, অভদ্র শরীরটা নিজে শুয়ে আছেন মৃত্তিকার পাশেই। তাঁর এতক্ষণকার যাবতীয় মেহনত এখন লজ্জা আর পরাজয়ের প্রানিমায় তাঁকে আপাতত এই শস্যার ভেতরেই প্রোথিত করে দিচ্ছে। আর

মৃত্তিকার আত্মিকার তার ভেতর থেকে উপচে উঠে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জলে।

তিনি অনেকবার জন্মনরত মৃত্তিকার কপালের ওপর তার দিনে দিনে রোগা হওয়া নীল শিরা ওঠা আঙুলগুলো রাখতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। সারা শরীর সিলে যে কথাটা বলতে চাইছিলেন এতক্ষণে তা মুখে বললেন—আমাকে ছেড়ে চলে যেও না, তুমি।

কিশোর একা থাকে, একটা ঘরে। সে খুব বেশি ভিড় পছন্দ করে না। আজ সন্ধ্যাবেলায় তার মায়ের নিমন্ত্রণে তাঁদের বাড়ি এসেছেন তিনি। মৃত্তিকার সঙ্গে। ভ্রমলোক ভ্রমমহিলার ছবির মতো সাআনো সংসারে হঠাৎ চৈত্রের অস্থির বাতাস ঢুকে পড়েছে। তা নাহলে আর পাঁচজন সুখী সম্পতির মতো তাদেরও থাকতে কোনও অসুবিধে ছিল না। কিশোরের নাম অনন্য। মা-বাবা ডাকেন অনু বলে। তার নাকি মাঝে মাঝে এমন বাড়াবাড়ি হয়, মনে হয় আজই, আজই শেষ সব। তারপর আবার খানিকটা ভাল থাকা। এভাবেই চলেছে ছ'বছর। তিনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলেন কিশোরের দিকে। এমনকি তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি অনন্তকাল তাকিয়ে থাকতে পারেন, এইভাবেই। ওই দুটি উজ্জ্বল চোখ, রোদওঠা ঝকঝকে সকালের চাইতেও স্বচ্ছ। ওই চোখেও কি ছায়া পড়ে? এত স্বচ্ছতা কি কোনও ছায়া ধরে রাখতে জানে, জানেন না তিনি? ওর ওই গ্রীক ভাস্কর্যের মতো তীক্ষ্ণ, বধ্যাযথ মুখমণ্ডল, অভিমাত্রী অথচ অহঙ্কারী চিবুকের ডোল, বৃষ্টিভেজা জুইফুলের মতো শরীরের স্নিগ্ধ সুষ্পাণ—একই সঙ্গে তাঁর ভেতর জেগে উঠছে স্পর্শ-গন্ধ-স্বাদ-শ্রবণের আকুল ইচ্ছে। তিনি যেন ওর রক্তপ্রবাহ, শরীরের অভ্যাস, শরীরের অচেনা অথচ অনিত্য আকুলতা অনুভব করতে পারছেন। এ থেকে তাঁর ভেতরে এতদিন পর এক বিরহ জন্ম নেয়। সেই বিরহ কি আশ্চর্য ভেতরের শিরা উপশিরা, খাঁজে খাঁজে ঢুকে থাকা ভরকে একটু একটু মুছে দিয়ে সঞ্চারিত হতে থাকে গভীরে—আরও গভীরে। কিশোর তার উৎসুক চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, ওর দু-চোখে কৌতূহলের ইশারা। এত কাছ থেকে এত বনিষ্ঠ নির্জনতায় তো কখনও দেখেনি কোনও শিল্পীকে! সে আবদার করে—তুমি আমাকে একটা ছবি একে দেবে?

—কি বলবে?

—ব্রহ্মে দেব আমার কাছে। যখন কিছু ভাল লাগবে না দেখব।

—কিসের ছবি চাই তোমার?

—যে কোনও ছবি। তুমি বা দেবে।

—দেব, তোমাকেই দেব।

—ঠিক দেবে?

—ঠিক।

ওই নিরালস্য বিরহ শুধু বুকে করে নয়, সারা শরীর জুড়ে বহন করে সেই যে নিজের ঘরে ঢুকলেন তিনি, সামনে ক্যানভাস, রং-তুলি আরও কত সরঞ্জাম। এখন তো তাঁর শরীরে শিঁদে তৃষ্ণা নেই। সর্বব্যাপী বিরহই তো এখন তাঁর সমস্ত অনুভবে ছড়িয়ে পড়েছে। বন্ধ দরজার বাইরে মুক্তিকার ডাক, তাই তাঁর কানে পৌঁছয় না। এই অনন্য গতি বিরহ থেকে তাঁর আর কোনও উদ্ধার নেই। তিনি এখন বিড়বিড় করে একটি বাক্যেরই পুনরাবর্তনে জড়িয়ে পড়ছেন—আ হর্স, মাই কিংডম ফর আ হর্স। তাঁর তুলিতে একটু একটু করে ফুটে উঠছে সেই দূরন্ত গতি অশ্বের আভাষ। অশ্বের দু’পায়ে ভাঁজগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। তার উদ্ধত গ্রীবায রঙের মসৃণতা। লেজটা দু’পায়ে মাঝখানে কোনও অবলম্বন ছাড়াই সোজা হয়ে ফুলে রয়েছে। লেজের প্রতিটি পৃথক লোমে হস্তদের গাঢ়তার তারতম্য। অস্পষ্ট চাঁদনিতে সেই ঘোড়া মাঠের পর মাঠ, অরণ্যের পর অরণ্য, বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি পার হয়ে হয়ে ছুটে যাবে। তার গতিতে যৌবনের ধাবমানতা। তার কোমরে ঐশ্বরিক দৃপ্ততা। তার দুই চোখে, তার সামান্য ঝাঁক হয়ে যাওয়া দুই ওষ্ঠে এক অলৌকিক জয়ের চিহ্ন।

এই বন্ধ ঘরে প্রহর কেটে যায়। তিনি খুব নিচুস্বরে নিজের সঙ্গে কথা বলেন। খুব ছোট ছোট বাক্যে। কখনও বাক্য শেষ হয় না। বাক্যের অসম্পূর্ণ অংশ মনের ভিতরেই বৃদ্ধ হলে ফেটে ছড়িয়ে মিলিয়ে যায়। তাঁর সারা শরীরের প্রতিটি রোমকূপের গোড়ায় গোড়ায় এখন বিটোফেন। সমস্ত পোশাক খুলে তিনি নিরাবরণ হলেন। আরশিতে নিজেকে দেখছেন। অপলক। উঠে দাঁড়ালেন। স্বস্তি, উন্নত, সাবলীল একটি পুরুষ শরীর। বাজনার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে শরীর জুড়ে। রক্তপ্রবাহ, হাড়, মজ্জা, কার্টিলেজ, চামড়া ভেদ করে তা তরঙ্গিত হচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে রোমে রোমে। স্তব্ধ হচ্ছেন তিনি। তিনি বিস্মিত হয়ে উঠছিলেন কি আশ্চর্য উপায়ে তার শরীর জোড়া নিরালস্য বিরহ এখন এই বাজনার পরশে পরশে মিলন হয়ে উঠছে ক্রমশ। তিনি বিস্মিত হয়ে উঠছিলেন কি অলৌকিক উপায়ে তাঁর এতদিনকার সম্যাস তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বিস্মিত হয়ে উঠছিলেন, কি আশ্চর্য উপায়ে কি অপার্থিব আনন্দে তাঁর, এতদিনকার নিম্নিত পৌরুষ আজ জেগে উঠেছে। তাঁর স্বগতোক্তি এই মুহূর্তে আলাপচারিতা হয়ে উঠল। সংলাপ। নিজের

শরীরের সঙ্গে নিজের। নিজের মনের সঙ্গে নিজের। নিজের শরীর থেকে বেরিয়ে শরীরের। নিজের মন থেকে বেরিয়ে মনের। তাঁর এতদিনকার বিরহ কেমন বিবাহ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। তিনি তাঁর পুরুষকে হাত বোলাচ্ছেন। ওই ধাবমান অশ্বের গতি কি তাতে সঞ্চারিত হল আজ এতদিন পর? তাই অমন দৃষ্ট, বলীয়ান? এখন এই ঘরে ক্রমশ পাহাড়ের মতো ফুলে ওঠা সেই গর্জন। তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাতের দ্রুত থেকে দ্রুততর ওঠানামা। ঝালা।

উৎসবের আলপনায় তাঁর আপাত অভিযান শেষ হয়। তাঁর হাতে আবার রং, আবার তুলি। আরও একটু হলুদ মেশাতে হবে। অশ্বের শরীর হবে আরও হরিদ্রাবর্ণ। তিনি এখন এই ঘরে বসেই দোলপূর্ণিমার শরীর থেকে খানিকটা হলুদ তুলিতে মাখিয়ে নিতে পারেন। তিনি এখন এই ঘরে বসেই বাইরের বাতাস থেকে খানিকটা তুলে এনে অশ্বের খুরে মিশিয়ে দিতে পারেন। তারপর সেই অশ্বের সওয়ার হয়েই পৌঁছে যেতে পারেন ওই মুমূর্ষু কিশোরের কাছে। অনন্য যার নাম। আজ তিনি এবং তাঁর সৃষ্টি তো পূর্ণতর অলৌকিক হয়ে উঠতে পারে। উঠতেই পারে।

মৃত্তিকা দরজায় করাঘাত করছেন। অস্থির, করাঘাত। উত্তীর্ণ কঠম্বর।—
দরজা খোলো। শুনছ? দুদিন কিছু খাওনি। শুনছ বাইরে এসো।

তিনি তো তখন ফাইনাল টাচ দিচ্ছেন। নইলে ওই অশ্ব তাঁকে সওয়ারী নেবে কেন? তিনি যে অনন্যকে কথা দিয়েছেন। আ হর্স, মাই কিংডম ফর আ হর্স। ট্রোজান হর্স এখন স্বভাব বদলেছে। তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি শেষ হয়েছে। সে এখন বিশ্বাসহীনতা নয়, বিশ্বাস্যও নয়। সে এক নিরন্তর আলোকধারা।

আবার করাঘাত। আরও উদ্ভল, অস্থির। বিপন্ন কঠম্বর মৃত্তিকার—শুনছ, অনুর খুব বাড়াবাড়ি। ডাক্তার এসে ফিরে গেছেন। তুমি কথা দিয়েছিলে। ওঁরা ভীষণ কান্নাকাটি করছে। শুনতে পাচ্ছ না তুমি? একবার চলো। বেরিয়ে এসো, প্রিয়।

এক নিতান্ত তুচ্ছ ভঙ্গিমায় দরজা খোলেন তিনি। প্রশান্ত পুরুষ। অসামান্য আলোক পুরুষ। এক অপার্থিব আলোক-বলর তাঁর চারপাশে। সেই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত তাঁর চোখ মুখ।

—কি হল, এত কোলাহল কিসের?

মৃত্তিকা উত্তর দিতে পারে না। তাঁর চোখের সামনে চন্দ্রালোকে প্রান্তর ঘরে ছুটে চলা অশ্ব। একি, অশ্বের শরীরে এ কার মুখ?

—এ কার মুখ বলিয়েছ তুমি?

—মনোময়াঃ ধাণশরীরনেতা প্রাতিষ্ঠিতোদ্রে

হৃদয়ং সমিধায়।

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপাশ্যন্তি ধীরা

সানন্দরূপমশ্বতম যদ্বিভাতি।।

—এতো অনুর মুখ।

এখন মধ্যরাত। এই সময় দেবতা আর নিসর্গের চোখের জ্বল মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। অনন্যদের বাড়ির কান্নার আওয়াজ ক্রমশ নিকট হচ্ছে। নিকটতর....। তিনি হাঁটছেন। তাঁর সঙ্গে অশ্ব। কোনও সেতু ছাড়া তো অনন্তের কাছে পৌছনো যায় না। কারও না কারও ভেতর দিয়েই তো অনন্তের কাছে পৌছতে হয়, কারও না কারও ভেতর দিয়ে পথ খুঁজে পেয়েছেন বলেই তো নীরবতা, সংলাপ হয়ে উঠেছে, বিরহ বিবাহ হয়ে উঠেছে, অন্ধকারের নির্বাসন থেকে মুক্তি ঘটেছে প্রসারিত আলোকনগরে।

তিনি অনন্যর ভেতর দিয়ে পৌছলেন।

কবির লড়াই

সোহরাব হোসেন

রূপকথার এক দেশ ছিল। সে দেশের নাম রসনগরী। রসনগরী রাজ্যের রাজার নাম ছিল খুবই কোমল—স্বপ্নপ্রসন্ন। রাজা বড়ই মহানুভব মানুষ বড়ই সদাশয় ব্যক্তি। নিজে সুখে থাকেন। প্রজাদের সুখে রাখেন। রাজ্যের সর্বত্র তাই তাঁর নামে ধন্য ধন্য রব ওঠে। শুধু তাই নয় রাজা সান্ত্বিত্য সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ। বিশেষ করে কাব্য-সাহিত্যের উপর তাঁর অতীব ঝোঁক। তাই সভাকবি সদাসর্বদা তাঁর হাতের কাছে থাকেন। থাকেন আর দেখেন। তিনি দেখেন। তাঁর চোখ দিয়ে রাজাকে দেখান। থুড়ি রাজার চোখ দিয়ে তিনি দেখেন। তিনি দেখেন আর সেই দৃশ্যমান বস্তু কিম্বা জীবকে মনের রসে ভেজে নেন। নিয়ে সুললিত সুরে স্বাক্ষরে রাজাকে শোনান। সভাকবি রাজার বড় প্রিয়। রাজা হয়তো তাঁর খাস বাগানের ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে শেষ বিকেলের দুখে-আলতা আলো মাখতে মাখতে উড়ে যাওয়া পাখির দিকে অপনক তাকিয়ে আছেন। তা দেখে রাজকবি তৎক্ষণাৎ পাঁচালি বেঁধে ফেলেন :

রাজা মনী রাজাশুণী রাজা দেখেন বলাকা।

নাই জীব রসরাজ্যে পিছনে দেয় শলাকা।।

সেই চেষ্টা যে পাপিষ্ঠ করিবার চায়।

রাজকুমা তাহারে হালুম করে খায়।।

কবির কাব্য শুনে রাজা তুষ্ট হন। স্মিত হাসেন। রাজকবির আসন দিনকে দিন পাকা হতে থাকে। কবির পাঁচালি-রসে রাজা যতই মজে যেতে থাকেন ততই রাজকবির মাথায় চিন্তা বাড়তে থাকে। পাঁচালি লিখে, রাজকুমার স্বরূপ লিখে রাজকবি তার বাস্তব রূপ ভাবতে গিয়েই মাথায় বাড়ি খান—সত্যিই যদি রাজকুমা আগে কখনো, তবে হালুম করেই তার নিবৃদ্ধি ঘটবে, বাপ বলে কাঁদারও সময় থাকবে না। রাজকবি ভাবেন। তাঁর মন খারাপ হয়। কিন্তু পরক্ষণেই এই ভেবে স্বস্তি পান যে—তাঁর আসন তো পাকা। রাজকুমা তাঁর দিকে শাহিবে কেন?

কিন্তু তাইই হল। রাজকবির পাকা আসন একদিন টলে উঠল। রাজকুমা একদিন প্রবল বেগে ধেয়ে এল। রাজা স্বপ্নপ্রসন্ন খোষণা করে দিগেন—‘পরীক্ষা হবে রাজকবির। হবে কবির লড়াই।’ রাজ্য দরবারে এক বুঝক কবির আবির্ভাব ঘটছে। অপরূপ তার চেহারা। অনিন্দ্য তার রূপ। তার ওপর তার পাঁচালি নাকি একেবারে গরম জ্বলাপি। রাজা তাই দিন ফেলছেন—

‘বেশ হোক পরীক্ষা, হোক লড়াই। আগামী পূর্ণিমার শুভলগ্নে শুরু হোক লড়াই সারারাত্রি ব্যাপী। হ্যাঁ, রাত্রি ব্যাপী বসবে কবির লড়াইয়ের আসর।’

রাজ-নির্দেশ সমগ্র রসরাজ্যে চলিয়া করে দেওয়া হল। প্রজাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হল সে-লড়াই উপভোগ করার জন্য। প্রজাদের মধ্যেও শুরু হয়ে গেছে শুধু—‘তবে কি এবার ইদ্রপতন হবে? সম্মানের লড়াইতে নেমে ল্যাজে-গোবরে হয়ে যাবেন রাজকবি?’ প্রজারা সোৎসাহে লড়াইয়ের দিন শুণতে লাগল।

দুই

কবির লড়াই শোনার আগে, পাঠক, রাজকবির ওপর রাজরোষ পড়ার গুট কারণটি একবার ছেনে নেওয়া জরুরী। ব্যাপার কী? না ব্যাপার হল—একদিন মধ্যরাত্রে নগর ভ্রমণে বেরিয়ে রাজা স্বপ্নপ্রসন্ন দুই যুবক-যুবতীর কোমল-মধুর কৌতুকলাপ শ্রবণ করেছিলেন। বড় মিষ্ট তাদের কথা। সুমধুর তানে-গানে যেন বাজছে তাদের স্বর। রাজা তাদের গৃহপার্শ্বে দাঁড়ালেন। স্বপ্ন উন্মোচিত গবাক্ষপথে দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন যুবক-যুবতী সুচারু পেয়ালায় কোনো মায়া-মেদুর তরল চুমুকে-চুমুকে পান করছে। দেখে রাজা প্রশ্ন রাখলেন—ওরা কি সুরা পান করছে কবি?

—না মহারাজ। সুরাপানে তো অমন মধুর আলাপ আসে না।

—তবে ওরা কী পান করছে?

—পেপসি-কোক।

—মানে? সেটা কী জিনিস?

ও পান করলে কামনা বাড়ে মহারাজ। পৃথিবী রঙিন মনে হয়। স্বর সুমধুর হয়। নারী-পুরুষের মধ্যকার ঘনত্ব বাড়ে।

—আজকালকার ছেলেমেয়েরা বুঝি এই মহাপানীয় খুবই ভক্তিসহকারে পান করে?

—হ্যাঁ মহারাজ। এতো আপনারই মহাকীর্তি মহারাজ!

—মানে?

—আপনি ‘ভুলে গেছেন মহারাজ, পশ্চিম দেশ থেকে আপনিই এই মহাপানীয় প্রজাদের জন্য আনিয়েছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ মহারাজ। দেশীয় লেবু-গুড়-জলের মধ্যে স্মার্টনেস আসে না বলে আপনি স্বয়ং পেপসি-কোকের পূজা করেছেন। প্রথমে প্রথমে দেশের সাধারণ প্রজারা এই মহাপানীয় খাচ্ছিল না বলে আমি বিজ্ঞাপন বেঁধে দিলাম জম্পেশ করে? সেই যে:

আনিয়াছেন মহারাজা টুড়ে স্বর্গলোক।

লাবণ্য ঝরিবে দেহে খেলে পেপসি-কোক।।

—হ্যাঁ হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে। তোমার ঐ শোলক দেশে রাষ্ট্র হবামাত্রই হিট। রাজারা দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পেপসি-কোকের ওপর ছমড়ি খেয়ে পড়ল। রাজভাণ্ডার দুদিনেই ফুলে ফেঁপে ঢোল হল। সব হল তোমার ঐ শোলকের গুণেই ঐ ঘটনার পরই আমি তোমাকে বাণিজ্যবর্ম দাস উপাধিতে ভূষিত করেছিলাম। তাহি তো?

—হ্যাঁ মহারাজ। পেপসি-কোকের অনন্ত গুণ।

—সে তো এই যুবক-যুবতীকে দেখেই বুঝতে পারছি। দেখ ওরা কেমন মদির রয়েছে।

আর...!

—আর কী মহারাজ?

—আর ঐ মদিরার রেশ ধরে কেমন একদেহ-এক আত্মা হয়ে পড়ছে। ওদের কণ্ঠ কেমন মধু ঝরাচ্ছে। আচ্ছা কবি, ওরা কীসের মধুর আলাপনে মগ্ন?

—মহারাজ এ প্রেমালাপ। পৃথিবীর সব থেকে বিস্ময়কর মধুর আলাপন এটি। কান খুলে শুনুন মহারাজ। ভাল লাগবে। মিঠে লাগবে। এমন আলাপনে জাতির স্বাভ্য বাড়ে মহারাজ।

—অতি উত্তম কথা শোনালে বাণিজ্যবর্ম। তোমার কথা শুনে আমি তুষ্ট। ঐ প্রেমালাপন আমার মনে রসের সৌতা বইয়ে দিয়েছে। এবার থেকে সপ্তাহান্তে একটা করে নিত্যনতুন প্রেমকাহিনী তুমি আমাকে শোনাবে।

—তাই হবে মহারাজ।

অতঃপর রাজা এবং রাজকবি নগরের কেন্দ্রাভিমুখে হাঁটতে শুরু করলেন।

বেশ ভালমিলেই চলছিল রাজা স্বপ্নপ্রসঙ্গের দিন। চলছেও। সপ্তাহ ধরে তিনি অপেক্ষায় থাকেন সভাকবির মুখ থেকে তরতাজা প্রেমকথা শোনার জন্য। প্রেমকথায় মধু থাকে। মদ থাকে। মোহ থাকে। মহারাজা সেই মদ-মধু-মোহের ত্রিবেণী সঙ্গমে ভেসে যেতে চান। বাণিজ্যবর্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। রাজা কখনো তুষ্ট হন কখনো না। আসলে রাজার মন বৈচিত্র্য চায়। নানা ধাঁচের কাহিনী না হলে রাজার মন ভরে না। মদ-মধু-মোহের মৌতাতরস জমে না। মহারাজ তাহি বিরক্ত হন মাঝে মাঝে।

তাই বাণিজ্যবর্মের হয়েছে বিপদ। তিনি চেষ্টা করেন কাহিনীতে বৈচিত্র্য আনতে। সপ্তাহ ধরে ভাবেন, কবে শোলক রচনা করেন। রাজা কথিত মদ-মধু-মোহের জারক রসে কাহিনীকে সাঁখলে দেন তেলকই রামার মতন। কিন্তু

তাতেও শেষ রক্ষা হয় না। তাঁর সব কাহিনীই এক ধাঁচের হয়ে যায়। আর তাতেই রাজা রুষ্ট হন। বলেন :

—হল না কবি। তোমার শোলকে মদ কই?

—কেন এই তো মদ দু'ছটাক মিশিয়েছি মহারাজ—এই যে, যে জ্বালগায় রূপকুমারী ও রূপনাথ পরস্পরের কাছে এসেছে। আর একবার শুনুন মহারাজ :

অথরে-অথরে দ্যাখো হয় মহাকেলি।

স্তব্ধ মুখোমুখি থাকে নয়ন মেলি।।

—হল না হল না বাণিজ্যবর্ম। এ মদে মধু বা মোহ কোনো কিছুই তুমি ঠিক মতো মেশাতে পারোনি। জমছে না।

—আমি চেষ্টা করছি মহারাজ।

রাজকবি বাণিজ্যবর্ম মাথা নত করে ভাবতে থাকেন। ভাবেন। ভেবে ভেবে বুঝতে পারেন

—প্রেমিকা নারীর দেহজ সৌন্দর্যের বিস্তারিত বর্ণনা শুনতে না পেলে মহারাজের মন খারাপ হয়ে যায়। সেই আন্দাজে রাজকবি প্রস্তাব রাখেন :

—মদ-মধু-মোহের বর্ণনা কি নারীকেন্দ্রিক করব মহারাজ?

—হ্যাঁ। আলবাৎ করো। বলো আরো রসিয়ে বলো। নায়িকার গীবার বক্ষিম রেখা ও বক্ষবন্ধনের খাদ-নদীর বর্ণনা আরো সরস করো।

—তাই তো করেছি মহারাজ। মনে করে দেখুন নায়িকার দেহকে, গলাকে, বক্ষকে তো আমি জীবকুলের সঙ্গে এমনকী আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে উপমিত করে বর্ণনা করেছি মহারাজ, ফের শুনুন :

গীবায় দুরন্ত বাঁক সারস পাখির গলা।

তারি নিচে শুয়ে আছে বন্দুক দুই নলা।।

—সব ঠিক আছে কবি। এ তোমার উৎকৃষ্ট কাব্য হতে পারে। কিন্তু এতে তো আমার মন ভরছে না। মনের মদ-মধু-মোহ জাগছে না।

—আমি নতুন কাহিনীতে সেই চেষ্টা করবো মহারাজ।

—তাই করো। প্রত্যহ একই নায়িকার বর্ণনা শুনে কান পচে যাচ্ছে। পান্টও, ধাঁচ পান্টও কবি। খোঁজো। খুঁজে বের করো নতুন আর জ্যাজ্জ-দেহ-কায়া। বলে রাজা রানীমহলের দিকে চলে যান। বিরক্তি নিয়ে। তাকিল্যভরে। বাণিজ্যবর্ম স্পষ্ট শুনতে পান, টাল খাচ্ছে রাজার মন। টাল খাচ্ছে তাঁর আসনও।

বিরস বদলে মহারাজ চলে যেতেই সভাকবির অন্তরে আঘাত লাগল। না আঘাত নয়, বহ্লাঘাত। এমনটা কোনোদিন কোনোকালে হয়নি। তাঁর

শোলক শুনে মন-খারাপ রাজার মন ভালো হয়ে যেত। অথচ আজ সরস রাজার মন বিরস হল। কেন হল? 'কেন এমন হল?'—চিন্তায় পড়েন সভাকবি বাণিজ্যবর্ম দাস। ভাবেন। আকাশ-পাতাল ভাবেন। ভেবে সিদ্ধান্তে আসেন—'মহারাজ নিশ্চয়ই দেহ চাইছেন। প্রেমকাহিনীর ছলায় ধারালো ব্রেডের মতো নারী দেহবর্ণনা চাইছেন।

রাজ-বিরক্তির কারণ নির্ণয় করে মনে মনে খানিকটা হালকা হলেন কবি। মনে মনে উচ্চারণ করলেন—'বুড়ো বয়সে আপনার ভীমরতি ধরেছে মহারাজ। তা সরাসরিই আমাকে বলতে পারতেন। এত ভণিতার কী দরকার ছিল? হবে। দেব-দেব। নারীদেহের, নগ্ন নারীদেহের রসালো বর্ণনাই এবার আপনাকে দেব আমি।' পায়ের তলায় অজ্ঞানিত সুড়সুড়ি লাগার মতো পিঁপিলি হাসি জেগে ওঠে সভাকবির সারামুখে। তাতে মিশে আছে স্বস্তির রেণু। কিন্তু এ স্বস্তিও বেশিক্ষণ থাকল না। উলকো মাছের ভুড়কি কাটার মতো মিলিয়ে গেল। পরিবর্তে রাজকবির মাথায় ঘাই মারল সাক্ষাৎ দৃষ্টিস্তা—'নগ্ন নারীর মডেল আমি কোথায় পাবো?' কবি আবার দৃষ্টিস্তায় ডুবে গেলেন। তার মুখে আঁধার নেমে এল। মনে পড়ে গেল তার নিজ-রচিত শোলকের কথা—'নারীক্ষুধা যদি দেখ রাজদেহে বাড়ে / নিবৃষ্টি না হলে রাজা কাহারো না ছাড়ে।' তবে? এ বচন তো মিথ্যা হবার নয়। তবে? রাজকবি চক্ষু বুজে নারীদেহ ভজতে থাকেন।

কবিকে শুম মেয়ে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে আসে কবি-পত্নী। এসে মোহময় তাকায়—কী হয়েছে তোমার?

—কই নাতো কিছু হয়নি—সমস্যাটাকে নিজের পেটের মধ্যে চালান করতে চান বাণিজ্যবর্ম।

—আমার চোখ ঝাঁকি দেওয়া যায় না কবি। তুমি তোমার কল্পনা দিয়ে রাজাকে ভোলাও, আর আমি আমার দেহ দিয়ে, রূপ দিয়ে তোমাকে ভোলাই যে। তুমি বড় উদাসীন আছ। কেন?

—কী বললে? তুমি তোমার দেহ দিয়ে আমাকে ভোলাও? সত্যি?—রাজকবি দ্বীর কথায় যেন দারুচিনি দীপ দেখতে পাচ্ছেন।

—সত্যি নাতো কী? তুমি তো দু'চোখ মেলে আমাকে দেখাই ছেড়ে দিয়েছো আজকাল। একবার তাকাও আমার দিকে।

বাণিজ্যবর্ম তাকালেন। দু'চোখ মেলেই। পূর্ণরূপে। যেন কিন্নকের দু'পালা খুলে গেল। কী যে যাদু ছিল সে দেখাতে, সভাকবির মুখে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। তিনি দ্বীর দিকে অনিমেষ নজরে দেখতে দেখতে বললেন—পেরেছি, আমি পেরেছি। আজ আমি তোমার সৌন্দর্যকে, তোমাকে পূর্ণরূপে দেখবো।

—মানে?—কবিপত্নী অবাক জিজ্ঞাসা রাখল।

—মানে জানতে চাও? শোনো—‘নারীদেহ রাম জানে জানে কত শলা।
/ দেহখ্যানে স্বর্গলাভ জিনি ষোলকলা। / নারীদেহ স্বর্গরাজ্য নারীদেহ ফলা।
/ দেহবাঁধে মহাজ্ঞানীর থামে পথ চলা।।’ বুঝছো?

—না! বুঝিয়ে বলো।

—আমি তোমাকে দেখবো। পূর্ণরূপে।

—এতদিন পর?

—হ্যাঁ!

—কেন?

—দরকার আছে?

কী দরকার, তার কিছুই কবিপত্নী বুঝল না। শুধু সেদিন রাতে তার দেহের উন্মোচনে কবির আগ্রহ দেখে সে খানিকটা বিস্মিত হল।

পরদিন সকালে রাজকবি বাণিজ্যবর্ম দাস নাচতে নাচতে রাজদরবারে গেলেন। সোজা রাজ্যসনের কাছে গিয়ে আর্জি পেশ করলেন—‘আজ আমি বিশ্বাসী মহারাজ। আজ শোলক পড়ে আমি আপনাকে তৃপ্ত করতে পারবো।’

—তাই নাকি হে কবি? বলি রসের ভিয়েন ঠিক ঠিক পাক দিয়েছো তো?

—হ্যাঁ মহারাজ!

—তবে শোনাও।

রাজকবি তার আসনে বসলেন জম্পেশ করে। আশপাশে তাকালেন। সভা আজ কানায় কানায় পূর্ণ। সবাই তার দিকে তাকিয়ে। বাণিজ্যবর্ম গতরাতে দেখা নারীদেহের বর্ণনা শুরু করলেন :

নারীদেহ রঙ্গ জানে জানে কত শলা।

দেহ খ্যানে স্বর্গলাভ জিনি ষোলকলা।।

নারীদেহ স্বর্গরাজ্য নারীদেহ ফলা।

দেহবাঁধে মহাজ্ঞানীর থামে পথচলা।।

হেননারী ছিল এক রসময় পুরে।

দেহ তার গান গায় চাতকের সুরে।।

তৃপ্ত সে নারীদেহ চলিয়াছে আশুড়ি।

বসন পিঙ্কিছে যেন কলাগাছের বাশুড়ি।।

হাঁটে নারী ফরফরফর অতি বড় ভাউ।

দুই উরু পাকিয়াছে গাছের জোড়া লাউ।।

বক্ষপূরের ডারে তাহার দায় পথ চলা।
আকৃতি ধরেছে যেন বড় বেউলো কলা।।

চক্ষেতে ধরেন নারী কামনার কুপ।
যৌবন পুড়িছে নিতি সুগন্ধী সে ধূপ।।

রাজকবি মনের আনন্দে আদি রসায়ক নাট্যিকার বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। তিনি অতি-নিশ্চিত ছিলেন যে এ শোলক রাজার না-পছন্দ হবে না। কিন্তু এতেও মন উঠল না রাজার। রাজক্ষুধা কি অত সহজে মেটে? মেটে না। রাজা হুকার দিয়ে উঠলেন—থাক কবি থাক। এ কী শোনাচ্ছে তুমি? এতো শ্রোতা নারীর রূপ। রাজদরবার কি বুড়োতে ভরে গেছে নাকি? এ শোলকে মধু করছে কই? মদ-মোহও বা কই? তোমার কবি-প্রতিভা দেখছি বিলুপ্তির পথে।

—কী বলছেন আপনি মহারাজ?—রাজ কবি তর্ক তোলেন।

—ঠিক বলছি কবি। তুমি ফুরিয়ে যাচ্ছ। রাজপদ তুমি ছেড়ে দাও হে। আমি নতুন কবিকে রাজকবি রূপে অভিষিক্ত করবো।

—কিন্তু মহারাজ—বাণিজ্যবর্ম কিছু একটা বলতে চাইলেন।

—না তোমার উপর অবিচার করবো না। পরীক্ষা হবে তোমাদের। কবির লড়াই। যে জিতবে সেই বসবে রাজকবির পদে।

বলে রাজা অন্যত্র চলে গেলেন। আর দরবারে উঠল শুঙ্কন। তবে কী রাজকবির দিন শেষ? শুঙ্কন সারা রাজ্যে হুড়িয়ে পড়ল। সবাই অপেক্ষা করতে লাগল আসন্ন পূর্ণিমা লগ্নের। ও দিন লড়াই হবে। মহা লড়াই।

তিন

রাজকবি বাণিজ্যবর্মের দিন এখন বড়ই দুঃখে কাটছে। তার চোখের ঘুম উঠে গেছে। একদিন তিনি শুধু মাথার চুল ছিঁড়ছেন। গত সন্ধ্যায় রাজামশাই একপ্রকারে তার মুখে আচ্ছা করে চুনকালি লেপে দিয়েছেন। অপমান বলে অপমান। এমন অপমান এ কবি-জীবনে কখনই হতে হয়নি। রাজা একপ্রকারে তাকে জবাবই দিয়ে দিয়েছেন। রাজ-বাণিক্যর আভ্যন্তর অর্থ বড় ভয়ঙ্কর। রাজকবির পদ গেলে তার এতদিনকার মানবশ সব সব মুহুর্তে ভেঙ্গে যাবে। সেই সঙ্গে পড়বে পেটে টান। দুঃস্বপ্নী বিপদ শীঘ্রের করাণ্ডের মতোই রাজকবিকে কুরতে লাগল। সে সময় তার পত্নী এসে তার সামনে দাঁড়াল। পত্নীর উদ্বেগের সঙ্গে বলল :

—এখন কী হবে নাথ। যদি রাজকবির পদটা যায় তবে তো না খেয়ে মরতে হবে আমাদের। কিছু একটা উপায় ভাবো স্ত্রী করে।

—উপায় আমার ভাবা আছে।

—কী উপায়?

—যুবতীর রূপ চাই। যৌবনবতী মদালসা যুবতীর রূপ চাই আমার।
এ-অস্ত্রে রাজা ঝায়েল হবে। নতুন কবি হবে হেরে ভূত।

—মানে?

—মানে খুব সোজা শ্রিয়ে। যুবতীরূপের মাদক শোলকে শোলকে মিশিয়ে
রাজাকে পরিবেশন করতে হবে। কিন্তু কোথায় পাই বলোতো? সেই কতকাল
আগে আমরা যুবক ছিলাম। যৌবনের তেজে তখন কত রসালো শোলকই
না বুনে তুলেছি। সেসব শোলকের মৌতাত পান করে করে রাজার মন
থেকে কাব্যরসদৃষ্টি একেবারে উবে গেছে। এখন কাব্যরস নয় তার যৌবরস
চাই। এ আমার খোঁড়া কবর বুঝলে—আমার খোঁড়া কবর। মহাবিপদ। যদি
হেরে যাই!

—কেন বিপদ কেন? তেমন শোলক ফের বাঁধো।—কবিপত্নী কবির
মাথায় হাত রাখে।

—বাঁধো বললেই বাঁধা যায় না শ্রিয়ে। এখন এই জরা বয়সে কী যুবতীর
রূপ ধরতে পারি আমি? দেখন যত্নে মরিচা পড়েছে। এখন সামনে মডেল
না হলে ওসব রসের ভিয়েন জমাতে পারি না যে।—কবি ফের চিন্তার
আঁধারে তলিয়ে যেতে থাকেন।

—তা'লে কী উপায় হবে নাথ? লড়াইয়ের দিন তো এসে গেল বলে।

পত্নীর কথা কখনো উত্তর রাজকবি দেন না। তিনি চিন্তা করেন। মাথার
চুল ছেঁড়েন। আপন মনে নানা ছাঁদের শোলক আওড়ান। ফের সে শোলক
কেটে দেন। নতুন করে শোলকের ভিয়েন করেন। অস্থির পায়চারী করেন।
নিজমনে রূপ হাতড়ে বেড়ান। যুবতী রূপ। মনে মনে সঙ্কল্প করেন—‘জয়ী
আমি হবই। ওহে আমার নবীন প্রতিদ্বন্দ্বী যুবক বাঁধো। আমার শোলকের
চাবুকে তোমাকে খুবলে খাব। সাবধান!’ পরক্ষণেই পরাজয়ের দৃশ্য কল্পনা
করে হতাশ হয়ে পড়েন—হার মানে মৃত্যু। পদ যাবে। যশ যাবে। রুটি-
রুজির পথ বন্ধ হবে।

ভাবতে ভাবতে দিন যায়। লড়াইয়ের দিন এসে হাজির হয়। যে সূর্য
খালস করেছে দিনের ভোর তার অস্ত্রে যাত্রার পর কী সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে—
তার হিসাবেই মশগুল থাকেন কবি। ঘেন ঘোরের মধ্যে রয়েছেন। বেলা
বাড়ছে। কবির বুকে দুরমুশ পেটার শুবগাব শব্দ। তাছাড়া ডিম্ব কোনো
শব্দ নেই। দুনিয়া স্তব্ধ। হঠাৎ কোথা থেকে এক যুবতী নারীর আহ্বাদমাখা
গীত শোনা গেল। মধুর। মায়াময়। মদের মৌতাতে ভরপুর। সে গীত শুনে
চমকিত হল কবি ও কবিপত্নী। কবি তার পত্নীর দিকে নীরব দ্বিজ্ঞাসা

রাখলেন—‘এ অপূর্বমধুর গীতের উৎস কী?’ কবিপত্নী প্রথমে কোনো উত্তর দিল না। মুহূর্তকাল নীরবে কাটল। তারপর সে বলল :

—আমাদের কন্যা চানঘরে গুপগুপিয়ে গান করছে নাথ।

—ওহ!—কবি ছোট্ট শব্দ করলেন।

—আমরা বেঁচে গেছি নাথ!—কবিপত্নী এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—কুমারী ঋতুকায়ী রান করছে। বড় সুন্দরী সে। মোহময়ী। তুমি যাও দরজার দ্বিধ দিয়ে তাকে অবলোকন কর। সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা। রাজকুমারের বাগদত্তা সে। ...তুমি তো যুবতী রূপ চাইছিলে!

—না। এ হয় না।—পত্নীর কথায় কেঁপে ওঠেন বাণিজ্যবর্ম। প্রতিবাদ করে ওঠেন হিন্দু—তুমি বলছো কী? পিতা হয়ে চুরি করে আমি কন্যার ঘোঁরন দেখবো?

—হ্যাঁ দেখবে। দেখে শোলক বানাবে। লড়াই করবে।

—এ হয় না। পৃথিবী কি রসাতলে গেছে?

—তাতে দোষ কী? লড়াই জিততে হলে কত কী করতে হয় নাথ! তুমি যাও। নইলে আমরাই যে অতলে তলিয়ে যাব।

বাণিজ্যবর্ম কিছু সময় শুন্ম মেরে থাকেন। ভাবেন। যত ভাবেন, প্রতিবাদের পারদ ততই নামতে থাকে। ধীরে ধীরে। তারপর অতি সন্তর্পণে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। চানঘরের দরজার দ্বিধে চোখ রাখেন। ভিতরে তখন সম্পূর্ণ নিরাবরণ কুমারী। রাজবাড়ি থেকে আসা পেপসি-কোকের পেরালায় চুমুক দিচ্ছে মৌজ করে।

সন্ধ্যার রাজসভা জমজমাট। রাজা-উজির, পাত্রমিত্রসহ দরবার কানায় কানায় পূর্ণ। এখন হবে কবির লড়াই। নতুন কবি ও রাজকবি মুখোমুখি দুই আসনে বসেছেন। সূর্য অস্তাচলে গেলে পূর্ণ পূর্ণিমার শুভ লগ্নে রাজা ঘোষণা করলেন—‘বেশ, সব প্রস্তুত। এবার শুরু হোক মহা লড়াই! আমি, মহামন্ত্রী আর মহাসেনাপতি এই লড়াইয়ের বিচারক। আমরা বিষয় বলে দেব। দুই কবিকে সেই বিষয়ে শোলক বাঁধতে হবে। প্রথম বিষয় হল—রাজা ও রাজ্য। প্রথম নতুন কবি শোলক বাঁধো।’

ঘোষণা সেরে মহারাজ মসনদে বসলেন। সভার চোখ তখন নতুন কবির ওপর। নতুন কবি উঠে দাঁড়ালেন। কিছু সময় মৌন থাকলেন। তারপর উচ্চস্বরে শোলক পড়লেন :

আমাদের রসরাজ্যের মহাশুণী রাজা।

আজ্ঞাপর না দেখিয়া পানীরে দেন সাজা।।

রাজা তাই পুণ্য-মতি রাজা বড় ধনী।

রাজাকে প্রশমি তাই ভগবান মানী।।

নতুন কবি শোলক শেষ করে বসে পড়ামাত্রই রাজ দরবার সাধু সাধু ধ্বনিতে মুখর হল। বিচারকদের মুখে খুশির হাসি।

এবার বাণিজ্যবর্মের পালা। তিনি উঠে দাঁড়াতেই সভা নীরব হল। নতুন কবি রাজবন্দনায় রাজাকে ন্যায়বান ভগবান বলেছেন। বাণিজ্যবর্ম কী বন্দনায় যাত্রা করেন তা নিয়ে এখন কৌতূহল। রাজা আহ্বান জানালেন—‘বাণিজ্যবর্ম শোলক পড়’। বাণিজ্যবর্ম একে একে সবাইকে দেখেন। একটু ভাবেন। তারপর আবেগদীপ্ত স্বরে তাঁর শোলক পড়েন :

ধরাধামের রসনার তার রসপিয়াসী রাজা।

রসেতে টইটুখুর যেন পাকা কাঁঠাল খাচ্ছা।।

জরা না প্রবেশে রাজ্যে সব রূপে তরতাজা।

নরনারীর দেহে আছে মৌতাতের গাঁজা।।

শোলক পড়া শেষ হতেই রাজদরবার করতালিতে কেঁপে উঠল। সভাসদদের একাংশ আওয়াজ তুলল—‘একদম রসে রসে রসসাগর। আহা কী শোলক। কী কাব্যি—রাঁজা মোদের খাচ্ছা কাঁঠাল। আর প্রজার দেহ খাঁজা। জিও! জিও!’ রাজাসহ মন্ত্রী-সেনাপতি একদম হাসিতে গাড়িয়ে পড়লেন। দরবারের কলরোল শান হলে রাজা ফের ঘোষণা করলেন—‘এবার বিষয়—দেশের যুবসমাজ। নতুন কবি তৈরি হও।’

রাজাদেশ পাওয়ামাত্র নতুন কবি উঠে দাঁড়ালেন। তার চোখে মুখে রক্ত খেলে গেল। রাজকবি এতটা ঠাঁড়ামিতে যাবেন তিনি আন্দাজ করতে পারেননি। এবার তাই মোক্ষম শোলক আওড়ালেন তিনি :

রসরাজ্যের যুবকেরা রসে ভরপুর।

যৌবন রসের নারী নেশাতে চুরচুর।।

মদির মদিরা ছোট্টে যৌবনের দেশে।

তুরন্ত ষোড়া যেন মিলনের রেশে।।

হেন যৌবন পেয়ে পরে রসনগর ধন্য।

যুবক হয়েছে সৃষ্টি যুবতীর জন্য।।

শোলক শেষ হতেই দরবারে নতুন কবির নামে জয়ধ্বনি উঠল। সেই সঙ্গে প্রবল খুশির হাস্যরোল। নতুন কবি বুঝলেন তিনি ঠিক জয়গায় ঠিক তীরটি হুঁড়েছেন। তিনি স্নিত হেসে রাজকবির দিকে কটাক্ষ হাসলেন। তাতে কেঁপে উঠলেন বাণিজ্যবর্ম। তিনি কবে ধরলেন তাঁর শোলক। বেশ তালে-জলে তিনি পড়লেন :

যৌবনের দুইটি ফল—যুবক যুবতী।

যৌনতার নেশায় রচে জাতীয় সংহতি।।

যুবতী নারীর দেহ রসরাজ্যের খাল।

ধেমপাগল ছাওয়ালেরো চালাতেছে হাল।।

পেপসি-কোকের নেশায় তাদের জমে ওঠে চান।

যৌনতার গানে গানে ওড়ায় নিশান।।

শোলক শেষ করে রাজকবি নতুন কবির দিকে একটা চোখ টিপে দিলেন। প্রতি-কটাক্ষ। ওদিকে রাজদরবার ততক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নতুন কবি এবারও টিট হয়ে গেলেন। তিনি মাথা নিচু করে বসে আছেন। তা দেখে মহারাজ ব্যাক্য দিলেন—‘ওঠো নতুন কবি। এবার শেষ সুযোগ। বিষয়—নতুন পানীয়, পেপসি-কোকা। পড় শোলক।’

নতুন কবি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। বিমর্ষ নজর। কিন্তু মনে জমিয়ে তুলতে চাইছেন বিব। শোলক বানালেন তিনি :

আনিয়াছেন মহারাজ নরম পানীয়।

মদিরার অধিক নেশা পানেতে জানিও।।

নাম তার সুদর্শন পেপসি এবং কোক।

মৃত্যুশোক, ভুলে যাবে খেলে দুই ঢোক।।

নতুন কবি ইতোমধ্যে নিজের মরমে পরাজয়ের খবর পেয়ে গেছিলেন। তাই তাঁড়ামি ছেড়ে স্বীয় মনের কাব্য রচনা করে শোনালেন। শোনালেন, কিন্তু বাহবা পেলেন না। যদিও এসব কিছু ভূক্ষেপে আনলেন না বাণিজ্যবর্ম। তিনি এখন দুপুরে দেখা স্বত্বকায়ার দৃশ্য নিয়ে শোলক রচনায় ব্যস্ত। নতুন কবি বসতেই রসের ফুলুরি ছাড়লেন তিনি :

রসরাজ্যের বৌক।/ পেপসি এবং কোক।।

খাও কোক-পেপসি।/ দেখতে হবে সেক্সি।।

পেপসি খেতে মগ্ন।/ যুবতী দেহ নগ্ন।। :

চানঘরের জল।/ বক্ষে মধুফল।।

দেখলে বাড়ে বল।/ এতো রসরাজ্যের কল।।

রাজ সভাকবি বাণিজ্যবর্ম তার তাঁড়ারের শেষ অত্র নিক্ষেপ করে শোলক শেষ করতেই দলে দলে লোক এসে তাঁকে ফিরে ধরল। দরবার-কক্ষে এখন উন্মত্ত নাচ চলছে। চলছে কবির নামে জয়ধ্বনি। চলছে তার কাব্যকর্মতার উচ্চকণ্ঠ স্তুতি। তার মধ্যেই বিচারের রায় জানাতে উঠলেন মহারাজ। তিনি হাত নেড়ে দরবারের সমস্ত পাত্রমিত্রকে বসতে বললেন। রাজ হুকুম মেনে প্রত্যেকে নিজ নিজ আসন নিলে রাজা যোবশা করলেন—“হে রসনিয়াসী দরবারীরা শুনুন। আমরা তিন বিচারক মিলে ঠিক করেছি, আজকের কবির লড়াইতে রাজকবি বাণিজ্যবর্ম দাসেরই জয় হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল তাঁর প্রতিভা লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু আমার ভাবনা যে ভুল ছিল তা আজকের

লড়াই প্রমাণ করে দিয়েছে।' আমি তাই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, বাণিজ্যবর্মই ফের রাজকবির আসনে অভিষিক্ত হল। এবং আমৃত্যু। আর, এই আনন্দে রসনগরে টানা সাতদিন উৎসব চলবে। উৎসব শুরু হবে এই মুহূর্ত থেকেই।”

রাজঘোষণা শেষ হতেই দলে দলে লোক রাস্তায় নেমে পড়ল। নগরের পথে পথে আলো জ্বলে উঠল। রাজকবির গাওয়া শোলক তাদের কণ্ঠে— ‘যদি ঋণ পেপসি/’ দেখতে হবে সেক্সি।’

ওদিকে হৃৎসম্মান ও রাজকবির আসন ফিরে পেয়েই আনন্দে আত্মহারা কবি বাণিজ্যবর্ম দ্রুত নিজগৃহে ফিরে এলেন। এসেই উৎফুল্ল পত্নীকে প্রশ্ন করলেন— ‘কন্যা স্বত্বকায়া কই?’

—ও চান মরে। শুনছো না গুণগুণ করে গান গাইছে।—কবিপত্নী খুশি মনে স্নানকক্ষের দিকে ইশারা করলেন।

—এখনো স্নান করছে?

—হ্যাঁ।

রাজকবি সেদিকে ছুটে গেলেন। পুনরায় সেই ছিন্নপথে নজর রাখলেন। নজর রেখেই গালে যেন চড় খেলেন কবি। ভিতরে তখন পেপসি-কোকের পেয়ালা হাতে সম্পূর্ণ নিরাবরণা কুমারী কোন্ দুঃখে, কার দুঃখে অঝোরে কাঁদছে। ফুলে ফুলে কাঁদছে।

মানুষে কুকুরে

পার্শ্বপ্রতিম কুণ্ড

“সকলো বাব মনসো ডুয়ান, যদা বৈ সঙ্কল্পয়তে, অথ মনস্যতি, অথ
বার্চমীরয়তি, তামু নানীরয়তি, নানি মত্ৰা একং ভবন্তি, মত্ৰেষু কর্মগি”।।

—হ্যান্সোগ্যোপনিষৎ, সপ্তম প্রপাঠক, চতুর্থ খণ্ড, শ্লোক-১

পারুলের বর্গাহস্তান্তরের পিছনে যে কালো অমানবিক ঘটনা লুকিয়ে
আছে, তা বিবৃত করতে না পারলে এই আখ্যানের পরম্পরা অসম্পূর্ণ
ধাকবে। তাই পারুলের পূর্বকথা বলতে হচ্ছে আখ্যানের প্রয়োজনেই। আর
হ্যান্সোগ্যোপনিষদের শ্লোকটি এক্ষেত্রে আখ্যান নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন
করেছে। প্রারম্ভে শ্লোকটির অনুবাদ দিয়ে আখ্যানের শুরু।

“মন অপেক্ষা সঙ্কল্পই শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যাগণ যে সময়ে সঙ্কল্প করে, তদন্তর
মনস্যন অর্থাৎ ইচ্ছা করে, অনন্তর বাগিন্দ্রিয়কে প্রেরণ করে, অর্থাৎ
শব্দোচ্চারণ বিষয়ে প্রবৃত্তি দেয় অর্থাৎ বাক্যোচ্চারণ করিয়া সেই ইচ্ছাকে
প্রকাশ করে। সেই বাগিন্দ্রিয়কে নামে প্রেরণ করে অর্থাৎ শব্দের সহিত
সংযোজিত করে বা কথা বলায়; মত্ৰসমূহ নামে একীভূত হয় এবং কর্মসমূহ
মত্ৰে একীভূত হয়।”

কর্তব্য-অকর্তব্য স্থির করার প্রয়াস সঙ্কল্প। এটা আত্মনির্মাণের বৃত্তিবিশেষ।
কর্তব্য নির্দিষ্ট হলে কার্যে পরিণত করার দিলা ও নিরন্তর প্রচেষ্টার রেখাচিত্রে,
সমাপ্তির বিন্দুতে গ্রথিত থাকে সঙ্কল্প। পারুলের সঙ্কল্প, সঙ্কল্পের টানাপোড়েন
এই আখ্যানের নির্মাণ। পারুলের ইবং পরিচিতি অনিবার্য।

পারুল বিষয়ক কিছু...

পারুল বিষবা। পাড়ার সম্পন্ন চাষী গোকুলের জমিতে চাষ করত তার
স্বামী হরেন। গত বছর বর্ষার দিনে সাপের কামড়ে মারা গেছে। পারুল
বিষবা হয়েছে। বর্গা উচ্ছেদের আইন নেই। গোকুল দাস নিজেও আশা করে
না এমন সন্তানবান। পারুলের নামে বর্গা রেকর্ড করিয়ে দিয়েছে পাড়ার
মোড়ল-পঞ্চান্নেত সনাতন মণ্ডল। ছেলের নামেই বর্গা করাতে চেয়েছিল
পারুল। হয়নি। আঠার না হলে জমিতে অধিকার জন্মায় না কারো। বিধান
মেনে নিয়েছে। আইন করে বর্গা রেকর্ড হল বটে, কিন্তু তার তের বছরের
ছেলে চাষ করতে পারবে কেন? প্রশ্ন তুলল গোকুলের সমস্ত ছেলে গোপাল।

গোপালের উদ্দেশ্য ভিন্ন। সে পারুলকে ল্যাঞ্জে খেলিয়ে কাছে পেতে চায়। প্রথম প্রথম সে কথা বোঝে নি। পরে নিরুপায় হয়ে ধরা দিয়েছে গোপালের কাছে। গোপালই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিল চাষের। পারুল মাঝে মাঝে এসে চাষের তদারকি করে। ফসল কাটার সময় প্রাপ্য অংশ নিয়ে যায় স্বরে।

পারুল বিষয়ক আরো কিছু—

পারুলের বর্গাহস্তান্তরের এই কালো অমানবিক ইতিহাস তা, পারুল ভিন্ন তো আর কেউ জানে না। জমির মালিক গোকুল দাস গ্রামের জ্যেষ্ঠদার, নামে বেনামে জমির পরিমাণ অনেক। বর্গা আইনে সব জমিই বর্গাদারদের। যতজন বর্গাদার গোকুলের জমিতে চাষ করে, সম্পর্ক সকলের সঙ্গেই ভালো। কিন্তু গোকুলের ছেলে গোপাল সুবোধ বালক নয়। শহরের স্কুলে ফেল মারতে মারতে আর কলেজে পড়া হয়নি। বাবার সঙ্গে জমির হিসেব রাখে, আর পাড়ার ছেলেদের নিয়ে ছত্রোড় করে। পাড়ার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট গোকুলদাস। টাকার জোরে প্রেসিডেন্ট। সকলেই মান্য করে। ফি বছর পাড়ার স্কুলমাঠে বড় জলসা করে। মাঝে মাঝে কলকাতা যাত্রাদল এনে যাত্রাপালা করায়। এবার তো রয়্যাল বীণাপানি অপেরার ‘কংসবধ’ হল। যাত্রার দিন গোকুলের দামাল ছেলে গোপাল সুবোধ বালকের মত যাত্রা দেখেনি। সে তখন দুজন সাক্ষরদ নিয়ে পারুলের সঙ্গে কণ্ঠিনাট্টি করেছে পাশের স্কুলবাড়িতে।

জমির বিনিময়ে গোপাল সময়ে অসময়ে পারুলকে বিরক্ত করে। বিষবা বো। মন বাধা দিতে চায়। পারে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে পারুলের এই সমর্পণ, পারুলের সঙ্কল্পে রূপান্তরিত হয়। এই সঙ্কল্পের নিহিতে থাকে এক ম্যাজিক সংখ্যা ‘আঠার’। যেভাবেই হোক তের থেকে আঠার এই পাঁচ বছরের ব্যবধান মুছে দিতে হবে অপেক্ষা দিয়ে। যে কোনো মূল্যে ছেলের আঠার প্রয়োজন। বর্গাসত্ত্ব পেতে হলে ছেলের আঠার, ভোট দিতে হলে ছেলের আঠার, চাকরি পেতে হলে ছেলের আঠার এমন কি গোপালের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলেও ঐ আঠার। কিন্তু তের তো আর আঠার হতে পারে না। মুখ বুজে তাই আঠার-র অপেক্ষা। মুক্তির অপেক্ষা। শুধু ছোবল খেয়ে খেয়ে অপেক্ষা। কৌশল করে ভয় দেখিয়ে অপেক্ষা। ভয় পেয়ে পাশিয়ে যাওয়া শয়তানদের পুনরাগমনের অপেক্ষা। পান্টা ছোবল মারার অপেক্ষা। শুধু এক বুক অপেক্ষা নিয়ে চেয়ে থাকা ম্যাজিক সংখ্যা আঠার-র দিকে। তের থেকে আঠার—পাঁচ বছর অতিক্রমণের দিকে। আঠার বছর যে কত ভয়ানক হতে পারে, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে স্বামীহারা নাবালক সন্তানের মা পাঁচ বছরের অপেক্ষমান পারুল।

ভের থেকে সতের

পারুলের ভের বছরের ছেলে, নরেন দেখতে দেখতে সতেরই পা দিল। কুলের গণ্ডি পেরিয়ে হাইকুলে ভর্তি হয়েছে। শৈশব থেকেই ছেলেটা কেমন যেন একরোখা। বাল্যে বাবাকে হারিয়ে মা-ই তার একমাত্র সম্বল, কিন্তু মা আর নরেনের মাঝে গোপালের অপকীর্তি যে দূরত্ব গড়ে দেয়, তা কিছুতেই ভাঙতে পারে না পারুল। পারুলের অপেক্ষা আরো এক বছর টিকিয়ে রাখতে চায় সংগোপনে। জানাজানি হয়ে গেলে বিপদ। দীর্ঘ অপেক্ষার সবটাই নিমেষে নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে মুহূর্তের ভুলে। কিন্তু তার ‘সকল’ কিছুতেই হতে দেবে না এমনতর। সে নরেনকে এড়িয়ে চলে। গোপালের অবৈধ কীর্তি লালন করে সমগ্র শরীর দিয়ে, সমাজকে এড়িয়ে, নরেনকে এড়িয়ে নিভুতে। নরেন এসব কিছুই ঘূর্ণাক্ষরেও টের পায় না এবং তাই মার এড়িয়ে চলার কারণও বোধগম্য হয় না। মার প্রতি রুগ্ন হয়, কিন্তু হয় পিতৃহারা মার স্নেহ বঞ্চিত সতের বছরের নাবালক নরেন। মানসিক বিকাশে তার এই রুগ্নতা ক্ষিপ্ততা তাকে ক্যাপাটে, বদরাগী মেজাজী করে তোলে।

চেহারা বাবার গড়ন আছে। উঁচু, লম্বা এখনই হ’লুট ছাড়িয়ে গেছে। ঝাঁকড়া চুল, লৌহকঠিন পেশী, সিংহবিক্রম আর বাইসনের তেজ নিয়ে নরেন হয়ে উঠেছে মূর্ত সংহারক। সামান্য অন্যায়ে ক্ষেপে গিয়ে সব কিছু তছনছ করে দেয়। ওজনে কম দিলে দোকান ভাঙুর করে। মহাজন বেশী সুদ নিলে কলার ধরে আদায় করে আনে। কেরোসিন মজুত করলে দ্ব্যম ভর্তি কেরোসিন ন্যায্য দামে বিক্রি করে দাম তুলে দেয় দোকানীর হাতে। গ্রামের সম্পদদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে সাহায্য করে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে। আঠার না হওয়া নরেনকে সকলে ভয় পায় তার শরীরের জন্য, তার মেজাজের জন্য। সে যখন অন্যান্যকারীকে মারতে থাকে, মারতে মারতে আধমরা করে দিয়ে তবে সে কান্ত হয়। দু’চার চড়-খানড়ে তার তৃপ্তি আসে না।

নরেন যখন পারুলের সতেরের নির্মাণ

নরেন এখন আঠার। তিরিকি মেজাজ আর বুনোমহিবের মত গভীর দেখে তার ধারে কাছে কেউ আসে না, নরেনের নিত্যসঙ্গী এখন এক কুকুর। যাকে সে শৈশব থেকে পালন করেছে। আদর করে কুকুরটার নাম রেখেছে টর্পেডো। টর্পেডো সতের প্রজাতির। ভাতের টানে একদিন গোকুল দাসের পালিত বুলডগ চেন ছিঁড়ে পাড়ার লালিকে কজা করেছিল। সেই অসম-মিলনের উত্তরাধিকারী এই টর্পেডো। চেহারার না হলেও পিতৃবংশের মর্যাদা

কিঞ্চিৎ রক্ষিত হয়েছে তার হিংস্রতা ও ক্ষিপ্ততায়। এলাকার মনুষ্যকুল যেমন ভয়ে নরেনকে এড়িয়ে চলে, তেমনি সারমেয়কুলও টর্পেডোর মুখোমুখি হতে সাহস দেখায় না। দু-একদিন গোকুলের বুলডগ বা নতুন কেনা এ্যালসেশিয়ানের সঙ্গে চেনাবাঁধা অবস্থায় সাক্ষাৎ ঘটেছে কিন্তু ‘মোলাকাৎ’ হয়নি। না জানি কেন গোকুলের চাকরবাকরেরা দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে কুকুর দুটোকে। টর্পেডোকে হানা দেওয়ার সুযোগ করে দেয়নি। সুযোগ দিলে ফলাফল যে কি হত, তা পাড়ার অন্যদের কাছে গবেষণার বিষয়। কিন্তু টর্পেডোর প্রতি ভালোবাসার পক্ষপাতিত্বে তাদের বিশ্বাস, টর্পেডো ছেড়ে কথা বলতো না। দুটোর মধ্যে একটার গলার টুটি ছিঁড়ে নিতো। এই নিশ্চিত বিশ্বাস সম্ভবতঃ গোকুল দাস এবং তার কুকুরদ্বয়ের প্রতি জনমানবের ক্রোধের বর্হিপ্রকাশ। থাক, এসব কথা। ঘটনা যখন ঘটেনি, ঘটলে কি হত, সে আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু পাড়ার বাসিন্দাদের উৎসাহ আছে, কোনো একদিন টর্পেডোর সঙ্গে কুকুরদুটোর সম্মুখ সমর দেখবে। সেই সৌভাগ্য যে কবে হবে, তা তারা জানে না। শুধু ভেবে ভেবেই রোমাঞ্চিত হয় মনে।

নরেনের এককথিত : দলে বোলাদান না করার যুক্তি

টর্পেডোর মনিব নরেন। শারীরিক শক্তিতে নরেন অধিষ্ঠী। সকলেই তাকে মান্য করে। গরীব চাষী ও ক্ষেতমজুর তাকে শ্রদ্ধাও করে। এর নিহিতে কোনো যাদুমন্ত্র নেই। আছে শুধুই বাহুবল এবং অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রয়োগের অসীম মনোবল। তার উপস্থিতিতে পাড়ার সমস্ত অনিয়ম বন্ধ। জানতে কেউ অন্যায় করতে সাহস পায় না। পাড়ার যুবদান দুই পক্ষ, গোকুল দাস বা সনাতন মণ্ডলের দল কেউই নরেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায় না কিন্তু সনাতন মণ্ডলের দল মনে মনে কাছে পেতে চায় নরেনকে। নরেন বলে, ‘এই তো ভালো আছি কাকা, দলে আবার কেন? তবে কিছু অন্যায় হলে বলো, আমি পিটিয়ে দিয়ে আসবো। দলটল আমার দরকার নেই। অন্যায়ের জন্য আমি জান-ও দিতে পারি। তবে দলের জন্য কিছু করতে বলো না, পারবো না। অন্যায়ের জন্য আমি একাই একশ। টর্পেডো সঙ্গে থাকলে পৃথিবীর কাউকেই আমি ভয় করি না। যদি কেউ অন্যায় করে, আমার আর টর্পেডোর হাত থেকে সে মুক্তি পাবে না। দল তোমরা করো। আমি বড়ো একা। আমাকে আমার মত একা থাকতে দাও।’

—কিন্তু দলের একটা প্রয়োজন আছে নরেন।

—তবে তোমাদের অতো বড় দল থাকতে সেদিন কি করে ঐ শরতানরা ইট ভাটার মেয়েদের বেইজ্ঞত করে গেল?

—সেদিন আমরা সংঘবদ্ধ ভাবে রুখে যেতে পারিনি তাই।

—তবে টর্পেডো কি করে একা গিয়ে একজনের পায়ের মাংস খুবলে নিয়ে এল?

—সে মানুষ নয়, কুকুর বলে।

—না কাকা, আমি একথা মানতে পারলাম না। সেদিন যদি কাউকে চিনতে পারতাম তাহলে তার প্রতিশোধ আমি নিতামই। আমার কোনো দলের প্রয়োজন হত না। ওদের সাতপুরুষের ভাগ্য ভালো, আমি সেদিন জুরে বেইশ ছিলাম। টর্পেডো তবুও আমার মান রক্ষা করেছে। শুধু আমার কেন আমাদের সকলের মান রক্ষা করেছে, আর তাকে কুকুর বলে তুমি ছোটো বলছো? অতোগুলো মানুষ বা পারেনি একটা সামান্য কুকুর হয়ে সে তা করে দেখিয়েছে। এর চেয়ে বড় গর্বের আর কি হতে পারে?

সনাতন মণ্ডলের সঙ্গে নরেনের সেদিনের ঐ আলোচনা বিশেষ কোনো ফল দেয়নি। নরেন, নরেনের মত একাই থেকে গেছে। নরেন কোনো দল বেছে নেয়নি। দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনও সে অনুভব করেনি। তবে সেদিনের ঐ আলোচনায় বিশেষ দলের প্রতি নরেনের পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হয়েছে একথা গোকুল দাসের নতুন দল জানতে পেরেছে।

নরেনের নতুন নামকরণ

নরেন জাত যোদ্ধা। সে ইংরেজী রূপকথার ‘রবিনহুড’। বাংলার শশধর দত্তর ‘মোহন’-ও কিছুটা। বাঘের মত হিংস্র, সিংহের মত বিক্রম, বুনো মহিষের মত তেজ, নেকড়ে মত ক্ষিপ্ততা হরিণের মত গতি—জান্তব সমস্ত শক্তির মূর্তমান মহামানব নরেন। নরেনের স্কুলের হেডমাস্টার এভাবেই চিনিয়ে দেন নরেনকে। নরেনের বাহন টর্পেডো। কুকুর। টর্পেডোর মনিব নরেন। নাম দুটো মানান সই হয় না হেডমাস্টারের কাছে। অনেক ডেবেটিঙে টর্পেডোর সঙ্গে মিলিয়ে তিনি নরেনের নতুন নামকরণ করেন ‘টাইফুন’। নরেনের পক্ষে নামটি এতই উপযুক্ত যে জনপ্রিয় তে বেশী সময় লাগে না। লোকের মুখে মুখে বোরে টাইফুন-টর্পেডোর বীরত্বের কথা। টাইফুন-টর্পেডোর ঝড় সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে পাড়ার মাতব্বররা। পুলিশ প্রশাসন একটু প্রশয়ের দৃষ্টিতেই দেখছে টাইফুন-টর্পেডোর কার্যকলাপ। তাদের বীরগাথা এখন জনপ্রসিদ্ধি। তারা রূপকথার নায়ক। তাদের অস্ত্রযানকে প্রশাসনের ঘেরাটোপে আটকে রাখা সমীচীন বোধ করছেন না সদ্য কাজে যোগ দেওয়া এস. আই। কারণ পুলিশ প্রশাসনের কাজ এলাকার শান্তি রক্ষা করা। আর এই টাইফুন-টর্পেডো তো সেই কাজই করছে একক প্রচেষ্টায়। ন্যায়-অন্যায় বিচার আপেক্ষিক। তবু টাইফুন-টর্পেডোর ভয়ে জানত কেউ অন্যায় করার সাহস পাচ্ছে না। দোকানদার থেকে মহাজন, ধানকলের মালিক

থেকে জ্ঞোতদার, সকলেনই।

পারুল ও গোপালের ভয়-এর ভিত্তি : নরেনের বেড়ে ওঠা

পারুল ভয়ে ভয়ে থাকে। সর্বদাই ভয়, এই বুঝি' কিছু অবটন ঘটল। শত্রুর মুখে হাই দিয়ে দামাল ছেলেটা যেভাবে ঘটোৎকচের মত বেড়ে উঠেছে, গোটা পৃথিবী তোলপাড় করে দেবে যদি ও বেঁচে থাকে। মহাভারতে শুনেছে, ঘটোৎকচের আয়ু বেশী দিন হয়নি। ভগবান কৃষ্ণ ওকে নিয়ে নিয়েছেন। নয়তো পৃথিবীতে প্রলয় বাধিয়ে ছাড়ত। পারুলের ভয় ঘটোৎকচের মত ও-উ অকালে না ঝরে পড়ে। শত্রুর তো শেষ নেই। এলাকার সব ক্ষমতাবান লোকেরাই ওর শত্রু। গরীব মানুষেরা যদিও সঙ্গে আছে, তবুও সত্যি সত্যি বিবাদের দিনে কখন থাকবে সে কথা বলা মুশ্কিল। সম্মুখ সমরে ওকে বধ করা দুঃসাধ্য। দেবতাদের সমস্ত শক্তি ওকে দিয়েছেন অসুরকে বধ করার জন্য। তবু সাবধানের মার নেই। পুরাণে যা লেখা থাকে সব সময় সত্যি হয় না। পারুলের সর্বদা ভয়, গোপালের সঙ্গে ওর মুখোমুখি লড়াই না বেধে যায় কোনো দিন। গোপালের বাবা গোকুল দাস জ্ঞোতদার হলেও গোবেচারী মানুষ। গায়ে আঘাত না পড়লে সরাসরি লড়াই-এ নামে না। কিন্তু গোপাল ভিন্ন প্রকৃতির, ঝামেলা বাধাতে ওস্তাদ। পুরুষের সমস্ত বদগুণই আছে। তার উপর নতুন পার্টিতে নাম লিখিয়েছে। নতুন পার্টির মদতে সনাতন মণ্ডলদের বিরুদ্ধে কামান দাগার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সনাতন মণ্ডলদের দলে নেই নরেন, পারুল জানে। তবুও গোপালের সমস্ত সাজপাঙ্গদের বিষ নজরে নরেন। গোপাল এদের হয়ে কোনো দিন লড়াইতে আসেনি, তার একটাই কারণ 'পারুল'। পারুলের অন্তরঙ্গতা। অন্তরঙ্গ মুহুর্তে গোপালকে দিয়ে শর্ত করিয়েছে পারুল। নরেনের সঙ্গে সরাসরি কোনো বিরোধে যাবে না গোপাল। শর্ত ভাঙলে পারুলের সাম্রাজ্য আর সে কোনোদিনই পাবে না, একথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে পারুল। নরেনকে হারানোর ভয়ে পারুল যেমন গোপালকে মেনে নেয়, ঠিক তেমনি পারুলকে হারানোর ভয়ে নরেনকেও মেনে নেয় গোপাল। দুজনেই ভয় পায়। কিন্তু ভয়ের ভিন্নতা অন্য। পারুলের নরেন। গোপালের পারুল। উভয় ক্ষেত্রেই পারুল.....। প্রথম পর্বে পারুল ভয় পায় এবং দ্বিতীয় পর্বে পারুল ভয়-এর কারণ হয়। প্রথম পর্বে পারুল গোপালকে ভয় পায়। এবং দ্বিতীয় পর্বে গোপাল পারুলকে ভয় পায়। গোপাল ও পারুলের এই ভিন্নমুখী ভয়ের ভরকেস্রে দাঁড়িয়ে নরেন ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে। ক্রমশঃ টাইফুন হয়ে যায় টর্পেডোকে নিয়ে।

নরেনকে সহ্য করার বান্দা নয় গোপাল। মাঝে মাঝে টাইফুনের দাপাদপি দেখে গোপালের মনে হয় গুলি করে ঝাঁঝা করে দিই বুকটা। টর্পেডোর

হুকারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মনে হয় বাড়ির বুলডগ আর এ্যালসেশিয়ান দিয়ে চুটি ছিঁড়ে ফেলি টর্পেডোর। তবু গোপাল সংযত থাকে। গোপালকে সংযত থাকতে হয়, পারুলের কথা ভেবে। কারণ পারুল যে তার সন্তাহন্তে মুহিফিলের পার্টনার। তার শরীর ক্রিয়ায় এই দীর্ঘ পাঁচ বছরের পারুলের স্পর্শ এমনভাবে মিশে গেছে, তা থেকে গোপাল সরে আসতে পারে না। পারুলের জন্য টাইফুন-টর্পেডোকে মেনে নিতেই হয়।

নরেনের আঠার : পারুলের প্রত্যাখ্যান

নরেন এখন আঠার। পারুলের বহু কাঙ্ক্ষিত আঠার। নরেনের আঠার-র সঙ্গে পারুলের দীর্ঘ অপেক্ষা মিশে আছে। নরেনের আঠার-র সঙ্গে পারুলের দিনযাপনের বিবর্তন প্রক্রিয়া মিশে আছে। মিশে আছে তার আপাত ইচ্ছার বৈপরীত্যে প্রগাঢ় সঙ্কল্প। যে সঙ্কল্প নির্মাণের আভাস আখ্যানের শুরুতে ছিল, তা যে কতটা অনিবার্য তা পারুলের সঙ্কল্প গঠনের প্রারম্ভেই বোঝা গেল।

এখন নরেন আঠার। অতএব পারুল বদলাতে চায়। গোপালের অবৈধ হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু গোপাল সুবোধ বালক নয়। দীর্ঘ পাঁচ বছরের অবৈধ অভ্যাস তার শরীর ক্রিয়ায় এক মাদকতার সৃষ্টি করেছে। এই মাদকতার নেশায় হিফ হয়ে উঠল গোপাল যখন পারুলের দ্বারা প্রথম প্রত্যাখ্যাত হল। জোর করে পারুলকে কাছে পেতে চাইল। অথচ পারুল বেপরোয়া, আর তার কাছে কিছুতেই ধরা দেবে না। সন্তাহন্তে একবার হাজিরা বন্ধ করল। গোপালের হুকার—‘জানে মেয়ে দেবো’। পারুল তবুও অকুতোভয়। নরেনের আঠার এতদিন অপেক্ষা ছিল। আজ বাস্তব। আজ তাই আর সঙ্কল্প রূপায়ণে কোনো দ্বিধা নেই। কোনো দ্বন্দ্ব নেই। মনের কোণে তবু অশনি ভয়। তবু ভয়হীন পারুল আবারও প্রত্যাখ্যান করল সরাসরি গোপালকে।

পারুলের প্রত্যাখ্যান : গোপালের সময় প্রস্তুতি

পারুলের প্রত্যাখ্যানের অর্থ সম্মুখ সময়। একথা পারুল ভালোভাবেই জানে। আর এও জানে গোপাল একা নয়। তার দলবল অর্ধবল বিশাল। এক ডাকে পঞ্চাশ লাঠিয়াল হাজির করতে পারে। বাবার পেনলা বন্দুক নিয়ে একাকী লড়ে যেতে পারে সমগ্র গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে। নরেনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি বটে কিন্তু নরেনকে সে মনে মনে যুদ্ধে আহ্বান করে। কারণ নরেনই তার একমাত্র প্রতিপক্ষ। অন্য সকলে অসম। গোপাল জানে পারুলের প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ যদি নিতে হয় তবে নরেনকে রুদ্ধতেই হবে।

পারুলকে জোর করে কাছে পেতে গেলে নরেন যে কতোটা ভয়ঙ্কর হতে পারে গোপাল অনুমান করে। নরেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে হলে লাঠিয়ালে কাজ দেবে না। কারণ নরেন লাঠি ধরলে দশজন সেরা লাঠিয়ালেরও প্রাণ যাবে নরেনের লাঠির আঘাতে। জনবল বৃদ্ধির চেষ্টা করে। যারা যারা এতদিন নরেনের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছিল যেমন শ্যামকুণ্ডু (কেরোসিন ডিলার), হরি মোদক (মিষ্টির দোকান), বলরাম দাস (রেশন ডিলার), বনমালী মণ্ডল (চালকলের মালিক), রঞ্জিত দাশ (পাটের আড়ংদার), মনা সামন্ত (হেঁটা ভাটার মালিক ও রাজনৈতিক দলের নেতা) সমস্ত নরেন-বিরোধী শক্তিকে একত্রিত করল গোপাল। এরা সকলেই কোনো না কোনো সময় নরেনের রোষের শিকার। এবার তারা ভরসা পেল। নরেনের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে সেনাপতি গোপালকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিল। সমগ্র যুদ্ধ ব্যয়-এর একটা হিসাব পেশ করল গোপাল। সেই মোতাবেক শ্যাম কুণ্ডু দিল এক হাজার টাকা ও পাঁচজন লাঠিয়াল, হরি মোদকের প্রতিশ্রুতি, সময় প্রস্তুতির সমস্ত খাদ্যে যোগান। রঞ্জিত দাশ দেবে পাঁচ হাজার টাকা ও দুজন বিশিষ্ট সমর যোদ্ধা। মনা সামন্ত সামাল দেবে পুলিশি খামেলা (পুলিশের জন্য বরাদ্দ অর্ধ প্রদান ও উচ্চমহলে প্রভাব খাটিয়ে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রাখা)। আর দেশি মদ বিক্রেতা কালিপদ যদিও নরেন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তবুও এই মহান যুদ্ধের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রতি যোদ্ধা পিছু দেবে এক বোতল মদ। রেশন ডিলার বলরাম দাস ভিত্তি প্রকৃতির। শুধুমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করে নরেনের বিরুদ্ধাচারের সাহস দেখাল না। কিন্তু গোপাল যুদ্ধে জয়ী হলে তাঁর বরাদ্দ অর্ধভার বে, সে অবশ্যই বহন করবে একথা গোপালকে কানে কানে বলে এল। যুদ্ধের প্রস্তুতি সাজ হল। এবার যুদ্ধ বাধার অপেক্ষা।

পারুল-নরেনের কথোপকথন : পারুলের সংলাপ

যুদ্ধের এই গোপন প্রস্তুতির কথা নরেন কিছুই জানে না। সে মনের আনন্দে টর্পেডোকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পারুলের প্রত্যাখ্যানের অর্থ যে অবশ্যজ্ঞাবী যুদ্ধ, পারুল জানে। পারুল এবার সব কিছুই জানাতে চায় নরেনকে। তার দীর্ঘ অপেক্ষা, সঙ্কল্প এবং প্রতিশোধ, সব। ছেলেকে কাছে ডেকে বলে—‘তুই এবার বড় হয়েছিস, সব কাজ বুঝে নে। আমাকে ছুটি দে।’

—কেন হঠাৎ এসব কথা বলছো? জানো তো ওসব কাজের কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না।

—তোরা আঠার বছরের দিকে আমি চেয়েছিলাম এতদিন। আমার সে সাধ পূর্ণ হয়েছে।

—আঠার হয়েছে তো কি হয়েছে? আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না। তুমি যেমন করছিলে করো, আমি তো আছিই।

—তের থেকে আঠার। পাঁচ বছর আমি টেনেছি। শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

—শরীর ঝাঁঝরা হয়েছে তো ডাক্তার দেখাও।

—না শুধু শরীর ঝাঁঝরা নয় মনটাও নীল হয়ে গেছে।

—কেন, আমার বিষের জন্য? তোমাকে তো বলেছি একুশ না হলে আমি বিষে করবো না।

—না, ওসব ব্যথা তুই বুঝবি না।

—কেন বুঝবো না? বুঝিয়ে বললেই বুঝবো। তুমি তো কোনোদিন বুঝিয়ে বলোনি। তাই বুঝিনি।

—যে কথা বলার নয়, তা বলি কি করে।

—কেন, এমন কি কথা আছে যা ছেলের কাছেও বলা যায় না।

—এ আমার পাঁচজনের ভেতরের যন্ত্রণা, কেমন করে বলি?

—কেউ কি তোমাকে কিছু বলেছে, মনে কষ্ট দিয়েছে? বলা, আমি তার টুটি ছিঁড়ে নিয়ে আসি।

বুনো মহিষের তেজ বিচ্ছুরিত হল নরেনের শরীরে। পাকুল সাহস পেল, সঙ্গে ভয়ও। গোপালের কথা সে বলবে কি করে? অথচ তাকে বলতেই হবে। অস্ত্র নরেনকে যুদ্ধে প্রস্তুত করার জন্যও বলতে হবে। নরেন তো আর জানে না গোপাল এতদিন তাকে কেন আক্রমণ করেনি। গোপালের ক্ষমতা সম্পর্কে সে ওয়াকিরহাল নয়। অন্য পাঁচজনের মত গোপালকে সে যদি দুর্বল ভাবে তবে নরেনের পরাজয় নিশ্চিত। গোপালের ক্ষমতার পূর্বাভাস নরেনকে জানাতেই হবে। যুদ্ধটা অসম হবে না তখন।

নরেনের শক্তি পাকুল জানে। আবার এও জানে নরেন একা। যদিও নরেন একা বিশজনের ক্ষমতা ধরে তবু গোপাল তো বিশের অধিক। নরেনকেও অধিক হতে হবে জনবলে। কিন্তু নরেনের বাহন বলতে এক কুকুর। টর্পেডো। আর কুকুরের প্রতিপক্ষ তো কুকুরই হবে। গোপালরাও নিশ্চয় কুকুর ছাড়া যুদ্ধে আসবে না। টর্পেডো যদি অন্য কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকে তবে নরেন তো আর টর্পেডোর সাহায্য পাবে না। যেমন মহাভারতে অভিমন্যু পায়নি অর্জুনের সাহায্য। একা অভিমন্যুকে মরতে হয়েছিল অসম চরম্যুহ যুদ্ধে। নরেনকেও না সেভাবে মরতে হয়। ভয়ে আঁতকে ওঠে পাকুল। কিন্তু ভয় পেলে তার চলবে না। তার দীর্ঘ অপেক্ষা,

সম্ভব সব বৃথা হয়ে যাবে। গোপালকে দেহ দিয়ে আটকে নরেনকে আঠার করেছে গোপালকে বধ করার জন্যই। নরেন এখন আঠার। তাই এখন যুদ্ধের পরিণতি ভেবে লাভ নেই। গোপালরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে, নরেনকেও প্রস্তুত করতে হবে। তাই আর কোনো সংশয় নয়। বীর সম্ভ্রায় সজ্জিত করে রণাঙ্গনে পাঠাতে হবে পুত্রকে। ক্ষত্রিয় মাতার পাবাণ হৃদয় নিজে আবার কথোপকথনের প্রস্তুতি নিল পাকুল।

পাকুল-নরেন কথোপকথন (২য় পর্ষায়) : নরেনের সংলাপ।

মনকে শক্ত করে, চোয়াল শক্ত করে নরেনকে বলে—‘শোন, যা আমি এতদিন বলিনি, আজ বলছি..’

—কি?

—গোপাল আমাকে বেইজ্জত করেছে।

—কবে?

—অনেকদিন ধরে। তোর যখন তের, তখন থেকে।

—এতদিন বলোনি কেন?

—ভয়ে।

—কিসের ভয়ে?

—তোকে হারানোর ভয়ে। আমি হারানোর ভয়ে।

নরেন মার সম্পর্কে অনেক কিছু কানামুখো শুনেছে। বিশ্বাস হয়নি। গোপালকে নিয়ে মার বাজে সম্পর্কের কথা কিছুতেই মনে ধরেনি নরেনের। কিন্তু আজ মা যা বলছে তাতে তো আগের ধারণায় সত্য। নরেনের দীর্ঘ মাতৃ-বিশ্বাস মিথ্যা। মা যে গোপালের কাছে যেত তা স্বৈচ্ছায় না বাধ্য হয়ে? কিসের সেই বাধ্যবাধকতা? যা তাকে মা এতদিন বলেনি। মার যদি ইচ্ছা না থাকত তবে গোপাল কি পারতো বেইজ্জত করতে? এতোগুলো চিন্তা নরেনের মাথায় ঘুরপাক খায়। মার ইচ্ছায় হলে গোপাল তো কোনো অন্যায় করেনি। আর গোপাল যদি অন্যায় না করে তবে গোপালের বিরুদ্ধে সে লড়বে কেন? দোদুল্যমানতায়, দীর্ঘ সংশয়ে নরেন দিশেহারা। ‘গোপালের বিরুদ্ধে সে লড়বে কেন?’ এরকম কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করার নিজেকে। উত্তরে প্রয়াসী হয়। কিন্তু বোধের কাছে ধরা দেয় না কোন জুংসই উত্তর। অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে নরেনের শরীরে খেলে যায় বিদ্যুৎচমক। হাতের পেশীগুলোতে এসে যায় অসূর শক্তি। লাঠিচালনার গতি বেড়ে যায় দশগুণ, চোখের পলকে, যার দ্বারা সে অসাধ্যসাধন করে অনায়াসে। অবলীলায় শত্রুকে করে পরাজিত। কিন্তু আজ গোপালের বিরুদ্ধে তার মনে কোনো ক্রোধ তৈরী হচ্ছে না। মুখের চোয়াল হচ্ছে না শক্ত। হাতের পেশী দোহা

মত কঠিন হচ্ছে না। সংশয়ে শুধু নিষ্ক্রিয়তা প্রকাশ পাচ্ছে। ক্ষিপ্ততার বিপরীতে নিশ্চলতা। গর্জনের পরিবর্তে নির্বাণ। কিভাবে বদলে যাচ্ছে নরেন। এভাবে বদল শুরু হলে কি করে লড়বে গোপালের মত হিংস্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে?

কিন্তু পারুলের বড় আশা গোপালের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে তার আঠার বছরের ছেলে নরেন। কিন্তু আজ তার চোখের মধ্যে কোনো প্রতিহিংসার আগুন খুঁজে পেল না পারুল, যে আগুন সে দেখেছে বহুবার। ভয়ে, সংশয়ে, দ্বিধায় প্রশ্ন করে পারুল—গোপালকে কি তোর ভয় করে?
—না।

—তবে তুই পারবি না গোপালকে মেরে আমার অনেক দিনের সাধ পূরণ করতে?

নরেন নিশ্চুপ থাকে। কি উত্তর দেবে মায়ের এই প্রশ্নের? মাকে শুধু খুশি করার জন্যই গোপালের বিরুদ্ধে লড়তে হবে? গোপাল অন্যায়কারী না হলেও গোপালের বিরুদ্ধে লড়তে হবে? আর সে যদি কোনো অন্যায় না দেখে তবে সে যে লড়াই-এর কোনো শক্তিই খুঁজে পায় না, একথা কেমন করে বোঝাবে মাকে? মার বেইজ্ঞতের প্রশ্নে সে তো কোনো ছির সিদ্ধান্তে পৌঁছে অন্যায়কারীকে চিহ্নিত করতে পারছে না। আর মা তো এই প্রথমবার বেইজ্ঞত হয়নি, এর আগেও বহুবার। তের থেকে আঠার, দীর্ঘ পাঁচ বছর? অন্যায়টা তবে কার? মার না গোপালের?

নরেন এতদিন অন্যায়কারীকে সরাসরি চিহ্নিত করতে পেরেছে বিবেচনায়। যেমন ব্রেশনের কেরোসিন বেশী দামে বিক্রি করছে অমুক, অতএব অমুক দামী। অমুক চাল মজুত করেছে অতএব অমুক দামী। ইত্যাদি ইত্যাদি। সরাসরি লড়ে গেছে তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু আজ গোপালের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধে তেমন কোনো মনের ছোর খুঁজে পাচ্ছে না নরেন। নরেন শুধুই ভাবছে, ভাবছে আর ভাবছে!...অন্যায়টা কার? মার না গোপালের? ভাবনার অতলে তলিয়ে যেতে যেতে নরেনের বিবেচনায় অন্যায়কারীর চিহ্নিতকরণ সমাপ্ত করতে পারছে না কিছুতেই। অথচ অন্যদিকে পারুলের প্রত্যাখ্যান যুদ্ধকে উস্কে দিয়েছে। আর উপায় নেই। যুদ্ধ অনিবার্য।

যুদ্ধের ধারাবাহিকতা

গোপালের যুদ্ধ প্রস্তুতি সমাপ্ত। এবার যুদ্ধজয়ের অপেক্ষা। অথচ তার প্রতিপক্ষ নরেন নিশ্চুপ। সমর সজ্জার প্রাথমিক প্রস্তুতিও সে নেয়নি। এমনকি যুদ্ধ করতে হবে এমন সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে পারেনি এখনও। আক্রমণকারী যখন প্রস্তুত তখন বিপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা যুদ্ধকে ধামিয়ে দিতে পারে না। যুদ্ধের

ব্যাকরণে এমন কথা নেই। তাই যুদ্ধের অনিবার্যতায় যুদ্ধ শুরু হয়। শুরু হয় গোপাল-নরেনের ঐতিহাসিক যুদ্ধ।

জনাচল্লিশ লোক নিয়ে গোপাল নরেনের সামনে। টর্পেডো নরেনের পাশে এসে ‘পজিশন’ নেয় প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণের। শুধু প্রচুর নির্দেশের অপেক্ষায় নিধর। নিশ্চুপ। নরেন যেন পাথরের মত নিশ্চল, চোখে কোনো বিস্ফোরণ নেই। মুখে নেই হাজার। ‘টর্পেডো এ্যাকশান’ অতি পরিচিত ডাকও শোনা যায় না শব্দের মুখে দাঁড়িয়ে।

পাড়ার সমস্ত লোক, ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-বৌ সব, এতদিন যারা মনে মনে প্রতীক্ষা করেছে এই দিনটি, তারাও দাঁড়িয়ে। তাদের কাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ-মুহূর্ত আজ তাদের সামনে দৃশ্যমান। টানটান উত্তেজনায়। গোপালের দু-হাতে ধরা দুটো কুকুর। ডন আর ড্যানি। একটা বুলডগ, অন্যটা এ্যালসেশিয়ান। গর্জন করছে। চেন ছিঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে টর্পেডোর উপর। টর্পেডো পা দুটো সামনে ছড়িয়ে একটু নিচু হয়ে বসে, যেভাবে বাঘেরা শিকার ধরে, অনেকটা সেরকম।

নরেন এতদিন শুধু আক্রমণ করেছে। আক্রান্ত হয়নি কখনও। টর্পেডো-ও তাই শিখেছে। চোখের পলকে কিছু বোঝার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুজনে। কিন্তু আজ ভিন্ন চিত্র। ছ’ফুট ন’ইঞ্চির তাগড়াই চেহারার নরেন মহীরাহের মত দাঁড়িয়ে। হাত খালি। পারুল জানে, নরেনের হাতে যদি একবার লাঠি ওঠে, তবে বন্দুকের গুলিও ছিটকে যাবে তার লাঠিচালনায়। এতটাই রপ্ত সে যষ্টি-যুদ্ধে। পারুল দ্রুত এগিয়ে দেয় নরেনকে তার প্রিয় লাঠিখানা। সবসঙ্গেই পুলকিত হয় এই ভেবে যে নরেন লাঠি ধরেছে। লাঠিখানা হাতে পেয়ে নরেন ছোর করে ধরে। কিন্তু লাঠিখানা না চাঙ্গিয়ে নরেন একি করছে? লাঠিখানা হাতে পেয়ে নরেন লাঠিতে ভর দিয়ে আরো ভাল করে দাঁড়াল। যেন মনে হল লাঠিখানা এই সময় হাতে না পেলে ঠিকমত দাঁড়াতেই পারতো না। লাঠিখানা হাতে পেয়ে আরো হুবির, স্থানু হয়ে গেল।

টর্পেডো জ্বাতে কুকুর, মানুষ নয়। মানুষের বিবেচনা তার মধ্যে নেই। তার অভ্যাস আছে। আছে প্রতিবর্ত ক্রিয়া। সে শুধুই এতদিন আক্রমণ করেছে। আক্রান্ত হতে শেখেনি কখনও। তাই পূর্ব অভ্যাসের প্রতিবর্তে আজও সে আক্রান্ত হবে না। পয়লা আক্রমণ করতে হবে। কিন্তু প্রচুর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকলে যে কোনো মুহূর্তে কুকুর দুটো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর ঝাঁপিয়ে পড়লে আত্মরক্ষা করা কঠিন বরং আক্রমণ অনেক সহজ। প্রচুর নিশ্চল মূর্তি দেখে স্বাভাবিক পরিচিত মনে হল না আজকের যুদ্ধ। আর কালবিলম্ব না করে হাজার ছাড়ল টর্পেডো—‘বেউ’। কঁপে গেল গোটা গ্রামের মানুষ। পাড়ার অন্য সারসেমের দলও খেউ খেউ করতে লাগল

একযোগে। চেন বাঁধা ডন আর ড্যানি কিছু বোঝার আগেই টর্পেডো ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনের ওপর। গোপাল টর্পেডোর এই অকস্মিক আক্রমণে প্রস্তুত ছিল না। ভয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা সেনাপতি গোপাল। পিছিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ জনের যুদ্ধ-দল। চেনদুটো খুলে দিল গোপাল।—‘এট্যাক ডন, ফাইট ড্যানি’। শুরু হয়ে গেল সারমেয় যুদ্ধ।

টর্পেডো জ্ঞাত ফাইটার ডন-ড্যানি শিক্ষিত। ফাইটের মাস্টার ট্রেনিং আছে। তারাও নিজেদের টর্পেডোর ধাবা থেকে বাঁচিয়ে বৌধ আক্রমণ করল পাশটা। একজন সামনের দিকে। একজন পেছনে। টর্পেডো প্রাথমিক কিছুটা ‘কামড়’ খেয়ে পিছু হটল। দেখল প্রচুর চোখ বেয়ে জলের কোঁটা গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। টর্পেডোর মাথায় খুন চেপে গেল। প্রচুর গর্জন শুনেছে। জ্বন্দন শোনেনি কখনও। প্রচুর পায়ের কাছে নত হয়ে অশ্রুসিক্ত মেদিনী নখের আঁচড়ে আঁচড়ে বিদীর্ণ করল কিছুক্ষণ, রাগে-অভিমানে-ক্রোধে। তারপর বা ঘটল মহাভারতের যুদ্ধেও এমন অলৌকিক কিছু দেখেনি কেউ। একসাথে প্রচুর কাঁধের ওপর উঠে, পেছনের দু’পায়ে প্রচুর কাঁধে ভর দিয়ে লাফিয়ে পড়ল দশফুট দূরে থাকা ডন-ড্যানির ওপর। নিশ্চল মহীরাহ নরেনও কিছুটা নড়ে গেল টর্পেডোর পেছনের জোড়া পায়ের ধাক্কা। কিন্তু এরই সঙ্গে টর্পেডোও পেয়ে গেল প্রচুর সমস্ত শক্তি।

ড্যানির কিছুটা মাংস টর্পেডোর মুখে। ড্যানি যন্ত্রণায় কাঁরাচ্ছে। ডন একটু বেশী মাত্রায় ভয়ঙ্কর হল এবার। লাফিয়ে পড়ল টর্পেডোর ওপর। শুইয়ে ফেলল মাটিতে। পাড়ার সমস্ত কুকুর সমন্বরে চিৎকার করছে যেউ যেউ। অর্থাৎ লড়ে যাও টর্পেডো আমরা সঙ্গে আছি। কিন্তু চিৎকারই সার। মাদী-মদা মিলে খানদশেক কুকুর দাঁড়িয়ে। অথচ কেউই সাহস করে এগিয়ে যাচ্ছে না টর্পেডোর সাহায্যে। গোপাল তাত্ত্বরে চোঁচাচ্ছে—“এট্যাক ডন, ফাইট ড্যানি। ড্যানি এবার একটু ধাতু হলে ডনের কজা করা টর্পেডোর একটা কান খুলে কেটে নিল। মাংসের বদলে মাংস কেটে নিল ড্যানি। এই প্রথম টর্পেডোর হকারের পরিবর্তে কেঁউ কেঁউ শব্দ শুনেতে গেল পাড়ার লোকেরা। এই সুযোগে গোপাল একজনের লাঠি নিয়ে টর্পেডোর মাথায় বসাতে গেল মোক্ষম আঘাত। টর্পেডো মাটিতে শুয়ে। কাটা কান দিয়ে রক্ত ঝরছে অঝোরে। ঐ বিপন্নতার মধ্যেও জ্ঞাত-ফাইটারের অনুমানে মাথাটা সরিয়ে নিতে পেরেছিল অকস্মিক, নয়তো গোপালের লাঠির আঘাতে শেষ হয়ে যেতে পারত জীবনটা। টর্পেডোর ঐ কল্লপ পরিণতি দেখে সারমেয়র দল আক্রমণের ঝুঁকি নিয়েছিল কিনা জানি না, তবে তারা ঐ গোপালের লাঠি তোলা দেখে সম্ভবত অনুমান করেছিল এবার তাদেরই আক্রমণ করতে আসছে গোপাল। আর কালবিলম্ব না করে সারমেয় জাতির স্বাভাবিক ক্রিয়ায়

আত্মরক্ষার্থে হেঁকে ধরল গোপালকে। ঐ মাদী-মন্দা দশ সারমেয় খেউ খেউ করে আক্রমণ করল যৌথভাবে। এই অবসরে এক সারমেয় সাহস করে গোপালের পায়ে বসালো মোক্ষম কামড়। ডন ও ড্যানি প্রভু নির্যাতন দেখে টর্পেডোকে ছেড়ে ঐ দশ সারমেয়কে আক্রমণ করল তৎক্ষণাৎ। টর্পেডো এই সুযোগে ছাড়া পেয়ে প্রভুর পায়ের কাছে আত্মনি নত হল। প্রভুর অক্ষ-জলে নিজেকে সিক্ত করে আরো হিংস্র হল টর্পেডো। তারপর যুদ্ধের যে ভয়াবহ রূপ, তা অভিমন্যু বধের পর অর্জুনের উন্নত যুদ্ধের সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয়। পৃথিবীর ক্ষিপ্ততম এই সারমেয় যুদ্ধের বর্ণনা ধারাবিবরণীর ক্ষুদ্র পরিসরে বিবৃত করার চেষ্টা বৃথা। সর্বশেষে যুদ্ধের ফলাফল হল এইরকম : ‘ডন নিহত, ড্যানি আহত।’

টর্পেডোর ঐ ভয়ঙ্কর খুনে মেজাজ দেখে ভয় পেয়ে গেল গোপাল ও তার চল্লিশ লাঠিয়াল। তারা লড়তে এসেছিল নরেন ওরফে টাইফুনের সঙ্গে। কিন্তু নরেন এখন নিশ্চল মহীরাহ, লাঠিতে ভর দিয়ে স্থবির, স্থানু হয়ে সব কিছু দেখছে। আক্রমণকারী এখন শুধুই টর্পেডো। অতএব গোপালের নেতৃত্বে চল্লিশ লাঠিয়াল একযোগে টর্পেডোকে আক্রমণ করল। অতগুলো লাঠির ভয়ে মাদী-মন্দা দশ সারমেয়র দল আকাশ বিদীর্ণ করে আওয়াজ তুলল খেউ খেউ। অর্থাৎ বাঁচাও বাঁচাও। ঝপাঝপ লাঠির আঘাতে তিন চারটে কুকুর অস্বাভাবিক প্রাণ দিল। টর্পেডো কিন্তু মানুষের সংঘবদ্ধ আক্রমণের মোকাবিলায় রণ্ড ছিল বহুকাল আগেই। তাই আজ আর এখন কোনো অসুবিধাই হল না এই যুদ্ধে। অতি দ্রুততায় কখনও সামনে, কখনও পেছনে, কখনও বামে কখনও দক্ষিণে সরে গিয়ে, এক-একজনের পায়ের মাংস খাবলে তুলে নিল। টর্পেডোর এই তৎপরতায় ও চোরাগোষ্ঠা আক্রমণে ছিন্নভিন্ন চল্লিশ লাঠিয়ালের দল। গোপাল এবার সোনলা বন্দুক নিয়ে হুঙ্কার দিল—‘নরেন তোরে কুকুর সামলা, নয়তো গুলি করে মেরে দেবো।’

নরেনের বুক কেঁপে উঠল। আর নিশ্চল মহীরাহ থাকতে পারল না। কাঁপা কাঁপা অস্বাভাবিক গলায় বলল—‘কিরে আয় টর্পেডো, কিরে আয়।’ প্রভুর নির্দেশে রণে ভঙ্গ দিল টর্পেডো। কাটা কান দিয়ে রক্ত পড়ছে। টর্পেডোর মাধ্যম হাত বোলাতে বোলাতে নরেন বিড়বিড় করে বলছে—‘অন্যায়টা কার মার না গোপালের, আগে জানতে হবে।’

নরেনের নিশ্চলতায় অন্তর্নিহিত এক ভয়

এদিনের যুদ্ধে নরেনের নিশ্চল হয়ে যাওয়ার অন্তর্নিহিত নরেনের যে বিবেচনা কাজ করেছিল, সেটা যারা জানে না, নরেনের মৌনতা দেখে সেদিন তারা সত্যিই আশ্চর্য হয়েছিল। এরপর থেকে নরেন অনেক বদলে গেছে।

জনে জনে শুধু জিজ্ঞাসা করে—‘মার সঙ্গে গোপালের যে সম্পর্ক..., তাতে দোষটা কার? মার না গোপালের?’

সকলেই একবাক্যে সাঙ্ঘ্যনা দিয়ে বলে, ‘গোপালের’। এই ভাবে নরেন জনে জনে জিজ্ঞাসা করে গোপালের বিরুদ্ধে নিজেকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। এতদিন নরেন শুধুমাত্র আপন বিবেচনার অন্যায়কারীকে চিনতে চেয়েছে। কিন্তু আজ জনে জনে জিজ্ঞাসা করে ব্যক্তি বিবেচনার সংশয়কে দূর করতে চাইছে সামগ্রিক বিবেচনার নিরিখে। টর্পেডো সেদিন যত সহজে গোপালদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিল, নরেন পারেনি। অন্যায়কারী চিহ্নিতকরণের বিবেচনা তাকে বিমুগ্ধ করেছে। নরেন টর্পেডো হতে পারেনি। নরেন অপেক্ষায় আছে শত্রু চিহ্নিত করণের। ব্যক্তি নয়, সামগ্রিক বিবেচনায়ও যদি গোপাল শত্রু বলে বিবেচিত হয় তবে সেও যে কোনো দিন ঝাঁপিয়ে পড়বে গোপালদের ওপর। সেদিনের ঐ রক্তমূর্তি দেখে টর্পেডো নিশ্চয় কান্নায় ভেজা মাটিকে আঁচড়ে বিদীর্ণ করে দেবে না। নরেনও যে কোনো দিন টর্পেডো হতে পারে, যদি সে সঠিক বিবেচনায় শত্রুর হদিশ পায়।

বেরাল কার্তিক লাহিড়ী

প্রাণবুদ্ধ যখন গর্জে ওঠেন—হিনজ (ইঁদুর) হিনজ (ইঁদুর) তখনই—
এই হাঁচাখর কতর (উপত্যকা)—এর গভীর নির্জনতা ভেঙে খান খান
হতে থাকে, সকলের চমকে ওঠা ঐ ঘোষণায় মিশে মিশে চারদিকের হাচাম
(খাড়া পাহাড়) হাপুঙ (পাহাড়) টিলায় লেগে লেগে সমতলে গোজা খেয়ে
আবার পাহাড় টিলার উপর থাকায় প্রতিধ্বনি হয়ে হয়ে কোলাহলময় করে
তোলে সারা উপত্যকা, আর তাদের হামা-কলক (দীর্ঘশ্বাস) হাওয়ায় শব্দিত
হতে থাকে

উপত্যকা গভীর নির্জন থাকে না আর
শব্দে শব্দে ছেয়ে যায় সারা উপত্যকা কারণ হিনজ চলাফেরা করে তাতে
শব্দ হয়
যখন ইঁদুর কিছু কাঁটে তখন শব্দ হয় চিকচিক, দীর্ঘশ্বাস পড়ারও শব্দ
হয়

এতদিন তারা স্বল্পতার মধ্যে ছিল, এখন নৈঃশব্দ ভেঙে পড়ছে, বৃকের
মধ্যে শব্দের ঢেউ হৃদপিণ্ডের দোলন বাড়িয়ে দিচ্ছে তাতেও শব্দ হয়—
শব্দের শব্দ, ইঁদুররা তাদের ধনে প্রাণে মারছে

জুন্দের কসল তুলতে পারছে না ঘরে, ঘেঁটুকু আনছে তা-ও খেয়ে সাফ
করে দিচ্ছে, অথচ

ইঁদুর যখন বাঁশফুল খেয়ে ফেলাছিল তখন কি আনন্দ-ই না হয়, কারণ
ঐ ফুল ফোটা অশুভ, বয়ে আনে অনাহার দুর্ভিক্ষ দুর্যোগ আরও কত
কি

বাঁশফুল ফুটলে কোথাও সুলক্ষণ দেখা দেয় না

সেই ফুল কোটে কত কত বছর বাদে—প্রাণ বৃদ্ধও বলতে পারেন
না, কারণ তাঁর জীবৎকালে ঐ ফুল ফুটতে দেখেন নি, শুনেছিলেন বুফা
(বাবা)-র কাছে তার সম্বন্ধে, তিনি জানান ঐ ফুল ইঁদুরের প্রিয় খাদ্য,
মেয়ে ইঁদুর একসঙ্গে ৬ থেকে ১০টি বাচ্চার জন্ম দেয় প্রতি মাসে, কিন্তু
এ কথা তিনি জানাননি ওদের, এখন অগণিত ইঁদুর ভাঁড়ার উজাড় করে
দিচ্ছে দেখে অস্বস্তিতে পড়েন খুব

অধিবাসীরা অস্থির হয়ে উঠছে, বুঝতে পারছে এই ভাবে চললে অনাহারে
মরতে হবে নির্ভাত, দুবস্ত মানুষ যেমন কুটো ধরে বাঁচতে চায়, তেমনভাবে
এরা হাতে তুলে নেয় মাকবারা (লাঠি)

কিন্তু এদের চলন এত দ্রুত যে ঠিকমত তাক করে মারার আগেই এরা চলে গেছে অন্য কোথাও, বার বার চেষ্টা বিফল হলে মনে আরেক ভয় এসে ঢোকে, তবে কি সব বুড়াছা (জাগ্রত দেবতা)-র রোষে ঘটছে? তাই এমন উৎপাত শুরু হয়েছে?

তখন সকলে ছুটুই (হলুদ) নিয়ে জমিতে যায়, জমির চারকোণায় পূতে দেয় হলুদ, বুড়াছা আর উৎপাত করবেন না, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে

কিন্তু সেই স্বস্তি আর কতক্ষণের, ইঁদুর নিজের কাজ করে চলে চোখের অগোচরে অথচ, এটা কাটে ওটা কাটে—ধান ভুট্টা তিল সব গাছের চারা আর গাছ, তার মানে বুড়াছার রাগ কমেনি মোটে, তাহলে এখন তাঁকে তুষ্ট করতে হবে মহাপূজায়...

ঘরের লক্ষ্মীও চলে যাচ্ছেন, ওরা খেয়ে নিচ্ছে সব, কিছুই উঠছে না ঘরে, লক্ষ্মী রুষ্ট হয়েছেন তাই শ'য়ে শ'য়ে অলক্ষ্মী পাঠিয়ে দিয়েছেন ঐ বেশে

অতএব লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা করতে হয়

কিন্তু মুশ্কিল এই যে জুমের ধান ঘরে আসেনি, তাই রন্দক পূজো করা যায়নি, আর তা হয়নি বলে মাইলুমা (ধানের দেবী, লক্ষ্মী) ও খুলুমা (কোপাসের দেবী)-র পূজোর কথা কারো মনে পড়েনি

এখন মনে পড়লেও লক্ষ্মীর পূজো করা যাবে কি? নতুন ধানের চাল ঘরে আসেনি, সেখানে লক্ষ্মী পূজো করা যায় না, নবান্ন-র সময় ঘট রেখে দিতে হয়, সেই ঘট লাগে মাইলুমা পূজোর সময়, এই অবস্থায় পূজো করলে যদি লক্ষ্মী রুষ্ট হন, তবে অলক্ষ্মী এসে জুড়ে বসবেন, তখন...

ভাবতে বুক কাঁপতে থাকে ভয়ে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়, এখন এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে কে? অসহায়ভাবে তারা চারদিকে তাকায়, কোথাও কিছু নেই—পাহাড়ের পর পাহাড় ঢিলা আর বলঙ (বন), এর মধ্যে কি কিছু নেই

হাপড় (পাহাড়) হাচুক (উঁচু পাহাড়) হাচাম (খাড়া পাহাড়) আর ঢিলা, তার গায়ে গাছের পর গাছ—শাল সেগুন বাঁশ গর্জন শিমূল কড়ই বহেরা শিত গামাই সোনালা চামলা জাম আরও আরও কত, কখনো বা পাহাড়ের ঢালে জুমের জমি—বেবাক শূন্য হাহা করছে, চাষের জায়গা কাঁকা পড়ে আছে, যেন অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে গেছে মাটি, ধান গাছে খোড় আসা মাত্র কেটে কুটি কুটি করে দিচ্ছে, সব খাচ্ছে না, কিন্তু নষ্ট করে দিচ্ছে কেটে কেটে

কতটুকু প্রাণী—কলক (লম্বা)-এ বোধহয় এক বিঘত ও হবে না, তো সেই প্রাণীর পেট-ই বা কত বড় হবে, অথচ কেটে কুটে খেয়ে শেষ করে

দিকে, হয়ত এবার ঘরের মধ্যে ঢুকে মায়রাঙ (খালা) লুতা (ঘাট) গলা (কলসি) ইত্যাদি কাটতে শুরু করবে

তা হলে কি করা?

অসহায় ভাবে দিন কাটে, ফিরে আসে আবার জুম করার সময়, এবার তো উঠতে হয়

প্রথমে জায়গা বাছতে হবে জুমের, তাই এগিয়ে যায় উত্তরের পাহাড়ের দিকে, একটা ঢালু জায়গা বেছে নিলে পরিষ্কার করে, তারপর বাঁশের টুকরো দু-তাগ ছুঁড়ে দেয় আকাশের দিকে, একখণ্ড উপড় অন্য খণ্ড চিত হয়ে পড়লে শুভ হবে তবে

নাহ দু-খণ্ডই চিত হয়ে পড়ে

তখন আবার ছোঁড়া হয়—এবারও না, তারপর আরেকবার—এবার নয় তাই যেতে হচ্ছে দক্ষিণে

সেখানেও বাঁশের টুকরো চিত হয়ে পড়ে, মানে এখানেও জুম করা চলবে না

তারপর পশ্চিম হয়ে একেবারে পূবে

এখানে মিলল শেষে জুমের জমি

জমির আগাছা গাছ সব কাটা হলো, কেটে ঐ অবস্থায় ফেলে রাখা হচ্ছে কড় রদুরে শুকোবার জন্য, তারপর পোড়ানো, আশুন দিতেই জুসে ওঠে গাছের ডালপালা পাতা বাঁশ আগাছা যত ছিল—বাঁশ ফাটার শব্দ হয় দারুণ, আশুনের শিখা লকলক করে আকাশ ছোঁবে যেন, মধ্যে মধ্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলি দারুণ হয়ে ভরে দেয় উপত্যকা

আর তা দেখতে দেখতে গানে নাচে মত্ত হয়ে ওঠে আবালবৃদ্ধবনিতা, আনন্দ আনন্দ, আনন্দ চারদিকে, এতদিনে জন্ম হবে ছিনজ-রা, বেশ আরামে খাচ্ছিল দাচ্ছিল ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এবার? আশুন কাউকে রেয়াদ করে না, এবার বুঝবে ঠেলা, পুড়ে ঝাঁকরা হয়ে যাবে, আহ

স্বস্তি সুখের নিঃশ্বাস পড়ে, এবার আসছে সুদিন—

ফনফনিরে বেড়ে উঠছে ধান ভূট্টা কাপাস তিল, টংঘরে টংঘরে চলছে দ্বন্দ্ব গানে গানে বুঝক যুবতীর, গোলার উঠছে ফসল, নতুন চালে হচ্ছে নবান্ন, তারপর লক্ষ্মীপূজা গড়িয়া পূজা তুইমা (গঙ্গা)-র পূজা, শ্রুয়ার মূর্গি কাটা হচ্ছে, আসছে পচাই মদ, বাঁশি চম্পেন (একরকম বাদ্যযন্ত্র)—এর মিষ্টি সুরে মেতে উঠছে উপত্যকা আবার

এই হাঁচাখর কতর (উপত্যকা) গভীর নির্জন হয়ে যাবে

শান্ত অসীম

হাপুঙ (পাহাড়) বলঙ (বন) এর সবুজতা কোমল হয়ে আকাশে ছড়িয়ে

পড়বে, নখা (আকাশ) সবুজে নীলে একাকার হয়ে নানা ছবি আঁকবে, ঝর্ণার ঝিরঝির নির্জনতা প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিরুদ্ভিগ্ন করবে, তারায় তারায় ঝলসে উঠবে জ্যোৎস্নার প্রাচীন

হায় তাদের সব আশা বিফল করে দিয়ে ইঁদুররা পোড়া জমির উপর দিয়ে দ্রুত ছুটে চলে যায় এখার থেকে ওখার

জুম করেও লাভ হচ্ছে না তবে

তখন সেই বৃদ্ধ বলেন উঁরায় (ফাঁদ) পেতে ছিনজ ধরতে, মুখ দিয়ে কথা বের হতে না হতে ছাইরিক-এ (সন্ধ্যায়) ফাঁদ পাতে, আর প্রফুল্ল মনে বাড়ি ফেরে, রাতে ইমাং (স্বপ্ন) দেখে—

রাশি রাশি ছিনজ ধরা পড়েছে ফাঁদে, পালাবার উপায় নেই আর, ফাঁদের মধ্যে ঘুরছে ফিরছে তারপর ক্লান্ত হয়ে...

ফুঙ (ভোর)-এ তড়িঘড়ি উঠেই তারা ছুটে আসে ফাঁদের কাছে— কোথায় ইঁদুর? ফাঁদ তুলতে দেখে ফাঁদের জাল সব কাটা, তার মানে ওরা জালে পড়েছিল, তারপর জাল কেটে বেরিয়ে যায়

তবু বৃষ্টি পড়লে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায়, মাটি নরম হয়েছে, বীজ পোঁতার এই সময়, গর্ত করে করে তারা বীজ পোঁতে খাসা চিকন ধান ভুটা তিল কাপাস ইত্যাদির...

তবু মাটি ফুঁড়ে বের হয় না অঙ্কুর কিংবা চারা, ওরা মাটির তলা থেকে বের করে বীজ, শাঁসটুকু খেয়ে খোসা ফেলে রাখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, উপত্যকাবাসীর চোখ ফেটে জল বেরোয়, তারা অবশ্য সবংশে নিধন করতে চেয়েছিল ঐ ছোট্ট অখচ ক্ষতিকর প্রাণীদের, এদের কি আর কোনো কাজ নেই, মতলব খানা কি তবে?

ধরতে পারে না, কিন্তু এরা থাকলে তো তাদের বাঁচাই দায় হবে, তাই পুজো কত কত দেবতার, দেবতারাও কিছু বিহিত করলেন না, করলেন না, না পারলেন না?

কি করবে এখন তাহলে?

এত চেষ্টা বিফল হচ্ছে, চোখে অন্ধকার বুকে হতাশা, উপত্যকাবাসীদের মনে কোনো তত্ত্বগণ (সুখ) নেই, খা খায় (আশা) নেই, খাবাইজ্ঞাক (নৈরাশ্য) ছেয়ে আছে ঘন হয়ে, সবাই এক জায়গায় মিলিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে ভাবি হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস, কত কি করলো ওদের বিরুদ্ধে— লাঠি দিয়ে মারা, জুনের আগুনে পোড়ানো, দেবদেবীর পুজো, শেবমেশ ফাঁদ পাতা

সব বিফল হলো তবু

হতাশা নিরাশায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, চারদিকে হতাশা, তার উপরে তাঁড়ার

শূন্য, খাদ্যের অভাবে জীর্ণ হতে শুরু করেছে, ককালসার চেহারা, চাল তো কোন্ হার বুনো ফলও নেই কোথাও, সব খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে ইঁদুর, আর পরিভ্রাণ নেই, ধায় (মৃত্যু) এখন নিশ্চিত, কেউ তাদের এবার তরাতে পারবে না আর

• অপেক্ষা ছাড়া গতি নেই, শুধু হা-হতাশ

তখন ছিয়ারি (কুয়াশা)-র এক হালকা আবরণ ঢেকে ফেলে উপত্যকা, এসময় কুয়াশা। চমকে ওঠে, গা শিউরে আবার এক গভীর ভয়ের মধ্যে ফেলে দেয়

আবার কিছু ঘটতে চলছে নাকি? এ ওর দিকে তাকায় অসহায়ভাবে, হিনজ (ইঁদুর)-এর আবির্ভাবের চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছুর বীজ, গাছের শাঁস, পাতা, ফুল ফল—সব উজাড় হয়ে গেছে ওদের তাণ্ডবে, আর এরই ভিতরে কুয়াশা ছেয়ে ফেলছে, উদ্বেগ, অপেক্ষা করতে থাকে কুয়াশায় কিছু ঘটায় জন্য—

তখন ঐ কুয়াশার মধ্যে তারার মত উজ্জ্বল দুটি আলো দেখা দেয়, সেই আলোয় কুয়াশা তরল হতে থাকে, তখন বুঝতে পারে

ঐ দুটি আলোর চুকুরো তারা নয়—চোখ, সেই চোখ সোজা তাগ করে আছে তাদের দিকে, যেন এ ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে তখন তখনুনি ওরা ভয়ে সিঁটিয়ে যেতে থাকে

এ আবার কে? কোন্ জীব? বাঘ ভালুক চিতা হরিণ ইত্যাদি দেখেছে তারা, কিন্তু এ কোন্ জীব।

জীব নাকি অন্যকিছু

আন্তে আন্তে আগন্তকের অবয়ব ফুটতে থাকে, ক্রমে কুয়াশা হালকা হয়

বাঘচিতার চোখও অন্ধকারে ডুলডুলায়, কিন্তু তাদের রং পাঁশটে, কারো শরীরে ডোরা কাটা দাগ, চিতার শরীরে চাক চাক দাগ অথচ

এর শরীরে দাগ নেই কোনো

কুয়াশা সরে স্পষ্ট হচ্ছে এখন—সাদা, লোমময় ছোট্ট খাটো, আর মুখের মধ্যে ছটফট করছে কি যেন....

কেউ বুঝতে পারে না, তবে ওর সোজা তাকানো একটা হিমেল স্রোত বইয়ে দিচ্ছে শরীরে

ঐ দৃষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষা করার কথাও ভুলে গেছে কখন, যত দেখে তত অবাক হয়

এ কোন্ জীব তবে? খেয়ে এসে আক্রমণ করছে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কেবল সোজা তাকিয়ে আছে, মুখে ধরা জিনিষটা মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে

বুড়াছা রেগে গেছেন তাদের উপর? তাই পাটিয়ে দিয়েছেন ওকে, ভয়ের ঠাণ্ডা হাওয়া আবার জড়িয়ে ধরে সারা শরীর, লোম সব খাড়া হয়ে উঠেছে, পারলে এ ওকে জড়িয়ে ধরে ওর আক্রমণ থেকে বাঁচতে চায়, বুড়াছা-র রাগ দারুণ, যা খুশি হয়ে যেতে পারে যে কোনও মুহূর্তে...

ভাবতে কাঠ হয়ে যেতে থাকে, যেন প্রাণহীন শব, আবেগ অনুভূতি বোধ কিছু নেই এখন, তারা তৈরী হয় ঐ জীবের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য, সেই মুহূর্তে বৃদ্ধপ্রাণ চিংকার করে ওঠেন—

আমিও, আমিও, আমিও ছিনজ্জ মাসা বুধারখা (বেরাল, বেরাল, বেরাল একটা ইঁদুর মেয়েছে)

বৃদ্ধের চিংকারের মর্ম ঠিক বুঝতে পারে না সমবেত সকলে, তাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে

বৃদ্ধ আবার আমিও আমিও (বেরাল, বেরাল) বলে উঠলে তারা সঠিক বুঝতে পারে না তবু, তখন বৃদ্ধ আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে ঘাম দিয়ে ছুর ছাড়ে যেন, বুঝতে পারে তখন বাঁশফুল যেমন ইঁদুরের প্রিয় খাদ্য, তেমনি বেরালের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে ইঁদুর, আর এটা জানতে পেরেই লাফিয়ে ওঠে তারা, এবং

নাচ গান হৈ-হুল্লোড়ে মেতে যায়, চুড়াক (মদ) আসে, তা গিলে গিলে মাথোয়রা হয়ে যেতে থাকে—উদ্দাম উদ্দাস, এবার বুঝবে ঠেলা ছিনজ্জ-রা (ইঁদুরা-রা), তাদের পরিজ্ঞাতা রূপে আবির্ভূত হয়েছে বেরাল

বেরাল-রা ইঁদুর মারতে থাকে, ইঁদুর-রা পালাবার পথ পায় না আর, যত দ্রুত তারা পালাতে চেষ্টা করে তত দ্রুত বেরালরা খপাখপ ধরে ফেলে ইঁদুরের উৎপাত নেই আর

আগের জীবন ফিরে পাচ্ছে তারা, অশান্তি নেই কোনো তাই জুমের জমি পরিষ্কার করছে, জুমে আগুন ধরাচ্ছে, পড়ে থাকছে জমি, বৃষ্টি হলে মাটি নরম হয়, গর্ত করে বীজ পৌতে, চারা বেড়ে বেড়ে গাছ হয়, ফসল ফলে, কেটে টংঘরে ভর্তি করা, তারপর বাড়িতে আনা

তাদের ইমাং (স্বপ্ন) সকল হতে চলছে, দু-চোখ জ্বলে ওঠে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলো, বিরাট আশা

এসবই সম্ভব হচ্ছে আমিও (বেরাল)-এর জন্য

পরিজ্ঞাতা তিনি, তাঁকে তুষ্ট করা দরকার, কিন্তু কি ভাবে করবে ভেবে পায় না, আলোচনা চলে—

ওদের কি ভালমন্দ খাওয়ালে তুষ্ট করা যাবে? তবে পূজো করতে হবে আমিও দেবতাকে?

কিন্তু পূজো করবে কিস্তাবে? এঁরা তো নতুন দেবতা, আচাই (পুরোহিত)

জ্ঞানেন না আমিষ্ট-দেবতার পূজোর মন্ত্ৰ,

তাহলে? কিছু করতেই হয় অথচ

তিনি হচ্ছেন পরিত্রাতা, তাদের বাঁচিয়েছেন সমূহ সর্বনাশের হাত থেকে
বুড়ান্না, সংগ্রামা, মহিলুমা, খলুমা, তুইমা—সকলের চেয়ে বড় দেবতা
আমিষ্ট, তাঁর কৃপায় ওরা সব কাজ করতে পারছে স্বচ্ছন্দে, অথচ প্রতিদানে
কিছুই দিতে পারছে না

দিন যায়, এবং তারা ভুলতে থাকে পরিত্রাতার ঋণের কথা, যখন
উপত্যকা হয় গভীর নির্জন তখন সুখ শান্তির অভাব হয় না, সুখের সময়
কি দুঃখের স্মৃতি মনে থাকে কারো? আর বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলে
কে আর মনে রাখে কে উদ্ধার করলো বিপদ, এমনই নিয়ম

এই রকম একদিন যখন উপত্যকা গভীর নির্জন, হঠাৎ এক কুয়াশা
ঢেকে দেয় চরাচর

তারা চমকে ওঠে, এরকম এক কুয়াশায় আবৃত হলে আমিষ্টের (বেরাল)
আবির্ভাব হয়, এই কুয়াশা কি তার চলে যাবার ইঙ্গিত?

বুক কঁপে ওঠে, বেরাল-রা চলে গেলে আবার অনর্থের সৃষ্টি হবে,
ছিনজ-রা (ইঁদুর) ফিরে আসবে নির্ভয়ে, তখন অত্যাচার শুরু করবে বেশি
বেশি আরও

তাহলে?

চোখে চোখে কথা হয়, ঠিক হয় ঘরে ঘরে আমিষ্টের পূজা করতে
হবে, যে-কোনো উপায়ে তুষ্ট করতেই হবে, এছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই

একটা হুঁসি যখন পেয়েছে তখন ভয় কিসের, প্রফুল্ল মনে ফিরে আসতে
থাকে বাড়ির দিকে, অচাই (পুরোহিত) একটা শুভ দিন শুণে বলবেন,
তারপর...

বেশ ফুরফুরে মেজাজে গান গাইতে গাইতে ফিরতে থাকে...

খুব নিশ্চিন্ত, আর ভয় নেই কোনো, তাকে তুষ্ট করতে পারলেই ব্যাস
কিন্তু একি? ঘরের দরজা হাট করে খোলা, ভিতরে অন্ধকার, সেই
অন্ধকারে জ্বলছে কাঁচাক-খীরভজি (কটা) দুটি চোখ, মাচার উপর ওত পেতে
বসে আছে যেন, চোখ জ্বলছে রোষের আগুনে নাকি?

ঠিক করার আগেই পালাতে চেষ্টা করে, ততক্ষণে আমিষ্ট লাক দিয়ে,
ধরে ফেলেছে গলা, নখের দাঁতের তীক্ষ্ণ আঁটুনি গলার নলি হিঁড়ে ফেলতে
চায়, তারা ঝটকা মেরে মেরে সেই ধাবা থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা
করে, আর

পালাতে থাকে টিলা পাহাড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দিকবিদিক জ্ঞান না করে
পিছন ফিরে তাকায় না আর

তারা দৌড়তে থাকে, দৌড়তে থাকে তবু...

মানুষ ও মেসিনের জীবন

অমর মিত্র

বুদ্ধিশ্বর জানে তার তুল্য চতুর মানুষ এই বারো কপাট, মহিষগোটি, কেঁটপুর, নয়াপট্টি এলাকায় নেই। শুধু এই আধাগঞ্জ, আধা নগরেই বা কেন, খোদ সন্টলেক উপনগরীর দালান কোঠা, প্রাসাদ, কুটিরবাসী মানুষের ভিতরও নেই। লেখাপড়া শেখেনি তাই, শিখলে যে কী হতো। নেই তাই খাচ্ছে, থাকলে কোথায় পেতে? এখন যেটুকু গতর নাড়াতে হয়, লেখাপড়া জানলে তাও হত না, শুয়ে বসে, লাল টুকটুকে মারুতি গাড়িতে চেপে, সুন্দরী মেয়েমানুষ নিয়ে জীবনটা তোফায় কেটে যেত। লেখাপড়া জানা লোককে গায়ের ঘাম ঝরাতে হয় না, তাদের শুধু মাথাই চলে। বুদ্ধিশ্বর নকর জানে তার মাথাও কম চলে না, তবে কিনা দেহও চালাতে হয় সঙ্গে সঙ্গে। এই যে বুদ্ধিশ্বর চলেছে জিতু মশলের খোঁজে—এই যাওয়া মাথা এবং দেহের একসঙ্গে চলা। গায়ের ঘাম ঝরছে যেমন, মাথাও খাটাতে হচ্ছে কম না। জিতুকে দিয়ে খোঁজ করাতে হবে নয়াপট্টির সেই বউটাকে। সকাল থেকে সঙ্গে পর্যন্ত বউটা কাজে বিরাম দেয় না। দশদিনের কাজ পাঁচদিনে তুলতে পারে বোকা মেয়েমানুষটা। বুদ্ধিশ্বরের চাই তাকেই। আগের বার টাকা দেওয়ার সময় বিশ টাকা কম দিলেও গাঁই শুই করে তা নিয়ে চলে গেল জবা। জবার খোঁজ জানে জিতু মশল। তার মাথাও কম চলে না।

এই যে চলেছে বুদ্ধিশ্বর। কখনো সে কোচপুকুরের ডেড়ির পাহারাদার, কখনো সন্টলেকের নির্মীয়মাণ বাড়ির নাইটগার্ড, সিমেন্ট, লোহার গোপন সাদ্রায়ার, কখনো সে লেদ মিত্রি—যখন যেমন পায়। কিছু দিন হাতিবাগানের ফুটপাথে ছিট কাপড়ের ব্রুক, ইজেরও বেছেছে, শেষে পুলিশের ঘরে সব জমা দিয়ে ফিরে এসেছে নিজ কুলায়ে। এখন সে ঠিক্কার। বারো কপাটে মস্ত একখানা বাড়ি উঠছে। সেই বাড়ি সব কাজ শেষ না করে টাকা নিয়ে ভেগেছে কলকাতার ঠিক্কার। দস্ত মশায় তাকে ধরে পড়েছে, ভাই বুদ্ধিশ্বরবাবু, তুমি কমব্রীট করে দাও, রং করে দাও, মেঝের মোজাইক ঘষে দাও, আনালায় কাচ লাগিয়ে দাও, বাইরেটায় সিমেন্টের খোলা মেঝে দাও, আমি আর কোথায় যাব?

বুদ্ধিশ্বরের ছোট ছোট দুচোখের পাতা দন্দদন্দ করল, ঠোঁটের কোম্পে হাসি ফুটল, রং মিত্রি লাগিয়ে এক থাকায় দুহাজার পকেটে এসেছে। বাবুর টাকা অনেক মনে হয়, কী সব ব্যবসাপাতি আছে কলকাতায়, বুদ্ধিশ্বর যেমন

চাইবে তেমন দেবে। বাড়িটা সুন্দর হয়ে ওঠা চাই। বাবু বলছে, বুদ্ধিশ্বর তুমি হলে গয়নাওয়ালা, গয়না পরিয়ে সাজাবে বাড়িটাকে, দেখি কেমন পার, চোখ জুড়িয়ে যায় কিনা।

বুদ্ধিশ্বরের বুক জুড়োচ্ছে ঠিকেমারিতে। রং মিশ্রিকে দিল চার হাজার, বাবুর কাছ থেকে বিল নিল ছ'হাজার। মোড়েইক ঘষতে একটা মেয়েমানুষ ক'দিন নেবে? নয়্যাপট্টির সেই হাবলা নগেনের বউ নেবে পাঁচদিন তো অন্যরা নেবে দশদিন। আহা কেমন চলোচলো যুবতী বউটি। ওর হাতের কাছ দেখেও সুখ। বুদ্ধিশ্বরের মাথা আছে, না হলে সেই জ্বার কথা মনে পড়ে? কই, রং মিশ্রির কাজের সময়ও মনেই পড়ল না জ্বাকে।

আধময়লা ধুতি, শার্ট, হাতে ফোমের হাতব্যাগ নিয়ে লেখাপড়া জানা ঠিকেমারের মতো হাঁটছে বুদ্ধিশ্বর। জিতু মণ্ডল হলো কাজের লোক সাপারায়। যে কাজে মজুর চাই, মেয়েমানুষ চাই কি পুরুষমানুষ চাই, জিতুকে বলো, ঠিক এনে দেবে। বাড়ির ঠিকে কাজের লোক, ঠিকেমারের মাটি কাটার লোক, রাজমিস্ত্রির জোগাড়—সব জিতু মণ্ডলের হাতে। এমনকি অন্য কাজেও মেয়েমানুষ চাইলে, জিতু খুঁজে এনে দেবে। বারোকপাটে এক নতুন ডাক্তার বসচে, শোনা যাচ্ছে তার রোগীও এনে দিচ্ছে জিতু। তার মাথাটাও বড় পরিষ্কার। কে কী চায় মুখ দেখেই ধরতে পারে। এখন এই অপরাহ্ন বেলায় জিতু বসে আছে বারোকপাটের মাঠে। এই সব জমিতে ধান হতো এককালে, এখন ধান ঘেঁষে বিক্রি হয়ে গেছে, একটা দুটো বাড়ি হচ্ছে, তানামারা পড়ে থাকছে, রাস্তাঘাট ভাল হওয়ার অপেক্ষায় আছে সবাই। বুদ্ধিশ্বর হাঁক দিল, জিতু, ওরে জিতেন উঠে আয়।

জিতেন আরো তিনজনের সঙ্গে পাস্তুর নিয়ে বসে আছে। এসেই হাত নাড়ল, এসো বুদ্ধিদা, সূর্য ডুবে গেল, কাজও শেষ হলো, এক পাস্তুর হয়ে যাক।

বুদ্ধিশ্বর এগিয়ে এল। জিতু মণ্ডলের কোনো বড় ছোট জ্ঞান নেই। কাদের সঙ্গে খেতে বসেছে। সব ভেড়ির মাছমাঝা। নলবন ভেড়ি আর মুনশির ভেড়ির মজুর। ভেড়ি এখন শুকনো ঝটখটে। মাটি কাটা হচ্ছে। মাটি বাচ্ছে খালের ওপারের নিউ টাউনে। মাটি কাটছে মেশিন। মস্ত দৈত্যের মতো ডোজার নেমেছে ভেড়ির শুকনো বৃকে। মাটি কেটে তুলে দিচ্ছে শক্তিমান ট্রাকে। মানুষের কোনো কারবার নেই। ও হলো বিলিতি ঠিকেমার। বিলিতি ঠিকেমারের মজুর দরকার হয় না, সব মেশিনে কাজ হয়। মেশিনের জন্য তেল লাগে, আর কিছু না, হস্তার পেমেন্ট নেই, মজুরের পিছনে খিটখিটানি নেই। ঠিকেমার হলে অমন হতে হয়। শুধু মেশিন কাজ করছে কিনা দেখলে হয়ে যাবে।

জিতু ডাকল, বসে যাও বুদ্ধিদা।

জিতুর সঙ্গে তিনটে মাছমাারাও হাকল, বসে যাও বুদ্ধিদা।

বুদ্ধিধর তার পা ঝাড়ল, ঠিকের যদি মজুরের সঙ্গে পাস্তুর নিয়ে বসে তো কাজের চিন্তি। সে ডাকল জিতেনকে, কলমিগ্রি চাই পরের সপ্তায়, এখন চাই জবারাণীকে, মোজেক ঘষতে হবে।

জিতেন কুতকুতে চোখে তাকায়, কোন্ জবা?

মায়ের পায়ের, বলছি সেই মেয়েছেলেটা, হাদের প্যারাপেট প্লাস্টারের সময় কাজ করল কদিন মিস্তির হেলপার হয়ে।

জিতেন বলল, জবা তিনজন আছে বুদ্ধিদা, একজন আছে মহিষগোটে, রামার কাজ করে সলসেকে, একজন আছে বারোকপাটে, নিতাই কুণুর বউ, রেশন কার্ডে জবা নাম, আর নমাপট্রির হাবলা নগেনের বউ জবা, আরো জবা আছে, শুনবে?

কথায় খুব পাটোয়ারি বলেই শুধু লোকের ঠিকের নিয়ে জিতেন কেমন কাটিয়ে যাচ্ছে দিন। বুদ্ধিধর বোঝে জিতেন ঠিক আন্দাজ করেছিল কোন জবাকে খুঁজছে সে। কিন্তু একটু খেলিয়ে নিল। না খেলালে তার দামই বা বাড়বে কেন? এই মাছমাারা তিনজন বেকার হয়ে বসে আছে জিতেনের সঙ্গে পাস্তুর নিয়ে, কারণটা কী, না জিতেন খোঁজ দিতে পারবে কোথায় তাদের যোগ্য কাজ আছে। তাদের যোগ্য মানুষ খুঁজছে কে?

বুদ্ধিধর বলল, হাবলা নগেনের বউকে চাই।

খ্যাখ্যা করে হাসল জিতেন, লোকের বউও চাও, তোমার এ রোগ ধরল কবে বুদ্ধিদা?

বুদ্ধিধর গম্ভীর হলো ঠিকের নিভাবে, বলল, তুই না 'সেবার' সাপ্লায়ার জিতু, পাস্তুর নিয়ে সব ভুলে গেলি।

জিতেন মন্তল আবার হাসল, হাবলার বউটার দিকে তোমার কুনজর দিলো না বুদ্ধিদা, কী কাজ হবে?

বুদ্ধিধর বলল, ওই মেয়েমানুষটাকে চাই, কাকি দেয় না, 'রেন' নেয় না, কাজ আছে দশদিনের, কিন্তু ও করলে পাঁচদিনে হয়ে যাবে।

আমার কত?

তুই 'সেবার' এর কাছ থেকে বুঝে নিবি।

সে আমার বুঝ, তুমি কত দেবা।

নিস পক্ষাশ।

না, একশো করো।

একশো দিলে আমার কী থাকবে?

সে তোমার বুঝ, একশো চাই, নইলে ও 'লেবার' অন্য জায়গায় যাবে।
পাঁচশত কর।

ঠিক আছে আশি দিয়ে। বলতে বলতে ঝাপ করে উঠে পড়ল জ্বিতেন।
আধভাঁজ করা লুঙ্গি ছেড়ে দিয়ে চটিতে পা গলিয়ে দিল। হাঁটতে আরম্ভ
করল। ক'পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, মজুরি কত করে দেবে বুজ্জিদা?

কেন যাট টাকা, আর খোরাকি পাঁচ।

দুইজনের কাজ একা করে, রেটেও দেবে না?

ওর বেশি সম্ভব না, ঠিকেশ্বরে কি রেট দেয়?

পাঁচটাকা বাড়িয়ে, বাবুতো একশো দেবে।

বুজ্জিশ্বর রেগে গেল আচমকা, ওসব তোর ভাবতে হবে না, যা যা,
তুই যদি না পারিস আমি অন্য 'লেবার' নেব, কাজ কীভাবে আদায় করতে
হয় আমি জানি।

আর কথা বলল না জ্বিতেন মণ্ডল। হন হন করে হাঁটল খালপাড়ের
দিকে। খালপাড় ধরে হেঁটে যাবে নয়াপট্টর দিকে। মাঝে পড়বে নতুন ব্রিজ।
ওপারের নতুন টাউনের নতুন পোল। সন্টলেকের চেয়েও বড় নগর বসছে
ওপারে। ভাবলেই গা শিরশির করে ওঠে। ওপারে মাটির কাজে মানুষ লাগছে
না বটে, হাজার হাজার দালান কোঠা গড়তে কত রাজমিস্ত্রি, তার
জোগাড়—কত মানুষ লাগবে। সাপ্লাই দিয়ে পারবে না জ্বিতেন। জ্বিতেন
হাড়া মানুষের খবর আর কার কাছে থাকবে? তখন টাকা আসবে উড়ে
উড়ে। বিড়বিড় করতে থাকে সে, আমার তখন টাকা হবে, টাকা হলে
মোজ্জেক মেরে, পাক্স হাঙ্গের দালান হবে। সেইটা আমার বাড়ি। বাড়ি
হলে গাড়িও হবে। গাড়ি হলে আর কীই থাকবে বাকি, নীল শাড়ির আরো
একটা বউ হবে, ধলা মেয়ে কালো চুল, দেহতে বড় বিউটিফুল, সব হবে
নগর বসলে। বসুক নগর, তখন বুজ্জিশ্বরের হেঁচড়ামি চলবে না। পাঁচ কেজি
নারকেল দড়ি, দু কেজি পেরেকের জন্য তিন গুণ টাকা চেয়ে দস্তাবুকে
ঠকানো চলবে না। দস্তাবুর অনেক টাকা, রাজমিস্ত্রি যদি পেট্রল, মবিলাও
চেয়ে বসে, কেনার জন্য টাকা দিয়ে যাবে। টাকা হলে নাকি অমনই হয়।
হিসেব রাখা চলে না। জ্বিতেন ভাবে তারও অমন টাকা হবে, টাকা হলে
মন উড়ু হবে। টাকা উড়িয়ে দেবে আকাশে। ভাবতে ভাবতে জ্বিতেন চলে
নয়াপট্টর দিকে। হাবলা নগেনের বউ জ্বাকে চাই তার।

দুই

তিন মাছমারার নাম যদু, মধু আর চাঁদু। এখন অক্টোবাস, ভেড়ি হেঁকে
মাছ তোলার কথা প্রত্যেক দিন। বাটা, তেলাপিয়া, সরপুটি, চারাপোনা—
এইসব। তো ফলান মাস থেকেই তাদের কাজ নেই। ওই সময় থেকেই

ভেড়ির জল বের করে দিয়ে, তার বুক রোদে শুকিয়ে মাটি কাটা আরম্ভ হয়েছে। ওপারে যে টাউন হবে, সেই টাউনে হাজার হাজার লরি মাটি যাচ্ছে সকাল সন্ধ্যা, সমস্ত রাত্রির। বিরাম নেই কোনো। মানুষ তো আর মাটি কাটছে না, কাটা মাটি লরিতে তুলছে না—কাজ করছে মেসিন, মেসিনের আর দিন রাত্রির। মেসিন কখনো ঘুমোয় না। ভেড়ির মাটি দিয়ে ওপারে ধান জমি, পুকুর, বাগান, জলাজমি সব ভরাট করে দেওয়া হচ্ছে। তিন মাইমারা শুনেছে ওপারে কেন এপারেও নাকি জল আর থাকবে না। পুকুরও থাকবে না। নদীও থাকবে না। একটু আগে তাড়ি খেয়ে জিহ্বা বলছিল, জগতেই আর জল থাকবে না।

জল থাকবে না? চাঁদু জিজ্ঞেস করল ঠিকেলার বুদ্ধিধরকে।

দাঁড়িয়েছিল বুদ্ধিধর। তার ইচ্ছে হচ্ছিল বসে যেতে, আবার সন্ধ্যাও নাগছিল। সে হলো ঠিকেলার, আর এরা হাভাতে প্রায়। ছিল মাইমারা, এখন হয়েছে কোদালমারা। কিন্তু কোদালের কাজই বা কই?

যদু ডাকল, বুদ্ধিধর বাবু বসো।

বসবো কী, তোরা যা আরম্ভ করেছিস। বুদ্ধিধর এগিয়ে এসে বিকেলের বাতাসে ভাসা তাড়ির গন্ধ নেয়।

মধু বলল, কী আর করি বুদ্ধিবাবু, জিহ্বা মোড়ল বসে গেল জগতে নাকি আর জল থাকবে না, ভেড়িতে জল নেই তো দেখছ।

বুদ্ধিধর নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, জল না থাকতেই পারে, তাড়ি থাকবে।

না আঁজ, জল না থাকলে মাহ থাকবে কোথায়?

কেন ডাকায়। বলতে বলতে বাড়ানো হাতে গেলাস পেয়ে যায় বুদ্ধিধর।

মধু বলল, ডাকায় জল মারতি হবে তখন?

বুদ্ধিধর চোঁ করে গ্রাস কাঁকা করে দিল, বলল, হ্যাঁ, শুকনো ভূঁয়ে খ্যাপলা জাল।

সেভা কেমন হবে? চাঁদু বিড়বিড় করে।

জানিনে। বুদ্ধিধর আবার হাত বাড়ায়, ভরে সে গেলাস, শুকনো ভূঁয়ে পেতে জাল, মাহ ধরে সে চিরকাল, কেডা বল দেখি, কেডা?

তুমি, তুমি, তুমি। বলল মধু।

ঠিক বলেছিস, টাক্ষ তো শুকনো ভূঁয়ে। ভরা গ্রাস হাতে নিয়ে বুদ্ধিধর বলে, মাইটাছ আর মারা হবে না তোদের।

কেন গো।

মিসিনে মাহ তোলাবে, মিসিনে বেমন মাটি কাটে, তেমনি জাল ফেলবে।

তবে মোর গতরখানি কী হবে? উঠে দাঁড়িয়ে কোমর নাচিয়ে দিল মধু, মিসিনই থাক, আমরা ভেসে যাই।

গ্রাসে চুমুক দিতে দিতে আশ্রয় করে বুদ্ধিশ্বর। বেশ গা ঝিমঝিম, মাথা ঝিমঝিম লেগেছে। দ্যাখো তিনটে মানুষ না তিনটে কুকুরছানা, কেমন কুতকুতে চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। বুদ্ধিশ্বর গ্রাসটা একজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এখন শুধু মাথার দাম আর মিসিনের দাম, আর কোনো কিছুই দাম নাই।

এড়া তুমি কী বলো বুদ্ধিদা, আগের জন্মে থেকে মোরা মাহ ধরি।

—মাহ আর ধরা হবে না, জল নাই তো মাহ নাই, গতরের কাম বন্ধ।

—এড়া হতি পারে না।

—পারে, এখন একটা মিসিন হাজার মানষের কাজ করছে, একটা মিসিনই হাজার মানষের গতর। বলতে বলতে বুদ্ধিশ্বর হাঁটে। বেশ ঝাড়া দিয়ে উঠেছে শরীর। এখন সে তার ঠিকেশারি গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে মেসিন দেখবে। হয়ে এল সক্ষে। ছলে উঠল ডোজারের আলো। বুল মানে ঝাঁড়। এটা বুল নয়, গণ্ডার। গণ্ডার ইংরেজি মনে নেই বুদ্ধিশ্বরের। ওই মেসিন বুলডোজার নয়, গণ্ডারের মতো নড়ে চড়ে। এমন চাঙড় তুলছে এক এক খাবলার, তার সঙ্গে সাপ, ব্যাঙ, সব উঠে যাচ্ছে লরিতে। উঠে গিয়ে পড়ছে ওই ওপারের নগরে। ভেড়িতে জলটোড়া ছিল প্রচুর। মাহ খেয়ে বেড়াতে আহরে! খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে সব। ওই যে বেটারা আসছে। অষ্টচরণ বোল হাঁটু / মাহ ধরিতে গেল লাটু / ওই যে এসে দাঁড়িয়েছে তিনি মাহমারা। শুকনো হুঁয়ে পেতে জল / মাহ ধরে সে চিরকাল। খিলখিল করে হাসল বুদ্ধিশ্বর। জল ফেলেছে সে।

তিন মাহমারা টলছে। টলতে টলতে দেখছে বুদ্ধিশ্বর নক্ষর জলেও নেই, হলেও নেই। আছে সে আকাশে। বুদ্ধিশ্বর তো বোল হাঁটু অষ্টচরণ, বাড়ির দেওয়াল বেয়ে বেয়ে কোথায় উঠে গেছে গো।

তারা ডাকল, নেমে এস বুদ্ধিদা।

বুদ্ধিশ্বর শোনে না। সে দ্যাখে মেসিন ঘুরছে, ধুলো উড়ছে। আলো ঘুরছে, ধুলো উড়ছে, গাঁক গাঁক করে লরি নেমে যাচ্ছে অন্ধকার ভেড়ির ভিতর। মেসিন ধাবা মারছে নেউলের মতো, সাপের মুণ্ড কাটা পড়ছে।

যদু, মধুরা হাঁক দেয়, খলে নেমে এস বুদ্ধিবাবু।

বুদ্ধিশ্বর কেপে যায়, বুদ্ধ নয় রে বুদ্ধিশ্বর, তোরা মিসিন হয়ে যা, মিসিনের কাজ আছে, তা বাদে কারোর নাই।

শুনে যদু, মধুরা পড়ে গেল একসঙ্গে। মরা মাছের মতো পড়ে থাকল শূন্য জলাশয়ের পায়ে ধায়।

তিন

জিতেন মণ্ডল নয়াপাট্টি বাজারে এসেছে বারোকপাট থেকে। বারোকপাটও সন্টলেক, নয়াপাট্টিও সন্টলেক। হলে কী হবে, নয়াপাট্টি বাজারে এখন শুধু 'সলসলেকের' কথা। বাজারে শুধু 'সলসলেকের' গল্প। সন্টলেকের আশ্চর্য সব দালান, কেঠা, রাজার বাড়ি, প্রজার বাড়ি, মন্ত্রী বাড়ি, দেওয়ান বাড়ি, সন্টলেকের পুরুষমানুষ, মেয়েমানুষ, কচিমানুষ, বুড়োমানুষ, লালগাড়ি, নীলগাড়ি, পথবাট, সোকানপাট—এই গল্প এখন সন্টলেকের আলোয় ভেসে যাচ্ছে নয়াপাট্টি বাজারে। এই গল্প যারা নিয়ে এসেছে তারা সকালে গিয়েছিল, দুপুরে গিয়েছিল করুণাময়ী, বৈশাখী, পূর্বাচল, লাবণীতে, রিকশা, অটোরিকশা নিয়ে গিয়েছিল, রাজমিস্ত্রি, রং মিস্ত্রি, কল মিস্ত্রি, কাচ মিস্ত্রির কাজ নিয়ে গিয়েছিল, আনাজপাতি নিয়ে গিয়েছিল, ফুলের বোঝা নিয়ে গিয়েছিল, আবার খালি হাতে গিয়ে সমস্ত দিন দুহাতে বাসন মেজে, ঘরমুছে, কাপড় কেচে ফিরে এসেছে। কেউ গিয়েছিল, বাগানের কাজে, গাছ ছেঁটে সমান করতে, দক্ষিণদেশীয় নারকেল গাছের পরিচর্যা করতে, কেউ গিয়েছিল মাছ নিয়ে, কেউ গিয়েছিল এমনি এমনি, মানুষজন, বাড়ি ঘর দেখে দেখে দিন কাটাতে। সুবাই সন্টলেকে গিয়ে নয়াপাট্টি ফিরে সন্টলেক নিয়ে গুণ গুণ করছিল। এই গুণগুণের ভিতরে বারোকপাটের জিতেন মণ্ডল হাজির।

নয়াপাট্টি বাজারে জিতেন মণ্ডল খোঁজ করছিল হাবলা নগেনকে। হাবলা নগেনের আর এক নাম আছে মাটি নগেন। মাটি কাটা ছাড়া কোনো কাজ জানে না, তবে তার দেখখানিও ছিল বটে। দেহই ছিল, মাথা ছিল না। এখন দেহও নষ্ট হয়ে গেছে মাথা তেমন আছে। খুঁজতে খুঁজতে খুঁজে পেল জিতেন। ওই তো হাবলা নগেন ডান হাতে জ্বলন্ত টেমি ধরে বাঁ হাতে কোমরের দাদ চুলকোচ্ছে। যতন পরামাশিকের গাছতলা সেলুনে এই কাজ করছে হাবলা নগেন। জিতেন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পরামাশিকের আয়না ঝুলছে গাছের গায়ে। লম্বা চেয়ারে বসে আছে বাস কণ্ঠার পক্ষা।

জিতেন ডাকতেই নগেনের হাতের টেমি কেঁপে গেল। কেঁপে যেতেই পক্ষার সাবান মাখানো গালের কোথাও আলো কম হয়ে গেল, কোথাও বেশি। ডানদিকটা কামাছে এখন পরামাশিক। ক্ষুরের উপর টেমির লাল আলো পড়ে সোনা সোনা লাগছে। সোনার ক্ষুরে গাছের তলায় অন্ধকারে টেমির আলোয় দাড়ি কামায় যতন পরামাশিক। নগেন বলে ওঠে, কামানো না শেষ হলি কথা বলা যাবে না জিতুদা।

জিতেন মণ্ডল কোমর বাকিয়ে নিবিষ্ট হয়ে যতন পরামাশিকের ক্ষৌরকর্ম দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে পরামর্শ দিতে লাগল পরামাশিককে, গুতনির নীচটা দ্যাখো পরামাশিক, ঝুলপিটা যে ছোট বড় হয়ে গেল, আহা গালখানি

নিপিস হয়েছে একেবারে মেয়েমানুষের মতো, গৌপটাও কেলে দ্যাও, কণ্ঠার সায়েব একেবারে মেয়েমানুষ হয়ে যাবে।

আহ থামো না, গাল কেটে যাবে। নগেন বলল।

নড়ে উঠল কণ্ঠার, ঘুরে দেখল জিতেনকে। তারপর আরো গভীর হয়ে বাঁ গালটা এগিয়ে দিল। নগেন জায়গা বদল করল বাঁ গালে আলো ফেলার জন্য। জিতেন আয়নার ভিতরে আলোর নাচন দেখতে লাগল। দেখতে লাগল পঞ্চা কণ্ঠারের ক্ষেপা মুখখানা। আচমকা পরামানিকের হাত ধেমে গেল, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, হেরাদর খবর আছে?

আছে।

কীরাম? যতন পরামানিক তার সোনার ক্ষুরে লাগা সাবান নিজের বাহুতে লেপে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করে, সলসেকের হেরাদ?

হবে।

কবে?

আগে তো আমারটা কামাও, হেরাদর নাপিত আমিই দিই, সলসেকে দু-পাঁচটা খবর হবে হবে করছে।

খবর দিয়ে, যা হয় ওই হেরাদর মাথা কামানিতে। বলতে বলতে পরামানিক আবার কাজ আরম্ভ করল। নগেনও ডানদিকে, বাঁদিকে কাত হয়ে আলো ফেলতে লাগল কণ্ঠারের গালে। একেবারে পৃথিবীর দিনরাত্রির মতো। মনে পড়ল জিতেনের। এরে বলে আফিক গতি। এতেই দিনরাত্রি হয়। সেভেনের ভূগোলে ছিল। লেখাপড়া যে জানে না তা তো নয়। তাহলে কী করে মনে এল এই কথা? ক্লাস এইটের পর আর হয়নি। হলে আর দেখতে হত না। বুদ্ধিমানের ঠিকেশারি তুলে দিত সে। নেই তাই খাচ্ছে, থাকলে কোথায় পেতে?

অনেকক্ষণ পর নিজের নিপিস গালে হাত বুলাতে নগেনকে নিয়ে ফাঁকা জায়গায় এল জিতেন, কাজ আছে।

কোথায় কাজ, মাটি তো মিসিনে কাটছে।

তুই তো ভালই টেমি ধরিস, কুরধরাটা শিখে নিয়ে পরামানিক হয়ে যা, শোন তোরা বউরে চাই।

কী বলো জিতু দা। নগেন আচমকা ক্ষেপে গেছে, তার মানে?

খ্যাখ্যা করে হাসল জিতেন। নিজের গালে হাত বুলাল আবার। নগেন কি জানে তার বউ-এর সঙ্গে কথা বলবে বলে ক্ষেউরি হয়ে নিল জিতেন মণ্ডল? নগেনের শিঠে হাত দিল জিতেন, বলল, তোরা বউ জবার কাজ আছে।

কী কাজ?

মোজ্জেক ঘষা শুনে নগেন জিজ্ঞেস করে, কত করে দেবা?

কেন পঞ্চাশ আর পাঁচটাকা খোরাকি।

ওতে মোজ্জেক ঘষা হয়?

হয়, মাটি কাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এমন করলি এবার সব মোজ্জেক মিসিনেই ঘষা হবে, তখন পাঁচপয়সাও জুটবে না।

চূপ করে কথাগুলো শুনল নগেন। শুনে অন্ধকারে আরো অন্ধকার হয়ে গেল। জিতেন বুঝল মোক্ষম জায়গায় যা মেরেছে সে। ভয় পেয়ে গেছে নগেন। পরামানিকের টেমি ধরে আর কত পায়? সেও ত্রে সন্ধের পর। সমস্ত দিন কী করে নগেন? বসে থাকে, এদিক ওদিক ঘোরে, আবার টুকটাক কাজও পায়। স্থিরতা কিছু নেই। জিতেন আবার ডাকল, কী হলো চূপ করে গেলি যে।

হবে, আর পাঁচটা টাকা বাড়িয়ে দিয়ো।

যদি না করে তোরে বউ তো অন্য লোক দেখি।

নগেন আচমক জিতেনের হাত ধরে বোলল, কী করে করবে বঙ্গো দেখি।

কেন?

কেন পুয়াতি হয়েছে।

চমকে ওঠে জিতেন, কী বলিস।

সত্যি কথা।

তাহলে যাই।

যাবা কেন, পুয়াতি হবা ইস্তক ও বসেনি কোনোদিন।

ক'মাস।

তিনমাস, একটু 'ব্রেস' নেবে আবার ঘষবে মেঝে, বসে কাজ তো, ও কাজে নাকি পেটেরটা ভালই থাকে।

না, না, পুয়াতি দে হবে না।

হবে। হাবলা নগেন ঝপ করে জিতেনের হাত ধরে ফেলল, ওর কাজেই সংসার চলছে জিতুদা, তুমি লিয়ে যাও।

অন্ধকারে হ্যাঁ, না করতে করতে ওরা দুজনে খালপাড়ে এসে পৌছয়। জবা বসেছিল চুলো জ্বালিয়ে। ভাত ফুটেছে। ভাতের গন্ধ ছড়িয়ে আছে অন্ধকারে। চুলোর কাছেই তিনটে মেয়ে পরপর, দশ, আট, চার বসে আছে। নগেন ডাকল, বউ উঠে আয়।

উঠে গিয়ে বউ বলল, পাঁচ টাকা আরো লাগবে, হাটিটা করে দাও দাদা।

জিতেন বুঝতে চাইছিল পোয়াতির চিহ্ন ফুটেছে কিনা বউটার গায়ে। মনে হচ্ছে, আবার হচ্ছেও না। হাবলার বউটা কাজ করে ভাল বলে এত

টান। জ্বিতেন বলল, ঠিক আছে, তবে কাজ যেন আগের মতো হয়।

কথাটায় শুটিয়ে গেল জ্বা। তখন জ্বিতেন হাটে হাড়ি ভেঙেই দিল, বলল, পুয়াতি মেয়েমানুষ, বাট পাবে কী করে, কাজ তো কম হবে।

হবে না। বিনবিন করল জ্বা।

তোমরা পারোও বটে, এই কামকাজের বাজার, মিসিন দেড় মাসে দেড় বছরের কাজ করে ফেলছে, ভেড়ি কাটা, মাটি তোলা—কোনো তাতে মানুষ লাগছে না, এই সময় পুয়াতি হলো।

জ্বা অঙ্ককারে সরে যায়। বউটা পোয়াতি শুনে জ্বিতেনের গরগর ভাবটা কমে গেছে। শরীর শিথিল হয়ে গেছে যেন। সে ফিরছে। তার গা ছুঁয়ে আছে নগেন। নগেন বলছে, আমারে দশটা টাকা দিয়ে যাও জ্বিতুদা।

কেন?

তোমার 'প্লেবার' ঠিক করে দিলাম।

সে তো তোর বউ।

আমারে কিছু দাও জ্বিতুদা, পুয়াতি বউটা কাজে যাবে।

জ্বিতেন ট্যাক থেকে বিড়ির কৌটো বের করে, বিড়ি ধরিয়ে নগেনকে একটা দেয়। নগেনের মুখে খ্যাচা কল লাইটারের আগুন দেয়। বিড়ির ধোঁয়া আশ্রয় করে উড়িয়ে জ্বিতেন মাথা সাফ করতে থাকে, জ্বিজেস করে, ট্যাকা চাই, কত?

পাঁচ টাকা।

ধুস শালা! একটা কাজ করবি?

কী?

তোর বউকে খালাস করে নে, বারোকপাটে বর্মিন ডাক্তার একবেলায় সাফ করে দেবে।

কী বলছ?

পুয়াতি মেয়েলোক কদিন কাজ করবে, কতটা কাজ করবে?

ও পারবে।

পারবে না, এই তো ট্যাকা পাচ্ছিস বুজিশ্বর ঠিকেশ্বরের কাজে, ডাক্তার আমার পেশেন দিতে বলেছে, সাফ করে নিলে আরো কাজ পাবে।

হবে না জ্বিতুদা।

হবে, পেশেন দিলে তুই পনের টাকা পাবি নগদ।

কী বলো জ্বিতুদা! হাবলা নগেন অঙ্ককার হাতড়ায় খালপাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে। ওই ওপারে ভি. আই. পি. রোড। আলোয় আলো। আলোর বিন্দু যেন ভেসে যাচ্ছে মসৃণ রাজপথ ধরে। ওই যে ভি. আই. পি. রোডের আকাশে লাল আলোর ঝলকানি, নীল আলোর মায়া, শাদা আলোর বিভা।

গ্লোসাইন জ্বলছে নিভছে। আকাশ থেকে হাত নাড়ছে বিমানসেবিকা। নরমপানীয় উথলে পড়ছে নরম আলো নিয়ে। জ্বিতেন বলছে, একবার কাজে খারাপ হলে আর নেবে না ঠিকেশ্বর, পুয়াতি মেয়েমানুষ কতটা করবে, মানষের এখন বুঝা উচিত মিসিনের চেয়ে ভাল কাজ না হলি মিসিনই নেবে লোকে, কী বুঝলি?

নগেন শুনে পাচ্ছিল না জ্বিতেনের কথা ভালভাবে। বুঝতে পারছিল না। এমনতেই সে কোনো কথায় মন রাখতে পারে না বেশি সময়, তার উপরে চোখের সামনে ভি. আই. পি. রোডের আলো।

জ্বিতেন ডাকল, বুঝলি?

চমকে ওঠে নগেন, বলল, আবার বলো ঠিকেশ্বর।

ঠিকেশ্বর সম্বোধনে খুশি হলো জ্বিতেন। ঠিকেশ্বর তো বটেই, মানুষ নিয়ে ঠিকেশ্বর করে তো। সে বলল, মানষের এখন মিসিন হয়ে ওঠার দরকার, কী বুঝলি?

নগেন ভি. আই. পি. রোডের আলো দেখছিল আবার। আলো দ্রুত সঞ্চরশীল। ডান থেকে বামে যাচ্ছে। বাম থেকে ডানে। উত্তর দক্ষিণ, উত্তর দক্ষিণ... আলোয় মন থাকায় সে জ্বিতেনের কথা এবারও বুঝতে পারল না।

চার

জ্বিতেনের কথা কেউ বুঝতে পারছিল না। তিন মাহমারাও না। তিন মাহ মারা, যদু, মধু আর চাঁদু দাঁড়িয়েছিল জ্বল শুকনো মুনশির ভেড়ির সামনে। ওই ওপারে দেখা যায় ইনফিনিটি, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত মস্ত বাড়ি, টেকনো ক্যাম্পাস, আলো বলমলে পৃথিবী, তিন মাহমারা ভেড়ির অঙ্ককারে চোখ জ্বলা দৈত্যকে দেখছিল। গা দিয়েও আশুন ছুটছে। এক এক ধাবায় আধলরি মাটি। ধুলো উড়ছে অঙ্ককারে। তখন জ্বিতেন মগুলা ফিরছিল, দাঁড়াল তাদের দেখে, বলল, কী দেখিস?

মিসিন।

হতে পারবি ওর মতো?

তিন মাহমারা ভাবলো হয়ে থাকিয়ে থাকল। কথাটা তেমন বুঝতে পারেনি কেউই, কেননা কেউ দেখছিল ইনফিনিটির আলো, দেখছিল ডোজারের আলো, আর কেউ বা অঙ্ককারকে জ্বলন্ত মাহের বাই শোনার অপেক্ষায় ছিল।

হাঁটতে জ্বিতেন এল বুদ্ধিশ্বরের বাড়ি, হাঁক মারল, বুদ্ধিদা?

অঙ্ককারে সাড়া দিল বুদ্ধিশ্বর, হলো?

মিসিনের সমান কাজ চাও?

চাই।

ওরা ওসব বোঝেই না, বউটা পুয়াতি।

বুদ্ধিশ্বর বলল, মজুরি কম দেব।

কাকে বলল সে, অন্ধকারকে? সেখানে তো জ্বিতেন মশুল আর ছিল না। জ্বিতেন মশুল বর্মণ ডাক্তারের বাড়ির দিকে হেঁটেছে হয়ত। কিংবা কোথাও না। অন্ধকারে বারোকপাটের মাঠে। অন্ধকারে সে কোথায় যায় কে জানে?

সীতা

সাধন চট্টোপাধ্যায়

ভিড়ের পেছনে বেঁটেমানুষটা দাঁড়িয়েছিল আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিতে। চাঁদোয়ার ঠিক নিচে আসরটি। খোলানো বাষ থেকে ছিটকে গিয়ে আলো ঠোকরাচ্ছিল তার মুখের কোনো-কোনো অংশে। চোয়ালদুটি গোপনে কিছু চিবিয়ে চলেছে। নতুন ফ্যাশানের সরু নিকেল ফ্রেম-কাঁচের আড়ালে চোখ দুটি মনে হচ্ছিল চকচকে কিছুতে আকৃষ্ট। বন্ধুটির ষাড়ে হাত রেখে, কী যেন বোঝাচ্ছিল আসর-সংক্রান্ত কিছু। হ্যাঁ, আঙুটি-ঠাসা আঙ্গুলে আঙুলিঝাত্যের একটি সিগারেট জ্বলছিল। তবে বন্ধুটিকে স্বাভাবিক সোজা-মনে হচ্ছিল না। যেন দাদাগোছের, কোনো এলাকার। পেছনে ঠেকানো দেওয়া ওদের লাল মটর বাইকটা।

বেঁটে মানুষটার কাঁধে ছোট্ট একটি-কিটস্ ব্যাগ। দামি কিছু নয়; সম্ভা স্কেমের। কালো প্যাশট, ভদ্রগোছের একটি সাদা গেঞ্জি-জামা পরা। বুকের কাছে ঝাপানো বাঘের ছোট্ট একটি জলছাপ। যেন বাড়ির পথে, অফিস ফেরত নেহাৎই মজায় পেছনে উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কত আগে ওরা গাড়ি দাঁড় করিয়েছিল, ভিড়ের কেউ জানে না, কারও মাথাব্যথা নেই দুজনকে নিয়ে। ফ্লাইং—অনেকেই তো কিছুটা সময় ব্যয় করে যাচ্ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে পাকা খেলুড়ে-ভঙ্গিতে ‘দ—শ’। হাঁকতেই সবাইর নজরের ঝাঁকুনিটা এ-দিকে ঘুরে আসে।

চাঁদোয়ার মধ্যে বল-ভরসাহীন ভরত যেন প্রাণে অল পেয়ে যায়। ধূর্ত হাসিতে আদরের তোয়াজে-গলায় বলে—নামটা। নামটা বলুন দাদা। লোকটা অবিচলিত কণ্ঠে চৈতাল—স্বপন দে।

তখনই রাম বাড়তি জোস দেখিয়ে, মাথার ওপর আঙ্গুল ঘুরোল—স্বপন দে দ—শ। ...গলেশ ঢাবঢ্যাব্।

বেঁটে মানুষটা এতকণের মরা আসরটিকে যেন হঠাৎ মালকোচা দিয়ে দাঁড় করিয়েছে।

একটু আগেও, রাম-ভরত শেষ আশটুকু নিংড়ে-নিংড়ে ডাক জ্বলছিল—সো-মা তিন। সো-মা তিন। সো-মা।

পাছে তিনের সীমানার ডাকটি বাঁজা না-হলে বসে, নানা কৌশলে সময় খেয়ে-খেয়ে পাক মারছিল—সোমা তিন। তিন। তিন। ...মিস্ সোমা সরকার তিন। সো-মা দেবী তিন।

মাত্র আট বছরের রোগা পটকা মেয়েটি। ঠাকুমা লক্ষণের মালা ভঙ্গি-
ভয়ে নাতনীকে দিয়ে ডাক করিয়েছিল। পোড়া আসরে তিন আটকে থাকে।
হঠাৎ বাতাস পড়তে-পড়তে গণেশ লোথ—চা-দোকানদার—হুকনিতে ঢালবার
ফাঁকে ছোট্ট করে উল্কে দিল—পাঁচ।

—দাদা, নামটা। লক্ষণের খুশিদীপ্ত গলা।

শুনেই রাম হাঁকল—গণেশ লোথ!...মাননীয় গণেশ লোথ মহাশয় পৌ-
চ!... সোমা ঢ্যাব্যঢ্যাব্! দিয়েছে। দিয়েছে গণেশ সোমাকে..... শুঁড় দিয়ে চেপটে
মাটিতে শুইয়ে.....

যখন পাঁচে দাঁড়িয়ে দশমিনিট ধরে ফের আসরটি খাবি খাচ্ছিল,
ধর্মপ্রাণের অভাবে রাম যখন এলাকার নওমোয়ানদের কাছে ব্যর্থ, সীতা
সামনে এসে খ্যামটা ঢংয়ে জনপ্রিয় হিন্দীগানের সুরে গেয়ে উঠল—গণেশ
পা-বে / মালা গলায় দে-বে / কৈশে গেল সো-মা।

অনেকটা 'শুনো চম্পা / শুনো তারা'র সুর লাগানো। ফ্লুট এবং ডুগডাগ
তবলা চলল চমর-চর ভঙ্গিতে।

তবু সোমা গ্যাস্ খায় না। খুকির চোখেই আসরে বসে থাকে ঠাকুমার
পাশে। তালে পাঁচেই দাঁড়িয়ে আছে ডাক। রাম হাঁকছে। কিন্তু এ-কোন মড়া-
হাংড়ার দেশ! লোথ তখন চা যুটতে যুটতে হাত কামড়ায়—মেয়েছে
পৌতা!...শালা, পাঁচের ওপর লোক নেই পানশিলা-খালগাড়ে? বাবা বাঁচা
কেউ!

চারপাশে চাপা খুশি, সবাই চালাক সেজে মজা দেখছে। ফ্লুটর সঙ্কেট
কাটিছে বেশ। বেচারী ভয়ত। কী করবে এর পর, ধরতে পারছিল না। রাম
যখন চোখ ঘুরিয়ে ভিড়ের এধার-ওধার খুঁজছে অগা আর কানাইকে। ওরা
এ-এলাকাটুকুর শের! এদের ডাকে, বিনে বায়নায় চলে এসেছে। দলে. নয়
সদস্য; মাথাপেছু বিশটা টাকা না হলে চলবে কি করে! অগারা ইচ্ছে করলে
নিলামের দর বে-করেই হোক ফাঁপিয়ে দিতে পারে। রামের চোখজোড়ায়
একটা ফ্লপ-আসরের ছায়া ক্রমে মলিন হয়ে উঠছিল। তখনই 'দ-শ!'
আওয়াজ-বুলেটটি ঝাকুনি গেড়ে বসে।

ছোট্ট চাঁদোরা। বাম্ব-এর আলো সরাসরি মোহময় প্রতিফলিত হচ্ছে তিন-
চার জনের মুখে। রামের পুরো বদনটি জুড়ে জিংকঅক্সাইড ও সিনসিড
তেলের ঘন পেষ্ট, ঠোঁটজোড়া কোনো কিছু দিয়ে সাজানো আরক্ত, সামান্য
ময়লা একটি ধূতি পরনে, পৈতে, খোলা শেট-বুক ছাতিতে অক্ষয় কালচে
লোম। চুলের গোড়ায় বিন বিন করছে বাম। গোড়খাওয়া চোখ দুটি বলে
দিয়ে, সে-ই দলের লিডার এবং আসন্ন চরিত্রে পোক্ত। ভরতের গালদুটো
বসা, চোয়াদে, থাক থাক চুড়োর মতো তাঁজখাওয়া চুল, শরীরে ছাপা-ছাপা,

সত্তা রাংচিহের বক্সমলে পোষাক। ওর পেটটি আবার নীলচে আভায় ঘামে সঙ্গে মিশে গেছে। শরীরটা ছিবড়ে-মারা। লক্ষণের বাড় অবধি কানঢাকা চুল, সরু গলা, হাসিহাসি চোখে পাতলা খাঁচায় চকচকে পেটটা দেখলে মনে হয়, নিভারটি গোপনে বিগড়ে চলেছে।

চটে সাপটে বসে দুজন ফুট এবং আড়-বাঁশির সুর তোলে, ওপাশে তিনটি মাথা ছোটছোট ডুগি তবলাতে লাগসই আসর জমানোর কসরতে ব্যস্ত। কেবল সীতার কোনো পেট নেই। খোঁপার পেছনে পেছমথরা আধুনিক ক্রিপ, টাইট শাড়ি-ব্রাউজ-কিছুটা উজ্জ্বল তাঁতভঙ্গি। ডুরু দ্রাক, বাদামী লাস্যময় সোখ; কিন্তু মুখের চামড়াটি ইকং কর্কশ। গালজোড়া সামান্য জল। দেখলেই বোকা যায়, হাট-মাঠের পুরুষ এই গর্ভে বীর্ষ নিষেক করেছে কব্জার।

—এগারো।

ভরতের হাতে ধসকানো কামিনীর সরু মালাখানা। আলোতে থুথুর কণা ছিটিয়ে চোঁচাল—গণেশ লোধ এগারো...এ-গা-রো! স্বপন দে ঢাব্ঢাব্...ফাটাফুটো।

ঘে-গণেশ খানিক আগে ফাটা বাঁশে আটকে গেছিল, স্বপনের ডাকটি টের পেয়েই জোরেল খেলার মেতে উঠল। বেঁটে মানুষটিকে কি লোধ মশাই চেনে?

এবার প্রমাদ শুধে বন্ধুটি কী যেন বাধ সাধতে যাচ্ছিল, স্বপন দে ছিটকে সরে এসে সিগারেটটি টেনে চলল ঘনঘন। চোখদুটো মুহূর্তের-জন্ম শুঙ্গিপাকিয়ে চোঁচাল—পনেরো।

এইবার নেশা চড়ে। ভিড়টা ছুটির সঙ্গে ভারি আমোদে চাটতে থাকে নীরবে।

—ফের! স্বপন দে পনেরো...হ্যাঁ, স্বপন দে...গণেশ এবার ঢাব্ঢাব্।

টুকুস করে চায়ের দোকানে আওয়াজ—বোল।

—বোল। বোল... গণেশ... আহা, গণেশ। দুর্গার ছেলে...জিতবেই...!

স্বপন দে পানসে মোরে গেছে।

—পঁ-চিশ!

ফাটাফাটা কান্ড! একলাফে ঐ অংকটিতে চড়ে বসতেই, আসরটা যেন ঘোরে মজতে চায়। লোকটা কে? চোখজোড়া চকচক করছে কেন? ভরতের তর সইল না। গোলাকার ভিড়ের চারপাশে আবুল হুরিয়ে—পঁচিশ-এক। পঁচিশ-দুই। পঁচিশ-তিন। বলেই মাথাটা ঝুকিয়ে ডাকে-কৈ, আসুন স্বপন বাবু! লক্ষণের মালা। জয়ের তিলক।

সরু শব্দে ব্যাণের চেনটেনে, নোটগুলো মুঠো পাকিয়ে, লোকটা বাড়

নুইয়ে মালা পরে নিল। কিছু ক্যাপ্‌ প্যাক্‌ হাততালি। নোট-শোওয়া খালাটি সীতার হাতে উঠতে সে পাশে মাটিতে রেখে, ঝোলানো মাইক্রোফোনটার ঠিকঠিক তলায় দাঁড়িয়ে ফের চটুল, বুক-কাঁধ হাতের ভঙ্গিতে গান শুরু করল। গলাটা ফাটা কর্কশ—বহু রাত গাইতে গাইতে যেন মরচে মেখে গেছে। অথচ, এই মুখ, এই গলা কাঁপিয়েই অগ্নিপরীক্ষার বেদনায় কাঁদলে, হাপুস চোখে কত উল্লসনি।

জায়গাটা ঠিক আসর বসার উপযুক্ত নয়। বিজি শহরতলী। পিচ-রাস্তা দিয়ে লাগোয়া বাস-লরি-ম্যাটাডোর-মারুতি থেকে লুপ্ত ভ্যান, রিক্সা ও শতশত সাইকেল ঘোঁরা-গন্ধ-শব্দ ছুঁড়তে ছুঁড়তে দোকানপাট, তেলেভাজার শুমটি, শহীদ স্তম্ভ, চাকিপেবাকল, খুপড়ি হোটেল ফেলে চলে যাচ্ছে। ভিড়ের চাপে খানিকটা যানছট এখানে ব্যাঘাত ঘটছে। খালের পাড়ে সি. এম. ডি., এর পাকা নতুন ড্রেন তৈরির ফলে যেটুকু খোজ-জমি বেরিয়েছে অতিরিক্ত, 'দোকান গড়ছে অস্থায়ী—তারই সামান্য গলিতাইতে আসর। অপর ফুটে পুরনো বটগাছটা থাকায়—বাসের সহিস হাঁকে, বটতলার মোড়।

এখানে হঠাৎ করে রামযাত্রা হবে, কেউ-ই ধারণা করেনি। কানহিয়ার গ্রুপটা আড্ডা মারে, কোথাও বোমবাজি করে আসে, কোনো ক্যাণ্ডামি হাতে নাতে ধরলে মাধাকামাই করে দেয় এখানেই। সেন্সনের ক্ষুর তুলে এনে। মাঝেমাঝে একটু ভারি রাঙিরে, সাধা পোষাকে আবগারী পুলিশ ঘোঁত-ঘোঁত ছুঁড়তে আসে। আর পাশের সরু খালটা দিয়ে জল শুধু আসা যাওয়া করে। নদীর সঙ্গে ওর যোগ।

দু-দিন ধরে রামযাত্রা চলছে। একখানা ফটো টাঙ্গিয়ে, খুপ-ধুনো প্রদীপ জ্বলে, পোড়খাওয়া রাম গোখুলির আলোটুকু মরে, বিচ্ছলি স্পষ্ট হলে, খানিক লক্ষণের গাওনা, সীতার প্রতি বাপ্পাকুল নিবেদন, ভরতের প্রতি শ্রীকৃষ্ণা বর্ষণ করেই—আড়চোখে ভিড়ের বুনেট যাচাই করে বলে, —এখন নিলাম।...ডাক হবে মা বোনেরা/...রাম-সীতা-লক্ষণের মালা নিলাম। মা-মাসিরা আপরাধ নেবেন না।...আমাদের সবাব পেট আছে, জ্বালা আছে। মালাগুলো এতক্ষণ আসরে এদের প্রত্যেকের গলায় দোল-ঝাপ করছিল।

মুখগুলো ভয়ানক সত্তা জ্বিক-অজ্বাইডের ঘন লেপনে মজার খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। মাত্র ন'জনের দল। মাটিতে ৫ জন যত্নী, যার যার ভঙ্গিতে গোল হয়ে সাজিয়ে বসেছে। আর আলোর দীপ্তি মেখে দাঁড়ানো চার জন। মহাকাব্যিক চারটি চরিত্র।

ধর্মের নামে বৃদ্ধা-মহিলা দুচারজন হাজির যে হয়নি এমন নয়। তবে ছুটির দিনের বেকার, মাঝবয়সী, ছেলেছোকরা, চলাচলের সাইকেল, কৌতুহলী

ভিড়ে উকিয়ারদের সংখ্যা-ই বেশি। আর আছে ফুটের দোকানঘরে ধোঁকায় ধোঁকায় অলস মানুষ, কিছু বন্ধের, আড্ডাবাজ। সজ্জোটা কাটিয়ে ক্লাস্ত বাড়িতে চুকেপড়ার সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। নিলামটা তাদের উপরি পাওনা।

রাম বন্ধন আসর জমাতে মিনিট ১৫-র জন্য দক্ষ গলায় রস গেঁজিয়ে তুলছিল, কেবল দু'একজন ঘোর বুদ্ধাই শুধু ত্রেতাযুগের ছায়াঙ্ককার পথে চোখের ছলে ভরতকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটছিল চোন্দ বছরের বনবাসে। কোন অজানা শব্দকূল পথ ধরে।

বাকি ভিড়ের মানুষজন পেট, বস্ত্রমলে পোষাক আর ভক্তির কম আয়োজনে সরষু নদীতে চান না করে, খালের পাড়েই দেখছিল নিলামের মজাটি।

আসর-অভিজ্ঞ রামের চতুর চোখ ইতোমধ্যে জগা-কানাইকে না-দেখতে পেয়ে বুঝে নিয়েছে ফলতু পাবলিক। চিমুস তৈয়েটে। গতকালও সূর্যতে আসরটা এরকমই ম্যারম্যারে ছিল কিন্তু নিলামপর্বে ঢাকাটা ঘুরিয়ে দেওয়া গেছিল। এমন তুল-অবস্থা, একটা স্যান টানিয়ে তার সারা দিনের একশ একটাক্স নিলামযুদ্ধে ময়দানে লক্ষণের মালা জিতে নিয়ে গেছে। এ-নিয়ে চাপা অসন্তোষের গুঞ্জন হুড়িয়েছিল যদিও—জগারা প্রথর দৃষ্টিতে ছিল।

আজ রাম নিজের গলার মালাটি নিলামে না তুলে সোজা আবেদন জানিয়ে বসল—রামের মালা!...মাস্তর এগারো টাকা.....কিনে সাহায্য করুন!

আবেদনের কি করণ হাল! প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট আসরের চারপাশে বস-দাঁড়ানো, সাইকেলে ঠেস দিয়ে, লক্ করে নানা বয়সের পাবলিক কী ভীষণ নিরাসক্ত হয়ে ছিল। বেশ মজা লাগছিল লোকটার নানা ভঙ্গির আবেগ-দেখানো পদ্ধতিতে। বারবার সে শেঁটমাথা মুখে পিটপিটে চোখে, ন-সদস্যের পরিবার, পেট, পিপাসার জল, ক্ষুধা, যন্ত্রণা, পিলে, গিভার, নাড়ি-ভুঁড়ির জন্য কুপা মাঙছে—শুধু টিকে থাকতে। লক্ষণ আর ভরত নির্দেশ মতো চুপটি দাঁড়িয়ে নখ শোটে। সীতা হাসছে আলোর হটায়। মৃদু চোখ নাচিয়ে।

দু-চারটে ঠানদি বা যুবকদের যে প্রাণ ভেজেনি তা নয়; এগারো টাকা অনেকে। খুচরো এক-দুই হলে সবারই হাত উঠত। রং-পালিশ মুখটা রামের লাগছিল কিছু একটা বেহিসেবী কাজ করার মতো। জগাদের কাছে বোকা বনে গেছে বলে। নাকি ভেবেছিল, হাটমাঠের চাইতে শহরে আজকাল অনেক পয়সা হয়? কিন্তু একবার হেঁকে, মালার দর আর কমিয়ে আনা যায় না। রাম বন্ধন মরিয়া পথ খুঁজছে অসহায় দৃষ্টিতে, তখনই রক্তিন পাড়ের শাড়িপরা এক বিধবা—বেশ মাংসল চেহারার, ছোট নার্সিংহোমের পয়-পরিকারের কাজ করে—১১টি টাকা এগিয়ে দেয়। আর তখনই রাম প্রশমির থালাখানা

ভরতের মারফৎ ভিড়ের মধ্যে সিকি আধুলি টাকাটার খুচরো সামর্থের অপেক্ষায় পাঠিয়ে দেয়। হাতে হাতে ফল। এগারো টাকায় যে গিট বেঁধে গেছিল, খুচরায় সেটিমুটি রূপোশি রেখা পাওয়া গেল। তারপরই লক্ষণের মালার নিলামপর্ব এবং স্বপন দে! বেঁটে মানুষটা।

এবার ভরত মালাটি রামের হাতে তুলে দিতেই, চতুর চোখ-মেয়ে সে জনতাকে বলে—এ মালা যে কিনবে, সীতা পরিবে দেবে।...হ্যাঁ, সীতা দেবে পরিবে।

ফের রাম ছোট একটি চোখ মারল। দ্রুত ঘুরে, সামনে বসেথাকা বয়স্কাদের উদ্দেশ্যে মাকি চাওয়ার ভঙ্গিতে—আসল রামায়ণ এখন বন্ধ....কমা করবেন মায়েরা, দিদিমারা...বাংলা হিন্দী গান একটু চলবে.....পরে ফের ধন্য ফিরিয়ে আনব....আপনারা উঠে যাবেন না।

চাঁদোয়ার কাপড়টির ঠিক মাঝে, ছোলায় দড়িতে বাঁধা মাইক্রোফোনের মুখটি ভীষণ সতেজ। ছোটখাট ফচকেমিও বড় ক্যাচ হয়ে ওঠে। রাম ঘাড় ঘুরিয়ে হাতে মুখ আড়াল করে—বৌদি! সামনে! সামনে!

বউটা হুসিহাসি ঠমকহুন্দে আলোর কেন্দ্রে দাঁড়ায়, হাত-পাছ-নেড়ে চটুল সুরের একটা বাংলা সিনেমার গান সুরু করে। বহু মানুষের চোখে সীতার রূপটি বেশ প্যাঁজ-রসুনের ফোড়ন তুলছিল বাসনার কড়াইতে।

রাম হাঁকে—ভরতের মালা।...দুই টাকা। দুই টাকা। মাত্র দুই টাকা—তিন! আবার সোমা সর গলায় ডাকে।

—সো-মা তিন! মিস্ সোমা!

—পাঁ-চ!

—কে?...আচ্ছা, গণেশ লোখ!....পাঁ-চ, পাঁ-চ! সোমা ঢাব্ ঢাব্!

এখনও ভীড়ের মতিগতিতে হাওয়া ওঠেনা। দু-একজন কিছু ঘটবার আসায়, টারিয়ে দেখছে মটর সাইকেলের বন্ধুটা বেঁটে মানুষটাকে পেছনে বসতে টানাটানি করছে। মানুষটা গোস্ত মেয়ে একটু এগিয়ে চাঁদোয়ার তরপানি মাপতে থাকে। বোঝা গেল, মানুষটা নিজের মতলবে ভয়ানক, অটল থাকতে পারে। ফের বন্ধুটি কাছে আসলে, 'দাঁড়িয়ে দ্যাখ।' বলে স্বপন দে হুকুম দেয়।

—দশ! বলেই মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে সিগারেট টানে।

ডাকের লাক্ষই আসরটিকে মাতাল করে দিচ্ছে। লোকটা কে? টাকা কি ব্যয় করতে কাতর হয় না? হয়তো কাঠে-কাঠ কেটে। কাণ্ডানি করছে। এই খালপাড় যে ঝামেলি কল্লাটের স্পট, কে না জানে! লোকটা এবার দু একজনকে সরিয়ে সোজা আসরের সামনে এসে, হাত বাড়িয়ে বলে,—দেখ খালপাড়ে কোন শালার কত মুরোদ!

থোকায় থোকায়, আলো অন্ধকারে, সাইকেলে পাছা, অনেক ছেলেছোকড়া। কে এমন চ্যালেঞ্জ খুঁড়ছে। খেয়ে এসছে বোধ হয়। কিন্তু বেশির ভাগই তেতে উঠল না, মৃদু মজার ঝাঁকিয়ে উঠল মনে মনে। এই আলো, জমজমটি, বাস-রিজা-ম্যাটাডোর কিংবা শত শত সাইকেলের গতিময়তার মধ্যে একটি পৃথিবী জেগে উঠল, যেখানে স্বপন দে-রা ভীষণ কমতালানী এবং নানা রঙ-বেরঙে মজার পোষাকে হাজির থাকে।

—এগারো! ছায়া-অংশ থেকে একটা ছোকড়া যেন ঢিল মারে। আর বিশ্বস্তের ব্যাপার, রাম ডাকের অংকটি শুনিয়ে মহিচ্ছোফোনে মোষ বলির বাজনা বাজায়—এগারো! এগারো! এগারো! স্বপন দে ঢাব্ ঢাব্।

এই ১১টি কার ছিল রাম জানায় না। প্রয়োজন বোধ করে না। তার বহু দিনের অভিজ্ঞতার পেট যেন বলে দেয়, নামে কী এসে যায়। একটা দোলা, একটা ঝাঁকুনিই আসল।

—কুড়ি!

—বাইশ! ফের একটি কোণের ডাক।

—বাইশ! বা-ইশ! দিল স্বপন দে-কে.... শুইয়ে চিং করে, বেশ মাখিয়ে দিয়ে....

—তিরিশ! ডাকটি তুরুপের তালের মত ফেলে দিয়েই হেঁটে রাস্তা পেরিয়ে শুমটি দোকানটার সামনে গেল। দু চারজন হাঁটল তার পিছু পিছু। সিগারেট কিনতে নয়। নতুন-উইলস্-এর প্যাকেটটা বুকপকেটে ফুলে আছে। চিবুনি ফুরিয়ে গেছল; দাঁতে পেষণের মন্ত্র। চোয়ালজোড়া নীরবে নাড়তে পারছিল না। তাই পানপরাগ বা শুটকা কিনতে গেছে। কোনো উদ্বেজনা নেই। ধীর গতিতে আবার রাস্তাটা পেরিয়ে ভিড়ের মধ্যে চলে এল। বোঝা গেল দোকানদারটা ওকে চেনে। মজা দেখতে সে-ও চলে এসছে। কী যেন একবার বোঝাতে যাচ্ছিল, স্বপন দে বরাভয়ের মুদ্রায় মুখফুটুনি বন্ধ রাখতে বলল। জ্ঞান-ট্যান সে কারও নেয় না। ভিড়ের একটি মাথা, স্বপন দে কাছে আসতেই বলে—একত্রিশ ডেকেছে।

ডাকটা সে মাচাই করল না। তাচ্ছিল্যে বলে উঠল—প-ফাংশ!

বাপরে বাপ! তালে কি গত সন্ধ্যাটাই ঘুরে এল?

জ্ঞান টানিয়েটা টাল খেয়ে খেয়ে এ-স্কাবেই জমশ একমুখীন হতে থাকলে, বাকি ডাকওয়ালারা চুপটি মেয়ে গেছল। তারপর, যেমোমুখে, নেশাচ্ছন্ন ঠোটে দুলতে থাকা সিগারেটটার ধোঁয়ায় ময়লা খুঁটের ভাঁজ খুলে একশ টাকা মিল যখন—বাতাস ঝপ করে পড়ে যেতেই বটের পাতারা ঝিম শুচ্ছ হয়েছিল। আর প্রশমির থালাটা তখন অনেক নোট ও মুদ্রায় ভরে যেতে, অনেকেই মনের নিশপিশ অন্ধকার অংশে মুখ লাইসেন্সের ডাবনা

জমতে থাকে। কিন্তু জগা কানাইরা মাঝেমধ্যেই রাম-সীতার পাশে ঘুরপাক খাচ্ছে বলে, প্রবল হাওয়া উঠল না। আজও কি তেমনই কোনো দল নেমে আসবে.....তবে চালা পানসি, বেলাঘরিয়া।

রাম গলাটি নামিয়ে টিকটিকির স্বরে বলে—পঞ্চাশ-এক। পঞ্চাশ-দুই। পঞ্চাশ-তিন।

দোকানদার ছোকড়াটা বেঁটে মানুষটার বন্ধুটিকে ফিস ফিস করে বলে—
নানু, গুরুকে ধামা। ফতুর হয়ে যাবে।

নানু এবার খাড়া গলায় হুকুম দেয়—তুই উঠবি পেছনে?

স্বপন দে ব্যাপারটা নজর করেছে। ছোকড়াটাকে শুনিয়ে দেয়—আমি ফতুর হলে এই ওভার হেডে ক্যারেন্ট থাকবে না তোদের....পানশিলা থেকে মোহনপুর অবধি।

তালে বেঁটে মানুষটি ইলেকট্রিক অফিসে রাজত্ব করে। এমন পঞ্চাশ একশ তাদের দৈনিক ময়লা। উপরি। তাই লক্ষণের ঘামজড়ানো বেলাফুলের মালাটার জন্য পঞ্চাশ গলিয়ে দিতে, তিলপ্রমাণ আপশোষ হয়নি তার। উইলস ইলিশ বা আয়েসের দখলের জন্য কোনো চড়া মূল্যই তাকে ঠেকিয়ে দিতে পারে না। জয় করার মুড উঠে আসে।

রাম কৌশলে এবার বাবাজি-নামের মালাটি নিলামে তোলে। বাবাজির ফটো ঝোলানো আছে। নানু তখন বগলদাবায় স্বপন দে-কে পেছনসিটে বসিয়ে, ভিড় কাটিয়ে খোঁয়া ছুঁড়ে বেরিয়ে গেল। লোকটা তবু ঘুরে চোখপাকিয়ে ঝাকতে ঝাকতে যায়—ব্যাগের হিম্মত স্বপন দে রাখে। মুরোদ দেখে নিতাম সবার।

সীতার প্রতি তার কোনো বিকার জন্মেছিল, আদৌ বোঝা গেল না।

লোকটা চলে গেল। উত্তেজনা ঢলল। তবু আসর, মানুষ, বাস, তেলভাঙা বা চাব্বের দোকান, খালের জল—নানা মিশ্র স্বাদের মধ্যে কেবলই অদ্ভুত কুকুরের গন্ধ আসছিল। এঁটুলি পোকের ঘেয়ো কুকুরের চিমসানি।

রাম মালাটা ইসৎ গোল বানিয়ে বলে—ঠাকুর গোজকনাথের মালা।
তিন।

—চার।

—পাঁচ।

—ছয়।

—সাত।

মনোহারি দোকানের স্ক্যাপা কুন্ডু ডাকল—এগারো।

তারপর ক্রমে ডাক গিয়ে ২৭-এ ঠেকে। ভরত বকের মতো খুশি খুশি

ঠ্যাং ফেলে ভিড়ে সোঁষিয়ে ডাকিয়ের গলায় পরিয়ে দিল। খানিকটা গোয়ার্জুমি-মরা আপশোবে, ডাকিয়ে তখন সাতাশ টাকা হারিয়ে চুপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার মিটিমিটি হাসি ছড়িয়ে, সীতা একটি ঠোঁটায় তিন তিনটে লাড্ডু—গোলাকার, হলদে বর্ণের—থালায় ঢেলে ডাক তোলে—পাঁচ। খাটি থিয়ের।

ভিড় থেকে চটুল হাসি ওঠে কিছু।

—আট।

—নয়।

—দশ! দশ এক, দশ দুই....। ডাকিয়ে ছোকরাটি নিজেই দর বাজা বানিয়ে দিচ্ছিল। এটাঘে নিলামে বেনিয়ম। ছোকরাটা জানে। তবুও রাম এবার মহাকাব্যের মুখোশ ছেড়ে, সাধারণ পাবলিকের মতো হাত জোড় করে কাতরভঙ্গিতে—দাদা, আসরটা মাটি করবেন না.....খিঁজ ভাই.....আপনার পুঁজিপাটা বেশেখাটা হয়ে গেলে অন্যদের সুযোগ দিন।

—লাড্ডু দশ। দশ। ছেলেটা তবু হাততুলে খ্যামটা নাচতেই থাকল। অন্য কোণা থেকে আগুয়াজ উঠল—বা-রো।

লক্ষণ এবার পিলেবাড়ন্ত পেটটি নিয়ে আসরের মতলবাটি ধরার চেষ্টা করছিল। ডাক কি চড়বে, নাকি ঝামেলা পাকাবে কেউ।

—পনের।

—আঠারো।

—কুড়ি।

কয়েকটি ছোকড়া শুমসা মেরেছিল। ভাবছে, আসরটাকে কেমন আগান দিয়ে, মানুষের পকেট ফতুর করা হচ্ছে। এর পর কোন কারদায় কী কী নিলামে চড়াবে? ফুল? বেলপাতা? চাঁদোয়াখানা? নাকি সীতার দেহের শাড়িখানা? ফটোর নিচের ধুলো-বালি? ইট? বাস-জঙ্গল-মাটি?

—এ-কুশ। হেঁকেই গাটোগোটা ছোকরাটা ছৌ মেরে আসরে ঢুকে নিজেই সীতার হাত থেকে লাড্ডুর থালাটি নিল কেড়ে।

বাতাস আগল বটের পাতায়, খালের জল কচুরি-ঢোপ নিয়ে ছুটল। পেটের খোঁয়ায় কিছু মানুষ নাক আড়ালে রাখে।

—লাড্ডুর নিলাম? কেন, কিসের জন্য? তারপর সে গলা ফাটায়—মাজাকি মাচ্ছ? শালা, কাল ড্যানাটিনটার ১০১ গ্যাছে.....খালপাড় ফতুর কণ্ডে এসছ?

ঝম্ ঝামাড়। ঝম্ ঝামাড়। ঝম্ ঝামাড়।

বাসটা দাঁড়িয়ে পড়ে, অটো কাটাবার পথ না পেয়ে ঘন ঘন ডাকতে থাকে, সাইকেলগুলো জমে যায়। গুতোগুতি, ঠেলাঠেলি।

লাজ্জু হাইজ্জাকারকে জগার দুই সাগরেদ কঁৎ কঁৎ তলপেটে ঘূষোতে থাকলে, খালপাড় আপন পরিচয় নিয়ে নিল। দ্বি-ম। দ্বি-ম। দুটো পড়তেই বিপুল ছটোপুটি। কে ফেলল ও-দুটো? কানাই সহিকেনে ইতোমধ্যে হাজির হয়ে গেছে। পানপরালের দোকানদার দুটো গরম আওয়াজ তুলে লুকনো ভোজ্যলিটা নিয়ে বেরিয়ে এল।

সরজু নদী বয়ে যায়। শব্দ নেই, বাতাস-হারা, আলো জাগে না। সরু অন্ধকারের মধ্যে পবিত্র জলের ধারা বইতেই থাকল। গোদাবরীর গভীর জঙ্গলে লক্ষণ আর মাথা তুলে সীতাকে আড়চোখে দেখতে চায় না।

এখানে নিলাম চললে কোন শালার কী? আসলে ছোকরাটা কি নেশাগ্রস্ত? ধর্মস্থানে নেশা করা ষোরতর অন্যায়। অন্ধকার আছে, সীতা আছে, তাকে অন্ধত রাখার শর্ত আছে—সবই যে গুলিয়ে ফেলা হল।

আসলে ছেলেরা খালের এ-পাড়ের। এ-পাড়ের বহু মাথা ঐ ডিড়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা কুকুরের গন্ধ পায়, গতকালের একশটাকা ভোজবাজির ঘ্রাণ শৌকে আর ঝাঁপের বাঁশ হাতে হাতে ওঠে জগা কানাইদের।

নিলামতো ন্যায় ও আইনসম্মত। তবে?

বাতাস খেমে থাকে, জল বয়ে নেয় খালের বুজবুজি। আসলে সব জলেরই গোপন ঘ্রাণ আছে, কিন্তু বলে দেওয়া হয় যাহা স্বাদহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন... ইত্যাদি।

কানাই সামলেসুমলে এবার রামকে ধমকে বলে—মারাতে এসছ? শুরু কসে পার না? রাম মুহূর্তের জন্য বিমূঢ়। মালা, লাজ্জু—সবইতো নিলামে বেরিয়ে গেছে। এখন? ফের ধর্ম আলোচনায় কিরে যাবে? কিন্তু দাদা-বৌদি-দিদিমা বা যুবকবৃন্দরা কোথায়? সে তখন সীতাকে ঝাঁকিয়ে নিল—একটা গান ধসে পার না? ডুগি-বাঁশি কি ইয়ে মারতে বসে আছে?

কথাগুলো মহিক্রোশেনে ক্যাচ হয়।

বেঁটে লোকটা নেই। কিন্তু খালের ওপাড় থেকে ফের কিছু বেঁটে জড়ো হয়ে যায়। এরা আইন-শৃঙ্খলার হাত-পা নেড়ে রাস্তাটা চলনযোগ্য বানাতে হাত লাগায়। অটো ছোটো, সাইকেল যায়, বাসগুলো হাঁটে—তবে সংখ্যায় কম।

রামের পাশে দাঁড়িয়ে জগাই ডাক তোলে—হাতের কাছে বা পায়। ঘর-বাড়ি-বটগাছটা রাস্তা-খাল-নদী-ফেন-অকাতরে বুকের সমস্ত বল ঝাঁকিয়ে সে ডাক তুলেই যায়। দেশটাকেও ছাড়ে না।

চটল বাজনার মহিক্রোশেনে সীতার ফটা গলা। ঘর বাড়ি থাকে না। রাস্তা লোপ পায়। জঙ্গল জাগে। গোদাবরীর অরণ্য। মারীচ ছোটো। ঈষৎ বাদামি, গালভাসা, কহীর্থে নিবিক্তা সীতাকে আপটে মাটিতে শুইয়ে দীর্ঘশ্বাস

যার যার দানখেলার জন্য অপেক্ষা করে। আবার ধস্ত সীতাকে নিয়ে নতুন লাইন শুরু হয়। জিংক-অক্সাইড ও লিনসিড তেলের মুখগুলো—সীতার কুটুমরা—কাঠিতে দাঁত খোটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

খসখসে, ঝড়ো ঝড়ো অন্ধকারের খুলো দৃষ্টিহীন ব্যুহ রচনা করে। বাতাস খেমে থাকে বটগাছে। জল বয়ে যায়। আসলে সব জলেরই গোপন ঘ্রাণ আছে, কিন্তু বলে দেওয়া হয়—যাহা স্বাদহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন... ইত্যাদি।

এসব কথা আজ কে না জানে।

সমীর রক্ষিত

আজ নিয়ে টানা দু'দিন মাধু হামলাচ্ছে। মাধু নামটা বিলাসেরই দেওয়া। সেদিনকার বকনা বাছুর এর মধ্যেই যুবতী হয়ে উঠল? রজোদর্শন হয়েছে, তারই হামলানি। দড়িদড়া হিঁড়ে ফেলবে, এত লাক্ষ্যাপ। বংকা রাখাল খুঁটি পুঁতে রেখে এসেছে তালপুকুরের ধারে। ঘাসে মুখে দিচ্ছে কোথায়? খুঁটি উপড়ে ফেলবে মনে হয়, এমন জোর ছুটছে। ছুটতে গিয়ে দড়ির টানে দু'একবার উশ্টেও পড়েছে। কিন্তু তাও গ্রাটে নেই। এরই নাম শরীরের খিদে। বিলাস দুদিন ধরে 'শরীরের খিদে' কথাটা আওড়াচ্ছে মনে মনে। তার বয়স পঞ্চাশ পার হচ্ছে।

ওদিকে নিমু কয়রালের কেলে বাঁড়টা ডাক ছাড়ছে বাঁশঝাড়ের দিক থেকে। তিন গাঁ উজিয়ে ডাকে ডাকে ঠিক চলে এসেছে। গতকাল থেকেই হামলা করছে। কিন্তু বিলাসের কড়া বুকুম জারি আছে—ও ডাকটাকে কাছে ঘেঁষতে দিবিনি বংকা। পেটান লাগা, তাহিড়ে দে শালারে।

গতকাল বারদুয়েক খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল। কেলেটা। দু'বার ঝাপও লাগায় মাধুর ওপর। কিন্তু তেমন যুতসই হয়নি। সেই ঝাঁকে বংকা আহোলা বাঁশ দিয়ে ঝেড়েছে দু'বার। কেলেও ক্ষিপ্ত, তেড়ে আসে শিং আর ককুদ কাঁপিয়ে। বংকার তো ভয়ই লেগে গেল। তখন খাত্তা তেড়ে যায় আরো একখানা বাঁশ নিয়ে। উপায়ান্তর না পেয়ে সেই থেকে কেলে বগু বাঁশঝাড়ে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে আর হামলাচ্ছে। রাতেও দু'বার মশাল নিয়ে তাড়া করতে হয়েছিল বংকাকে।

নিমপুরা গাঁয়ের জোতদার বলাই সামন্তর এই এক রোখ চেপেছে। আর যে বাঁড় আসে আসুক নিমু কয়রালের বাঁড় যেন মাধুর কাছাকাছি না হতে পারে। আটকাও শালাকে। যেন ব্যাটা স্বয়ং নিমু কয়রাল।

পাটনেখালির নিমু কয়রাল অঞ্চল প্রধান। গত নির্বাচনে তার সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় বিলাস সামন্তর। মাত্র এক ভোট হারে বিলাস। কয়রাল নিজে খেতমজুর। তন্মাত্রের ভাগচাষি আর খেতমজুর অনেক দিন ওদের দলে। সেই সাতান্তর থেকে।

সাতষট্টি থেকে সাতান্তর। সেই দশটা বছর ভানুমতির বা খেলই হয়েছে এতন্মাত্র। সাতষট্টির বছরখানেক আগেই, তখনো বিলাসদের সরকার বহাল আছে কলকাতার রাইটার্সে। সেই তখনই সন্তর বিধে জমি সামন্তদের খাস

করল সরকার। নিমপুরা আর এই পাটানখালির মাঝ বরাবরা। ডাঙাজমি, কৃষিজমি, সিলিং নাম-বেনাম, আইন-আদালতের হরেক প্যাঁচ চলছে তখন। পাটানখালি, গোবিন্দপুর, ময়নাদা ভাগচাষি আর খেতমজুরদের ঘাঁটি হয়ে উঠছে। তাদের হাঁকাহাঁকি তো ছিলই, সেই তেভাগার কাল থেকে। কিন্তু তা বলে নিজেদের সরকারের একী বিশ্বাসঘাতকতা?

বিলাসের বাবা রঘুনাথ সামন্ত ছিল এ তল্লাটের মোড়ল। সামন্তরা এ তল্লাটে সাতপুরুষেরই মোড়ল। এদিকে নিমপুরা, টুটাঘাট, পায়রাডিহি, ওদিকে গোবিন্দপুর, ময়নাদার ও একমাত্র পাটানখালি বাদ। সবাই তখনো, ভেতরে ভেতরে যা করুক, তাকে মানে, ভয়ে কিম্বা ভক্তিতে। এ তল্লাটের এম-এল-এ তখন বাসুদেব পোদ্দে। রঘুনাথকে ডাকে—জ্যোতি। ভোটের পরে মিছিল করে এল বাসুদেব সেবারে রঘুনাথের পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেছিল। সেই বাসুদেবকে রঘুনাথ শুধায়—এডা কী হল বাসু? আমার জমি খাস হল?

কথা যা হয়েছিল সব গোপনে। কিন্তু লোকের মুখে মুখে ছড়ায় সেসব কথা, এমন যেন নিজে কানে শোনা। দশগাঁয়ে ছড়ায় সেসব কথা। এ অঞ্চলের হাওয়া সে-কথা বলে, গাছ-গাছালিতে, পাখ-পাখালিতেও সেসব কথা জানে।

—জ্যোতি, রাগ করোনি। ও'রম করতি হয়—অপজিসন আছে না, কমিনিস। তাও তো আপনার মাস্তর সম্তর বিধা, ঘাটপুকুরির আমোদ সরদারের দেশ বিধা খাস হয়েছে। তা হোক না, জ্যোতি, আপনে চাবাবাদ চাইলে যান। কে ঠেকায়? আর একটা কথা আপনেনে বলি—একটা মামলা হুকি দেন সদরে। আইনের সব ফাঁকফোকর রেইখোই খাস করা হয়েছে না? বোঝেন তো সবই।

এসব কথা হাওয়ায় ছড়াতে ছড়াতে সাতবট্টি এসে যায়। বিলাস তখন সন্তের আঠারর উঠতি জোয়ান। তার দাদা কৈলাসের বড় জোর পঁচিশ। সাতবট্টিতে কর্কশ হুতাম পেঁচা ডাকল চারদিকে। একটা ঝড় হল। রাইটার্স থেকে রঘুনাথদের সরকার উচ্ছেদ হল। এল পাঁচমিশালি সরকার। তখনই বেদখল হল তাদের সম্তর বিধা জমি। আরো, বেনাম জমিতেও ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা হল। আগেকার দারোগাপুলিশ এবার বেঁকে বসল, তারা আর জেতদার রঘুনাথের হুকুমে রাইফেল বন্দুক নিয়ে ছুটে আসে না। রঘুনাথের দোনালা আছে ঘরে, তাই ভরসা।

তখন এলাকায় দাপট তিনু মাঝি, নিমু কন্নরালের বাবা হিমু কন্নরালদের। বাসুদেব ভোটে হারল, নগেন সাধুর্ষী হল নতুন এম-এল-এ। হঠাৎ যেন পিপড়ের ডানা গজাল। বিলাস-কৈলাস-রঘুনাথরা দেখল তার চেয়েও

ভয়াবহ, পিঁপড়ে নয় পঙ্গপাল। বহুদিনের ভূমিকুখাত্তর জাতকৃষক, ভূমি থেকে উচ্ছেদ-হওয়া অনেককালের কৃষিমজুররা ঝাঁপিয়ে পড়ল জমির ওপর। তারা শুধু সরকারের খাস করা সম্ভব বিঘাতে চাব দিল না, সামন্তদের বেনাম জমিতেও নিশান পুঁতে গেল। খাস করার বিরুদ্ধে মামলা চলছিল তখন জেলাসদরে। রঘুনাথ বন্দুক নিয়ে দাঁড়াল বেনাম জমির ধারে, খাস হওয়া জমির কিনারে। তার ফলে তখনও কিছু ভাগচাষীকে সে ধরে রাখতে পেরেছে। আরো আছে যারা জন্মজন্মান্তর ধরে গাছীর দলকে ভোট দিয়ে আসছে। সুখে দুঃখে যারা দিন শুজরান করে যার। যারা ভাবে মাথার ওপর ভগবান আছে, তিনিই দেখবেন তাদের। দেখুক না দেখুক তারা ছাড়বে না তাঁকে আর সেই সঙ্গে গাছীর দলকে। এদের ছাড়তে তাদের সংস্কারে বাধে।

ফলে রঘুনাথ নিতান্ত একলা মানুষ না। তারও খুঁটিখোঁটা আছে এখানে, আছে সদরে আছে কলকাতায়। সে জানে এদের শিকড় বাড়ি ছড়ানো আছে দিল্লিতেও। তাদের রাজস্ব অত সহজে যাবার নয়। কে ভয় পায়? রঘুনাথের হাতের বন্দুকের নল গর্জে ওঠে। গুলি ছোটো, ধোঁয়া বের হয়। লাশ পড়ে দুখানা। কিন্তু ছাড়ান পায় না রঘুনাথ। থানা তাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। বন্দুক সিজ করে। সদরে চালান যায় রঘুনাথ।

এসব যখন ঘটছে এজেন্সি ও জেলা সে-জেলায়, তখন রাজ্যের স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী অনশনে বসেন। নিজের সরকারকে বলেন—বর্বর সরকার। সে সব কথা মাটি-হাওয়ায় জানে, জানে এদেশের গাছ-গাছালি, জানে পাখ-পাখালিতেও। পাঁচা কি এমনি কর্কশ ডাক ডাকে? এ ডাক শোনা যায় উত্তরে শিলিগুলি-নকশালবাড়ি, দক্ষিণে কাকদ্বীপ, সুন্দরবন, পশ্চিমে মেদিনীপুর-পুরুলিয়া, পূবে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত।

বিলাস সামন্তর তড়পি গাই, প্রথম ঋতুমতী হওয়া মাধু কি জানে এসব কথা? নাকি জানত তার মা ধলি? ধলির মতই গান্নে সাদা আর কপালে কালো চাঁদ নিয়ে চাঁদকপালী মাধুকে দেখলে কার না হিন্দি সিনেমার কথা মনে আসে? এমন জেলা তার রাপের। এ তন্ম্যাটে আজ তক শুধু বিলাস সামন্তর বাড়িতেই আছে কালার টিঙি। না তো কি বিলাস এমনি এমনি মাধুর নাম মাধু দিয়েছে? কী মাধুরী ওর দেহে। আর এও এক তাজব কাণ্ড যে সামন্তদের গোয়ালে তেমন ঐড়ের জন্ম হচ্ছে না বহুকাল। বড় হলে যার শিং ককুদ আর মস্ত তাগড়াই শরীরের তেজে গাই আপনা আপনি ছুটবে তার দিকে! টিঙটিঙে যে দুখানা আছে সে দুটোর একটাতেই বুঝি শেব তক মাধুর বরমাল্য দিতে হয়। কিন্তু ও দুটোর হিম্মতে জন্মাবে কোন জাতের ঐড়ে বা বকনা? এই দুর্ভাবনার ওদুটোকে খুঁটিপৌতা করে রাখা হয়েছে দূরে। কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবেই। তবু শেব সিঁছাতটা মাথায়

খেলছে না বিনাসের। হঠাৎ মনে মোচড় দেয় ষাটপুকুরের আমোদ সরদারের ব্যাটা ষাট সরদারের মুখটা। সে নাকি জার্সি গরু কিনেছে গোটাকতক। সেখানে যদি মাধুকে—

ষাট সরদার—ভালো কথা। সেও তো ঝাঁকের কই। সেই সাতষট্টিতে ওদের আরো বেশি জমি খাস হয়েছে। ওরাও জম্মি শেষ। ওরাও গরুগরু করছিল সাতষট্টিতে। তারা তখন কেউ ভেবেছিল সাতষট্টির পরেই একান্তর আসবে? ঠিক তার পরেই আসবে বাহান্তর? নির্বাচন তো নয় বাঁড়াবাঁড়ির বান। যত হেলে বর্গাদার আর নিখাত ক্ষেতমজুর জমি বেদখল করেছিল রক্তের ঢলে তাদের চুবিয়ে চুবিয়ে নাস্তানাবুদ করে দেওয়া গেল। ক্ষেতমজুরদের নেতা হিমু কয়রাল আর হরেকেষ্ট দলুইয়ের লাশ কেলে দিয়েছিল রঘুনাথ আগেই। পরে পবন ইন্দু আর সানা মিন্দেও রক্তের ঢলে ভেসে গেল। যে কটা ছিল পালের গোদা পালাল তারা, পরে পুলিশের জালে অড়িয়েও গেল, শেষে চালান হয়ে গেল শ্রীঘরে। যেমন হিমুর ব্যাটা নিমু। আর যারা রইল নিমুমাঝ ট্যাকৌ করলেই হাতে হাতকড়া পড়তে লাগল। আহ, কী শাস্তি!

ফের আইনের রাজত্ব কায়েম হয়ে গেল এ রাজ্যে। রাইটার্সে আবার তাদের সরকার। বাহান্তর থেকে সাতান্তর—আহ, কী সুদিনই যে গেছে। দিল্লীতে তখন দেবী ছিন্নমস্তা জেগে উঠেছেন। নিছের রক্ত নিজে পান করে দেখাচ্ছেন দুনিয়াকে। আর দেশজুড়ে জরুরি আইনের চাবুক চলছে। তখন মনে হয়নি এজীবনের কয় আছে, শেষ আছে। মনে হয়েছিল এজীবন অক্ষয়, চিরস্থায়ী। কোনদিন আর কোন ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষীর ব্যাটা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আর কোনদিন তাদের পাখা গজাবে না, উড়বে না। তাদের সব রক্ত শুকে নিংড়ে নিয়েছেন দিল্লীর দেবী আর রাইটার্সের দশাননেরা।

হরগোপাল পাণ্ডার ব্যাটা প্রাণগোপাল একখানা শোলোক আওড়ার—
ইয়ে, তোমার ইয়ে পরিবর্তন হচ্ছে চক্রবৎ। চাকা ঘোরে—হাত ঘুরিয়ে দেখায়। সত্যি কি ঘোরে নাকি? শব্দ ওঠে? কিন্তু আর ঘুরবে কেন? এবার বন্ধ হোক। বাহান্তরেই থেমে থাক চাকা। চিরজীবন।

শেষ চেষ্টা করেছিল তারা, বিনাস-কৈলাস-ষাটপুকুরের সর্দাররা, সবাই মিলে সাতান্তরে। চাকা যাতে আর না ঘোরে। রঘুনাথ জামিনে ছাড়া পেয়েছিল আগেই। মামলা তুলে নিয়েছিল সরকার বাহান্তরে। সাতান্তরে আবার রঘুনাথ বন্দুক হাতে বেরিয়েছিল কিন্তু বাঁশবাড়ের ওদিক থেকে প্রতিপক্ষের গুলতির গুলি এসে লাগে তার কপালের ঠিক মাঝখানটাতে। খেল খতম। তার চাকা জ্যাম চিরকালের মত। কিন্তু কালচক্র থামে না। শুঁড়িয়ে দিয়ে যায়

বিলাসদের। আর হাড়-হাভাতেরা, হাফমিনেরা ফিরে আসে পিল পিল করতে করতে।

এবার ওদের চোঁট দাপট কে দেখে! সব খাস জমি দখল হয়ে যায়। চাষাবাদ চলতে থাকে। দেখতে না দেখতে পঞ্চায়েত নির্বাচন, অপারেশন বর্গা এসে যায়। পিঁপড়ের ডানা গজায়। পিঁপড়ে থেকে পঙ্গপাল। আর বিলাস কৈলাস খাটু সরদারেরা চূপচাপ থাকে। মাথা নিচু করে থাকে। যে ন্যাড়া নেংটি লোকেরা আগে সামন্ত বাড়ির সামনে দিলে হাতা মাথায় দিলে যেতে পারত না, হাতা বন্ধ করে দিতে হত, তারা হাতা মাথায় গটমটিয়ে যায়। যাদের সাইকেলে চড়ে যাওয়া বারণ ছিল, নিয়ম ছিল এখানে এসে নামতে হবে, সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তারা সাইকেল চালিয়ে যায় ধীরেসুস্থে। কেউ কেউ শিস দেয়। আর যেমন নিয়ম ছিল, এবাড়িতে এলে সোজা হেঁটে কেউ ফিরতে পারবে না, কারণ তাতে তোমার পাছা দেখতে হয় সামন্তদের, কাজেই তোমরা পেছন ফিরে হেঁটে চলে যাবে। এই নিয়ম উশ্টে গেছে, এখন সব ব্যাটা পাছা দেখিয়ে দেখিয়ে পেছন ফিরে চলে যায়। বিলাসদের ঘরে বন্দুক এখনো আছে। বন্দুক থাকে আলমারিতে। তালা দেওয়া। বিলাসরা দিন গোনে। কারণ তাদের দম বন্ধ হয়ে আসে। দাঁতে দাঁত চাপে তারা, রক্তচাপ বাড়ে। কণ্ঠা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। তেঁটায় ছাতি ফাটে। এতকাল নর-রক্তে তৃষ্ণ মিটেছে। এখন।

একথা এরাছোর মাটি-হাওয়ায় জানে, জানে এতল্যাটের গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি। কালপেঁচা কি অন্ধকারে এমনি কর্কশ ডাক ডাকে? আর শহরে সদরে? সেখানে কি এমনি এমনি রাতে ছাপা হয় সন্ধ্যাপত্র? এমনি এমনি কি খবর তোলে কাঁধের ক্যামেরা? তারাও সব হা-হুতোশ করে। কাগজে টিভিতে। বুক চাপড়ায়। বিলাসদেরই জাতভাই তারা, স্পষ্ট বোঝা যায়। ধড়ে প্রাণ আসে তখন। এসব কথা মাধুর মা ধলি জানত। মাধু কি জানে না এসব কথা? পাটানখালির গুলি-খাওয়া হিমু কয়রালের ব্যাটা নিমু কয়রাল বিলাসের জাতশত্রু, জানে না মাধু? হোক না প্রথম রক্তোদর্শন। যে বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে গুলতির গুলি ছুটে এসেছিল, বিদ্ধ করেছিল রঘুনাথ সামন্তের কপাল, সেই বাঁশঝাড় থেকে ডাক ছাড়ছে নিমু কয়রালের কেলৈ যাঁড়? ব্যাকা হুঁচলো তার দুই শিং, মস্ত ককুদ আর ঝুলন্ত তাগড়াই অশুকোষ! ওরই খপ্পরে পড়বে মাধু?

বিলাসের গায়ে অগ্নিদাহ। এদিকে দিনও তো শেষ হয় না, আর কতদিন দিন শুনবে বিলাসরা? চাকা তো ঘুরছে না? দিন ফিরে আসছে কোথায়?

কোথায় হে হরগোপাল পাণ্ডার ব্যাটা প্রাণগোপাল পাণ্ডা, কোথায় গেল তোমার ইয়ে? কোথায় গেল তোমার জয়ের চক্রবৎ পরিবর্তন? চাকা তো

দেখি শুধু সামনে চলে। সেই সাতাস্ত্রেই নির্বাচন, তারপর বিরশি, এরপর সাতাশি, আবার বিরানব্বই, এরপর ছিয়ানব্বই—ওদের চাকা তো চলছেই। কী বিধানসভায়, কী লোকসভায়? কী পঞ্চায়তে, কী জেলাপরিষদে? তবে কি ওরা কয়েমি হয়ে যাবে হে?

প্রাণগোপাল পাণ্ডা আকর্ষণ হেসে বলে—জ্যাঠা, কলিকাল চলতিছে না?

—ঘুর ব্যাটা! সাতষট্টির পরে যে একান্তর, একান্তরের পরে যে বাহান্তর এল, সেও তো কলিতেই, নাকি না?

—সেও সত্য। তবে কিনা জ্যাঠা, কলিতে পাণীরাই পয়া পায়, একথা স্বয়ং ভগমান বলতিছেন কুরুক্ষেত্রের ময়দানি দাঁড়ালে—

প্রাণগোপালের একথা—‘ইয়ে মারি তোমার ভগমানির’। একথা সপাটে বলতে যাচ্ছিল বিলাস। হঠাৎ একথা যে স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, এ ইশ বিদ্যজ্ঞানের মত তেনাই এনে দেন সম্ভবতা ফলে বিলাস আত্মহত জ্বিত কাটে। কিন্তু তার গায়ের অমিলাহ কমে না। গায়ের এ আশুন তার গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে দিতে মন চায়। মাঝে মাঝে খাটু সরদারের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। সদর থেকে, কলকাতা থেকে পছন্দনৈরাও আসেন। তাদের মধ্যে আর কেউ দশানন নেই। সব অর্ধেক হয়ে গেছে। তবু তারা আশার আলো দেখান, বলেন—আবার দিন আসবে বিলাস, পাপের রাজত্ব শেষ হল বলে, হিমমতী দেবীর পুনরাবির্ভাব অবশ্যজ্ঞাবী। দিল্লীর দিকে তাকাও, আর নিজে বুক বাঁধো।

শেষ কথাটায় আপত্তি থাকে বিলাসের, তার ফোড বুক বাঁধার প্রশ্ন আসে কোথেকে, সে কি মেয়েছেলে নাকি? তবু প্রতি ভোটের আগেই কোমর বেঁধে নামে সে। একটু একটু কি চাক্ষ নড়ছে? তার তাঁবের কিছু ভাগচাষী তো আছেই। তাছাড়া কিছু ক্ষেতমজুর যারা জমি না পেয়ে মনে হয় মন মরা, আর আছে তারা, যারা জন্মজন্মান্তর ধরে গাছীর দলকে ভোট দিয়ে আসছে। যারা ভাবে মাথার ওপর ভগবান আছে তিনিই দেখবে তাদের। তিনি দেখুক না দেখুক, তারা কখনো ছাড়বে না তাঁকে, আর ছাড়বে না গাছীর দলকে। তারা আছে তার পাশে।

কিন্তু এত যে তোড়জোর, হাঁকডাক, মিটিং মিছিল আদত ফলটা কী ফলছে? এত যে সাংবাদিক, এত ক্যামেরা, এত প্রতিবেদন, সবাই তো বিলাসদেরই জিতিয়ে দেয় ভোটের আগে। ওদের গোহরান হারিয়ে ছাড়ে। কী কাগজ আর কী টিভি এমন ভবিষ্যদ্বাণী করে বিলাসদের আশা ভাল গাছে গিয়ে ওঠে। ফল বের হলে শকুন এসে বসে। তবু ওদের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে বিলাসের, ধড়ে প্রশ্ন আসে। ওরা কেউ বলে—আমি দৈনিক সত্যবাদী থেকে আসছি। কেউ বলে—আমরা দিনকে রাত রাতকে দিন করি, আমাদের কাগজ ‘দিনরাত’। ক্যামেরা তাক করে কেউ বলে—

আমরা ‘সোজা কথা নিউজ’। ওরা এসেই বলে—চারদিকে তো দেখছি সাংবাদিক সন্ত্রাস চলছে, এম.মানেই তো মারপিট, মারদাঙ্গা। আপনি কী বলেন? আম্মোও তাই বলি। এই যে, কোন ব্যাটা ছাতি মাথায় দে যেতে পারতনি সামন্ত বাড়ির সামনা দি, তারা এখন গটমটিয়ে যায়। সাইকেল কী, মটর সাইকেল ভটভটিয়ে যায়, পাছা দেখিয়ে দেখিয়ে—অ্যা! কী বীভৎস? পাছা দেখায়? শীলতাহানি। বাড়ির মেয়েদেরও? আলবৎ। এম.মানেই তো মালমেট্রিয়াল, এমনি মাল, দিশি বিলিতি, এম.মানেই তো মিথ্যাচার, রাহাজানি, ধর্ষণ, মার্ডার, ওরা আপনার বাবাকে খুন করেছে, তাহিতো? জোর করে আপনাদের জমি চষছে?—নিযাস্। এম.মানেই তো মানি, মাসল, মাস্তান? লক্ষ লক্ষ টাকা? তাহিতো? সাইকেল থেকে মোটর সাইকেল? সব দুশ্বরী, ঠিক কিনা? তাহলে ওসব ক্ষমতা, অর্ধের বিকেন্দ্রীকরণ, সবই ওদের নিজেদের স্বার্থে? ওরাই তো সব? গ্রামের শতকরা আশিভাগ লোককেই ওরা পাইয়ে দিচ্ছে। আপনি কী বলেন?—আম্মোও তাই বলতিছি।

‘দৈনিক সত্যবাদী’ ‘দিনরাত পত্রিকা’ কিম্বা ‘সোজা কথা নিউজ’ ইত্যাদি হরেক সন্বাদপত্র ও টিভি নিউজে যা ওরা বলে বিলাসও তাই বলে, কিন্তু বিলাস যা বলে ওরা তা বলে না। কিন্তু মালটা জমে জব্বর। এখন বিলাস জানে এগুলো সব ইন্টারি। এবং সব নির্বাচনেই ওরা ভোটের আগে বিলাসদের ক্ষিতিয়ে দেয়, তুলে দেয় তালগাছের মগডালে। ভোট গণনার পরে বলে রিগিং, সাস্পেন্টিফিক রিগিং, বুথদখল, বুথজ্যাম, ব্যোমবাজি ভয় দেখানো, কারচুপি, গণনা কেন্দ্রে সন্ত্রাস। নির্বাচন নয় গ্রহসন। দু’চার জয়গায় যে জেতে বিলাসরা, তাও গ্রহসন।

বার বার, বার বার ঐ এক কথা বলতে বলতে, শুনতে শুনতে বিলাসের এখন সব কেমন আলুনি লাগে। পুরোপুরি জীবনটাই তার কাছে পান্দে হয়ে যাচ্ছে। এটা বিলাস বুঝে যাচ্ছে জমি বুঝি আর ফেরত পাওয়া যাবে না। লোককে দিয়ে বোধহয় আর সামন্তবাড়ির সামনে খোলাছাড়া বন্ধ করানো যাবে না। কাউকেই সাইকেল কিম্বা মোটর সাইকেল থেকে নামানোও যাবে না আর। কিম্বা বন্ধ করা যাবে না পাছা দেখানোও। তাহলে? বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বিলাসের। ঠিক আছে, তাও মানছি। সেসব পুরানো দিন যদি ফেরানো না-ই যায় তো না যাক, কিন্তু এখন তো একটা পঞ্চায়েত প্রধানের চেয়ারটা দখল করা যায়? অন্তত যদি জেলাপরিষদে গিয়েও বসা যায় একবার? আর যদি, যদি তাঁর ইচ্ছায়, অন্তত একবার এম-এল-এ হওয়া যায়? ইস্, জীবনটাতে যেন একটু নুন লাগে। যেন একটু ঘন হয় লজ্জাবাটা ঝোল। হয়তো তখন আবার তালা খুলে বন্দুকটা বের

করা যায়, সাফসুতরো করে নতুন করে টোটাগুলি ভরা যায়। হা ঈশ্বর, জীবনে একটু নুন পাও। হারতে হারতে, হারতে হারতে দম বন্ধ হয়ে আসছে। কথা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।

কেলে যশুটি যেমন পেটের একদম তল থেকে শব্দ তুলে এনে মুখ নিচু করে ডাক ছাড়ছে বাঁশঝাড় কাঁপিয়ে, তেমনি দ্বিধুবন কাঁপিয়ে শেষবারের মত ডাক ছাড়তে ইচ্ছে হয় বিলাসের। সারা গায়ের আগুন রক্তে রক্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সদরের, কলকাতার পঞ্চাননদের ওপরে সন্ধ্যাপত্র আর টিভি নিউজের মুখের ওপরে আগুন ছুঁড়ে দিতে মন চায়। কারকে আর বিশ্বাস নেই বিলাসের। এসের দিগ্রে কিছু হবে? আদতে দিল্লীতে দেবীর পুনরাবির্ভাব ঘটছে বটে কিন্তু তার আর আগের দেবীর মত তেজ নেই। মহিমা নেই। এই তো এসেছিল সুযোগ। ছিয়ানব্বই থেকে আটানব্বই। আটানব্বইয়ে কাঁকা মসনদ। ওঠো, লাফাও, গ্যাট হয়ে বসো। আর পার তো ছিন্নমস্তা হও, নিজের নখে নিজের গলা চেরো। নিজের মুখে পান কর নিজের রক্ত—দেখাও দুনিয়াকে। কিন্তু সে কি আর ঘটবে কোনদিন? নয়া দেবী বলল—না, পারব না সরকার গড়তে।

তবে কে গড়বে? কে দেখাবে পথ? একদিন উদ্বেজিত খাটু সরদার ছুটে আসে—চাকা ঘুরতিছে বিলাস। এতদিনে আশার আলো ফুটতিছে, চোখে পড়তিছে?

—কই, কোন্ দিক? বিলাস চোখ খোঁরায় পূবে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে। সব দিকে। যে কোন দিক থেকে হোক, আসুক। আলো চাই, নুন চাই। জিন্দে স্বাদ ফিরে আসুক। বোল ঘন হোক।

কিন্তু কার হিম্মৎ আছে, যার ওপর ভরসা করা যায়? দিল্লীতে গান্ধী নেই, দেবী হীনবল।

—আচ্ছা, আরেক দেবী যে ছেল, কী এক চমকা দেবী। কলকাতা থেকে লাফ মেইরে এসে ধান রুয়ে দিগ্রে গেল সিবার তোমার জমিতি?

—আরে, সেই তো এখন দিল্লিতি?

—অ্যা, কও কি খাটু?

—তবে?

দিল্লী কি কারোর একার? দিল্লীতে কি চিরকাল কেউ একা টিকে থাকে? গান্ধী চলে গেছে, কিন্তু তা বলে কি রথুপতি রাঘব নেই? ফিরবে নাকি রাজা রাম? রাম লালা? রামরাজহু কায়েম হবে না? তবে আর কোন্ কন্মে নিরানব্বইয়ে বাবরিভঙ্গ হল? সারা দেশ জুড়ে আগুনই বা ছলে উঠল কেন? সেই রথযাত্রা থেকে বাবরি। খুনে ধর্ষণে লুণ্ঠনে শিশুহত্যায় এমনি বিঘ্নস্ত, রক্তাক্ত হল ভারত? ভারতের পকির সব নদী বিঘর্মীর রক্ত ঢলে তবে আর

গেকুয়া হল কেন? এমনি এমনি, বল? হনুমানরা কি এমনি লাফায়? এমনি মুখ পোড়ায়?

তাদের ল্যাঞ্জে ধর্মের কল নড়ে। ইতিহাসের কলকাঠিতে ধর্মের ল্যাঞ্জ। বিরানববই থেকে ছিয়ানববই। ধর্ম পাড়ে হাওয়া ডিম, তের দিনের। কিন্তু ধর্মের প্রজ্জনন কি থেমে থাকে? ছিয়ানববই থেকে সাতানববই, সাতানববই থেকে আটানববই—দ্যাখো, ল্যাঞ্জে বাঁধা পড়ল দিল্লীর মসনদ। রক্তে ভেজা ধর্মের নামাবলী ধুতির তলায় চালান হয়ে গেল। চোখে দেখা যায়? না। সাধুর ভয়মাথা মুখে রক্ত নয়, রক্তচন্দনের তিলক। আহা, এ—মুখ না মুখোস? এর নাম দিল্লীর মসনদ, এখানে পাত পাততে গেলে কত কী করতে হয়। কিন্তু হা হতোশ্বি, তবু একা নয়, এক কুর্সিতে চকিশ দখলদারের জাঘো বাটোয়ারা। সেই কুর্সি থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে? সত্যি?

খাঁটু সরদার চোখের ওপরে বাঁ হাতের করতল কাত করে দূরদৃষ্টিতে দেখে, বিলাস তার দৃষ্টি অনুসরণ করে—সত্যি আশার আলো ফুটিছে। এতদিন পরে তবে সত্যি চাকা ঘুরতিছে। আবার কি সেই একান্তর বাহান্তর আসতিছে। এতদিন পরে, সেই সাতান্তর থেকে আটানববই—

—হারে প্রাণগোপাল। ওরে হরগোপাল পাশুর ব্যাটা প্রাণগোপাল পাশু, আয় দেখি; বল দেখি—সত্যি কি আলো আসতিছে, বাপ? উত্তেজনায় বিলাসের গলার নলি ফেড়ে যায়। শুকনো কঠা।

—জ্যাঠা, সত্যই। নিয়ন্ সত্য। আমি আগেই বলিছি কিনা জ্যাঠা, কলিতে পাপীরই পয়া পায়, একথা স্বয়ন্ ভগমান বলতিছেন কুরুক্ষেত্র ময়দানি দাঁড়ায়? প্রবল উত্তেজনায় প্রাণগোপাল লাফাতে লাফাতে বলে—আলো আসতিছে জ্যাঠা, দিল্লীর ঠেঙে আলো। ঐ তো ঐখানে দেঁইড়ে আছেন আমাদের রাষ্ট্রের তেরঙা দেবী স্বয়ন।

একথা আজ কে না জানে ভূ-ভারতে। জানে এখানকার জমি-হাওয়া, এখানকার গাছ-গাছালি, মায় পাখ-পাখালি পর্যন্ত। কালপেঁচা ডেকে ডেকে জানান দিচ্ছে অষ্টপ্রহর। জানান দিচ্ছে কলকাতার ‘দৈনিক সত্যবাদী’, ‘রাতদিন পত্রিকা’, ‘সোজা কথা নিউজ’। এছাড়া বলছে দিল্লীর কিছু ইংরেজি হিন্দি, পত্র-পত্রিকা, যেমন—‘দ্য অল ইণ্ডিয়া যুথিস্ট্র’, ‘নই ভরতপাদুকা’, ‘জয় হনুমানবলী’, এছাড়া অষ্টপ্রহর দূরদর্শন সঞ্চাদ ‘হরজালি (লাভু) সন্দেশ’, ‘শ্রণয়-পরিণাম-হানিমুন এডেলি’।

ডাক উঠেছে এম-এর দফারফা। যতই রেকর্ড দেখাও, সর্বভারতীয়? বিশ্বরেকর্ড? অচল, চলবে না। ফেলে দাও। ছুঁড়ে ফেল। পুড়িয়ে ফেল। যদি ওরা নিজেরা না ফেলে দেয়, আমরা গিয়ে ফেলে দিয়ে আসব। আমরা ছুঁড়ে ফেলব। ছিঁড়ে ফেলব। পুড়িয়ে ফেলব। আমরা ওদের মৃত্যু ঘণ্টা

বাজাব। আমরা রাইটার্স খেরাও করব। জবরদখল করব রাইটার্সের করিডোর। আমরা মুখ্যমন্ত্রী হব। লাল বাড়ি আমাদের চাই। আমাদের কেউ রুখতে পারবে না—যতদিন দৈনিক সত্যবাদী, রাতদিন পত্রিকা, সোজা কথা নিউজ—আমি আইন পেতে দেব, সমস্ত গ্রামগঞ্জ, শহরকন্দের থেকে হাজার হাজার মানুষ সোজা সোনার বাংলায় পৌঁছে যাবে। আমি সোনার বাংলা—দূর থেকে শোনে বিলাস আর খাঁটু সরদার।

কিন্তু ওরা যে বলছে ওরা গ্রামবাংলার ভূমিসংস্কার করেছে? খাস জমি, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের বস্টন করে দিয়েছে। কলে এরাঙ্কের কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। অপারেশন বর্গায় ভাগচাষীর অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ওরা বলছে—গ্রামবাংলায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, ক্ষমতা অর্ধ দিয়ে ওরা গ্রামের মানুষের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার, মর্যাদা দিয়েছে? কলে গ্রামবাংলা ওদের দুর্গ।

সাতাস্তর সাল থেকে আজ পর্যন্ত ওরা গ্রামবাংলাকে তিলে তিলে ধ্বংস করেছে। ওরা হাজার হাজার মানুষ খুন করেছে, জমিজমা কেড়ে নিয়েছে, নিজেদের ক্যাডারদের মধ্যে তা বিলি করেছে। ওরা রম্পলা পোন্নের মত নারীদের ধর্ষণ করেছে। কেউ ওদের বাধা দিতে পারেনি ভয়ে। ক্ষমতা আর অর্থকড়ি সব দিয়েছে ওরা ক্যাডারদের। ওরা গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। বহুগণ, আপনারা তৈরি হোন, কঁখে দাঁড়ান, আপনারা আপনাদের জমি ফিরিয়ে নিন। আপনারা কি ওদের ভয় করেন? আমি আছি, আপনাদের ভয় নেই—আমি আজই দিল্লী যাচ্ছি—সব কাগজপত্র আমার সঙ্গে। আপনারা জেগে উঠুন,.....হাতে অস্ত্র নিন, আত্মরক্ষায় এগিয়ে আসুন, আত্মরক্ষায় অস্ত্র ধরোগ নিষিদ্ধ নয়। একথা বিলাস স্বকর্ণে শোনে। তার রক্তের আশুন লাফ মেয়ে ওঠে।

এসব কথা আজ কে না জানে! কালপেঁচা, ডেকে যায় গাঢ় অন্ধকারে। আজকাল দিনেও ডাকে। দিন এখন রাতের অধিক। চব্বিশ ঘণ্টাই জীবন, টিভি-জীবন। সিনরাত। অবিরাম। একথা আজ মাটি-হাওয়ান, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালিও জানে। মাধু কি জানে না? জানে না তাদের সমস্ত বিধা জমি বেদখল করে নিয়েছে সরকার? ভাগযোগ্য করে নিয়েছে ভূমিহীন কৃষকেরা। সরকার দিয়েছে তাদের পট্টা। কার জমি কে পায় পট্টা? বে-আইনি পট্টা। হিঁড়ে ফেল। হুঁড়ে ফেল। পুড়িয়ে ফেল। যদি ওরা না নিজেরা ফেলে আমরা গিয়ে ফেলে দিয়ে আসব। যদি ওরা না হেঁড়ে আমরা গিয়ে হিঁড়ে দিয়ে আসব। মাধু তবু হামলে যাবে? হোক না প্রথম স্বাভূমতী। দড়িদড়া হিঁড়ে ফেলবার জো করবে? খুঁটি উপড়ে ফেলবে? আর ওই ফেলে বশা, পাটানখালির নিমে কয়রালের, ভূমিহীন কৃষকের কলে যশা, হংকার তুলে

যাবে বাঁশঝাড় থেকে? যে বাঁশঝাড়ে রঘুনাথ সামন্ত....

—খাত্তা, খাত্তা। বিলাস ডাকে। তার শুরু কঠে চেরা শিরার নিজের রক্ত মিশছে। তাকে বহুদিন পরে তাগড়াই জোয়ান দেখাচ্ছে। তার পায়ের নখ থেকে মাথার শিরা অবধি ধক ধক করছে। তার আত্মরক্ষার তীব্রতম সাধ পান্থপথে ঢুকে তার মস্তকে ঝড় তুলেছে।

খাত্তা একটা আছোলা বাঁশ মেপে দেখছিল হাত দিয়ে, পাঁচ হয় সাত, সে আচমকা ডাকে ছুটে আসে। থানায় গিয়ে অভ্যস্ত সে, ফলে ছার বলাও তার অভ্যাস। সে বলে—বলেন ছার।

—তোর নামি কড়া কেস দেছে সালার দারোগা?

—ছুয়খান। দুইখান ডাকাতি, তিনখান ধব্যাণ, হাট আর ডিডিও ঠেকে তোলা তুলে, তার জন্মি একখান।

—না হয় আর একখান যোগ হবি। বিলাস বলে—আজ শেষরাস্ত্রির আমরা তো ফসল তুলে নে আসব, পাটানখালির আমগের জমিনির।

—আঁঃ? পরনে শাহরুখী জেন্স, মোড়ানো গৌফ, বস্ত্রমের মত চাঁছা শরীর। তবু কি আঁতকে ওঠে খাত্তা? সে জানে পাটানখালির ও জমি পাহারা দেয় আজকাল রাতজাগা কুবকেরা, তারা খালি হাতে বসে থাকে না। মাঝখানে ক'বছর দেয়নি পাহারা কিন্তু আবার তারা পাহারা দিতে শুরু করেছে। যবে থেকে আশাপুরার লাইন চালু করেছে তেরঙা দেবী গাঁয়ে গাঁয়ে। আশাপুরাতে অস্ত্র কারখানা তৈরি হয়েছে, অস্ত্র নিজেরাই বানাচ্ছে, নিজেরাই ট্রেনিং দিচ্ছে গ্রামবাসীকে, তারপর অ্যাকশনে যাচ্ছে তারা। ওখানে হাজার বিঘা জমি উদ্ধার হয়েছে জোতদার সন্তোষ নক্ষরের। খাত্তারাও ভাড়া খেটে এসেছে বার কতক। তার এক সাকসেদ রক্তমের লাস পড়েছে চন্ননপুরের ফসল খেতের আলের ওপর। কোন রকমে সেটাকে পিঠে তুলে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল খাত্তা।

—কী রে খাত্তা, ভয় লাগতিছে?

—হু, ভয়। তবে লোক কিছু বেশি লাগবি।

—তোরা ক'জন?

—দশ বারো।

—অস্তর?

—সব আছে ছার। তবে কিনা আপনার নিজির বন্দুকডাও যদি...

—যদি কী রে, সে আমার সঙ্গী! বিলাস ধমকে দিয়ে বলে—ইবার যা তোরা দলবল ডেকি নে আয় খাত্তা। বাস্ত্রির খাওয়া এখানেই খাবি।

গভীর রাত। পৌঁচার কর্কশ চীৎকারে মাঠের অন্ধকার ছিঁড়ে উড়ে যায়। বিলাস বংকা আর খাত্তাদের দল এগোয় আল বেয়ে। নিমপুরা ছাড়িয়ে ক্রোশ

কয়েক মাঠ ভাঙে তারা। রাত যখন ফিকে হয়ে আসছে, ফসলের ভাঙে নুয়ে পড়া ধানক্ষেতে যখন ভোরের হাওয়ায় গন্ধ ছড়াচ্ছে পাকা ধানের, তখন বিলাসের দল ফসল কাটবে বলে অগ্রসর হয় এদিক থেকে, হঠাৎ ওদিক থেকে একটা মাথা ওঠে ফসল ক্ষেতের ওপর দিয়ে। তারপর আরো একটা। এর পরে ক্রমে ক্রমে বহু মাথা দাঁড়িয়ে যায় অর্ধবৃত্তের আকারে।

সহসা, বিলাসের মনে পড়ে মাধুর কথা। হঠাৎ মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত চমকে ওঠে কেনে যন্ত্রের শরীরটা চোখের ওপর। বিলাস বংকাকে শুধায়, বংকা, মাধুরে কোথায় রেইখে এসেছিস?

—কেন গোয়ালির মধ্য।

—আরে আহাম্মক, খোলা গোয়ালির মধ্য কেলেটা তো ঢুকি যাবি না?

—যাতি পারে।

—তেবে?

—তেবে আর কী! হা ভগমান! তীব্র আত্ননাত করে উর্ধ্বশ্বাসে পেছনে ছুট লাগায় বিলাস, হাতে বন্দুক। কিন্তু তাকে ধমকে দাঁড়াতে হয়। পেছনেও পর পর কালো মাথা জেগে ওঠে একে একে ফিকে অন্ধকারের ভিতর। এপাশেও অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে একদল মানুষ। ওপাশেও। বৃত্ত সম্পূর্ণ। মাঝখানে পাকা ফসলের খেতের মধ্যে বিলাস, বংকা, খাত্তারা। আপাতত শান্ত, নিশ্চল, শুষ্ক ফসলের খেত।

এসব কথা আজ কে না জানে। মাটি-হাওয়া, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালিও। এবং কালপেঁচা ডেকে যায়।

খুলিহর

কিম্বদন্ত

আজ তা প্রায় বছর দশেক, সন্ট লেকে নিজের বাড়িতে বসেই শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী খুলিহরের খবর পায়। সন্ট লেকে এই গরমে বেশ হাঁসফাঁস দশা। কয়েক বছর হলো চুরি-ডাকাতিও খুব বেড়েছে। সঙ্গে জঙ্গলের কষ্ট। একটু বর্ষা হলেই জল জমে। তবু খুলোরের মেঘ বড় তাড়াতাড়ি পৌঁছয় সন্ট লেকে। প্রায় সাতাস্তর ছোঁয়া শ্যামসুন্দরের তো অন্তত তেমনি মনে হয়।

আসলে বছর দশ বারো আগে চোখ নিয়ে খুব ভুগলাম। দুটোরই দৃষ্টি কমে গেল। ঝাপসা দেখি। বড়খোকা, মেজোখোকা, বড়খুকি, ছোটখুকি, ছোটখোকা, জামাইরা, বোঁমারা—সবাই খুব জোর দিল। অসম্ভব বকাবকি। সবাই পেছনে পড়ে আছে আমার চোখের, শ্যামসুন্দরের মনে পড়ল। সময়টা পুজোর আগে আগে। সন্ট লেকে বড়খোকার বাড়িতে তখনও আসিনি। বাড়িই শেব হয়নি বড়খোকার। বেলগেছেতে ছোটখোকার ভাড়া ম্ল্যাটের একতলায় থাকি। ইন্দ্র বিশ্বাস রোড। অশপাশে নতুন নতুন বিউটি পার্কার, ফাস্ট ফুডের দোকান হয়েছে। পার্কের গায়ে সাজের বাহার। সে সব হোক ক্ষতি নেই। কিন্তু জল জমাটি ঠিক আছে। একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় এতটা জল। সেই নোংরা জল গাবিয়ে বাজার, দোকান, ইকুল-কলেজ, আপিস।

সন্ট লেকে তখন খুব কাশফুল। পুজোর আগে আগে যেমন হয়। বড়খোকার নতুন দোতলা, দোতলা একতলায় টাটকা রঙের গন্ধ। সবে তৈরি বাড়ি ঘরে কেমন একটা আনন্দ আনন্দ কাই লেগে থাকে। দেয়ালে তেল-সিঁদুরে আঁকা বসুধারা। লোকজন, গৃহপ্রবেশের মন্ত্র, নারায়ণ শিলা—সবমিলিয়ে সে এক নতুন আনন্দ।

বেলগেছেতে ছোটখোকার একতলায় ভাড়া ম্ল্যাটে তিনটে বড় বড় ঘর। সবচেয়ে আলো-বাতাসঅলা ঘরটি আমার আর স্নেহলতার। খোকা-খুকিদের মা স্নেহলতা এখনও বেশ টরটরি। তা হবে আমার থেকে বছর ছ' সাতের ছোট। তখন তো আর হাসপাতাল নার্সিং হোমের বার্থ সাটিফিকেট নেই। বাবা-মায়েরা এ সব নিয়ে মাথা ঝামানোর সময়ই পেত না। ছ' সাতটি বা আরও বেশি ছেলেমেয়ে। তার ভেতর একটা দুটো তো শৈশবেই গত। বাকিরা যারা যুদ্ধ করে বেঁচে উঠে ডাগর হলো, তাদের অন্য জন্মের তারিখ মানে, সেই যে যেবার জাপানের প্লেন উড়ে গেল আকাশ দিয়ে, সেবার তুই

হলি। আমার ঠাকুমা—সারদাসুন্দরী, তা সে বুড়ি বেঁচেছিলেন প্রায় নব্বই টক্বই হবে। অন্তত তাঁর স্মৃতি আর চামড়ার কোঁচকাঁচ দেখে তো তেমনটিই মনে হতো, সেই বুড়ি তাঁর বড়খোকা—মানে আমার বড়দার জন্ম সময় বলতে বেতনা নদীতে বড় বন্যার কথা বলতেন। বড়দা রাধামাধব আমার থেকে বছর আড়াইয়ের বড়, এখনও শক্ত আছেন। ফোনে কথা হয়।

বড়দা, আপনার প্রেশার কত?

কে শ্যাম! প্রেশারটা একটু বেড়েছিল গত পরশু।

কেন, হঠাৎ প্রেশার বাড়ালেন কেন?

ও কি আর আমি বাড়াই, এমন এমনি বেড়ে যায়। নানা কারণ থাকে।

তলায় কত, ওপরে কত?

নিচেরটাই বেশি। প্রায় একশো।

কিভনিতে চাপ পড়বে। যে কোন সময় একটা অ্যাটাক।

সব জানি, তুই একটু চূপ করবি?

আচ্ছা করলাম। আপনি বলুন।

এই সব অস্বৈরণ। জন্মদিনের নামে অপব্যয়। বাজে খরচ।

ধাক না বড়দা। ওসব নিয়ে এখন আর নাই মাথা ঘামালেন।

মাথাকে ঘামাতে হয় না। মাথা এমনিই ঘামে। মনে হয় লাধাধি দিয়া সব তছনছ করি। একেবারে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। পয়সা খরচ করলেই হলো। পয়সা আয় করতে হয় না।

শ্যামসুন্দর ফোনের অন্য দিকে একটু চূপ করে থেকে বলে, আপনি তো পেনসন পান এখনও। সরকারি চাকুরিয়া ছিলেন। দুর্মূল্য ভাতার সঙ্গে সঙ্গে পেনসনের টাকাও তো কিছু কিছু বাড়ে। ফলে দরকার কি! ওদের টাকা ওদের খরচ করতে দিন না।

রাখো তোমার এইসব ছাতামাথা কথা। ঠিক আছে, পরে সব কথা হবে। বলতে বলতে রাধামাধব চক্রবর্তী কোন নামিয়ে রাখে। খুব রেগে গেছেন বড়দা। আবার প্রেশার বাড়বে। ধাক, পরেই কথা হবে। ভাবতে ভাবতে শ্যামসুন্দর বেলগাছিয়ার ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে নিজের শোয়ার ঘরের ভেতর তাকাল। হৃদ পুরনো এই ফ্ল্যাট বাড়ির বাইরে রঙ পড়ে না বহুদিন। সামনেই পার্ক। সরকারি দুধের বড় জায়গা। পরেশনাথের মন্দির। বাড়ির ছাদে ছাদে তখন অনেক অ্যান্টেনা। সবাই আকাশ থেকে ভেসে আসা ছবি ধরে ধরে নিজেদের ঘরে রাখা টিভি-র পরদায় দেখতে চায়। এখন কেবল, বড় বড় সব নামকরা চ্যানেল আসার পর অ্যানটেনারা সব নেমে গেছে। দশ বছর আগে তেমন ছিল না।

নিজের ঘরে খাটের ওপর বসে মেঝের রাখা ঠাকুরের আসন চোখে

পড়ে শ্যামসুন্দরের। কাঠের তৈরি ঠাকুরের আসনে পটের বিজয়কৃষ্ণ গোবামী, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, সারদা-মা, শ্রীচৈতন্য—বড় বড় ছবি। সব কাঁচ আর কাঠ দিয়ে বাঁধানো। বড় জ্ঞানলা দিয়ে রোদ লাগিয়ে পড়ে বেড়াল ছানা হচ্ছে। আলোর সেই বিভা কখনও কখনও ছবির মুখে।

ছোটখোকার বড়খুকিকে গংখালির ভূতের গল্প বলি। সেই যে এক ছিল গংখালি গ্রাম। সেখানে থাকত এক বউ। শহরে তার স্বামী চাকরি করে। ওমা, গ্রামকে গ্রাম ম্যালেরিয়া, নাকি কলেরায় মরে কৌত হচ্ছে গেলে বেঁচে থাকে শুধু ভূতেরা।

সেইসব গ্রামে রাতের বেলা টিমটিমে আলো জ্বলে। যারা থাকে, তাদের দিনের বেলা দেখা যায় না। ছায়া পড়ে না মাটিতে। পায়ের গোড়ালি সামনের দিকে। কথা বললে হঠাৎ হঠাৎ অনেকগুলো চন্দ্রবিন্দু একসঙ্গে বেরিয়ে আসে। রামনাম শুনলে পরে গংখালির সেই সব ছায়া ছায়া তেনারা দৌড়ে পালাতে পথ পায় না।

ছোটখোকার একটি খোকা একটি খুকি। খোকা ছোট, খুকিটি বড়। খুকির নাম ময়ূরী। তা সেই ময়ূরী পড়ে ক্রাশ নাইনে। ছেলেটি অনেক ছোট। কেজি টু। খুব ক্যারাম খেলতে চায়। আমার সঙ্গেও ক্যারাম খেলে। বেশির ভাগ কলাগাছ। আমি সেই সব খেলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারি। না হলে খেলা জমে না যে।

তো গংখালির ভূতের গল্প—আমায় তাড়া দেয় ছোটখোকার খুকিটি।

প্রতিবারই তো—যখনই এসে থাকি তোমাদের বাড়ি, তখন তোমাদের এই গল্প বলি। তোমার বাপ-শুড়ো-জ্যাঠাদেরও বলেছি। আবার নতুন করে বলতে থাকি সেই গংখালির ভূতের গল্প। শহরে চাকরি করা স্বামী তো কখনো পর গ্রামে এসেছে। তা হবে হয়ত পুজোর আগে আগে। আকাশে একটু একটু করে নিজেই ছড়িয়ে চাঁদ। কেমন যেন বিম্বিয়ে আছে তার আলো। সেই আলোর বেশি দূরের জিনিস খুব স্পষ্ট নজরে পড়ে না। লোকটি তো স্টেশনে নেমে দেখল চারপাশে কেউ নেই। একটা মাল বইবার লোক না। স্টেশন মাস্টার, পয়েন্টস ম্যান, রেলগুমটির অন্য কেউ না। ফাঁকা—ধু ধু ফাঁকা স্টেশন। শুধু কয়লা টানা কাঠের বগির ইঞ্জিন একবার ঝুগ ঝুগ ঝুগ ঝুগ করে এসে দাঁড়াল। তারপর চলেও গেল।

কু-উ-উ-উ-ক করে লম্বা ডাক ছেড়ে আকাশের গায়ে মত্ত একখানা কয়লার কালো ধোঁয়ার দাগ টেনে ইঞ্জিন তো চলতে শুরু করল। কাঠের বগি থেকে পাদানি বেয়ে আস্তে আস্তে নিচু স্টেশনে নেমে সেই গ্রামের জামাই দেখল পাখিরা সব ঘরে ফিরছে। একটু একটু করে সন্ধ্যা নামছে দূরে।

তা নামুক সন্ধ্যা। এবার তো যেতে হবে স্বপ্নরবাড়ি।

শ্যামসুন্দরের বলা কথার সঙ্গে সঙ্গে গংখালির ভূতেরা পায়ে পায়ে বেলগাছিয়ার ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের ভেতর ঢুকে পড়ে। হাওয়ায় সেই ভূতদের খোঁনা স্বর। গায়ের গন্ধ।

হোটেলকার খুকিটি—যার নাম ময়ূরী, সে তো এখন ক্লাশ নাইনে, তাই তার ইংরেজিতে পড়া উইচদের গল্পে উইচরা সব ন্যাড়া। তাদের মাথায় খুব সুন্দর করে বসান চকচকে পরচুল। দু হাত ঢাকা দস্তানায়। শীত-গ্রীষ্ম—যাই হোক না কেন, মেম ডাইনিদের হাতে গ্লাভস থাকবেই।

কেন কেন? খুব ব্যাথ ভাবে নাতনির কাছে জানতে চায় শ্যামসুন্দর।

আসলে উইচদের হাতে মানুষদের মতো আঙুল থাকে না।

তাহলে কি থাকে?

এও জানো না তুমি দাদুভাই? কথা বলতে বলতে ময়ূরী আলতো করে হাসে। আর হাসলে পরেই তার এক গালে পাতলা টোল পরে; সেই টোল ফেলা মুখটিকে আরও মায়াবী মনে হয় শ্যামসুন্দরের।

উইচরা দস্তানা পরে এই জন্যে যাতে ওদের বেড়ালের মতো কু—মানে ধাবা কারও না চোখে পড়ে যায়।

তাই। শ্যামসুন্দর স্বস্তির শ্বাস ফেলে।

একবার তো উইচরা এক বাড়ি থেকে একটা বাচ্চাকে হাওয়া করে দিল। একদম গায়েব।

তারপর?

তারপর আর কি! খুঁজে খুঁজে কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। শেষ অবধি বাড়িতে রাখা অনেক দিনের পুরনো একটা ফার্ম হাউজের ছবির ভেতর সেই ছোট্ট মেয়েটা।

ছবির ভেতর মেয়ে? শ্যামসুন্দর তো রীতিমতো অবাক।

হ্যাঁ মেয়ে। যে মেয়েটা হারিয়ে গেছে।

আর কি কি ছিল ছবিতে?

একটা বিশাল ফার্ম হাউজে যা যা থাকতে পারে। অনেকগুলো গোরু। কয়েকটা খোড়া। প্রচুর গাছ। সামনে বিশাল জলা। তারমধ্যে অনেকগুলো ডাকসু। ডাকলিঙ্গে। খুঁটে খুঁটে দানা খাওয়া মোরগ-মুরগি।

তার ভেতরেই সেই হারানো মেয়েটাকে দেখা যেত?

হ্যাঁ।

ওখু দেখা যেত না, মেয়েটা রীতিমত মূর্তিবল্। নড়ত চড়ত।

তার মানে?

মানে আবার কি? ছবির ভেতর মেয়েটা নড়ছে। এই হয়ত

ডাকলিসেদের খাবার দিচ্ছে। ছুটছে মোরগদের পেছনে। চূপ করে বসে আছে। তারপরই হয়ত একেবারে ভ্যানিশ।

তারপর আবার চলে আসত ?

হাঁ দাদুভাই। শুধু চলে আসত না। ছবির মধ্যে এসে সে বার বার নিজের জায়গা বদলাত। আর দিন মাস বছর ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে তার বয়েস বেড়ে বেড়ে যেত। তারপর এই ধর ফিফটি টু ইয়ারস—ছবির সেই ছোট্ট মেয়েটা বড় হলো, আস্তে আস্তে আরও বড়। সব শেষে একদিন একটু একটু বুড়ো—এরকম করতে করতে একদিন মেয়েটা ছবিতে নেই। একেবারে উধাও। আর কোনোদিন সেই ফার্ম হাউজের ছবির ভেতর মেয়েটা ফিরে আসেনি।

নাতনির গল্প আর গংখালির ভূতের গল্পকে খানিকটা আটকায়। থামাতে পারে না। শ্যামসুন্দর বলতেই থাকে—সেই যে জমাই স্বত্তরবাড়ি এসেছে, সে তো এবার একা একা হাঁটতে শুরু করল। রাস্তাঘাটে কোনো লোক নেই। রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছ। একটা বিশাল মাঠ। সেটা পেরলে বড় বড় বাড়ি। সব বাড়ির দরজা-জানালা খোলা, হা-হা করছে। কোথাও কোনো লোক আছে বলে মনে হয় না। একটা কুকুর অঙ্গি নেই রাস্তায়।

কি হলো কি গ্রামের! কাউকে কোথাও দেখা যায় না কেন? বলতে বলতে পানের ভিবে থেকে বৌমার হাতে সাজা পান বের করে শ্যামসুন্দর। পান মুখে দিয়ে তার সঙ্গে পছন্দমতো জরদা নেয়। দু আঙুলে টিপ করে তুলে আস্তে হাঁয়ের ভেতর। বেলগাছিয়ার বাতাসে ধুলিহরের গপপো—গংখালির ভূতের পরপকথা, জরদার ম-ম গন্ধ কি এক সঙ্গে ছড়ায়?

ছোটখোকার ছেলেমেয়ে—দুজনেই চূপ করে বসে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর পাশে।

তারা জানতে চায়—তারপর ?

তারপর তো লোকটি কোনোরকমে স্বত্তরবাড়ি পৌছে দেখে সেখানেও একই অবস্থা। কোথাও আলো নেই। ভালো করে দেখা যায় না কিছু। গোয়ালঘরে গোরুর সাড়া পাওয়া যায় না। বাড়ির কাজের লোকরাই বা গেল কোথায় ?

তারপর তো শ্যামসুন্দর গল্পে গল্পে বেলগাছিয়ার এই ঘরের ভেতরই গংখালির ভাবত ভূতদের টেনে আনতে পারে এক এক করে।

সেই যে বউ, যে স্বামীকে দেখে তাড়াতাড়ি উনোন ছেলে শিচুড়ি বসায়। চুলোয় আঁচ ফুরিয়ে গেলে কাঠের বদলে নিজের পা ঢুকিয়ে দেয় উনোনের ভিতর। তার দুপায়ের আলানীতে আগুন ওঠে উসকে। তারপর সেই শিচুড়ি নামানোর আগে তার মনে পড়ে খাওয়ার পাতে লেবু কেটে দেয়ার কথা।

লোকটি নিজের বউয়ের আশুনে পা ঢুকিয়ে খিচুড়ি রান্না দেখেছে। তারপর সেই বউ আনলা দিয়ে অনেক অনেক দূর হাত বাড়িয়ে দেয়। বাইরে চাদের আলো মেখে গাছেরা এমনতেই ঝিম ধরা। তার থেকে বেছে বুছে লেবু ছিঁড়ে আনে বউ।

গংখালির নিজের স্বপ্নরবাড়ি আসা লোকটি আর দাঁড়াতে পারে না। রাম রাম জপতে জপতে সে দৌড় লাগায়। দৌড়। দৌড়। দৌড়। কাঁচা রাস্তা, মাঠ ফুরিয়ে ফেলে তাকে স্টেশনে পৌঁছাতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। গল্প এখানেই থামে না। সেই মেয়েটি যে কি না কাঠ কম পড়ে যাওয়াতে খিচুড়ি রান্নার জন্যে নিজের পা শুঁজে দিয়েছিল চুল্লোর ভেতর, সে তখন একজন নয়, চারজন বউ হয়ে সমস্ত রাস্তা লোকটিকে ঘিরে রাখে।

স্টেশন পর্যন্ত নিজের স্বামীকে পৌঁছে দিয়ে তবে তার শান্তি। ফেরার আগে দূর থেকে ধ্যাম করে সে ভয়ে গলা শুকিয়ে যাওয়া স্বামীকে।

সামনের রাস্তা দিয়ে খুব জোরে হর্ন দিতে দিতে কোনো গাড়ি চলে যায়। গংখালির স্মৃতির এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় নানা দিকে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী চুপ করে যায়। বাইরে রাত বাড়ে।

সন্ট লেকে রাত বড় তাড়াতাড়ি এসে যায়। সব বাড়িই তো এক একটা আলাদা আলাদা দ্বীপ। কিন্তু এখন ধূলিহরের থেকে উড়ে আসা মেঘ শ্যামসুন্দরকে কত কি বলে যাবে চুপি চুপি। এমন তো দশ বছর ধরেই হচ্ছে, চোখের সেই অসুখটা হওয়ার পর থেকে। শুধু তো চোখের রোগই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরও অস্বস্তি। অস্বস্তি মানে অসুখ। অসুখ মানে শুষ্ক। বিশ্রাম।

বড়সড় মেঘের সঙ্গে সঙ্গে সেই সবুজ ডানা মেলা টিয়াটিও উড়ে আসে। শ্যামসুন্দর জানে এই টিয়াটি তার আর রাখামাখবের মাঝে সেই যে বোনটি দুর্গাসুন্দরী—যে কিনা ছ' সাত বছর বয়সে মায়ের দমায় হঠাৎ চলে গেল। মা কাঁদলেন। কেঁদে উঠলেন বিধবা পিসিমা। পিসিমার বিয়ে হয়েছিল বাঁকা ভবানীপুরে। কপোতাক্ষর তীরে সেই গ্রাম। মধুকবির কপোতাক্ষ নদ। তখন তো বসন্তকে 'মায়ের দম্মা' বলেই ডাকার রেওয়াজ। এখনও তো সেরকমই বলে অনেকে। দুর্গাসুন্দরী দিদি টিয়াটি হয়ে উড়ে আসে সন্ট লেকের আকাশে। খুব সকালে এসে বসে আমাদের পাঁচিলে।

এই তো ছোটখোকা বাংলাদেশ গেছে—দু তিনটে কলোজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দেবে, থাকবে দশ-বারো দিন। বাংলাদেশে পৌঁছে আই এস ডি করেছিল খুলনা থেকে। পঞ্চাশ সেকেন্ড

কথা বলতে পঞ্চাশ টাকার মতো লেগে যায়। বাংলাদেশি টাকায়।

চোখটা ভালো হয়ে যাওয়ার পর খুলিহরের মেঘকে দেখতে পাই। খুলিহরের কথা বললে আনে মেঘ। আর দিদি সারদাসুন্দরী সবুজ টিয়াটি হয়ে উড়ে আসে। এসে বসে বড়খোকার দোতলা বাড়ির পাঁচিলে।

এই তো পরশ রাতে কোন এক ছোটখোকার, বাংলাদেশ থেকে। এখন খুলনাতেই আছে। তারপর রাজশাহী হয়ে যাবে ঢাকা। সব জায়গাতেই ছোটখোকার বস্তুতা। ইউনিভার্সিটিতে বলবে। আরও অন্য দু-এক জায়গায়।

রাচুলি, কাঠপাড়া, বাঁকা, বেতনা নদী। মেঘ সব কথা বললে আনে। গল্প বলে যায় সবুজ টিয়াটি। মেঘের গা থেকে জল বরলে তৈরি হয় নতুন নতুন অক্ষরমালা। গল্প। পরশকথা। আমার মা, ঠাকুমা, বাবা, পিসিমা, কাকিমা, জ্যাঠিমা—সবাইকে দেখতে পাই। শ্যামসুন্দর চন্দ্রবতীর ভেতর কি এক প্রাচীন শিকড় নড়ে ওঠে।

সেই শিকড় নড়াচড়া করে। দোল খায়। মাটি থেকে তুলে আনা শিকড়ের গন্ধে মন খারাপ বাড়ে। ভৈরব নদ, উল্লাসিনী সিনেমা। খুলনা জেলা স্কুল, দৌলতপুরের ব্রজলাল কলেজ, খুলিহরের মাটি।

মেঘ বলে যায় খুলিহরের মাটিতে এখন রোদের বড় তাপ। গ্রীষ্মে যেমন হয়। শেষ বৈশাখে। খুলনা শহর ছেড়ে সাতক্ষীরার দিকে যেতে বেশ অনেকটা যাওয়ার পর আর একটা রাত্তা চলে গেছে কলারোয়ার দিকে। সেখানে চাঁদগ্রাম বলে একটি গ্রাম আছে।

ছোটখোকার কথা বলে যাচ্ছে মেঘ।

মেঘ খবর এনেছে ছোটখোকা—বিপ্লব চন্দ্রবতী, বয়স উনপঞ্চাশ প্রায়, কী ভাবে গেছিল খুলনা শহর থেকে সাতক্ষীরার পথে।

কলকাতার সেই সন্ট লেকের আকাশে এখন অনেক তারা। এমন সব তারাদের কি দেখা যায় খুলিহরের মাটি থেকে। সেখানকার আকাশ তো আরও অনেক অনেক পরিষ্কার। ধূলো, কারখানার ধোঁয়া, পলিউশন—কিছুই নেই।

মেঘ তার কথা বলে যাচ্ছে। দোতলার ঘরের খোলা জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে শ্যামসুন্দর চন্দ্রবতী তার ভিটের পাকা আমের গন্ধ পেলে। গোলাপখাস আম। ফলেছেও খুব। একেবারে গাছ ভর্তি হয়ে আছে। গায়ের রঙটি ভারী সুন্দর—সিঁদুরে-লাল। গাছ পাকা আম হঠাৎ হাতে নিলে কেন্দ্রনগরের পুতুল মনে হতে পারে। এমন নিশ্চয়।

ছোটখোকা নিজেদের ভিটেতে যাবে। অনেক গল্প শুনেছে আমার কাছে। ওদের মা স্নেহলতার কাছে। বড়খোকাও কিছু বলেছে। ওখানেই আমার খুড়তুতো ভাই তারাচরণ ডাক্তারি করত। আগেকার একল এক এক।

শিকারের শব্দ ছিল। শীতে মাথায় শোলার হ্যাট দিয়ে বন্দুক হাতে থাকী হাফ প্যাণ্টের ভেতর শার্ট শুঁড়ে তারাচরণ শিকারে যেত। আমার থেকে বছর সাত আটের ছোট। সে তো মরে গেছে—তা হবে বছর দশ।

শীতের পড়ে আসা বিকেলে তারাচরণ আমাদের বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। ডান হাতে বন্দুক। বাঁ হাতে ঘাড় ভাঙা বড় হাঁস। দুটো তিনটে। লতপত লতপত করে দুলছে। তার হাফ প্যাণ্টেও ফুটে আছে চোর কাঁটা। পায়ে কিতে বাঁধা বুটে নদীর বালি। নয়ত বিলের কাদা।

মানুষ তো কত কি করে? দেশ ভাগ হওয়ার পর আমরা সবাই—খুড়তুতো, জ্যাঠাতো ভাইয়েরা মিলে বসিরহাটে অম্মি কিনলাম। বাড়ি হলো। বড় উঠোন। তুলসিমঞ্চ, কাঁঠাল গাছ, আম, নারকেল ডেউয়া। বেশ করেটা খেজুর গাছও। নিজেদের শরিকানি পুকুর। বেশ বড় সেই পুকুরের বাঁধান ঘাটে গ্রামের দিনে সুন্দর বসা যায়।

এপার ওপার করা তখন কোনো ব্যাপার নয়। সব ইন্ডিয়া পাকিস্তান আলাদা হয়েছে। মাঠ ভেঙে, অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে খেজুর শুড় নিয়ে সাইকেলে ফিরত ছোটভাই হরিমাধব। শীতে তখন মাঠভরা ধান। সবে খেতে হলুদ কাপেট। পাখিরা মাঠে নেমে শস্যকণা খুঁটে খায়। সেই হরিমাধব হঠাৎ মরে গেল তিন দিনের জ্বরে। বসিরহাটের বাড়িও কালে দিনে একটু একটু করে ফাঁকা হয়ে আসতে থাকল। সবাই কলকাতায় আসতে চায়। কলকাতার অনেক সুবিধে।

বসিরহাটের বাড়িতে কার্তিক মাসে লক্ষ্মী পূজো। কাঁঠাল গাছে বড় বড় কাঁঠাল। আম গাছে ভর্তি আম। নারকেল গাছও বেশ ফলন্ত। কুন্মোর জলের স্বাদ ভারী মিষ্টি। কিছুদূর গেলে ইছামতী পাওয়া যায়। নদীর ওপারে সম্পূর্ণ আলাদা একটা দেশ। সেই দেশ একদিন আমারও ছিল। তবুও আমরা সবাই বসিরহাটের বাড়ি থেকে ছড়িয়ে গেলাম। সে বাড়িও এখন ফাঁকা পড়ে আছে। বেশিরভাগ ঘরেই তালা। একটা পোরশানে লোকাল একটা ফ্যামিলি থাকে। তারা ধরেই নিয়েছে এ বাড়ি তাদের। কে অত ছোটোছুটি করে? সম্পত্তি রাখতে গেলে দৌড়তে হয়। রীতিমত দৌড় দৌড় দৌড়। বড় খোকার সময় নেই। মেজোখোকা ব্যস্ত, ছোটোখোকা পারে না। আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে। দাদা আরও বড়। হরিমাধব বহুদিন নেই। কেবল স্নেহলতা মাঝে মাঝে ঘুন ঘুন করে বসিরহাটের বাড়ির কথা বলে। সে বাড়ির হাওয়ায় মাথা নাড়ায় অনেক আম কাঁঠাল নারকেল গাছ। ঘাটলা বাঁধান পুকুরে চাঁদের ছায়া।

মাঝে মাঝে খুব যেতে ইচ্ছে করে বসিরহাটের বাড়ি। তারপর যদি পারা যায় ইছামতী পেরিয়ে ওপারে বাংলাদেশ। তারপর সাতক্ষীরা। ধুলোর।

মেঘ বলছে ছোটখোকার ধুলোর যাওয়ার গল্প। ছোটখোকা ধুলোর রঙনা হওয়ার আগেই মেঘ সব বলে যাচ্ছে।

সন্ট লেকে বড়খোকার বাড়িতে শোওয়া শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে শাদা মাইক্রোবাসে ছোটখোকা। শাদা পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরেছে। বাংলাদেশের পায়জামা যতটা ঢোলা পায়ার হয়, ততটা ঢোলা নয়, এ পায়জামা ইন্ডিয়ানাই।

নিজের বাড়ির রাস্তা কেমন যেন বদলে বদলে যাচ্ছে।

চারপাশে দুপুরের রোদ, কাল সকালে কি কি হবে সমস্ত খবরই আগাম বলে যাচ্ছে মেঘ। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মন দিয়ে শুনেছে।

তখনই একরাশ বদ হওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল কথা বলা মেঘকে। খুব গরম লাগছিল অনেকক্ষণ ধরে। কেমন যেন দমচাপা, ঝিমঝিমা গুমোট আবহাওয়া।

টি-ভিতে বলল, নিম্নচাপ। কালবৈশাখী। রেডিওতেও বলল একই কথা। ধুলোরের কথা, ছবি—সব মুছে গেল সন্ট লেকের আকাশ থেকে। খানিকটা ঝড় হলো এলোমেলো। বাতাসের টানাপোড়েন, তার সঙ্গে হালকা এক পশলা বৃষ্টি। পৃথিবী কিন্তু জুড়োল না।

পরদিন ভোরে একটু একটু করে আলো ফোটার পর টিরাটি এল উড়ে। সেই সবুজ সবুজ পাখির দিকে তাকিয়ে নিজের দিদির কথা মনে করে চোখে জল এল শ্যামসুন্দরের।

শ্যামসুন্দর দোতলার বে যারে থাকে, তার জানলায় পাঁচিল থেকে সোজা উড়ে এসে বসল টিরাপাখি।

বড়খোকা, বড়বোমা, নাতনি, নাতি—কেউই এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। টিরা বেশ ছড়িয়ে বসল জানলার ফ্রেমে। তারপর ও বলল, ছোটখোকাকে সবাই দেখে কি খুশি। কি আনন্দ সকলের। এ আম দিতে চায় তো ও কাঁঠাল। সে বলে ভাত খেয়ি যাও।

যারা একটু পুরনো লোক, তারা তো ছোটখোকারে দেখে বললে, এষে একেবারে ডাক্তারবাবু গো।

টিয়ার কথা শুনে শ্যামসুন্দর বুঝতে পারল, ডাক্তারবাবু মানে তারাচরণ। সত্যিই কি ছোটখোকার হাবভাব তারাচরণের সঙ্গে মেলে। কি জানি হয়ত বা। ভাবতে ভাবতে শ্যামসুন্দর গলার ন দণ্ডির পৈতেটি দিয়ে পিঠ চুলাকোনার ঢেঁটা করল। তারপর বহু বছর পর খুড়াতো ভাই তারাচরণের ছবিটি অনেক বছর আগের ধুলো সিরিয়ে স্মৃতির ভেতর থেকে তুলে আনতে চাইল। সেই শোলার হাট, সাইকেল। ডাক্তারির বড় ব্যাগ। হাতে কন্দুক। তুলি বেঁধা হাঁস। সবার থেকে আলাদা করে শুধু মানুষটাকে বের

করে নিয়ে এলে ছোটখোকার সঙ্গে মেলে কি? হয়ত মেলে। হয়ত মেলে না।
পিঠের চুলকে ওঠা আবারও গলায় পৈতে যবে ঠিক করতে চায় শ্যামসুন্দর।

টিয়াপাখি বলে যায়, তোদের ইন্সুল রে। সেখানে ছোটখোকা গেছিল।
কোন স্কুল?

ধূলিহর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

শ্যামসুন্দরের সারা গায়ে কাঁটা কাঁটা। ব্রহ্মরাজপুর পেরিয়ে ধুলোরে
আমাদের ভিটেতে যাওয়ার খানিকটা আগে ধূলিহর প্রাথমিক বিদ্যালয়।
সেখানে আমি হেডমাস্টারি করেছি বছরদিন। ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৪০, ৪১।

ছোটখোকা তোমার হাতের লেখা দেখল ইন্সুলের রেকর্ড বোর্ডে।
টিয়াপাখি বলে যাচ্ছে।

এখনও আছে সে সব।

আছে বই কি! তোমার নিজের হাতে করা সই। কালির কলমে।

শ্যামসুন্দর মেঘের কথা মতো দেখতে পেল শাদা রঙের বড়
মাইক্রোস্কোপে ছোটখোকা খুলনা শহর থেকে চলেছে সাতক্ষীরার দিকে।

কি কি পড়ল পথে মেঘ?

কেন গন্ডামারি! যেখানে একাত্তর সালে খান সেনারা কচুকাটা করেছিল
রাজাশিদের। হিন্দু-মুসলমান মানে নি। সেই গন্ডামারির মাঠে মুক্তিযুদ্ধের
শহিদদের স্মৃতিতে মিনার তৈরি হয়েছে। সুন্দর পিচ বীধান রাস্তা। দু ধারে
বড় বড় গাছ। অনেক সবুজ। আকাশ আশ্চর্য নীল।

মেঘের কথা শুনতে শুনতে শ্যামসুন্দর চন্দ্রবর্তী আজ থেকে ষাট বছর
আগের রাস্তা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। সে রাস্তা অন্য। তার নাম
যশোর রোড। সেই রাস্তারও দু দিকে বিশাল বিশাল ঝাঁকড়া গাছ। দেশটা
তখন এক ছিল।

খুলনা শহর থেকে সাতক্ষীরার দিকে যাচ্ছে তোমার ছোটখোকা। মেঘ
বলে যাচ্ছে। আর সেই আগাম ধারাবিবরণী শুনতে শুনতে শ্যামসুন্দরের দু
চোখ বেয়ে গরিয়ে পড়ছে অল। খোকা পেরল খেইয়া নদী। তারপর আরও
এক নদী। নাম তার বালিডাঙ্গা। এই গরমে নদীর বুক শুকনো। কোথাও
এতটুকু পানি নাই। শুকনো নদী হা-পিত্যেস করে তাকিয়ে আকাশের দিকে।
ঘলি দয়া হয় আশমানের। বৃষ্টি করে। টলটলে অলে ভরে ওঠে নদীর বুক।

চারপাশ আশুন আশুন। গাড়ির মধ্যে ছোটখোকার বেশ কষ্ট লাগে।
খাম হচ্ছে। বার বার ক্রমালে খাম মুহুছে। এভাবেই চুকনগর পেরয় গাড়ি।
তারপর খনিয়া বাজারে আছে খনিয়া নদী। তারপর পাটকেলঘাটার নদী,
পাটকেল ঘাটা বাজার। পাটকেলঘাটা থেকে খেলসেখালি হয়ে যায় পশ্চিমে,
বলে উঠল মেঘ।

মাথা নাড়ল শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দরের চোখের সামনে তখন অনেক দেখা, চেনা বেতনা নদী। বেতনা, নাকি বেগবতী? অন্য নামে বেত্রবতী। তার ঠাণ্ডা, টলটলে জলে আকাশের মুখ দেখা যায়। সেখানে—সেই নদীর ধারে শৈশব, বালকবেলার কত আনন্দময় সময়। সবকিছু মনে পড়ে গিয়ে শ্যামসুন্দরের দু চোখ জলে টে টুহুর হয়ে ওঠে।

এবার ব্রহ্মরাজপুর। বলেই সামান্য চূপ করল মেঘ।

আর তখনই কথা বলে উঠল টিয়া। পাখি হয়ে যাওয়া নিজের বড় বোনের কথা তো শুনতেই হয়।

ব্রহ্মরাজপুরে ঢোকান আগে দোকানে দোকানে সাগর কলা। বাংলাদেশে এই কলার চাষ এখন খুব হচ্ছে। কি তার গায়ের বর্ণ! আর আছে আপানি তরমুজ।

এসব শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল শ্যামসুন্দর। আর টিয়া তখনই বলল, বুধাঘাটা, পলাশপোল হয়ে সাতক্ষীরে। সেখান থেকে ব্রহ্মরাজপুর হয়ে ধুলিহর।

আমার ধুলোরে এখন খুব সবুজ। গাছে গাছে আম পেকেছে। কাঁঠাল। ডোউয়া। আমাদের গোলাপখাস, সিঁদুরে, সলতেখাগি—সবেতে ফল টুপটুপ করছে। শ্যামসুন্দরের বিড় বিড় করে বলা আবহা আবহা এসব কথা শুনতে চাইল না টিয়া।

হোটখাটো গাড়ি নিয়ে খুঁজে খুঁজে ঠিক তোমার ইকুল বার করলে। যেখানে তুমি চাকরি করত। তার হেডমাস্টারমশাই এখন সেকেন্ডার আলি হায়দার। পঞ্চাশেকের মধ্যে হবে বয়েস। দু বছর আগে হজ করে এনে হাজিসাহেব হয়েছেন। দাড়ি রাখেন বড় করে। ইকুলে পরীক্ষা হচ্ছিল। তা তিনিই তো আলমারি খুলিয়ে পুরনো খাতাপত্রর টেনে এনে তোমার হাতের সেই দেখালেন হোটখোকারে। স্কুলে পরীক্ষা হচ্ছে হোক, তাতে কি মিষ্টি খেয়ে যান। আমি লোকদে আনাই—বারবার বলছিলেন হায়দার আলি মশাই।

হোটখোকার চোখ উপচে জল পড়ছে। ১৯৪৫-র ৫ জানুয়ারি ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়েছে আমাদের বড়খোকা। তার নামও দেখা আছে। সঙ্গে সন তারিখ। দেখতে দেখতে কেঁদে ফেলল হোটখোকা।

এখনও তো ভিটে কত দূর। কাঁচা রাজা। সব দেখে খুলনা শহরে ফেরার তাড়া আছে।

স্কুলের সামনেই যে তেলভাজার দোকান, সেখানে আর এক বুড়োর সঙ্গে আলাপ হোটখোকার। সেই বুড়োর বুক অন্ধি শাদা দাড়ি। মাথার পাকা চুল ছোট ছোট করে কাটা। চোখে কালো ফ্রেমের অর্ডিনারি চশমা। পরনে লুঙ্গি পাঞ্জাবি।

আমার সব মনে পড়ে যাচ্ছে। সব কথা। ওই তো বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন। ঠাকুরদা। জ্যাঠামশাই। এই বৈশাখে—গরমে গৃহদেবতার মাধ্যম ‘ঝরা’ দেয়া হবে। নিয়মিত জল পড়বে গৃহদেবতার মাধ্যম ফুটো পাত্র থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় নিয়ম করে। সেই ‘ঝরা’-র জলে মাথা ঠাণ্ডা হবে কুলদেবতার। সমস্ত চরাচর শীতল হবে। গাছের নতুন গোলাপখাস, আম কাঁঠাল, গহিয়ার বাচ্চা বিয়োনোর পর আঁতুড় কেটে গেলে তার দুষ—সবই প্রথম তার সামনে। বৈশাখ মাসেই পুণ্যাহ, অক্ষয়তৃতীয়া। রাতাসে ধুলোর গন্ধ। ঝড় উঠলে চারপাশ ধুলোর ধোঁয়াটে। গাছ থেকে ধসে পড়ে কাঁচাআম। ভোরে উঠে ছুটোছুটি দেগে যায় সেই আম কুড়নোর জন্যে।

এসব ভাবতে ভাবতে ভেতরটা ধর ধর করে ওঠে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। বুকের ভেতর চাপ বাড়ে। ধুরোলের বাড়ির উঠানে ডালপালা মেলা গোলাপখাস গাছটি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

আমাদের ভিটের সামনেটা অনেকটাই বদলে গেছে বাপু। তড়বড় করে বলে টিয়া। সেখানে তারা চক্রবর্তীর ডিসপেন্সারি নেই, ঝাঁকা জায়গায় গোক বীধা হয়। আর আছে নতুন করে লাগান দু একটা নারকেল গাছ।

দাঁড়াও। দাঁড়াও। মেঘ ধামাতে চায় টিয়াকে।

টিয়াপাখি ধামলে তো। সে তাড়াতাড়ি বলে, তোমাদের সাত পুরুষের ভিটেতে সন্নে প্রদীপ দেখান হয় না। তুলসি মঞ্চও নেই। শাঁখ বাজে না।

শ্যামসুন্দর চূপ করে থাকে। তার দু চোখে জল।

টিয়াপাখি বলে যায়, ধূলিহরে—আমাদের ভিটের থেকে একটু দূরে থাকেন নিবারণ সাহ্যমশাই। বেশ বড় ব্যবসায়ী। যাকে বলে ধানিপানি গেরহ। বেশ কয়েক বিঘা ধান জমি, বড় বড় তিনটে পুকুর, বাস্তু—সব বেচে দিয়ে ইন্ডিয়ান চলে আসতে চায়। বলে, ভিটেবাড়ি দেখা ছোটখোকার কানে কানে একটু দূরে বেয়ে বলে, এখনও যা দাম পাচ্ছি, এরপর আর তাও পাব না। তাই যদি পারি, যত তাড়াতাড়ি পারি চলে যাব।

দাঁড়াও বাপু। অনেকক্ষণ তো বকলে, এবার আমায় বলতে দাও। মেঘ যেন একটু ধমকেই ওঠে পাখিকে। তুমিই তো বলেছিলে সেই বুক অঙ্গি শাদা দাড়ি, পাকা মাথা বুড়োর কথা। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। পরনে সুতির লুঙ্গি-পাঞ্জাবি। তেলেভাজার দোকানের সামনে সেই বুড়োরে জড়ায়ে ধরল ছোটখোকা। বুড়োও তারে। বলতে গিয়েও তো তুমি পুরোটা বললে না। সেই বুড়ো—কেরামত আলির বাড়ি ছিল মহলন্দপুর। আমাদের এই এপারে—ইন্ডিয়ান। চৌবট্টির হজরতবাল দাসায় সারা দেশ জুড়ে কটাকাটির বাতাস। তখন বুড়ো মানে মানে পালিয়ে গেল ওপারে—পূর্ব

পাকিস্তানে। সঙ্গে পরিবার-পরিজন। ছেলেপিলে। জ্যেত-জমি, ভিটে, বাস্তু, পুকুর, আমগাছ, কাঁঠালগাছ, বাপ-সাদার কবর, নমাজ পড়ার জায়গা, ঈদের গলা মেলানের মসজিদ—সব সব কিছু পড়ে রইল পেছনে। ইনডিয়ায়। বর্ডার পেরিয়ে রাতারাতি তারা আয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তানে; সেই বুড়ো কেরামত আলি এখন ধুলোরে শিকড় চারিয়েছে। ব্যাটারা সব সেয়ানা—লায়েক হয়ে গেছে। কেরামত আলি নিজে হোমোপ্যাথি ডাক্তার। রুগি-পত্তর ভালো হয়। মাঝে মাঝেই জরদা ছাড়া পান খায়। পাতলা পাতলা ফরসা মানুষ। তেমন লম্বা নয়। পানের রসে সাজান দাঁতে সামান্য কালাচে ছোপ। পাতলা দু চৌঁট পান খয়েরের রসে টুকটুকে।

ধূলিহরে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশ করা ডাক্তারটিকে পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে পেল শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। কেরামত আলির চশমা মোড়া দু চোখ চিকচিক করছে। ছোটখোকা দু হাত দিয়ে টেনে নিয়েছে কেরামত আলিকে। বৃকে বৃকে। কেরামত আলিও জড়িয়ে ধরেছে আমাদের ছোটখোকাকে। দু-জনের চশমার কাঁচেই কুয়াশা। এসব দেখতে দেখতেই শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী শুনতে পেল—বাবা, আমি আমাদের ধুলোরের ভিটে থেকে বলছি—মেঘের ভেতর থেকে ভেসে আসছে ছোটখোকার গলা। ও বাবা, শুনতে পাচ্ছ?

বল বাবা, পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি।

ধুলোরের আকাশে এখন খুব রোদ্দুর। চারপাশে চিড়বিড়ানি গরম। গা জ্বালা করে। খুব ঘাম হচ্ছে।

তা তো হবেই খোকা। তুমি তো পাঁচ বছরে আমাদের সঙ্গে দেশ ছেড়ে ইন্ডিয়ায় চলে এলে, তোমার তো অতসব মনে নেই ছোটখোকা।

অনেক গাছপালা বাবা এখানে। অনেক গাছ। খুব সবুজ। চোখে বেশ আরাম লাগে।

এবার মেঘ বলল, দেখলে তো—মসলন্দপুরে সাতপুরুষের ভিটে, বাস্তু, নমাজ পড়ার মসজিদ, কবরখানা, চেরাগ জ্বালার পীরের মাজার, পুকুর, ফলের বাগান—সব ছেড়ে এক কাপড়ে কেমন চলে গেছে কেরামত আলি। তোমারই মতো সে দুঃখী মানুষ। তোমার যেমন ধুলোরের কথা ভেবে চোখে জল আসে। স্বপ্নে বার বার ভেসে উঠতে দেখ ধূলিহরকে, কেরামত আলিও তেমনি। বার বার খোয়াবে দেখতে চায় মসলন্দপুরকে। সেই বাড়ি, সেই উঠোন, গোয়াল, হাঁস-মুরগির খোঁয়াড়। রান্নাঘর। পানি ভর্তি বদনা।

এক ঝাঁক বাচ্চা নিয়ে একটা মা মুরগি এইমাত্র পুকুরের দিকে চলে গেল। বাবা, শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ?

শুনতে পাচ্ছি ছোটখোকা। বল। বলে যাও।

সামনের ফাঁকা জমিতে খোঁটায় বাঁধা গোন্ধরা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। যেন কোনো নতুন মেহমান। পেছনে পুকুর পাড় তেমনই আছে। চারপাশে গাছ। গাছের ছায়া। একটু সবুজ সবুজ জল। সেই জলে গাছের করা পাতা। মাছেদের হালকা ঘাই। শুনতে পাচ্ছ বাবা?

শুনতে পাচ্ছ তো ছোটখোকার গলা ঠিক ঠিক? মেঘ জানতে চাইল।

পাচ্ছি। পাচ্ছি। তুমি বেশি কথা বল না তো। ছোটখোকার গলা হরিষে যাবে।

শ্যামসুন্দরের দাবড়ানি শুনে মেঘ চুপ করে গেল।

পুকুরটাকে এখন আর তত বড় মনে হচ্ছে না বাবা। যেমন মনে হতো ছোটবেলায়। মনে হতো আমাদের পুকুরটাই সবচেয়ে বড়। এর থেকে বড় পুকুর আর নেই। এখন সেটাকে ছোট লাগছে। বেশ ছোট।

তা হোক বাবা, ভিটেবাড়ির পুকুর তো! নিজের মনে এমনটি বলতে বলতে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তার পুকুরে নেমে আসা গাছেদের ছায়া দেখতে পেল। ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে শেষ বৈশাখের দশটা বেলার রোদ।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী পরিষ্কার দেখতে পেল পুকুরের পাড়ে নিচু হয়ে খানিকটা মাটি কুড়িয়ে নিচ্ছে ছোটখোকা। সেই মাটির গায়ে চক্রবর্তীবাড়ির অনেক কুলপুত্র, কুলনারীদের গন্ধ লেগে আছে। মাটি তুলে প্লাস্টিকের ছোট প্যাকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে হ হ করে কেঁদে ফেলল ছোটখোকা। সারা শরীর কাঁপছে।

এমন করলে হবে না বাবা। মাথা ঠিক রাখতে হবে। তোমার এখন কত নাম। তুমি তো আর সেই নেহাতই তোমার মায়ের আর আমার ছোটখোকাটি নও। দেশ বিদেশে গিয়ে বক্তৃতা দাও। সেইসব কথা মানুষজন মন দিয়ে শোনে। শোনার পর আলোচনা করে নিজেদের ভেতর।

দুপুরে দুটি ভাত ডাল খেয়ে যান। ফোটায়ে দেব নে। চক্রবর্তী বাড়ির ভিটেতে বসবাস করা মানুষটি এসে দাঁড়িয়েছে। উদলা গা। পরনের রঙিন লুঙ্গিটি অনেকটা ওপরে তোলা। খানিকটা পেছনে তার বউ। অনেকটা ঘোমটা টানা। আম নে বান, কাডাল নে যান। উদলা গায়ের পাশে আর একটু কম ব্য্রেসি একজন। তার গায়ে গেঞ্জি। পরনের লুঙ্গিটি সামান্য চকচকে। ধুতনিতে কালো দাড়ি।

শ্যামসুন্দর দেখতে পেল ধূলিহরের বাড়িতে দাঁড়িয়ে ছোটখোকা বার বার চশমা খুলছে। মুছেছে।

মেঘ তার কথা বলতে ভুলে গেছে।

টিয়াপাখি একেবারে চুপ।

ওধু সন্ট লেকের হাওয়ায় ধূলিহরের বাতাস মিশে ছিল।

মা

মলয় দাশগুপ্ত

আমার ঘরের সামনে সামান্য একটু খোলা জমি আছে, জমি না বলে জায়গা বলাই ভাল। আমরা সবাই মিলে সেখানে নানান ফুল ফোটাবার চেষ্টা করেছি, এখনও করে চলেছি। কিন্তু মনমত একটা বাগান তৈরি করতে পারিনি। আমরা কথায় বোঝায়, আমি, আমার স্বামী, আর ছেলে-মেয়ে—সংখ্যায় ওরা দু'জনই। মালি ডেকে, মাটি ফেলে, সার দিয়ে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে ফুলে ফুলে সাজিয়ে দেওয়ার। সাজানো যায়নি, আমাদের কারোই পছন্দমত ফুটে ওঠেনি ফুল। আজ সকালে উঠে অন্যদিনের মতই ফুলগাছগুলির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি গতরাতের বৃষ্টির ফোঁটা তখনও ওদের পাতায় পাতায় লেগে রয়েছে। কোনও গাছে ফুলের ফুঁড়িরও দেখা নেই, কেবল ধোকা ধোকা রসন সেই জলে ভেজা পত্রপুষ্পের মাঝে নিজেদের মেলে ধরেছে। রসন আমাদের শ্রিয় ফুলের তালিকাতেই নেই, মালি জোর করে ওর একটা গাছ পুতে দিয়েছিল। এখন অন্যসব পুষ্পহীন গাছের মধ্যে নিজেদের মেলে ধরে নিজেরই অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। আজ সকালের রসনকে কেন যেন আমার ভালই লাগল। এমনকি আলতো হাত বুলিয়ে একটু আদরও করে দিই, রাতের বৃষ্টির জলকণা ঝরে পড়ে, হাত সিক্ত করে দেয়। আকাশে তাকিয়ে দেখি, আকাশে মেঘ জমেছে বিস্তার।

আকাশ মেঘে ধমধম করছে। এ দিনটায় আমার মনেও চাপা বিষাদ ভরে থাকে। আজ আমার মায়ের মৃত্যুদিন, ঠিক ত্রিশ বছর আগে এই দিনে আমার মা আমাদের ছেড়ে চলে যায়। সেদিন থেকে প্রতি পনেরই আগস্ট সকাল হলেই মনটা ভার হয়ে থাকে। এদিন আমি কোথাও যাই না, কোনো আত্মীয় বা বন্ধু-বাড়ি না, কোনো অনুষ্ঠানে না, বাইরে না নিজের ভেতরে চলে যাই আমি। একটা দিন, তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে মাত্র একটা দিন আমার মায়ের জন্য রাখি। পীষদিন ধরে মনকে তৈরি করার ফলেই সম্ভবত পনের আগস্টকে একেবারে নিজের বিষমতার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারি। নইলে সময়ের দক্ষ চাতুর্ঘের কাছে অনেক আগেই হেরে যেতে হতো। এই যে নিজেকে নিয়ে থাকা, বাইরের দুয়ারগুলি বন্ধ করে একটি বৃষ্টি ভেজা দুপুরে চলে যাওয়া, মৃত্যুর প্রাক্-মুহুর্তে মায়ের অসহায় মুখকে ছবির মত মনে ভাসিয়ে তোলা এবং তিরিশ বছর আগের বৃষ্টিধোয়া আকাশের সঙ্গে নিজের মনের বর্ষাক্তাব্দ অবস্থার মিতালি ঘটানো—এসবই নিজের মনকে

মাতৃসম্মান রাখার সচেতন প্রয়াসেরই ফল। মাঝে মাঝে মনে হয়, এইভাবে স্মৃতি পুঁবে না রাখলে মাকে কি ভুলে যেতাম, মা কি হারিয়ে যেত? মানুষ কি হারিয়ে যায়?

পরিবারের ওরা জানে আমার এই মাতৃচর্চার কথা। ফলে একা থাকার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হয় না। আমরা কারো মৃত্যু দিনে ফটোর গলায় মালা পরাই না, ফুল সজ্জায় সাজিয়ে মৃত্যুকে বড় করে দেখানোর কোনো মানেই হয় না। যীরা চলে যান তাঁরা কেবল নয়নের মাঝখানে নয়, মনের অতলে ঘুমতেই ভালবাসেন। মৃতেরা এ পৃথিবীতে ফেরে না কখনও। তারা ঘুমিয়ে থাকে—আত্মজ-আত্মজ্ঞার অণুর মধ্যে, বংশানুর বিকাশই যে মানুষের বহমানতার ধারা। আর ক্লেথায় থাকে মানুষ? ছবিত্তে, মূর্তিত্তে, না স্মৃতিতত্তে?

ছুটির দিনে এক সময়েই চা খাই আমরা। আত্মও তার অন্যথা হয় না। এক সময়েই চা খাই। আমার স্বামী অরুণ, অরুণশঙ্কর লিকার খায়, আমি দুধ ছাড়া চা খেতেই পারি না। দুধ ছাড়া চা কোটে তেতো লাগে। অরুণ তো কড়া ব্র্যাণ্ডের সিগারেট খায়, সিগারেটের কড়া তামাকের সঙ্গে লিকারের একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। আমাদের মত ফ্রেশ মুখে দুধ-চা-র স্বাদই আলাদা। আমি দুধ-চা খাই। পর্যা, আমার মেয়ে চা-ই খায় না। চায়ের বদলে এককাপ দুধ খায় ও সকালে উঠে, চিনি ছাড়া সাপা দুধ, ছোটবেলার অভ্যাস—আমরা ছাড়াইনি, ও-ও ছাড়াইনি। আর শ্রীমান অভিঞ্জিৎ মানে ছেলে অভি চা, দুধ কিছুই খায় না। হস্টেলে থাকার সময় কফি খাওয়া অভ্যাস করেছে, ওর জন্য এক কাপ কফি করতেই হয় সকালে। আমাদের এ পরিবারে চা-এর সঙ্গে জলখাবার খাওয়ার পাট নেই। শুধুই তরল পানীয়, যে যার মত করে একটু উষ্ণতা, একটু উত্তেজনার রসদ সম্ভান।

অন্যদিন দু'চারটা কথা হয়। আত্ম তাও হয় না। কথা না হওয়ার একটা কারণ হয়তো আমার মনের অবস্থা, কিন্তু সেটাই সব নয়। আমাদের এই ছোট পরিবারের ওপর দিয়ে এখন একটা চাপা উত্তেজনার স্রোত বইছে। আমরা প্রত্যেকে টেনশনে ভুগছি; আমরা কেউ সেই টেনশন কাটিয়ে উঠতে পারছি না বলেই অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। যে যার নিজের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিজের সঙ্গেই কথা বলে চলেছি। এর সঙ্গে উপরি হিসাবে বোগ হয়েছে পনেরই আগস্টের বহমান বিষাদ।

পনেরই আগস্ট তো ভারতবর্ষের একটা স্মরণীয় দিন। বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির দিন। স্বাধীনতার দিন। শিশু বয়সে এই দিনে জাতীয় পতাকা কিনে আমরাও সাজিয়েছি, তখন লোকানে লোকানে তেরদা খান্ডা টাঙ্গানো

ধাকত, একটা পূজা পূজা ভাব ধাকত। আমার বাবা স্বাধীনতা দিবসটাকে খুব ভালবাসত, বাবা ছিল জাতীয়তাবাদী। কোনও দলে ছিল না, দেশের যাতে ভাল তাতেই সায় দিত আর স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা বলেই মনে করত। তাই আমরা ভাই-বোনেরা জাতীয় পতাকা সাজাতাম পনেরই আগস্টে। সত্যিই উৎসবের উত্তেজনা আসত মনে। এখন দোকানে দোকানে পতাকা বিক্রি হয় না, যত রাখী ঝোলে তার শতাংশও পতাকা দেখা যায় না। ছেলেমেয়েরা হাসাহাসি করে, মজুরা করে এসব নিয়ে। বাচ্চারা আর স্কুলে যায় না, মা-বাবারা ছুটির দিনে ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙাতে চায় না। একটা দিন একটু ঘুমোক বেচারারা, এনার্জি স্টোর করুক। কিন্তু আমরা ছোটবেলা প্রভাত কেরি করেছি, ফুলের মালা গোঁথে ছবিতে পরিয়েছি, স্বাধীনতা দিবসেও 'নেতাজী ফিরে এসো' বলে গলা ফাটিয়েছি।

এখন দেখি লাশকেন্দ্রীয় পতাকা ওড়ানো হয়। ব্রিগেডের মাঠে আর স্টেড রোডে কুচ-কাওয়াজ হয়। ছবিতে দেখা এইসব প্রথা ছবিতেই থেকে যায়। আমার বড় মামা নাকি স্বাধীনতাকে খুটা বলে জোগান দিয়েছিল, বাবার সঙ্গে এই নিয়ে অশান্তি লেগেছে এমন কথাও শুনেছি। এই একটা বিষয় নিয়ে দু'জনে মন কবাকষি ছিল অনেক দিন। তবু আমত্যা দু'জনের কেউই নিজের নিজের জায়গা থেকে সরে নি। দু'জনেই গোঁড়া ছিল, দু'জনেই নিজের বিশ্বাসে অটল ছিল।

আজ তারা জীবিত থাকলে স্বাধীনতা দিবসে তাদের কী অভিজ্ঞতা হতো? বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, মুছে গিয়ে স্ফাকাশে হয়ে যাওয়া একটা দিনের কথা স্মরণ করে তারা কে, কী ভাবত? আমার মাত্রের মৃত্যুর এ দিনটা আমাদের শোকের দিন, মা চলে যাওয়ার পরেও বাবা বারো বছর বেঁচে ছিলেন। বাবাও পনেরই আগস্টে আর পতাকা ওড়াত না, সারা দিনটা স্তব্ধতার মধ্যে কাটাত। আমি যে এখনও সেই স্তব্ধতা, সেই বিষাদের বোকা মন থেকে নামাতে পারি না, তা বাবার কাছ থেকেই পাওয়া। মার মৃত্যু একটা দিনের রং-ই বদলে দিয়েছে আমাদের চোখে। কিন্তু মা যদি এ দিনে মারা না যেত তবেও 'কি পনের আগস্ট স্বমহিমার উজ্জ্বল থাকত? চারদিকের স্বাধীনতাহীনতার ভাব দেখে মনে তো হয় না যে সেই সুপ্রভাতী আনন্দ, উৎসবের সেই স্বতঃস্ফূর্ততা এখনও আছে। 'এ আত্মা খুটা হায়' বলে এখন আর গলা ফাটাতে হয় না। কার্যত স্বাধীনতা দিবসটির মাহাত্ম্য খুটাই হয়ে গিয়েছে। এ কথা ভাবতে বলতে কষ্ট হয়, তবু বাস্তবতা অস্বীকার করি কী উপায়ে?

পর্বা এসে বলে, 'মা, আমাকে যেতেই হবে, শিডিউল্ড শ্যাটিং কথা দিয়েছি, যেতেই হবে—'

‘আমি কেবল ওর দিকে তাকাই, মুখে কিছু বলি না। কথা বলার কোনো অর্থ নেই বলেই কথা বলি না। আমার চোখের ভাষা ও পড়তে পারে। মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেতেই হবে বলেও পা বাড়ায় না।

আমি আর কী বলব? বলতে হয় তো পারতাম যে এইদিনেই কেন সে গুটিং ডেট দিল, সে কি জানত না যে পনেরই আগস্ট ছুটির দিন বলেই ওর বাবা কথাবার্তার দিন ঠিক করেছে। সেখানে ওর থাকটা বাধ্যতামূলক না হলেও সৌজন্যমূলক। সেই সৌজন্য দেখাবার সুযোগ যদি ও না দেয় না দেবে, আমার কী বলার আছে? বলিও না কিছু, কেবল ওর মুখের দিকে তাকাই।

‘আমি বাবাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। বাবাই সব কথা বলবে, এখন এই স্টেজে এসে আর কন্সিলিয়েশনের প্রশ্ন ওঠে না, তাই দ্য সুন্যার ইজ্ বেটার মনে করে ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলা ভাল।’—প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে জা তুলে মেয়ে কিসের অন্য যেন কান পাতে। পর্ণা সেজেছে চমৎকার, ছাব্বিশ পেরিয়ে এখন সাতাশ চলছে ওর, কিন্তু এমন সেজেছে যে দেখে মনে হয় এই সেদিনের খুশীই আছে। এই সেদিনের খুশী, যেদিন প্রথম স্বাক্ষর দেখে ভয়ে কোমর কেঁদে কেটে আমার এসে জড়িয়ে ধরে সেই সেদিনটি যেন ওর শরীর ছেড়ে যায়নি আজও। সময়ের একটু আগেই এসেছিল ওর ওই উপসর্গ, ফলে বাচ্চা মেয়েটার সে কী কান্না। তখন মা-ই তো তার একমাত্র আঁকড়ে ধরার আশ্রয়। সেই মেয়ে আজ কত স্বাবলম্বী, কত একা চলায় পোক্ত। আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে কি মেয়ে?

‘মা, আমি জানি তুমি আজ সেক্সুশনে থাক। তোমায় বিরক্ত করছি না। বাট্ মাশ্বি, আমি তো তোমারই মেয়ে, তোমার না জানিয়ে তো আর যেতে পারি না। প্রবীরের গাড়ি বোম্বহয় এসে গেল, শুদ্ধ বাই মা—।’

হাত নেড়ে পর্ণা বিদায় নেয়। শুকে যেতে দেওয়া ছাড়া অন্য পথ খোঁজা নেই। যাক, কিন্তু কাঁটার মত একটা অনিশ্চিতি বোধ বিধিয়ে দিয়ে গেল ও মনের মধ্যে। বিকুর সঙ্গে ওর ডিভোর্সের কেস শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আমাদের উকিলের পরামর্শেই অরুণ আজ বিকুর উকিল আর আমাদের উকিল সত্যাব্যুর সঙ্গে বসে শেষবারের মত একটা মিটমাটের পথ খোঁজার চেষ্টা চালাতে চাইছে। ওরা আসবেন বিকেলে, পর্ণাকে থাকতে বলা হয়েছিল। সব কিছু এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই ও বেড়িয়ে গেল। ওর বাবার শেষ চেষ্টাটাও বুধাই গেল। এ বারেও পর্ণার বিয়েটা ভেঙ্গে গেল।

এইভাবে চললে পর্ণা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? বিকুরিকুর পরিধা ওর দ্বিতীয় স্বামী। সিনেমা লাইনেই পরিচয়, বেখানেক বিয়ে। বিকুর কটোগ্রাফার, ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ নাম করেছে। পর্ণা আগে এ্যাড-ফিল্মে মডেলের কাজ করত,

সেই সূত্রেই বিষ্ণুর সঙ্গে আলাপ, আলাপের পরে পরেই বিয়ে। আমরা বাধা দিই নি, কারণ পর্ণার প্রথম বিয়েটা ভেঙ্গে যাওয়ার পর ওকে স্বভাবতই একা লাগছিল। মুখে কিছু বলত না, মনে মনে একাকীত্ব যে ছিল মা হয়ে আমি তা ভালই বুঝতে পারতাম। একান্তে যখন মেয়েকে কাছে নিয়ে ওর চুল বেঁধে দিতাম, কিম্বা স্নানের সময় পিঠে সাবান মাখিয়ে দেওয়ার জন্য ডাকত তখন ওর রূপসী সৌন্দর্যের ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা দুঃখ আমার বুক ফাটিয়ে দিত। আমিও অবশ্য মুখে কিছু বলতাম না, তবে খুব কাছে থেকে বুঝতে পারতাম ওর অবস্থা। তাই বিষ্ণুর সঙ্গে বিয়েটাকে আমরা মেনেই নিয়েছিলাম।

মাত্র ক'টা দিনের আলাপেই বিয়ে করার মত ঝুঁকি নেওয়া সম্পর্কে একটা প্রশ্ন যে ছিল না তা নয়। তবে একটা কথা ভেবে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সমর্পণ করতে চেয়েছি। অতনুর সঙ্গে ওর বিয়েটা তো বেশ দেখেওনে, ভেবে চিন্তেই দিয়েছিলাম। প্রায় স্কুলে পড়ার সময় থেকেই পর্ণা আর অতনুর ভবিষ্যৎটা গড়ে তুলেছিলাম আমরা সবাই মিলে। তবু তো বিয়ের দু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বিচ্ছেদের কালো ছায়া মাথা তুলে দাঁড়ালো। আরো একবছর টানা-হেঁচড়া করার পর ছিঁড়েই গেল সুতো। ডিম্বোর্সের প্রথম থাকাটা সামলাতে গিয়ে বড় বেশী কষ্ট পেয়েছিল পর্ণা। বিয়ের পর দু'বছর খুবই মানিয়ে চলেছিল সে। অতনু বাই নেচার ছিল স্যাডিস্ট, তার এই রোগ দেখা দিত বিছানায় গেলে। পর্ণা আর সইতে না পেয়ে মার কাছে বুকের বোতাম খুলে দাঁড়িয়েছিল একদিন। ওই নরম তুলতুলে বুক সিগারেটের ছাঁকার দাগ। দিনের বেলা যে ছোঁলেটা অমন শান্ত, সুন্দর রাতের অন্ধকারে সে কেন এমন পশু হয়ে যায়। ভেবে কুল কিনারা পাইনি আমরা। ডিম্বোর্স পেতে একেবারেই অসুবিধা হয়নি, অতনুও জোর করে আটকে রাখতে চায়নি। আমার তো খুব মায়াই লেগেছিল যখন কোর্টে ভরা মানুষের মধ্যে অতনু উপুড় হয়ে প্রণাম করে শেষবারের মত চলে গিয়েছিল। পর্ণা অতনুকে ছেড়ে চলে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু ভুলতে সময় নিয়েছে।

খোলা জ্ঞানালার পাশে অনেকক্ষণ বসে আছি। খুব আলস্য লাগছে, আর বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। আকাশে মেঘ আছে, কিন্তু বৃষ্টি নেই। মায়ের মৃত্যু দিনটাতে কিন্তু কমকাম করা বৃষ্টি ছিল, সেই বৃষ্টির জল মাথায় নিয়েই মা চোখ বুজেছিল। তার মৃত্যুর সময়টায় বাবা তার কাছে ছিল না, পনেরো আগস্টের পতাকা তুলে পাশের বাড়ির রোয়াকে গিয়ে বসেছিল। মা তো খুব বেশি অসুস্থ ছিল না, দিন দু' একের জ্বর, তবে জ্বর যখন বাড়ে তখন চোখ-মুখ লাল হয়। মাথায় জল দিতে দিতে জ্বর নেমে যায়। তখন সবে

বৃষ্টি শুরু হয়েছে, ধূপধাপ জানালা বন্ধ করছে এ বাড়ি ও বাড়ির বৌ-মেয়েরা। আমার মাও উদ্বেগে শয্যা ছেড়ে উঠতে যায়। আমি বসেছিলাম মায়ের ঘাটে, মায়ের পাশেই। মা উঠতে গিয়ে আর উঠতে পারে না, যে তেজে মাথা তুলেছিল সেই তেজেই ধপাস করে পড়ে যায়। কী করব বুঝতে পারার আগেই মায়ের কঠার কাছে ওঠা-পড়া, সারা মুখে বিপন্নতা দেখে কী যে কী ভাবি। কান্নার বেগ আমার বুক ভেঙ্গে উঠে আসে একেবারে অন্তর মত চিংকার করে কান্ডাতে থাকি।

‘স্বাভী, ওরা চলে গেল—’ অরুণ এসে জানায়, ‘সত্যবাবুই ইন্সটিট করছিলেন একটা মিটমাটের জন্যে। তা মেয়ে তোমার তো একেবারে ধনুকভাঙ্গা পণ করে বসে আছে। আজ বেরোবার সময় ও বলে—’ হাতের ইশারায় ধামিলে দিই অরুণকে, ‘আমি জানি, পর্যা আমাকেও বলে গেছে।’
‘তাল তো জানোই। আর কোনো চেষ্টা করেই লাভ নেই।’ অরুণের স্বরে হতাশা স্পষ্ট।

‘আমি আর ভাবতে চাই না, যা হবার হতে দাও, ভাগ্যে যা থাকবে তাই হতে দাও।’ বলে এবার অরুণকে ভাল করে দেখি। সারা মুখে কে যেন কালি মেখে দিয়েছে, একটু উজ্জ্বলতাও নেই ওর চোখে। ও খুব দাপুটে লোক, খুব সং বলে একটা নাম আছে পরিচিত মহলে। মানুষজন সমস্যায় পড়লে ওর কাছে পরামর্শ নিতে আসে। তাই ও নিজেও চেয়েছিল পর্ণার দ্বিতীয়বারের বিবাহ বিচ্ছেদটা আটকাতে। আমি বুদ্ধি, পর্ণার এ ঘটনা ব্যক্তি হিসাবেও ওর বাবার ক্ষতিই করেছে। আমাদের কাছে সেটাও একটা পয়েন্ট তো বটেই, একটা মেয়ে বার বার জীবন গড়তে চাইছে আর বার বার তা ভেঙ্গে দিচ্ছে, এটা যদি সামাজিক ভাবে স্বীকৃতি পেয়ে যায় তো মা-বাবা হিসাবে আমাদের সম্পর্কেও মানুষের মনে সন্দেহ আসতেই পারে। কোনো অজুহাতে দেখিলে মানুষের মন চাপা দেওয়া যায় না।

‘সত্যবাবু বলেছিলেন, পর্যা যে বিষ্ণুকে ছেড়ে আসতে চাইছে তার সমর্থনে খুব একটা কপনিজিবল্ পয়েন্ট ও দেখাতে পারছে না। আমার তো মনে হয় ওদের ভেতরে ড্রামারস্ট্যাডিং গড়ে ওঠার সময়ই পায়নি। তাই কিছু সময় দিলে হয়ত একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করতে পারবে। আমিও তাই বলি—’

অরুণের অসহায়তা বুদ্ধি। একমাত্র মেয়ের জীবনে বারবার এ রকম ঘটনা ঘটুক তা সে মন দিয়ে মানতে চাইছে না। স্নেহ এসে পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে ওর। তাই মেয়ের ওপর জোর খাটাতেও ভয় পাচ্ছে। আমার মত ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত বসে থাকার মানুষ অরুণ নয়। তাই দুই

উকিলকে এক সঙ্গে বসিয়ে একটা শেষ চেষ্টার পথ খোলা রাখতে সেও চেয়েছিল। কিন্তু মেয়ের এ্যাডামেন্ট ভাব তাকে সে চেষ্টা করতেই দিল না। আবার ভেঙ্গে গেল পর্ণার বিবাহিত জীবনের বন্ধন।

অরুণ হতাশ হয়েছে, কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না, ও যে ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাস রাখে না এটা ওর পক্ষে বাড়তি বালাই হয়েছে—। অথচ ও বুঝতে চাইছে না যে আজকাল সব ধরণ ধারণ, ধারণাই বদলে গিয়েছে। অরুণ-স্বাভীর মত তিরিশ বছর এক সুতোয় বাঁধা থাকার কেওয়াজ আর থাকছে না। মানুষ বড় স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে ছাড়া জবার অবকাশ কোথায়?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অরুণ আমার আরও কাছে সরে আসে। ও আমার চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে মাথার ওপর থেকে নিচে হাত নিয়ে আসে। পর্ণা বা অভি যখন পেটে অরুণ এইভাবে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে আরাম দিত, শান্তি দিত। ওর মন হতো মা হবার ঝামেলা বাবা হবার থেকে অনেক অনেক বেশি। আর তাই নিজের ভেতরে জমে থাকা একটা কুষ্ঠাকে তাড়াতে চাইত আমার শরীর ও মনের আরাম, বিশ্রাম ঘটিয়ে। ও কি এখনও মনে করছে যে আমি মেয়ের বিপর্য্যতার ভার বেশী বহিছি, নইলে সেই পুরানো দিনেরই মত মাথায় হাত বোলাবার মুদ্রাকে সে ফিরিয়ে আনবে কেন? আবেশে আমার চোখ বুজে আসে, এমনিতে আমি একটু আদর খেতে ভালবাসি। তার ওপর এতদিন বাদে এত কাছে এসে অরুণের এই সমব্যর্থী মনে হোঁরা দেওয়া আমাকে ছুবিয়ে দেয়। পর্ণারা কেন এই ঐশ্বর্যের খোঁজ পায় না?

মাথায় হাত বোলাতে বোলাতেই অরুণ বলে, 'তোমায় একটা খবর বলা হয়নি। ইন্ ফ্যাক্ট অভি আজই আমার জানাল, আজ পনেরই আগস্ট বলে তোমাকে বোধহয় জানাতে চায়নি।'

অরুণ কী বলতে চাইছে তা আমি বুঝতে পারি। অভি কাল জানতে পেরেছে যে এ্যামেরিকা ভিসা মঞ্জুর করেছে। এখন আর ও দেশে যাওয়ার বাধা রইল না তার। কালই অভি আমার ওর ভিসা পাওয়ার কথাটা জানিয়েছে। বাবাকে কাল জানাননি, আজ সকালে জানিয়েছে হয় তো। অরুণ ভেবেছে ছেলে তাকেই প্রথম জানিয়েছে খবরটা। ওর এই বিশ্বাসটুকু ভাঙতে চাইল না মন। মেয়ের কাছে আঘাত পেয়ে এমনিতেই মুবড়ে আছে এখন ছেলের কাছ থেকে পাওয়া গৌরবটুকুও কেড়ে নিলে বেচারী মনে মনে একটু তো কষ্ট পাবেই। তাই একটু বেশী আগ্রহ নিয়েই বলি, 'কী হয়েছে 'অভির'?' আমার কথার ঝোক ওকে স্পর্শ করে, কথা শেষ হতে না হতে ব্যগ্র হয়ে বলে, 'না, না, অভির কিছু হয়নি। ও আমেরিকার ভিসা পেয়েছে।'

আমি শান্ত হওয়ার ভান করি, আমি আনন্দিত হওয়ার ভান করি, আমার স্বামী কোনও ভানই বুঝতে পারে না। নিজের মনেই কথা বলে যায়, 'কিন্তু ও এ্যামেরিকা যাবে? কী ভাবে যাবে?'

'কেন, অন্যরা যেভাবে যায়। অন্যরা যেভাবে যাচ্ছে।'

'আরে তা না। এতদিন যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষার কথা বলেছে সেই দেশে ও যাবে? যাবার ইচ্ছে হবে?' অরুণ মাথা নাড়ে।

'আমরা মনে কৌতুক করার ইচ্ছা হয়, কিন্তু এ মুহূর্তে সে ইচ্ছা দমন করাকেই প্রেম মনে করি। বাপ-ব্যাটায় মিলে এতদিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যা সব সিদ্ধান্তে এসেছে তা মনে পড়াতেই এই কৌতুক করার ইচ্ছা। কিন্তু অরুণের এই ভাঙ্গা, হতাশ, সংশয়ী মূর্তিটাকে আর বিন্দুমাত্র আঘাত দিতেও মন চায় না। কেবল বলি, 'ভিসা পর্যন্ত যখন এগিয়েছে তখন একটা আশা অবশ্যই আমাদের মনে ছিল।'

অরুণ মাথা নাড়ে, ঠিক বলেছে, ভেতরে একটা লোভ সকলেরই থাকে, আমাদেরও আছে। এই লোভকে ও পরানো যায় না, কেউ হয়ত ওপরতে পারে। কিন্তু আমরা পারিনি, আমাদের মত ভাঙ্গা মানুষরা পারে না। অরুণের মনস্তাপকে আমি যেন দেখতে পাই, ও খুব ছটকট করছে মনে মনে।

অভিকে আমি একই কথা বলেছিলাম কাল। কেন ও ভিসা পেয়ে আমার কাছে ছুটে এল; নির্ধাৎ ও এটাকে জীবনের একটা এ্যাচিভমেন্ট মনে করছে। এম-এম-সি-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হজেও এরকমই ছুটে এসে আমার বুকে মুখ ঝুঁজেছিল অভি। লন্ডনের জার্নালে লেখা বেরোবার পরও ওর চোখে আমি একই আলো দেখেছিলাম। আমার চোখ ভুল না করলে আজও বলি, একই রকম আলোয় ভরে গেছে আমার মন। আমি যখন জিজ্ঞেস করি, 'এ্যামেরিকাকে তোরা তো সাম্রাজ্যবাদীর চূড়ামণি বলিস, আবার সেখানকার ভিসা পেয়ে মার কাছে ছুটে আসিস কেন, ভেবে দেখেছিস?'

একটু দমে যায় অভি, বিপন্ন মনে হয় ওকে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে আমাকে জাপটে জড়িয়ে ধরে ও বলে, 'বু আর মাই গ্রেট মাদার। শোন, এখনও বলি আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদের ধর্মই সব গ্রাস করা।'

'তবে যে গ্রাসে যাচ্ছিস কেন?' সোজাসুজি তাকাই অভির চোখের দিকে। আমি চাই ছেলে যেখানেই থাক মন পরিষ্কার করে থাক।

'গ্রাসে যাব না মা।' এদেশে আমার রিসার্চ করার কোনো স্কোপ নেই। জেনেটিক্ সার্বেল এখানে এখনও হামাগুড়ির স্তরে। ভাবতে পারো মা

ওখানে গিয়ে গবেষণা করতে করতে একদিন আমি ওদের সব কিছু গ্রাস করে ফেলব। খাওয়ার সুযোগ পেয়েছি, পেট পুরে খাব—তারপর, ভাবতে পারো মানুষের ক্রোনিং হতে চলেছে, আর তোমার ছেলেকে সেইসব বিজ্ঞানীদের দলে।’

আমার বিশ্বাস হয় না, ওর কথায় কতটা আবেগ আর কতটা অনুভব আলাদা করে বোঝার সময় লাগবে। তবু জিজ্ঞেস করি, ‘মানুষের ক্রোনিং, এসব পাগলামো—’।

মুখ চেপে ধরে, অভি বলে, ‘মাগো, আমি সুযোগ পেলেই তোমার ক্রোনিং করব। আমার মাকে আমি যেতে দেব না, এই ভাবে তুমি থাকবে।’

এখনো ওর পাগলামোর কথা মনে হলে আমি শিউরে উঠি সেও কী সম্ভব? আমারও তো ইচ্ছে করে আমার মাকে আমি ধরে রাখি। এই যেমন প্রতি বছরের পনেরই আগস্ট তাকে পাওয়ার চেষ্টা, আমার ছেলের চেষ্টার সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়?

অরুণ আমার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, অভি বলছিল ক্রোনিং নিয়ে গবেষণা করবে ও। এ সুযোগ এদেশে পাওয়া যাবে না।’

‘তুমি ওকে কী বললে? আমি জানতে চাই।

‘কী বলছি শুনবে? বলছি এই ভারতবর্ষের একটা ক্রোনিং করা যায় না? অন্তত ভারত নামে একটা দেশ আছে এটা জানবার জন্যও তা দরকার।’ অরুণ হাসে, কিন্তু তার চেয়ে কান্নাও যেন ভাল। বুঝি হেরে যাওয়ার ছালা ভুলতে অরুণ এ সব বলছে। আমি তো চাই না অরুণ হেরে যাক, তাই চুপ করেই থাকি।

উপাখ্যানের স্রাণ

ঝড়ের চট্টোপাখ্যান

বহুর ঘুরে শীত আসে। শীতের ঠাণ্ডা গায়ে দীত বসায়। বীরেনের মনেও কী যে বারবার হল ফোঁটায়। তখন অবাক হয়ে ভাবে, কেন.....কেন এমন অস্বস্তি....!

কয়েক দশ মাত্র। ব্যস। তারপর একটা মরসুমি অভ্যাস দ্বায় মনের মধ্যে উঁকি পারে। বোধ হয় জিনিসটা এখনও নিজে যাওয়া হয়নি, তাই এমন অস্বস্তি।

মেশ বেয়ে শীত পড়ে পাহাড় অরণ্যে। উঁচু নিচু মাঠ ভূমিতে। মানুষের মহলায় নগরে।

বাড়িটার কলিং বেলয়ে চাপ দেয়। ঘরে বনের পাখি ডাকে। ছিটকিনি আঁটা ছিল ভিতর থেকে। এবার ছিটকিনি খোলার শব্দ।

বীরেন এতক্ষণ মনে মনে অনেক ছবি একেছে। হয়তো দরজা খুলে এক মুখ হেসে নীতা বলবে, আরে এবারও আনলেন?

বীরেন ভেবে ছিল এইভাবে শুরু করবে, কী আর আনলাম.....! তা আপনারা সব ভালো আছেন তো....

—হঁ। মা...এদিকে আসুন—, বলে একটু ব্যস্ত হবে নীতা। উন্টো পান্টা কাছ করে ফেলবে। টেবিলের দিকে দেখিয়ে বলবে, বসুন-বসুন। হয়তো সেখানে তখন কোন চেয়ার বা মোড়া থাকবে না। নয়তো অতি উচ্ছ্বাসে মোয়ার বড় প্যাকেটটা ধরতে গিয়ে বীরেনের মগিবন্ধে নীতার তুলতুলে নরম হাত ছুঁয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করবে নীতা, বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছেন?

—এই ঘণ্টা দুয়েক

—অনেকক্ষণ তো। তাহলে খুব কষ্ট হয়েছে না..., নীতার কণ্ঠে সহানুভূতি ঝরে পড়ে।

সমবয়সী সুন্দরী যুবতীর কাছ থেকে আকৃতি বা অনুরোধ যে কত বেশী আকর্ষণীয়। এ মুহূর্তে তার জন্যে উদ্যত ফণিসীর মাথা থেকে মগি ছিনিয়ে আনতে পারে কিংবা ছোবল খেয়ে ওই সমবয়সিনীর গুচ্ছবা পেতে সব কিছু করতে পারে। এটা কি মোহ? সৌন্দর্য কীতি? গোপন কামনা! বীরেন ঠিক ধরতে পারে না।

দরজার কজ্জা কঁকিয়ে ওঠে। এমন তো কোনবার কানে বাজেনি

বীরেনের...! খটাস্ করে দরজা খুলতেই...কে...আপ..., মুহূর্তে নীতার গলা রুদ্ধ।

—এই যে এগুলি...

নীতা একবার বীরেনকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে। ভিতরে চলে যায়। চাপা স্বরে ডাকে, মা—

এমন তো করে না নীতা! এই বড় বয়সেও শিশুর মতো লাফিয়ে উঠত। সে সব কোথায়! নীতা ভিতরে গিয়ে বললো, মা... তোমাদের বীরেন এসেছে। সেই গৈয়ো ছেলোটো...

কোন তথ্য বা বাক্য নয়। যেন কাঁটা ধোঁচার আঘাত।

—তুমি কোথায়? নীতার গলা ভিতর থেকে ছিটকে এলো বীরেনের কানে। বীরেন একটু নড়ে ওঠে।

—কেন...আমি বাধরুমে..., নীতার মায়ের কঠিন স্বর। নীতার মা মানে বীরেনের মাসিমা। তবে এই সম্বোধনটা আসা যাওয়ার ফলে কিংবা আতিথেয়তা ও বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। এখন বীরেনের হাতে মোয়ার প্যাকেটটা বেশি ভারি মনে হল। মনে হল, অল্প ওজনের খই মোয়া নয়। কত কালের সেই আদিম সভ্যতার গোল গোল পাথরের ডেলা। কিংবা ধাতব পদার্থের ভার। কত বড় একটা আপদ যে...।

বীরেন তখন বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। নিজের পা থেকে মাথা অঙ্গি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলো। নিজেকে অত্যন্ত দীন, তুচ্ছ মনে হ'ল। মনে হ'ল কত নির্বোধ। শুধু মনের আবেদনকে প্রাধান্য দিয়ে এত বড় বাস্তবটা এড়িয়ে যাচ্ছে। কেনই বা যে এত আশ্রয় তাক্ষিক্য বা আশ্রয় অবহেলা...! কারণ বুঝতে পারছে না। পরক্ষণে মনে হ'ল, কারণ অতি সহজ। নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে যাচ্ছে বীরেন। গ্রাম্য সরলতাকে বিকিয়ে যেন যুক্তির আশ্রয় খুঁজছে। কিন্তু সারল্যের যা ওজন ও আয়তন তার তুলনায় বীরেনের বয়স তো বেশি বা বড়। এত মানসিক দীনতা কেন? তবে কি পরিচিত হ'তে চায় এই পরিবারের সঙ্গে! নাকি এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পেরে মনের একটি ফাঁকা জায়গা ভরিয়ে নেয় বীরেন...।

পাউডার আর সুবাসিত তেলের এক ঝলক সৌরভ বীরেনের নাকে পৌঁছল। যিনি এলেন, মাসিমা। মানে এ বাড়ির গৃহিণী। অনুমানে এমন সম্ভাব্য সত্যতা যদি আজ সকালে আয়ত্ত্ব করতে পারতাম...তাহলে অন্তত এমন করে এখানে চলে আসতাম না..., অনুশোচনায় কথাগুলো ভাবে বীরেন।

মাসিমা বললেন, তুমি...তা ভেতরে বসলে না কেন? ইস দেখো তো তখন থেকে এই জিনিসপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে। যেন ইস্কুলে পড়া না পারার দণ্ডভোগ...।

মাসিমার এখানে উপস্থিত হওয়ার আগে পর্যন্ত বসবার কোন অনুরোধ কিংবা আদেশ আসে নি। তবুও বীরেন বলে, না। আমি এই মাত্র এলাম।

মাসিমা আরও নিকটে আসে। তার মাথা থেকে মায়াময় সুগন্ধ বীরেনের নাকে ভাসে। বীরেন বলে, শীত শেষ হ'তে চললো। এনে ফেন্সলাম জিনিসটা।

প্রশান্তি লেপে ছিল মাসিমার মুখমণ্ডলে। মোয়ার প্যাকেটটা নিয়ে ভিতরে গেলেন।

বীরেন একা বসে। সামনে টেবিলে ক'খানা পত্রপত্রিকা। উন্টোতে লাগলো। মন বসে না। মনের মধ্যে কত সব প্রশ্ন উদ্ভূত যে হিজিবিজি রেখা টেনে যাচ্ছে। এই তো গত বছর মোয়া আনার পর, বীরেনের হাত থেকে পত্রিকাটা কেড়ে নিয়েছিল নীতা। পরে বুকের আঁচল গুছিয়ে বলেছিল, কী? আপনার গ্রামের খবর কী?

—আমার গ্রাম তো আপনি চেনেন না। খবর নিচ্ছেন?

—না চিনলেও কি খবর নিতে নেই? তাহলে তো লোকে খবর কাগজ পড়তো না ইংল্যান্ড আমেরিকা জাপানে গিয়ে হেঁটে হেঁটে সব দেখে চিনে আসে নি বলে?

বীরেনের মনে হ'ল? তাই তো কথাটা অমূলক নয়। তবুও নিজেকে নীতার সামনে প্রতিষ্ঠিত করতে যুক্তি হাড্ডায়। তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটি নিয়ে মুখ খোলে, তা বলে কি ভবানীপুরের মেয়ে আপনি মাঝেরহাটের মিষ্টা দেখবেন না?

—বাহু। বেশ কথা শিখেছেন তো আপনি? বলেই ঝিল ঝিল হেসে উঠতো নীতা। কালো বেলীর সঙ্গে দুলে উঠতো গা বুক। সেই ছন্দময়তায় বীরেনের দেহ জুড়ে কোষমালায় দহন। তখন বীরেনের বিষম সঙ্কট। নীতাকে কী সন্ধাননে যে ডাকে। নীতা, না নীতাদি?

সেবার বিনুনির গিট বাঁধতে বাঁধতে নীতা বলেছিল, আপনার বাড়ির খবর কি?

—তার মানে? এবার গ্রাম ছেড়ে বাড়ি ধরলেন?

—কেন? তাকি জিজ্ঞেস করা যায় না? বলেই সোজাসুজি বীরেনের দিকে তাকায়। এমন স্বচ্ছন্দে তাকানো যায়। নাকি? এমন গ্রাম্য যুবক বিবেচনায় তাকে নির্বিষ কিংবা নির্জীব মনে করে নীতা? নীতার এমন আচরণে একজন সমবয়সী যুবককে হেনস্তা করার লোভও উকি মারে।

নীতার বাবা বীরেনকে তো চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছে। সেই সূত্রে অফিসের 'স্যার'। এ বৃহত্তর নীতাদের পরিবারে সকলের জানা।

নিম্নোপহীনতার এই দুঃসময়ে বীরেন 'স্যার' মানুষটার প্রতি কৃতজ্ঞতায়

আকর্ষ নিমজ্জিত। সূত্রাং অনুযোগের সুরে সেদিন নীতার উদ্দেশ্যে বলেছিল, দেখুন না, আমাকে—আমার গ্রাম নিয়ে কত কী বলছে

স্যার তখন মেয়েকে মৃদু ধমক দেয়, কেন রে বীরেনটাকে যা-তা বলছিস? নীতা কপট রাগে বলে, বাবা তুমি ওকে বিশ্বাস করলে আর আমি মিথ্যুক হয়ে গেলাম...

স্যার ব্যাপারটায় বেশি গুরুত্ব না দিয়ে বলে, হঁ। তোমার বাড়ির খবর ভালো তো?

—হ্যাঁ স্যার, নত মুখে উত্তরটা জানান্য বীরেন। এটুকু জিজ্ঞাসায় যে কত আশ্বস্ত!

—তুমি এসব আবার আনতে গেলে কেন?

—স্যার...শীত ফুরিয়ে গেলে তো এসব আর আনা হবে না

—বাবা। তুমি তাহলে শীতের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে?

নীতা তখন প্রায় জানালার কাছ থেকে ছুটে এসে বাবাকে বলে, তুমি অমন করে ওকে বকছো কেন গো? ও আনে তাই আমরা খাস কলকাতায় বসে খাঁটি নলেন গুড়ের মোয়া টোয়্যার স্বাদ পাই

—তা বললে চলে? ওর তো খরচ হয় কিছু, স্যারের কঠ বেয়ে সহানুভূতি।

—কেন? দাম দিলেই পারো, বাবার কাছে মেয়ে পরামর্শ রাখে।

কথাটায় চমকে ওঠে বীরেন। বাবা মা ভাই বোনে পাঁচজনের সংসার। তার খেজুর গাছ ছোট্ট পুকুর কঁকাঠা বাস্তু নিয়ে সামান্য ভূমিভাগ। সে জীবনে এই চাকরিটুকু যে কত বড় সাশ্রয় কঁখানা মহাপ্রাণীর। শীত এলেই গায়ের চামড়ায় রোমকূপে সেই অনুকম্পা ছেয়ে যায়। তখনই মনে হয় বীরেনের, কত বড় পৃথিবী...! কত মাঠঘাট পাহাড় সমুদ্র...কলকাতাখানাময় এদেশ...! কত রকম মানুষ...! কে বা এমন করে একটা সংসার বাঁচাতে সাহায্য করে...! যে 'সব রাষ্ট্র...সরকার সব মানুষের জন্যে দরদী ছিল...তাদের জোর তো ক্ষয়ে গেছে...। যাচ্ছে। তখনই মরিয়া হয়ে বীরেন বলে, মানে? আমি কি ফেরি করে বেচতে এসেছি?

বীরেনের গলায় রাগ ঝরে। অভিমানে হন হন করে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। নীতা দৌড়ে এসে হাতটা ধরে, এছন্যেই বলে গায়ের লোক বোকা। বদরাগী...

স্যার দু-এক পা এগিয়ে যায়। বীরেনকে বলে, তুমি এসব কিছু মনে রেখো না। বরং যখন খুশী আসবে। এই নীতা ওকে কিছু খেতে দিবি, না?

কেন, দেবো না? বলে বীরেনের দিকে তাকাতেই নীতার বিনুনী আলগা। কেমন বন্ধনহীন কেশরাশি। দেহের আর মনে বাঁধনের গিঁটগুলো আলগা

হয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে শিখিল তো বীরেনও।

সামনে ছোট্ট সেন্টার টেবিল। ওপাশে নরম সোফা। এপাশেরটা সিঙ্গল সিটেড সোফা। টেবিলের কাছে পিতলের কারুকর্মময় ফুলদানি। ফুলের পাপড়িতে ফ্যানের হাওয়া। বিড়ালটা লাফিয়ে পাল্লাতেই টেবিলের ফুলদানিটা পড়ে গেল। সোফাসুদ্ধ বীরেন কেঁপে ওঠে। দু-কান বাজিয়ে বন্ববন্ শব্দে চারপাশ ছিঁড়ে যায়। ছিঁড়ে যায় বীরেনের এতক্ষণ ধরে ভাবনার জট। এখন তার মনে হল, আমি নীতার বাবা... আমার অফিসের সাহেব প্রশংসাবাবুর বসার ঘরে...

নীতার মা কাছের মেয়েটিকে বললেন, এই পারুল এখানে প্রেটটা দিয়ে যা। আর জলের গেলাস নিয়ে আয়—

নীতার মা কাছে আসে, নাও। বীরু খেয়ে নাও।

বীরেন মুখে হাত তুলতে পারছেন না। এতটুকু পরিমাণ খাদ্যকণাও গলার মধ্যে যাচ্ছে না। ভাবতে থাকে, ...আমি কি তবে এই জিনিসটা অত দূর থেকে বয়ে আনি এক প্রেট ভর্তি দামী সুবাসু খাবার খাওয়ার জন্যে...। মোয়াদুকু নিয়ে আমার অফিসারকে নিছক খুশী রাখতে...?

দ্বিধাময় প্রশ্ন বার বার পাক খায় বীরেনের মস্তিষ্কে। মানসিক অস্থিতি হ্রাস পায় না। এরকম ধোঁয়াটে পরিস্থিতিতে বীরেনের মতো অধস্তন কর্মচারির বুকে জেগে ওঠে উর্দ্ধতন আধিকারিক বাড়িরই এক মুখ। অবচেতনায় পোবা সে মুখ।

—বীরেন তুমি খাও, মাসিমার কণ্ঠে হঠাৎ অপত্য আকুলতা। অন্যমনস্কতায় বীরেন বলে ফেলো, হাঁ। খাচ্ছি তো—

—না, তুমি ভীষণ কিছু... কী ভাবছো বলো তো?

মাসিমার মুখের দিকে তাকিয়েই বীরেনের ভিতরে সংকোচন ক্রিয়া শুরু হয়। বয়স্ক উর্দ্ধতন অফিসারের স্ত্রী সূত্রে মাসিমা সংবাদন। রক্তের সম্পর্কে তো আর মাসিমা নয়। তাই মন খুলতে ব্যথা। সত্যি বলতে লজ্জা। কত সত্যি যে মুক্তি পায় না। সে সব বুকের মধ্যে হাড় মাংস হয়ে জমে থাকে।

হঠাৎ চেয়ারটা কাছে টেনে মাসিমার কণ্ঠ, বীরু... পরক্ষণেই প্রেটে দেওয়া একটা মোয়া ভেঙে যেতে লাগলো বীরেন। কব্জেরখানা খই বুর বুর খসে পড়লো গাল থেকে। কিন্তু গলার মধ্যে যেন শীতের জাড় কাঁটা যেতে চাচ্ছে না। কেমন বিষাদ যে মোয়াটার...!

—তোমার বাড়িতে কারুর অসুখ বিসুখ?

—না তো, জানায় মৃদু কণ্ঠে বীরেন।

—তবে কারুর কথায় দুঃখ পেয়েছ?

—দুঃখ; সেটা খুঁজতে খুঁজতে বলে, না না মাসিমা...।

এত না'য়ে যেন বাক্যটা পরিসমাপ্তি পাচ্ছে না। বরং মাসিমার স্বরে জিজ্ঞাসার চেয়ে বিস্ময় বেশী। কারণ এমন দায় সারা উত্তর আগে তো শোনে নি মাসিমা।

বীরেনের হঠাৎ মনে হ'ল, আগে...গত বছর অক্সিও এ বাড়িতে যখন এসেছি, কত কুশল বিনিময়...। কত জিজ্ঞাসা। তথ্য বিনিময় যে...। সে স্মৃতি ধরে ধরে জমে থাকে বুকে...। মনে...। সেহ যন্ত্রের কোথায় যে...। নাকি আর কোন চোরকুঠরি আছে। সেখানে বোধ হয় তারা সুপ্তভাবে থাকে! পরশ পেলেই জেগে ওঠে। ক'দিন বা এসেছি? সময়ের অতি তিলান্বিত নীতার সঙ্গে মাত্র কথা বলা। কিংবা না-বলা কথা নিয়ে মনোভারে কালক্ষেপ করা! অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ সময়ের এক একটা তুচ্ছ মুহূর্ত যে কত মহাবর্ষ! ঘরের বাতাস বেয়ে ছট করে নীতা বৃকের মধ্যে উঁকি দেয়! এ বছর... এবছর শীতে কেন যে নীতাটা একবারও দেখা করলো না। তবে কি নীতা তার পছন্দ মাক্ষিক যুবক বন্ধু পেয়ে গেছে? নাকি পাত্রহু হবার মতো যোগ্য স্বামীর আয়োজন ঘটে যাচ্ছে! সে জন্যেই নীতা বোধহয় গর্বিতা। তার কাছে বীরেন একান্তহীন।

অতীত ব্যবচ্ছেদে বীরেনের মনে হ'ল, অন্য ক'বছর তো এ বাড়িতে এসে নীতাটা কত প্রগলভ...। কত এলোমেলো ন্যাকামি করতো সে সব তাহলে সমবয়সোচিত বিপরীত আকর্ষণে? তখন তার মনে তেমন যুবক পুরুষ ঠাই রচনা করে নি, সেই দুঃসহ রিক্ততা, দীনতা পূরণ করত আমাকে দিয়ে! বীরেন নামে আমার মতো যুবক সঙ্গতায়...। সে সময়ের বাক্য বিনিময়...আন্তরিকতাকে পরম সত্য মনে করাই ছল হয়ে গেছে।

খাওয়া তো নয়, দ্রব্যগুলো পেটের মধ্যে চালান করে গ্রেটো টেবিলে রাখার নিয়মমাক্ষিক ব্যবস্থা। মাসিমা সেই অবসরে বসার ঘর থেকে বারান্দা উজিয়ে ওদিকের ঘরটার দরজায়। ভেতরে মুখ বাড়ায়, এই ...

চাপা কণ্ঠে মুখ তোলে নীতা। বৃকের কাছে বালিশ উপড় হয়ে কোন বইয়ের ধী ছবি টবির পাতা উন্টে আছে...

—বাড়িতে যখন আছি, একটু কথাবলাও যে ভদ্রতা মুখ না তুলেই উত্তরটা আসে, তুমি ছাড়া তো

মাসিমা পায়ে পায়ের কিরে আসেন। মোজাইক মেঝের চকচকে মসৃণতায় সে প্রত্যাবর্তন গম্ভীর। সতর্কতা অস্পষ্ট ছায়া কাটে মেঝেতে। বাইরে দিনের আলো ক্রমশ নির্জীব।

মাসিমা বললেন, বীরু—, তোমার বাড়ি পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে?

হঠাৎ যেন এলোমেলো কিছু ছোঁড়ার শব্দ। বীরেন নিজেই গুছিয়ে নিয়ে বলে, কতক্ষণ আর? ধরুন দু-ঘণ্টা...?

—তাহলে তোমার পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে?

—যাবে তো নিশ্চয়ই

সেওয়াল ষড়্টিটায় পর পর চারটে ঘন্টা। মাসিমা কী আর করবেন? পায়ের বুড়ো আঙুলটা মেঝের ঘষেন। এখন প্রতিটা মুহূর্ত যে কত দীর্ঘ। ভারি। অথচ সেবার এবাড়িতে এসে মোয়ার প্যাকেটটা ধরিয়ে দিতেই, নীতা কত এলোমেলো কথাই শ্রোত বইয়ে দিয়েছিল। ষড়্টির দিকে তাকাতেই বীরেন বুঝতে পারলো, পঁচিশ মিনিট। কত দ্রুত চরাচরের মাঠ নদীর গা বেয়ে সে মিনিটগুলো পাহাড়ের বুক গড়িয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেছে।

মেঝে বেয়ে পায়ের শব্দ। মাসিমার আগেই বীরেন শব্দরেখার দিকে তাকায়। রীধুনি মেয়েটা মাসিমার উদ্দেশ্যে বলে, বড় মা, আজ কি বাজার হবে?

—ও, আচ্ছা। তুমি ভিতরে যাও আমি আসছি...

মাসিমা বীরেনের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে সৌজন্যের পীড়ন। বীরেন সেটা অনুমান করে নিজেই উদ্যোগ নেয়, মাসিমা—আজ তাহলে উঠছি...

—উঠবে? আবার কবে আসবে?

—আসবো...

ধীরে ধীরে নামতে থাকে। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ বীরেনের বৃকে ধপ্ ধপ্ বাজে। তবুও নামে। নামতে হয়, জীবনের ক্ষেত্রে অনেককে যেমন নামতে হয়।

সিঁড়িটা মিশে গেছে। মেঝের সঙ্গে। তার খানিক নিচ থেকে সবুজ ঘাস। কয়েক পা ফেলতেই বৃকের মধ্যে মাড়িয়ে কী যে ব্যথা! নিজেরই অজান্তে তাকায় বীরেন উপরের দিকে। ভীষণ-অবাক। কে যেন রেলিং থেকে জামা আর কী সব নিরে ঘরের মধ্যে চলে গেল। পিছনে কৌকড়ানো কেশগুচ্ছের ঢল। এক পলকেই মনে হ'ল, নীতা! হালকা ম্যাকসিতে নীতা।

বীরেন উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। নীতা ব্যস্ত হয়ে রেলিং দেখলো। বারান্দায় নজর বোলালো। কী যেন হারিয়ে ফেলেছে। তার চোখ মুখে উদ্বিগ্নতা।

বীরেনের হঠাৎ মনে হ'ল, একটু পরেই নীতা ডেকে কথা বলবে।

সেই ভাবনাটুকু রচনা করে নিজেকে তাজা রাখে। সামনে সবুজ ঘাসের আশ্বরে উঠানের এই অংশটুকু। সেখানে সাদা ধবধবে কাপড়ের দ্রব্যটা অতি অবহেলায় পড়ে। হওয়া লেগে প্রজাপতির সাদা ডানার মতো তির তির কাঁপে। তখনই গায়ে শীতের হোঁয়া। পরক্ষণে নীতার মুখ চোখ গা বৃকের আভা বীরেনকে উবুত করে তোলে।

কক্ষ ঘরে চিৎকার দেয় কাজের মেয়েটাকে নীতা, টুপুর মা-আ-আ-

—কি গো দিদিমণি?

—আমার ব্রাটা গেল কোথায়?

কাজের মেয়ে ছুটপাট ছুটে আসে। বারান্দায় টাঙানো নাইলন দড়িটা দেখিয়ে বলে, এই তো এখানে শুকুতে দিচ্ছিলুম...

দড়িটার পর মস্ত আকাশ। নিচে সবুজ ঘাস। প্রাচীর বেঁধে দু-চারখানা ঝাউ ইউক্যালিপটাস আম জামের গাছ। পাখিরা বাসায় ফেরার আগে বেলাশেষের ওড়াওড়ি সেরে নিচ্ছে।

উপর থেকে কথাবার্তার প্রতিটা অক্ষর নিচে বীরেনের কানে আসে। ফসত ঘাসের উপর সাদা জিনিসটা আরও যত্নে লক্ষ্য করে।

বারান্দার রেলিং থেকে ষাড় গলা ঝুকিয়ে নীতা নিচে সবুজ ঘাসের দিকে তাকায়। জিনিসটা নিজের অন্তর্বাস সাব্যস্ত করে চোঁচায়, টুপুর মা—আ—

টুপুর মা গায়ের কাছে দাঁড়ায়। তখনই কড়া গলায় আদেশ, কুড়িয়ে আনো ওটা... ইস্ ঘাসের গায়ে কত কী বেয়ে যায়...

বীরেন কোন মুহূর্তে যে এক পলক উপরের দিকে তাকিয়েছিল নিজেই জানে না। পরক্ষণে নীতার বাহবা পাবার আশায় না, বরং করুণা কুড়োবার বাসনায় পোশাকটা হাত দিয়েই তুলে নিল। সদ্য কাচা ধবধবে বন্ধবন্ধনীটায় গত বছরের উচ্ছল নীতার দেহ গন্ধ এখনও লেগে।

বীরেনের হাতের মুঠোয় পোশাকটা। চকিতে রামায়ণ...রামায়ণের অরণ্যঈবনে স্বপ্ন বসনে সীতার দেহকে মনে জাগায়। মহাভারতে অরণ্য পর্বে দ্রৌপদীর দেহচ্ছবি চোখে ভাসে। মনে হ'ল তো কালীদাসের যুবতী শকুন্তলা কাচুলি বন্ধনে ভারাবনত। নম্র পদক্ষেপে আশ্রম বাগান অতিক্রম করছে আর্যপুত্রের কামনায়। দূর রাজপ্রাসাদ অভিমুখে।

কাজের মেয়ে টুপুর মা কখন যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে এতটুকু টের পায়নি। উপর থেকে বিদ্যুৎ চমকে আওয়াজ, কই দিয়ে দেবেন তো। ঝিঃ! কী অসম্ভ্য...! কেন যে এরা বাড়িতে ঢোকার পারমিশন পায়?

ঝলসে যায় বীরেন। পোশাকটা হাত ফসকে নিচে পড়ে। খানিক পরে মনে হল, টান টোনে গোছানো হৃদয়ে একরকম বাক্য ব্যবহার। আলগা পেতেই এলোমেলো রুঢ়।

এক কলক হিমেল হাওয়া। তার মধ্যে যে কত কালের কাব্য উপাখ্যানের গন্ধ। উঠান ঘিরে আঁধার নামে। রেলিং বারান্দায় সে আঁধার আরও জমট। চোখ চালিয়েও কাউকে দেখতে পায় না বীরেন। সবুজ ঘাসে আঁধার মাড়ায়। কোথায় হারিয়ে যায় যে কাব্য উপাখ্যানের রমনীরা!

চার দিকে পুরনো বাতাস। খানিক হাঁটতেই সে বাতাস কুড়ে হাতের তালুতে তেল সাবান চর্চিত নীতার গন্ধ। জীবন্ত দেহের স্বাপ।

পেখম মেলছে নীলরতন

রবিশংকর বল

প্রায় দশ বছর পরে পুরনো পাড়ায় ফিরে তিমির দেখল, নীলু এখনও রোজ সন্ধ্যাবেলা ঘড়িবাড়ির রকে বসে আছে। তবে তার পাশে আর কেউ নেই, নীলু একাই বসে থাকে। ঘড়িবাড়ির মাথায় লাগানো ঘড়িটাও আর চলে না, সেকেন্ডের কাঁটাটাই কবে যেন খুলে পড়ে গেছে।

নীলুর মাথায় চুল কম ছিল, এখন পুরোটাই টাক, শুধু ঘাড়ের কাছে সূতোর মতো কয়েকটা চুল ঝুলে আছে। নীলুর সামনের একটা দাঁত ভাঙা ছিল, এখনও আছে, তিমির লক্ষ করে দেখেছে। একসময় এই রকে নীলু এবং আরও অনেকের সঙ্গে তিমিরও তো দিনের পর দিন বসে থেকেছে। নীলু সব কথাই চোঁচিয়ে বলত। তার কথার প্রতিবাদ করলে নীলুর চোঁচামেটি আরও বেড়ে যেত।

সেই নীলু একা ঘড়িবাড়ির রকে চুপচাপ বসে আছে, বিড়ি টানছে। তিমিরের ইচ্ছে হয়, নীলুর সঙ্গে গিয়ে কথা বলে, কিন্তু সে জানে, নীলু কথা বলবে না।

কেন কথা বলবে না? কী হয়েছিল আমার নীলুর সঙ্গে? তিমিরের আত্ম আর মনে পড়ে না, শুধু এটুকু মনে আছে, একদিন হঠাৎই নীলুর সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে নীলু আর তার মুখের দিকেও ফিরে তাকায়নি। নীলুকে এখন জিগ্যাস করা যায় না? নীলু তোর সঙ্গে আমার কী হয়েছিল? নীলু সব মনে রাখত, এখনও নিশ্চয়ই মনে রেখেছে। হয়তো নীলুও ভুলে গেছে।

নীলুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্লাস টু-থ্রি থেকে। পুরো নাম, নীলরতন মোদক। এখনও নীলুর চেহারাটা মনে আছে, গাটাগোটা, কালো একটি ছেলে স্কুলের মাঠময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে, একে মারছে, ওকে মারছে, নীলুকে নিয়ে স্কুলের সবাই তট্। নীলু তার ছোড়দার হাত ধরে স্কুলে আসত, হাতে অ্যানুমিনিয়ামের ফুল বক্স, গলায় ওয়াটার বটল ঝুলত। তিমিরের ওসব ছিল না, নীলুর ছিল। কেননা নীলুরা বড়লোক।

বিরিট একতলা বাড়ি নীলুদের। বাড়ির ভিতরে চকমিলনো বড় উঠোন। সে-বাড়িতে হরিণ, ময়ূর, কস্তুরকমের যে পাখি ছিল। আকাশে মেঘ জমলে নীলুদের বাড়িতে ময়ূর পেখম মেলত। অনেকে বলত, ময়ূরবাড়ি। নীলুর

বাবা রামচন্দ্র মোদকের পায়ের কাছে ঘুমিয়ে থাকত হরিণ, তিনি হরিণের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন।

নীলুদের বাড়ির ছাদেই ঘড়ি ওড়ানো শিখেছিল তিমির। নীলু যত বড় হচ্ছিল, তত রোগা হয়ে যাচ্ছিল, তার হাতপায়ের দণ্ডিপনা কমছিল আর বাড়ছিল চোঁচামেচি। নীলু কথা বলবে মানে, কাউকে সে কথা বলতে দেবে না। তিমিরের মনে হয়, নীলু হয়তো এছন্যই তাকে বন্ধু করে নিয়েছিল। কেননা তিমির তো বেশি কথা বলে না, নীলু যা বলে, তার প্রতিবাদও করে না।

ক্লাস নাইনে পড়ার সময় থেকেই ঘড়িবাড়ির রকে বসা শুরু হয়ে যায়। তখন ঘড়িটা চলত। শ্রীতিকৃষ্ণ দিদিমণির কোচিং ছিল ঘড়িবাড়িতেই। তিমির সেই কোচিং ক্লাসের ছাত্র। রোজ সন্ধ্যাবেলা ক্লাসের পর ঘড়িবাড়ির ভিতরের গন্ধরাজ গাছের নিচে বসে দিদিমণির মেয়ে বুবাইয়ের সঙ্গে গল্প করত তিমির। গল্পের ভিতর দিয়ে অন্য কোনো চোরা শ্রোতও কি তৈরি হচ্ছিল? বুবাই বছর বারো আগে আত্মহত্যা করেছিল। কেন? প্রীতি দিদিমণি তার প্রেমিক গৌতমকে মেনে নেয়নি বলে? নাকি শৈশবে বাবাকে হারিয়ে যে বিষমতায় মাঝে মাঝেই ডুবে যেত বুবাই, তার অন্ধকার আরও গভীর হয়েছিল বলে?

নীলুর সঙ্গেই দিনের বেশির ভাগ সময় কেটে যেত। নীলু বাজারে যাবে, চল্ তিমির, নীলু মায়ের ওবুধ কিনতে যাবে, চল্ তিমির। রাত্তায় নীলুই কথা বলত। আমাদের বাড়িতে জ্বলিস তো লক্ষ্মী যি ছাড়া রান্না হয় না। তিমির শুনে যায়। মায়ের মাঝে মাঝেই জ্বর হয়, অথচ বাবা কিছুতেই চটি পরতে দেবে না। কেন জ্বলিস তো? আমার ঠাকুমা কোনোদিন চটি পরেনি বলে। আর রকের আড্ডায় শুধু মোহনবাগান-ইন্সটিবেশল। নীলুর বাবার মোহনবাগানের মেম্বারশপ কার্ড ছিল। অতএব মোহনবাগান সম্পর্কে নীলু যা বলবে সেটাই শেষ কথা। একবার শিশ্বে মোহনবাগান হেরে গেল। রামচন্দ্র মোদক দুদিন উপোশ করে রইলেন।

নীলু একবারে মাধ্যমিক পাশ করতে পারল না, কম্পার্টমেন্টাল পেল। তিমির এগার ক্লাশে কলেজে ভর্তি হয়ে গেল। কিন্তু নীলুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হতে পারে নাকি? নীলুর তখন এক নতুন নেশা। প্রায় রোজই নুন-শোতে হিন্দি সিনেমা দেখা। নীলু কখনও পুরো সিনেমা দেখত না। নায়িকা বা খলনায়িকার নাচ শেষ হলেই সে হল থেকে বেরিয়ে আসত। তখনও হেজেন, বিন্দু, কল্পনা আয়ার বা অরুণা ইরানীর জন্য একটি করে নাচ বরাদ্দ ছিল হিন্দি সিনেমায়ে। তিমির বিরক্ত হত। কিন্তু কিছু তো বলতে পারত না। নীলুর সঙ্গে তাকেও হল থেকে বেরিয়ে আসতে হত। নীলু বলত, 'ধুর পুরো সিনেমা

কেউ দেখে নাকি? নাচ হয়ে যাওয়ার পর আর কী থাকে!

তিমিরের মনে আছে, নারী বলতে, শুই নর্তকীদের প্রতিই যা আকর্ষণ ছিল নীলুর, পর্দার ছবিনর্তকীদের প্রতি। রক্তমাংসের নারীর প্রতি নীলুর কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। ষড়্‌বাড়ির রকে বসে সে হয়তো পাড়ার উঠতি দু-একজন তরুণীকে আওয়াজ দিয়েছে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। নীলু কখনও তাদের সম্পর্কে খারাপ কথাও বলেনি। বরং কোনো মেয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে নীলু কেমন আড়ষ্ট হয়ে যেত, আরও চোঁচিয়ে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নিয়ে কথা বলত।

এই নীলুর সঙ্গে তার কথা বন্ধ হয়ে গেল কবে? কেন? তিমিরের মনে হয়, আসলে কিছুই হয়নি। নীলু আর সে, দিনে দিনে আলাদা সময়ের ভিতরে ঢুকে পড়ছিল, তাদের সোলাকাত-আড্ডা কমে আসছিল, তারপর একদিন হঠাৎ নীলুই যেন নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল। বাবা রিটারার করায় তিমিরকে চাকরির চেষ্টা করতে, হচ্ছিল, তার জন্য কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেওয়া, এখানে-ওখানে দৌড়দৌড়ি, নীলুর সময়ের বৃত্ত থেকে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল। নীলুও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিল, তাই একদিন কথা বন্ধ করে দিয়েছিল। এমনটাই কি ঘটেছিল? তিমির জানে না।

অথচ নীলু এখনও রোজ সন্ধ্যায় ষড়্‌বাড়ির রকে বসে আছে। ষড়্‌ কবে বন্ধ হয়ে গেছে। তার পাশে আর কেউ নেই। নীলু বসে আছে।

—তিমির, অ্যাঁ তিমির—

পিছন ফিরে সে দেখল, নীলু হাত তুলে ডাকছে। তার ঠোঁটের কোণে বিড়ি জ্বলছে।

—কদিন ধরে তোকে দেখছি। আমার সঙ্গে কথা বলিস না কেন? নীলু গলগল করে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে। খকখক করে কাশে।

তিমির কোনো কথা বলে না।

—খুব শ্যাম হয়ে গেছে না? নীলু বিড়িটাকে চটি দিয়ে ডলতে ডলতে মুখ বেঁকিয়ে বলে, ‘এতদিনে অনেক শ্যামবাজ দেখলাম রে।’

—আমার কথা বলার ইচ্ছে ছিল।

—তাহলে?

—তুই হয়তো কথা বলবি না, সেজন্য—

—কেন? কথা বলব না কেন? তুই আমার সঙ্গে কাকুর মিস আগার-স্ট্যাণ্ডিং দেখেছিস?

তিমির হেসে ফেলল।

—হাসছিস কেন?

—না, এমনি—। তিমিরের মনে পড়ল, নীলু কথার মাঝে মাঝে এইরকম এক একটা ইংরেজি শব্দ ডরে দিত।

—রকে বসতে এখন খারাপ লাগে?

—না।

—তাহলে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

তিমির তার পাশে বসলে নীলু পাঞ্জাবির পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেট বের করে। —বিড়ি খাবি?

—দে। কিন্তু তুই তো এক্সুনি খেলি।

—তাতে কী?

—এত বিড়ি খাস?

—এখন তোর সঙ্গে একটা ফুঁকব। আবার এখানে ফিরে এলি?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—কলকাতায় বদলি হয়ে এলাম তো। আপাতত থাকার জায়গা নেই। তাই কিছুদিন এ-বাড়িতেই থাকব।

—ভালো। কচিদা মারা গেছে জানিস তো?

—কচিদা—

—ভুলে গেছিস? শ্যাম ধাপার আগে ত্রিকোণ পার্কে ব্যাক ভলি করে গোল। তুই সব ভুলে গেছিস তিমির।

—না। মাসীমা-মেসোমশাই কেমন আছেন?

—কেউ নেই।

—বড়দি?

—ভালো আছে। বুড়ো হয়ে গেছে। খুব বাতের ব্যথা। হাঁটতে-চলতে খুব কষ্ট হয়। চঃ—

—কোথায়?

—বাড়িতে চ।

নীলু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পাঞ্জাবির কলার তুলে দিল।

সেই একই বাড়ি, কিন্তু অনেকদিন রং হয়নি। দেওয়ালে শুকিয়ে যাওয়া শ্যাওলার কালো কালো ছোপ। বাড়ির ভিতরে এখনও শূন্য সব খাঁচা, যেখানে একদিন হরিণ, ময়ূর, কতরকম পাখি ছিল। তিমিরের মনে পড়ল, নীলুদের বাড়িতেই সে টেলিভিশনে প্রথম ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ দেখেছিল। পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন ছিলেন আসিফ ইকবাল। আসিফ ইকবালকে কী যে ভালো লাগত তার। কেন যে। আর বিশ্বনাথ। যেন একটা ধুমকেতু।

—তুই বিয়ে করিস নি?

—না। চারজন দিদির বিয়ে হল না। বিয়ে করা যায় বল? ছোড়াও বিয়ে করেনি। বোস। কী খাবি বল।

—এখন?

—সম্রাট মারাস না। গৃহস্থ বাড়ির একটা নিয়ম বলে কথা আছে।

—লুচি খাওয়াবি?

—লুচি খাবি? আর? কালো জিরের ফোড়ন দিয়ে আলুর তরকারি করতে বলি?

—হ্যাঁ। কে বানাবে?

—আছে বশু, রান্নার লোক আছে। এখনও মরা হাতি লাখ টাকা। তার আগে একটু খাবি নাকি?

—কী?

—লিমকা দিয়ে বাংলা—হেভি লাগে—অড্যাস নেই?

—তুই খাস?

—তুই খাস না?

—তাহলে বানা।

রামচন্দ্র মোদকের ছেলে নীলু বাড়িতে বসে লিমকা দিয়ে বাংলা খাচ্ছে, ভাবতেই পারে না তিমির। নীলুর ঠাকুমা চাট পারেননি বলে নীলুর মাঝেও কোনোদিন চাট পরতে দেওয়া হয়নি। নীলুরা কেউ প্রতিবাদ করেনি। সেই নীলু বাড়িতে বসেই লিমকা দিয়ে বাংলা খায়?

নীলু গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলে, 'চিয়ার্স'।

তিমির গ্লাসে চুমুক দেয়। সে বুঝতে পারে, নীলুর সঙ্গে বলার মতো কথা সে খুঁজে পাচ্ছে না। কী বলা যায় নীলুকে? কী কথা বলতে সে এখন ভালোবাসে?

—তোর দুটি ছেলেমেয়ে, না? নীলুই কথা বলে।

—হ্যাঁ।

—একদিন সূতপাকে দেখলাম ওদের নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। তুই আর লিথিস তিমির?

—না।

—কেন?

—হল না আর। তিমির হাসে।

—তুই তো ভালো লিখতিস।

—তুই কী করে জানলি? তুই তো কোনোদিন আমার লেখা পড়িসনি।

—না।

—তাহলে?

—শুনেছি।

—ওঃ। তিমির হো হো করে হেসে ওঠে।

—হাসহিস?

—সবার সব কিছু হয় না রে, নীলু।

—কেন বল তো?

—হয় না। স্রেফ হয় না। মোহনবাগানের খেলা দেখতে যাস?

—না।

—কেন?

—খেলা কি আর আগের মতো আছে? সব শালা, কেনন ঘসেটি বেগম হয়ে গেছে।

—ঘসেটি বেগম?

—ফালতু। খেলা-ফেলা সব ফালতু হয়ে গেছে। মাঠের সেই পরিবেশই আর নেই। তুই ভাব তিমির, একটা ম্যাচের দিন সকাল থেকে টিকিটের জন্য লাইন, র‍্যামপার্চে ভিড়—এসব ছাড়া খেলার মজা আছে? এখন সব শালা, গট আপ পেম। বড় বড় কোম্পানি কিনে নিচ্ছে ক্লাবগুলোকে। এর মধ্যে কে মোহনবাগান, কে ইস্টবেঙ্গল? কে ইগ্লিশমাছ, কে চিংড়িমাছ, বাগুয়া?

—আচ্ছা নীলু—

—কী?

—তোর সঙ্গে আমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন?

নীলু হেসে ওঠে।—তোর মনে আছে?

—হ্যাঁ। কেন নীলু? আমি কি কোনো অপরাধ করেছিলাম?

—না।

—তাহলে?

নীলু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ‘আমারও মনে নেই।’

—তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না নীলু?

—না। নীলু তিমিরের হাত চেপে ধরে।—আমার খুব ভয় করে।

—কেন?

—চার দিদির বিয়ে হল না। অন্য দাদাদের তো দেখলাম। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই সবাই আলাদা হয়ে গেল। আমার বিয়ে করতে ভয় করে। দিদিদের কে দেখবে বল?

—তাই বলে তুই—

—তিমির, শুনে রাখ, আমার বাবার নাম রামচন্দ্র মোদক। আমার ঠাকুমা চটি পরেনি বলে বাবা কখনও মাকে চটি পরতে দেয়নি। চিকিৎসার জন্য

হাজার হাজার টাকা খরচ করেছে। আমার বাবার নাম রামচন্দ্র মোদক।
আমি শালা, দিদিদের একা রেখে কোথাও যেতে পারব না।

—তুই তাহলে রোজ সন্ধ্যায় ঘড়িবাড়ির রকে বসে থাকবি?

—হ্যাঁ।

—একা একা? কেউ তো আসে না।

—তো কী?

—তুই রকে বসে কার সঙ্গে কথা বলবি?

—তোদের সঙ্গে।

—কী কথা বলিস?

—ওঠ, নীলুর গলায় একটা ধাতব শব্দ জেগে ওঠে।

—তার মানে?

—বাড়ি যা। নীলু উঠে দাঁড়ায়। তার চোখ ছির।—আমাকে খোরাক
করতে এসেছিস?

—নীলু—

—আমি শালা ঘড়িবাড়ির রকে বসে থাকব কি থাকব না, তাতে তোর
কী? তুই তো বসতে আসবি না।

—নীলু—

—সবাইকে আমার জ্ঞান হয়ে গেছে। আমার মাথায় টাক পড়লে জের
কী তিমির? নীলু হাসতে থাকে।—তুই তো আমার টাকে হাত বুলোতে
আসবি না। আসবি, বল? তোরা কেউ আসবি না, আমি জ্ঞানি।

তখনই তিমির দেখল, মাথার ওপর সিলিংয়ে মেঘ জন্মছে। নীলু পেখম
মেলছে। এই পেখম তার কাছে শুধু স্মৃতি—কেবলই বিস্মৃতির দিকে।

পাওয়া রসময়

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কুঁড়ি থেকে ছিঁড়ে না। এখন
ফুল-কে নিজের মত
ঠিকঠাক ফুটে উঠতে দাও।
না হলে পাথরে জাগে ক্ষয়,
গোড়া থেকে ছিঁড়ে নেওয়া মানে, তাকে পেয়ে যাওয়া নয়।

ফুলের নিবিড় ঝুঁতে
কীভাবে একটি কীট নীরবে ভিতরে যায়, দ্যাখো।
তার কোনও তাড়া নেই। আলোড়ন নেই।
এইভাবে যেতে যেতে
নরম, নিভৃত শয্যা একদিন পেয়ে যাবে ঠিক।
ফুলের বৃকের পরে
সে বসেছে শান্ত কাপালিক।

তার কাছে শিখে নাও পাঠ।
উপক্রমণিকা সেরে
মূল গ্রন্থে যেতে যদি বেলা হয়, হোক।
তুমি প্রতীক্ষায় থাকো। আসেনি সময়—
গোড়া থেকে ছিঁড়ে নেওয়া মানে, তাকে পেয়ে যাওয়া নয়।

অতিথি

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

আকাশের ভিতরে আকাশ, আকাশের উপরে আকাশ।
তার উপরে নক্ষত্রলোক। তারও উপরে পাখিটি উড়ে বেড়ায়।
ক্রমশ তার ডিম পাড়ার সময় আসে, চতুর্দিকে
নীল শূন্যতার মধ্যে সে ডিম পাড়ে।

ডিম নীচের দিকে পড়তে থাকে। পড়তে বহুকাল সময় লাগে।
ততদিনে ডিম ফুটে ছানা বের হয়। ছানাপাখি নীচের দিকে
পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ডানা গজায়। সে ভূমণ্ডল দেখতে পায়।

এত সবুজ নিমগ্ন মায়া মহাশূন্যের কোথাও সে পায়নি।
ডানা শুক হয়, পড়ার গতিবেগ বেড়ে যায়। অনন্ত নীলের
মধ্যে পড়তে পড়তে তার পালকশরীর নীল হয়ে আসে।
এক সময় সে ভূমি স্পর্শ করে। তার ভিতরে অমের জন্ম প্রার্থনা জেগে ওঠে।

কিন্তুকাল এই আশ্রয়হারা ভুবনে সে ওড়াউড়ি করে,
ছোটোছুটি করে। তারপর এক সময়ে তার মায়ের কথা
মনে পড়ে যায়। এই পৃথিবীর জন্য একটি নীল পালক
এবং দুটি পায়ের কিন্দু কিন্দু ছাপ রেখে দিয়ে মুখ উঁচু করে
আকাশে উঠে যায়। মায়ের দিকেই উড়তে থাকে।

যাই চলে যাই

পর্ণেশ বসু

ভালোই হল। চলে যেতাম। সেটাই স্বাভাবিক
সঙ্গে নিয়ে দরজা খোলা অবসরের দিন।
বইয়ের র্যাকে লাশের ছায়া স্বপ্নচুক রাত
রইল পড়ে ভগ্ন সিঁড়ি লিটল ম্যাগাজিন।

নষ্ট স্মৃতি ভ্রষ্ট স্মৃতি নুড়িপাথর সব
পেরেক ঠোকে চার দেয়ালে ফ্রেমের ভাঙা হাড়
মিহি সুরে হাসতে থাকে ইদুরে আরশোলা
রক্তঝরা চিতার শিখা শূন্য সারাৎসার।

কালবেলাতে মুখ ঢেকো না বর্ণমালা থাক
নোনা ঘামের স্বর্গদ্বারে পাখির ডানা ছাঁটা
চোখের কোণে হলদে পাতা বদলে গেছে কবে
ভালেই হল খাঁ খাঁ বালির অন্ধকারে হাঁটা।

যাই চলে যাই, একতারাটা মাতৃভাষার মতো
হারিয়ে গেছে বিশিভাবে বিশিষ্টর দিন
মঞ্চঝোড়া ডাইনোসরে ঝাপায় খোঁড়া রাত
যাই চলে যাই, ভয় সিঁড়ি, লিটল ম্যাগাজিন।

একুশ শতকের কবিতা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

ভালো বাসতে চাই—এই অনুস্রপ্ন নিয়ে এই গ্রহে
বেঁচে আছে, এরকম মানুষ ক্রমশ
বিরল প্রজাতি।

বাড়িয়ে ধরে না ছাতা অন্যের মাথায় রোদবৃষ্টিতে এখন,
গায়ে জড়িয়ে বর্ষাতি
দ্রুত পা চালায়, লক্ষ্য—
মৎস্যচক্ষু ভেদ, তাই
প্রতিদ্বন্দ্বী
সকলেই সকলের।

ভালোবাসা নয়, চাই ভালো বাসা। সমূহ দুঃখের
ভারে নুয়ে আছে কোন প্রতিবেশী
প্রতিবক্ষী শিশু
নিঃশর্ত কল্যাণ হয়ে সেটুকু দেখার
কেউ নেই আর।

ময়দানে কথার তুবড়ী, প্রতিশ্রুতি রেখে যায় ঠাড়,
 মুণ্ডহীন জনতার
 দুর্ভেদ্য প্রাচীর ফুলে ওঠে, ফুলে ওঠে;
 মুঠো করে হাত
 যৌথ স্বপ্নের দাবি তোলে।

মাতৃলা পেরিয়ে আসা সেরিনার কোলে
 হাড়গিলে শিশুর কান্না, চোখে মুখে
 ভন্ডনে মাছি;
 সংখ্যার হিসেবে তারও কিছু দাম, সভাভঙ্গে তারো
 ঘরে ফেরা, আঁচলে দশটা টাকা
 গান্ধীবাবার ছবি আঁকা।

ছুটছেন ঈশ্বরবাবু প্রায়শ্চন্দ্রে উড়িয়ে চারচাকা,
 ময়দান উপচে পড়া ভিড় দেখে সকলে অবাক।
 যে যার নিজের স্বপ্নে বঁদে হয়ে আছি।

ন্যাড়া ডালে ডেকে যায় অভিসন্ধিহীন
 ঝোড়ো কাক।

কুয়াশামঞ্চের দিকে

অনন্ত দাশ

কুয়াশামঞ্চের দিকে হাঁটি; কণ্ঠে পিপাসার গান।
 দু'পাশে জ্বলনরত মানুষের আঁঠু কোলাহল
 তাহলে কোথায় যাবো? কোনদিকে জলের সন্ধান?
 আকর্ষিত তৃষ্ণায় আমি পান করি দুঃখের গরল।

স্বপ্নচারা পুঁতে রেখে চেয়ে আছে দূর নভলোকে
 এদিকে সময় যায় অনাদর দুঃখে একটানা
 মায়ামুকুরের মত আর কেন একুশ শতকে
 মানুষের এত কাছে—তবু তার পেলে না ঠিকানা।

হয়তো স্বচ্ছতা নেই—জল ও বাতাসে তাই বিষ
 শ্বাস নিতে বড় কষ্ট; চতুর্দিকে সন্দেহের ফণা
 এত ঘৃণা অবিশ্বাস শুদ্ধবের এত ফিসফিস
 সামান্য সহিষ্ণুতায় দূরে যেতো সকল যন্ত্রণা

কাছে দেশ, দূরে দেশ, দেশ দূর অতীতের বুকে
 একমাত্র মানুষই বারবার দাঁড়িয়েছে রুখে।

কী দারুণ সহবাস

সত্য শুহ

ওগরা চালের ভাত, নালচে শাক, মৌরলা মাছের ঝোল
 নিছ গোহালের কালো গাইয়ের দুধ

পলিমাটির মতো বৌ—এর দরদে খরখর হাতে
 কলার পাতায় পরিবেশন

ছনে ছাওয়া চাটাইয়ের বেড়া-দেয়া ঝুঁড়েঘরের ঐশ্বর্য
 পায়ে হেঁটে ধানের ছড়ার পাশে পাশে শ্রী ছড়িয়ে এসে
 লক্ষ্মী যেন অচলা হয়ে বসেছেন নন্দীকাঁধায়

আর কী চাই, জিহ্বার জিরাফ হবাব ইচ্ছাই ছিলো না
 কী ঘন বর্ষা, কী শীত বা মাধার ঘাম পায়ে ঝরানো দিন
 শান্তি কাড়ে এমন সাধি ছিলো না কারো
 কাঠুরে ও গাছের মধ্যেও ছিলো একটা সুশোভন সামঞ্জস্যের আত্ম
 ধান এবং গান ছিলো সমার্থক
 আঙ্গান, উপাসা আর শংখধ্বনি মাখামাখি হয়ে
 সন্ধ্যা করতো, সকাল করতো
 আর জলে জলে স্নান করতো, কোলাকুলি হতো, জনে জনে

এত সুখ। চোখ টাটায়—মানুষই মানুষ খেয়ে বড় হয়
 সময়ের হাত থেকে অসময় কেড়ে নেয় সমস্ত সুখের চাবিকাঠি
 এবং তার ফলে

কুড়ে ঘরের চালে চালকুমড়ো দেখতে অভ্যস্ত আমার বৌ
 আকাশ আচড়ানো পড়শী-বাড়ির ডগায় দেখলো উন্মেষ ছাতার লুঠতরাজ
 ফাঁকফোকর দিয়ে জেনে ফেললো পুতুলপুতুল দেবদেবীর গেরস্থালি
 —শীত-আতপ নিয়ন্ত্রিত চবিশঘন্টাময় বিদ্যুৎ-উৎপন্ন রদূর
 আর সোনামুখের বায়নায় আমার ঘুম হোলো সংক্ষিপ্ত, পায়ে সর্ষে...
 জিরায় হতে চাইলো জিহ্বা এবং চোখ চড়কগাছ দিশাহারার
 সাক্ষাৎ পরিচয় হোলো ভুলভুলাইয়া বিজ্ঞাপন ও শব্দ শব্দ অসুখের সঙ্গে

তামাদি হয়ে গেছে খুব ভালো না-থাকার মধ্যেও থাকা আয়িক আরাম
 অবিশ্বাস আর ভালোবাসাহীনতায় দ্বন্দ্বিত দেশ-কালে
 এখন ভোগ নিয়ে ভোগান্তি আর চাহিদা ও যোগানের ক্রীতদাসত্ব
 জলে বিষ, বীজে বিষ মানুষে নেই মাটির রসগন্ধ
 এমন কি মর্মান্তিক দুঃখকেও যে গান করে তুলবো
 সে ভাষাও শুধু কৌটো বন্দী লেবেল অটো মশলা—শব্দ ধাতু অব্যয়
 আশ্রয়হীনতা আর অর্থহীনতার দিকে ধাবমান বাক্য ও জীবন
 সুখে আছি, আপন মনে—তা সুখেই তো আছি

মৃত আমার সঙ্গে জীবন্ত আমার কী দারুণ সহবাস।

সূর্যদেব

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

সূর্যদেব ডুবছেন, তাঁর স্বর্গীয় ফসলে শেষ লালমাত্রা পড়েছে
 চঞ্চল রোসের দিন চলে যাচ্ছে স্মৃতির ভেতর।

যাঁরা বেরিয়েছিলেন কোনো ওভারব্রিজ পেরিয়ে কোথাও
 পৌছে, যেতে, প্রত্যেকেই ইহল্লক্ষে ভাববেন এবার
 রণ-পা-ও কি ভেঙে পড়ে? তারপর ইতিহাস মারে।

রক্ত থেকে পেল না কেউই
 পদ্ম কিংবা নবাসের স্বত্ব

অথচ চিন্তা ছিল লক্ষ্যভেদী, প্রাণ হাত করে
গিয়েওছিলেন নিরম্পাড়ায়, তবুে ছিল তুমুল জোয়ার

তবু ফুল হল? লক্ষ মানুষের দিন
রয়ে গেল লাবণ্যহারানো সেই নষ্ট পৃথিবীতে?

সূর্যদেব ডুবছেন, নেই সঁচিছুপ প্রত্যহ যেখানে এসে
দর্শনার্থী বিস্ময়ে তাকাবে...

নিতান্ত ভবিতব্য

গুড বসু

শব্দা সংস্কারহীন খুঁকিদের যৌন দাপটের
ভয়ে স্রিয়মান যত অপহৃত পুরুষের ম্লান মানিভারে—
আকাশের মুখ লাল হয়ে উঠলে আমরা জন্মশ
বৃক্ষেতে পারি যে, ত্রিকাল জুড়েই মুখিয়ে রয়েছে হাহা গ্রাসমেলা রাত্রি,
তবুও তখনো অস্তিত্বের আশির নথরে জ্বল
রূপান্তরের স্বপ্ন জাগিয়ে কোন কৌতুকে মাতে?

সেই স্বপ্নের দিকে আমাদের চলার প্রয়াস আশৈশব যে?
তাই, প্রত্যেক বাঁকে বারবার যখন প্রবল মারের দাপট
তখনো বকুল গন্ধে হঠাৎ নিজে থেকে চেনার আশ্বাস জাগে,
মনে হয় কিছু রয়ে যায় তবু নিত্য প্রহারে প্রবলনায়
সেটুকু মাত্র পাথের' তবুও এগিয়ে চলার এ কেমন ষোর।
এত ক্ষয় এত বন্ধনাতোও বুঝি যে সেই শেষ লগ্নের দিকে
অনিবার্যত এগিয়ে চলার নিষ্ঠা এখনো প্রাসঙ্গিক যে।
এটুকু নিত্য জন্ম, তাই সেই মূল ভরসায়
আমাদের এই পালিখানির নিত্যনূতন নোঙরের খোঁজে
যাওয়া যে নিয়তি, সেই জানাটুকুই চূড়ান্ত ভবিতব্য।

সুপারমার্কেটের কবিতা

রশ্মিঃ দাশ

একটা বিরাট সবজি-ফ্রেজের মাঝখানে দেখি
মাইকেল জ্যাকসন দাঁড়িয়ে আছে—কাকতাড়িয়া হয়ে
মালতীপুর গ্রামের সীমানায়। দুটি আড়াআড়ি বাঁশ
আর হাঁড়ি দিয়ে তৈরি সেই মাইকেল জ্যাকসনের
নাচের পোষাক নির্ভুল, তার হাঁড়িমুখ নির্ভুল, তার
মাথার টুপি নির্ভুল। শেষ বিকেলের ঝুল মেঠো
বিষমতা চতুর্দিকে। চাষীর ছেলের টেপরেকর্ডার
বাজছে আলোর ওপর। অঙ্ককার নামছে গ্রামের
বাঁশঝাড় বেয়ে, আর লঠন-ছালানো ঘরের
জানালায় দাঁড়িয়ে ঠোটে লিপস্টিক মাখছে
চাষীর ছেলের বউ। সন্ধ্যাতারার আলোয়, খুব
আস্তে, নাচের তালে নড়ে উঠছে মাইকেল জ্যাকসনের
মাথার কালো টুপি।

একটি কবিতার ইতিকথা

তুলসী মুখোপাধ্যায়

এক বন্দিত কবির টেবিল থেকে এক নন্দিত কবিতা

এক নিশ্চিতি রাস্তিরে

খুব চুপচাপ বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত রাস্তায় নীরবে দাঁড়ালো :

এবং নিজের নাম ধাম পোশাক আশাক হুঁড়ে ফেলে

একেবারে পুরোপুরি নাগা সম্যাসী।

অতঃপর বাতাস কাঁপানো এক চণ্ডাল চিৎকারে বলে উঠলো—

আমি আর কারুর কলমের ক্রীতদাস নই

আমি আর শোখিন কাগজের কারাবন্দী নই।

এখন আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন—

যা ইচ্ছে তাই করব—যেখানে খুশি দাপিয়ে বেড়াবো...

এই স্বগত বিস্ফোরণের কিছুক্ষণ পরেই
 সে একটা ফুলের দোকানে ঢুকে বলতে থাকলো—
 যাও বাছারা, যে যার মায়ের কোলে ফিরে চলে যাও।
 তারপর হঠাৎ সে ফুটপাথ সংসারে গিয়ে ঘোষণা করলো—
 চোখের লবনে কোনো পাথরের শুদাম গলে না,
 অর্জুনকে ডেকে এনে গাশীবের মস্ত্রে দীক্ষা নাও।
 অস্ত্র পর খুব দ্রুত সে পৌছে গেল মন্ত্রীদেব গোপন শুহায় :
 মাকড়সার ছাল ছিঁড়ে বাইরের বাতাসে এসে
 অস্ত্রত একবার রবীন্দ্রচনাবলী কপালে ঠেকান—
 বলেই সটাস সে হানা দিল লালবাজারের লীলাময় ঠেকে;
 ছোর করে হোমড়া-চোমড়াদের চমকদার উর্দি খুলে নিয়ে
 বহু হুকারে সে আদেশ করল—
 এক্ষুণি দূর কোনো গ্রামে গিয়ে ধান চাষ করো।

লালবাজারের ছন্দোড়ের পর
 সেই উন্মাদ কবিতার আর কোনো হৃদিশ মেলেনি।

একা

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

আমার প্রাণের বহু একা বড় একলা হয়ে গেছে
 তার রোগশয্যা ছুঁয়ে নাগকেশরের ডাল
 একটু দূরে শ্বাস ফেলছে সেগুনের ফুল
 ভাৱাক্রান্ত স্নেহ একেবারে মশারির কাছে
 কদিন থেকেই ভাবছি ওকে দেখতে যাব
 তার চোখের সামনে পাণ্টে যাচ্ছে যোগিনী খোয়াই
 সকাল বিকেল দোপাটি ও রঙ্গনের মেলা
 এসময়ে তার মুখোমুখি হওয়া অন্য এক থেলাপারাপার
 আমি কোনোদিন তাকে বিষন্ন দেখিনি
 তালপাতার পাখা নেড়ে যে নিজে দুঃখ উড়িয়েছে
 ডাক শুনে যে বলে দিতে পারে
 কোন পাখি বিরহকাতর, কার কণ্ঠে আনন্দিত আলো
 সেই একা, শয্যাবন্দী, আচ্ছ বড় একলা হয়ে গেছে
 তাকে সঙ্গ দিতে চতুর্দিক ঢেকে অনিবার্ণ শ্রাবণ নেমেছে।

তিনটি কবিতা

সুশান্ত বসু

তুমি নাচো

আড়াল সুতোর টানে তোমাকে নাচানো

তুমি নাচো।

কথাসরিতের যতো নিবিদ-পূরীষে আমি

ঢেকে দেব তোমাদের হিসেবী বিবেক

তুমি নাচো।

তোমার স্মিকালিপি প্রতিদিনই অপূর্ব আশরে

যা রচা সে আমারই রচনা।

বৃহন্নলার পালা এবার লিখেছি আমি

জলের পুরাণে।

তুমি নাচো আড়াল-সুতোর খর টানে।

বাস্তব

বাস্তবের চৌহদ্দি জুড়ে ঘিরে থাকে আধর্বাণ শব্দের নিদুটি

চৌরপক্ষাশিকার গানে মেতে-ওঠা হিরন্ময় ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী

বলে, 'ওরে মেখে নে রে আত্মরতিমগ্নীর ফাগ!'

সন্তানের দুখে ভাতে মাছি পড়ে, তবু তার ভিতরে ভিতরে

বহুতল মিনারের চূড়ো থেকে সুখপাখি গোয়ে ওঠে গান

'সিকতাসাগরে ভাসা যা রে কাগজের নৌকো যা।'

প্রতিষ্ঠান

মহীনের বোড়াগুলি ঘাস খায় আমাদের

কলরব মুখরিত নিওলিথ-স্তম্ভতার সুখের প্রান্তরে

হাঁটি হাঁটি পায়ে পায়ে মেকলের সেই সব সুখী

সন্তানেরা

খুঁটে খায় স্বপ্নবীজ বাঁজা ওই অস্বাণের মাঠে।

সংশয়

দীপেন রায়

কমতা কিন্তু কমতাকে খায়। বিস্তীর্ণ পথের
 অন্ধকার আকাট মুখের মতো—জোনাকীকে গিলে।
 খুণীর হাতে থাকে খুন আর রক্ত
 চাষী-মজুরের হাতে থাকে শ্রম।
 জীবন ও জীবিকায় মানুষও বাঘের দৌড়ে
 উঠে আসে নুন শুদ্ধ বাস্তবের ছবি।
 কতটা তোমার আর কতটা-বা-তুমি
 গৃহস্থালি সংবাদের শিরোনাম হও
 প্রত্যহ দৈনিকে রৌদ্র ও বৃষ্টির ভিতর।
 যেখানে যেমন থাকো—তোমাকে টানবে
 ভেসে বেড়ানো বয়স্ক যন্ত্রণা...
 আমাকে দাও—না, কিছু-না, অসহ্য এই জ্বালা
 শরীর জুড়ে বিস্তারে,—ঢেউ ওঠে ঢেউ ভাঙে।
 উপশম কোথাও নেই, ব্যর্থতার উনুন
 ভোরে জ্বালিয়ে কামাই নেই রাতে—
 হিলে দাঁত নখ খুঁটছে মানুষ ষাওয়া বাঘ
 এ কোন বন, মনে উঠছে অরণ্য-সংশয়।

সুন্দর

সুরজিৎ ঘোষ

সুন্দর বলে নতুন কিছুই নেই
 যা রয়েছে তার সবই তো তোমার চেনা
 খুঁজে নিতে যত দেরি হবে এইখানে
 তত বেড়ে যাবে বসে থাকবার দেনা।

কুড়ি বছরের সুন্দর মেয়েটিও
 পনেরো বছর প্রতীক্ষা পার করে
 আজকে এসেছে তোমাকে দেখবে বলে
 এসো, ভালো করে নিত্রে যাও হাত ধরে।

দেখবে তোমার একলা ঘরের আলো
 কী রকম জ্বলে ধূসর পঞ্চাশেও
 পঁয়ত্রিশ আর কুড়িতে কী যায় আসে।
 সবই সুন্দর তুমি ভালোবাসলেই।

কর্ণ

ব্রত চক্রবর্তী

মাঝে মাঝে তোমার কথা ভাবি।
 তোমার রথের চাকা বসে যাবার পরও
 অত্ননিক্ষেপ বন্ধ করেনি কেউ।
 সূর্যেরও রথের চাকা বসে যায় মেবে,
 হাওয়া শোরগোল তোলে,
 অবরোধ তুলে নেয় মেঘ।
 কিন্তু তোমাকে ঘিরে ঘিরে অন্যায় শরনিক্ষেপ
 যখন বধ করা হচ্ছিল,
 কোনও প্রতিবাদ ওঠেনি।
 শোরগোল তোলেনি কেউ।
 খুব শিশুও শুনেছে তোমার কবচকুণ্ডল
 কেড়ে নেবার ঘটনা,
 একটি অন্যায় মৃত্যু কলঙ্কের কালি
 মেখে ইতিহাস;

কর্ণ, আমি মাঝে মাঝে তোমার কথা ভাবি।
 কষ্ট হয়।

আমারও রথের চাকা বসে যায় কখনও কোথাও,
 ঠেলে তুলতে যাই যখন,
 চতুর্দিকে শর;

তখন তোমার কথা মনে পড়ে যায়।
 সূতপুত্র, তুমি ছেনেছিল, আমিও ছেনেছি,
 দুজনের কারুরই সারথি
 ক্ষনাদর্শন নয়, ক্ষেদ।
 কিন্তু ব্যাসদেব জ্ঞানেন, দুজনেই
 যুদ্ধ ছেড়ে পালাইনি কখনও!

প্রিয়কবির প্রতি

অমিতাভ গুপ্ত

প্রতিনিমেষের প্রতি অপূর্বে
 আমাদের জয়পতাকা উড়বে
 কী অনিশ্চয় কোন্ অক্ষরের
 শৃঙ্খলে বাধা—তাকে ভেঙে ফেলে

বুকের উপর আশুনুকে ছেলে
 আশুনের পাখা মহাকাশে মেলে
 আমাদের সাথে তোমরাও এলে
 অস্তগোধূলিবর্ণাভ পূর্বের

উষার আবেগে স্পন্দিত প্রাণে কোরকের গৌরবে

২

হয়তো—বা এই চিরায়তন পূর্ণাবশেষের
 মতন তীব্রগভীর অনিশেষে
 সূর্য হয়ে, ভেসে
 চলেছি। আজ পূর্ণমিলন জ্যামুস্ত স্বদেশে

কে দেবে এই ধনুকে টকার? ঘণার লোভের ঈর্ষার উদ্দেশে
 চরম আঘাত কোন্ কবিতায়? কার?

সেই শব্দ

জিয়াদ আলী

প্রকৃত যুদ্ধের জন্য কতো জন্ম লাগতে পারে ঠিক ঠিক আমিও জানি না।

বুকের মধ্যে যদি নদী থাকে খেলে যাবে ঢেউ
স্বপ্নের পাখিরা পারে মেখে নিতে নীলিমার নীল।

নবনীতা, তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে গেছ।

যে-সব শব্দের জন্য প্রতিদিন ভোরবেলা ঝাঁটপাট দিয়ে রাখতে
বুকের ভিতর

তারা সব মরে গেছে?

মানুষের উচ্চারণ এভাবে মরে না।

শব্দকে শুশ্রূষা দিলে তার মধ্যে বেঁচে ওঠে শুদ্ধ জাগরণ।

মানুষের বেড়ে ওঠা এক-আধ জন্মের খেলা নয়।

বর্ষার দিনে

আনন্দ ঘোষ হাজরা

প্রভাতেই মেঘাভ্রমর দেখে বলেছিলে, 'সারাদিন

ভালো যাবে দেখো; অফুরাণ রোদ্দুরে—

শীতের আমেজ থাকবেই আর আমাদের উৎসব

উচ্ছল হয়ে উঠবেই জেনো।' এই আনন্দে পথে

বের হয়ে দেখি বেলা বাড়ে আর ঝড়ের দমক বাড়ে

মেঘগর্জন অবিরল আর বিদ্যুৎ-সম্ভাব

ঘন ঘন হয় অন্ধকারের ভয়াল মায়াবী কালো

ধীরে ধীরে বাড়ে, উৎসব-সঙ্গীরা

বন্ধন ছিড়ে চলে যায় আর আমি ভিজি নির্জনে।

কাঁপি আর ভয়ে চেয়ে দেখি যদি অরুণ কিরণ লেখা

যদি বা কখনও দেখা যায়। জানি এ আশা কেবল ব্রহ্মের

দর্শন পাওয়া, আর কিছু নয়। তবু বার বার ভিজছি।

হাত

পার্ব রাহা

আমার হাত

কখনো আকাশের দিকে মাথা তুলে

পাখিদের ডানার জলের শব্দে

ফোঁটায় ফোঁটায়

আমার হাত

কখনো আবার মাথা নিচু করে

পাথর সরায়

টেনে টেনে নিশ্বাস নেয়

হাঁপায়

নিশ্বাস নেয়

আবার পাথর সরায় হাঁপায় পাথর সরায়

কিন্তু যখন

যখন শুধু আঁতুল একটা আঁতুল

তাকিয়ে শত্রুর দিকে

ধাবা আর নখ

ভিজে জ্বিল আর ছোট চোখ

আমার হাত

তখন ভুল করে না

জলের ফোঁটা করে না

টেনে টেনে নিশ্বাস নেয় না

আলো নয়, অন্ধকার নয়

শুধু শত্রুর মুখ

চোখ

জ্বিল আর নখ

শুধু একটি আঁতুল নির্ভুল অঁতুল চোখ

আমার হাত।।

রোগশয্যার কবিতা

উপাসক কর্মকার

ইচ্ছে ছিল আড়াল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই সাতমহল
ইচ্ছে ছিল আড়াল ভেঙে সরিয়ে দিই চার দেয়াল

ইচ্ছে ছিল আড়াল করে চালিয়ে দিই হাতল
ইচ্ছে ছিল আড়াল করে ঘুরিয়ে দিই ছোয়াল

স্বপ্নের ভিতরে

সুজ্জিত সরকার

স্বপ্নের ভিতরে বাবা আমাকে ডাকলেন, হাত
বুলিয়ে দিলেন গায়ে-মুখে,
বললেন : অনেকদিন পুণীতে যাইনি—
তোর কলেজের ছুটি পড়ুক, আবার আমরা যাবো।

ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসি—বহুদিন হ'ল বাবা নেই।

মৃত সব প্রিয়জন স্বপ্নের ভিতরে আজও ভীষণ জীবিত।

মেঘ-দুপুরের সনেট

স্বজুরেশ্ চক্রবর্তী

ছড়ানো আকাশ থেকে মেঘ-দুপুরের ভীষণ ভাষা!
স্মৃতি-তাড়িতের দেশ—দূরতর প্রাচীন কুয়াশা—
তারও পরে রাজধানী, বৃক্ষরোপণকালে ধৃত
কয়েকটি মুহূর্ত শুধু বেঁচে থাকে, অথচ অতীতও
তেমন আশ্চর্য কিছু দূরে নয়—এই মায়াজালে
যে জানে অমৃতের স্বাদ, চেতনায় বিষ সে-ই তালে,
সে-ই জানে অধিকার, শিবিরে শিবিরে ডেদাভেদ—
এ মহা বিশ্বয়ভার তারই সজ্জা—তারই তো নির্বেদ।

তারই তো বিপন্ন প্রেম—ঘরবাড়ি—স্মৃতির ঠাডার—
তারই তো সংগ্রাম, তবু স্মৃতিভেদে মূর্ত নিরাকার
শোক তাকে ঢেকে দেয়, শোকই তাকে করে সামাজিক—
একক মুক্তির মোহ—ভাঙে তার পুরনো আঙ্গিক।

ভাঙে স্বশাসন, ভাঙে—ভাঙে অশ্রু, পরবাস....সবই,
নির্বৈদ-আসন ভাঙে মেঘ-দুপুরের জলছবি।

নানুর

অজিত বাইরী

কোনো মুখই আমি শনাক্ত
করতে পারছি না।
খুন করার পর এমন ভাবে বিকৃত
করে দেওয়া হয়েছে, যাতে কাউকেই
নির্দিষ্ট করা না যায়।
আমি কখনো নিহতের পরিচয়
অবলুপ্তির জন্য এমন পাশবিক
নৃশংসতার নিদর্শন দেখিনি।
আমার কলম এখন বোবা, নির্ধর—
প্রকৃতপক্ষে তার মুখের কালি শুকিয়ে গেছে
যেমন ভাবে জমাট বেঁধে আছে
নিহতদের মুখ, কান, নাক দিয়ে
গড়িয়ে পড়া রক্ত।
আমার কলমের নিচে শাদা পাতা নয়;
শুয়ে আছে এগারোটি ক্ষেতমজুরের লাশ।

অপেক্ষা

সৌতম ঘোষদস্তিদার

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় তুমি হৃদয়ের কথা লিখবে
 এতটা ভাবা বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যায়
 কেননা তুমি এতদিনে সুনিশ্চিতভাবেই
 ছুঁলে গেছ সেইসব রাত্ৰিকালীন লেখালিখি
 অনেক সময়ই যা কুচিকুচি করে তুমি
 উড়িয়ে দিতে বাসের ছানলা দিয়ে
 একেবারে ভবিতব্যের দিকে হাসি-মুখে
 যেদিন কোনওক্রমে ওড়ানো হত না
 সেদিন দু-ভাঁজ চার-ভাঁজ করা লেখা
 বুক থেকে বের করে ফুলোমনে
 ফেলে রাখতে ফ্রিজের উপর টিভির উপর
 বইয়ের পাতায় কিংবা শাড়ির ভাঁজে
 লেখা প্রকাশ্যে নাম ধরে ডাকতে পারত না তোমাকে
 একা-একা উড়ে যেতে পারত না রাস্তায়
 ফলে তার কিছুটা নিত শালিখ-চড়ুই
 বাকিটা পড়ে ফেলত অন্য লোকে
 তোমার চোখ ভাল নয় বেশ খারাপ
 তবু কী করে অত দ্রুত ওই আবছায়ায়
 পড়ে ফেলতে পাতার-পর-পাতা
 একবারও পলক না-ফেলে
 তা আমি আঙ্গু বৃষতে পারিনি
 কী লেখা ছিল সেইসব কাতর পৃষ্ঠায়
 আঙ্গু আর তা তোমাকে জিজ্ঞেস করার
 সত্যিই কোনও মানে হয় না
 তবু মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ করে
 বানান ফুল করিনি কি আমি কখনও
 আফ্রোশে লিখিনি কি অন্তত একদিন
 চুম্বনে ঠোট ছিঁড়ে নেওয়ার কথা

তুমি জানো সে-সব বাস্তবে ঘটেনি কখনও
 কথা তা নয় কথা হল
 দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটি তুমি একদিন লিখবেই
 এই বিশ্বাসে আমি এখনও
 জলের নিচে রাত ছেগে আছি।

ফুল

বিশ্বজিৎ রায়

তারপাশে রাখো কিছু ফুল
 আর নীরবতা,
 তোমাদের মাঝে যত ভুল
 থাক সেই কথা।
 মেঘ আজ নীচ হয়ে দূরে
 ছুঁয়ে যায় জল—
 হারানো দিনের সাথে ঘুরে
 তার কথা বল।
 তুমি পারো আজও পারো ছুঁয়ে যেতে
 মলিন চিবুক,
 আজ নেই ভুল বোঝাবুঝি
 পৃথিবী দেখুক।।

অবিকল্প

শান্তি সিংহ

১

একটানা কাজের শেষে
 গুনগুনিয়ে ওঠে—
 ভাষা, না ধর্ম?

২

প্রেমের জোয়ারে
কে বেশি সহায়—
ভাষা, না ধর্ম?

৩

ষিদের ছালায়
কোনটি জোরালো—
ভাষা, না ধর্ম?

৪

অসহ্য যন্ত্রণায়
কে বেশি সরব—
ভাষা, না ধর্ম?

৫

নবজাতকের মুখে
প্রথম স্বাগে—
ভাষা, না ধর্ম?

৬

জীবন-ফুরানোর আগে
মুখে ফোটে—
ভাষা, না ধর্ম?

দোষ

নির্মল হালদার

যেদিকে জানলা
সেদিকে তুমি নেই
যেদিকে দরজা
সেদিকে তুমি নেই

ভুলেই গেছলাম, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছো।
 চলে গেছো, কতোদূর চলে গেছো
 আমাকে বলে যাওনি।

ঘরের ছাদে একটা টব আছে, যতোবার গাছ লাগাই
 বেড়ে ওড়ে না।
 দু'একবার ফুল এসেছে, ম'রেও গেছে তারপর
 কিন্তু টবটাকে ফেলে দিইনি
 মাটিটুকু নিয়ে প'ড়ে আছে ছাদে।
 টবটার গায়ে হাত রাখি, মাটির দিকে চেয়ে থাকি
 মাটির কী দোষ আছে কোথাও
 নাকি আমারই দোষে জান্‌লায় কেউ নেই
 দরজায় কেউ নেই

থাকার সুখ নিঙড়ে নিই

রাণা চট্টোপাধ্যায়

একদিন আমি থাকবো না তোমরা থাকবে
 পদ্মপাতায় বৃষ্টির ফোঁটা রামধনুর কথা বলবে
 মীনদের
 মীন নারীদের সলজ্জ চাহনী বাতাসকে
 উদাস করবে
 তবু আমি কেন যে থাকবো না!

একজন আমাকে বলেছিল—এ্যাতো মৃত্যুর কথা
 আমি ঈশ্বরের কথাও তো ভাবতে পারি
 আমি তো বিপ্লবের কথা ভাবতে পারি
 আমি তখন দেশজুড়ে দেখি হয়নার হাসি
 শইলকের চোখ
 ভোরের লাল আকাশটাকে ক্রমশ ঢাকছে
 এসময় মৃত্যুর কথা ছাড়া কিই বা ভাববো?

তাকে কিছু বলিনি হাসিও নি তার কথায়
 কেবল তাকিয়ে ছিলাম ত্রৈতাযুগের মানুষের মতো
 আর দেখে ছিলাম ঘুলঘুলির পাশে
 বোধবুদ্ধিহীন ধূসর টিকটিকি
 মৃত্যুভয়ে ভীত অচেতন বড়ো পোকাটিকে
 দংশন করছে।

বড় পোকাটি জন্মের কথা জানে না
 মৃত্যুর কথাও ভাবে না
 বিপ্লব নিয়ে তাদের কোনো উদ্বেগ নেই
 তবু যেতে হয় অনন্ত মৃত্যুর দেশে।
 আমি সব ভাবি ভালোমানুষ আর শয়তান
 একই রঙের জামা পরে বসে থাকে
 আমি তাদের দেখে-দেখে থাকার সুখ
 নিঃসঙ্গে নিই
 আর খুব মৃদু স্বরে নিজেদের শোনাই
 কেন যে থাকবো না!

কবিতার পাঁচ

প্রতিমা রায়

আলপথে সবুজ জ্বলায়
 ঘোঁয়াটে ফেনার মতো ফুটন্ত হাঁড়িতে
 সময়ের বিচিত্র ঘড়ি ঝরে পড়ে তামাটে মরচে হয়ে,
 এ যেমনো এলানো এক বিশ্বের পাপড়ি
 জ্বিল দিয়ে চেটে সব রস একে একে খসিয়ে ফেলে
 ছিবড়ের মতো,

কিছুতেই কিছু না
 এই দেখা না দেখা বোঝা না বোঝার ভৌতিক উল্লাসে
 যদি না কবির থাকতো মাথার গুণ্ণগোল
 বেঁচে থাকা শুধু দুই আর দুইয়ে পাঁচে।

বিড়াল বিকেল

বিশ্বনাথ কয়াল

রোজদিন নদী ও আকাশ মিশে গেলে
সকাল ও শালিখ আসে,
রোজদিন দুনিয়া দুপুর দাপিয়ে
জানালায় কার্নিশে শুয়ে থাকে বিড়াল বিকেল।

হাঙ্গার মাইল চাকাগুলো পাক খেয়ে
স্টেশন শুনে শুনে ফিরে আসা,
তালগাছ, মাটি ও পাথর শেষে কারশেড,
রাতের শহর জানুজুজ্বা জুড়ে বন্দর নিখরতা।

পথে নেমেছিলাম প্রান্তরে পলাশ বাতাস,
জনারণ্যে নিখোঁজ ছিলাম বন্ধুসঙ্গ শ্বাস,
হাঙ্গার ছবি নিয়ে আকাশ বিকেল,
প্রতিদিন শুড়ি মেরে শুয়ে থাকে একক বিড়াল।

৫

তারপরের কাহিনী

কাজল চক্রবর্তী

অনন্ত ফুলের ওপরে বসেছিল শব্দ
তাকে এনে বসলাম হৃন্দের দাঁড়ে
দিগন্তে ভয়ানক চৌচামেচি, কর্কশ বহুপাত
হৃন্দের বন্দীত্ব নয়, মঞ্চ ভেঙে পড়ল সিয়াটেল-এ
তপ্তবালির বুকে ফুটে ওঠা মুড়ি ধামা থেকে এক প্লাস্টিক প্যাকেটে
যে প্লাস্টিকে আজকাল ভরা থাকে রক্ত, ওষুধ, জন্মনিরোধক-ও
বসন্তের কোকিলের পেটেন্ট নিয়ে প্যাঁজ-পয়জারের দোলাচলে
অনন্ত ফুলটি এখন মুক্ত বাজারী হাওয়ায় দুলছে...

মানুষের শ্রম বর্ষার রোদের মত আছড়ে পড়ছে সন্ধ্যাসীতের অন্তরায়
 নবীন মাংসের ভেতরে জেগে উঠছে সবুজ—
 অথচ রক্তের রঙ লাল, উষার রঙ লাল, বিদায়ী সূর্যের-ও।
 হৃদয় শস্যের সিন্দুক ডুবে যাচ্ছে সন্দেরের নোনাছলে
 কেউ বলছে স্বাদের বদল, কেউ বা ক্ষমতার...

আমি কিছুতেই

অনন্ত কৃষ্ণটির ওপরে শব্দটাকে পুনরায় বসাতে পারছি না।

এজলাস

পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত

সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হবার আগে আর একটু মদ দাও,
 রূপরূপ শব্দের পালক, গণ্যমান্য, যদি আসে!

অলৌকিক, অপদেবতার মিনারে প্রতিপক্ষ আমি।
 এই এজলাসে মতোভেদ আছে ডানার নীচে জড়ো।

তাই ভিটে উচ্ছ্বসে গেলেও রোদ ওঠে, বৃষ্টিও আসে।

না, কেন

নাসের হোসেন

জল পড়ছে, টুপটুপ, গড়িয়ে যাচ্ছে, পাশেই গাছ, গাছের
 পাতা নুয়ে দৃষ্টিহীনের মতো কিছু খুঁজে যাচ্ছে, বাতাস কি একটু বেশিই
 বইছে, বাঁধানো ইটের অল্প উঁচু বাগান রয়েছে টিউবওয়েলের
 ঠিক গায়ে গায়ে, সবুজ বকঝকে ঘাস মৃদু দুলাচ্ছে, সমস্ত দিক
 কীরকম ভিজে ভিজে, মাটির সোঁদা গন্ধ, সোয়েলের ডাক শোনা
 গেল একবার, তারপর পালকের স্মৃতিগন্ধ ছাড়া আর কিছু
 অবশিষ্ট থাকে না, জলের প্রতিশব্দ কি জীবন হতেই হবে
 জীবনাতীত কেন হবে না, কেন মৃত্যু নয়, মৃত্যুর গহন

ডানার নীচেই আমাদের বেঁচে থাকা, ফাঁকা লাগছে সবকিছু ভালোবাসা বলে যদি কিছু থাকে তবে তার দুকুহ উত্থান সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলতে পারবো না, তুমি কি আমার কাছে যাবে আমি কি তোমার কাছে যাবো, এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক, তারপরেই অন্ধ কুখ্যা।।

শুভদের বাড়ি

নীরদ রায়

শুভদের বাড়ি আর বাড়ির সামনেরটা কেমন না—

বারো মাস শীত শীত ভাব, বাড়ির লাগোয়া গাছপালাগুলি,
শনিমন্দিরের পেছনটা টানা চারপাঁচমাস ভোগে সর্দিকাশিতে,
কে. জি স্কুলের ফুটফুটে শিশুরা যাদের চিংকার চোঁচামেটিকে
রাস্তাঘাট, রাস্তা বেঁধা বারান্দা, পুরসভার পার্ক,
বারবার চমকে ওঠে আর তাকায় পেছনে—

তারাত সেই বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়

কেমন যেন বোবা হয়ে যায়,

দশ বছর ধরে সেথে আসছি বাড়িটার কপালের ভাঁজ, গম্ভীর মুখ,
জ্ঞানালগুণির পর্দায় শোকের ছায়া লেগে আছে তো আছেই—

কৃতদ্রুত পৃথিবীর কতকিছু বদলে যাচ্ছে—

এসব কোনো কিছুই যেন স্পর্শ করে না শুভদের বাড়ি, বাড়ির
সামনেরটাকে

মানুষ নয় ছাদে ও বারান্দায় মেলে দেয়া রঙীন শাড়ি, জামাকাপড়
দিনমান কথা বলে ছোড়ে ছোড়ে—

যেসব মেলামেশা ব্যবহার বাড়িতে বোবা হয়ে থাকে—

তারাই আবার রোববারের বিকেলে পার্কের সামনে

আইসক্রীম খায়, কখনো চিংকার করে কবিতাও পড়ে—

কি অদ্ভুত না—

রতি

সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্ধ অঙ্গ নারী তার, পরার্ধ ঈশ্বরী।
পুরুষবিহীন ঘরে অন্ধ কবুতরী
হারেম-খোজার কাঁধে বসে থাকে রাতে।
সে আসে, সে টের পায়—তুলে নেয় হাতে।

অর্ধ অঙ্গ সুরা তার, অর্ধ নেশাধীনা
বরফকুটির মতো। রবাব, না বীণা
বেজে ওঠে একাকিনী শরীরে শরীরে।
পুরুষবিহীন ঘরে কাম নামে। ধীরে।

অর্ধ অঙ্গ নাও তার, অর্ধ তাকে দিয়ে।
দু'চোখ অন্ধতে জ্বলে, কটাক্ষে তৃতীয়।
সে-কটাক্ষ কার দিকে, দর্পণও বোঝে না—
পুরুষবিহীন ঘরে স্বশরীর চেনা।

অর্ধ অঙ্গ আমি তার, অর্ধে সে আমার—
তাকে চাটি, খাই, গিলি। সে তোলে উদ্‌গার।
শ্রেণী-চক্ষু ঝলসায় ঘৃণা, ভয়, রাগে :
ভামপুরুষের ঘরে একা রতি জ্বলে।

দুখু মিঞা

শতরূপা সান্যাল

শেখাও আমায় আশুন স্বরলিপি
ছবির জলায় বৃদ্ধ প্যাচার ঘাড়ে
সাঁওলা শুধে ম্যাগেজিনের তারে
বইয়ে দেব পাগল মিসিসিপি

শেখাও ধু ধু শ্বেত করবীর ডালে
ভরিয়ে দিতে আনন্দ সম্ভ্রীতির
রক্তকুসুম সীমন্তিনী সিঁথি
বুকের পাঁজর কেমন করে ছালে!

শেখাও আমায় সাম্যবাদীর পাঠ
লেটোর দলের নবীন কবিয়ালী
ঘর ছাড়ানো ঝড়ের খ্যাপা তালি
রাঙাধুলোর স্বরাজ্যে সম্রাট।

দক্ষিণ-দুয়ার

জয়ন্তী রায়

দুই হাত বাঁধা ছিল
তোমাকে পারিনি বলতে
তখনী সংকেতে—যেও না,
ওখানে গভীর শাদ, মরুঝড়
মধ্যরাতে মরীচিকা নাচে,
ওখানে বসতি নেই, জলাভূমি,
আলোয়ার হৃদ, অঙ্গরা গন্ধর্বমায়া,
ওরা সত্য জয়,
সবুজ শ্যামল নেই, বৃক্ষ মহীকর—
যার প্রতিচ্ছায়া দেবে গভীর সঙ্গতি :
আকাশে নক্ষত্রলোকে
অমোঘ নিবেশ, অলখে
মহাৰ্ষ ভাবে, চোরাবালি পাকে।

দুই হাত বাঁধা ছিল,
বলতে পারিনি,
অনির্দিষ্ট খেয়াঘাটে নোঙর ছিল না,
দেখাতে পারিনি ছিন্ন সময়ের সীমা,
প্রকৃত প্রত্যয়, আয়ুষ্কাল—
খুলতে পারিনি আমি
বিস্মৃতির দক্ষিণ দুয়ার।

সকাল

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি শেষ হ'ল
দিন শেষ হ'ল
তারা ঝরে গেল
রাত্রি শেষ হ'ল

গমনার মোড়কে
পাপড়ি খুলে গেল
ওধু তুমি আর আমি
রাত্রি শেষ হ'ল

প্রতীক্ষার সুরে
অবয়বহীন
এই দীর্ঘ শীত ঋতু
রাত্রি শেষ হ'ল

সময় ফুরালো
পাতা ঝরে গেল
তারা ঝরে গেল
রাত্রি শেষ হল

জীবন ফুরালো
স্বপ্ন শেষ হ'ল
ওধু তুমি আর আমি
রাত্রি শেষ হ'ল।

পাথর ও প্রজাপতি

শঙ্কর বসু

বাগানে নৃত্যরত প্রজাপতি হয়ে গেল অনাস্বাতা কিশোরী।
 চোখদুটো বর্ণময় হয়ে ওঠে,
 সরিয়ে রাখলাম স্টিফেন হকিংস
 খসে পড়ল মিথ্যে আবরণ—চুঁচিয়ে উঠি
 'নেমে আসুক অভিসম্পাত
 পাথরের বুক চিরে বেরিয়ে আসুক বিদ্যুৎ
 বৃষ্টি হোক 'সারারাত'—তবু,
 আমার রোগা হাতদুটো শালতরু হয়ে
 বুকে টেনে নেবে নীল প্রজাপতি
 আলতো করে শুইয়ে দেবে ঘাসের মোরামে
 পাথর নিংড়ে উরুমূল গোঁথে দেবে নীরব প্রতিবাদ
 তখন, পৌষালী ধানের গন্ধ ছড়িয়ে, পড়বে অতি সংগোপনে।
 শুধু ভাবি,
 কেন পাথরের কাছে শিখেছিলাম উদাসীনতা?

রাস

গৌতম দাশগুপ্ত

বধ্যভূমি ঢেকে রাখে অপলক ফুলের কেয়ারি
 ক্লান্ত করে ক্লান্ত করে ক্লান্ত করে নীল তলোয়ার
 আমি তো তোমারই সেই নিরালস্য স্তম্ভতার ঘোর
 আমি তো তোমারই সেই আঁধারিয়া মোড় স্বপ্নফাঁস
 পুরানো হ্যান্ডারে কঁাদে ফাটলের পর্ণমোচী হাওয়া
 একুল ওকুল গেল রাজন্যের ইনভয়েস ক্রোধ
 স্টুটগার্ট পরমাণু ছুঁড়ে দ্যায় রূপালি ফড়িং
 বন্ধিম লাগে মোক্ষমুদারের বুকে শুই সুন্দরনচাকা
 কাঁপা কাঁপা রাস রাইকিশোরীর সিন্ধুওয়ার্ম জ্বর
 রেডিয়াম হয়ে কৃষ্ণ গিরির আড়ালে ভাসে রাখার কোমর।

চিরন্তনী

মৌসুমী মুখোপাধ্যায়

নির্জনতা খুঁজতে আমি গিয়েছিলাম ঘাটের কাছে
ঘাট আমাকে ফিরিয়ে দিল আজলা ভরে জল পাঠালো আজ

রৌদ্র কেমন বসল এসে পায়ের কাছে সিঁড়ির ওপর
পানার জটে কিসের শব্দ কোথা থেকে ভেসে আসছে সে

ওপারে কোন রাখাল যুবক ঘাসের ওপর বসে থাকে
বাঁশির সুরে অনেক দিনের পুরোনো কোন মেয়েকে ডাক দেয়

দিশে সৈ তমালপ্রবণ দধি দুধের পসরা নিয়ে
হাটের পথে যেতে যেতে ছলকে ওঠে তারও নদীর জল

অচেনা কোন ঘাটের পারে জলে ছলছল রটনা হয়
'মরণ ওদের মরণ হলো' কাঁপিয়ে দেয় সেই নারীটির প্রাণ

নির্জনতা খুঁজতে এসে চিরন্তনী ডাক দিয়েছে
মহাকাশের তলায় যেন সূতোর সকল বাঁধন ছিড়ে আজ

জন্মকথা

অনির্বাক দত্ত

ভুলের জীবনে শুধু সূতুর প্রসব?...তবু আমি জন্মান্তর চাই;
জন্মের কথাই বলি অভ্যাসবশত, কাণ্ডে-কাণ্ডে জন্মায় আশা।
স্বচ্ছ জলে দেখি ছায়া, অচঞ্চল তৃণ-জুড়ে কাঁটা—
তবু জানি—এখনও অন্ধকার, ঘিরে আছে তারার জিজ্ঞাসা।

অরব এখন সব, মৌন চাঁদ গেছে হেলে দূরে;
বাতাসে টান নেই...মাটির সঙ্কয়ে শুধু শিরা-ওঠা নীরব দহন।
আর, কিছু তাপ নিয়ে সৃষ্টির আদিম ডিম শুয়ে থাকে ঘুমে;
চেতনা বধির বলে ঘূর্ণির চাবুকে নেই সমুদ্র-লবণ।

এই ঠিক জন্মের সময়, বিষয় গোলাপকুড়ি জেগে ওঠে এই অবকাশে...
 আলো জানে—এখনি তো ভোরের শেফালি নেবে স্বাপ,
 ডানায় উড়াল দিয়ে পাখি মাঝে নীল রক্তের ব্যুহভেদ করে;
 বৈতরণী ঘিরে দোলে সাঁকো, দিকে-দিকে অবিচ্ছেদ আশ্রয় সন্ধান।

কেয়ারটেকার

প্রবালকুমার বসু

প্রতিদিন গৃহে ফিরি, গৃহের ভিতরে এক নারী
 আদর যত্ন করে, খেতে দেয়, আর একটুখানি ফুরসৎ পেলেই
 শাপ শাপাত্ত, ছেড়ে চলে যাবে বলে নিয়ত শাসায়
 গৃহ কি বাংলা বাড়ি? সত্যি আমি তার কেউ নয়?

বাংলা বাড়িতে ফিরি, অন্ধকার জ্যোৎস্না জ্যোৎস্না
 কেয়ারটেকার আঁজ-মদে চুর, জ্যোৎস্না ঘরে মোম-ছেলে দেয়
 সেও তো নারীই এক, তার কাছে আমি কিন্তু শুধুই ট্যুরিস্ট
 এই সত্যটুকু গৃহে কেন হয় বোঝে না হৃদয়

গৃহ কি বাংলা বাড়ি, আমি বুঝি শুধু ঠিকে যি
 নেহাত ছেলেটি আছে, না থাকলে যেন চলে যেত
 প্রতিদিন ফিরতে ফিরতে দূর থেকে দেখি
 গৃহটি অনেকটাই বাংলার মত

মোম পুড়ছে, বল জ্যোৎস্না কেন তবু এত অন্ধকার
 আমি মদে চুর আঁজকে ভেসে যাচ্ছি বাড়িটির কেয়ারটেকার

বটতলা

রাহুল পুরকায়স্থ

চলেছি রহস্যপ্রাণ তমসার তীরে

যদি তুমি কাছে আসো

যদি এই কেসাব রঙিন

তোমার প্রতিভাখানি আমাকেও কাছে টেনে আনে

খোদাই চিত্রের মোহে, কিছু আমিশাষী

কাব্যকণিকার প্রায়

আমি তবে পথে পথে ছড়াই মহিমা

কোনোক্রমে খুঁজে আনি (ছবিসহ) ছবি আবুশামা

ভাষা শহর

প্রবীর ভৌমিক

ভাষা শহরের থেকে উঠে আসে প্রধান রমণী

তার আয়ু মেখলা ও সমূহ গহনা

পথ নির্দেশ নিয়ে পড়ে থাকে।

কারা এই পথ নির্দেশ নিয়ে, দিগন্ত সংকেত নিয়ে

হেঁটে যাবে, ভাষা শহরের থেকে দূরে।

মূলসূত্র অব্যবহৃত হয়ে আছে

ব্যবহার হয় নাই শরীরের দ্রাবিমা সংকট

তুষার জুপের থেকে স্তরে স্তরে মেষ সরে গেলে

জেগে উঠবে উন্মাদের রাত

এ সকলই মূলসূত্র, সংকেত সিদ্ধান্ত যথাযথ।

একটি সরল আয়ুরেশা আর মেখলা

আর ওই গহনার আমিষ ত্বকের স্পর্শ, নোনাবাম

প্রধান সংকেত নিয়ে যাবে।

প্রাকৃত উন্মাদ খুঁজছে ধুলো ও কাদার মধ্যে

মূলসূত্র আর তার শাখা-প্রশাখার

ব্যথা ও বেদনা।

বেচে দে...বেচে দে

দুলাল ঘোষ

তিনকাল গিয়ে তোর
এককাল ঠেকছে
বেচে দে...বেচে দে

নিয়ে আয়—টাটাসুমো
সেলুলার
কারজন সংসার

এতকাল দেখলি তো
মাথা মোটা—সরু পা
কিন্তু চেহারা

খুলে ফ্যাল পাছমা
ছেঁটে ফ্যাল চুলদাড়ি
ভেঙে ফ্যাল আয়না

ঝটপট নিয়ে আয়
পরগাছা বাবা-মা
বংশের তুমুমা
নাক টিপে গিলে ফ্যাল
এককাপ ভাবনা

বেচে দে...বেচে দে...
এককাল রেখে বাকী
তিনকাল অমানা

সীমান্ত স্বপ্ন

পঙ্কজ সাহা

তুমি হাত তুললে
 কিছু যেন বললে আমার দিকে
 তুমি হাত বাড়ালে
 এতো দূর থেকে আমি
 তোমার হাত তো স্পর্শ করতে পারবো না।
 ফিরে দাঁড়াও তুমি
 আমি তোমার দিকে
 অবিশ্বাস হুঁড়ে দেবো না,
 বলবো এসো

ওই পাহাড়-দেওয়াল ডিঙিয়ে
 একটা মরা নদীর সোঁতা পেরিয়ে
 তুমি হেঁটে এসো
 বারুদের কিছু কটুগন্ধ এখনও হাওয়ায়

হেঁটে এসো তুমি এপারে
 কোন অস্ত্র এনো না সঙ্গে
 শুধু পারমানবিক পরীক্ষাফর্মের মাটি
 যেন থাকে তোমার হাতে
 আমিও হাতে মেখেছি
 এপারের সেই মাটি
 তুমি এলে
 আমাদের মাটিমাখা
 দুটি হাত
 মিলে যাবে

আজ বিকেলে যনমেঘে বহুপাত হবে
 তারপর প্রবল বৃষ্টি
 মরানদীতে যখন প্রথম জলধারা
 এগিয়ে আসবে
 আমরা দুজনে সেই ধারায়
 একসঙ্গে হাত ধরে
 উঠে দাঁড়াবো।

কুসুম

নন্দদুলাল আচার্য

আঙুল কেটে সলতে দিলাম, শুভ্রফুলের মালা,
 কেউ বোঝে না ব্যথাকুসুম, অকুমারীর ছালা।

অকুমারীর ছালা কুসুম, মেঘ দুমদুম জলে,
 মনের মাঝে ডুবে বিকল সরাবনের তলে।

সরাবনের তলে কুসুম, ফুলের বাসর ঘর।
 কোন কন্যার কুটির গেছেন শিব সদাগর?

সদাগরের চোখ কুসুম, খোলো মেয়ের চোখে,
 কালো কন্যার দুঃখকুসুম, বোঝে কি আর লোকে?

বোঝে কি আর লোকে কুসুম, অকুমারীর ছালা?
 মেঘ দুম দুম জলে ভাসে সরাবনের তলা।

প্রেম রহস্য অমিতাভ চৌধুরী

সেটি ছিল গোলকর্মাধার চাঁদ
আর আত্মক্ৰোধে অস্থির হয়ে
কখন হয়ে উঠল বিকৃত কামা—
পৃথিবী অবশ্য আত্মস্থ,
কেউ যে কাউকে
পুনর্জন্মের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না কখনও
এ বোধটি
ছায়ার মতো ঘিরে রেখেছে সন্ধ্যার আঁচল;
আকাশ এখন উঠে আসছে
পাছনিবাসের মাধ্যম,
নিচে অন্ধকার ঘরে এইমাত্র পরিশ্রান্ত শরীর।
শুকতার। দেখবো বলে
আমি আর গোলকর্মাধার চাঁদ
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছাদে।

এমন দেশেই আছি

প্রদীপ পাল

এমন দেশেই আছি, দিবস খেয়ে পরে
বেশানে ভাতের জন্য এখনও কাঁদে মানুষ
এখনও লম্বা লাইন মাদোয়ারির আড়ৎ-ঘরে
দানের মধ্যেও হুঙ্কার : শালে মাং খাও জাদে

এমন দেশেই আছি, দিবস হেঁটে-চলে
দুটো-একটা পটকা ফাটলে, দেখি না ফিরে
বোকাবাজে মুখ গুঁজে ঘাম-মুখ খুই জলে
পরের দিনই স্বাভাবিক, স্মৃতি যায় অস্তাচলে

এমন দেশেই আছি, দিকি নিজেই টুকু নিয়ে
বাড়ি-গাড়ি-টিভি-ফ্রিজ-ব্যাঙ্ক লকারে
গরীব সেতো কর্মদোবে, কে দেয় জল, কে বিয়ে
ভালো কর্মে চক্কো, নাহলে ফতুর-ফক্কাইয়া

এপাশে আলো দেখি, ওপাশে চতুর্দশীর আন্ধার
কখনও বোতল ভূত, কখনও রোশনাই, মগজ ধক্কুমার

কবেকার টিলা।

কমল চন্দ্রবর্তী

টিলায় বেড়াতে এসে একি কাণ্ড।
একটাও গাছ নেই, একটাও ছায়া।
বড় বড় ল্যাটেরাইট গ্র্যানাইট কঙ্কাল
শেয়াল কাঁটায় ফুল ভালো না লাগলেও
হাওয়া পাথরের ফাঁকে ফাঁকে, কি নির্জন।
মাঠ-ভোলা-ঘুঘু ডাকছে, টিলা ছেড়ে যায়নি আঁধার
যায়নি শীতের দিন
যায়নি রোদের চাঁচে হাঁটি হাঁটি খয়েরী মেয়েটা।

টিলা ফেলে চলে গেছে শাল।
গোপন বাংলোর খাট, কুয়োতলা, হাট
চলে গেছে, বাবুডি, ঘোসিডি, উস্তী
ধুলোছাপ মেয়েটি প্রপাত
টিলা ফেলে চলে গেছে 'সুখে থাকো' লেখা নিশিরাত।

টিলায় বেড়াতে এসে কাঁটায়ুল, কি হলুদ।
আহা!
গ্র্যানাইট, ব্যাসেন্ট ডাঁই
মোরামের পথ আঁকাবাঁকা।

সাড়া দাও

অত্রি ভৌমিক

কে আছে ভিতরে?

রুদ্ধ ঘর স্তব্ধ হয়ে থাকে।

এত তীব্র গন্ধ বাতাসেও নেভেনি প্রদীপ,

এসো দেখি রূপোলী আলোতে সন্ত্রম মেনে

এখনো তেমনই সবুজ আছে কিনা।

আমি এখনো পুরোনো পোষাকে

দুর্লভ শয্যাদানা খুঁজি পুরোনো উঠোন ছুড়ে।

কে আছে ভিতরে?

যাকে প্রেম বলে মেনেছো, পেয়েছো কি তাকে

সশরীরে?

নাকি পরিচিত পথ-ঘাট ছেড়ে জ্বলোছে সমুদ্র-গভীরে?

সাড়া দাও

যে আছে ভিতরে;

যাতে অশ্রুবে নৈরাশ্য ভেঙে

ফিরে যেতে পারি রাজসিংহাসন ছেড়ে

সুশীতল বৃক্ষছায়ায়।

পায়সান্ন

অপূর্ব কর

ভিক্ষা করে যা এনেছ

নিষ্কতার সরু চাল তফাতে রাখ।

বেছে বেছে আলাদা রাখ গোটা পুষ্টি দানা

তোরদে সিদ্ধকে কুশুসিতে রাখ রন্ধনতায় মিশিও না।

কত দিন তেজী আঁচে

নেই টগবগানো জ্যোৎস্না দুধ

এলাচ বাগান থেকে আসে না ফেরেস্তা হাওয়া
কাবুলিওয়ালাও হাঁক পেড়ে ঘোরে না পাড়া—কিসমিস্
আখরোট।

দারুচিনি স্বীপের কাব্য পড়া শেষ হয়ে গেছে কত দিন
সুচারু তেজপাতায় মুগনাভি হরিণেরা ঘুমাত এ কথা বলা
এখন মিথ্যা রঙীন।

এক দিন পায়সাম স্বাণ বাতাসে কি দামাল নীলকণ্ঠ
পালক
নবামের গানে নেচে উঠে পাড়া বলত ঐ নামের নাটকের
অভিনয় হোক।

সেই সব দিনের কথা এখন সাবেক ছবি রূপোর ফ্রেমে
বীধা
কত দিন ঠিক ঝাল-ঝোল-অম্বল হয় না পাক, হয় না
পায়সাম রীষা।

সাম্প্রতিক অস্তিত্ব ও মার্কসবাদ

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মার্কসবাদ একদিন পৃথিবীর বহু মানুষের মনে আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। তার কারণ, মার্কসবাদ এক নতুন বাণী নিয়ে এসেছিল। ফরাসী বিপ্লবের বাণী তো ছিলই, মার্কসবাদে আরও ছিল অর্থনৈতিক সাম্যের বাণী; নতুন সমাজ, নতুন মানুষ, নতুন সামাজিকতা, নতুন মূল্যবোধ, শ্রুতি সৃষ্টির বাণী।

সাম্যবাদ এমন একটা সমাজের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল, যে-সমাজে শোষণ নেই, নিপীড়ন নেই, ধনিক নেই, জমিদার-মহাজন নেই, বিরোধ নেই সংঘাত নেই, সামাজিক আত্ম-বিচ্ছেদ নেই। এ এমন একটা সমাজ যেখানে সবাই ভাই-ভাই, সবাই সকলকে চায়। এ এমন একটা সমাজ, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই; ফলে সামাজিকতার প্রতিকূল যে লোভ সেই রিপূও নেই। ধনের পূজার অবসান হওয়ায় এ-সমাজে শুধুই মানুষের শুভবুদ্ধির উত্তরোত্তর বিকাশ।

এ-সমাজ ধনিক-সমাজ থেকে একেবারেই আলাদা। ধনিকত্বের লাভের লোভ সাহিত্য, কলাবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, গার্হস্থ্য—সমস্তকেই আচ্ছন্ন ও কলুষিত করে তোলে। লোভের ও লাভের মূলোচ্ছেদ করে সাম্যবাদ মানুষে মানুষে মিলনের ক্ষেত্রে কেবলই প্রগতি করে তোলে।

১৯ শতকে ইংরেজিনবীশ বাঙালী পাশ্চাত্যের ভাবের ভাবুক হয়ে স্বদেশ ও আধুনিকতার মন্ত্র গ্রহণ করেছিল। স্বদেশ-চেতনা যদি জেগে উঠে থাকে ১৯ শতকে, তবে ২০ শতকে সমাজতাত্ত্বিক চেতনা জাগ্রত হয় সোভিয়েট বিপ্লবের পরে। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ইউরোপের ইতিহাস পড়ে বাঙালীর যে স্বাধীনতার জন্ম বাংলার ১৯ শতকের নবযুগে, তেমনি সোভিয়েট বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কাহিনী শুনে, বাঙালী সাম্যবাদের আদিশের ও মাদুরের উদ্ভাদনায় মগ্ন হতে শুরু। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ কত ঘটনার সাক্ষী না বাঙালী। লোকসমাজ ভেঙে গেছে; যৌথ পরিবার ভাঙনের মুখে; ছিন্নমূল মানুষের ভাবে ভারতব্রহ্ম, খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ। দরিদ্র কৃষককুল, হতাশাগ্রস্ত মধ্যবিত্ত সমাজ। এ হেন অবস্থায় সাম্যবাদ এসেছিল আশার সূর্য হয়ে।

কবি রাম বসুও একদা সাম্যবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনিও একদা ভেবেছিলেন সাম্যবাদ এলে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হবে।

গোলাভরা ধান, ক্ষেতে সোনালি ফসল, সম্পন্ন শ্রমিক-মধ্যবিত্ত, নতুন সমাজবন্ধন, নতুন সংস্কৃতি, সমাজে সর্বত্র কেবল সৌভ্রাতৃত্ব ও শিষ্টাচার। এ-সমাজে বেকারি নেই শোষণ নেই, বংশকৌলীন্য, অর্থকৌলীন্য নেই, দম্ব নেই, মনাফাশিক্ষা নেই; এ এক সর্বাসুন্দর সমাজ। রাম বসু অনেকের মতো এই গোলাপী স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্নকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন।

সত্তর বছর সোভিয়েট সাম্যবাদ টিকে ছিল। পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়ন আর নেই। পূর্ব ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক দেশগুলি আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের বন্ধন ছিন্ন করে স্বাভাব্য অর্জন করেছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একাধিপত্য এখনও বজায় আছে ঠিকই। কিন্তু, চীনও কতদূর পর্যন্ত বাজার-অর্থনীতি চালু করা যায়, তার পরীক্ষা করছে। ভিয়েতনাম ও কিউবার সমাজতন্ত্রের অনেক রূপান্তর ঘটে গেছে ইতিমধ্যে।

হঠাৎ বেশ কয়েকবছর আগে, একই সময়ে সমকালীন সমাজতন্ত্রের ভিত কেঁপে উঠেছিল। তখনই অনেকে বুঝেছিলেন এই কেঁপে ওঠার কারণটা স্থানিক নয়, কণিকও নয়। এর কারণ রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছুড়ে।

রাম বসুর মতে সমাজতন্ত্র যে টিকে থাকতে পারলো না, তার জন্য লেনিন দায়ী কি স্টালিন দায়ী—এসব কোন সমস্যাই নয়। আজ না হয় কাল এই সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়তই। কারণ, এরা কেউ পরিবর্তিত বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করেননি। তাঁর ভাষায় “ক্রমবিকশিত বিশ্ব আর ক্রমসংকুচিত মানবসত্তা হল আদ্যকের দিনের বেসিক কন্ট্রাডিকশন।”

এগারটি বিষয়সূচী সম্বলিত রাম বসুর “সাম্প্রতিক অস্তিত্ব ও মার্ক্সবাদ” গ্রন্থে এই কন্ট্রাডিকশনেরই বিস্তার। আনতোনিও গ্রামসি স্বরণে উৎসর্গীকৃত এই গ্রন্থটিতে এগারটি অধ্যায় আছে; যথা (১) কথায় কথায় (২) বাই বাই সোস্যালিজম (৩) অঙ্ককার কালিন্দীর স্রোতে (৪) ময়দানবের ছায়া (৫) ময়দানবের ধাবা (৬) ময়দানবের ধাবার নীচে মার্ক্স (৭) আমি চাই পথের আলো (৮) এক কৃষ্ণ যবনিকা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের পরে (৯) বিজ্ঞানই শেষ কথা নয় (১০) কাহ্নার প্রেমের বেদনায় (১১) এখন জীবন মানেই বৈপরীত্য।

লেখকের কাছে সাম্যবাদী ব্যবস্থার প্রায় বিলুপ্তি “রাজনৈতিক সমস্যা” নয়। তিনি এই বিলুপ্তিকে দেখেছেন “আর্থিক সংকট”, “সংস্কৃতির সংকট” হিসেবে। লেখকের মতে সমাজতন্ত্র কোন রাষ্ট্রশক্তি নয়। রাষ্ট্রশক্তি এবং তার অর্থনীতি সমাজতন্ত্রের ডালপালা। গাছটি হোল আর এক সভ্যতা, আর এক জীবনবোধ, আর এক বিশ্ববীক্ষা। লেখকের মতে সমাজতন্ত্র যেহেতু একটা জীবনবোধ, তাই এর পতন কিম্বা অন্তর্ধান হতে পারে না। তবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কিম্বা অর্থনীতি টেকসই ছিল না। এবং ভেঙে পড়তই। এই ভেঙে পড়ার মূল কারণ, সমাজতন্ত্র-নির্মাতারা পরিবর্তিত বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করেননি। লেখক সূত্রাকারে তাঁর বক্তব্যটা তুলে ধরেছেন। সেটা হল

“ক্রমবিকশিত ব্যাপ্ত বিশ্ব আর ক্রমসংকুচিত বদ্ধ মানুষ।”, আত্মকথনের মাধ্যমে এই সূত্রেরই বিস্তার।

আজকের জগৎ ও জীবনে অনেক নতুন ও অপরিচিত গতি এসেছে, মাত্রা এসেছে। আজ যে অশান্ত পৃথিবী দেখা যাচ্ছে তার মূল কারণ আমরা এক সঙ্কীর্ণে দাঁড়িয়ে আছি। সোভিয়েট ইউনিয়নে মার্কসবাদ অফিসিয়াল মতবাদ ও দর্শন হয়ে ওঠায় স্ববিরুদ্ধ পেয়ে গিয়েছিল, নতুন বাস্তবতাকে সে ধরতে পারেনি। কিন্তু লেখক বিশ্বাস করেন যে, সাম্যবাদ যদি পৃথিবী থেকে মুছে যায় তাতে মানব-কল্যাণ হবে না। লেখক স্টালিনপন্থী নন পুরোপুরি। তবে সাম্যবাদের পতনের জন্য তিনি দায়ী করেছেন গর্বাচেভকে। সাম্যবাদের পতনের নাটকে তিনিই খলনায়ক। লেখক বিশ্বাস করেন যে, গর্বাচেভ আমেরিকার সঙ্গে বোঝাপড়া করে তার চর হিসাবে প্রথম কিস্তিতে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজকে এলোমেলো করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, মহৎ আদর্শের বোরখার আড়ালে। এলোমেলো করে দিয়ে খলনায়ক পর্দার আড়ালে গেলেন, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন ইয়েলৎসিন, পূর্ণ ধনতন্ত্রের প্রোগান নিয়ে।

লেখক পড়েছেন অনেক, সাম্প্রতিক অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন। তবে তাঁর লেখাটা মনে হয় খাপছাড়া, খানিকটা এলোমেলো, quotation কষ্টকৃত। মনে হয় এত উদ্ধৃতির প্রয়োজন ছিল না এবং অনেক উদ্ধৃতির প্রাসঙ্গিকতা নেই। এ-সব ছোটখাটো অনেক ক্রটি থাকলেও কবি রাম বসু সাম্প্রতিক জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন। এই বিশ্বায়িত বাজার-অর্থনীতির এবং টেকনোলজিকাল যুগে, মানুষের ভবিষ্যৎ কেমন হতে চলেছে তা নিয়ে ভেবেছেন। Bad faith-এর অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা যাবে না।

বিশ্বপ্রকৃতির বাথাবিপত্তি সত্ত্বেও মানুষ উচ্চত্বরের এক শক্তি অর্জন করেছে। এই শক্তি বিচারবুদ্ধির শক্তি। বিচারবুদ্ধির প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্টি হয়েছে দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা ইত্যাদি। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রেরণায় এই প্রচেষ্টা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ টেকনোলজি এত উন্নত হয়েছে যে, পৃথিবীটা আজ “ভূবনায়িত গ্রাম” হয়ে উঠেছে। আর টেকনোলজির সঙ্গে ইলেকট্রনিকস্ একত্রিত হয়ে আজ এমন এক বসুন্ধরার সৃষ্টি হচ্ছে যা একেবারেই অপরিচিত ও নতুন।

মানুষের বিচারবুদ্ধি করেছে অনেক কিছুই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সফল হয়নি। বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সুশৃঙ্খল বিভাজীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ সম্ভব হয়েছে, বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে। জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়েছে। বিচারবুদ্ধির শান্ত, সুশৃঙ্খল পথ অনুসরণ করে বিজ্ঞান এমন-সব আবিষ্কার করেছে যার ফলে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়েছে। অপরদিকে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি এমন

সব বৃহৎ ভয়ানক মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে যার ফলে মানুষের অহমিকা বেড়েছে এবং পারস্পরিক ধ্বংসের পথ খুলে গেছে।

মানুষ একদিকে এমন সব অতিকায় সুদক্ষ সংগঠন সৃষ্টি করেছে যার দ্বারা একদিকে জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রীবৃদ্ধি হয়েছে, অপরদিকে বৃদ্ধি পেয়েছে আত্মসী মনোভাব, হিংসা, ধ্বংস ও হত্যার তাণ্ডবলীলা। বিচারবুদ্ধি একদিকে সমর্থন করেছে উদার যুক্তিপূর্ণ ও জনকল্যাণকর মানবিকতাবাদকে। অপরদিকে সে সমর্থন জানিয়েছে অহংবাদকে। প্রাণবাদকে, ভোগবাদকে, শক্তি ও সাফল্যের জন্য অতি হীন, নীচ, কর্মধারাকে। একদিকে সে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, শোষণহীনতার আওয়াজ তুলে, তার প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই আশাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে বিশাল বাণিজ্যিক, সামরিক, আমলাতান্ত্রিক, একদলীয় ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন তৈরী করে।

আমরা যে সাহিবদারনৈটিক যুগে উপনীত হয়েছি, সেই যুগ গ্রীসীয়-রোমক সাধনারই ক্রমিক পরিণতি। আধুনিক যুগ দাঁড়িয়ে আছে যুক্তিবাদের উপরে, কেবল বুদ্ধির দ্বারা জীবনকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। সেই জন্যই সাধনমন্দিরে আধুনিক যুগ বিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছে, টেকনোলজিতে নিত্যনতুন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এবং আনছে।

অরাধকতার অবসানে একদা ইউরোপ এক নবীন কৃত্রিম আলোকে উদ্ভাসিত হ'ল। সত্য-শিব-সুন্দরের বেদীর উপর অধিষ্ঠিত হল বুদ্ধিবাদ ও জড়বিজ্ঞান। নতুন সংস্কৃতির লক্ষ্য হল (ক) নতুন অর্থনীতির ভিত্তির উপর পূর্ণপরিণত সুখী জীবন গঠন করা। (খ) উদার অর্থনীতি ও গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর মানবসমাজ গঠন; আরও লক্ষ্য হল (গ) সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান, শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষাচর্চা, বিদ্যানুশীলন, মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষসাধন। এই সব লক্ষ্য সামনে রেখেই পৃথিবীতে সত্তর বছর সাম্যবাদেরও পরীক্ষা হয়ে গেছে।

রাম বসু সমস্যাটা ঠিকই ধরেছেন। মানুষ পরিণতবুদ্ধি; জড়বিদ্যার কল্যাণে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ আজ তার দাসীবাঁদী। ভোগ পরিতৃপ্তির আজ অপরিমিত সুযোগ। কিন্তু আমাদের প্রাচীনেরা ঐহিক ও পারত্রিকের যে সামঞ্জস্য দেখেছিলেন তা আজ লোপ পেতে বসেছে। এর অনিবার্য পরিণাম যা তাই ঘটেছে—বিশৃঙ্খলা, অন্তরে, বাহ্যরে, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত। এখন দেখা যাচ্ছে, শিক্ষায়িত, কুৎকৌশলনিবিড় ভোগসর্বস্ব আধুনিক সমাজের—আধুনিক সংস্কৃতির (সে পুঞ্জিবাদীই হউক কিম্বা সাম্যবাদীই হউক) ভিত্তি হল চোরাবালি। এক বিরাট গণ্ডগোলের মধ্যে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

এখন অনেকেই উপলব্ধি করছেন যে, মানুষ যদি উচ্চতর মানসিক ও নৈতিক প্রেরণাবশে আপন অন্তরতম সত্তার সংস্পর্শ লাভ না করে তবে তার অবলুপ্তি অবশ্যজারী।

লেখক দেখিয়েছেন, আমাদের যুক্তিবাদী মন মোটামুটি গণতন্ত্র, উদার অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গঠিত মানবসমাজ, অথবা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এদিকে মানুষের কোন প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সত্য কথা, টেকনোলজি মানুষকে দিয়েছে প্রসারিত বিশ্ব, কিন্তু মানুষের ভালোকে তো আমূল পরিবর্তন হয় না। অথচ মানুষ বিবর্তনের পথে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। এখন কেবলই বিশ্বরহস্যের উন্মোচন হচ্ছে প্রতিদিন। তাই এবার সেই পরমার্শ্বকে ধারণ করার জন্য মানুষকে শুদ্ধ হতে হবে, ক্রেদমুক্ত হতে হবে।

আগেই বলেছি লেখকের বক্তব্য খুব সাজানো গোছানো নয়, কোথাও কোথাও ঘোলাটে। কিন্তু পাঠক এই লেখায় অনেক মণিমুক্তার সন্ধান পাবেন। যেমন তিনি লিখেছেন—বিজ্ঞানের প্রসারিত শক্তি হল টেকনোলজি। সেই অর্থে এখন বিজ্ঞান ও টেকনোলজি সমার্থক। অর্থনীতিতে যেমন গ্রোথের (growth) সীমা আছে টেকনোলজিতেও তেমনি গ্রোথ-এর সীমা আছে। মধ্যযুগে শেষ কথা বলত পাদ্রী। আমাদের দেশে যেমন বলে শুরু আর মোহান্ত। আধুনিক যুগে শেষ কথা বলার অধিকার একমাত্র বিজ্ঞানীর। এখন সংশয় দেখা দিয়েছে ক্রমাগত মনে হচ্ছে শেষ নাই যে শেষ কথা কে বলবে?

আমরা কথায় কথায় specialisation-এর বড়ই করি। কিন্তু এই অতি-স্পেশালাইজেশনের ফল কি হল? ফল হল আমরা খণ্ডকেই দেখলাম অখণ্ডের পাশ্চ পেলাম না।

জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক আমরা চাই অখণ্ড সমগ্রতা, wholeness.

লেখক বলছেন যে “technological সমাজ” মানুষ গড়ে তুলেছে, তা sustainable, টেকসই নয়। টেকনোলজির স্বপ্নের বীজ টেকনোলজির মধ্যেই নিহিত। লেখকের মধ্যে রোমাণ্টিক যন্ত্রবিরোধিতা নেই। “সমস্যা হল কি করে যন্ত্রকে রেখে “ব্যবস্থাকে” মানবিক করা যায়, মানুষ রাখা যায়।” লেখক সমস্যাটা নিয়ে ভেবেছেন।

যে শিল্পায়িত, নগরপ্রধান আধুনিক সমাজ গড়ে উঠেছে সে-সমাজ অদ্যাবধি তিনটি সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। অধুনা নানা মহল থেকে শোনা যাচ্ছে যে, কৃৎকৌশলনিবিড় বাজার-নির্ভর শিল্পসমাজ পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। শিল্পায়নের বাড়াবাড়ির ফলে পৃথিবী ধূসর হয়ে যাচ্ছে। শহরগুলি হয়ে উঠছে কোলাহলমুখর “বাজার”। সেখানে গজিয়ে উঠছে বস্ত্রী। নানারকম অপরাধমূলক কাজকর্ম, দ্রাগের নেশা, ছড়িয়ে পড়ছে। হিংসাও, বিশেষত গার্লফ্রি হিংসা। একদা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আধুনিক সমাজে তা নষ্ট হয়েছে ক্রমশঃ। উড্ডিসকুল, জীবকুল, শিল্পায়ন ও নগরায়নের দৌরাণ্ডে বিপন্ন হয়ে উঠেছে। শিল্পায়িত সমাজ

মানেই অনিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি, অসঙ্গত বিকাশ। সাম্যবাদীরা ভেবেছিল শিল্পায়িত সমাজ যদি “নিয়ন্ত্রিত” হয় “রাষ্ট্রাধীন” হয়, তবেই শুধু বাজার-অর্থনীতির নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়ান সম্ভব। তখনই শুধু এমন শিল্পসমাজ গড়া সম্ভব যা দূষণমুক্ত, প্রকৃতিপ্রেমী ও অপাপবিন্দু সমাজ হবে। তবুও সমস্যা থেকেই যায়। কমলা জ্বালালে যেমন দূষণ হবেই তেমনি বৃহদাকার শিল্পপ্রধান সমাজ (সে পুঁজিবাদীই হউক কিম্বা সাম্যবাদীই হউক) গড়ে উঠলে নিশ্চিতভাবে প্রকৃতি রিক্ত হবে, তার ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে, বাড়বে অসাম্য গণতন্ত্রহীনতা, শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ প্রভৃতি। তাই টেকনোলজিই টেকনোলজিকে ধ্বংস করবে।

লোখকের কাম্য স্বাধীন, স্বতন্ত্র, মহিমময় মানুষ। কিন্তু আধুনিক সমাজে মানুষ অর্থনীতির, রাষ্ট্রশক্তির দাসানুদাস। ফলে সমাজজীবনের ভিত্তি দুর্বল হয়, মানবিক সম্পর্কের অবক্ষয় ঘটে। এই সমাজে ব্যক্তির তাৎক্ষণিক demand—চাহিদা ছাড়া কোন কিছুই মূল্য নেই। ফলে জনসমষ্টির মধ্যে দেখা দেয় অপরিমিত ভোগাকাঙ্ক্ষা। আর এই ভোগাকাঙ্ক্ষা আজ পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ উজাড় করে ফেলেছে। পরিণামে দেখা দিচ্ছে মানুষের সমূহ অকল্যাণ।

কিন্তু শিল্পায়িত টেকনোলজিকাল সমাজের সঙ্গেই (সে সমাজ পুঁজিবাদী হউক কিম্বা সাম্যবাদী হউক) মানুষ ঠিক খাপ খায় না। শিল্পসমাজকে টিকে থাকতে হলে উৎপাদনকে কেবলই বাড়িয়ে যেতে হবে, কেননা এই সমাজ চায় উৎপাদনের সীমাহীন বিস্তার। যন্ত্রকে করতে চায় আরও উৎপাদনশীল ও সজ্জা। কিন্তু মানুষ তো মানুষই থেকে যায়। যন্ত্রের মতো মানুষের ব্যস তো কমে না, বরং মজুরি বৃদ্ধি পায়। তাই শিল্পসমাজ চায় মানুষ ছাড়াই কাজ চালাতে, যন্ত্র দিয়ে। হয়তো ২১ শতকে মানুষ ছাড়াই শিল্প-উৎপাদন ইত্যাদি সম্ভব হবে। কিন্তু মানুষগুলি তো থেকে যাবে পৃথিবীতে। তাদের তো মেরে ফেলা যাবে না। তাদের কি হবে?

বলা যেতে পারে যে, মানুষ তো এমন শিল্পই শুধু করতে পারে যাতে মানুষ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে না। এমন শিল্প করতে পারে যাতে কাজ তৈরী হয়; এমন কাজ যা অদক্ষ, অশিক্ষিত কর্মীরাও করতে পারে। কেননা উৎপাদন, বস্তু সজ্জার, ভোগের উপকরণই শুধু নয়, মানুষের দাবি সর্ববার আগে। কিন্তু কৃৎকৌশল নিবিড় শিল্প-সমাজ মানুষকে বলি না দিয়ে অগ্রসর হতে পারে বা।

একথা মানতেই হবে শিল্প-সভ্যতার সম্মোহিনী শক্তি আছে, বিশেষত দরিদ্র উন্নয়নকারী দেশের মানুষদের কাছে। ভোগের হাতছানিতে দরিদ্র দেশের মানুষ যে ভুলবে, তাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। অথচ, অপরিমিত ভোগে তৃপ্তি নেই, সুখ নেই, উত্তেজনা আছে, পরিতৃপ্তি নেই। শিল্পসমাজ অনেকটা মাতালের সমাজের মতো। প্রতিক্ষণেই মাতাল যেমন ভাবে “বেশ

মজা হচ্ছে” শিল্প সমাজও তেমনি ভাবে ভোগ, কোলাহল, উত্তেজনার মধ্য দিয়ে মানুষ প্রগতির পথে এগুচ্ছে।

লেখক বৈরাগ্যের নাম করে দরিদ্রের শূন্য বুলির সমর্থন করেন নি। কৌশল ধারণের পরামর্শও দেননি। কিন্তু তাঁর আলোচনায় বার বার এসেছে একটা কথা—শিল্পসমাজ মানুষকে ঈর্ষান্বিত, বিষেপরায়াণ, স্বার্থপর, ভোগী, কেজো মানুষ করে তোলে। যান্ত্রিকতাকেও এ-সমাজ অন্তরে-বাইরে বড় করে তোলে। তাতে মানবসম্পর্কে অন্তরতম আত্মিক বন্ধন থেকে বিচলিত করা হয়।

মানুষের ক্রমপরিণতির পথে একটা সংকটকাল এসেছে। একদিকে সে বন্ধুর অগ্রসর হয়েছে কিন্তু অপরদিকে তার বাড়ি খেমে গেছে। এই বাড়ি খেমে যাওয়া overspecialisation, অতিবিশেষ্য, ক্রমপরিণতিতে একটা মারাত্মক রোগ। মুক্তি হল, প্রকৃতির অগ্রগতির সঙ্গে এই রোগগ্রস্ত শাণী চলতে পারবে না। মানুষ আজ বিশাল জটিল সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহ গড়ে তুলেছে বটে, কিন্তু তার সীম মনোবুদ্ধি তার অপরিণত নৈতিক-আধ্যাত্মিক সমাজ সেই বিরাট সংগঠনের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। তার সৃষ্ট সভ্যতা সংস্কৃতি তাকেই গ্রাস করতে বসেছে। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে বোকা মনিবের অতিচতুর চাকর। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত নানাবিধ দাবিদাওয়া মেটাবার ক্ষমতা মানুষের নেই। নিত্য নতুন নতুন অভাব সে সৃষ্টি করছে ও সেই অভাব পূরণের জন্য অহরহ হাঁকপাকু করছে। সমষ্টিগত স্বার্থ ও সেই স্বার্থের সিদ্ধি নিয়ে সমষ্টিগুলির মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব দিন দিন বাড়ছে। আজ প্রাকৃত বিদ্যার চর্চার পলে মানুষের শক্তি বেড়েছে; সমগ্র মানবজাতির বাহ্যিক জীবনধারা এক ছাঁদের হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অন্তরে সাম্য বা মৈত্রী নেই, একত্ববোধ তো দূরের কথা। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক গোষ্ঠী, প্রত্যেক সমষ্টি আপন স্বার্থ, আপন মত, আপন চিন্তাধারা নিয়ে মশগুল। সংতির, harmonyর আশা সুদূরপরাহত। অর্থাৎ আজ আছে শুধু পরস্পর-তাড়না, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যাধির টেটিকা ওষুধ, মুখে নানারূপ বাঁধা বুলি—যার জন্য মানুষ প্রাণ দিতে ও প্রাণ নিতে পারে।

বড় বড় কথা যে মানুষ বলে না তা নয়। যে ভাবের রুখা শোনা যায় তা ভোগ, ভেদ ও অজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মনের কল্পনামাত্র। তা দিয়ে সমস্যার সমাধান কখনই সম্ভবপর নয়।

বিজ্ঞান ও টেকনোলজি মানবজীবনে আংশিক ঐক্য (বহিরঙ্গ) ও সামঞ্জস্য এনেছে। সে সামঞ্জস্য এসেছে খণ্ড খণ্ড সংঘটন দ্বারা এবং সেই প্রচেষ্টার ফলে নানা লক্ষ্য নানা ভাবনা নানা কর্মধারা প্রবর্তিত করেছে। কিন্তু এই সব বিভিন্ন ধারার মধ্যে যে বিরোধ ও সংঘর্ষ তার অবসান হতে পারে

না; সমস্ত খণ্ডধারা মিলে এক বিশাল স্রোতস্রী সৃষ্টি করতে পারে না, যতদিন না মানুষ তার অন্তরে উচ্চতর চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। শুধু বুদ্ধিবাদ, জড়বিজ্ঞান, সংস্কারবাদ, ভোগবাদ, অহংবোধ এ কাজ করতে পারবে না। বুদ্ধিবাদ, জড়বিজ্ঞান ও টেকনোলজি বাইরে থেকে মানুষকে একছাঁচে ঢালাই করতে পারে। যথার্থ একত্বের জন্য সমগ্র সম্ভা, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র শক্তির প্রয়োজন। এ-সব আসবে কোথা থেকে? লেখক বলতে চেয়েছেন, এসব আসতে পারে কোন মহত্তর, গভীরতর সত্যের উপলব্ধি থেকে। সেই সত্যানুভূতিই শুধু দিতে পারে পূর্ণ সঙ্গতি।

চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ের পূর্বে জগতে কি সঙ্গতি ছিল না? ছিল। এই সঙ্গতি ছিল সহজবুদ্ধিজাত instinctive। আজকের দিনেও এর উদাহরণ বর্শীক, মধুচক্র প্রভৃতি। উই বা মৌমাছি নিত্যকর্মে যে নিপুণতা শৃঙ্খলা ও সমবেত প্রচেষ্টার পরাকাষ্ঠা দেখায় তা অত্যাশ্চর্য হলেও সহজাতপ্রবৃত্তি বই কিছু নয়। মানুষের জীবনে এসেছে বুদ্ধিবলে বোঝাপড়া, বাকশক্তির সাহায্যে মিটমাট। কিন্তু সে বোঝাপড়াকেও যথার্থ সঙ্গতি বলা যায় না, কেননা তার মূলে অভিন্নতাবোধ নেই। আসল কথা আঞ্চিক পরিবর্তন চাই। যদি আমরা বৈশ্বিক চেতনা, মানব-চেতনা-সমাজ-চেতনা, এই মডেল-মার্কসবাদের সঙ্গে যুক্ত করি তবে পরিবর্তিত নতুন পৃথিবীতে মানুষের আঞ্চিক পরিবর্তনের গতি বাড়বে। মানুষের জ্ঞানের আলোতে কিম্বা গতিতে নেই কোন বিশ্বচেতনা, নেই কোন আন্তরচেতনা বা শক্তি যার দ্বারা সে মানবজাতির দৈহিক ঐক্যকে পরিবর্তিত করতে পারবে প্রকৃত প্রাপের ঐক্যে, মনের ঐক্যে এবং অধ্যাত্ম ঐক্যে। আন্তর পরিবর্তন ছাড়া বহির্জীবনের উন্নতির সঙ্গে ভাল রেখে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে না।*

* (রাম বসুর 'সাম্প্রতিক অস্তিত্ব ও মার্কসবাদ' গ্রন্থ অবলম্বনে।)

ওরিয়েন্টালিজম্

রমাকান্ত চক্রবর্তী

মানুষের ইতিহাসে প্রায়শ বিভিন্নতার এবং বিচ্ছিন্নতার মতাদর্শ দুর্নিবার এবং দূরপন্থ্য হয়ে ওঠে। তথাকথিত নিকট প্রাচ্যের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা থাকলেও প্রাচীন গ্রীক নগর-রাষ্ট্র সমূহের নাগরিকগণ নিকট প্রাচ্যের মানুষদের সভ্য ভাবতেন না। প্রাচীন চিনেও এইরূপ অস্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল। ক্রমশ বিভিন্নতা এবং বিচ্ছিন্নতা নানা ভাবে পল্লবিত হয়। শক্তিশালী ইসলামের অসংহনীয় অভিঘাতে যখন পূর্ব ইউরোপের খ্রিস্টান দেশগুলো বিপন্ন হল, তখনই শুরু হল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। মুসলমানরা খ্রিস্টানদের বিদূষণে মেতে ওঠেন। খ্রিস্টানরাও ইসলামের নিন্দা করতে থাকেন। সুদর্শন মুসলমান তরুণের অসাধারণ রমণে মুগ্ধা খ্রিস্টান রাজকন্যা এবং বীরাস না ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবীর খ্রিস্টান সেনানায়কদের যমসদনে ধারণ করলেন। এটি আরব্য উপন্যাসের একটি বিখ্যাত কাহিনী। জনচেতনায় বিভিন্নতার তত্ত্ব স্থায়ী হয়।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে পশ্চিম ইউরোপে এক নূতন সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকশিত হতে থাকে। তার প্রাণবন্ত ছিল উন্নয়নশীল পুঁজিবাদ এবং রেনেসাঁস। ইউরোপের এই রূপান্তর ছিল সমকালীন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা। পুঁজিবাদের সঙ্গে সংযুক্ত হল শ্রুটেনশাফ্ট নীতি। ক্রমশ ইউরোপ হয়ে উঠতে থাকল ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ চতুর্ভুজের কেন্দ্রবিন্দু। উন্নয়নের মাঝে পিছিয়ে পড়তে থাকল মধ্য এশিয়া, ভারত, চীন, উত্তর আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকা। ধনবাদী, সম্প্রসারণশীল, বিবিধ প্রযুক্তিতে সমুন্নত, এবং সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম ইউরোপে ক্রমশ এই ধারণাই বহুমূল হতে থাকল যে, সভ্যতায় ইউরোপই শেষ কথা। তার উপরে আর কিছু নেই। একদা শক্তিশালী তুরস্কের সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে যেতে থাকে। আকবর-এর পরে মুগল সাম্রাজ্য হয় কয়িযু। চৈনিক সাম্রাজ্যের অবক্ষম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লাতিন আমেরিকায় মায়্যা সভ্যতা, ইনকা সভ্যতা তলিয়ে যেতে থাকে। এমনভাবেই ইউরোপই হয়ে ওঠে প্রগতির ও উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইউরোপ জ্ঞানালোকে দীপ্তিমান। ইউরোপে উদ্ভাবিত হল প্রাচ্যবাদ বা ওরিয়েন্টালিজম্। তার মধ্যে একটা প্রধান কথা ছিল সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা, যা অধুনা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদের বিকল্প হয়ে উঠেছে।

ওরিয়েন্টালিজম্ সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক

এডওয়ার্ড ডব্লু. সেড্। “ওরিয়েন্টালিজম্” নামক এই সন্দর্ভটি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও এখনও সুপ্রচলিত। এখন সেড্-এর অধ্যয়ন আলোচ্য। তার পরে তাঁর মতের বৈচারিক মূল্যায়ন করা যাবে। সেড্ প্রাচ্যবাদের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করেছেন। বঙ্গানুবাদে তা এইরূপ :

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে মৌল পার্থক্যের যে বহুমূল ধারণা অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান, এবং সেই জ্ঞানের প্রকৃতি ও কারণ বিষয়ক বিশেষ তত্ত্ব, তাকেই বলা যায় ওরিয়েন্টালিজম্।

সংজ্ঞাটি নিঃসন্দেহে অটল এবং দৃঢ়পাচ্য। সেড্ বোধ হয় এই ভেবেছেন যে, প্রাচ্যবাদ এক ধরনের দার্শনিক বিচারধারা, যাতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দুইটি আলাদা “গুপ” রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিচারধারা পাশ্চাত্যে রচিত সাহিত্যে, ঐতিহাসিক বিবরণে, ভৌগোলিক এবং নৃতাত্ত্বিক বিবরণে, ভ্রমণ-সাহিত্যে, ধর্মবিশ্বাসের তুলনামূলক বিচারে পুষ্ট এবং পল্লবিত হয়। অর্থাৎ, ওরিয়েন্টালিজম্ কেবল মাত্র একটি সরল ও নিষ্পাপ জ্ঞানতত্ত্ব নয়। তা প্রাচ্যের সভ্যতার এবং কৃষ্টির অপব্যাখ্যা করার এমন একটি উপায়, যা পাশ্চাত্যের সভ্যতা এবং কৃষ্টিকে অবধারিত ভাবে শ্রেষ্ঠতর এবং যোগ্যতর প্রতিপন্ন করে। প্রাচ্যবাদে এই ধারণাই পুষ্ট এবং পল্লবিত হয় যে, ভারতবর্ষে শুধু সাপ, হনুমান, ঝাঁড় আর যাদুবিদ্যাই আছে। চীনে আছে সংখ্যাশীত আকিংশের হতদরিদ্র মানুষ, যারা খেতে পায় না, অথচ বহু বিবাহ করে। আর, ইসলাম হচ্ছে একটা সভ্যতা-বিরোধী ধর্ম, যা মানুষের চরিত্র নষ্ট করে এবং ধর্মের নামে ঘটায় রক্তস্রোত। প্রাচ্যবাদের একটি নয়নমনোহর ফল হল “ইউরোসেন্ট্রিজম্” বা ইউরোপ-কেন্দ্রিকতা, যা এমন কী কার্ল মার্কস্-এর মতো সাম্যবাদী মানবতাবাদীকেও গ্রাস করে। বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে সেড্ প্রাচ্যবাদের এই সব বিনিশ্চয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বার বার এটাই বলতে চেয়েছেন যে, ঔপনিবেশিকতার মোহচ্ছন্ন প্রাচ্যদেশীয় বুদ্ধিজীবীগণ যখন নির্বিচারে ওরিয়েন্টালিস্ট অবধারণসমূহকে, বা যুক্তিসমূহকে গলাধঃকরণ করেন, তখনই এক দুঃখজনক সাংস্কৃতিক সাংকর্ষের সূচনা হয়।

সেড্ যে ভিত্তিহীন কথা লেখেননি তা আমরাও বহু প্রমাণের সাহায্যে দেখাতে পারি। পুরাতন লেখকদের পুরাতন বইপত্রের কথা তোলার দরকার নেই। সেড্-এর গ্রন্থে সে সব বিদ্যুত ভাবে আলোচিত হয়েছে। ইউরোপ-কেন্দ্রিকতা যে কী সুমধুর হয়ে উঠতে পারে, তার একটা সাম্প্রতিক প্রমাণ বিখ্যাত ফরাসি ঐতিহাসিক ফার্নান্দ ব্রদেল রচিত ‘সিভিলাইজেশন্স আণ্ড্ কাপিটালিজম্’ নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। কলকাতার ঐতিহাসিকগণ ব্রদেল্-এর প্রশংসায় অদ্যাবধি পঞ্চমুখ। তার প্রধান কারণ ব্রদেল্-এর অসামান্য পাণ্ডিত্য। কিন্তু এটা দেখা হয় না যে, ব্রদেল তাঁর রচনায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু ইউরোপকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশেষ ভাবে এশিয়ার প্রসঙ্গ

সর্বদাই প্রান্তিক কিংবা গৌণ। ব্রদেল এটাই দেখাতে চেয়েছেন যে, পুঁজিবাদদ্বারা মানব সভ্যতা যেভাবে সম্প্রসারিত এবং পল্লবিত হয়েছে, তার কোনও সমান্তর প্রাচ্যদেশীয় কোনও প্রাচীন ও মধ্যকালীন সভ্যতায় দেখা যায়নি। কথটা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয় এই হয় না যে, পুঁজিবাদের আগে মানব সভ্যতা ছিল না। আগের এবং পরবর্তী অবস্থার বিচার ছাড়া যে পুঁজিবাদের সঙ্গে মানব সভ্যতার সম্পর্ক পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয় না, এই ঐতিহাসিক সত্যার্থপ্রকাশ ইওরোপ-কেন্দ্রিকতায় দুনিরীক্ষা।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বহু চর্চিত ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। এখন তো ভূস্বর্গ বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই প্রায়শ চিহ্নিত করা হয়। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রকে স্বর্ণ ভাবার, এবং আমেরিকানদের দেবতা ভাবার যুক্তি যে কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে, তা দেখাবার জন্য আমি ১৯৯৯ সালে ২৬শে সেপ্টেম্বর “বর্তমান” পত্রিকায় প্রকাশিত “অমৃতকথা” থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করি :

শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সুন্দর এবং তাঁর পার্বদেও অত্যন্ত সুন্দর। যাঁরা পূর্বজন্মে পুণ্যকর্ম করেছেন, তাঁরা এই জড় জগতে উচ্চকূলে এবং উচ্চজাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকার মানুষেরা খুব ঐশ্বর্যশালী এবং সুন্দর। তাঁদের ঐশ্বর্য তাঁদের পূর্বজন্মের পুণ্যকর্মের ফল। পৃথিবীর সব কাটি দেশের মানুষ আমেরিকার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, কেন না আমেরিকা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-সম্পদ সৌন্দর্য ইত্যাদিতে উন্নত।

এই হল আধুনিক ওরিয়েন্টালিজম্-এর “অমৃতকথা”, যা আমাদের মধ্যে ধর্মের মোড়ক দিয়ে পরিবেশন করা হচ্ছে।

সেড্ দেখিয়েছেন যে, বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যখন অনভিপ্রেত ভাবে কল্লনা মিশ্রিত হয়, তখন ওরিয়েন্টালিজম্ বিচিত্র রূপ ধারণ করে। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো এ বিষয়ে দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর “দি আর্কিওলজি অফ নলেজ্” এবং “ডিসিপ্লিন্ অ্যাণ্ড পানিশ্” গ্রন্থ দুইটিতে এই বিচিত্র এবং উদ্দেশ্যমূলক জ্ঞানবিচার আছে। ফুকোর মত গ্রহণ করে সেড্ এই বলতে চেয়েছেন যে, ওরিয়েন্টালিজম্ আসলে পিছিয়ে থাকা প্রাচ্যে সমুন্নত পাশ্চাত্যের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য উদ্ভাবিত একটি শক্তিশালী ভাবাদর্শ। ওরিয়েন্টালিজম্ আসলে ঔপনিবেশিকতার একটি জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব।

সেড্ স্বীকার করেছেন যে তিনি আন্তোনিও গ্রামসি-র চিন্তাধারার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। গ্রামসি বেসরকারি (সিভিল) এবং রাজনৈতিক (পলিটিকাল) সমাজের মধ্যে পার্থক্য বিচার করে এই মত প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক সমাজ নানা ভাবে বেসরকারি সমাজের উপরে “হেজিমনি” বা প্রভুত্ব বিস্তার করে। ওরিয়েন্টালিজম্ এইরূপ প্রভুত্ব বিস্তারের একটি

উপায় মাত্র। তা নৃতাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক বিনিময় সমূহ দ্বারা সমর্থিত হয়। এই সমস্ত বিনিময়ে সত্যের সঙ্গে সুকৌশলে মিথ্যা মিশ্রিত হয়। যেমন, এক সময়ে মান্যগণ্য ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ ভারতে মুসলমান শাসকদের ইতিবাচক অবদানসমূহ ছোট করে দেখিয়ে এবং নেতিবাচক পরিণামসমূহকে বড় করে দেখিয়ে এটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন পরমেশ্বরের আশীর্বাদ। যেমন, এখন গ্রামসি-কথিত “রাজনৈতিক সমাজ”-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে তথাকথিত “কেমব্রিজ ঐতিহাসিক”-গণ এই মত জোরাল যুক্তি দিয়ে প্রকাশ করে চলেছেন যে, ভারতে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা-সংগ্রাম বার বার কেবল মাত্র আঞ্চলিক স্বার্থকেই সামনে নিয়ে এসেছে। তাঁদের বিচারে ভারতীয়রাই পান্ড্য অর্ধ পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সাহেবদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাকে তাই “সাম্রাজ্যবাদ” বলা যায় না। এইরূপ মিথ্যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়, এবং সেই পরিবেশনের কর্মে কখন কখন ভারতীয় ঐতিহাসিকরাও অংশ গ্রহণ করেন। সেড় এই ধরনের ওরিয়েন্টালিজম্-এর বিপদ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করতে চেয়েছেন। জুসেড্-এর সময় থেকে ইসলামের যে বিদূষণ অদ্যাবধি অপ্রতিহত, তা অদ্যাবধি ওরিয়েন্টালিজম্-এর একটা প্রধান মাত্রা। এই মাত্রাটিকে পরিপুষ্ট করেছেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে প্রধান একজন লেখক হলেন বিখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক গুস্তাভ ম্যুবেয়ার।

কোন কোন লেখকের রচনায় কখন কখন “প্রাচ্যপ্রেম” দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের এই প্রেম ছিল অনুন্নতদের উপরে কর্তৃত্বভ্রাত শ্রীতি মাত্র। এই শ্রীতিতে সমদর্শনের অভাব পরিস্ফুট। কখন কখন এই শ্রীতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্কারের এবং পরিবর্তনের বিরোধী হয়ে ওঠে। ভারতের ক্ষেত্রে একদিকে থাকেন আমূল সংস্কারের প্রস্তাবক মেকলে সাহেব। অন্য দিকে থাকেন সংস্কারবিরোধী ভারততত্ত্ববিদ সাহেবরা, যারা ছিলেন বেদবেদান্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই দুই মতেই ওরিয়েন্টালিজম্-এর দুইটি ধারা প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক সমাজে যুগনন্দ হয়েছে। সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীগণ সংস্কার করা হবে কী হবে না, এই প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কে প্রজন্মে এবং বিজন্মে মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন।

রিচার্ড বার্টন ইসলাম এবং আরবীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞানার্জন করে। তাঁর দ্বারা যেভাবে আরব্য উপন্যাস ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল তার কোনও তুলনা ছিল না। কিন্তু এই অনুবাদে যে জ্ঞানগর্ভ টিকা তিনি সংযুক্ত করেছিলেন, তাতে মাঝে মাঝে তিনি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের যৌন জীবনের অস্বাভাবিক নানা রকমের প্রবণতা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে এই বোঝাতে চান যে, আরব দেশের অধিবাসীদের মৌল “সেমিটিক” চরিত্রেই এইরূপ অস্বাভাবিকতা ছিল স্বাভাবিক। এই ধরনের রচনাবলিতে

এই ভাবই স্পষ্ট যে, প্রাচ্য কখনও কোনও কারণে লক্ষ্যায় লাল হয় না। প্রাচ্যের মানুষ ভয় পায়, ঘৃণা করে, কিন্তু লক্ষ্য পায় না। এইরূপ মধ্য-ভিক্টোরীয় মূল্যায়ন সকলেই মেনে নিতে পারেননি। পরবর্তীকালে টি. ই. লরেন্স তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “দি সেন্ডেন্স পিলাস্ অফ উইল্ডার্নেস্”—এ, এবং এইচ. এ. আর. গিবস্ তাঁর ইসলাম ধর্ম বিষয়ক অধ্যয়নে এই ধরনের ওরিয়েন্টালিস্ট সাধারণীকরণের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। তাঁদের অনেক আগেই অবশ্য হোরেস হোমান্ উইলসন্ জেমস্ মিল্-এর উপযোগবাদভিত্তিক ইতিহাস রচনার বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার গভীরতর এবং ব্যাপকতর অধ্যয়নের মূল্য স্বীকার করেছিলেন অধ্যাপক সিলভা লেভি। কিন্তু ওরিয়েন্টালিস্ট সাহিত্যের অসাধারণ সাংস্কৃতিক মূল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও এডওয়ার্ড সেড্ ভেবেছেন যে, তাতে, কখন কখন সদিচ্ছা প্রকাশিত হলেও, ছিল এক অটল ও বহু স্তর ঔপরিকতা বা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। রিচার্ড বার্টন এবং শুভাঙ্ক ফ্লেবোয়ার্-এর মতো প্রতিভাশালী লেখকগণও তার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি।

এখন সেড্-এর গ্রন্থটি সম্বন্ধে দুই একটি তথ্য আলোচ্য। তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রধানত নিকট প্রাচ্য এবং মধ্য প্রাচ্যের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশেষ ভাবে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে ওরিয়েন্টালিস্ট সাহিত্যে যে বিবেচনা দেখা যায়, প্রায় সর্বদা তারই সমালোচনা করেছেন তিনি। দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা বিকল্প। ভারতবর্ষ এবং মহাচীন ছিল ওরিয়েন্টালিজম্-এর কেন্দ্রবিন্দু। এই বিশেষ তথ্য সেড্-এর জানা থাকলেও তিনি বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেছেন। এই বিষয়ের গভীরতর অধ্যয়ন অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে চিরায়ত ওরিয়েন্টালিজম্ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দ্বারা যে স্বীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, তা সেড্ আলোচনা করেননি। বিশেষ ভাবে এই ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার পণ্ডিতদের অধ্যয়ন যে প্রচলিত ওরিয়েন্টালিজম্ থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন ছিল, তা দেখাবার প্রয়োজন ছিল। ইউরোপে, আমেরিকায়, এবং জাপানে ক্রমশ এক বিশেষ ধরনের গবেষণা প্রচলিত হয়। তাতে প্রাণাধুনিক সাহিত্য বিচারে মূল্যানুসন্ধান, এবং মৌল রচনাবলির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেতে থাকে। অজ্ঞানতাপ্রসূত সাধারণীকরণ এই ধরনের ওরিয়েন্টালিজম্-এ সমর্থিত হয়নি।

ওরিয়েন্টালিজম্-এ অস্ফুট বা সুপরিষ্ফুট বিভিন্ন ধরনের মতলব বা কুবুদ্ধি যে ছিল, সেড্-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণ পড়ে তা না মেনে উপায় থাকে না। কিন্তু একথাও না মেনে উপায় থাকে না যে, তার কতগুলো ধারা সামগ্রিক ভাবে জ্ঞানচর্চাকে বিশ্বয়কর ভাবে সম্প্রসারিত করেছে। এই বিষয় সম্বন্ধে সেড্ প্রায় নির্বাক। বিশেষ কোন ধর্মবুদ্ধির দ্বারা, বা সঙ্গীর্ণ

জাতীয়তাবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে ওরিয়েণ্টালিস্ট রচনাসমূহের কঠোর সমালোচনা অর্থবহ হয় না।

সেড্‌ ভেবেছেন যে, ওরিয়েণ্টালিজম্ ছিল অদ্ভুত এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। অসম্পূর্ণতা ছিল তার প্রধান লক্ষণ। প্রথম ভাবনাটি গ্রাহ্য। দ্বিতীয় ভাবনাটি আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। মরিস বিণ্টারনিৎস রচিত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, কিংবা মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্-এর সংস্কৃত অভিধান অসম্পূর্ণ? হার্বটআইলস্-এর অতুলনীয় রচনা, চীনের সাহিত্যের ইতিহাস, কিংবা হিট-রচিত আরবদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ? এ ধরনের একটিও রচনা বহুভাষাবিদ এডওয়ার্ড সেড্‌ আলোচনা করেননি। ওরিয়েণ্টালিস্টদের মধ্যে সকলেই প্রাচ্যকে নিজেদের ঔপরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি।

এটাই বলা উচিত যে, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার যে উন্নত আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তার আলোকেই আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। কিন্তু আমরা ওরিয়েণ্টালিজম্-এর প্রতিস্পর্শী জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার কোনও আদর্শ অদ্যাবধি স্থাপন করতে পারিনি। এখন তো জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার “বিশ্বায়ন” স্বত্ত্বসিদ্ধ। কিন্তু তার কার্যকারণ যাই হোক না কেন, বিশেষ ভাবে আমাদের দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে, সেড্‌-এর ভাষায়, তা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক ভারতে বিদ্যাচর্চার বিবিধ অনুপপত্তির সুন্দর বিশ্লেষণ করেছিলেন এডওয়ার্ড শিলস্, তাঁর “ইন্টেলেকচুয়াল বিটুইন্‌ ট্রাডিশন্‌ অ্যান্ড মডারনিটি : দি ইণ্ডিয়ান সিচুয়েশন্‌” (দি হেগ্‌, ১৯৬১)-নামক গ্রন্থে। তিনি দেখেছিলেন যে, ভারতের বুদ্ধিজীবীগণ প্রধানত পাশ্চাত্যের মেট্রপোলিস্, অর্থাৎ প্যারিস, লন্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, নিউর্ক থেকে সর্বদা বিদ্যাবুদ্ধি ধার করেন। এ ভাবে কেবলই স্বগত হয়ে তাঁরা নিজেদের প্রাদেশিকতাকেই সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। এ জন্য ওরিয়েণ্টালিজম্‌কে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এখনও বক্সিমচন্দ্রকে বুঝবার জন্য একজন বাঙালি লেখক বক্সিমচন্দ্রে উল্লেখ দুই একবার পাদটীকায় করে সংখ্যাভীত সাহেবি রচনার সাহায্য গ্রহণ করেন। মহাশ্বেতা দেবীর “স্তনদায়িনী” নামক গল্পটির বিশ্লেষণের জন্য দেবিদা, ফুকো, চম্‌স্কি, “গঠনতত্ত্ব”, “উত্তরাধুনিকতা” প্রভৃতি মেট্রপোলিটান্‌ সূত্র ধার না করলে চলে না। চিন্তার এবং জ্ঞানচর্চা ক্ষেত্রে দিগন্ত থেকে দিগন্তে প্রসারিত এই যে ঔপনিবেশিক মানসিকতা, তাকে জয় করতে হলে সাহস চাই। এখন তারই বড় অভাব।

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

অরুণকুমার বসু

অতীত দিনের স্মৃতি

১৩৩৬-এ প্রকাশিত চোখের চাতক কাব্যে নজরুলের একটি সুপরিচিত গান আছে :

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি
কেউ দুখ সয়ে কাঁদে কেউ ভুলিতে চায় গীতি।
কেউ শীতল জ্বলে হেরে অশনির জ্বালা
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে তার শুষ্ক কুণ্ডলীধি।

শচীন সেনগুপ্তের 'রক্তকমল' নাটকের গানে সুর সংযোজনা ও সংগীত নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন নজরুল। এই গানটি সেই নাটকের মাধ্যমেই শহর কলকাতায় দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সরযুবালা ইন্দুবালার মতো শিল্পীদের গায়নভঙ্গির শুণেই তা সম্ভব হয়েছিল। 'রক্তকমল' মঞ্চস্থ হয় ১৯২৯ সালে। তার প্রায় পনেরো বছর পরে সম্ভোষ সেনগুপ্তের কণ্ঠে গানটির রেকর্ড প্রকাশিত হয়।

বর্তমান নিবন্ধের পক্ষে এই গানটির রচনা ও প্রকাশের ইতিহাস অবশ্য অবিচ্ছিন্ন সংলগ্নতায় জড়িত নয়। তবে নজরুলের জীবনে তাঁরই নিজের কয়েকটি গান খুবই আশ্চর্যভাবে ভবিষ্যৎ-সংকেত হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং কারাবরণ করার আগেই তিনি লিখেছিলেন 'কারার ওই লৌহকপাট' পুত্রশোক পাওয়ার অনেক আগেই লিখেছিলেন :

কোন সুদূরের চেনা বাঁশির ডাক শুনেছিল ওরে চখা

ওরে আমার পলাতকা।

(১৩২৮, ছায়ানটে সংকলিত)

তাঁর বিদ্রোহ বিপ্লব জীবনের সংস্পর্শে এসেছিলেন অনেক মানুষ, এসেছিলেন শ্রীতি-ভালোবাসা স্নেহস্পর্শ নিয়ে। সে সব অতীত দিনের স্মৃতিও কেউ ভুলে গেছেন, কেউ ভোলেননি।

যাঁরা ভোলেননি, তাঁরাও কি সকলেই না ভোলার দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করেছেন?

গুণ্ডাঘোষের কাণ্ডকারখানা

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে নজরুল ইসলাম মন্ডির বিরল রোগে আক্রান্ত হলেন। দ্রুত তাঁর চৈতন্যের শত সহস্র ডালপালায় হুড়িয়ে পড়ল

সেই মারাত্মক ব্যাধি। মজ্জি-বিকৃতির বাহ্য লক্ষণে নানা চিকিৎসক নানাভাবে তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সমস্ত স্মৃতি চৈতন্য বুদ্ধি ইত্যাদি হারিয়ে নজরুল হয়ে পড়লেন এক জড়বৎ জীবদেহ, একালের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের যে বিপুল করুণ অপচয়ের কোনো প্রতিভুলনা নেই। শেষ হল সৃষ্টি সুখের উল্লাসের এক আশ্চর্য ইতিহাস।

তারপর শুরু হল সৃষ্টি-মূকের উল্লাসের আরেক ইতিহাস। যে মুক জড়বৎদেহ নিজে নজরুল বেঁচে ছিলেন ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই ইতিহাসও সেই দিন পর্যন্ত এসে—

না, খামল না/এখনো চলেছে হয়তো কিছু দিন আরও চলতেই থাকবে।

নজরুলের সঙ্গে বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে সাহিত্য-শিল্প-রাজনীতি সাংবাদিকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যারাই অখণ্ড বসে নেতৃত্ব দিয়েছেন বা যুক্ত ছিলেন প্রায় সকলেরই কমবেশি যোগ ঘটেছিল। তাঁদের অনেকেই নজরুলের স্মৃতিচারণা করেছেন। এঁদের স্মৃতি কথা কিন্তু নজরুল-জীবনীর অনুকূলে যথেষ্ট উপকরণ সরবরাহ করেনি। একমাত্র কমরেড মুজফ্ফর আহমদই নজরুল-জীবনীর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য উপাদান তাঁর স্মৃতিভাণ্ডারে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে নজরুলের স্মৃতিচারণা সম্ভব ছিল না। কবির সান্নিধ্যে যারা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, নলিনীকান্ত সরকার, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আকবরউদ্দীন, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিমল গোস্বামী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সজনীকান্ত দাস, আব্বাসউদ্দীন, শান্তিপদ সিংহ, নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, আবদুল কাদির, অসিমউদ্দীন, খান মুহম্মদ মহিনুদ্দীন, শামসুন্নাহার মাহমুদ, সূফী জুলফিকার হায়দার, মোহাম্মদ মহিফুজউল্লাহ, এমন অনেকগুলি নামের উল্লেখ করা যায়, যাদের লিখিত স্মৃতিচারণগ্রন্থে নজরুল-প্রসঙ্গ অনেকটাই আছে।^১ বিচ্ছিন্ন স্মৃতিচারণার ক্ষেত্রে অখিল নিয়োগী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অমরদাশঙ্কর রায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য, অমরেশ কাঞ্জিলাল, শামসুল হুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী আনোয়ারুল কাদির, আবদুল খালেক, আবদুল হালিম, আবদুল কালাম শামসুদ্দীন, আসাদুজ্জামান, এনামুল হক, কালীপদ গুহ, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভা বসু, বুদ্ধদেব বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিজয় মোদক, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, হুমায়ুন কবীর, মোহিতলাল মজুমদার, শওকত ওসমান—এইসব নাম মনে আসে।^২ অবশ্যই সম্পূর্ণ তালিকা পেশ করার দায়িত্ব বহন করতে চাইনি

এখানে। এঁরা ছাড়া গানের জগতের অনেকের স্মৃতিকথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করতে হয়। স্মৃতিচারণ করেছেন আশুরবালা, ইন্দুবালা, আব্বাসউদ্দীন, চিত্ত রায়, জগৎ ঘটক, নিতাই ঘটক, সুপ্রভা সরকার, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, গোপাল সেন, গিরীন চক্রবর্তী, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, গোলাম মোস্তাফা, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মণ, যুধিকা রায়, সরযুবালা, সারদা শুভ, বরদা শুভ, ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, কমল দাশগুপ্ত, ফিরোজা বেগম, সন্তোষ সেনগুপ্ত, জগন্ময় মিত্র—হয়তো এ তালিকা দীর্ঘতর হতে পারে। বাংলা দেশের নজরুল গবেষণা ও নজরুল-চর্চার বিবরণে এই জাতীয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্মৃতিচারণলব্ধ তথ্য একত্র করলে পরিমাণ কম হবে না।

স্মৃতিচারণার পদ্ধতি সকলের এক নয়। মুজফ্ফর আহমদ যেমন নজরুল-জীবনের যতটুকু অংশ আপন অভিজ্ঞতার জগতে পেয়েছেন, বিশ্বাসজনক তথ্য দিয়ে বিন্যস্ত করেছেন। কয়েকজনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলে এমন কিছু আমরা পাঠ করেছি যার সত্যতা যে কোনো পাঠকের কাছেই সন্দেহজনক মনে হবে। সর্বাধিক সন্দেহ লেখা সংগীতের এলাকা থেকে এসেছে। এঁদের ইতিহাসবোধ অত্যন্ত আদিম স্তরের। সাল-তারিখের কোনো ধার ধারেন না এঁরা। কল্পনা ও বাস্তবের সীমারেখা মুছে দিতে ইতস্তত করেন না কখনো। এঁদের স্মৃতিচারণ প্রায় সবই নজরুলের স্মৃতিলোপের পরবর্তী সময়ের যখন সেগুলির সত্যাসত্য নিয়ে নজরুলের দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ বা প্রশ্নের আর সামান্যতম সুযোগও নেই। এরা অবলীলায় বলে গেছেন এমন অনেক কথা যা কোনো সাল-তারিখ দিয়ে সমর্থিত হয় না। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরোক্ষ কিছু সাক্ষ্য প্রমাণে সন্দেহের মাত্রা বাড়ায়।

নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ এবং পরবর্তী একাধিক সাক্ষাৎকার নিয়ে অনেক গালগল্প ইতিপূর্বে অনেকের আলোচনায় বিস্তারিত হয়েছে, তাই সেগুলি এখানে পুনরুক্ত হয়নি।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর মোহিতলাল মজুমদার তাঁর লেখা পূর্বপ্রকাশিত 'আমি' নামক একটি রচনার সঙ্গে নজরুলের কবিতার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে তাকে অপহরণ বলে প্রচার করেছিলেন। সে কাহিনী প্রায় সকলেই জানেন। নলিনীকান্ত সরকার তাঁর 'আসা যাওয়ার মাঝখানে' (২য় পর্ব ১৩৯২) বইতে প্রসঙ্গটির সংক্ষেপে এই রকম বিবরণ দিয়েছেন:

"বিজলীতে 'বিদ্রোহী' বেরোবার পর থেকেই মোহিতলাল নজরুল বিমুখ হয়ে পড়েছেন। একদিন সকালবেলায় আমি কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট ধরে যাচ্ছি, মাঝপথে মোহিতলালের সঙ্গে দেখা। একথা সেকথার পর এল নজরুলের প্রসঙ্গ। এল 'বিদ্রোহী'র কথা। মোহিতলাল আমাকে বললেন—জানো, বিদ্রোহী আমার একটি লেখা থেকে চুরি?"

বলেন কি মোহিতলাল? নজরুল মোহিতলালের একান্ত স্নেহের পাত্র। তাঁর মুখে এ কি কথা! আমি বললাম—“মোহিতদা, আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না, আমি নজরুলের কাছে “বিদ্রোহী”র খসড়া কপি দেখেছি।”

মোহিতদা বললেন—“বিশ্বাস হ'লো না? আচ্ছা, আমার যে লেখা থেকে চুরি, সেটা তোমাকে দেখাবো একদিন।”

মোহিতলাল তাঁর লেখাটি দেখালেন একদিন। লেখাটি বেরিয়েছিল ১৩২১ সালের পৌষ মাসের “মানসী”তে। শিরোনাম—“আমি”। গদ্য প্রবন্ধ।

লেখাটি পড়ে মনে হ'লো, মোহিতলাল হয়তো কোনোদিন নজরুলকে তাঁর এই প্রবন্ধটি শুনিয়ে থাকবেন। এটি শোনার ফলেই নজরুলের মনে “বিদ্রোহী” রচনার সঙ্কল্প জাগে। মোহিতলালের “আমি” পড়লে পাঠকের মনে হবেই যে, এই কবিতা থেকেই নজরুল “বিদ্রোহী”র প্রেরণা পেয়েছেন। তাই ব'লে চুরি।

মানুষের এ একটা অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব। মোহিতলালের “আমি”-র খবর কেউ রাখে না আর নজরুলের “বিদ্রোহী” সারা দেশে একটা তুমুল আলোড়ন তুললো। মোহিতলাল অত্যন্ত চম্পক হয়ে উঠলেন।

একদিন সকালবেলায় ‘ভারতী’র আড্ডায় গিয়ে দেখি—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একটি আরামকেন্দ্রারায় অর্ধশায়িত অবস্থায়, আর পাশের কেন্দ্রারায় ব'সে মোহিতলাল বাঁধানো ‘মানসী’ খুলে তাঁকে “আমি” প্রবন্ধটি শোনাচ্ছেন।

সন্ধ্যার পরে ৩৮ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে গজেনদার আড্ডাখানায় গেছি। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, গিরিজাকুমার বসু, নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রমোদকর আতর্ষী প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক উপস্থিত,— মোহিতলাল ঘরে ঢুকলেন, হাতে বাঁধানো ‘মানসী’, “বিদ্রোহী” যে মোহিতলালের লেখা থেকে চুরি, একথা মোহিতলাল সর্বত্র প্রচার ক'রে বেড়িয়েছেন, এখন চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার জন্যে ‘মানসী’ নিয়ে ঘুরছেন। এখানে সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি “আমি” প্রবন্ধটি পড়লেন। দুটি শব্দের প্রতি সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন—“বলুন আপনারা, এ চুরি কি না।” শব্দ দুটি হচ্ছে—“মহামারী” আর “উন্মাদ।” মোহিতলালের প্রবন্ধের ঐ দুটি শব্দ আছে নজরুলের “বিদ্রোহী”র মধ্যে। শব্দ দুটির উল্লেখ ক'রে মোহিতলাল বললেন—“বলুন আপনারা এ চুরি কি না।”

আমি হঠাৎ ব'লে বসলাম—“ও-রকম চুরি রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও আছে।”

সত্যেন্দ্রনাথ যেন ফণা-বিস্তার করে গর্জে উঠলেন—“রবীন্দ্রনাথের লেখাতে চুরি! কোথায় দেখলেন আপনি?”

বললাম—“ঐ খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এলো আশ্বিনের আভিনায়” গানটি রবীন্দ্রনাথের চুরি।”

সত্যেন্দ্রনাথ চোখ রাত্তা করে বললেন—“কোথেকে চুরি করেছেন?”

বললাম—“গুপ্তপ্রেস পত্রিকা থেকে। ওর মধ্যে শ্রাবণ আর আশ্বিন, দুটো শব্দই আছে।”

সকলে হেসে উঠলো। মোহিতলাল গম্ভীর।” (পৃঃ ৭৪-৭৫)

নলিনীকান্ত সরকার সুরসিক ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেদিনের রসিকতাহীন পরবর্তীকালে এমন সত্য হয়ে উঠবে তিনিও বুঝতে পারেননি। অর্থাৎ নজরুলের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে গুপ্তপ্রেসের কাণ্ডকারখানা কতদূর প্রসারিত হতে পারে, তাঁর জ্ঞান ছিল না।

তথ্য কতটা শুদ্ধ করা যায়, কতটা কল্পনায় মুড়ে প্রকাশ করা যায়, নজরুলবিষয়ক স্মৃতিচারণা থেকে তারই দু-চারটি গুপ্তপ্রেস পত্রিকা উদ্ধার করা যাক।

দিলীপকুমারের স্বসিরাধিতা

এই প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায়ের উল্লেখ অবশ্যম্ভাব্য। সুদর্শন বহুভাববিদ, অসাধারণ কণ্ঠ সম্পদের অধিকারী, কবি-সাহিত্যিক-গীতশ্রদ্ধা দিলীপকুমার নজরুলের গজল গানগুলির জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নানা সভা-সমাবেশে বারবার সেগুলি গেয়ে। ১৯২৬-এর মে মাসে কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনে নজরুলের সদ্যরচিত ‘দুর্গম গিরি-কান্তার-সর’ গানটি নজরুলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনিও গেয়েছিলেন বলে জ্ঞানো যায়। নজরুলও তাঁর গুণমুগ্ধ শুভানুধ্যায়ী এই অগ্রজ শিল্পীকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর ‘বুলবুল’ গীতি সংকলনটি (নভেম্বর ১৯২৮)। নজরুল যখন রেকর্ড আভ্যন্তরীণ গণমাধ্যমের সহায়তা পাননি, তখন দিলীপকুমারের কণ্ঠ আশ্রয় করে কবির গান যে বৃহত্তর শ্রোতার কাছে পৌঁছতে পেরেছিল, নজরুলের কৃতজ্ঞতার কারণ ছিল সেখানেই। তাই লিখেছিলেন বুলবুল-এর উৎসর্গপত্রে :

আমার শুধু এ বাণী হে বন্ধু আমার শুধু এ গান
তুমি তারে দিলে রূপরসিমা, তুমি তারে দিলে প্রাণ।
আমার ব্যাখ্যায় বেঁধেছিল নীড় যে গানের বুলবুলি
আপনি আসিয়ে আদরে তাহারে বন্ধে লইলে তুলি।

আমার পাখির কণ্ঠে মিশালে তোমার দরদ লয়ে
আমার বেদনা বাজে আজ তাই সবার বেদনা হয়ে।

১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারি দিলীপকুমার যখন বিদেশ যাত্রা করেন তখন নজরুল তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এই বলে :

বন্দী-দেশের আনন্দবীর আনবে তুমি জয় করি
ইন্দ্রলোকের উর্বশী নয়, কণ্ঠলোকের কিম্বরী।
শ্বেতবীরের সুরসভায় আজকে তোমার আমন্ত্রণ
অস্ত্রে যারা রণ জেতেনি বীণায় তারা জিতল মন।

কিন্তু ‘সাদীতিবী’ গ্রন্থে (১৯৩৮) ১৯ অধ্যায়ে দিলীপকুমার পারসিক ও উর্দু গজল নিয়ে বিশ্বর আলোচনা করে, অতুলপ্রসাদের গজলের প্রশংসা করে ও বাংলায় গজলের সম্বন্ধা বিষয়ে কিছু প্রাজ্ঞোক্তি করে প্রীতিভাজন নজরুল সম্পর্কে লিখলেন :

“এরপরে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীতের উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে লেখার সময় এখনো আসেনি—সাময়িক রুটির চঞ্চলতার জোয়ারভাঁটা এখনো বড়ো বেশি প্রকট গোলমাল একটু থিতুয়ে যেতে দেওয়া দরকার। আরো দশ পনেরো বছর পরে তবে তাঁর গানের গুণমূল্য নির্ধারণ করা যাবে নিরপেক্ষ অনাসক্ত মনে, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান কলহের শোচনীয় সাম্প্রদায়িক আঁধি একটু সরে যাওয়ার পরে। কারণ শিল্পীর বিচারে সব আগে ভোলা চাই তাঁর ধর্ম বিশ্বাস। আবদুল করিম মুসলমান ছিলেন না হিন্দু ছিলেন, না আফ্রিকার নিগ্রো ছিলেন একথা তাঁর গানের রসভোগের সময় যদি একধারও স্মরণ হয় তো মহতী বিনষ্টি।”

স্ববিরোধিতার অনন্য উদাহরণ! শিল্পীর বিচারে তাঁর ধর্মবিশ্বাস আদৌ বিচার্য নয় যিনি বলেন, তিনিই জানালেন, শোচনীয় সাম্প্রদায়িক আঁধি একটু দূরে সরে গেলে নজরুল সম্পর্কে মতামত জানাবেন! অথচ সেই শোচনীয় সাম্প্রদায়িক আঁধির মধ্যেই তিনি নজরুলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছিলেন ‘দুর্গম গিরি-কান্তার-মরু’ গান। তারপর নজরুলের কণ্ঠ যখন ব্যাধির কারণে শুক্ন হয়ে গেল তখন দিলীপকুমার তাঁর স্মৃতিচারণায় নজরুলকে সার্টিফিকেট দিলেন, সুরস্রষ্টা হিসেবে নজরুলের কোনো কৃতিত্বের কারণে নয়, নজরুলের সুরের উপর দিলীপকুমার নিঃস্ব কেরামতির সুযোগ পেয়েছিলেন বলে। তাঁর ভাষাতেই শুনি কথামূলি :

“কাজীর সঙ্গে আমার আর একটি মন্ত মিল ছিল এই যে, তার গানে সুরবিশ্বরের স্বাধীনতা সে আমাকে সানন্দেই দিত। যেমন দিতেন আমার পিতৃদেব ও অতুলপ্রসাদ। এ নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে আমার মতভেদে কাজী

ও অতুলপ্রসাদ দুজনেই ছিলেন আমার দিকে। আজ শুনি একদল ক্রিটিকের মুখে যে এ স্বাধীনতা অক্ষমণীয়। কিন্তু অতুলপ্রসাদ ও কাজীর অনুমতি পাওয়ার পরে এ সব রুক্ষ ক্রিটিকদের মাথানাড়া উপেক্ষা করা চলে।”

নজরুল তাঁর ঝাঁকড়া চুলের বাবরি ঝাঁকিয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় গাইতেন ‘জাতের নামে বজ্রাতি সব’, ‘শিকল পরা ছল মোদের’ প্রভৃতি গান। সেই স্মৃতি উদ্ধার করে দিলীপকুমার লিখেছেন,

“তখন আমাদের বৃকের মধ্যে কিসের বান-ডেকে যেত বলা ভার—
দুঃখের খেদ না ভণ্ডামির প্রতি ক্রোধ, কুসংস্কারের অগৌরব? কেবল একটা
কথা বলা যায় যে আমরা সবাই অভিভূত হয়ে পড়তাম তার আশ্চর্য
প্রকাশভঙ্গিতে : এ ধরনের চরণ কি স্বভাব প্রতিভাধর ছাড়া আর কারও
কলমে এমন স্বতোসোরে বইতে পারে? কাজী বিদ্রোহী কবি বটে। কিন্তু
সেই সঙ্গে নির্ভেজাল কবি। তাই বৃষ্টি তার বিদ্রোহে মানুষের মনে ছৌঁওয়া
লাগত এত ব্যাপকভাবে।”

এতে মনে হতে পারে এ সব গানে দিলীপকুমারও কণ্ঠ মেলাতেন। কিন্তু
ওই ‘কান্তারী হুঁশিয়ার’ ছাড়া নজরুলের আর কোনো গগনঙ্গীত তিনি আদৌ
গাইতেন বলে কোথাও তেমন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। বরং অন্যত্র তিনি নিজেই
বলে ফেলেছেন:

“এক সময় আমি তার নানা গানই গাইতাম, বিশেষ করে প্রেমের গান,
যথা, বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল, বসিয়া বিজনে
কেন একা মনে পানিয়া ভরণে চলল গোয়ী। এত জল ও কাজল চোখে,
কেন কাঁদে পরান কি বেদনায় কারে কহি, চেও না আর চেও না সুনয়না
এ নয়ন পানে, কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে, কে বিদেশী মন-
উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে, সখী বলো বঁধুয়ারে নিরঞ্জে, নিশিভোর
হল জাগিয়া পরান পিয়া, আমারে চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হয় কে গো
দরসী, করুণ কেন অরুণ আঁখি, গরজে গঞ্জীর গগনে কষু প্রভৃতি।” গীতপ্রাণ
দরদিকষ্ট এই শিল্পীর কণ্ঠের অবিনশ্বর স্পর্শে নজরুলগীতি শ্রোতার কানে
কী মধু বর্ষণ করত, তা আজ আর শোনার সুযোগ ঘটবে না। দুর্ভাগ্যবশত
তাঁর কণ্ঠে নজরুলের কোনো গানই রেকর্ড হয়নি। দুর্ভাগ্য এবং রহস্য দুইই।
সুরবিহারের নামে নজরুলের গান যথেষ্টভাবে নিজের আত্মোপিত বিস্তারে
গাইবার প্রবণতা তিনিই সমকালে চালু করেছিলেন যার অন্তর্ভুক্ত প্রভাব
নজরুলগীতির শুদ্ধতা পুনরুদ্ধারের পক্ষে আজও সক্রিয়।

তবে সে প্রসঙ্গ এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

পবিত্র ও শালস্তোত্র-প্রসঙ্গ কথা

সবুজ পত্র ও কম্বোল যুগের লেখকদের অকৃত্রিম শুভৈষী সুস্থদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিতেও নজরুলকে অনেকটাই স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর ‘চলমান জীবনে’র দ্বিতীয় পর্ব প্রথম সংস্করণে (১৩৬১) তাঁর সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাতের যে বিবরণী আছে তার স্থান বত্রিশ কলোজ স্ট্রিটের সেই বিখ্যাত মেসবাড়ি। এ বিবরণের সত্যতায় সংশয়ের অবকাশ নেই বলেই মনে হয়। তবু দু’একটা কিন্তু থেকেই যাক।

নজরুল সদ্য কলকাতায় এসেছেন। শৈলজ্ঞানন্দের মেস থেকে বিতাড়িত হয়ে উঠেছেন মুজয়স্কর আহমদের ডেরায়। সবুজপত্র কার্যালয়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের খোঁজ করে এসেছেন। সে খবর পেয়েই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এসে নজরুলকে পেয়ে গেলেন। গেল্লি-পর্যায় নজরুলও আগন্তুককে পবিত্র গাঙ্গুলী বলে শনাক্ত করে ফেললেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :

“বাইরের ঘরে দুজনে এসে তন্তাপোশ জাঁকিয়ে বসলাম। প্রশ্ন করলাম, আমি যে পবিত্র গাঙ্গুলী একথা বুঝলে কি করে?

বুঝতে সময় লাগেনি, হেসে উঠল নজরুল। ‘সে যেন আসবে আমার মন বলেছে’ গেয়ে উঠল গানের কলিটা।”*

মাত্র তিরিশ-বত্রিশ বছর আগের স্মৃতি উদ্ধার করেছেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। যে গানটির উল্লেখ আছে এখানে, সে গানটি হল ‘সে আমার গোপন কথা শুনে যা ও সখী।’ তারই সঞ্চারীর ছন্দ :

সে যেন আসবে আমার মন বলেছে

হাসির পরে তাই তো চোখের জল গলেছে।

গানটি রবীন্দ্রসংগীতানুরাগী নজরুলের পক্ষে জানাতেও আপত্তি নেই, গাওয়াতেও না। কিন্তু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-কথিত সাক্ষাৎকারটির সময় যদি হয় ১৯১৯-২০, গানটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ তখনও রচনা করেননি। গানটির রচনা ও প্রকাশ ১৩৩২-এর বা ১৯২৫-২৬-এর আগে নয়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্য তাই বলছে।*

আরও আছে। নজরুল-পবিত্র আলাপচারণার মধ্যেই শৈলজ্ঞানন্দের আগমন ঘটল, পবিত্রের সঙ্গে পরিচয় হল, পরিচয় বন্ধুত্বে গাঢ়তর হল। তারপর শৈলজ্ঞানন্দ বললেন :

“তার চেয়ে নুরু একটা গান গা না।

বলতে দেরি সইল না; হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে নজরুল শুরু করে দিলে :

দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তুষায় হানে—

ঘর কাঁপিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সর্বত্র দুলিয়ে গেয়ে চলল নজরুল। প্রতিটি কথা স্পষ্ট, জোর করে উচ্চারণ করছে—যেন সুরের তলায় কথা চাপা না পড়ে। কিন্তু সব শেষে যখন গাইছে : ভয় নাহি ভয় নাহি। তখন সুর উঠেছে সপ্তমে, সকল ভয় যেন অপসারিত করতে চাইছে সব দিক থেকে। শুধু ঝরচৈত্রেয় অগ্নিবানের ভয় বিদূরণ করতে কেউ অতখানি উদাস্ত হয়ে উঠতে পারে না। তার সেই সুর এবং উচ্চারণের মধ্যে সর্বযুগের সর্বভয়হারা আশ্বাসবাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে, সবাইকে ডেকে বলছে মাইন্ডে।”

নজরুলের গান গাইবার ভঙ্গির নির্ভুল বর্ণনা। গানটি নজরুলের প্রিয় একটি রবীন্দ্রসংগীত* তাতেও সন্দেহ নেই এবং প্রিয় সুহৃদ পবিত্র নজরুলের কণ্ঠে সেটি একাধিকবারও শুনে থাকতে পারেন।

কিন্তু ঠিক সেইদিনই কি শুনেছিলেন? সত্যিই কি শৈলজানন্দের অনুরোধে নজরুল এটি গেয়েছিলেন? গাওয়া কি সম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে?

কারণ রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করেছিলেন আরও দু'বছর পরে বৈশাখ ১৩২৯-এ, এপ্রিল-মে ১৯২২, অসুস্থ রবীন্দ্রজীবনী তাই বলে।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত স্মৃতিচারণার আরও তথ্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করেছেন কেউ। নজরুল কারাদণ্ডিত হল ১৯২৩-এর বোলোই জানুয়ারি অর্থাৎ ১৩২৯-এর মাঘে। ফাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করলেন নজরুলকে তাঁর নতুন গীতিনাট্য বসন্ত। কারাগারে সেটা দিয়ে এলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। চৈত্রেয় শেষ দিকে নজরুলকে 'আনা হল হুগলি জেলে। এখানেই শুরু হয় নজরুলের সেই ঐতিহাসিক অনশন এবং তাঁর অনশন ভঙ্গের জন্য নানা প্রয়াস তৎপরতা অনুনয় ইত্যাদি। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শুভানুধ্যায়ীরা প্রায়ই সমবেত হতেন জেলের বাইরে, সেখানে একদিন 'নলিনীদা (নলিনীকান্ত সরকার) প্রস্তাব করলেন আমি উবু হয়ে বসলে তিনি আমার কাঁধে উঠবেন, তারপর আমি দেয়াল ধরে কোনমতে দাঁড়াতে পারলে তিনি উঠে পড়বেন পাঁচিলে। স্টেশনের দিকের পাঁচিলটা অপেক্ষাকৃত নিচু।...যে কথা সেই কাজ।”

এই বর্ণনা পাঠ করে নজরুল-জীবনীর উপকরণ-সংগ্রাহক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সংগতিবোধ গীড়িত হয়েছে। তিনি লিখেছেন :

“আমরা যারা হুগলির জেলে, হুগলির বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বারবার জেলে গেছি, তারা জানি এই জেলের প্রাচীরে ওঠা কত শক্ত। কারণ প্রাচীরটা প্রায় ১৫-২০ ফুট উঁচু হবে। এইসব অলীক কাহিনীর মাধ্যমে নজরুলকে নিয়ে নানাভাবে চলেছে আত্মপ্রচারণার মহড়া। হুগলি জেলের ওই প্রাচীরে উঠতে হলে তিনটি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাঁধের প্রয়োজন। তাতেও ওঠা যাবে কিনা সন্দেহ।”

অথচ স্বয়ং প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণাতেও তথ্যবিভ্রান্তি কম নেই। নজরুল হুগলি জেলে যখন অনশন শুরু করেন তার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ ‘বসন্ত’ উৎসর্গ করে নজরুলের কাছে তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নজরুল তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন :

“কারাবাসের প্রথম কিছুদিন নজরুলকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। কবিশুরু তাঁর বসন্ত নাটিকা নজরুলকে উৎসর্গ করলে জেলে ওঁর কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার ভার আমার উপর পড়ল। একটা সাধারণ ‘কনভিক্ট’কে ‘পোয়েট টেগোর’ বই ‘ডেডিকেট’ করেছেন শুনে তাক্ষব বনে গেল জেলার সাহেব ও ফিরিসি অফিসার ও পাহারাদার মহল। সমস্ত্রমে প্রশ্ন করল : ‘ইজ্-হি রীয়েসি সো গ্রেট এ ম্যান? থ্যাঙ্ক হেভেল’।”

তারপর অনশনসংবাদ শুনে বিচলিত রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন, যে তারবার্তা কর্তৃপক্ষ চেপে গিয়েছিল, নজরুলের হাতে দেয়নি। সুতরাং অনশনভঙ্গের দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের তারবার্তার সংবাদ নজরুলের জ্ঞানার কথা নয়। অথচ প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, যিনি অপরের স্মৃতিচারণার অসংগতি খুঁজেছেন, তিনি লেখেন :

“কবি নজরুল বিশ্বকবির তারবার্তা ও বসন্ত নাটকসহ আশীর্বাদ পেয়ে একটু চিন্তিত হলেন।”

তাতে চিন্তা পাঠকদেরই হয়। তা আরও বর্ধিত হয় যখন প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখিত এই বিবরণ পাঠ করা যায় :

“বিশ্বকবির তারবার্তায় ও বিরজাসুন্দরী দেবীর বহু সাধ্যসাধনায় এবং সরকার পক্ষের দাবি মিটানোর স্বীকৃতিতে মায়ের হাতের লেবুররস পান করে কবি নজরুল অনশন ভঙ্গ করলেন।”

স্মৃতিচারণায় কালগত বিচ্যুতি ঘটলে পরবর্তী জীবনীকারদের পক্ষে তা শুরুতর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় নজরুলের সামিথ্য লাভ করেছিলেন এবং নানা সূত্র থেকে তথ্যচয়ন করেছিলেন। তবু তাঁর কোনো কোনো লেখায় অসতর্ক উক্তিই অভাব নেই। বিশ্বনাথ দে সংকলিত ‘নজরুল স্মৃতি’ (১৯৭০) গ্রন্থে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখিত অংশটির নাম ‘কারাঙ্গীবনে কবি নজরুল’। তাতে আছে, জেলখানায় নজরুল যখন অনশন ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কারাসঙ্গীদের সমর্থন নিয়ে, তখন

“ধীরে ধীরে সকলে প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে চলেন। এই সময় বোধ হয় কবি নজরুল ‘মরণ বরণ’ গানখানি রচনা করেন।...

এই সময় বন্দীবন্দনা নামে আর একটি গান লেখেন।”

প্রথমে ‘এসো এসো ওগো মরণ’ অর্থাৎ ‘মরণ বরণ’ গানটির প্রসঙ্গ

দেখা যাক। গানটি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার ১৩২৮ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (অক্টোবর-নভেম্বর ১৯২১)। গানটি রচনার সময় নজরুল ছিলেন কুমিল্লায়। তারও বছরখানেক পরে নজরুলের কারাগারীবন শুরু হয়। ‘বন্দীবন্দনা’ গানটিও নজরুল তাঁর কারাবাসকালীন অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছিলেন, এই তথ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রাপ্ত স্ত বিবরণে লিখেছেন :

“ভোরবেলায় রাজনৈতিক বন্দীদের ফাইলে দাঁড়াতে হত। স্কুলে ড্রিলের সময় প্রথমে এসেই যেমন দাঁড়াতে হয় সেই রকম দাঁড়ানোকে ফাইল বলে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, বন্দীদের রাম দুই করে হেড জমাদার শুনত। গোনা হয়ে গেলে জেলের তার বিরাট ভুঁড়ি দুলিয়ে মূর্তিমান নির্বোধের মতো সেখানে ঢুকত। আর সঙ্গে সঙ্গে জমাদার বীভৎস চিৎকার করে বলে উঠত ‘সরকার সেলাম’। এই সরকার সেলামটা কবি ও অন্যান্য বন্ধুরা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তারা সঙ্গে সঙ্গে একটি করে ঠ্যাং সামনের দিকে তুলে দিতেন। পরে এই নিয়ে অনেক মারপিট হয়ে গেছে।...ভোরবেলায় এই ব্যাপারটির সঙ্গে উপরি-উক্ত বন্দীবন্দনা গানটির যোগাযোগ ছিল। এই প্রভাতী গান গেয়ে কবি নজরুল সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন।”

‘ভুঁড়ি-সোলানো’ জেলরের সামনে জমাদারের ‘বীভৎস চিৎকার’ এবং বন্দীদের ‘সামনে ঠ্যাং তুলে-দেওয়া’ দৃশ্যের সঙ্গে ‘বন্দীবন্দনা গানটির যোগাযোগ ছিল’ বাক্যটি পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতাকে তীব্রভাবে বিপর্যস্ত করে। গানটির ভাষা মনে পড়ে :

অজি রক্তনিশি-ভোরে

একী এ শুনি ওরে

মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে

ওই কাহারা কারাবাসে

মুক্তি হাসি হাসে

টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়াতলে।...

নজরুল রচনাবলী^{১০}-র গ্রন্থপরিচয় থেকে জানা যাচ্ছে, বিষের বাঁশি কাব্যভূক্ত উক্ত ‘বন্দী-বন্দনা’ গানটি ১৩২৮ মাঘ “নারায়ণে” এবং ৪র্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২৮ অগ্রহায়ণ সাধনা পত্রিকাতেও পুনর্মুদ্রিত হয়। সেখানে গানটির শিরোনাম ‘বিজয়-গান’। সাধনা এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় গানটির নিম্নে স্থানের উল্লেখ আছে—‘কান্দিরপাড়, কুমিল্লা’।

অথচ এই প্রচেষ্টা মানুষটিই নজরুল-বিষয়ক প্রকাশিত স্মৃতিকথার তথ্যগত অসামঞ্জস্য ও তথ্য গোপন করার অপচেষ্টাকে চিহ্নিত করতে

চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন শুণ্ডপ্রেসের তলা থেকে সত্যকে উদ্ধার করতে। নজরুল-জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করতে বসে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় মস্তব্য লিখেছিলেন :

“শ্রদ্ধেয় অমল হোম লিখেছেন, ‘স্মৃতিকথা মায়ুই অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ’ (অতুলপ্রসাদ সেন—শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ ৫৬)। নজরুলকে নিয়ে বহু স্মৃতিচারণ চলেছে, তার মধ্যে সনতারিখের কোন উল্লেখ নেই, আছে উদোর পিণ্ডি বুখোর ঘাড়ে বসিয়ে আত্মপ্রচারণার আদিখ্যেতা ও সাতরঙের চাপচাপ রঙিন ভাষার আতিশয্য। এই রকম বহু গালগল্পের মধ্যে কয়েকটি কথা নিবেদন করব। যীরা স্মৃতিকথনের কথক তাঁরা সকলেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, কিন্তু কোথায় কি বলছেন, অথবা কার পরে কি ঘটনা সাক্ষ্যেছেন, তার কোন সামঞ্জস্য রেখে চলেননি। নজরুলকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে নিজেরই প্রাধান্য দিয়ে আত্মপ্রচারণার মোহে কি করছেন স্বেদিকে নজর দিতেও ভুলে গেছেন।”

চট্টোপাধ্যায় মশায়ের উল্লেখ থেকে জানা যায়, নলিনাক্ষ সান্যালের ভ্রাতা শশাঙ্কশেখর সান্যাল বেতার জগৎ পত্রিকার বাইশে নভেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যায় (৪৫ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, পৃ ৯৩২) প্রকাশিত একটি স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন, ১৯২৬-২৮ সালের মধ্যে কোনো এক সময়ে কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন কাজী নজরুল ইসলামের ‘আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল’ কবিতাটিতে নাকি জনৈক ফেলুদা (উমাপদ ভট্টাচার্য) সুরারোপ করেছিলেন। নজরুল স্বয়ং নাকি সেটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। তাই শুনে নাকি উক্ত ফেলুদার পিতা হাউহাউ করে কেঁদে কাজীকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তিনি বুঝতে পারেননি কাজী কত বড়ো সাধক। যে রাজনৈতিক বিদ্রূপে শাপিত দীর্ঘ কবিতাটির জন্য কাজীর রাজদণ্ডযোগ ঘটল, পত্রিকার সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হল, সেই সুদীর্ঘ কবিতা সুরারোপে একটি শ্যামাসংগীত হয়ে গেল এবং কাজীও সাধক হয়ে গেলেন, এই ধরনের কাহিনী সেই শুণ্ড প্রেসের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

গজল-গুজব

বাংলা গজল গানের স্থপতি নজরুল, এই নিয়ে গজল-গুজব-গাছনের পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। বাংলা গজল গানের প্রথম প্রয়োগকর্তা সরলা দেবী না অতুলপ্রসাদ সেসব ইতিহাস-প্রসঙ্গ আপাতত গৌণ। নজরুলের গজল গান কিভাবে রচিত হল, এই সম্পর্কে একাধিক টীকাভাষ্য পাওয়া গেছে তাঁকে নিয়ে লেখা স্মৃতিচারণায়। সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন

তার 'সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম' (১৯৮৮) গ্রন্থে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন যে, ১৯২৬ ইংরেজি সালের শেষদিকে মিশরের শিল্পী মিস ফরিদা কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে তাঁর নৃত্যগীত পরিবেশন করতে আসেন। অ্যালেক্সেণ্ড্রা মধ্যে নাসিরউদ্দীন নজরুলের সঙ্গে সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে ফরিদা একটি উর্দু গজলও গেয়েছিলেন 'কিসকে খেরামে নাজনে কবরমে দিল হিলা দিয়া।' এই গজলের প্রবল প্রেরণাতেই নজরুল কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর প্রথম গজলটি লেখেন 'আসে বসন্ত ফুলবনে সাজে বনভূমি সুন্দরী'। নাসিরউদ্দীন সওগাতের ১৩৩৩ পৌষ সংখ্যায় সেটি প্রকাশ করেন। তিনি জানাচ্ছেন, "সওগাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার পর ১৩৩৩ সাল থেকে ১৩৩৮ সালের মধ্যে নজরুল তাঁর শ্রেষ্ঠ গজল গানগুলি রচনা করেন।"^{১১৮}

গজল গানের প্রকাশ-তালিকাটিও একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। সওগাত ১৩৩৩ ফাল্গুনে বেরিয়েছে 'দূরন্ত বায়ু পূরবৈয়া', ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠে 'কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়', অগ্রহায়ণ 'চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না', পৌষে 'কে বিদেশী মন-উদাসী', চৈত্রে 'সখী বলো বঁধুয়ারে নিরঞ্জে', ১৩৩৫ ভাদ্রে 'গহিন রাতে ঘুম কে এল ভাঙতে', অগ্রহায়ণে 'বাজল কিরে ভোরের সানাই', ১৩৩৬ আষাঢ়ে 'আঁধার রাতে কে গো একেলা', আশ্বিনে 'আমার কোন কূলে আছ ভিড়ল তরী', কার্তিকে 'জনম জনম গেল আশাপথ চাহি' প্রায় ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটেছে। পাশাপাশি নওরোজ পত্রিকায় ১৩৩৪ আষাঢ় সংখ্যায় 'করুণ কেন অরুণ আঁধি', শ্রাবণে 'আসিলে এ ভাঙা ঘরে কে গো মোর রাজ্য অতিথি', 'কেন কঁদে পরাণ কী বেদনায়', ভাদ্রে 'কেন দিলে এ কাঁটা', আশ্বিনে 'এত জল ও কাজল চোখে' ইত্যাদি। নওরোজে গানগুলির সঙ্গে স্বরলিপিও প্রকাশিত হয়েছে। সওগাতেও কয়েকটি গানের স্বরলিপি বেরিয়েছে। দিলীপকুমার রায় এই সময়েই নানা স্থানে গানগুলি অকাতরে গাইছিলেন। ১৩৩৩ মাঘ কয়লালে বেরিয়েছে 'বাগিচায় বুলবুলি তুই', আর ১৩৩৪ ফাল্গুনের শনিবারের চিঠিতে এর প্যারডি বেরিয়েছে 'জানালায় টিকটিকি তুই টিকটিকিয়ে করিস নে আর দিক'। সওগাতে বেরিয়েছে ১৩৩৪ চৈত্রে 'কে বিদেশী বনউদাসী' গানের স্বরলিপি। তা প্রকাশের আগেই শনিবারের চিঠিতে ফাল্গুন সংখ্যায় তার প্যারডি বেরিয়ে গেছে 'কে উদাসী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে'।

নজরুলীয় গজলের সূত্রপাত সম্পর্কে নাসিরউদ্দীনের কথিত কাহিনীর সঙ্গে মেলে না এমন আর একটি কাহিনী পাই নলিনীকান্ত সরকারের স্মৃতিচারণায়। তাঁর অভিজ্ঞতা অন্যরকম। তিনি এবং নজরুল কোনো একদিন গজল শুদ্ধ করছিলেন নলিনীকান্তের কলকাতার বাসভবনে। ঠিক তখনই দুজন

অবান্তালি ভিক্ষুক হারমনিয়াম বাজিয়ে উর্দু গজল গেয়ে পথে ভিক্ষা সংগ্রহ করছিল, যা শুনে নজরুল তাদের ডেকে আনান এবং নজরুলের অনুরোধে কয়েকটি গান তারা শুনিয়েও যায়। নলিনীকান্ত লিখেছেন :

“নজরুল তক্ষুনি বসলেন গান লিখতে। তাদের জাগো পিয়া গানটির রেশ তখনো আমাদের কানে যেন ঘনিত হচ্ছে। এ গানের সুর অবলম্বন করে নজরুল কয়েক মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন নিশি ভোর হল জাগিয়া পরাণপিয়া গানটি। তাঁর গজল গান লেখার শুরু এইখান থেকে। গজল গানের নেশা তাঁকে যেন পেয়ে বসল। অসি ছেড়ে এই বাঁশি ধরবার জন্য কয়েকজন উগ্রপন্থী বন্ধু ব্যঙ্গবিদ্রুপও করেছিলেন যথেষ্ট। রসের সন্ধান পেলে কবিপ্রাণের অপ্রতিহত গতিমুখে সকল বাধাই তৃণখণ্ডের মতো ভেঙ্গে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হল। নজরুল এমন্য কয়েকজন চরমপন্থী রাজনৈতিকদের বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন।”

অন্য বাক্যগুলি সম্পর্কে বক্তব্য নেই, শুধু একটিবাক্যই আমাদের আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা : ‘তাঁর গজল গান লেখার শুরু এইখান থেকে।’ নাসিরউদ্দীন ও নলিনীকান্ত দুজনেই নজরুলের অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি, কিন্তু দুজনেই স্মৃতিচারণা করেছেন অনেক বছর পরে। কোথাও কিছু বিভ্রান্তি ঘটে গেছে নিশ্চয়। নাসিরউদ্দীন কথিত প্রথম গজল গান ‘আসে বসন্ত ফুলবনে’। তথ্যে জানা যাচ্ছে গানটি কৃষ্ণনগরে রচিত হয়, ২৮ অগ্রহায়ণ। আর তারও আগে ৮ অগ্রহায়ণ রচিত হয়েছে ‘বাগিচায় বুলবুলি তুই’ গজলটি। তাহলে?

এই জাতীয় শুশু প্রেস স্মৃতিচারণ কী ধরনের গালগল্পের জন্ম দেয় তার একটি উদাহরণ এখানে না দিলেই নয়। লেখাটির শিরোনাম ‘টুকরো কথা’, লেখকের নাম বেণু গঙ্গোপাধ্যায় :

“১৩৩০ সাল। ১৪ ফাল্গুন মঙ্গলবার। মেদিনীপুরের নজরুলগঞ্জের দিকের অসমাপ্ত ইদগাতে একজনকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিল, লোকের ভিড় বেশ। একজন ফকির সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। জনতা দাবি জানাল, গজল গাইতে হবে।

কী আর করেন, সম্বর্ধিত ব্যক্তিটি গজল গান ধরলেন : কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে। জনতার কণ্ঠে গানের অকুণ্ঠ প্রশংসা। কিন্তু ফকির সাহেব প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, ইদগামে এ গান বিলকূল ঠিক নেই, খুদা রসুল।

সঙ্গে সঙ্গে গায়ক গেয়ে উঠলেন :

খুদা রসুল খুদা রসুল

এ নহে বুট এ নহে গুল

এই দিনের প্রসাদী ফুল

করো না ফুল করো না ফুল।

জানো কে এই গায়ক? ইনিই বুলবুল কবি নজরুল ইসলাম।”

বিশ্বনাথ দে তাঁর ‘নজরুল-স্মৃতি’ গ্রন্থে এটির স্থান দিয়েছেন। সুতরাং বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, লেখক বোধহয় স্বয়ং ১৩৩০-এর ১৪ই ফাল্গুন মেদিনীপুরের নজরগঞ্জের সেই ইদগাতে উপস্থিত থেকে নজরুলের কণ্ঠে ‘কে বিদেশী বন-উদাসী’ গজলটি শুনেছিলেন।

তবে তাঁর জীবনীকাররা জানান, গানটি নজরুল ওই সভানুষ্ঠানের তারিখের আরো প্রায় বছর চারেক পরে রচনা করেন। গানটি সওগাত ১৩৩৪-এর পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। আর খুদা রসুল বলে নজরুল যে গানটি গেয়ে উঠেছিলেন সেটি তাঁর রচনাবলীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আব্বাসউদ্দীন স্মরণিকা

সংগীতসূত্রে যারা নজরুলের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, কবির সঙ্গে সংগীত নির্দেশনায় যারা সহকারীর দায়িত্ব পালন করেছেন, স্বরলিপি করেছেন, অথবা রেকর্ডের জন্যে গান শিখেছেন, তাঁদের অনেকেই নজরুলকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন। এঁদের সকলের স্মৃতিতেই কাজীদা সম্পর্কে শ্রদ্ধার অভাব নেই, অভাব শুধু ইতিহাসবোধের। কেউই তাঁদের স্মৃতির অনুকূলে বছর মাস-তারিখের ধার ধারেন না। সকলেই বলেন, ‘একদিন কাজীদা বললেন...’ ইত্যাদি। এই একদিনের পান্না-ভাজা জ্ঞানলা দিয়ে অবিশ্বাসের ভিজে হাওয়া কী পরিমাণে ঢুকে পড়ে, এঁদের সে বিষয়ে কোনো চেতনাই নেই। তথ্যবিপর্যয় ঘটে যায়, বুঝে উঠতে পারেন না। পরবর্তী জীবনীকারদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন এঁরা—সজ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক, সত্তাগোপনের দায় থেকে তাঁরা অব্যাহতি পেতে পারেন না।

প্রথমেই আব্বাসউদ্দীনের স্মৃতিকথায় আসা যাক। আব্বাসউদ্দীন আহমদ লিখিত ‘আমার শিল্পী জীবনের কথা’ বইটি থেকেই অনেকখানি অংশ বিশ্বনাথ দে তাঁর ‘নজরুল-স্মৃতি’ সংকলনে, ব্যবহার করেছেন। ১৯৩০-৩১ সালে সবে আব্বাসউদ্দীনের রেকর্ড হয়েছে, স্থায়ীভাবে শিল্পী কলকাতায় চলে এসেছেন। শিল্পী একদিন গ্রামোফোন কোম্পানীর অফিসে নজরুলকে বললেন,

“এই যে পিয়ার কাওয়াল, কাহু কাওয়াল এরা উর্দু কাওয়ালী গায় এদের গানও শুনি অসম্ভব বিক্রি হয়, এই ধরনের বাংলায় ইসলামী গান দিলে হয় না? তারপর আপনি তো জানেন কিভাবে কাকের কুফর ইত্যাদি হলে

বাংলায় মুসলমান সমাজের কাছে আপনাকে অপাংক্তেয় করে রাখবার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে একদল ধর্মিষ্ঠ। আপনি যদি ইসলামী গান লেখেন তাহলে মুসলমানের ঘরে ঘরে আবার উঠবে আপনার অঙ্গগান।

কথাটা তাঁর মনে লাগল।...এর প্রায় ছয়মাস পরে।...

শুনলাম পাশের ঘরে কাজিদা আছেন। আমি কাজিদাকে বললাম যে ভগবতীবাবু (ভগবতী ভট্টাচার্য অর্থাৎ গ্রামোফোন কোম্পানির রিহাসাল ইন চার্জ) রাজি হয়েছেন। তখন সেখানে ইন্দুবালা কাজিদার কাছে গান শিখছিলেন। কাজিদা বলে উঠলেন, ইন্দু তুমি বাড়ি যাও, আক্বাসের সাথে কাজ আছে। ইন্দুবালা চলে গেলেন এক ঠোংগা পান আর চা আনতে বললাম দশরথকে। তারপর দরজা বন্ধ করে আধঘণ্টার ভিতরই লিখে ফেললেন, ও মন রমজানের ওই রোজ্জার শেষে এল খুশির ঈদ। তখুনি সুর সংযোগ করে লিখিয়ে দিলেন। পরের দিন ঠিক এই সময় আসতে বললেন। পরের দিন লিখলেন; ইসলামের ওই সওদা লয়ে, এল নবীন সওদাগর।

গান দুখানা লেখার ঠিক চারদিন পরেই রেকর্ড করা হল। কাজিদার আর ধৈর্য মানছিল না। তাঁর চোখে মুখে কী আনন্দই যে খেলে যাচ্ছিল।...”

আক্বাসউদ্দীনের যে স্মৃতিচারণা কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পাদিত ‘নজরুলগীতি-অন্বেষা’ গ্রন্থে আছে, সেখানে এই বিবরণই ঈশ্বর ভাবান্তরে এই প্রকার :

“...গ্রামোফোন কোম্পানির বাঙালি সাহেব বন্দেন, না না ও ধরনের বাংলা গান বিক্রি হবে না। অবশেষে প্রায় এক বৎসর পরে সাহেব রাজি হলেন। কাজিদাকে বললাম, সাহেব রাজি হয়েছেন। কাজিদা তখুনি আমাকে নিয়ে একটা কামরায় ঢুকে বন্দেন, কিছু পান নিয়ে এসো। পান নিয়ে এলাম ঠোঙা ভর্তি করে। তিনি বন্দেন, দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাক। ঠিক ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন—ও মন রমজানের ওই রোজ্জার শেষে এল খুশির ঈদ। সুর-সংযোগ করে তখুনি লিখিয়ে দিলেন গানটা। বললেন, কাল এসো, রেকর্ডের অপরা পৃষ্ঠার জন্য আর একখানা গান লিখে দেব। পরদিন লিখলেন, ইসলামের ওই সওদা নিয়ে এল নবীন সওদাগর। রেকর্ড করলাম চারদিন পরে। সে গান বাংলার আকাশে-বাতাসে তুলল এক নব আলোড়ন। তারপর লিখে চললেন এইভাবে বহু ইসলামী গান।”

নজরুলকে পান ও চা দিয়ে দরজায় শিকল তুলে ঘরবন্দী করে গান লিখিয়ে নেওয়ার অনুরূপ বহু কাহিনীর মতো এই কাহিনীটিও, ধরে নেওয়া যাক সত্য। কিন্তু খটকা লাগে একাধিক কারণে। আক্বাসউদ্দীন ইসলামি গান লিখিয়ে নেওয়ার সময়কাল ‘একদিন’ বলেই সেয়েছেন। আক্বাসউদ্দীন জানিয়েছেন, তাঁর ইসলামি গান রেকর্ড করার দু’মাসের মধ্যেই তা ঈদ-উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশের যে তালিকা আমাদের

সংগ্রহে আছে তাতে দেখা যাচ্ছে আব্বাসউদ্দীনের উক্ত ইসলামী গান দুটি রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে : রেকর্ড নং এন ৪১১১, 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ড, ফেব্রুয়ারি ১৯৩২-এ। প্রথম পিঠের গান 'ইসলামের ওই সওদা লয়ে' এবং দ্বিতীয় পিঠের গান 'ও মন রমজানের'।

আব্বাসউদ্দীনের দাবি অনুযায়ী, শিল্পীর কণ্ঠে উক্ত গান দুটি রেকর্ডে প্রকাশিত হওয়ার আগে ইসলামি গানের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং নজরুলের রচিত প্রথম দুটি ইসলামী গান 'ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এল খুশির ঈদ' এবং 'ইসলামের ওই সওদা লয়ে এল নবীন সওদাগর'। কিন্তু সত্যিই কি তাই। তথ্যগতভাবে আব্বাসউদ্দীনের পরিবেশিত তথ্য যে সন্দেহাতীত নয়, তার কিছু নিদর্শন পেশ করা যেতে পারে।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে নজরুল শ্রীহট্ট এবং ডিসেম্বরে নজরুল রাজশাহিতে গিয়েছিলেন। সেইসব স্থানে নজরুল-সংবর্ধনার বহু সংবাদ নথিভুক্ত হয়েছে। শ্রীহট্টে নজরুল গিয়েছিলেন প্রাদেশিক মুসলিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে। সেখানে কিকিং নজরুল-বিরোধিতার আবহাওয়াও ছিল। সেই সম্মেলনে নজরুল উদ্বোধন-সংগীত গেয়েছিলেন :

‘বাজল কি রে ভোরের সানাই নিদ-মহলের আঁধারপূরে।

শুনছি আজান গগনতলে অতীতরাতের মিনার চূড়ে।’

শোনা যায় এ গান শ্রোতাদের অভিভূত করেছিল। এটিই নজরুলের প্রথম ইসলামী গান। ১৩৩৫ অগ্রহায়ণ সওগাতে গানটি প্রকাশিতও হয়। আরও চার বছর পরে জুন ১৯৩২ গানটি কে মল্লিকের কণ্ঠে রেকর্ড হয়। এই গানটি ১৯২৯-এর ১৩ অক্টোবর নজরুল আবার গাইলেন কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ মুসলিম যুব সম্মেলনে। ১৯ অক্টোবর ১৯২৮ সওগাতে দেখা হয়েছিল, ‘তাহার এ গান সুর-তান-লয়ে এমন অপূর্ব হইয়াছিল যে, সমবেত জনসাধারণ উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং মুহুমূহ আনন্দ করতালিতে তাহাকে অভিনন্দিত করেন। ১৪ ডিসেম্বর ১৯২৮ রাজশাহিতেও কবি বিপুল অভিনন্দন পেলেন এবং প্রাণ ঢেলে গান শোনালেন। রাজশাহির সেই সংবাদতথ্যের একাংশ :

“...দ্বিতীয় দিন সকালবেলা চৌধুরী দালালে মুসলিম ছাত্রাবাসে ‘ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এল খুশির ঈদ’, ‘বাজিছে দামামা বাঁধে রে আমামা’, ‘দিকে দিকে পুন ছলিয়া উঠিছে’, ‘তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে’, ‘বাজল কিরে ভোরের সানাই’ গানগুলি গেয়ে শোনান। তারপর ঐ দিন বিকালবেলায় কাদিরগঞ্জে বেলতলা হাউসে একটি গানের আসর বসে। ওই আসরেও তিনি কয়েকটি ইসলামি গান ও গজল গেয়েছিলেন। তাঁর গান শুনে উপস্থিত হাজি ও মওলানারা তাঁকে আলিঙ্গন করেন।”

স্পটই দেখা যাচ্ছে দরজা বন্ধ করে চা ও পানের প্রেরণাতেই নজরুল ইসলামী গান রচনা করেননি। এর আগেই তাঁর ইসলামী গানের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। আব্বাসউদ্দীন প্রচারিত মিথিটি ভেঙে যাচ্ছে। আর 'ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এল খুশির ইদ' গানটিও নজরুলের প্রথম ইসলামী গান নয়।

আব্বাসউদ্দীন প্রসঙ্গের এখানে শেষ নয় তাঁর আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, এইসব ইসলামি রেকর্ড পেয়ে যখন মুসলমান সমাজ উল্লাসে মেতে উঠেছে তখন

...“কে মল্লিক সাহেব একদিন আমাকে বলেন, আব্বাস, জীবন ভরে তো শ্যামাসংগীতই গেয়ে গেলাম, বাংলার লোক জানতেও পারল না আমি কে, কাজেই কাজী সাহেবকে বলে আমার জন্য দুখানা ইসলামী গান লিখে দাও। আমার নাম মহম্মদ কাসেম লোকে জানুক। কাজীদা তার জন্য প্রথম ইসলামী গান লিখে দিলেন ‘বাজল কিরে ভোরের সানাই নিদমহলার আঁধারপুরে’। প্রায় প্রতিমাসেই ইসলামী রেকর্ড বের হতে লাগল।”

মহম্মদ কাসেম বা কে মল্লিক মহোদয়ের সঙ্গে আব্বাসউদ্দীন আহমদের ঠিক এই ধরনের কথাই হয়েছিল, একথা বিশ্বাস করলেও শুণ্ড প্রেসের হস্তক্ষেপ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ আগেই সাক্ষ্য প্রমাণে জানা গেছে যে, ‘বাজল কিরে ভোরের সানাই নিদমহলার আঁধারপুরে’ এ গান শুণ্ড ঐ শিল্পীর জন্যই কাজীদা আব্বাসউদ্দীনের অনুরোধে লিখে দিলেন, বাক্যটিই গোলমালে। গানটি ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বরে শ্রীহট্টে স্বয়ং নজরুলকেই গাইতে দেখা যাচ্ছে। ১৩৩৫ অগ্রহায়ণ সওগাতে যে গানটি প্রকাশিত হয়ে গেছে, আব্বাসউদ্দীন অবশ্যই সে খবর রাখেন না। মহম্মদ কাসেমের রেকর্ড করা ইসলামি গান যথাক্রমে ১৯৩২-এর হিসেব :

জুন ১৯৩২ এন ৭০০৫ এইচ এম ভি—বাজল কিরে ভোরের সানাই

বলে আমার কাবার ছবি

সেপ্টেম্বর ১৯৩২ এন ৭০২৭ এইচ এম ভি—আয় মরুপারের হাওয়া

খুশি লয়ে খোশরোজের

নভেম্বর ১৯৩২ এন ৭০৫৩—তরুল প্রেমিক প্রণয় বেদন

তোমারই মহিমা গাই ইত্যাদি।*

ইসলামী গানের জনপ্রিয়তার সুযোগে কে মল্লিক মহম্মদ কাসেম নামে, চিত্ত রায় দেলোয়ার হোসেন নামে, ধীরেন দাস গনি মিঞা নামে, গিরীন চক্রবর্তী সোনা মিঞা নামে, হরিমতি সাকিনা বেগম নামে ইসলামী গান রেকর্ড করতে থাকেন। তবে আব্বাসউদ্দীন নিজেও তকরিমুদ্দিন আহমেদ নামে নভেম্বর ১৯৩২-এ টুইন রেকর্ডে দুটি ইসলামি গান প্রকাশ করেন :

‘রাখিস নে ধরিয়া মোরে ডেকেছে মদিনা আমায়’ এবং ‘দরিয়ায় ঘোর তুফান পার কর নাইয়া’ (এক টি ২২৯১)। কিন্তু আব্বাসউদ্দীন তাঁর স্মৃতিচারণায় যথাস্থানে ওই তথ্যটি শুণ্ড প্রেসের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ উল্লেখ করেননি।

আব্বাসউদ্দীনের স্মৃতিকথার অংশ পুনর্ব্যবহার করতে হবে। তিনি একাধিকবার তাঁর লেখায় বলার চেষ্টা করেছেন, ইসলামি গান নজরুলকে দিয়ে তিনিই লিখিয়ে নিয়েছেন। ইসলামি গানের দ্বারা মুসলমান সমাজে যে নবজাগরণের স্পন্দন জেগেছে, স্বভাবতই তার নেপথ্যে আব্বাসউদ্দীনের ভূমিকার কথাই যেন ইঙ্গিতে তিনি বলতে চেয়েছিলেন। অথচ নজরুল-জীবনের সঙ্গে যীরা পরিচিত তাঁদের কাছে আব্বাসউদ্দীনের এই দাবী কোনো গুরুত্ব বা মূল্যই পাবে না। ইসলামি উপাদানের শিল্পসম্মত ব্যবহার ও ইসলামি ধর্মের মানবতান্ত্রিক আবেদন প্রথম থেকেই নজরুলের মুখ্য কাব্যপ্রসঙ্গ, এ সত্যকে গোপন করবেন? নজরুল যখন ‘মোহররম’ ‘কোরবানী’ ‘খেয়াপারের তরঙ্গী’ ‘ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম’ ‘খালেদ’ ‘সুবহ উন্মেদ’ ‘নকীব’ ‘ইদ মোবারক’ লিখেছেন, তখন কোথায় ছিলেন আব্বাসউদ্দীন? আব্বাসউদ্দীন সগর্বে লিখেছেন, তাঁর কণ্ঠে প্রচারিত ইসলামি গানে বাংলার ঘরে ঘরে এসেছিল ইসলামি চেতনার পুনর্জাগরণ, তৈরি হয়েছিল ইসলামি গানের চাহিদা। এমনকী গ্রামোফোন কোম্পানির পক্ষ থেকেও নজরুলের কাছে নয়, আব্বাসউদ্দীনের কাছে তাগিদ আসতে লাগল নজরুলকে দিয়ে এই জাতীয় গান লিখিয়ে নেওয়ার জন্য :

“ভগবতীবাবু তখন আমাকে দেখা হলেনই বলতেন, কাজী সাহেবের কাছে এই ধরনের ইসলামি গান আদায় করুন। কাজীদাকে বললাম, কাজীদা, মুসলিম বাংলার ঘরে ঘরে আজ ধ্বনিত হচ্ছে ইসলামের ওই সওদা লয়ে এল নবীন সওদাগর—এই শুভ মুহূর্তে এই ঘুমন্ত আত্মির প্রাণে জ্বালিয়ে দিন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার তীব্র মশাল’। তিনি তখন লিখলেন ‘দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দীন-ই-ইসলাম লাল মশাল’। তারপর লিখলেন, শহীদী ইদগাহে জন্মায়ত ভারি, বাজিছে দামামা বাঁধে রে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান ইত্যাদি জাতীয় গানগুলি শুনে বাংলার শহর বন্দর এবং সুদূর পশ্চীম অঞ্চল থেকে আসতে লাগল তরুণ ছাত্রদের আহ্বান।”

নজরুল-গানের খ্যাতিমান শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদের এই জাতীয় স্মৃতিকথার উপর ভরসা করে নজরুল-জীবনের সংগীত-বৃত্তান্ত লিখতে গেলে তা গুরুতর অসংগতির কারণ হবে। কারণ আব্বাসউদ্দীনের উক্তি অনুযায়ী ইসলামের ওই সওদা লয়ে এল নবীন সওদাগর’ এই ইসলামি গানের

অনপ্রিয়তা দেখেই আব্বাসউদ্দীন নজরুলকে অনুরূপ গান লিখতে প্ররোচিত করলেন এবং তখন নজরুল লিখলেন আব্বাসউদ্দীন-উল্লিখিত গান তিনটি। এবার, রেকর্ড-তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে উক্ত গানগুলির প্রকাশকাল যথাক্রমে :

দিকে দিকে পুন জুলিয়া উঠিছে (আব্বাসউদ্দীন কণ্ঠে) ডিসেম্বর ১৯৩২

শহীদী ইদগাহে জমায়েত ডারি (আব্বাসউদ্দীন কণ্ঠে) মে ১৯৩৩

বাজিছে দামামা বাঁধো রে আমামা (মহঃ কাশেম কণ্ঠে) মার্চ ১৯৩৪

অর্থাৎ উদ্দীপিত নজরুল আব্বাসউদ্দীনের অনুরোধে দু'বছরে মাত্র তিনটি ইসলামি গান লিখলেন। কিন্তু রেকর্ড তালিকায় দেখি, ১৯৩২ থেকে গ্রামোফোন কোম্পানি নজরুলকে দিয়ে ইসলামি গানের ব্যবসা ভালোভাবেই চালু করেছেন। প্রকাশিত রেকর্ডের আনুমানিক হিসেব কেবল ১৯৩৫ পর্যন্ত এই রকম :

মে ১৯৩২ ইসলামি গানের প্রকাশিত সংখ্যা ২টি, শিল্পী ফকরে আলম

জুন ১৯৩২.....২টি, " মহম্মদ কাশেম

সেপ্টেম্বর ১৯৩২.....২টি, " মহম্মদ কাশেম।

নভেম্বর ১৯৩২.....৪টি, " তাকরিমুদ্দিন আহমেদ ও মহঃ কাশেম

ডিসেম্বর ১৯৩২.....২টি, " আব্বাসউদ্দীন

এপ্রিল ১৯৩৩.....২টি, " মহম্মদ কাশেম

মে ১৯৩৩.....৪টি, " আব্বাসউদ্দীন

জুন ১৯৩৩.....৪টি, " আব্বাসউদ্দীন ও মহম্মদ কাশেম

আগস্ট ১৯৩৩.....২টি, " কে মন্নিব, গনি মিজা

অনুয়ারি ১৯৩৪.....৪টি, " আব্বাসউদ্দীন, মহম্মদ কাশেম

মার্চ ১৯৩৪.....৫টি, " গনি মিজা, মহম্মদ কাশেম, আব্বাসউদ্দীন

মে ১৯৩৪.....২টি, " আব্বাসউদ্দীন

অনুয়ারি ১৯৩৫.....২টি, " আব্বাসউদ্দীন

জুন ১৯৩৫.....২টি, " আব্বাসউদ্দীন

সেপ্টেম্বর ১৯৩৫.....২টি, " আব্বাসউদ্দীন

অক্টোবর ১৯৩৫.....৪টি, " গনি মিজা, মহম্মদ কাশেম

ডিসেম্বর ১৯৩৫.....৪টি, " আব্বাসউদ্দীন, আবদুল লতিফ

শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের স্মৃতিচারণায় তথ্যভ্রান্তি তথ্যলোপ অথবা তথ্যগত অসংগতির প্রসঙ্গ আপাতত এই পর্যন্ত।

এবার উল্লেখ করা যাক শিল্পী ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কথা।

অথ ধীরেন্দ্রচন্দ্র ও সিদ্ধেশ্বর-কথা

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শ্রদ্ধেয় সংগীতশিল্পী। নজরুলের গানকে তিনি একটি শ্রদ্ধাশ্রিত মর্যাদায় স্থাপন করে গেছেন। তাঁর কিছু স্মৃতিচারণ লিখিত অবস্থায় ও কিছু দূরদর্শনের পর্দায় রক্ষিত। কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পাদিত নজরুলগীতি-অধেষা-র স্মৃতিচারণায় তিনি লিখেছেন :

“কবির গান তখন (কখন?) অসম্ভব জনপ্রিয়, অনেক খ্যাতিমান শিল্পী তখন তাঁর গান রেকর্ড করে আরো প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, অনেক নতুন শিল্পী তাঁর গান গেয়ে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। আমার সৌভাগ্য, কবি আমাকে দিয়েও তাঁর গান প্রচারের কথা চিন্তা করেছিলেন, আমার কণ্ঠে তাঁর গান রেকর্ড করার ব্যবস্থা করেছিলেন। রেডিওতে আমার পদাবলী কীর্তন শুনে কবি নিজেই আমাকে সংগ্রহ করে নিলেন। রসিকতা দিয়েই আলাপ শুরু করলেন—কটা কোকিল খেয়ে আমি কণ্ঠ-পরিচর্যা করেছি জানতে চাইলেন। কথাটি নিছক ঠাট্টা।...”

এ পর্যন্ত পড়ে মনে হয় সবই সম্ভব। যদিও রেডিওতে কীর্তন শুনে ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে তিনি নিজেই সংগ্রহ করে নিলেন—এই ঘটনার কোনো বিস্তারিত বিবরণ তিনি দেননি। আর নজরুলের অনেক কীর্তনাত্মক গান থাকলেও তাঁর কণ্ঠে তা রেকর্ড হয়নি। কণ্ঠপরিচর্যার জন্য কোকিল-ভক্ষণ জাতীয় শীতল রসিকতা নজরুলের পক্ষে সম্ভব কিনা সে বিষয়ে মন্তব্য নিরর্থক। নজরুলের রোগলক্ষণ প্রকাশ ও অসুস্থ হওয়ার (১৯৪২) সময়ে ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের বয়স আঠাশ বছরের মতো। তাঁর কণ্ঠে নজরুলের দুটি গানের রেকর্ড প্রথম প্রকাশিত হয় (শাওন আসিল ফিরে ও নীলাঘরী শাড়ি পরি) ১৯৪৩ সালের জুনে, নজরুলের পক্ষে যখন গান শিখিয়ে রেকর্ড করানোর প্রসঙ্গই ওঠে না। রেকর্ডের সংগীত নির্দেশনা তবে কার? রেকর্ডে সুরকার হিসেবে নজরুলের নামও উল্লিখিত হয়নি। এর কারণ অবশ্য কোনোদিনও জানা যাবে না। ‘কাবেরী তীরে’ এই বেতার-আলোচ্যের জন্য নজরুল গানটি রচনা করেছিলেন ও স্বয়ং এর রাগনির্দেশ করেছিলেন। ‘হরপ্রিয়া’ গীতি-আলোচ্যেও গানটি ব্যবহার করেছিলেন। এ সবই নজরুলের সুস্বাভাবিক, কিন্তু ১৯৪৩ সালে ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কণ্ঠে গানটি রেকর্ড করার সময় নজরুল যে তাঁকে শেখাননি বা শেখাতে পারেন না এই তথ্য অস্বীকার করা যায় না। অথচ শিল্পী ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র জানাচ্ছেন, নজরুল “তাঁর গানে যথেষ্টাচার করবার অধিকার কাউকেই দেননি। কিন্তু গানের শ্রেণী অনুসারে এবং শিল্পী বিশেষে গায়কী লাগাবার অধিকার তিনি দিতেন। আমি যখন তাঁর রাগভঙ্গিম গানে একটু আলাপ, একটু বিস্তার, একটু হ্রদের কাজ যুক্ত করে তাঁর দেওয়া মূল সুরটিকে এমনভাবে অলংকৃত করেছি যাতে গানে

কাব্যভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, তখন কবি খুবই তারিফ করেছেন, সেইভাবে রেকর্ডও করিয়েছেন।”^{২৭}

শেষ বাক্যটিতে আমাদের প্রশ্ন চিহ্ন অনিবার্য। নজরুলের সুস্থ থাকাকালীন ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কোনো নজরুলগীতিরই রেকর্ড হয়নি। তবে কোন রেকর্ডের কথা বলেছেন?

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, নজরুল “কোন সুর কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তার সম্পূর্ণ খবর কেউই রাখেননি। আমি যতটুকু জ্ঞানতে পেরেছি তার কিছু এখানে উল্লেখ করছি।”^{২৮}

এবার, তাঁর বর্ণিত কাহিনীটি এইরূপ :

হীরাবাই এবং সুন্দরাবাই কলকাতায় এসেছেন। বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে হীরাবাইকে গান গাইতে ডাকা হলেও সুন্দরাবাই তেমন আমন্ত্রণ পাননি। তবে কয়েকজন সংগীতবোদ্ধা রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে সুন্দরাবাই-এর একটি গানের আসর করান। যেখানে শ্রোতাদের মধ্যে নজরুল ছিলেন, ধীরেন্দ্রচন্দ্রও ছিলেন। অনুষ্ঠানে সুন্দরাবাই একঘণ্টা প্রতাপ বরালি নামে একটি দক্ষিণ ভারতীয় রাগ (আরোহণ স র ম প স। অবরোহন স ষ প ম গ র স) পরিবেশন করেন। শিল্পী “গাইতে গাইতে আরোহীতে একটু ধৈবত লাগালেন, অবরোহণে বেশ একটু বঙ্গগতির চলন দেখালেন। তাতে নারায়ণী রাগের আবির্ভাব-তিরোভাব অনুভূত হল। এই নারায়ণী দক্ষিণ ভারতীয় একাং ঋষাঙ্ক ঠাটে গেয়। কাজীদা সুন্দরাবাইয়ের গান তন্ময় হয়ে শুনেছেন। তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে এই সুর জমা পড়ে গেছে। পরে তিনি যখন ‘নিশিরাতে রিমঝিমঝিম বাদল নুপুর’ গানটি রেকর্ড করার জন্য আমাকে শেখালেন তখন মনে পড়ল এই রকম সুর তো সেই সুন্দরাবাই-এর কণ্ঠে শুনেছিলাম। কী আশ্চর্য ক্ষমতায় নিজের গানে প্রয়োগ করেছেন। এই গানটি কবি ‘কাবেরী তীরে’ গীতি-আলোচ্যেতে মিশ্র নারায়ণী চলে উল্লেখ করেছেন।”

আপাতনির্দোষ স্মৃতিচারণা বলে মনে হয়। নজরুলের গান রচনার নেপথ্যে এই জাতীয় প্রভাব থাকতেই পারে। সংশয় সেখানে নয়। ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কণ্ঠে গানটি মেগাফোন রেকর্ডে (জে এন জি ৫৭০৬) প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। অবশ্যই নজরুলের শিক্ষায় ও নির্দেশনায় ঐ সময় তা হতেই পারে না।

সুতরাং মিত্র মশায়ের স্মৃতিকথায় একটা শুণ্ড প্রেস ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। সংশয়টি থেকেই যাচ্ছে।

দূরদর্শনের একটি নজরুল-অনুষ্ঠানে ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আনিয়েছেন, ‘স্কুলের জলসায় নীরব কেন কবি’ গানটি ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে দিয়ে রেকর্ড করানোর জন্য নজরুল শিখিয়েছিলেন। শেখানোর সময় বলেছিলেন, শিল্পী যেন এই

গানটি অনুষ্ঠানে পরিবেশন করলে সব শেষে সেটি গেয়ে শোনান, অর্থাৎ এ গানের পরে যেন আর কোনো গান গাওয়া না হয়।

গানটির ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র-কৃত রেকর্ড প্রকাশিত হয় মার্চ ১৯৪৪-এ। নজরুল তখন সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। রেকর্ডের জন্য ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এ গানটি কার কাছে লিখেছেন? নজরুলের কাছে কি হতে পারে? হওয়া সম্ভব?

আর নজরুল কি ঠিক ওই কথাগুলি সত্যিই বলেছিলেন? বলা সম্ভব? নজরুল কি তাঁর ভবিষ্যৎ পরিণতি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন?

কবির এই ধরনের আশ্চর্য উক্তি ১৯৭৬ সালের পর ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র তাঁর অন্য কোনো স্মৃতিচারণায় কখনো করেননি। কেবল ১৯৯৯-এর কবিজন্মের শতবর্ষে দূরদর্শনের একটি তথ্যচিত্রেই বললেন। এত বড়ো আশ্চর্য উক্তি এতদিনে গোপন করে রেখেছিলেন? এই উক্তি গানটি শেখানোর সময় নজরুল করে থাকলে অন্য কোনো শ্রোতার কাছে যায়নি?

নাকি শুণ্ড প্রেস পঞ্জিকায় এই রকমই হয়।

আরও একজন বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় শিল্পী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণার উল্লেখ করছি। কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পাদিত প্রামাণ্য নজরুলগীতি-অম্বোষায় সংকলিত তাঁর স্মৃতিচারণায় শিল্পীশুধী মুখোপাধ্যায় মশায় লিখেছেন:

‘তালের ওপর কাজী নজরুলের অসাধারণ দখল ছিল। একবারের ঘটনার কথা বলি। এক গানের আসরে নজরুল উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে ছিলাম আমি, কলকাতা বেতার কেন্দ্রের তৎকালীন সহকারী পরিচালক সুনীলবাবু ও ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র গান ধরেছেন, তবলাবাদক একটু নাসিকাকুঞ্জন করে বলে ফেললেন যে বাংলা গানের সঙ্গে আবার কি বাজাবেন। কথাটা শুনে নজরুল তখনই ত্রিতালের উপর একটি বাংলা গান বাঁধলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শেখালেন। গানটি ‘শ্রান্ত বাঁশরী সুরুল সুরে কাঁদে যবে’। ত্রিতালে বাঁধলে কি হবে। গানটির হৃন্দের বোঁক কেবল এক তালেতে আসে। এরপর আমি যখন সেই গানটি ধরলাম তখন তো আর তবলাবাদক বাজাতে পারে না। ভয়ানক জ্বদ। কেবল একতালের হৃদ আসে। কাজীদার এরকম অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।’”

কাজীদার ‘এরকম অদ্ভুত ক্ষমতা’-র গালগল্প সরল বিশ্বাস নিয়ে শুনে বেশ লাগে। কিন্তু মাঝে মাঝে ওই শুণ্ড প্রেসের হস্তক্ষেপ মনে হয়। প্রশ্নগুলি সাজালে এরকম দাঁড়ায় :

উক্ত গানটি ১৯৩৭-এর মে মাসে রাধারাণীর কণ্ঠে টুইন রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ঘটনাটি ১৯৩৭-এর যথেষ্ট পূর্বে। তখন নজরুল সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে নিয়ে একটি সংগীত-আসরে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সময়কার কর্মব্যস্ততায় এই ঘটনা সম্ভব হলেও হতে

পারে। কিন্তু প্রকাশ্য সভায় সংগীত পরিবেশনকারী শিল্পী ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের পাশে বসে তবলাবাদক নাসিকাকুঞ্জন করে ওই মস্তব্য করলেন যখন শিল্পী 'গান ধরেছেন'; সে মস্তব্য গায়ক-শিল্পী শুনলেন না, শুনলেন কাছাকাছি বসে-থাকা নজরুল ও সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। গান শুনতে শুনতে সেই সভায় বসে বসেই নজরুল 'শ্রান্ত বাঁশরী সঙ্কল্প সুরে কাঁদে' গানটি রচনা করলেন? কোনো বাদ্যযন্ত্রের বা পরিবেশের প্রয়োজন হল না? সেই সভাতে গান শুনতে শুনতেই সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে নতুন তৈরি-করা গানটি শিখিয়ে দিলেন, ওই ছন্দের গোপন কায়দাটুকু সহ? তারপরই পরবর্তী শিল্পী হিসেবে সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় গানটি গাইতে উঠলেন। একেবারে গাইবার মতো করে তৈরি করে নিয়েছেন তিনি। সেই তবলটি এবার জ্বল হয়ে গেলেন।

কিথাসের উপর বড়ো বেশি চাপ পড়ে যায়। এতটা চাপ সহ্য করার সামর্থ্য সব কিথাসের থাকে না, শুণ্ড প্রেস কেন যে সে সভ্য বুঝতে চান না।

উল্লেখপঞ্জি

- ১। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় : চলমান জীবন ২য় পর্ব ১৩৬১
 নলিনীকান্ত সরকার : আসা-যাওয়ার মাঝখানে ২য় পর্ব ১৩৯২
 শান্তিপদ সিংহ : নজরুল কথা, ১৯৭২
 পরিমল গোস্বামী : স্মৃতিচিত্রণ, ১৯৫৮
 আবদুল কাদির : নজরুল-প্রতিভার স্বরূপ, ১৯৮৯
 কাজী আবদুল ওদুদ : নজরুল-প্রতিভা, ১৯৪১
 সুফী জুলফিকার হায়দার : নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়, ১৯৭১
 খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন : যুগপ্রস্টা নজরুল, ১৯৫৭
 মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন : সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম, ১৯৮৮

কয়েকটি মাত্র গ্রন্থের উল্লেখ করা হল। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যাদের দেখেছি, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যাত্রী, জসিমউদ্দীনের ঠাকুরবাড়ির আভিনায়, সজনীকান্ত দাসের আত্মস্মৃতি, নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর নজরুলের সঙ্গে কারাগারে। শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কেউ ভোলে না কেউ ভোলে প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাপ্ত উপাদানও নজরুল-জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

- ২। দিলদার সম্পাদিত নজরুল স্মৃতিকথা, ১৯৭১

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত নজরুল স্মৃতি, ১৯৭০

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত নজরুল কথা, ১৩৭০

কমলতর সেনগুপ্ত সম্পাদিত নজরুলগীতি-অম্বোবা, বসুমতী সং ১৯৮৫

- ৩। দিলীপকুমার রায় রচনাসংগ্রহ, আনন্দ, ১৯৯৭, পৃ ২৭৭

৪। নজরুলগীতি-অঙ্কুরা, পৃ ৬৩ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি সং, ১৯৭৭

৫। চলমান জীবন ২য়পর্ব, ১৩৬১, পৃ ৬২

৬। গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী দ্রষ্টব্য

৭। চলমান জীবন, পৃ ৬৭

৮। দারুণ অগ্নিবাণে রে গানের সুরেই নজরুল লিখেছিলেন 'তুষিত আকাশ কাঁপে রে' গানটি। নজরুল-রচনাসঙ্গ্রহ ১ম খণ্ড, হরফ, পৃ ৯৬; কাব্যগীতি ৩৬৭।

৯। ধুমকেতুর নজরুল : পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবি নজরুল : সংস্কৃতি পরিষদ, ইন্টিয়ানা প্রকাশিত, ১৯৫৭, পৃ. ৪২

১০। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় : কবি নজরুল ২য় পর্ব, ১৯৮৩, পৃ ১৬

১১। ধুমকেতুর নজরুল প্রবন্ধ, পৃ ৪০

১২। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়-এর প্রাণ্ডস্ত গ্রন্থ, পৃ ২৮৯

১৩। তদেব, পৃ ২৯০

১৪। বিশ্বনাথ দে : নজরুলস্মৃতি, প ২৮৭

১৫। তদেব

১৬। ঢাকা বাংলা একাডেমী প্রকাশিত, ১ম খণ্ড।

১৭। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, কবি নজরুল, পৃ ১৭

১৮। বর্তমান লেখকের নজরুল-জীবনী (পঃ বঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯) গ্রন্থে ২১৯-২২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিবরণ সংকলিত হয়েছে।

১৯। তদেব। এবং নলিনী কান্ত সরকারের 'শ্রদ্ধাভাজনেষু' গ্রন্থ থেকে আজহারউদ্দীন খান তাঁর নজরুল-জীবনী 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' (সুপ্রীম সং ১৯৯৭) গ্রন্থে ১৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

২০। বিশ্বনাথ দে, পৃ ২৬৯

২১। আমার শিল্পী জীবনের কথা, পৃ ৭২-৭৩

২২। কল্পতরু সেনগুপ্ত, পৃ ৬০

২৩। আজহারউদ্দীন খান, পৃ ১৭১

২৪। নজরুল গীতির রেকর্ড সংগ্রহ : তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শ্রীবিম্বজিৎ দাস।

২৫। আজহারউদ্দীন খান, পৃ ১৮২

২৬। কল্পতরু সেনগুপ্ত, পৃ ১০৫

২৭। তদেব, পৃ ১০৬

২৮। তদেব, পৃ ১০৭

২৯। তদেব, পৃ ৯১

মশা

শ্রীপাশু

ভ্যালো লোমেনিয়া উত্তর ইতালির একটি গ্রাম। সেখানকার আবহাওয়া উষ্ণ। বাতাসে আর্দ্রতাও বেশি। অনেকটা আমাদের এই কলকাতার মতো। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সেখানে একটি অভিনব প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় নয়, যাকে বলে দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগীদের জটিল বা শ্রমসাধ্য কোনও ক্রীড়া কৌশল দেখাতে হবে না, শুধু মশা মারতে হবে। তবে ঠ্যা, অবশ্যই খালি হাতে। পাঁচ মিনিটে দু'টি হাত কাছে লাগিয়ে কে কয়টি মশা নিধন করতে পারলেন, বিচার্য সেটাই। যিনি সবচেয়ে বেশি মশার শব্দ দাখিল করতে পারবেন প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত হবেন তিনিই। বিজয়ীর পুরস্কার একটি সোনার মশা আর একটি সোনার মেডেল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কারের ব্যবস্থাও রয়েছে। স্বভাবতই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে নাকি দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেছে।

খবরটি পড়ে মনে মনে ভাবছিলাম, আচ্ছা কলকাতায় কি এমন একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায় না। একটি কেন, প্রত্যেক ওয়ার্ডেই মশা-মারা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেই বা বাধা কোথায়? পুরস্কার হিসাবে মশা, মেডেল বা অন্য যা কিছু দরকার হবে শহরের গহনা ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেখে তো মনে হয়, তাঁরা এক্ষেত্রেও সানন্দে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। শুধু প্রচারটুকু চাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল ইতালিতে সম্ভব হলেও বোধ হয় কলকাতায় এ-ধরনের প্রতিযোগিতা সম্ভব নয়। কারণ, কলকাতার মশা একটি ঔপনিবেশিক শহরের মশা। এ মশা যে পুরুষানুক্রমে একটি কসমপলিটান শহরের নানা জাতির এবং বর্ণের মানুষদের রক্তপান করেছে তা-ই নয়, ঔপনিবেশিক প্রভুদের কল্যাণে শোষণের নানা জারিজুরিও রপ্ত করেছে। ফলে শুধু হাত দুটি সম্বল করে এখানে মশাকে জপ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। হ্যারি হব্‌স নামে এক রসিক বাসিন্দা ছিলেন এই শহরে। জ্ঞাতে তিনি খাঁটি ইংরেজ, স্বভাবে পাকা ক্যালকেনিয়ান। তিনি একবার একজনকে এক ধান্নে ডজন খানেক মশা নিধন করতে দেখেছিলেন বটে, কিন্তু সে এই কলকাতায় নয়, অসমে। অভিজ্ঞতা জ্ঞানেন, মশা শরীরের এমন স্ট্যাটোজিক বিন্দুতে বসে যে উদ্যত করতল চট করে তার নাগাল পায় না। কিংবা এমন কোনও দেহ সজ্জিতে হল বসায় যে হাত পা না নাড়িয়ে সেখানে প্রত্যাঘাত সম্ভব নয়। আর, একটু নড়ে চড়ে বসলেই মশা উধাও।

পরক্ষণেই ফিরে এসে ঈষৎ স্থান বদল করে এমন জায়গায় বসবে যেখানে শত্রু চপটোঘাত থেকে অনায়াসে মাথা বাঁচাতে সক্ষম। বুঝিবা একারণেই বাংলার প্রবাদ মশা মারতে গালে চড়। এই গেরিলা-সদৃশ শমনকে লইয়া কি কোনও প্রতিযোগিতা চলে? এখানে সাত চড়ে যদি এক মশা মরে।

আচ্ছা, মশা কি পাখি? না কি পতঙ্গ। না নিছক কীট। প্রাগৈতিহ্যবিদ এবং কীট-বিজ্ঞানীরা কী বলেন সঠিক জ্ঞানি না। তবে দেখে শুনে মনে হয় এক একজনের কাছে মশার এক এক পরিচয়। কলকাতার গঙ্গার ঘাটে জাহাজ থেকে নামতে গিয়ে একজন ইংরেজ তরুণী একটি হাতি দেখে তার সঙ্গীকে নাকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ইজ্জ দিস হোয়াট দে কল্ মসকিউটো? একেই কি ওরা মশা বলে? লর্ড অ্যাকল্যান্ডের লেখক এবং শিল্পী বোন রাজেন্দ্রবনে অবিবাহিত গভর্নর জেনারেলের গৃহকর্ত্রী এমিলি ইডেন মশাকে বলেছেন ‘অ্যানিমেল’,—জন্তু। প্রবাদে মশা আর হাতির দ্বন্দ্বের কথা যখন বলা হয়, তখন মনে হয়না কি দুটি জন্তুর কথা হচ্ছে। মহাকালের ‘সিংহ ও মশক’ কবিতার কথা মনে পড়ে। ‘শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল, / ভব-তলে যত নর, / ত্রিদিবে যত অমর, / আর যত চরাচর, / হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।’ মেঘনাদের মতো আশ্চর্য রণকৌশল মশার। (গোড়ায় সেকারণেই বলা হয়েছে গেরিলা-যোদ্ধা)—‘কছু নাকে, কছু কানে, / ত্রিশূল সদৃশ হানে / হুল মশা বীর।’

শেষ পর্যন্ত ফলাফল?—‘গত-জীব মুগরাজ ভূতলে পড়িল।’ এ-কি পতঙ্গ কিংবা কীট সাধ্য। একজন মশাকে আখ্যা দিয়াছেন ‘কুদে ভ্যাম্পায়ার।’ আর একজন—‘ড্রাকুলা’। পৃথিবীতে রক্তপায়ীর অভাব নেই। কিন্তু সন্দেহ নেই। মশা তাদের মধ্যে অনন্য। শোষণ হিসাবে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। প্রধানত ক্ষুদ্র মানুষ এবং প্রাণীরাই তার শিকার। মশা শুন শুন গান গেয়ে অজান্তে তাদের প্রাণরস তুলে নেয়। মানুষকে বাদ দিলে এমনটি আর কে পারে?

মশা নিজের রক্ত তৃষ্ণা তৃপ্ত করেই খুশি নয়। প্রায়শ সে মৃত্যুবীজ বপন করে যায় তার অসহায় শিকারের দেহে। গত শতকের শেষ দিকে (১৮৯৭) কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালের ছোট্ট একটি গবেষণাগারে রোনাল্ড রস খুঁজে পেয়েছিলেন ম্যালেরিয়া রহস্য। তিনি দুনিয়াকে জানিয়েছিলেন স্ত্রী এনোকেলিস মশাই ম্যালেরিয়ার জীবানু বাহক। এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি (১৯০২)। তারপর ভাগীরথী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। কিন্তু মশা এবং ম্যালেরিয়া এখনও এই শহরের নিত্যসঙ্গী।

ম্যালেরিয়া সভ্যতার পুরানো সঙ্গী। ইতিহাস বলে পাঁচ হাজার বছর

আগে পৃথিবীর মানুষ চাষবাস শুরু করে। তখন থেকেই লাঙ্গল দেওয়া জমিতে সঞ্চিত জলে ফসলের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় মশার চাষ। অন্তত তিন হাজার বছর আগেকার মিশর এবং চিনের মমিতে নাকি পাওয়া গেছে ম্যালেরিয়ার চিহ্ন। পরবর্তীকালে ইউরোপ আমেরিকায়ও দেখা গেছে ব্যাপক ম্যালেরিয়া। আফ্রিকা থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে পূবে মেসোপটেমিয়া, উত্তরে গ্রিস এবং রোমে পৌঁছায় মশা এবং সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া। রোমান সৈন্যদের সৌজন্মে ক্রমে ইংল্যান্ড, এবং ডেনমার্কও। দক্ষিণ আমেরিকায় ম্যালেরিয়া ছিল। এখনও দিব্য আছে। যেখান থেকে এই রোগে এক সময় আক্রান্ত হয় উত্তর আমেরিকা। কোনও কোনও ন্যূনপত্তন মশার দৌরাণ্যে উজাড় হওয়ার মুখে। ষাতক মশা যে পৃথিবীর কত মানুষকে হত্যা করেছে তার লেখাজোকা নেই। ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে দুই বিশ্বযুদ্ধের অভাবতী সময়ে আমেরিকা মশা এবং ম্যালেরিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ইউরোপ থেকে ম্যালেরিয়া বিদায় নিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। কিন্তু এখনও তার দৌরাণ্য পুরোপুরি বহাল এশিয়া এবং আফ্রিকায়। একটি খতিয়ানে দেখছিলাম এখনও বছরে গড়ে দশ লক্ষ শিশু ম্যালেরিয়ায় মারা যায় আফ্রিকায়। আরও দশ লক্ষ অবশিষ্ট পৃথিবীতে। গড়ে প্রতি বছর একশ' মিলিয়ন মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত পৃথিবীতে। কলকাতা তথা বাংলা তথা ভারতের অসংখ্য মানুষ নিশ্চয়ই রয়েছেন সেই খতিয়ানে। প্রতি বছর আমরা নিয়ম করে এই শহরে ম্যালেরিয়া নিয়ে বিতর্ক শুনি। রকমারি কর্মসূচির কথা শুনি। কিন্তু ষাতক মশা তবু অপরাধিত। পুর নির্বাচনে যাঁরাই জিতুন না কেন, মশার কাছে তাঁরা পরাজিত। তবে কি জলা আর জঙ্গলে আকীর্ণ পরিবেশে জন্ম বলে কলকাতার এটাই নিয়তি? কিপঞ্জিং বলেছিলেন—“অন দ্য পেন্টিন্যাটাল টাউন, ডেথ লুক্‌ড ডাউন।” মৃত্যু এখনও তাকিয়ে আছে কলকাতার দিকে।

তবু কী আশ্চর্য, মশা সম্পর্কে আমরা যেন সম্যাসীর মতেই উদাসীন। রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়ার বাহন শনাক্ত করেছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মশা বৃদ্ধির সঙ্গে রেলপথের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। রেল যে জঙ্গলের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করেছে তাতে আর সন্দেহ কী। লোক-বিশ্বাস ভূত তাড়িয়েছে আলো আর লোহা। কিন্তু লোহার রেলপথ আবার অন্য দিক দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে বাংলার ভূত। এই রাজ্যে গ্রামের নাম মশা গ্রাম। কত গ্রাম যে ম্যালেরিয়ায় শ্মশান হয়ে গেছে তার হিসাব নেই। অনেক ভূতের গল্পে পঞ্চিক সে ধরনের কোনও গ্রামে হাজির হন। তারপর শুরু হয় গা ছম ছম করা কাহিনী। তবু আমাদের কাছে মশা যেন কৌতূকের উপলক্ষ্য। ম্যালেরিয়া রীতিমত উপভোগ্য। হ্যালোক্য নাথের গল্পের মশা চড়াই পাখির মতো বড়। জ্বাল পেতে তাকে ধরে ভেঙ্গে খেতে হয়। অমঙ্গলকর হুড়ায়

‘কেশনগরের মশার’ দাপট সবিস্তারে বর্ণিত বটে। কিন্তু যাকে যাকে রস সৃষ্টির আভাসও লভ্য। কলকাতার মশার আকার প্রকার নিয়ে নানা অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে সহাস্য তুলনা শোনা যায় অহরহ। যথা মশা বটে বেলেঘাটার। অন্য জন হয়তো বললেন, দূর মশাই, বেহালার মশার কাছে বেলেঘাটার মশা তো শিশু। তারা মশারিতে সুড়ঙ্গ কাটতে পারে, একজন অন্যজনকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার কৌশল জানে। এমনকি মশা মশারি নিয়ে উড়ে চলে গেছে এমন গল্পও রসিকদের আড্ডায় দিব্য শোনা যায়। ছেলেবেলায় একটি ধাঁধা ছিল বলতো ঘরের মধ্যে ঘর কী। কে না জানে, মশারি। বুদ্ধিমান হাঁক দিয়ে উত্তর দিত। বিজয় শুভের ‘মনসা-মঙ্গল’ আছে—

“মশার দোষেতে দিলাম মশারিতে আশুন।” মশার এমন শত্রু খুব বেশি দেখা যায় না। বরং, প্রয়াত আশু দে মশাই শুনিয়ে গেছেন সহনশীলতার গল্প। শুতে গিয়ে দেখা গেল মশারিতে বড় বড় জানালা। ঠিক আছে, ‘দুর্গা, দুর্গা’ বলে শুতে পড়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব মশা মশারির ভেতরে। তখন চুপচাপ বেরিয়ে এসে জানালাগুলো বেঁধে দেওয়া গেল। বসে। আর পায় কে? ঘরের সব মশা মশারির ভেতর বন্দি, সুতরাং বাহিরে, মেঝেয় নাক ডাকিয়ে ঘুমোত দোষ কী। শশী শেখর বসু শুনিয়েছেন সহনশীলতার আর এক গল্প। শহর থেকে, তিনি নিজেদের ছেড়ে আসা গ্রামে বেড়াতে গেছেন। পরিচিত একজন বয়স্ক মহিলা কথায় কথায় বললেন, দা ঠাকুর, মিছিমিছি কেন শহরে পড়ে আছেন, নিজেদের ঘরবাড়ি পড়ে আছে, গ্রামে এসে থাকুন না কেন? তিনি উত্তর দিলেন থাকতে তো পারি। কিন্তু মনে যে ম্যালেরিয়ার ভয়। মহিলা উত্তর দিলেন। ভয় কি দা ঠাকুর, লোকেরা অফিস যাওয়ার সময় যেমন সকাল সকাল খায় তেমনই খেয়ে নেবে। কম্প দিয়ে ছুর আসবে তখন, লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকবে। কয়েক ঘণ্টা পরে ঘাম দিয়ে ছুর ছেড়ে যাবে। তখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়বে। ভাববে দশটা পাঁচটা অফিস করে এলে।

সহজ সরল সমাধান। কে জানে, এই সহনশীলতাই শত শত বছর ধরে বাংলা মূলকে মশাকে লাগন করে চলেছে কিনা। অবশ্য তার পিছনে কায়মি স্বার্থের পৃষ্ঠপোষণও থাকা সম্ভব। মশা মানে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য। গ্রামের পুরোহিত হয়তো ছুরাসুরের পূজা করে কলাটা মূলেটা পেয়েই খুশি, কিন্তু অন্যরা এত অল্পে তুষ্ট হবেন কেন? মশা মারা ধূপ ধূমো, ট্যাবলেট, হাত বোমা, ডিডিটি ও রকমারি রাসায়নিক, স্প্রে—মশার নামে বাজারে কত না উপচার। ইত্বক খোঁয়া কামান পর্যন্ত। কলকাতা পুরসভার দৌলতে অবশেষে মশা মারতে কামান দাগাও দেখা গেল। শুধু কি, তাই? মশার ডিম খেয়ে

মশককে নির্বংশ করার জন্য আমদানি করা হয়েছে গাপ্পি নামে এক মশা থেকে। এখন মশা নিরোধক গাছের কথাও শোনা যাচ্ছে। স্থির হয়েছে পুরসভা নাকি শহরে একলক্ষ নিম গাছ লাগাবে। কারণ, নিম গাছের হাওয়া মশা প্রতিরোধক। অনুমান করতে অসুবিধা নেই তারপরও বহাল থাকবে সনাতন সেই মশারিটি। কে না জানেন, মশারিও নিছক কুটির শিল্প নয়, মূলত যাকে বলে—বিগ বিজনেস। বিদেশি উৎপাদকরাও সেখানে হাজির। বাজারে বিদেশি মশারির কাপড়ও কিনতে পাওয়া যায়। সর্বোপরি ম্যালেরিয়া এবং মশা-ঘটিত অন্যান্য ব্যাধি। তা ঠেকাবার জন্য বিশ্বব্যাপী কত না উদ্যোগ। লক্ষ লক্ষ হাতুড়ে, চিকিৎসক, রসায়নবিদ, গবেষক এবং প্রশাসক জড়িত মশা এবং ম্যালেরিয়া সম্পর্কিত শিল্পে। সুতরাং, ক্ষুদ্রে মশা শুধু প্রাণ হরণকারী নয়, অসংখ্য মানুষের অম্লদাতাও বটে। সুতরাং, মনে মনে তাঁরা মশার চিরায়ু প্রার্থনা করতেই পারেন। বাংলায় মাছি মারা কেরণী বলে একটা কথা আছে। পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষকে কিন্তু একই স্টাইলে বলতে পারি মশাজীবী প্রাণী।

পৃথিবীতে নাকি হাজার হাজার জাতের মশা রয়েছে। সব মানুষ যেমন এক নয়, সব মশাও তেমনই এক নয়। মানুষের ম'গ্রহি কোনও কোনও মশা-মহাশয়। এই অগণিত মশককুলের মধ্যে অধিকাংশই প্রীকৃষ্ণের নিত্য নিরীহ জীব। শতকরা মাত্র দশ ভাগ রোগ জীবানুর বাহক। তার চেয়েও চাক্ষু্যকর ঘটনা সব মশা রক্তপান করে না। পুরুষেরা দল মত নির্বিশেষে নিরামিষাশী। তারা রক্ত স্পর্শ করে না, গাছপালায় রস পাণ করেই তৃপ্ত। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও, বিজ্ঞানীরা বলেন মশক কুলে রক্তপিপাসু একমাত্র স্ত্রী মশকরাই। তারাই তুলসিদাসের সেই দোহার মতো রক্তপান করে মহাশয়া হয়ে উঠে। তুলসিদাস নারীকে বলেছেন দিনকা মোহিনী, রাত কা বাধিনী।। রায়ে সে রক্ত পানে মেতে উঠে। তবু কবি বলেন, কী আশ্চর্য দুনিয়া তারপরও পাগল হয়ে মোহিনী পোষে। নারী বিদেষীর কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু মশা বিদেষী সবিস্ময়ে শোনে, সব স্ত্রী মশকের পানাত্যাস এক রকম নয়। কেউ রক্তের নেশায় মেতে উঠতে চায় সন্ধ্যায়, কেউ গভীর রাতে। কিন্তু রক্ত তাদের চাই-ই কারণ, রক্ত পান না করলে বংশ রক্ষা সম্ভব নয়। স্ত্রী এনোফিলিস সুন্দরী অতএব ঝুঁকি নিয়েই রক্তের সন্ধান বেঁধে হয়। অভিযান সফল হলে একদিকে বংশে বাতি দেওয়ার ব্যবস্থা যেমন পাকা হয়, অন্য দিকে মানুষকে নির্বংশ করারও মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হয়। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর ঋতিয়ান আগেই শোনানো হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাধির একটি ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়নি। শত শত বছর ধরে কোনও জনগোষ্ঠী ম্যালেরিয়ার পরিবেশে বাস করলে, পুরুষানুক্রমে তাতে আক্রান্ত

হলে তাঁদের শরীরে নানা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায়। তাঁরা আর সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ থাকেন না।

দেখে গেছে দীর্ঘকাল পরেও আমেরিকার একালের কৃষকদের অনেক বহন করছেন তাঁদের বিস্মৃত পূর্বপুরুষদের ম্যালেরিয়াজনিত ক্ষত। আধুনিক বাঙালিও বোধ হয় তার প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাতে পারেনি। সুতরাং, মশা মেয়ে হাত কালা করব না, এই বাহাদুরি বাঙালির কাছে না। কারণ, মশা আমাদের জাতশত্রু।

উপসংহারে মশার জীবনে একটি গৌরবময় অধ্যায়ের কথা। অস্তিত্ব মশার তরফে সোঁটা স্বর্ণাঙ্করে লিখিত রাখার মতো বটে। কলম্বাস যখন আমেরিকায় পৌঁছান তার বেশ কিছুকাল আগে পর্তুগিজ অভিযাত্রীরা পৌঁছেছিলেন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে। কিন্তু পরবর্তী সাড়ে তিনশ বছর ধরে আফ্রিকা তবু ইউরোপিয়ানদের কাছে—“অন্ধকার মহাদেশ।” পশ্চিমীদের সাম্য নেই তার গভীরে প্রবেশ করেন। দাস-ব্যবসা থেকে শুরু করে যা কিছু লেনদেন সবই উপকূল বরাবর। নতুন পৃথিবী আমেরিকা, বিশাল এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া—সবই নাগালে এল। কিন্তু ঔপনিবেশিকদের কাছে আফ্রিকা নিবিদ্ধ এক মহাদেশ। সাম্রাজ্যবাদের এই যে শত শত বছর ধরে ঠেকিয়ে রাখা তার কৃতিত্ব কিন্তু বহুলাংশে এই ক্ষুদ্রে মশার। সত্যি বলতে কী, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তারাই ছিল এক তার্শে আফ্রিকার প্রহরী। ১৪৮৫ সালে একজন পর্তুগিজ অভিযাত্রী অভিযান চালিয়েছিলেন কাসো নদীর প্রবাহ ধরে। দেখা গেল কয় দিনের মধ্যে অভিযাত্রীরা অধিকাংশই মৃত। মৃত্যুর হেতু পীতজ্বর, টাইফয়েড এবং ম্যালেরিয়া। ১৫৬৯ সালে পশ্চিমীদের ভাগ্যে একই পরিণতি জায়েজির উপত্যকায়। ১৭৭৭-৭৯’র কাল পরে উইলিয়াম বোন্টস-এর অভিযান। ভিলাগো উপসাগরে দলের ১৫২ জনের মধ্যে প্রাণ হারালেন ১৩৯ জন। ১৮০৫ সালে আপার নাইজার বা উজ্জানি নাইজারে অভিযান চালাতে গিয়ে মঙ্গো পার্ক সঙ্গীদের সবাইকে হারালেন। ১৮১৬-১৭ সালে আর একটি অভিযানেরও মোটামুটি একই ফল। অল্পদাশঙ্কর তাঁর ছড়ায় বলেন—“জাপানিরা ভাগল কেন সে খবর কি রাখেন? কেশনগরের মশার মামা ইক্ষলেতে থাকেন!” তিনি বোধ হয় খেয়াল করেননি, মশার মামার ঠিকানা ছিল এককালে আফ্রিকা। একালের পশ্চিমী গবেষকরা নির্বিধায় স্বীকার করেন মশা প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা না করলে অনেক আগেই পতন হত আফ্রিকার।

“সাদা মানুষের গোরস্থান”, আফ্রিকার এই খ্যাতি শেষ পর্যন্ত লুপ্ত হয় কুইনানের দৌলতে। জেসুইট পাদ্রিরা সপ্তদশ শতকেই সন্ধান পেয়েছিলেন সিকোনা গাছের। অ্যান্ডিড পর্বতমালার সানুদেশে এই বন্য গাছের ছাল

ব্যবহার করেই দক্ষিণ আমেরিকার নানা দেশের বাসিন্দারা সেই ভয়াবহ ছুরের সঙ্গে লড়াই করে নাম যার ম্যালেরিয়া। তাঁরা বস্তুটি সংগ্রহ করে ইউরোপে নিয়ে আসেন। ১৮২০ সালে একজন ফরাসি ডেবলবিদ সেই ছাল থেকে কুইনাইন তৈরি করেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল ম্যালেরিয়ায় ওই ঔষধটি বেশ কার্যকর। ১৮৩০ নাগাদ শুরু হয় তার বাণিজ্যিক উৎপাদন। ১৮৪৩ সালে আমরা দেখি লিভিংস্টোনের ঝুলিতে কুইনাইনের বড়ি। আফ্রিকায় সব ইউরোপিয় অভিযাত্রীদের সঙ্গেও শুধু বন্দুক আর বাইবেল নয়, অপরিহার্য হয়ে উঠেছে কুইনাইন। ফলে একতাল ধরে আগলে রাখা দুয়ার পশ্চিমীদের কাছে খুলে দিতে হল আফ্রিকাকে। অবশ্য আরও একটি হাতিয়ার সেদিন সহায় হয়েছিল অভিযাত্রীদের পক্ষে। সেটি স্টিমবোট। বাষ্পীয় পোত।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে কুইনাইনের ভূমিকা একালে এক আলোচ্য বিষয়। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ছদ্মবেশে সিঙ্কনার বীজ সংগ্রহ করা থেকে শুরু বিলাতের কিউ উদ্যান এবং কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেন-এ রকমারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নীলগিরি। দার্জিলিং এবং শ্রীলঙ্কায় তার চাষ এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। প্রতিযোগী ডাচরা বাগান শুরু করে জাভায়। শুরু হয় আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা। সব কিছুই মূলে কিন্তু এই মশা। ইশ্বরগুপ্ত বলেছিলেন—“রেতে মশা দিনে মাছি এই নিয়ে কলকাতায় আছি।” অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি আরও বিশদ বলেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতা। লিখেছেন,—“কি কব দুঃখের দশা, দিনে মাছি রেতে মশা, দুইকালে বন্ধ দুই জন; / শয্যা ভার্যার প্রায় ছারপোকা ওঠে গায়, প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন।” এই রসিকতারই প্রতিশ্রুতি শুনি হ্যারিব্‌স-এর উক্তি, *What with the hum of the mosquito above, and the bug in the bed below, I am regularly humbugged out of my night's rest*” সাম্রাজ্যবাদীদের কিন্তু এজাতীয় রসিকতার সময় ছিল না। তাঁরা সেদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কুইনাইন প্রথমে পাবেন সাম্রাজ্যের প্রহরী এবং কারিগররা। অর্থাৎ, সৈনিকেরা এবং নানা শ্রেণীর রাজকর্মচারীরা। কারণ, গোরহানগুলো উপড়ে উঠছে শবে। ‘বার্ডওয়ান ফিভার’, ‘পাক্স জুর’, ম্যালেরিয়া। ঝাঁকঝাঁক মশার মতোই ঝাঁকে ঝাঁকে মৃত্যু। মশার শিকার এমন কি লেডি ক্যানিং পর্যন্ত। কোথায় তখন এদেশের সাধারণ মানুষের জন্য ডাকঘরের কুইনাইন।

কেন্দ্র, রাজ্য ও উন্নয়ন

অনির্বাক চট্টোপাধ্যায়

একাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। অর্থ কমিশনের সুপারিশ নিয়ে টানাপোড়েন হবেই। এই টানাপোড়েনের দুটি স্তর থাকে। একটি কেন্দ্র-রাজ্য স্তর, অন্যটি রাজ্য-রাজ্য স্তর। কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধের আবার দুটি দিক। এক, রাজ্যের কতটা অংশ কেন্দ্রের হাতে থাকবে আর কতটা রাজ্যের হাতে যাবে তা নিয়ে দু'পক্ষের দুরকম মত থাকবেই, কারণ কেন্দ্র বেশি বা কম পেলে, রাজ্যের ভাগে কম বা বেশি হয়, সুতরাং দুই তরফের স্বার্থ সরাসরি বিপরীত। দুই তরফের লাভ (বা লোকসান) যোগ করলে যখন শূন্য হয়, তখন অর্থশাস্ত্রের (এবং অন্য নানা শাস্ত্রের) তাত্ত্বিকরা সেই খেলাকে বলেন 'জিরো সাম গেম', পরস্পরবিরোধী স্বার্থের এর চেয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর হয় না। দুই, অর্থ কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করা বা না করার অধিকার পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্য সরকারগুলি তাদের সমর্থন বা প্রতিবাদ জানাতে পারে, প্রত্যেক অর্থ কমিশনের ক্ষেত্রে জানিয়েছে-ও, কিন্তু সেই মতামতের কোনও আইনি বা সাংবিধানিক মূল্য নেই, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের কথা শুনতে বাধ্য নয়। এই অবস্থাটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মৌলিক দুর্বলতার পরিণাম। কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে অর্থ বন্টনের নিয়ম কী হবে, সেটা শেষ অবধি কেন্দ্রই স্থির করবে, এ যেন দুই খেলোয়াড়ের একজনকে আম্পায়ার বানিয়ে দেওয়া, কিংবা দুই পক্ষের মামলায় একটি পক্ষকেই বিচারকের আসনে বসানো। স্বভাবতই এমন বিষয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা রাজ্যের প্রতিবাদ শোনা যায়। সচরাচর সেই প্রতিবাদ বিস্ময় নীতিগত হয় না, প্রাপ্য মনোমত না হলে তখনই আপত্তি ওঠে। কিন্তু সেই আপত্তিতে একটা নীতিগত প্রতিবাদও মিশে থাকতেই পারে।

রাজ্য-রাজ্য বিরোধের চরিত্রটিও যুগপৎ অর্থের পরিমাণ এবং বন্টনের নীতি দ্বারা নির্ধারিত। অর্থ কমিশন রাজ্যগুলির প্রাপ্য তাদের মধ্যে বন্টনের জন্য কত্রে একটি মাপকাঠির সাহায্যে একটি সূত্র নির্ধারণ করে। মাপকাঠিগুলি কী কী এবং সূত্র নির্ধারণের সময় কোন মাপকাঠিকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে কোন রাজ্য কত টাকা পাবে। স্বভাবতই এই নিয়ে নানা রাজ্যের নানা মত থাকে, এখানেও 'জিরো সাম গেম' এবং তার অন্তিম দ্বন্দ্ব। সচরাচর ই দ্বন্দ্বও কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধের মুখোশ পরে থাকে, কারণ—একটু আগেই বলেছি—বন্টনের নীতি নির্ধারণের চূড়ান্ত অধিকার

কেন্দ্রের হাতে। তাই যে রাজ্য বঞ্চিত হল সে অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে কথা না বলে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়। যদিও আসলে কোনও অবস্থাতেই কেন্দ্রীয় সরকার সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারত না। অর্থাৎ অর্থ বন্টনের যে সূত্রই হির হোক রাজ্যে-রাজ্যে স্বার্থের বিরোধ এখানে অনিবার্য এবং মৌলিক, কিন্তু কোনও একটি সূত্র নির্দিষ্ট হলেই সেই বিরোধিতা কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধের রূপ নেয়, যে রাজ্যগুলি নিজেদের বঞ্চিত মনে করছে তারা কেন্দ্রের প্রতিকূলে দাঁড়ায়।

একাদশ অর্থ কমিশন সংক্রান্ত বিতর্কে একটি অন্য রকম ঘটনা দেখা গেছে। এই কমিশনের সুপারিশে যে সব রাজ্যের লোকসান হয়েছে তারা সরাসরি অন্য এক দল রাজ্যের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। তাদের বক্তব্য, ওই অন্য রাজ্যগুলি নিজেদের ব্যর্থতায় ভাল উন্নতি করতে পারেনি, গরিব থেকে গেছে এবং অর্থ কমিশন সেই দারিদ্র্যের জন্যই তাদের বাড়তি রাজস্ব-ভাগ পাইয়ে দিয়েছেন। এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগ নিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রাবাবু নাইডু। তিনি প্রচার পছন্দ করেন, নেতৃত্ব দিতে ভালবাসেন, সংবাদ মাধ্যমের চড়া আলো তাঁর বিশেষ প্রিয়। অর্থ কমিশনের সুপারিশের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি যে তাঁর ভাষায় ও ভঙ্গিতে পশ্চিমবঙ্গের এবং বিহারের রাজ্য সরকারের মুণ্ডপাত করেছেন, তা চমকপ্রদ। কিন্তু ভাষা ও ভঙ্গির বহিঃসংস্পর্শে ছেড়ে যদি তাঁর বক্তব্যটুকু প্রশিধান করি তবে বোঝা যাবে, সেই বক্তব্যে অন্য কয়েকটি রাজ্যেরও সায় আছে। যেমন মহারাষ্ট্র, গুজরাত, পঞ্জাব, কর্ণাটক ইত্যাদি। তাদেরও ক্ষোভ এই যে দরিদ্র রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় রাজস্বের বেশি ভাগ দিলে দারিদ্র্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, আর দারিদ্র্য যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থতার পরিণাম তাই প্রশ্রয় পায় ব্যর্থতা, সাফল্য তিরস্কৃত হয়। এ কেমন বিধান?

এই বক্তব্য এটা তাঁর প্রচারভঙ্গিতে নিহিত আছে ভারতীয় অর্থনীতি এবং ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও প্রবণতার একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রলক্ষণ। নব্বইয়ের দশকে যে আর্থিক সংস্কার ঘটেছে, যতখানি ঘটেছে, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, অর্থনীতির ওপর, বিশেষত শিল্পবাণিজ্যে বিনিয়োগের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে শিথিল হয়েছে। এই বিনিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নয়, সার্বিকও নয়, কিন্তু অন্তত একটি বিশেষ ব্যাপারে বিনিয়োগের ওপর পুরনো নিয়ন্ত্রণের আর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। কোনও শিল্পোদ্যোগী বা কারবারি কোন রাজ্যে কত বিনিয়োগ করবেন, সে বিষয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের আজ বিশেষ কিছু বলার নেই, সেটা প্রায় সম্পূর্ণত বিনিয়োগকারীর বিচার। তার ফলে রাজ্যগুলিকে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি বিচারে এক রাজ্যে

বিনিয়োগ বাড়লে, সেই রাজ্যের আর্থিক উন্নতি ঘটলে তার ফলে অন্য রাজ্যেরও মঙ্গল হওয়ার কথা, কারণ উন্নয়নের ফলে বাজারের সমৃদ্ধি হয়, সেই বাজারের সুযোগ অন্যরাও নিতে পারে। কিন্তু রাজ্য যাঁরা চালান তাঁদের কাছে দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ অপেক্ষা স্বল্পমেয়াদি স্বার্থ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নির্বাচনী রাজনীতি চরিত্রেই স্বল্পমেয়াদি। তা ছাড়া, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের প্রক্রিয়াটিতে অনেক জটিলতা থাকে, একটি রাজ্যের উন্নয়নের সুফল অন্য একটি রাজ্যে পৌঁছবেই কিনা বা কবে কী ভাবে কতখানি পৌঁছবে, সে বিষয়ে কোনও নিশ্চিতি থাকে না। এবং ভারতের মতো দেশে মোট বিনিয়োগের পুঁজি সীমিত, তাই যে কোনও রাজ্যই চায় যথাসম্ভব সে পুঁজি টেনে আনতে, অন্তত সেটাই চাওয়া স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগের রাজ্যওয়াড়ি বস্টন হয়ে পড়ায় একটা ‘জিরো সাম গেম’—স্বল্পমেয়াদি বিচারে।

ভারতে এই রেবারেবিটা দেখতে দেখতে তীব্র হয়ে উঠেছে। তার নানান প্রকাশ দেখা গেছে। বিনিয়োগকারীদের ভোলাতে বিভিন্ন রাজ্য বিক্রয় করে ছাড় দিতে দিতে এমন একটা স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল যে সকলেরই রাজস্বের বিরূপ লোকসান হচ্ছিল, তাই আবার সবাই সমবেত হয়ে ন্যূনতম বিক্রয় কর বসানোর অঙ্গীকার করেছে। এটা এক রকম রেবারেবি। আর এক রকম রেবারেবি চলে পরিবেশ পরিকাঠামো নিয়ে। সব রাজ্যই বলে তার পরিবেশ ভাল, পরিকাঠামো ভাল, শিল্পবাণিজ্যের সুযোগ তার এলাকাতেই সর্বাধিক। এই রেবারেবি অনেক সময় একটা দৃষ্টিকটু রূপ নেয়; যখন রাজস্বহানের মুখ্যমন্ত্রী এসে কলকাতার শিল্পপতিদের আপন রাজ্যে ডাকাডাকি করেন, কিংবা হায়দরাবাদ এবং বাঙ্গালোর ইনফর্মেশন টেকনোলজি বা তথ্য প্রযুক্তির নতুন রাজধানী হয়ে ওঠার জন্য একে অন্যের নিন্দায় মুখর হয়। অর্থ কমিশনের সমালোচনা করতে গিয়ে চম্রবাবু নাইডু যেভাবে ‘ব্যর্থ’ রাজ্যগুলির নিন্দায় মুখর হয়েছেন সেটা এই অর্থেই দৃষ্টিকটু এবং দৃষ্টিকটু হলেও, অমোঘ, অনিবার্য। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় ভূমিকা যত খর্বিত হবে, বিনিয়োগ যতই বাজারের দ্বারা নির্ধারিত হবে, রাজ্যে রাজ্যে প্রতিযোগিতা ততই বাড়বে।

এই প্রতিযোগিতায় প্রচারের ভূমিকা প্রবল হতে বাধ্য। এবং প্রচারের লক্ষ্য যদি হয় অন্যদের তুলনায় নিজেদের যোগ্যতর প্রতিপন্ন করা, তা হলে নিজের প্রশংসার পাশাপাশি অন্যের নিন্দাও একটি প্রকরণ হয়ে উঠবেই। একটি ব্যাপ্তের বিজ্ঞাপনে অন্য ব্যাপ্তকে কী ভাবে ছোট করা যায় তার বিস্তারিত বিজ্ঞাপন চার পাশে ছড়ানো রয়েছে। বিনিয়োগের বাজারে রাজ্যগুলি ক্রমশ নিজেদের ‘ব্র্যান্ড মূল্য’ বাড়াতে চাইছে। চম্রবাবু নাইডুর ‘সাইবারাবাদ’ বা ‘হাই টেক সিটি’ এই উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত। এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য

নিয়েও প্রশ্ন নেই। বিল ক্রিস্টন কিংবা বিল গেটস তাঁকে সার্টিফিকেট দিলেই অক্ষুপ্রদেশের সব দুঃখ ঘুচবে না, কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রটিতে বিনিয়োগ যে বাড়বে তা তো দেখাই যাচ্ছে। তার পরেও প্রবল বর্ষণে হায়দরাবাদ জলমগ্ন হবে, জনজীবন বিপন্ন হবে, কিন্তু তা নিয়ে কলকাতাবাসীর জ্বাধার হেতু নেই। তাঁর শহরেও অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে, কিন্তু সূর্যোদয়ের শিল্পে বিনিয়োগ আসে না। কোন রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন কতটা হচ্ছে সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, বিনিয়োগের দড়ি টানাটানিটাই প্রাথমিক সত্য।

স্বাধীনতার পরে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের যে নীতি ও কার্যক্রম জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর সহকর্মী ও উপদেষ্টারা তৈরি করছিলেন তার অনেকগুলি ঘোষিত লক্ষ্যের একটি ছিল বিভিন্ন অঞ্চল বা রাজ্যের সুবম উন্নয়ন। নানাভাবে সেই লক্ষ্য পূরণের পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা। অর্থ কমিশন ও যোজনা কমিশন অনগ্রসর রাজ্যকে বিশেষ সাহায্য করবে। কেন্দ্রীয় সরকারি বিনিয়োগের স্থান নির্বাচনে অনগ্রসর অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অনগ্রসর এলাকায় শিল্পস্থাপন করলে বেসরকারি উদ্যোগীকে নানা সুবিধা দেওয়া হবে। বেসরকারি উদ্যোগীকে শিল্প-লাইসেন্স মঞ্জুর করার সময়েও দেখা হবে যাতে তিনি অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প নির্মাণ করেন। এই সব নীতির প্রত্যেকটিই শেষ অবধি বিকৃত হয়েছে। সুবম উন্নয়নের নামে বিশেষ বিশেষ রাজ্য বা অঞ্চলকে রাজনৈতিক কারণে নানা সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আঞ্চলিক সাম্য প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় না।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। পঞ্চাশের দশকে কয়লা লোহা ইস্পাতের জন্য রেল মাসুল দেশ জুড়ে সর্বত্র সমান করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যে ক্ষতি করা হয়েছিল তার ফল এই রাজ্য আজও ভুগছে। সেই সমীকরণের যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছিল, কয়লা লোহা ইস্পাতের মতো অত্যাবশ্যক শিল্প-উপকরণের সুযোগ কেবল একটি অঞ্চলে সীমিত থাকলে দেশের অন্য অঞ্চলগুলির প্রতি অন্যায় করা হবে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ যখন—সেদিন—শিল্পে দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অগ্রসর। এই যুক্তি মানলে অন্য কিছু কিছু অত্যাবশ্যক শিল্প-উপকরণের ক্ষেত্রেও সেটা প্রয়োগ করা উচিত ছিল। যেমন তুলো, যেমন সিমেন্ট, যেমন পেট্রোলিয়াম। সে সবের ওপর রেল মাসুল বা পরিবহনের অন্য খরচ সারা দেশে এক রাখা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বাঞ্চলের নিজস্ব প্রাকৃতিক (কয়লার ক্ষেত্রে) এবং ঐতিহাসিক-প্রাকৃতিক (লোহা-ইস্পাতের ক্ষেত্রে) সুবিধা হরণ করা হল কিন্তু অন্য অঞ্চলের অনুরূপ সুবিধা থেকে গেল। এই অসঙ্গত নীতির মূল কারণ একটাই। দেশের রাজধানীতে বসে যাঁরা

নীতি নির্ধারণ করেছিলেন তাঁদের উপর পূর্বাঞ্চলের প্রভাব অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কম ছিল। তার নানা কারণ—ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক। দিল্লি থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক দূরত্ব অনেক, রাজনৈতিক-মানসিক দূরত্ব ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি। বিধানচক্র রায়ের ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং তৎপরতা পশ্চিমবঙ্গের জন্য কিছু প্রকল্প ও কিছু টাকা আদায় করেছিল বটে, কিন্তু সমস্যার মূলে কোনও আঘাত করতে পারেনি।

কিন্তু বিধানচক্র রায়ের প্রসঙ্গেই অন্য কথাটাও বলা দরকার। যে যুক্তিতে রেল মাসুলের সমীকরণ ষাটিয়ে গোটা দেশের শিল্পোন্নয়নে উৎসাহ দিতে চাওয়া হয়েছিল, সেটা অর্থহীন ছিল না। সে দিন বিধানচক্র রায় নিজেকে এ যুক্তি মেনে নিয়ে বলেছিলেন—রাজ্যের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড়, তাই এই সমীকরণ মেনে নিতে হবে। তিনি যুক্তিটিকে অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগের দাবি না জানিয়ে ভুল করেছিলেন, কিন্তু তাতে যুক্তিটি ভ্রান্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে দিনের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি-চিন্তায় আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অর্থ কমিশনের সিদ্ধান্তেও সেই লক্ষ্যের বিলম্ব প্রভাব থাকে। কেন্দ্রীয় রাজস্ব রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টনের মাপকাঠি স্থির করতে গিয়ে স্বভাবতই দেখা হয়, যে সব রাজ্যের নিজস্ব সামর্থ্য কম তারা যাতে কিছু বিশেষ সুবিধে পায়। আর এখানেই নতুন যুগের বাজার অর্থনীতির মূল আদর্শের সঙ্গে রাজস্ব বন্টন নীতির একটা বিরোধ বেধেছে। চন্দ্রবাবু নাইডু যে জেহাদ শুরু করেছেন সেটা বহুলাংশে সুবিধাবাদী কার্যক্রম, তিনি আয়ের অনুপাতে ব্যয় বেশি করেছেন বলে অর্থ কমিশনের বিচারে ‘শাস্তি’ পেয়েছেন, এখন তা নিয়ে অশান্তি করতে চাইছেন। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে যে ভাষায় তিনি কথা বলছেন সেটা বাজার অর্থনীতির ভাষা। যতদিন যাবে, এই ভাষার প্রতিপত্তি তত বাড়বে, অগ্রসর রাজ্যগুলি অনগ্রসর রাজ্যগুলিকে ‘দাক্ষিণ্য’ দেখানোর বিরুদ্ধে ততই প্রতিবাদ জানাবে। আবার এরই অমোঘ বিপরীপ প্রক্রিয়ায় অনগ্রসর রাজ্যের প্রতিনিধিরা অগ্রসর রাজ্যের বিরুদ্ধে তোপ দাগবেন, যেমনটি দেখা গেছে বিহারের লালুপ্রসাদ যাদবের চন্দ্রবাবু-নিন্দায়।

এই পারস্পরিক বিরাগ এবং নিন্দার পরিণামে রাজ্যগুলির মধ্যে মানসিক দূরত্ব বাড়বে, এ আশঙ্কা প্রবল। সেটা জাতীয় সংহতির দুর্বল এবং বহু-আক্রমণে আক্রান্ত ভিত্তিকে আরও দুর্বল করে দেবে, এমন কথা ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। একটি রাজ্যের জননায়ক এবং কার্যত সরকারপ্রধান অন্য একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ‘কম্পিউটারওয়াল’ বলে ব্যঙ্গ করছেন, সেই মুখ্যমন্ত্রী আবার আর এক রাজ্যের ‘কোনও উন্নতিই হবে না’ বলে নিদান দিচ্ছেন, এই সওয়াল-জবাব নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির নাগরিকদের সহমর্মিতা বানাতে সাহায্য করবে না।

এখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। বাজার অর্থনীতি রাজ্যে রাজ্যে সীমানা ভাঙতে চায়। যেখানে যে ভাবে প্রসারিত হলে মুনাফা বাড়বে সেখানে সে ভাবেই প্রসারিত হতে চায়। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হতে পারে, বাজারের প্রসারে রাজ্যগুলি পরস্পর আরও কাছাকাছি আসবে, তাদের মধ্যে লেনদেন বাড়বে। সেটা এক অর্থে সত্যি হতেই পারে। কিন্তু কোন অর্থে, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। বাজার কোনও সাম্যের ধার ধারে না, কেবল পুঁজির জন্য সুযোগের সাম্য চায়, যাতে পুঁজি অবাধে আপন মুনাফা অর্জন করতে পারে। সমস্ত রাজ্য বা সমস্ত অঞ্চল যদি পুঁজিকে সমান ভাবে মুনাফা অর্জনের সুযোগ দিতে পারত তা হলে বাজারের অবাধ প্রসার থেকে সমস্ত রাজ্য সমান সুবিধা আদায় করে নিতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তার কোনও প্রশ্ন নেই। বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্ন অবস্থানে দাঁড়িয়ে পুঁজির সামনে নিজেদের উন্মুক্ত করে দিচ্ছে বা দিতে বাধ্য হচ্ছে, বাজার বিভিন্ন রাজ্যের কাছে বিভিন্ন সুযোগ এবং সমস্যা নিয়ে আসছে। পঞ্জাবে সবুজ বিপ্লব হলে ওড়িশার খেতমজুর বা প্রান্তিক চাষী বছরের কয়েক মাস অভিবাসী হয়ে রোজগার করতে পারেন। বাঙ্গালোরে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের ক্ষুতিতে পশ্চিমবঙ্গের কম্পিউটার প্রশিক্ষিত তরুণের কেরিয়ার বিকশিত হয়। প্রথম দৃষ্টান্তে যে শ্রেণীর লাভ, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে তার কোনও লাভ নেই। কিন্তু প্রথম দৃষ্টান্তে যে সুযোগ পাওয়া গেল, তা কাজে লাগানোর জন্য কোনও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে প্রশিক্ষণই অত্যাবশ্যিক শর্ত। পশ্চিমবঙ্গে তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ যদি পর্যাপ্ত এবং উৎকৃষ্ট না হয় তবে তথ্য প্রযুক্তি-নির্ভর শিল্প ও পরিষেবার আদিশস্ত সমৃদ্ধি ঘটলেও এই রাজ্য তার সুযোগ নিতে পারবে না। এই প্রশিক্ষণ আবার নিরালস্য হতে পারে না, সে জন্য প্রয়োজন অস্তুত মাধ্যমিক স্তর অবধি ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের। বিভিন্ন রাজ্য এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে। স্বভাবতই তাদের সম্ভাবনাও আলাদা আলাদা।

প্রশ্ন হল, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যগুলি এই পরিস্থিতিতে বাজার অর্থনীতির মোকাবিলা করবে কী ভাবে? কেন্দ্রীয় রাজস্বের বৃদ্ধি ক্রমশই কমে আসছে, সেই রাজস্ব থেকে ভাগ নেওয়ার জন্য রাজ্যে রাজ্যে টানাটানি চলবেই। কিন্তু তা দিয়ে খুব বেশি দূর যাওয়া যাবে না। রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহের সুযোগও সীমিত। সুতরাং বেসরকারি বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীলতা উত্তরোত্তর বাড়বে। সেই নির্ভরশীলতার প্রভাবও অপ্রতিরোধ্য। দু'ভাবে সেই প্রভাব কাজ করতে পারে। একটি ইতিবাচক দিক, অন্যটি নেতিবাচক। ইতিবাচক দিকটি হল বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নানা প্রকরণের সমন্বয়ে সেই উদ্যোগ সম্ভব। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে কয়েকটি রাজ্য

বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোটামুটি ভাল অবস্থার সত্যটি বাদ দিলে অন্য সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ হয় এখনও কোনও উদ্যোগ শুরু করেনি, নয়তো সে উদ্যোগ ক্ষীণ, বিক্ষিপ্ত, দ্বিধাগ্রস্ত।

নেতিবাচক দিকটির কথাও সংক্ষেপে বলা যায়। বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য কোনও রাজ্য সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের অস্বাভাবিক কিছু সুবিধে করে দিতে পারে। যেমন, শ্রমিক-কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি বা সুযোগসুবিধে না দিয়ে উৎপাদনের খরচ কম রাখার অনুমতি, কৃষিজমি বা অরণ্য কিংবা জনজাতীয় বাসভূমিতে শিল্পনির্মাণের অনুমতি—যা নাকি পরিবেশের পক্ষে কিংবা স্থানীয় মানুষের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। এ ধরনের কিছু কিছু 'উৎসাহ' দানের চেষ্টা ইতস্তত দেখা যাচ্ছে। শেষ অবধি এর পরিণাম কী হবে সেটা নির্ভর করবে ভুল আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের উপর। বিভিন্ন রাজ্যে তার সম্ভাবনা বিভিন্ন। সেটাও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি চরিত্র।

দরকার নতুন মুখোশের

গৌতম রায়

ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন অন্ধ্র প্রদেশের দলিত রাজনীতিক বঙ্গার লক্ষ্মণ। হিন্দু মহাসভা-জন সংঘ-বি জে পির বিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম এমন ঘটনা। জনসংখ্যার এক বিপুল অংশকে মূল স্রোতের বাইরে রেখে ভারতীয় রাজনীতির নিয়ন্তা হওয়া কঠিন, এই উপলব্ধি থেকেই কেন্দ্রীয় শাসক দল বি জে পি একজন দলিতকে দলের মাধ্যম বসিয়েছে, এটা মনে করাটা অতিসরলীকরণ হবে। কেননা বি জে পি হিন্দু সমাজের যে উচ্চবর্ণীয়দের প্রতিনিধিত্ব করে, দলিতদের তারা জুতোর তলায় রাখতেই অভ্যস্ত, শিরোধার্য করতে নয়। বুঝতে অসুবিধা নেই যে, বিজেপির এই সিদ্ধান্ত প্রতারণামূলক, লোকদেখানো এবং আগামী নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে নেওয়া। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার শিবিরে দলিতের এই উত্থান নিতান্তই প্রতীকী, প্রতীকের বাইরে এর অন্য কোনও তাৎপর্য খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

লক্ষ করার বিষয় এই যে সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর-পরই বঙ্গার মুসলিম সংখ্যালঘুদের বি জে পির দিকে আকৃষ্ট করার উপর জোর দিতে শুরু করেছেন। বস্তুত, তাঁর সংখ্যালঘু-দরদ এমন মাত্রাছাড়া আবেগের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে, যে সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে, এই আবেগ আন্তরিক, নাকি লোকদেখানো, ভোটকুড়নো কৌশল। এ কথা ঠিক যে, কংগ্রেস থেকে শুরু করে বামপন্থীরা পর্যন্ত সব রাজনৈতিক সংগঠনই দেশের সংখ্যালঘুদের নিতান্ত ভোট-ব্যাংক হিসাবেই দেখে এসেছে, তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক অংশীদারি নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায়নি। তথাকথিত এই সব ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সংখ্যালঘু-প্রেম বি জে পির মতো হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের কাছ থেকে সংখ্যালঘুদের দূরে সরিয়ে রাখতেই জাগিয়ে রাখা হয়েছে। সে দিক থেকে বিচার করলে সংখ্যালঘুদের তরফে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ার, তাদের সম্পর্কে মোহভঙ্গ হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু এই মোহভঙ্গ সংখ্যালঘুদের বি জে পির প্রতি আকৃষ্ট থাকবে, এমন শূন্যতা কি সংখ্যালঘুর রাজনৈতিক চেতনায় রচিত হয়েছে?

বিনায়ক দামোদর সাভারকর থেকে শুরু করে হেডগেওয়ার, গোলওয়ালকর পর্যন্ত হিন্দু জাতীয়তাবাদের এক জন নেতাও কি মুসলিমদের জন্য তাঁদের হিন্দুত্ব এক ইঞ্চি জায়গাও ছেড়েছেন? ছাড়েননি। বিপরীতে ভারতীয় সভ্যতার যাবতীয় অধঃপতন, দুর্দশা ও ক্ষয়িক্ততার জন্য মুসলিমদের দায়ী করেছেন। এই তো বিজেপি সরকার নিযুক্ত জাতীয় মহিলা কমিশনের সর্বশেষ

রিপোর্টে হিন্দু তথা ভারতীয় নারীর অনগ্রসরতা, অশিক্ষা, পুরুষনির্ভরতার জন্য অষ্টম শতকের মুসলিম আগ্রাসনকে দায়ী করা হয়েছে, মনুপরাশরের পিতৃতন্ত্রকে নয়। সুতরাং বি জে পি-র নতুন সভাপতি যে মুসলিম-দরদ দেখাচ্ছেন, তাকে শুক্ল সেবার মানে হয় না। তা ছাড়া বাছপেয়ীর ভারতে যেখানে অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় খ্রিস্টানরা নিত্য নিগৃহীত, ধর্ষিত, নিহত, জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে এবং ঘাতকদের কিংবদন্তীর নায়ক বানিয়ে তাদের রক্তিন মুখোশে বিক্রি করা হচ্ছে, সেখানে মুসলিম সংখ্যালঘু হঠাৎ বি জে পি-র সংগঠনে ও রাজনীতিতে সহসা স্বাগত হতে যাবেন কেন?

আসলে বি জে পি অন্য একটি সমস্যা পড়েছে। বর্ণ হিন্দুর পার্টি হিসাবে সাধারণে চিহ্নিত হওয়ার কুফল সে এখন হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে। পার্টি আর বাড়ছে না, অনগ্রসর ও দলিতদের নিয়ে অশুশ হিন্দুদের যে অবিভাজ্য রূপটি বর্ণ হিন্দু নেতৃত্ব মনে-মনে লালন করছিলেন, ‘সোশাল এঞ্জিনিয়ারিং’-এর প্রকল্পটি মাঝপথে মুখ ধুবড়ে পড়ায় সেই সুশৃঙ্খল ভেঙে গেছে। শংকর সিংহ বাপেলা ও কল্যাণ সিংহের মতো অনগ্রসর নেতারা নিজের অনুগামী ও গণভিত্তি নিয়ে দল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ায় দল আবার বর্ণ হিন্দুর জনসমর্থননির্ভর হয়ে পড়েছে। প্রাণপণে অনগ্রসর, দলিত ও সম্ভব হলে সংখ্যালঘুদের সমর্থন আদায় করতে মরিয়া বি জে পি এমন নানা সংকেত দিচ্ছে, যা তার সাবেক গণভিত্তি উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের সংশয়কঙ্কিত করে তুলছে।

রাজনীতির মণ্ডলাননকে প্রতিরোধ করার জন্যই বি জে পি এই সামাজিক পুনর্বিন্যাসের প্রযুক্তি প্রণয়ন করেছিল। বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহ মণ্ডল কমিশনের সুপারিশকে কার্যকর করে তৃণমূল দলের গণতন্ত্রকে যে ভাবে অর্গলমুক্ত করেছিলেন, তার সামনে ঝড়কুটোর মতোই ভেসে যেতে বসেছিল কমণ্ডলুর রাজনীতি। রামমন্দির আন্দোলনের প্রভাব যে সাময়িক এবং তুলনায় মণ্ডলের প্রভাব ও কার্যকারিতা যে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী, সে কথা না বোঝার মতো নেতা এল কে আডবাণী, গোবিন্দাচার্যরা নন। তাই মণ্ডলকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছিলেন। এ কাজে তাঁদের প্রধান সহায়ক ছিলেন বাপেলা ও কল্যাণ সিংহের মতো নেতারা। বর্ণ হিন্দুদের নৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নেতৃত্বে অনগ্রসর, দলিত ও সংখ্যালঘুদের সমাবেশিত করার সেই এঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু সফল হয়নি।

মণ্ডল রাজনীতি দেশের অনগ্রসর জাতগুলিকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে একে জাতীয় রাজনীতির অনভিপ্রেত বিভাজন ও খণ্ডীকরণ রূপে শনাক্ত করা হয়। বামপন্থীরা একে জাতপাদের রাজনীতি বলে নিন্দা করেন। কিন্তু এই রাজনীতিই প্রথম দেশের নিচু জাতগুলিকে

উচ্চ বর্ণের আধিপত্য ছুঁড়ে ফেলে অধিকারসচেতন হতে শক্তি জোগায়। এই প্রথম তারা নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে এগিয়ে আসে। ক্রমে তাদের নিজেদের জাতের রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি হয়। এবং তারই পরিণামে আলগা হতে থাকে কংগ্রেসের মতো দলগুলির সাবেক পা-রাখার জমি। হিন্দি বলয়ে কংগ্রেস যে আঙ্গ গুরুত্বহীন শক্তিতে পরিণত, তার মূলে রয়েছে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে এই সব অনগ্রসর ও দলিতদের নিজস্ব রাজনৈতিক মঞ্চ গঠন। বামপন্থীরাও জাত-পাতের এই সংগঠন ও তাদের রাজনীতিকে হেয় করে এসেছেন। মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষায় অভ্যস্ত তাঁরা শ্রেণীর প্রথাগত ও পুঁথিগত ধারণা থেকে বের হতে পারেননি। রামমনোহর লোহিয়ার মতো সমাজতন্ত্রীরা সেই কবেই caste বা 'জাত'কে class বা শ্রেণীর বিকল্প হিসাবে বিবেচনার ভারতীয় প্রকল্প হাজির করেছিলেন, রাজনীতি পাম দস্তুর পাঠশালায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বামপন্থীরা সেই ব্যাখ্যাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অথচ অনগ্রসর এই জাতগুলির শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনার প্রতিকারের কোনও বিকল্পও তাঁরা উদ্ভাবন করতে ব্যর্থ হন। লোহিয়াপন্থীদের সামাজিক ন্যায়বিচারের স্লোগান তাই যখন সমগ্র আর্যাবর্তকে আলোড়িত করে তোলে, মণ্ডল রাজনীতির মধ্যেই অনগ্রসররা খুঁজে পেতে থাকেন তাঁদের অধিকার ও মর্যাদার দলিল, তখন দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের অগ্রাসঙ্গিক মনে করা ছাড়া বামপন্থীদের আর কীই বা করার ছিল?

নিম্নবর্ণীয় জনতাকে সমাবেশিত করার ক্ষেত্রে বামপন্থীদের ব্যর্থতাই মণ্ডলায়নের জমি প্রস্তুত করে রেখেছিল। তা যখন হিন্দি বলয়ে রুদ্ধশ্বাস গতি পেল, তখন কমণ্ডলুও ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়। মণ্ডলায়নের সেই ধাক্কা আঙ্গও সংঘ পরিবার পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিশরে সমতা পার্টির কুর্মি গণভিত্তি, শরদ যাদবদের অনগ্রসর জনসমর্থন এবং রামবিলাস পানোয়ানের দলিত সমর্থকদের ঘাড়ের ভর দিয়ে বি জে পি কিছুটা জমি পাওয়ার চেষ্টা করলেও উত্তরপ্রদেশে এখনও সে উচ্চবর্ণীয়দেরই পার্টি, মধ্যপ্রদেশেও তাই। মশরাষ্ট্র, রাজস্থান, গুজরাতেও কি অনগ্রসররা গেরুয়া ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হয়েছে? হয়নি। তাহি বঙ্গুরু লক্ষ্মণ। তাহি দলিত, অনগ্রসর ও মুসলিম সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কথা সাতকান করে বলা। কিন্তু সত্যিই যদি বঙ্গুরু যা বলছেন, তা ঘটানো যেত, তাহলে বি জে পি কি আর বি জে পি থাকত? এ কথা ঠিক যে, শাসন পরিচালনার বাধ্যবাধকতা বি জে পির নেতৃত্বকে সংঘ পরিবারের হিন্দুত্বের সংজ্ঞা থেকে সরিয়ে এনেছে। চম্পাবু নাইডু, করুণানিধি, প্রকাশ সিংহ বাদল কিংবা ওমপ্রকাশ চৌটানাদের সঙ্গে ঘর করতে হলে হিন্দুত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি করার সুযোগ কম। কিন্তু পরবর্তী কোনও নির্বাচনে বি জে পি নিরঙ্কুশ সংসদীয় গরিষ্ঠতা পেলে তার

নিজস্ব কর্মসূচি রূপায়ণ করতে এগিয়ে আসবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? বাধ্য হয়ে বিতর্কিত সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি শিক্কে তুলে রাখা আর ভিতর থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তা পরিহার করা তো এক জিনিস নয়। ভিতরের তাগিদ আসতে পারে তখনই, যখন দল তার স্বভাব-চরিত্রই পাল্টে ফেলতে উদ্যত হয়, দলের ভিতর রূপান্তরের শক্তি প্রবল হয়ে সনাতনপন্থী সব প্রতিরোধ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বি জে পির বর্তমান কল্পনাশক্তিরহিত, অশীতিপর নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে তেমন কোনও সম্ভাবনার কথা ভাবা কঠিন।

তবে বঙ্গুরু যে কামান দেগেছেন, তাতে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিছু করে ওঠার আগেই কেবল মৌখিক আশ্বাস শুনেই বি জে পিকে অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল শক্তি হিসাবে বঙ্গুরু করার জন্যে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে কী আকুলতা। গণমাধ্যমের সম্পাদকীয় প্রতিফ্রিয়ায় এই আকুলতারই প্রতিফলন। রাতারাতি ফুলে যাওয়া হচ্ছে খ্রিস্টান যাজক, পাদ্রি, সন্ন্যাসিনীদের প্রতি সংঘ পরিবারের ঘৃণার গরল উদগারের সাম্প্রতিক উপাখ্যান, ফুলে যাওয়া হচ্ছে গ্রাহম স্টেইন্সে যাতক রূপে শনাক্ত দারা সিংহের অনুতাপশীল আত্মজ্ঞান—সনাতন ধর্ম রক্ষায় প্রায় বিধুর অবতারণা হয়ে তার সংখ্যালঘু-নিষনের নিরবচ্ছিন্ন অভিযানকে মহিমাম্বিত করার জন্যে সাম্প্রদায়িকতা। ফুলে যাওয়া হচ্ছে গত দেড় দশক ধরে রাম জন্মভূমি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশময় মুসলিম-বিরোধী জিগির সংগঠিত করার সুপরিচালিত প্রয়াস এবং তার পরিণামে সাড়ে চারশো বছরের পুরানো একটি সংখ্যালঘুর ধর্মস্থানকে রামচন্দ্রের জন্মস্থান রূপে শনাক্ত করে লাঞ্ছনা ধর্মোন্মাদকে জড়ো করে তা ধূলিসাৎ করে দেওয়া। এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্য দিয়েই হিন্দু মহাসভা-জন-সংঘ-বি জে পির জন্ম, তার মধ্য দিয়েই তার বিকাশ-বৃদ্ধি। আজ যে বি জে পি ভারত শাসন করছে, তার পিছনেও ওই রাম জন্মভূমি আন্দোলন উপলক্ষে সংঘ পরিবারের উল্লে দেওয়া হিন্দুত্ববাদী আবেগের জ্বিরা। সংসদের এক কোণে দুটি আসন নিয়ে যে দল এই সে দিনও টিম্টিম্ করছিল, আগ্রাসী হিন্দুত্বের রাজনৈতিক আত্মজ্ঞানই তাকে এত দূর নিয়ে এসেছে। যা তাকে এত দূর নিয়ে এসেছে, হঠাৎ তাকে বি জে পি ত্যাগ করতে যাবে কেন? এই প্রশ্নটা কিন্তু শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মনে জাগছে না। তাঁরা যেন বি জে পির হৃদয়-পরিবর্তনের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুতই হয়ে ছিলো।

তাঁদের কাঁধে ভর দিয়েই বি জে পি ভারতীয় রাজনীতির ধর্মনিরপেক্ষ spaceটি দখল করে নিতে অগ্রসর হচ্ছে। জনজাতি ও শ্রান্তবাসীদের জন্যে তিন-তিনটি পৃথক রাজ্য গঠনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে ইতি-পূর্বেই

বি জে পি এই বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে যে সে আদিবাসী-বিরোধী নয়, বর্ণ হিন্দু সমাজের লাঞ্ছনাজ্ঞ স্বর্ণের কাঁটাতারে বেড়ার বাইরে পড়ে থাকে অন্ত্যেবাসী জনগোষ্ঠীর স্বাধিকারের জন্য সে অন্য কোনও দলের চেয়ে কম ভাবিত নয়। এ ব্যাপারে অন্তত বামপন্থীদের চেয়ে তার বিশ্বাসযোগ্যতা যে অনেক বেশি তা তো ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। বামমার্ক্সীরা কী খেয়ালে কে জানে চিরকাল মুখে জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের (এমনকী বিচ্ছিন্ন হবার) অধিকার সরবে সমর্থন করে এলেও যখনই বঞ্চিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বশাসন দেবার প্রকল্প সম্ভাব্যতার এলাকায় প্রবেশ করেছে, তখনই ততোধিক মুখরতায় তার বিরোধিতা করেছে। আড়খণ্ডি, হুস্তিসগড়ি ও উত্তরাখণ্ডিদের জাতিসত্তার আন্দোলন এ দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের চেয়েও বেশি পুরনো, যদিও ওই আন্দোলনগুলির সব সম্ভাবনা শুরুতেই প্রকটিত হয়নি। মার্ক্সবাদীরা যখন এই সব আন্দোলনের স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক দিশাকে দমন করতে চেয়েছেন, তখন কোনও মতাদর্শগত নৈতিকতা নয়, তাঁদের শাসিত ও প্রভাবিত রাজ্যের প্রাদেশিক ক্ষমতাবিন্যাসের সমীকরণ তাঁদের প্রতিকূলে চলে যেতে পারে, এই আশঙ্কাই তাঁদের প্ররোচিত করেছে। ফলশ্রুতি হিসেবে বামপন্থী শিবিরেরই শরিক থাকার কথা ছিল, সেই জনজাতীয় গোষ্ঠীগুলি কালক্রমে বামপন্থীদের শত্রুপক্ষে পরিণত হয়েছেন। নেপায় দই মেয়ে যাওয়ার মতো মাঝখান থেকে নিরঙ্কুশ বর্ণ হিন্দু আধিপত্যের প্রবক্তা বি জে পি জনজাতীয় স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক অস্বাভাবিক রূপকার হয়ে উঠেছে।

কংগ্রেসের কাছ থেকে উদারনৈতিক আর্থিক সংস্কারের কর্মসূচিটি ছিনতাই করার পর এখন তার ধর্মনিরপেক্ষ মঞ্চটিও কী করে আত্মসাৎ করা যায়, বি জে পি সেই ভাবেই রয়েছে। নাগপুরের দলীয় মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধু লক্ষ্মণের ঘোষণায় তারই সংকেত। মুসলিমদের একাংশ, অন্তত সুবিধাভোগী, শিক্ষিত ও প্রভাবশালী অংশটি যে বি জে পি-র এই সংখ্যালঘুপ্রীতির নিদর্শনটি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন, তাতে সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতে কংগ্রেস কখনও আবার ক্ষমতার পাটি হয়ে উঠবে এমন আশা যাঁদের নেই, তাঁরা যদি অনুগ্রহবিতরণের পাটি হিসাবে বি জে পি-কেই গ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গে নিজেদের শর্তে দরকষাকষি চালান, তাতে ঘোর অন্যায়ও কিছু নেই। হাজার হোক, জুম্মা মসজিদের শাহি ইমাম কিংবা তাঁর মতো মুসলিম সমাজের স্বঘোষিত অভিভাবকরা যখন ইন্দিরা গান্ধী বা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের দলকে প্রকাশ্যে সমর্থন করার জন্য সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিতেন, তখন বিনিময়ে নেপথ্য ভাগ বাঁটোয়ারা কিছু থাকত বৈকি। এখন যদি সম্প্রদায়ের এই সব নেতাই বাজপেয়ীর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে গরিব মুসলমান বি জে পি-র দ্বারা প্রভাবিত

হওয়ার আশা করা সর্বদাই মাথায় রাখবে বলে মনে হয়। সে যে বোঝাইতে, সুরাতে, মিরাটে, ভাগলপুরে বি জে পি-র, বজ্রও দলের, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের, আর এস এসের চেহারা দেখেছে, মুখোশের আড়ালের মুখ দেখেছে, তার শিকার হয়েছে। তার যে ঘর পুড়েছে, ছেলে মত্তেছে, বউ ধর্ষিত হয়েছে, লোকান ছলেছে, ভিটে গেছে, আবাদ গেছে, 'হর হর মহাদেব' শুনলে তার বুক কাঁপে। বঙ্গারর আশ্বাস কি তাকে আশ্বস্ত করতে পারে?

তাকে কেউ বোঝায়নি, তবু তার এমন সন্দেহ হতেই পারে যে, খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের নির্বাসনের উপর্যুপরি ঘটনায় বিরত এবং সে অন্য পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে তিরস্কৃত বি জে পি মুসলিম সংখ্যালঘুদের কিছুটা তোষণ করে নিজের বদনাম ঘোচাতে প্রয়াসী হয়েছে। এ কথা তো ঠিক যে, সংঘ পরিবারের বিভিন্ন শাখা সংগঠন গত দু-তিন বছর ধরে খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে, এমনকী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধেও যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিবোধাগার করে চলেছে, বি জে পির নেতৃত্ব তা বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। স্বরণ থাকতে পারে, শুভরাতের ডাংস জেলায় খ্রিস্টান গ্রামবাসীদের ঘর পোড়ানো, বাইবেল জ্বালানো, গির্জা ভাঙার অপকাণ্ডগুলির বিরূপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ায় জেরবার হয়ে প্রধানমন্ত্রী বাজুপেয়ী যখন উপদ্রুত ডাংস সফরে যান, তখন তাঁকে কেউ কড়া হাতে হিন্দুধর্মাবলম্বী দুহুতীদের দমন করার কথা বলতে শোনেনি, বরং তিনি ধর্মভ্রষ্টকরণ নিয়ে জাতীয় বিতর্কের আহ্বান করে গোটা ইস্যুটিকে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। জাতীয় বিতর্কে কেউ যোগ দেবার আগ্রহ দেখায়নি, তবে বাজুপেয়ীর এই আহ্বানের পর রাজ্যে-রাজ্যে ধর্মভ্রষ্টকরণের ছিড়িক পড়ে যায়—না, হিন্দু থেকে খ্রিস্টান করার অভিযান নয়, শুরু হয় খ্রিস্টান আদিবাসীদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করার অভিযান, যা এখনও চলছে। মুসলিমদের হিন্দুতে পুনর্ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস ওঠে না। কিন্তু গরিব আদিবাসী খ্রিস্টানদের টাকা-পয়সা দিয়ে কিংবা ভয় দেখিয়ে হিন্দুতে ফেরানোর আয়োজন বানচাল করা কঠিন, বিশেষত তা যখন কেন্দ্রীয় শাসক দলের প্রচেষ্টা সমর্থন ও অপ্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতাতেই ঘটছে। খ্রিস্টান নিগ্রহ অব্যাহত রেখে, খ্রিস্টান-বিদ্বেষের পরিকল্পিত ও সংগঠিত প্রচার চালু রেখে কোনও মল যদি হঠাৎ মুসলিমদের প্রতি বঙ্গারর প্রতিকারের কথা, তাদের জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার কথা বলে, তবে তার কথা কি বিশ্বাসযোগ্য হয়? হতে পারে? বস্তুত, খ্রিস্টানদের সঙ্গে বরং হিন্দুদের তত বিরোধ ঐতিহাসিকভাবেই কখনও এ দেশে আত্মপ্রকাশ করেনি। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগের শুরু থেকেই হিন্দু মুসলিম বিভাজন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও আধিপত্য বজায় রাখার একটা অপরিহার্য প্রকরণ হিসাবেই সক্রিয় থেকেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের যাবতীয়

উত্তরাধিকার হিন্দু উচ্চবর্ণীয়রা আত্মসাৎ করে নেবার ফলে মুসলিম সম্প্রদায় স্বাধীন ভারতে আরও বেশি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই বিচ্ছিন্নতা ক্রমে হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলির জলসিঞ্চনে সাম্প্রদায়িক বিভেদপন্থার বিষয়ক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়ে উঠেছে স্বাধীন ভারতে আগ্রাসী হিন্দুত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠার অনিবার্য ও নিয়মিত প্রকরণ। তুলনায় হিন্দু-খ্রিস্টান দাঙ্গার কথা কখনও সে ভাবে শোনা যায়নি। খ্রিস্টানদের প্রাথমিক অংশটি শিক্ষায় নিজেদের উৎকর্ষের কারণে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অনুপাতিক ভাগের চেয়েও বেশিই ভোগ করে এসেছে। আর আদিবাসী বা দলিত খ্রিস্টানরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধ সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে শাস্তিপ্রিয়, আপসকারী একটি জনগোষ্ঠী হিসাবেই সহাবস্থান করে চলেছে। এ ধরনের একটি জনগোষ্ঠীকে হঠাৎ আক্রমণ করে তটস্থ করে তোলার প্রয়োজন হল কেন, তার উত্তরটা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট—হিন্দুত্ববাদী এই কালাপাহাড়ি তাম্র প্রত্যক্ষ করার পর সংখ্যালঘুদের পক্ষে ঠাণ্ডা মাথায় বঙ্গীয় সংসদগণের আশ্বাসে ভরসা রাখা অসম্ভব।

সুতরাং বি জে পি তার বিবর্তনের সঙ্কীর্ণে এসে দাঁড়িয়েছে, এ ধরনের সরলীকরণ বাস্তবিক্য। বি জে পি, বি জে পিতেই আছে। না থেকে তার উপায় নেই। সাভারকর-হেডগেওয়ার-গোলওয়ালকররা যার দিশা নির্ণয় করে গিয়েছেন, তার পক্ষে ভোল পাশ্টানো কঠিন। বাথ তার গায়ের ডোরা মুছে ফেলাতে পারে, কিন্তু বি জে পির পক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়কে মুসলিম হিসাবে গ্রহণ করা কঠিন। কেননা, সাভারকরের মতে, ভারত তার জন্মভূমি হলেও তার পুণ্যভূমি মক্কা-মদিনা, তাই তার মন পড়ে থাকে স্বদেশের বাইরে, আরব মলুকে। সে কখনওই পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় হতে পারে না, দেশপ্রেমিক হতে পারে না, বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। সে হয় পাকিস্তানের গুপ্তচর, নয় সৌদি আরব থেকে টাকা পায়, নয়তো আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মানবাদী বিন লাদেনের সঙ্গে তার যোগসাজশ রয়েছে। সংঘ পরিবার ও তার শাখাগুলি বৃহত্তর জনসমাজে মুসলিমদের সম্পর্কে এই রকম একটা ধারণাই চাউর করে রেখেছে। বি জে পি সভাপতির কথায় সেই ধারণা দলীয় সমর্থকরা কিংবা সংঘের প্রচারকরা বদলে ফেলবেন? এত কাল ধরে তবে সংঘের প্রচারকরা কী কাজ করলেন?

সংঘ প্রচারকরা প্রচার করে রেখেছেন, মুসলিম পুরুষ মাদ্রাই চারটে করে বিয়ে করে এবং প্রতিটি বিবির থেকে গুণ-গুণা ছেলেমেয়ে জন্মায়। এ ভাবেই মুসলিমরা নাকি জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুদের পরিকল্পিতভাবে পিছনে ফেলে দিচ্ছে। আর সেটা বন্ধ করতেই মুসলিমদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত আইন রদ করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তন করা দরকার। অধিকাংশ বি

জে পি সমর্থক ও সকল আর এস এস কর্মী এই উদ্ভট অসত্যগুলি বিশ্বাস করে এসেছে। চারটে কেন, অধিকাংশ মুসলিম পুরুষ যে একটি বিবি জোটাতেই হিমসিম খায় (এতই তাদের দারিদ্র), মুসলিম স্ত্রীদের প্রজননের হার যে হিন্দু স্ত্রীদের তুলনায় বেশি নয়, বরং শিশুমৃত্যুর হার বেশি হওয়ায় মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হিন্দুদের চেয়ে কম (প্রতিটি জনগণনা রিপোর্টেই যা উত্তরোত্তর প্রমাণিত), এ সব বাস্তব তথ্য বি জে পি সমর্থক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদেরও বোঝানো কঠিন। এই অবস্থায় কেমন করে মুসলিমদের সম্পর্কে বি জে পি তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে? সেই পরিবর্তন তো দলের কর্মীদের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য হবে না। নেতৃত্ব কি তবে সত্যের খাতিরে কর্মী-সমর্থক-অনুগামীদের কাছে আপন কর্তৃত্বের বৈধতা হারাতেও প্রস্তুত? বাজপেয়ী হিন্দুত্বের শিবিরে এত বড় বিপ্লব সংঘটিত করে ফেলেছেন?

মনে হয় সে সব কিছু নয়, বি জে পি নেহাতই ধোকা দিচ্ছে। মুসলিমদের সাময়িকভাবে 'নিরস্ত্র' করে তাদের সতর্কতা শিথিল করে দিতে চাইছে। আগের চেয়ে তাই বি জে পির অভিসন্ধি সম্পর্কে সংখ্যালঘুদের আরও বেশি সতর্ক, সজাগ, অত্যাধিকার উচিত। রাত না পোহাতেই বঙ্গবন্ধু যে ভাবে হিন্দুত্বকে বি জে পির আত্মা বলে প্রায়শ্চিত্ত করতে শুরু করে দিয়েছেন, সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডাকে কেবল সাময়িক বাধ্যবাধকতায় স্থগিত রাখার কথা বলে অদূর ভবিষ্যতে কোনও মতেই তা পরিহার না করার ব্যাপারে দলীয় গণভিত্তিকে আশ্বস্ত করেছেন, তাতে সংখ্যালঘুদের সজাগ থাকার ব্যাপারটা আরও জরুরি হয়ে পড়ে। নমনীয়, উদারনীতিক, সহিষ্ণু, আধুনিক ও ভবিষ্যমুখী অটলবিহারী বাজপেয়ী অতএব এখনও সংঘ পরিবারের মুখোশই রয়ে গেছেন, মুখ হয়ে উঠতে পারেননি। বাজপেয়ীকে কটরপন্থী গোঁড়া সংঘ পরিবারের উদারনীতিক মুখোশ আত্মা দেওয়ার জন্য গোবিন্দাচার্যকে প্রধানমন্ত্রীর অনুগামীরা ভর্ৎসনা করলেও তাঁর মূল্যায়ন এখনও মোটামুটিভাবে অস্বাস্থ্য। বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রবল সমর্থকরা বাজপেয়ী ও বি জে পি-র যতই গুণমুগ্ধ হোন, বহুত্ববাদী ভারতের সর্বসাধারণের কাছে বাজপেয়ীর দলকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার মরিয়া প্রয়াস সহসা সফল হবার নয়। দলিত-হেগড়েওয়ার-গোলওয়ালকরের পার্টি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অনুশীলনকারী হয়ে উঠেছে। গান্ধী-হত্যা, বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং গত অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী দেশময় অসংখ্য সংখ্যালঘু-বিরোধী দাঙ্গার গল্প হিন্দুত্বের রাক্ষসকে সর্বদাই জীতিপ্রদ এবং বিশ্বাসঘাতক করে রাখবে। প্রতীকের রাজনীতির দেশে এগুলির চেয়ে শক্তিশালী প্রতীক তো আর আধুনিক ভারতে নেই।

শনিবারের চিঠি, সজনীকান্ত ও গোপাল হালদার

অমিয় ধর

“সজনীর বেলা...বরং বলতে পারি, পৃথিবীর সাধ্য ছিল না তাকে ঝেড়ে ফেলে। তার বেলা দোষও শক্তিতে-সাহসে গুণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে আরেক তত্ত্ব। তাতে আমাতে পরিচয় কলেজে বছর দুই পরে। সে পরিচয় সহজেই জমে ওঠে সাহিত্য-প্রীতির সূত্রে; আর কর্মসূত্রে মর্ম-সূত্রে তা বেড়ে যায় ক্রমাগত। হিঁড়তে পারত; কিন্তু হিঁড়েনি শেষ দিন পর্যন্ত।”—গোপাল হালদার

সজনীকান্ত দাস বাংলা সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রায় সবটুকু জুড়ে আছে ‘শনিবারের চিঠি’। এই ‘শনিবারের চিঠি’র প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ সালের ১০ই শ্রাবণ তখন সেটি বেনাম রঙ্গব্যঙ্গ রচনার একখানি স্কীণকায় সাপ্তাহিক মাত্র। ষোগানন্দ দাস পত্রিকাটির সম্পাদক ও মুদ্রাকর, আর হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় তার কর্মধ্যক্ষ; তবে আসল পরিচালক হলেন ‘প্রবাসী’ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়। এই ত্রয়ীর সঙ্গে তখন আরও দু-জন ছিলেন—সুধীরকুমার চৌধুরী ও প্রভাকর দাস।

‘শনিবারের চিঠি’র আবির্ভাব কালে উদ্যোক্তারা ঘোষণা করেছিলেন, ‘আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই’, তবে ‘উদ্দেশ্যহীনতা’ও যে তাঁদের ‘উদ্দেশ্য নয়’ তা বেনামা ব্যঙ্গ রচনায় ‘আপনা আপনি ফুটে উঠতেও দেরি হয় না। প্রথম থেকেই “শনিবারের চিঠি”র প্রধান উপজীব্য ছিল পলিটিঙ্গ’, স্বরাষ্ট্র পাটি ও চিন্তনরঞ্জন দাশ তাঁদের ব্যঙ্গের আসল টার্গেট। আর পলিটিঙ্গের বিকল্পে সাহিত্যের টার্গেট হয়ে উঠলেন কাঙ্গী নজরুল ইসলাম ও ‘কম্বোজে’র ‘ফুটকি-কণ্টকিত গল্প-কথিকার’ অতি আধুনিক লেখকবৃন্দ। প্রথম সংখ্যা থেকেই সজনীকান্ত ‘শনিবারের চিঠি’র উৎসাহী পাঠক, আর অষ্টম সংখ্যা (২৮ ভাদ্র, ১৩৩১) থেকে তিনি তার ‘রীতিমত লেখক’। ভাবকুমার প্রধান ছন্দনামে প্রকাশিত হল তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা ‘আহুান’। আর ‘চিঠির’ একাদশ বাঁ শারদীয়া সংখ্যায় (১৮ আশ্বিন, ১৩৩১) প্রকাশিত হল ‘কামকটিকীয়া ছন্দ’। এই কবিতাটির শেষাংশ ‘অসমছন্দ’-ই কাঙ্গী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার প্যারডি। “আমি ব্যাঙ / লম্বা আমার ঠ্যাং / ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ডাকিত যে গ্যাঙের গ্যাং” ইত্যাদি সেদিন বাংলা-সাহিত্য-সংসারে যথেষ্ট সোরগোল তুলেছিল। এই কবিতা যেমন সজনীকান্তকে প্রতিষ্ঠার পথে অনেকখানি অগ্রসর করে দেয় তেমনি ‘শনিবারের চিঠি’-রও নবজন্ম ঘটায়।

শারদীয়, ২০০০ শনিবারের চিঠি, সজ্ঞনীকান্ত ও গোপাল হালদার ২৮৩

আর এই 'প্যারডি'কে কেন্দ্র করেই মোহিতলাল-নজরুলের বিবাদ-সংবাদও তুঙ্গে ওঠে। মোহিতলাল এককালে নজরুলের সাহিত্যগুরু ছিলেন, কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পরে দুজনের মনান্তর হয়। 'শনিবারের চিঠি'তে 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারডি দেখে নজরুল ভাবলেন—এ মোহিতলালের কীর্তি। তিনি 'কম্রোলে' তাঁকে কবিতায় আক্রমণ করলেন, আর নজরুলের প্রতি ক্রুদ্ধ মোহিতলালের অভিশাপ বর্ষিত হল 'শনিবারের চিঠি'র বিদ্রোহ সংখ্যার ক্রোড়পদ্রে 'দ্রোণগুরু' কবিতায়। এভাবেই 'কম্রোলে'র সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র সংঘর্ষ বাধল; মোহিতলালও শনিমঙ্গলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। তখন থেকেই 'শনিবারের চিঠি'র পলিটিক্সের কেন্দ্র সাহিত্য অধিকার করল। ১৯শ সংখ্যা থেকে (২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৩১) সজ্ঞনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'র সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। মোহিতলালের উৎসাহে সজ্ঞনীকান্তের ব্যঙ্গ রচনার হাত তখন বেশ খুলে গিয়েছে। কিন্তু সাতাশটি সংখ্যা প্রকাশের পরই 'শনিবারের চিঠি'র সাপ্তাহিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায় সজ্ঞনীকান্ত বেশ হতাশ হয়ে পড়লেন। প্রায় দেড় বছর বন্ধ থাকার পর 'হামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে এবং সজ্ঞনীকান্তের উদ্যোগে 'শনিবারের চিঠি'র বিশেষ 'জুবিলি-সংখ্যা' (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৩৩৩) প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২ এপ্রিল শুভ ফ্রাইডের দিন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পৈশাচিক তাণ্ডবের প্রতিক্রিয়ায় 'শনিবারের চিঠি'র এই পুনর্জাগরণ ঘটে। সজ্ঞনীকান্ত লিখেছেন, "দাঙ্গা সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য মন উন্মুখ হইয়া ছিল। কয়েকটি প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা লিখিয়াও ফেলিলাম। সেগুলি প্রকাশ করিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। 'প্রবাসী'তে কাজ করি, কিন্তু প্রবাসী সে সব ছাপিবে না। একমাত্র অবলম্বন আমাদের নিজস্ব 'শনিবারের চিঠি' তখন মৃত। তাহাকে পুনর্জীবন দান করা ছাড়া গত্যন্তর দেখিলাম না"—(আত্মস্মৃতি, পৃ. ১০৯)। দাঙ্গা-পীড়িত কলকাতার মধ্যবিস্তৃত সমাজ 'জুবিলি-সংখ্যাটি' সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাল, ফলে 'শনিবারের চিঠি' এই প্রথম কিছুটা আর্থিক লাভ হল। উল্লিখিত সজ্ঞনীকান্ত আবার মাসেই 'বিরহ-সংখ্যা' বের করে ফেললেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন; "অতি আধুনিক সাহিত্যের ন্যাকামি ও সম্পর্ক-বিরুদ্ধ যৌন আবেদনের বিরুদ্ধে আমাদের সেই প্রথম সর্বোদয় অভিযান, শুধু আমাদের নয়—প্রকাশ্যে সেই সর্বপ্রথম অভিযান"—(আত্মস্মৃতি, পৃ. ১১২)। এই অভিযান শুধু 'কম্রোলে'ই থেমে থাকেনি 'কালিকলম', 'প্রগতি'র বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়েছিল। ১৩৩৩ সনের কার্তিক মাসে ভোটসর্বস্ব দলীয় রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করে 'শনিবারের চিঠি'র 'ভোটসংখ্যা' প্রকাশিত হয়। সংখ্যাটির চার হাজার কপি বিক্রী হওয়ার পত্রিকা তহবিলে আরও কিছু আমদানি হল। সজ্ঞনীকান্ত এবার নিয়মিত মাসে মাসে পত্রিকা

প্রকাশের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের (দিবাকর শর্মা) মধ্যস্থতায় আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে শনিবারের চিঠির একটা যোগাযোগ গড়ে ওঠে এবং ঠিক হয় শনিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকার পুরো একটা পাতা শনিবারের চিঠির জন্য নির্দিষ্ট থাকবে; তাতে শনিমণ্ডলীর সদস্যরা নিজেদের খুশিমত লিখতে পারবেন। সঙ্জনীকান্ত লিখছেন, “এইভাবে ক্ষেত্রান্তরে উণ্ড হইয়া ‘শনিবারের চিঠি’র আর একটু প্রসাদ বাড়িল, আমার লাভ হইল বেশ কয়েকজন নূতন বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত এইখানেই পরিচিত হইয়াছিলাম। ইহাদের প্রত্যেকেরই স্নেহ আমি বরাবর সমানে পাইয়া আসিয়াছি।”—(আত্মস্মৃতি, পৃ. ১১৮-১৯)। শনিবারের চিঠি বা সঙ্জনীকান্তের প্রতি গোঁড়া কংগ্রেসী আনন্দবাজার গোষ্ঠীর এই স্নেহ-সমর্পনের কারণ তাঁরা চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক কাজকর্ম ও স্বরাজ্য পার্টি গঠনের বিরুদ্ধে তখন জেহাদ চালাছিলেন; তাই ‘প্রবাসী গোষ্ঠি’র যুবকদের পরিচালিত ‘শনিবারের চিঠি’র সঙ্গে হাত মিলিয়ে চিত্তরঞ্জন ও তাঁর রাজনীতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার বাড়তি সুযোগটুকু কাজে লাগাতে দ্বিধা করেননি। বরাবরই ‘শনিবারের চিঠি’ স্বরাজীদের হয়ে করতে চেয়েছে। কেবল ১৯২৫-এর অর্ডিন্যান্স-এ স্বরাজীদের অনেকে কারারুদ্ধ হওয়ায়, আর একটু পরেই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু ঘটায় সেই বিদ্রূপ-বাসনা সাময়িক বন্ধ থাকে। সেই সময়টাতেই ‘শনিবারের চিঠি’তে পলিটিজের স্থান সাহিত্য অধিকার করে। পরে অবশ্য রাজনীতির টার্গেট হন চিত্তরঞ্জন-শিষ্য সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁকে ‘ষোকা ভগবান’ বা ‘গক’ (G.O.C) ইত্যাদি বলে যথেষ্ট ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়।

১৯২৬-এর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার বিষাক্ত আবহাওয়ার সাহিত্য ছাড়া আরেকটা যুদ্ধের আসরও ‘শনিবারের চিঠি’ আয়ত্ত করে। “বিশেষত মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার কড়া বিরোধী রূপে সঙ্জনীর তখন একটা খ্যাতিও লাভ হয়েছে...আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে সেই থেকে ‘শনিবারের চিঠি’র বরাবর সাম্প্রদায়িকতার সৌহার্দ্য।”—(গোপাল হালদার, রূপনারাণের কূলে—২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩)। এই সৌহার্দ্য পরবর্তীকালে আরও গভীর হয় যখন সঙ্জনীকান্তের ‘শনিবারের চিঠি’ সাম্যবাদের বিরোধিতা করে কমিউনিস্টদের ‘কামনিষ্ঠ’ বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মেতে ওঠে। সে যাই হোক, শনিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকার ফ্রেডপত্র রূপে ‘শনিবারের চিঠি’ মাসাধিককাল প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্জনীকান্ত এবার মাসিক ‘শনিবারের চিঠি’ প্রকাশের ভোড়জোড় শুরু করে দিলেন। এবং তাঁর সে উদ্যোগ কয়েক মাসের মধ্যেই ফলপ্রসূ হল। ১৩৩৪ সালের ৯ ভাদ্র ‘শনিবারের চিঠি’র মাসিক

শারদীয়, ২০০০ শনিবারের চিঠি, সজ্জনীকান্ত ও গোপাল হালদার ২৮৫

রূপে নবজন্ম ঘটে। আগের মতই সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক যোগানন্দ দাস এবং সজ্জনীকান্ত তাঁর সহকারী।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, শনিবারের চিঠির সেই পুনর্জাগরণের একটা বড় উপলক্ষ্য—১৯২৬ সনের কলকাতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। আর দাঙ্গার সেই বিধের পরোক্ষ জ্বালায় সজ্জনীকান্তের বন্ধু গোপাল হালদার-ও রাজনৈতিকভাবে হতাশ ও সাম্প্রদায়িকভাবে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নোয়াখালি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন, আশা, কলকাতার বৃহৎ জীবনে—শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির আড্ডায়, আসরে মুক্ত বায়ু গ্রহণ করে মনের স্বস্তি ফিরে পাবেন। গোপাল হালদার লিখছেন, “কলকাতায় যখন এলাম তখন হুগোলা না হোক সোরগোল বাঁধছে। ‘শনিবারের চিঠি’র সোরগোল। সজ্জনী ‘শনিবারের চিঠি’র নামত বোধহয় সহকারী, কার্যত প্রধান কর্মাধ্যক্ষ। অমন দুহাতে ঘুঘি চালাবার সাধ্য আর কারও নেই, অতুলনীয় ক্ষিপ্ততা—সংস্কৃত পদ্যে আর স্বচ্ছন্দ গদ্যে। কাজেই সম্পাদক যোগানন্দ দাস আর মালিক উদ্যোক্তা অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে সে একাধারে ভীমার্জুন। মোহিতবাবুর সঙ্গে তৎপূর্বে নিজের আগ্রহে সজ্জনী পরিচয় করে নিয়েছিল। ...সে পরিচয় করে দিতে জানে, আপনার করে নিতে ও আপনার হয়ে পড়তে পারে। তখনই ‘প্রবাসী’র ও বিশ্বভারতীর অনেকেরই সে স্নেহাদৃত। ...অনেক অধ্যাপক, মানী-শুণী সাহিত্যিক-লেখকের সঙ্গে তার পরিচয়। আমি এলাম কলকাতায়—ও সব সমাজের অজ্ঞাতকুলশীল। দু একটা গল্প-প্রবন্ধ ‘ভারতবর্ষে’, ‘প্রবাসী’তে আগে বেরিয়েছে... এক আধাটি লেখা ‘সবুজপত্র’ও বেরিয়েছে...সজ্জনীরও আগে বোধহয় আমার লেখা ছাপার অক্ষরে বেরোয়—কলেজ জীবনে আমাদের সাহিত্য চর্চার আমরা সহযোগী। এক সময়ে আমি চূপ করে গেছলাম...নোয়াখালিতে বসে সজ্জনীর তাগিদেই তবু বাংলা লেখা ছাড়িনি, ইংরেজী লেখাও লিখেছি। আমার সামিথ্য এ সময়ে (১৯২৫-২৬) সজ্জনীর না হলেও চলত—সে সাহিত্যের পক্ষে উঠবার মুখে। তার সামিথ্য বরং আমার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দেখলাম, তাও প্রয়োজন।”—(রূপনারায়ণের কূলে, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩)। ১৩৩৪ সনে, বন্ধু সজ্জনীকান্তের সহযোগিতায় গোপাল হালদার প্রবাসী প্রতিষ্ঠানের ইংরেজী সাপ্তাহিক ‘ওয়লফেনবার্গ’র সহ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ বছরেই শনিবারের চিঠির ফাঙ্কন সংখ্যায় শ্রীমহাকাব্য হর্ষনামে গোপাল হালদারের ‘শেষ মহাসঙ্গীতি’ প্রকাশিত হয়—তিনি শনিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হলেন। ‘দীর্ঘকাল প্রায় কুড়ি বৎসর ‘শনিবারের চিঠি’র সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল।”—(আত্মস্মৃতি, পৃ. ১৩৬)।

এর কিছুদিন আগে থেকেই মোহিতলালের আগ্রহে তাঁর ‘অতি প্রিয়

ছাত্র নীরদচন্দ্র চৌধুরী' শনিবারের চিঠির আড্ডায় আসতে শুরু করেছেন।

শনিবারের চিঠির ১৩৩৪ সনের কার্তিক সংখ্যায় তিন বলাহক নন্দী ছদ্মনামে কিছু 'প্রসঙ্গকথা' লিখে পাঠকদের মুগ্ধ করে দিয়েছেন। গোপাল হালদার লিখেছেন, 'কলম তো নয়, এ যেন বিদ্যার, বুদ্ধির, রুচির, বাগ্-বৈদম্বের শাপিত তরবারি।' পরবর্তী মাঘ সংখ্যা থেকে নীরদচন্দ্র শনিবারের চিঠির সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন আর সজ্জনীকান্ত হলেন তার কর্মস্বাক্ষর। নীরদচন্দ্র অবশ্য সে দায়িত্ব খুব বেশিদিন পালন করতে পারেননি, তবে তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় সেই স্বল্পকালেই—(মাঘ ১৩৩৪—ভাদ্র ১৩৩৫) 'শনিবারের চিঠি' বাংলা পত্রিকা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

অশোক, হেমসুত, যোগানন্দ, সজ্জনীকান্ত, মোহিতলাল, রবি মৈত্র, সুনীতিকুমার, সুশীল দে প্রমুখ সাপ্তাহিক পর্বের রবী-মহারথীদের সঙ্গে নীরদচন্দ্র, পরশুরাম, গিরীন্দ্রশেখর বসু, যতীন্দ্র সেন, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, বনফুল প্রমুখ শক্তিমানেরা যখন একে একে যোগ দিলেন সে মুহূর্তেই শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গরসের শিক্তিত দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লেখা একখানা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সে কথা উল্লেখও করেছেন—“শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ করার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেছে...শনিবারের চিঠির অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ স্তীক, সাহিত্যের অঙ্কশালায় তার স্থান—নব নব হাস্যরসের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়।” (শনিবারের চিঠি, মাঘ, ১৩৩৪)।

নীরদচন্দ্র শনিবারের চিঠির সম্পাদক পদ ত্যাগ করলে ১৩৩৫ সনের আশ্বিন সংখ্যা থেকে পত্রিকার সম্পাদনা, প্রকাশনা ও মুদ্রণের সব দায়িত্বই সজ্জনীকান্তের উপর অর্পিত হয়। এ সময় পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে সজ্জনীকান্ত বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। নীরদচন্দ্র শনিবারের চিঠি-তে আর লিখতে চান না কারণ বাংলা লেখায় তিনি অনীহ, ইংরেজী লেখাতেই তাঁর আগ্রহ। তাছাড়া স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বভাষার প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব থাকায় তিনি কখনই শনিবারের চিঠির সঙ্গে একাত্ম হতেও পারেননি। যোগানন্দ দাস, হেমসুত চট্টোপাধ্যায় অন্য কাজে ব্যস্ত, চিঠির জন্য সময় দিতে পারেন না। শনিবারের চিঠির 'সাহিত্যাদর্শের সারথি' মোহিতলাল ও (সত্যসুন্দর দাশ) অর্থাপনা করতে চলে গিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' লিখে পাঠান ঠিকই কিন্তু তাঁর সঙ্গে নিত্যপরামর্শের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে সজ্জনীকান্ত কিছুটা বিমর্ষ। শনিবারের চিঠির প্রাণপুরুষ অশোক চট্টোপাধ্যায় তখন বিলেত যাত্রার

শারদীয়, ২০০০ শনিবারের চিঠি, সজ্জনীকান্ত ও গোপাল হালদার ২৮৭

তোড়জোড় করছেন, ডরসা শুধু ‘বন্ধুবর গোপাল হালদার’—তিনিও ‘ওয়েলফেয়ার’ নিয়ে ব্যস্ত। এ সময় ‘শনিবারের চিঠি’র নীতি ও আদর্শের ক্ষেত্রে সজ্জনীকান্ত মোহিতলালকেই সারথি মেনে চলছিলেন। “ফলে সকল প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক নকল-ভেজালের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ‘শনিবারের চিঠি’ ক্রমে মোহিতলাল নির্দিষ্ট সাহিত্য-সমালোচনার সংকীর্ণ পথেই” প্রধানত চলতে থাকে।—(সাহিত্য সাধক চরিতমালা ১১শ খণ্ড, পৃ. ১২)। মোহিতলালের প্রভাব তখন এতই প্রবল যে, রবীন্দ্রভক্ত সজ্জনীকান্ত সাময়িকভাবে রবীন্দ্র-বিদূষণেও মেতেছিলেন। বেশ কয়েকবছর পরে অবশ্য সজ্জনীকান্ত মোহিতলালের এই সম্মোহন অতিক্রম করে সূর্যবয়েই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

এদিকে ভণ্ড ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে লেখা বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস ‘নকুড়ঠাকুরের আশ্রম’-এ শ্রীলতাভঙ্গের অপরাধে সজ্জনীকান্তকে আসামীর কাঠগড়ায় পাঁড়াতে হয়। এ সময় আরও একটি মামলায় তাঁর জরিমানা হয়। ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশন থেকে সজ্জনীকান্ত বাসে করে ফিরছিলেন, সঙ্গে ‘বন্ধুবর গোপাল হালদার’। বাস কণ্ঠান্তরের সঙ্গে বচসার কারণে সজ্জনীকান্ত হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তাকে দু-এক ঘা দেন। ফলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে, গোপাল হালদার জামিন হন এবং পরদিন আদালতে দশ টাকা জরিমানা দিয়ে তিনি অব্যাহতি পান। এই ঘটনার ক্ষেত্রে ‘বাতায়ণ’ সাপ্তাহিকে একটি কবিতায় ব্যঙ্গ করে লেখা হয়—‘বাস কণ্ঠান্তরে মারিয়া যে দেয় ফাইন / তাহার কালচার এবং শিক্ষা সুপার ফাইন।’ সজ্জনীকান্ত নানা কারণেই তখন বিপন্ন তাই আচরণে অসহিষ্ণু এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপেও আক্রমণাত্মক। ১৩৩৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে অশোক চট্টোপাধ্যায় বিলেত যাত্রা করেন। সজ্জনীকান্ত স্বয়ং এবার ‘শনিবারের চিঠি’র সম্পাদক, কর্তা ও সহায়িকারী হয়ে বসলেন। ‘নকুড়ঠাকুরের আশ্রম’ সংক্রান্ত মামলা তো চলছিলই, তার উপর জে. টি. সাগরল্যাণ্ড-এর ‘ইতিয়া ইন বণ্ডেজ’ পুস্তকের প্রকাশক হিসাবে আরও একটি মামলায় তিনি জড়িয়ে পড়লেন। তবুও সজ্জনীকান্ত অদম্য, বিদ্রূপের নেশায় বেপরোয়া। সজ্জনীকান্ত লিখেছেন, “আমাদের যেন তখন খুন চাপিয়া গিয়াছে।—প্রমথ চৌধুরীর পরা একে একে আরও মহাশয়ী নিপাতের উদ্দেশ্যে অবিশ্রান্ত শরাঘাত করিয়া চলিয়াছি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—আমি একাই পরপর এই তিনজনকে লক্ষ্য করিয়া মারাত্মক মারাত্মক অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম; ‘অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় তম-এ হনি, ঢাক’ দীনেশ-নামা’ ও ‘নরেশ-নিকষ’ আমার-ই রচনা। দা’ঠাকুর শরৎ পণ্ডিত মহাশয় আমার নাম দিলেন ‘নিপাতনে সিদ্ধ।’—(আত্মজুতি, পৃ. ১৭৫)। এসব যখন ঘটছে

গোপাল হালদারও ‘শনিবারের চিঠি’র অকৌহিনীর একজন হয়ে ব্যঙ্গ রচনায় সাধ্যমত সহযোগিতা করেছেন। এমনকি, “গোড়ায় এক-আধটা লেখায় ‘গোপালদা’র দু-একটি অভ্যাস সকৌতুকে যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার সঙ্গে ” গোপাল হালদার স্বয়ং যুক্ত ছিলেন। পরে অবশ্য ‘শনিবারের চিঠি’র ‘গোপালদা’ সজ্ঞনীকান্তেরই “গভীর সরস ও উদ্ভট প্রয়োজনানুগ সকল রকমের কথা ও মনের মুখপাত্র” হয়েছে। গোপাল হালদার এসব তথ্য জানিয়ে লিখেছেন, “কিন্তু আমার ব্যঙ্গে ধার নেই, রঙ্গও নেই স্বচ্ছতা, কাছেই আমার সে লেখা মনে রাখার মত নয়, তবে দলাদলির দলিল বই কি—খুঁজে পেলে।”—(রূপনারাণের কূলে, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬)।

এই সব আক্রমণাত্মক রচনা প্রকাশিত হওয়ার ফলে ১৩৩৬ সনের শ্রাবণ মাসে প্রবাসী প্রেস ও প্রবাসী কার্যালয় থেকে ‘শনিবারের চিঠি’র মুদ্রণ ও প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, ২০৬ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, শ্রীমানী মার্কেটের দোতলার একটি ঘরে অফিস স্থানান্তরিত হয়। ১৩৩৬ সনের ৯ ভাদ্র এই নূতন কার্যালয়ে রঞ্জন প্রকাশালয়ের পত্তন হয়। সজ্ঞনীকান্ত বন্ধু গোপাল হালদারের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেন, তাঁরা দুজনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’র প্রকাশক হবেন। লেখককে দেয় রয়্যালটির টাকাটা জোগাড় করে দেবেন গোপাল হালদার আর সজ্ঞনীকান্ত দেবেন তাঁর উদ্যোগ ও পরিশ্রম। সজ্ঞনীকান্ত লিখেছেন, “গোপাল ও আমি উভয়ে মিলিয়া পুস্তক প্রকাশের ব্যবসা ঐদিব গোড়ায় তাহাই স্থির হইল। উভয়ের পরামর্শে নির্ধারিত হইল ‘পথের পাঁচালী’র প্রথম সংস্করণের জন্য বিভূতিভূষণকে আমরা তিনশত টাকা সম্মানদক্ষিণা দিব....বিভূতিভূষণ ও আমার মধ্যে লেখাপড়া হইবে, সাক্ষী থাকিবেন নীরদচন্দ্র ও গোপাল....রঞ্জন প্রকাশালয়ের পক্ষে আমি দলিলে সহি করিলাম, গোপাল অন্তরালে রহিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অন্তরালেই রহিয়া গেলেন।”—(আত্মস্মৃতি, পৃ. ১৮২-৮৩)। এভাবে অন্তরালে থাকার মূল কারণ গোপাল হালদার তাঁর আত্মজীবনীতে ও ‘শনিবারের চিঠি’র সজ্ঞনীকান্ত স্মরণ সংখ্যায় উল্লেখ করেছেন। গোপাল হালদার তখন বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই কাগজে কলমে রঞ্জন প্রকাশালয়ের অংশীদার হয়ে গৃহী বন্ধুকে আর বিপন্ন করতে চাননি। রাজনীতিতে উৎসাহ না থাকলেও বেপরোয়া সজ্ঞনীকান্ত বন্ধুর গোপন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করতে গিয়ে একাধিকবার পুলিশের খানাতল্লাশির হাঙ্গামায় জড়িয়েও পড়েছেন। সজ্ঞনী স্মরণ সংখ্যায় গোপাল হালদার লিখেছেন,—“অধিকন্তু আমার বন্ধু হিসাবে আমার সেদিনের কোন কোন প্রয়াসে সজ্ঞনী ছিল আমার সহায়ক, বিশ্বাসভাজন বন্ধু। সে সূত্রেই ‘প্রবাসী’ প্রেসে তল্লাশী হয়েছিল। গোয়েন্দাদের সন্দেহ ছিল চট্টগ্রামে নিহত

শরদীয়, ২০০০ শনিবারের চিঠি, সজ্জনীকান্ত ও গোপাল হালদার ২৮৯

বিপ্লবীদের যে অ্যালবাম মুদ্রিত হয় তা সজ্জনীকান্তের সহযোগে আমি প্রবাসী প্রেস থেকেই মুদ্রিত করেছি। সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়—সজ্জনীর সহযোগিতা ছিল। এরূপ আরো কিছু কিছু ব্যাপারে সজ্জনীকান্ত আমার সঙ্গে জড়িত ছিলেন—যদিও আমি জ্ঞানতাম, তাঁকে বেশী জড়ানো অন্যায্য। কারণ সে গৃহী মানুষ, অনেক তাঁর দায়িত্ব। তাঁর গৃহ সংসার ক্রটিগ্ৰস্ত হলে আমার অনুশোচনার অন্ত থাকত না। আর জ্ঞানতাম—দশজন প্রাণবান্ পুরুষের মত তাঁর স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকলেও রাজনীতিতে উৎসাহ নেই। অকুণ্ঠিত ছিল স্বদেশপীতি ও বন্ধুপীতি।”—(শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৬৮)।

সজ্জনীকান্তের বন্ধুপীতির নিদর্শন হিসাবে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন গোপাল হালদার। ১৯৩২ সনের ২৪ এপ্রিলের প্রত্যয়ে গোপাল হালদার গ্রেপ্তার হয়ে লর্ড সিনহা রোডে আবদ্ধ রয়েছেন। সংবাদ পেয়েই বিচলিত সজ্জনীকান্ত ছুটলেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। বাঁকুড়া কলেজে সজ্জনীর সহপাঠী বন্ধু জনৈক গোয়েন্দা কর্মচারীর কাছ থেকে এ খবর পেয়ে গোপাল হালদারও উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন, “অনুগ্রহ করে সজ্জনীকে বাড়ি চলে যেতে বলে দিন। তাকে আমার হয়ে বলবেন, যতদিন আমি জেলে আছি ততদিন আমার সঙ্গে পরালাপ যেন না করে। আমি তাঁর ব্যবসায়ের সহযোগী—এ কথাও যেন কখনো না বলে।”—(শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন, ১৩৬৮)। নানা বিষয়ে মতান্তর সত্ত্বেও সজ্জনীকান্তের সঙ্গে গোপাল হালদারের এই বন্ধুত্ব শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। তিনি যখন জেলে (১৯৩২-১৯৩৭) তখন ‘কন্দীর বন্ধু’ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমেই ‘শনিবারের চিঠি’র বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর মানসিক সংযোগ বজায় ছিল। সজ্জনীকান্ত লিখেছেন, “বন্ধু বর গোপাল হালদার তখন আলিপুরদুয়ারের বজা-ফোর্টে আটক ছিলেন, সুনীতিকুমার মারফত তাঁর দীর্ঘ দীর্ঘ চিঠি আসিলে সকলে মিলিয়া পড়া হইত।”—(আত্মস্মৃতি, পৃ. ২৫৭)।

এ সময়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাপ্রসন্ন বনযুগল, শরদিসু; প্রমথ বিদ্যায় বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের আসর হয়ে ওঠে সজ্জনীকান্তের ‘শনিবারের চিঠি’। ১৩৩৯ সনের ৮ অগ্রহায়ণ সজ্জনীকান্ত ‘বঙ্গপী’ পত্রিকার সম্পাদকের চাকরি গ্রহণ করেন। চাকরির শর্তানুযায়ী তাঁকে ‘শনিবারের চিঠি’র সম্পাদক পদ ছাড়তে হয়। তখন পরিমল গোস্বামী হলেন বেতনভোগী নূতন সম্পাদক। অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ থেকে আষাঢ় ১৩৪৩ পর্যন্ত তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় ‘শনিবারের চিঠি’ সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ‘বঙ্গপী’র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর ঘটায় সজ্জনীকান্ত ১৩৪১ সনের ১ মাঘ সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন। ১৩৪৩ সনের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে তিনি পুনরায় শনিবারের চিঠির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ দিন (২৮ মাঘ;

১৩৬৮) পর্যন্ত সে দায়িত্ব তিনি পালন করেও গিয়েছেন।

জেল থেকে বেরিয়ে (১৯৩৭-৩৮) গোপাল হালদার শনিবারের চিঠির সেই সাহিত্যিক নবরূপায়ণ দেখে খুশি হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার অন্তরে আর প্রবেশ করেন নি। কারণ, তখন তো তিনি শুধু সাহিত্য-সেবক নন; সাহিত্য-সাধনা, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও বিপ্লব-সাধনাকে তিনি আর স্বতন্ত্র করেও দেখেন না—তিনি মার্কসবাদী, শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে বিশ্বাসী জেল-ফেরত বিপ্লবী, কৃষক আন্দোলনের কর্মী। সজ্ঞনীকান্তের উপর তাঁর বন্ধুত্বের দাবী যতই থাক, ‘শনিচক্র’র ‘ঐকান্তিক সাহিত্য-সেবক’দের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে তাঁদের আর ধানা-পুলিশের অবাঞ্ছিত উপদ্রবে বিভ্রান্ত করতে চান নি। “তখন শনিবারের চিঠি বিশিষ্ট সাহিত্যপত্র, সজ্ঞনী স্বভাবানুযায়ী রবীন্দ্রানুগত, ক্ষমতাবান নানা গোষ্ঠীর মিত্র, এবং তাই কমিউনিস্টদেরও বিরোধী।”—(রূপনারায়ণের কূলে, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬)। ফলে, বন্ধু সজ্ঞনীকান্তের সঙ্গে, শনিচক্রের সঙ্গে গোপাল হালদারের মতাদর্শগত দূরত্ব অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল, তবে এই মতান্তর কখনই মনান্তরে গিয়ে পৌঁছয়নি। আমরা দেখি, ১৯৩৯ সনে সজ্ঞনীকান্ত ষষ্ঠেষ্ঠ আগহভরেই গোপাল হালদারের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক উপন্যাস ‘একদা’র প্রকাশক হতে এগিয়ে এসেছেন। গোপাল হালদারও বন্ধুর আহ্বানে ‘শনিবারের চিঠি’তে লিখেছেন।

মহাযুদ্ধের সময়ে মুসোলিনিভক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবে ‘শনিবারের চিঠি’ ও ‘শনিচক্র’ নিজের নিয়মেই তখন জাতীয়তাবোধের যে স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল তাতে সে-আসর ফ্যাসিবাদের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল। তখনও গোপাল হালদার প্রমুখ বন্ধুদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সজ্ঞনীকান্ত ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক-শিল্পীদের সমাবেশে যোগ দিয়েছেন। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ সংগঠিত করার জন্য যে কমিটি তৈরি করা হয়, তিনি তার অন্যতম সম্পাদক হয়েছেন এবং সুরেন্দ্র গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘প্রগতি’ সংকলনে তাঁর ‘জোটের লেখা’ কবিতাটি গৃহীত হয়েছে। তবে প্রগতিপন্থীদের সঙ্গে সজ্ঞনীকান্তের এই সম্পর্ক বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের সময় তিনি কমিউনিস্টপার্টির ‘জনযুদ্ধনীতির’ তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং ‘শনিবারের চিঠি’তে কমিউনিস্টদের ‘কামনিষ্ঠ’ বলে বিদ্রূপের-তীক্ষ্ণ শর-সন্ধান করেছেন, এমনকি বন্ধুবর গোপাল হালদারও তাঁর হাতে নিস্তার পাননি। ‘শনিবারের চিঠি’র এক সংখ্যায় পাদপূরক পদ্যাংশে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন,—‘ভাগ্যের নদী বেয়ে...যশী অধিকারী হল পার, / অশ্বম গোপালদের এ অর্গবে লগি ঠেলা সার।’

কমিউনিস্ট বিরোধী সজ্ঞনীকান্ত ও বনফুল বন্ধুবর গোপাল হালদারের আমন্ত্রণে গণনাট্য সংঘের নৃত্যাভিনয় দেখে খুশি হয়ে ‘শনিবারের চিঠি’তে

শরদীয়, ২০০০ শনিবারের চিঠি, সজ্জনীকান্ত ও গোপাল হালদার ২৯১

(ফাল্গুন, ১৩৫১) ‘দামামার আহ্বান’, ‘লাসার্ভি নৃত্য’ ‘তার মৃত্যু হল অনাহারে’, ‘ভারতের মর্মবাণী’—ইত্যাদির প্রশংসাও করেছেন। আবার আগস্ট আন্দোলন বিরোধী কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধনীতির বিরোধিতা করার জন্য কংগ্রেস-সাহিত্য সংঘ গঠন করে সজ্জনীকান্ত ‘অভ্যুদয়’ নাটকের অভিনয় নিয়ে মেতেও উঠেছেন। সজ্জনীকান্ত জানতেন, গোপাল হালদার কমিউনিস্ট হলেও তাঁর অন্যতম বন্ধু; তাই ১৩৫২ সালের চরম মতবিরোধের দিনেও তাঁরই হাতে শনিবারের চিঠির ‘সংবাদ-সাহিত্য’ রচনার ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে চলচ্চিত্রের কাজে বোম্বে গিয়েছেন।

এত ব্যঙ্গ-বিমূপ, মত ও পথের এত পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের বন্ধুত্বের সূত্র ছিন্ন হয়নি। কারণ, “যে ব্যক্তিত্বের লক্ষণ মানুষকে বারংবার করা নয় বরং স্বাগত করা”, সজ্জনীকান্ত ও গোপাল হালদার তেমনি ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। গোপাল হালদার লিখেছেন, “আমি তাঁর বন্ধু সমাজে প্রশান নই...বিশেষ করেই ‘বিপক্ষ দলের মানুষ’ দুজনের মাঝখানকার অস্বীকৃতিই সাধারণের জন্য। কিন্তু স্বীকৃতি আছে গৃহে, সংসারে, ব্যক্তিজীবনে হয়ত বা দুজনার কাব্যমৃত পিপাসায়। সজ্জনীর যে প্রকৃতির সঙ্গে আমি পরিচিত সেখানে রাজনীতি-সমাজনীতির মতামত নিতান্তই বাহ্য ব্যাপার।...সে হৃদয়বান সুহৃদ। তার প্রকৃতিতে যা ছিল না তা হচ্ছে ক্ষুদ্রতা, পেটিনেস।”—(শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন, ১৩৬৮)। আমরা জানি, গোপাল হালদারও ছিলেন পরমত সহিষ্ণু, উদার ও প্রসন্নচিত্তের মানুষ। তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল—কমিউনিজমের উৎস ‘হিউম্যানিজম’, ঘৃণা তার প্রেরণা নয়। এই কারণেই কমিউনিস্ট বিরোধী সজ্জনীকান্ত দাসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থেকেছে এবং একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী শ্রদ্ধেয় নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসুও তাঁর সম্পর্কে অক্রেপে বলতে পেরেছেন, “গোপালবাবু একেবারে স্বতন্ত্র...আর দশজন কমিউনিস্টদের চেয়ে অনেক স্বতন্ত্র।”

শতবর্ষে সুকুমার সেন

পবিত্রকুমার সরকার

চন্দ্রবতী, না হেমলতা দেবী—বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি কে? এ নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ থাকত না যদি বছর কয়েক আগে একটি বই না প্রকাশিত হত।

রাঢ় বাংলার সংস্কৃতির প্রখ্যাত গবেষক প্রয়াত মানিকলাল সিংহের পুত্র প্রদীপকুমার সিংহ বিষ্ণুপুর থেকে ১৩৮৭ সালে শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণীর ‘মানবি বিলাস’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রদীপবাবুর বক্তব্য, মধ্যযুগের প্রখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবীই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এতদিন পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গানকে যে স্বীকৃতি দেওয়া হত কার্যত তিনি তা অস্বীকার করে দিখলেন, ‘চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কাব্য করুণ রসের নির্ঝর, কিন্তু পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার দিক দিয়া তিনি হেমলতার সমকক্ষতা দাবি করিতে পারেন না।’ ১৯৮২ সালে যখন বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে বেড়াতে যাই আমাকে শ্রদ্ধেয় মানিকলাল সিংহ মহাশয় স্বয়ং ‘মানবি বিলাস’ বইটির এক কপি উপহার দেন।

বইটি পাঠ করে আমার মনে প্রশ্ন জাগে এটা কি সত্যিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম কোন মহিলা কবির কাব্যগ্রন্থ? মনের খটকা নিরসনে দুই পণ্ডিতের শরণাপন্ন হই। একজন ভাষাচার্য অধ্যাপক সুকুমার সেন, অপরজন আমার মাস্টারমশাই অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস। অধ্যাপক সেন ছিলেন জ্ঞানের জাহাজ। সাহিত্য একাডেমি তাঁর ‘বৈষ্ণব পদাবলী’ ও তাঁর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল। এছাড়া ১৯৩৫-এ তাঁর A History of Brajabuli literature ছাপা হয়েছিল। ১৯৮৫-তেও তাঁর ‘চৈতন্যাবদান’ প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক দাসের ‘বৈষ্ণব রসসাহিত্য প্রকাশ’-ও বৈষ্ণব সাহিত্যের ওপর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। অতএব কোন বৈষ্ণব কাব্যের ইতিহাসসিদ্ধতা নিরাপত্তার জন্য ওঁরাই ছিলেন যোগ্য ব্যক্তি।

অধ্যাপক সেনকেই প্রথমে ‘মানবি বিলাস’ বইটি দেখাই। তিনি কয়েকটি পাতা মনোযোগ সহকারে পাঠ করে মন্তব্য করলেন—পিতা ও পুত্রীর incest! অসম্ভব—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তো ভাবাই যায় না। এসব লেখা শ্রীনিবাস-কন্যার হতেই পারে না। যাঁরা অধ্যাপক সেনকে জীবদ্দশায় দেখেছেন তারা সবাই জানেন যে তিনি স্পষ্ট মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে দ্বিধাহীন ছিলেন।

অধ্যাপক দাসের বক্তব্য—মানবি বিলাসের ভিত্তি সহজিয়া বৈষ্ণব

ভাবনা, প্রধানত আউল-বাউল আশ্রয়ী। গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ ছিল অত্যন্ত গোঁড়া। তারা কখনই সহজিয়া সাধনার পথকে মানতেন না। কিন্তু তখন সহজিয়া সাধকরা যে সব পদ রচনা করতেন সামাজিক বাধায় তা অনেক সময় নিজেদের নামে প্রচার করতেন না। প্রখ্যাত বৈষ্ণবগুরুদের নামে প্রচার করতেন। সে-সময় বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীনিবাসের দারুণ পরিচিতি ছিল। তাঁর কন্যা হেমলতা দেবীরও নাম হয়েছিল সাধিকা হিসেবে। তাই বাউল সম্প্রদায়ের কোন কবি হয়ত বা হেমলতার নামে ‘মানবি বিলাস’ লিখেছিলেন। অধ্যাপক দাসের কথার সমর্থন পাওয়া যায় ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, ‘সহজিয়া বাউল দরবেশ সাঁই ইত্যাদি বৈষ্ণব তান্ত্রিকদের সাধনঘাটত বহু ক্ষুদ্র পুস্তিকা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাহির হইয়াছিল। ইহার মধ্যে অনেকগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও নরোত্তম দাস ঠাকুরের নামে চলিতেছিল।’ (পৃ: ৫৫৪)।

(ভাষাচার্য অধ্যাপক সুকুমার সেনকে তাঁর জন্মশতবর্ষে স্মরণ করতে গিয়ে প্রথমেই এই ঘটনার উল্লেখ করলাম এই কারণেই যে, দুই বিদগ্ধ গবেষকের আলোচনায় একটি বিষয় পরিষ্কার যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্বীকৃত মহিলা কবি পালাকার বংশীবদন চন্দ্রাবতীর কন্যা চন্দ্রাবতীই (অবশ্য চন্দ্রাবতীর রচনার কালক্রম ইত্যাদি নিয়ে এখনও গবেষকদের মধ্যে নানান মত রয়েছে)। যেহেতু আর কোন আলোচনার বা রচনার অধ্যাপক সেনের এই মত প্রকাশিত হয়নি তাই প্রাসঙ্গিক কারণেই বিষয়টি উল্লেখ করলাম।

১৯৭৬ সালে মাস ছয়েকের জন্য পূর্ব ইউরোপের চারটি দেশ দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সাংবাদিকতার একটা কোর্স করার জন্য যাওয়া। আমাদের ইনস্টিটিউট ছিল হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে। ইউরোপের নানা অঞ্চলে আজও জিপসিদের দেখা যায়। এদের পূর্বপুরুষরা তৃতীয় থেকে নবম শতাব্দীতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে দলে দলে বেরিয়ে ইউরোপের নানা দেশে, পশ্চিম এশিয়ার আর্মেনিয়া, তুর্কি ও সিরিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল। হাঙ্গেরিতেও কয়েক লক্ষ জিপসি আছে যারা অনেকেই যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত। বুদাপেস্টের এক রেষ্টুরায় একটি জিপসি তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তার গায়ের রঙ, হাবভাব দেখে বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি যে সে ভারতীয় উৎসজাত। মেয়েটি রাজমিস্ত্রির কাজ করে। তার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে পরে জিপসি ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, লোকাচার নিয়ে চর্চা করেছি। জিপসি ভাষাকে রোমানি ভাষা বলা হয়—এটা ভারতীয় কোন ভাষারই রূপান্তর, মূল অবশ্য সংস্কৃত। বিখ্যাত স্পেনদেশীয় গবেষক জর্জ বারো বোয়ানি ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বই লেখেন। বাংলায় জিপসিদের ভাষা নিয়ে

কেউ কোন কাজ করেছেন কিনা খুঁজতে খুঁজতে সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' বইটির সম্বন্ধ পাই। ১৯৩৯ সালে বর্ধমান সাহিত্য সভা বইটি প্রকাশ করে। অধ্যাপক সেন তাঁর ঐ বইতে লিখেছেন, “আধুনিক উত্তর-পশ্চিম আৰ্যভাষার সঙ্গে জিপসি ভাষাগুলির সম্পর্ক নিকটতর মনে হয়। কচিং ব্যাকরণের ধাঁচও বদলাইয়াছে। বাঙ্গালার সঙ্গেও জিপসীদের বেশ মিল পাওয়া যায়। যেমন, ‘মই’ (আমি), ‘অমে’ (আমার), ‘রা কের’ (রা কাড়া, কথা বলা), ‘সাপ্নী’ (সাপিনী), ‘সুবিলো’ (সুমন্ত), ‘তুমে দুই’ (তোমরা দুইজন)।” (চতুর্দশ সংস্করণ ১৯৮৩, পৃঃ ১৭১) প্রকৃত পক্ষে এই মানুষটি সাহিত্যের কত দিকে যে আলোকপাত করেছেন তা বলি শেষ করা যাবে না। মঙ্গলকাব্য, পদাবলী, সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি তো ছিলই তাছাড়া নানাবিধ মেয়েলি ভাষা, ঘুমপাড়ানি গান, ব্রজবুলি, ভূতের গল্প, হাস্যকৌতুক, লোকসাহিত্য, গোপাল ভাঁড় ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে লিখেছেন। পণ্ডিতি লেখাও কত সহজ ও সাবলীল ভঙ্গীতে লেখা যায় তা তিনি দেখিয়ে গেছেন।

রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার দিক থেকে অধ্যাপক সেন কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের থেকে খানিকটা দূরেই ছিলেন। তিনি যেসব কথা বলতেন তা বামপন্থীদের অনেকেরই পছন্দ হত না। এই যেমন ইংরেজির গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়াকে তিনি সমর্থন করেননি। শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল্যায়ন প্রচেষ্টাকে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম মনে করতেন। ছকে বাঁধা লেখার তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। অধ্যাপক সেনকেও বামপন্থীরা বরাবর একটু দূরে দূরে ঠেলে রেখেছেন। খানিকটা উপেক্ষাই করতেন। তাদের আয়োজিত সাহিত্য-সংস্কৃতি আলোচনায় বা সভা-সমিতিতে অধ্যাপক সেনের ডাক পড়ত না। তাদের পত্র-পত্রিকাগুলোতেও অধ্যাপক সেন প্রায় অনুপস্থিত। সুকুমার সেন নিজে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন যে, তিনি কখনই কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁদের কয়েকজন তীব্র বাম-বিরোধী ছিলেন। কোন লেখক, গবেষকের মূল্যায়ন হওয়া উচিত তাঁর রচনা ও গবেষণাকর্মের নিরিখে—তিনি কাদের সঙ্গে যুরলেন, ফিরলেন তা দিয়ে নয়। রাজনৈতিক সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন থেকে আমরা অনেক সময় এই বিষয়টি বিস্মৃত হই।

১৯৮০ সালের ১৬ জানুয়ারি সুকুমার সেনের অশীতিতম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁর ১০ রাজ্য রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন হয়েছিল। এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন কয়েকজন কমিউনিস্ট-বামপন্থী-ই। তাঁদের সহযোগিতায় অবশ্য অন্যরাও এগিয়ে এসেছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানের আয়োজক হিসেবে জাতীয় সাহিত্যসংঘের নাম ছিল। কিন্তু এর প্রভাবক ও প্রধান সংগঠক ছিলেন আদ্যোপান্ত নজ্রালপন্থী কমিউনিস্ট মুকুর

সর্বাধিকারী—তার পাশে ছিলেন সাহিত্য গবেষক অমর দত্ত, জিতেন পাল প্রমুখ। স্নাতক হওয়ার পর মুকুর সর্বাধিকারী (বর্তমানে প্রয়াত) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম-এ পড়েন। সেখানে তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ অধ্যাপকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। আচার্য সেন মুকুর সর্বাধিকারীকে ‘শুভযোগী’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

সেদিনের ঐ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন আমারও কিছুটা ভূমিকা ছিল। ঐ সংবর্ধনা সভার উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরেক বিদ্বৎ বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সেদিন শ্রোতারা দুই বিদ্বৎ-সম্মিলন প্রত্যক্ষ করার বিরল সুযোগ পেয়েছিলেন। উপনিষদের বিস্ময় সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করে আচার্য সুকুমার সেনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ। বিনম্র চিত্তে তা গ্রহণ করে অধ্যাপক সেন সংস্কৃতে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি সুকুমার সেন ১৯২১ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। পরে পঠনীয় বিষয় বদল করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৩-এ তুলনামূলক ভাষা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান দখল করেন। অধ্যাপক সেনের নিজের কথায় জানতে পারি, তাঁর ভাষাবিদ্যার দীক্ষাগুরু ছিলেন অধ্যাপক ই. জে. এস তারাপুরওয়ালা। আর তিনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র, সেইসময় ১৯২২-এ বিলেত থেকে ফিরে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক রূপে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

যাই হোক, ভাষাচার্য ড. সেনের অশীতিতম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান দারুণ সফল হ'বছিল। দেশের বিদ্বৎ সমাজের ও বিদ্বৎ সভার চোখ খুলে গেল। তারপর বঙ্গীয় সাপ্তিক, পরিষদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও আচার্য সেনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সবশেষে আচার্য সেন ১৯৮৪তে, Royal Asiatic Society of London-এর Scholastic Medal পান। তাঁর আগে ১৯৮১তে পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনার ফল। এই বিষয়ের প্রতি প্রথম অনুসন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্য গবেষক ও লেখক দীনেশচন্দ্র সেন। বাংলা ভাষার ইতিহাস নিয়ে তিনিই প্রথম বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত ভাণ্ডারের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার (কৈশাখ ১৩১২) তিনি ‘বঙ্গভাষায় মুসলমান রাজত্বের প্রভাব’ শীর্ষক একটি অতীব মূল্যবান ও বিশ্লেষণশীল প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি লিখলেন, ‘দীনা বঙ্গভাষা রাজসভায় উপস্থিত হইবার সাহস পাইল কিরূপে? মন্দাক্রান্ত ও মালিনী ছন্দের ব্যুৎপত্তি করিয়া

পয়ার ছন্দে প্রবিশ্ট হইল কাহার অনুগ্রহে? গ্রাম্য পণ্ডিতকে সংস্কৃত অধ্যাপক রাজসভার গৌরবদণ্ড নৈয়ায়িক সভাসদ স্থান দিতে সম্মত হইলেন কেন?

আমি ইহার একটা উত্তর ভাবিয়া রাখিয়াছি। মুসলমান সম্রাটগণ এদেশে আসিয়া এদেশেরও অধিবাসী হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা এ দেশের কথিত ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন। হিন্দুর শাস্ত্র তাঁহারা জানিতে স্বভাবতই ইচ্ছুক হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সংস্কৃত পাঠ করিবার ধৈর্য তাঁহাদের ছিল না; সুতরাং তাঁহারা কথিত পৈশাচিক প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত বাংলা ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থগুলি অনুবাদ করিবার অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন। বঙ্গভাষার সেই এক দিন।’

এরপর দীনেশবাবু মন্তব্য করলেন, ‘মুসলমানগণের নিকট ঋণ এইটুকু মাত্র নহে; হিন্দু রাজত্ব অব্যাহত থাকিলে বাংলাভাষা ভদ্রসমাজে দাঁড়াইতে স্থান পাইত কিনা বলা যায় না—মুসলমান বাদশাহগণ ইহাকে পাড়াগাঁ হইতে তুলিয়া আনিয়া দরবারে প্রতিষ্ঠা করিলেন,—ইহা ছাড়া আলোয়াল প্রভৃতি মুসলমান কবিগণ এই ভাষাকে যে শ্রী প্রদান করিয়াছেন, তাহা ইহাকে বহুকাল উজ্জ্বল রাখিবে।’

‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাসাহিত্যে প্রথম এম-এ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—১৯১২ সালে পাস করেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের ঐ গবেষণাকে আরো সমৃদ্ধ করেন আচার্য শহীদুল্লাহ যাঁর সঙ্গে অধ্যাপক সেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওঁদের ধারায় গবেষণা চালিয়ে তিনি ১৯৫১ সালে ‘ইসলামিক বাংলা সাহিত্য’ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্যের অনুরণন শুনি সুকুমার সেনের কণ্ঠে, আরো তথ্যাশ্রয়ী ভঙ্গীতে—

‘যে কালে লৌকিক ভাষার উদগম হয়েছিল তখন আর্যাবর্তে বাহন-ভাষা ছিল দুটি—সংস্কৃত ও অপভ্রংশ (অবহট্ট)। সংস্কৃত ছিল সাধুভাষা—পণ্ডিত শাস্ত্রের ধারক ও সভা-সাহিত্যের বাহক। অপভ্রংশ (অবহট্ট) ছিল অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত জনগণের গাথা-গীতির সহজ ভাষা। সংস্কৃতমূলক সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান কবিদের পরিচয় কিছু থাকলেও তা খুব গভীর ও ধারাবাহিক ছিল না, তাই বরাবর হিন্দু কবিদের তুলনায় এঁদের জনগণসংযোগ নিবিড়তর ছিল, সুতরাং তাঁরা অপভ্রংশ (অবহট্ট) কাব্যপদ্ধতিকে উপেক্ষা করেননি। মুসলমান কবির লেখা একটি অপভ্রংশ কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে কিছুকাল আগে। কাব্যটি “পাহাড়ুত” গোছের, নাম ‘সংনেহয়রাসয়’ (অর্থাৎ সন্দেশকে রাসক)। কবি ছিলেন মূলতানের অধিবাসী, নাম আব্দহেমান অর্থাৎ আবদর রহমান।’

তিনি জানানেন, ‘বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবির প্রথম সাক্ষাৎ মেলে

চাটিগা-রো সঙ্গে অর্থাৎ চট্টগ্রাম আরাকানে। বাংলায় হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যধারার ভগীরথ হচ্ছেন রোসঙ্গ-সরবারের দুজন সভাকবি দৌলত কাছী ও আলওয়াল। দৌলত কাছী বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, পুরানো বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী কবিদের অন্যতম। তাঁর একমাত্র কবিকৃতি অসমাপ্ত—পরে আলওল কর্তৃক সম্পূর্ণিত—লোর চন্দ্রাণী পাঁচালী কাব্য।’

১৯৪০ সালে সুকুমার সেনের ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’—প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮ সালের মধ্যে আরো তিনটি খণ্ড ছাপা হয়। অধ্যাপক সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুভদ্র সেনের সহযোগিতায় ও শ্রমে সম্প্রতি পঞ্চম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পথপ্রদর্শক রামগতি ন্যায়রত্ন ও দীনেশ চন্দ্র সেন। কিন্তু অধ্যাপক সেনই প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য ইতিহাস রচনা করেন। ১৯৪০ সালে ১১১১ পৃষ্ঠার যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে ৭৫২ পাতা রবীন্দ্রনাথ দেখে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর মংপু থেকে রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লেখেন, ‘বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র ইতিপূর্বে আমি পড়িনি। গ্রন্থাকার তাঁর বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত পুস্তকগুলি থেকে যে দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করে দিয়েছেন তাতে করে তাঁর গ্রন্থ একসঙ্গে ইতিহাস ও সম্বলনে সম্পূর্ণ রূপ ধরেছে।’ এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবারই বহু তথ্য সমিবেশিত হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি পূর্ব মতের বদলও করেছেন। এই ইতিহাস রচনায় বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন। প্রতিটি তথ্যকে কঠিণাধারে যাচাই করে নিয়েছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের আমলে ‘সেক শুভোদয়া’ একটু ভাঙা ভাঙা অমার্জিত বাংলায় লেখা। কিন্তু বইটি বেঁটে তিনি দেখালেন ধর্মসংপৃক্ত নয় এসব রচনায় নিদর্শন এখানেই আছে—

রাম রাজা বর্ষে ইম্র বর্ষে জল।

যে বৃক্ষ রোয়ে সে অবশ্য ধরে ফল।।

যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য করিয়ে আশ।

যদি বা শীঘ্র ফলে তবে তু হয় ছয় মাস।।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৫ (প্রথম সংস্করণ)

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা গ্রন্থ কিরূপ ছিল সেকশুভোদয়াতে তার কিছু প্রতিচ্ছবি আছে বলে তিনি জানালেন। আর লৌকিক গীতির একমাত্র নিদর্শনও তিনি খুঁজে পান ঐ বইটিতে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯২৭ সালে হুথিকেশ সিরিজে বাংলা সফরে তাঁর সম্পাদিত সেকশুভোদয়া প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের সব গবেষকের মতই সুকুমার সেনও মনে করেন ষোড়শ শতাব্দী পুরাতন বাঙলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। বাংলাদেশে চৈতন্যের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে সমাজজীবনে যে প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল সাহিত্যে তার ধাক্কা এসে লাগল। চৈতন্যোত্তর চৈতন্যজীবনীকেন্দ্রিক পদাবলী বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা এনে দিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' তো বাংলা কবিতাকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে দেয়। এক লাফে সাহিত্য একশ-দেড়শ বছর পেরিয়ে গেল। সুকুমার সেন নিজেও চৈতন্য চরিতামৃত সম্পাদনা করেন যা ১৯৬৩ সালে সাহিত্য একাডেমি প্রকাশ করে। ডঃ সেন বলেছেন, 'বাংলা ভাষায় চলার পথে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে শক্তি দেখিয়েছেন তার তুলনা—রবীন্দ্রনাথ ছাড়া—আর কারোর রচনায় পাই না' (স্রঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা)। পরবর্তীকালে লেখক-গবেষক গোপাল হালদারও প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেন।

বাঙালির ভাবমানসে এবং রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনে ঝড় তুলে দিয়ে যান চৈতন্য। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে চৈতন্যের অবদানকে বিশ্লেষণ করেন এবং দেখিয়ে দিয়ে গদাধর প্রমুখ কয়েকজন চৈতন্য-শিষ্য বাংলাদেশে বস্তুবাদী দর্শনের প্রচারক ছিলেন। কিন্তু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অনেক আগে অধ্যাপক সেন চৈতন্যকে সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণের প্রয়াস চালান। তিনিই প্রথম গবেষক যিনি চৈতন্যকে অবতার হিসেবে না দেখে বিরুদ্ধ শাসক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখেছিলেন। বাঙালি সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ডে) তিনি বলেছেন, '...নবদ্বীপ অঞ্চল ছিল আবুয়া মুলুকের অন্তর্গত। মুলুকের কাজীর কাছে নালিশ হল। চৈতন্য লোক খেপাইতেছে এবং হিন্দুয়ানি জাহির করিতেছে, সুতরাং তাহাকে জব্দ না করিলে মুসলমানের আধিপত্য টিকিবে না। কাজী একদল সংকীর্তনকারীকে খেদাইয়া দিয়া তাহাদের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিল। শুনিয়া চৈতন্য ক্রুদ্ধ হইয়া মিছিল করিয়া নগর-সংকীর্তনের আদেশ দিলেন। চৈতন্যের এই উদ্যম ভারতবর্ষে বিরুদ্ধ শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম চ্যালেঞ্জ।' এই বক্তব্যের স্বচ্ছতা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তবে বিরুদ্ধ শাসকশক্তির বিরুদ্ধে বোধহয় এটা প্রথম চ্যালেঞ্জ নয়। রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজা-বিদ্রোহ, গণঅভ্যুত্থান আগেও হয়েছে, হয়ত বিকল্পভাবে।

আচার্য সুকুমার সেনের গবেষণার মৌলিকত্ব কি? হয়ত তিনি তাঁর পূর্বসূরী জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত বিশাল ও একেবারেই মৌলিক আকর গ্রন্থ *Origin and Development of Bengali Language* (O.D.B.L) রচনা করেননি। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের

ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁর নিজের কথায়, সব দেশে সব কালে আর সব সমাজে মেয়েদের ভাষায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, বাচনভঙ্গীতে, শব্দ ব্যবহারে অথবা পদবিধিতে, যা পুরুষদের বাক্যালাপে সাধারণত শোনা যায় না। নারীর ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে তখন কোন বিদেশী শব্দবিদ্যাবিদ গবেষণা চালাননি। আমিই বোধহয় এবিষয়ে প্রথম—আর যতদূর জানি—অদ্যাবধি একক (ঋঃ দিনের পরে দিন যে গেল—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫)। উল্লেখ করা যেতে পারে, ‘Women Dialect in Bengali’—এই কাজের জন্য তিনি গ্রিফিথ পুরস্কার পান। তিনি তিন তিনবার ঐ পুরস্কার পেয়েছিলেন।

বাংলা ভাষাতত্ত্বের অপেক্ষাকৃত নতুন উপশাখা Bengali Toponymy বা বাঙলা স্থাননামের ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ—এই বিষয়ে তিনি পথপ্রস্তুত। তিনি তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান, গভীর প্রজ্ঞা ও সর্বোপরি অনুসন্ধিৎসা প্রয়োগ করে এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কলকাতার দুটি পুরনো পুকুর হেদো আর গোলদীঘি নিয়ে তাঁর মতামত জানান—

কলকাতায় পড়তে এসেছিলাম ১৯১৯ সালে। সেই থেকে ১৯৬৪ সালের প্রথম তিন মাস পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমার জীবনপথের পাদচারিক ভূমি ছিল গোয়াবাগানের বাসা থেকে পটলডাঙায় সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থাৎ হেদো থেকে গোলদীঘি। (এইখানে আমার কলম নিসপিস করছে নাম দুটির ব্যুৎপত্তি অনুসারে ব্যাখ্যা করতে।) সকলে, অশ্চর্য হন গোলদীঘি নাম হল কেন? পুকুরটি তো চৌকো। দীঘি নয়, গোল হো নয়ই। অনেকে অনুমান করেন, হয়ত উত্তর-দক্ষিণ ভরাট করে দীঘিকে পুকুর করা হয়েছে। আগে গোল ডোবা ছিল, তাকে কেটে চৌকো পুকুর করা হয়েছে। এদিকে হেদো কিন্তু গোল এবং দীঘি, অর্থাৎ দীঘি বৃত্তাকার, elliptical। কিন্তু নাম তার ‘গোল দীঘি’ নয়। সমস্যা মোটেই জটিল নয়। গোলদীঘির ‘গোল’ অংশটি বিশেষণ নয়, বিশেষ্য। ‘গোল হল হোগলার মতো একরকমের আগাছা, হোগলার নামান্তরও হতে পারে। এই পুকুরের ধারে ‘গোল’ আগাছার ঝস ল ছিল। আর দীঘি কথাটি এখানে পুকুর অর্থে ব্যবহৃত, দীর্ঘিকা অর্থে নয়। পশ্চিমের লোকেরা বলে গোলতলাও। মনে হয় দীঘি এখানে হিন্দী ‘তলাও’-এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত। আর ‘হেদো’ কথাটির মানে মজাপুকুর। বর্ধমান জেলায় কোন কোন গ্রামে এই নামে পুকুর ও দীঘি আছে। মনে হয় হেদো আগে দীঘিই ছিল। পরে তার কোণ কেটে bath tub-এর আকার দেওয়া হয়েছে।

(ঋঃ দিনের পরে দিন যে গেল—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৫)

বাংলার স্থান-নাম নিয়ে অধ্যাপক সেনের একটি পৃথক বইও আছে।

অধ্যাপক সুকুমার সেনের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর ছাত্র-গবেষক অমর দত্ত ‘অধ্যাপক সুকুমার সেন’ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকায় অমরবাবু জানিয়েছেন, ‘বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, আবেস্তা, প্রাচীন পারসিক ভাষায় তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তির জন্য তিনি দেশ-বিদেশের প্রশংসা অর্জন করেছেন। ডক্টর সেন সম্ভবত একমাত্র ভারতীয় পণ্ডিত যিনি ল্যাটিন ও প্রাচীন ইরানীয় ভাষায় গবেষণা করেছেন।

ডক্টর সুকুমার সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বর্ধমান সাহিত্য সভার প্রায় বারো হাজার বাংলা, সংস্কৃত পুঁথি পরীক্ষা করেছেন। জয়দেবের গীত-গোবিন্দের প্রাচীনতম পুঁথিটির তিনিই প্রথম সন্ধান পান।...

প্রাচীন ইরানীয় ও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা সম্বন্ধে ডক্টর সেনের গবেষণা ভাষার ইতিহাসে মূল্যবান সংযোজন। An Etymological Dictionary of Bengali (1000 A.D.–1800 A.D.) তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের অনবদ্য নিদর্শন। তাঁর রচিত ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’ বাংলা ভাষাতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ আলোচনাগ্রন্থ।’

আচার্য সেনের তুলনামূলক পুরাণতত্ত্বের কাজও মনে রাখার মত। তিনি ভারতীয় দেব-দেবীকে ধর্মাশ্রয় থেকে যুক্তিনিষ্ঠ লৌকিকতার অগতে নামিয়ে আনেন। লৌকিক দেবদেবী ভাবনার উৎস তিনি খুঁজে বের করেছেন। তুলনামূলক পুরাণতত্ত্বের আলোচনার ভিত্তি হিসেবে তিনি বলেছেন, ‘দেবতারা মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন কিনা জানি না। তবে মানুষ যে দেবতা সৃষ্টি করেছে তাতে সন্দেহ নেই। মানুষ যদি দেবতা সৃষ্টি না করত তবে পৃথিবীর বিভিন্ন জনসমাজে দেবতার এত বিভিন্ন ও বিভিন্ন রূপ দেখা যেত না এবং একই জনসমাজে (যেমন আমাদের হিন্দু সমাজে) দেশ-কাল-ভাষা অনুসারে দেবতার এমন রূপ ও স্বরূপ পরিবর্তন হত না। [শিবঠাকুর ও সম্পর্কিত নারী দেবতা (শারদীয় আনন্দবাজার ১৩৮২)]।

সুকুমার সেন কত যে মিথের অগ্নি ভেঙেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ডি ডি কোশাধী তাঁর Myth and Reality নামক বিখ্যাত গ্রন্থে কৃষ্ণ-মিথকে ভেঙে দিয়েছিলেন। তিনিই দেখান মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ঊর্ধ্বতনকালে পুরুষকুলের কোন নেতা হিসেবেই কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা। আর সুকুমার সেন তাঁর ‘বিষ্ণু-কৃষ্ণ কথা’ (চতুরঙ্গ মাঘ-চৈত্র ১৩৮৩)-য় যা লিখেছেন তা জানলে কৃষ্ণভক্তরা তো নির্ভীক ফ্রেপে যাবেন। তাঁর চমকপ্রদ বক্তব্য হল, ‘প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি ভাগবত-বৈষ্ণব

—লোকভাবনায় ও লোকসাহিত্যে শিশু কৃষ্ণের সমাদর জাগ্রত হয়েছিল।

ঋগ্বেদে বিষ্ণু শিশু নন, বালকও নন, তিনি প্রৌঢ় কিশোর বা যুবা।

নারী সমাজের গানে-গাঁথায় ও গল্পে এর চল হয়েছিল। এখানে ইতিহাসের অনুরোধে খ্রীষ্টীয় ধর্মের কিছু প্রভাব মানতে হয়। শিশু কৃষ্ণ বা বাল-গোপালের পূজা খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দ শেষ দ্বারার আগেই দেখা দিয়েছিল। যতদূর অনুমান করা যায় তাতে মনে হয় দক্ষিণ ভারতে কেরলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে সিরীয় খ্রীষ্টানদের সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপিত হয়।... তাঁরা মেরী মাতা ও তাঁর শিশু পুত্রকে পূজা করতেন। সেই সূত্রে আমাদেরও শিশু-কৃষ্ণের ডাবনায় দেবডাবনার ও বিষ্ণু ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল।’

অধ্যাপক সেন দেখিয়েছেন শিবঠাকুর পুরোপুরি অবৈদিক ও লৌকিক ডাবনা সঞ্চার। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘ঋগ্বেদের দেবতা রুদ্র পৌরাণিক গ্রন্থে ও লৌকিক আখ্যানে শিব হয়েছেন সে বিষয়ে পণ্ডিত সমাজে মতবৈধ নেই’ (ঋঃ শিব ঠাকুর ও সম্পর্কিত নারী দেবতা)।

রামচন্দ্রকে দেবতা ও অবতার সাজিয়ে ভারতবর্ষে কী কাণ্ডই না হয়! অন্ধবিশ্বাস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নেয়। রামকে কোন পৌরাণিক চরিত্রের বদলে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং অযোধ্যায় তাঁর একটি জন্মস্থানও খুঁজে বের করা হয়েছে। কিন্তু রামকেন্দ্রিক ধার্মিকতাকে তিনি যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে খণ্ডন করেছেন তাঁর ‘রামকথার প্রাক-ইতিহাস’-এ। বইটি খুবই ছোট বই, কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি প্রমাণ করেছেন যে-রামায়ণকাহিনী ইন্দো-ইরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখায় ও অন্যত্র নানান রূপে প্রচলিত ছিল। সেটাই নানান রক্ত পেরিয়ে রামকথায় জন্মটি বেঁধেছে। তাঁর ধারণা আইরিশ বীরগাথার ‘লশুন ন্যায়রিস ও ভীষণ উপত্যকার মহাবীর’ লোককাহিনী বা রুশ গল্প ‘মারিয়া মোরোভনা’ রামকাহিনীর উৎস হতে পারে। ১৮৮৬ সালে ইবন এন মোজাহির নামে জনৈক ইতিহাসবিদ এডেনে দশমাথাওয়ানা রাবণের এক গল্পের উল্লেখ করেছিলেন—এটিও অধ্যাপক সেনের নজর এড়ায়নি। তিনি মনে করেন, ‘সম্ভবত সীতার চরিত্রই আগে জন্মটি বাঁধতে শুরু করেছিল এবং তা ঘটেছিল ভারতবর্ষে।

রামচরিত্রের জন্মটি বাঁধন স্বতন্ত্রভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রাচীন ইরানে।’ অতএব দেখা যাচ্ছে রাম চরিত্রটি ভারতীয় নন।

রামকথা নিয়ে অধ্যাপক সেনকে গবেষণায় উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষক আচার্য সুনীতিকুমার। সুকুমার সেনের নিজের স্বীকৃতি ছাত্রশিক্ষকরূপে সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার যোগ আমার জীবনের একটি প্রধান ঘটনা। ১৯৭৫ সালে ‘রামায়ণ সহস্রকে অন্যান্য কথার মধ্যে সুনীতিবাবু বলেছিলেন যে পালি জাতকের কাহিনী অনুসারে রাম সীতা ছিলেন ভাইবোন। একথা পড়ে গোঁড়ারা সুনীতিবাবুর উপর চটে গেল, বেশি গোঁড়ারা ক্ষেপে

গেলেন। তাঁকে ভয় দেখিয়ে চিঠি আসতে লাগল। সুনীতিবাবু ভয় পাননি, তবে একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন' (দিনে পরে দিন যে গেল—দ্বিতীয় পর্ব)।

১৯৭৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রামায়ণ কাহিনীর সত্য নির্ধারণের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা হয়। সেই সভায় অধ্যাপক সেন একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি তারপর এ বিষয়ে আরো গবেষণা চালান। সুনীতিকুমারের অনুরোধে বৈদিক সাহিত্য খঁটে সুকুমার সেন দেখালেন সেখানে সীতা আছে, রাম নেই। অতএব সীতা কথা প্রাচীনতর। সীতা কথার অর্থ চষা' হুঁইয়ে লাঙলের রেখা, যা ধরে চাষা বীজ বুনে যায়। আর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যা তিনি তথ্য সহযোগে প্রমাণও করেছেন, মহাকাব্যিক নায়ক রামকে অন্য দেশ থেকে ভারতে আমদানি করা হয়েছে। এই কথা শোনার পর রামলালার অর্ধ ভক্তরা কি বলবেন?

‘রাম কথার প্রাক্ ইতিহাসের’ প্রস্তাবনায় তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, ‘রামকথার আলোচনা প্রস্তুত হয়েছে ইতিহাসপন্থার অনুসরণে অর্থাৎ যুক্তির আলোয়। আমার ধর্মবিশ্বাসে ‘রাম’ ঈশ্বরের নামান্তর বটে। কিন্তু আমার সে ধর্মবিশ্বাসের রাম তো আমারই ভাবনায় গড়া। তাঁকে ইতিহাস হোঁবে কি করে? খাঁরা রামকে ঈশ্বরের অবতার মনে করেন না, তাঁরাই তো রামকথা পড়ে—তুনে আনন্দ পান। তাঁদের জন্যেই এই আলোচনা।’

আর ধর্মাসক্তদের প্রতি তাঁর অনুরোধ ‘ভ্রাতৃজনোচিত দৃষ্টিতে রামচরিতের এই আলোচনার জন্যে আমি ভক্তিপ্রবণ ধর্মাসক্তদের কাছে সানুনয় ক্রমা প্রার্থনা করছি। তাঁরা এই বইটি না পড়লে খুশি হব।’

ড. সেনের আলোচনার ভিত্তি ছিল বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠা। এই পক্ষে তিনি যেসব রামকথার প্রাক্ ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন, তেমনি মহাভারতের গ্রন্থিমোচন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তুলনামূলক পুরাণতত্ত্বের ওপর তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ‘ভারতকথার গ্রন্থিমোচন’ (১৯৮১)। একটি ক্ষুদ্র পরিসর প্রবন্ধে তাঁর বিশাল জ্ঞান সাধনার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। ভাষাতত্ত্ব থেকে ইতিহাসের দীর্ঘপথে তিনি হেঁটেছেন, সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষণায় ও আলোচনায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। জ্ঞানসাধনার মধ্য দিয়ে তিনি যে লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন তা আসলে সমাজ প্রগতিকেই এগিয়ে দিয়েছে। জন্মশতবর্ষে এই মনীষীকে আরেকবার শ্রদ্ধা জানাই।

সুকুমার সেন : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

জন্ম : কলকাতায় ১৯০০ সালের ১৬ জানুয়ারি।

পিতা : হরেন্দ্রনাথ সেন, মাতা : নবনলিনী সেন।

পত্নী : সুনীলা সেন (প্রয়াত)। কন্যা : সুন্দা দত্ত (প্রয়াত)। পুত্র : সুভদ্র সেন।

বর্ধমান জেলার বায়না থানার গোতান গ্রামে বাল্যকাল কেটেছে।

বর্ধমান হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোহিনীমোহন মিত্র মেডেল পেয়ে।

বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আই-এ। সংস্কৃত, বাংলা ও গণিতে সেটার। সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সে বি-এ। প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয়। কমপারেটিভ ফিললজিতে এম-এ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোনার মেডেল।

১৯২৪-এ প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান।

১৯২৬-এ মণ্ডাট মেডেল।

১৯২৬-৩১ মৌলিক গবেষণার জন্য তিনবার গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার ও দুবার স্যার আন্তোনি মুখার্জি মেডেল।

১৯৩০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগদান। এর আগে অবৈতনিক অধ্যাপকের কাজ করতেন। ১৯৩৭-এ পি এইচ ডি।

১৯৫৫-৬৪ ঋষরা অধ্যাপক।

১৯৬৩তে রবীন্দ্র পুরস্কার।

১৯৮১তে বিদ্যাসাগর পুরস্কার।

১৯৮৪তে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব লন্ডনের Scholastic Medal

এছাড়া আনন্দ পুরস্কার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামেন্দ্রসুন্দর স্বত্ব-ফলক, সরোজিনী মেডেল।

বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট।

মৃত্যু : ৩ মার্চ ১৯৯২।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

বাংলা

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৪

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—বর্ধমান সাহিত্যসভা ১৯৪০-৫৮ চার

খণ্ড ১৯৯৯-এ নবম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯
৪. ভাষার ইতিবৃত্ত—বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৯৩৯
৫. প্রাচীন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী—বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থ, বাং ১৩৫০
৬. মধ্যযুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী—বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থ, বাং ১৩৫২
৭. বিদ্যাপতি গীতি ও গীতি গ্রন্থিকা—বর্ধমান সাহিত্য সভা, বাং ১৩৫৪
৮. ইসলামি বাঙ্গালা সাহিত্য—বর্ধমান সাহিত্য; বাং ১৩৫৬
৯. ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—গ্রন্থপ্রকাশ ১৯৬১
(ভারতীয় আর্থ সাহিত্যের ইতিহাস নামে বাং ১৩৮৫তে পুনঃ প্রকাশিত)
১০. রবীন্দ্র রচনা ভূনির্দেশিকা—বর্ধমান সাহিত্য সভা ১৯৬১
১১. পরিভ্রমণ পরিবেশে রবীন্দ্র বিকাশ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২
১২. বাঙ্গালীর সাহিত্য ইতিহাস—১৩৭২
১৩. নট, নাট্য ও নাটক—মিত্র ঘোষ ১৩৭২
১৪. রামকথার প্রাক ইতিহাস—জিজ্ঞাসা ১৯৭৭
১৫. বঙ্গ ভূমিকা—ইস্টার্ন পাবলিশার্স ১৩৮৪
১৬. ভারত কথার গ্রন্থমোচন—আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৮১
১৭. বিচিত্র নিবন্ধ—গ্রন্থভবন ১৯৮১
১৮. বাংলার স্থান-নাম—আনন্দ ১৯৮১
১৯. গল্পের ভূত—আনন্দ ১৯৮২
২০. দিনের পরে দিন যে গেল প্রথম খণ্ড—আনন্দ ১৯৮২
২১. আয়কাহিনীর কালজ্ঞাপ্তি—আনন্দ ১৯৮৪
২২. চৈতন্যাবদান—আনন্দ বাং ১৩৯২
২৩. বটভল্লার ছাপা ও ছবি—আনন্দ ১৯৮৪
২৪. রবীন্দ্র শিল্পে প্রেমচৈতন্য : বৈষ্ণব ভাবনা—আনন্দ বাং ১৩৯৩
২৫. রবীন্দ্রের ইন্দ্রধনু—আনন্দ বাং ১৩৯৩
২৬. সুকুমার সেনের প্রবন্ধাবলী প্রথম খণ্ড—এ. কে. সরকার ১৯৮৪
২৭. দিনের পরে দিন যে গেল দ্বিতীয় খণ্ড—আনন্দ ১৯৮৬
২৮. কলকাতার কাহিনী—আনন্দ ১৯৯০
২৯. বাঙ্গালির ভাষা—বাংলা একাডেমি ১৯৯০ (সুভদ্র সেনের সঙ্গে)

হিন্দী

১. বাংলা সাহিত্য কী কথা—অনুবাদক : ভোলানাথ বা প্রয়াগ ১৯৪২
২. ভারতীয় বাঙ্গময়-ভাগ তিসরা, মানসিংহ ও বড়ুয়া সহযোগে—
রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি বর্ধমান ১৯৫৪
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসাহিত্য—হিন্দী গ্রন্থ রত্নাকর, দিল্লী ১৯৬৩

৪. ভারতীয় সাহিত্য মেরু কালবর্ধন—জবাহরলাল নেহরু অভিভাষণমালা—
১. হিন্দী অনুবাদ ভাবী সংগম, দিল্লী ১৪/১১/১৯৬৪
৫. বিদ্যাপতি গোষ্ঠী—অনুবাদক শৈলেন্দ্র ঝা, লাহোরিয়া সরাই ১৯৬৬

ইংরেজি

1. The use of cases in Vedic Prose—Reprinted from the Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute 1926-30
2. A History of Brajabuli Literature—Calcutta University 1935
3. Old Persian Inscriptions of Achaemenian Emperors—1942
4. Historical Syntax of Middle Indo-Aryan—Linguistic Society of India 1953
5. History and Pre-history of Sanskrit—Mysore University 1950
6. The Latin Language—Wilson Philological Lectures, 1961 Bombay University, Cal Philological Society Vol. IX-X
7. History of Bengali Literature—Sahitya Academy 1960
8. Comparative Grammar of middle Indo-Aryan—Linguistic Society of India 1960
9. Paninica—Sanskrit College Research Series 1970
10. Lipinda Translated from the Bengali Original of William Carey 1977
11. Suniti Kumar Chatterjee—1980
12. The Great Goddesses in Indic Tradition—Papyrus 1987
13. Kabi Kankan—Sahitya Academy 1989

সম্পাদিত গ্রন্থ :

1. Vipradasa's Manasa Vijay—Asiatic Society 1953 (বাংলা হরফে)
2. A. M. I. A. Reader—In Collaboration with Prof. S. K. Chatterjee 1957
3. Gauranga Vijaya of Indamanidasa—Asiatic Society 1957
4. Seksubhodaya—অধিকেশ সিরিঙ্গ, বাংলা হরফে মূল ১৯২৭
Asiatic Society, নাগরি অক্ষরে মূল
5. Visnupada's Manasa Mangla—Asiatic Society বাংলা অক্ষরে মূল
(দ্রঃ তালিকায় কিছু ভুল-ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে)

মিছিলের রাজনীতি

বাসব সরকার

রাজ্য পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক জীবন সুরুই হয়েছিল মিছিল দিয়ে। দেশভাগের যুদ্ধা, সমস্যা এই রাজ্যের মানুষকে স্বাধীনতার প্রায় পরের দিন থেকে যেভাবে আলোড়িত করে, অন্য রাজ্যের কোথাও এমনকি বিভক্ত পাঞ্জাবেও সেই যুদ্ধা, আলোড়ন ছিল না। প্রাক-ক্ষমতা হস্তান্তর পর্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা পাঞ্জাবে স্বাধীনতার পর অল্পদিনের মধ্যেই থেমে যায়। তার স্থানান্তর ঘটে দিল্লিতে। জনসংখ্যা বিনিময় তার প্রধান কারণ। তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ ক্ষমতা হস্তান্তরে আগে সাম্প্রদায়িক কারণে অকালিদেয় যে পাঞ্জাবী সুবা আন্দোলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, স্বাধীনতার অল্পকাল পরেই, উদ্বাস্ত পুনর্বাসন শেষ হওয়া মাত্রই তা মাথা চাড়া দেয়। পশ্চিম বাংলায় ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ যে দাঙ্গা থেমে যায়, ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মার্চের আগে সেই দাঙ্গা আর হয়নি। আর ১৯৫০ সালের দাঙ্গা ১৩ হয়েছিল মূলত হাওড়ায় এবং অন্য দু'এক জায়গায়। সারা পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কুণ্ডল হয়নি মোটেও। স্বাধীনতার পর দেশের অন্যরাজ্যে বিশেষ দিনে, বিশেষ উপলক্ষে শোভাযাত্রা হয়েছে, মিছিল নয়। এই রাজ্যে মিছিল তাই সাম্প্রদায়িক তাগিদে হয়নি, যা হয়েছিল পাঞ্জাবে সীমিতভাবে হলেও।

মিছিলের সঙ্গে শোভাযাত্রার মৌলিক ভেদ আছে। মিছিলের চরিত্রই রাজনৈতিক, প্রতিবাদী। মানুষের সংগ্রামের ধারাকে, যা অপ্রত্যক্ষ তাকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরার মধ্য দিয়েই তার সার্থকতা। রাষ্ট্রতন্ত্রে যাকে politics of mass mobilisation বলে, পিছিয়ে পড়া তৃতীয় দুনিয়ার দেশে নিরক্ষর মানুষদের যুদ্ধপাজর্জর জীবনযাপনকে সংঘবদ্ধ চেতনার স্তরে উন্নীত করে জন-সমাবেশের সেই মাধ্যম হলো মিছিল। পঞ্চাশের দশকে শহর কলকাতার রাজপথে অগণিত মিছিলের একটা বহুশ্রুত কথা উল্লেখ করলেই অন্তত এই রাজ্যে মিছিলের চরিত্র বোঝা যাবে : 'এই মিছিল সবহারার সব পাওয়ার এই মিছিল'। স্বাধীনতা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণ করতে পারেনি, তাদের জীবন পরাধীন ভারতে যেমন ছিল অসহায়, বঞ্চিত, স্বাধীনতার পরেও তাই রয়েছে, তখনকার মিছিলে এটাই ছিল মূল বক্তব্য। আর এই সব মিছিলের বড়ো অংশ জুড়ে ছিল উদ্বাস্তদের দাবি। অবিভক্ত বাংলার শেষ দশকে কংগ্রেসের হিন্দুপ্রধান নেতৃত্ব আর হিন্দু মহাসভা দল মুখ্যতঃ ডঃ শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে এই প্রদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং

উচ্চবিত্ত হিন্দুদের মনে সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্ব এমনভাবে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন যা দেশভাগে সোচ্চার সমর্থন যোগায়। পূর্ববাংলার হিন্দুদের কপালে তার পরিণতি কি হবে সেটা আদৌ বিবেচনা করা হয়নি। তাই দেশভাগের পরেই যখন পূর্ববাংলা যার নাম তখন পূর্ব পাকিস্তান, সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে এপার বাংলায় শরণার্থীর ঢল নামে, তখন তাদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। পশ্চিম বাংলার বিধানসভার ১৯৪৭-৫০ পর্বের নথিভুক্ত কার্যাবলীতে তার প্রমাণ রয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এপার বাংলার মানুষদের প্রত্যাশার বিস্ফোরণ। সরকারের পক্ষ থেকে একটানা এই সব দাবির মোকাবিলায় উদাসীনতা, অনীহা মানুষদের বিক্ষুব্ধ, প্রতিবাদী করে তোলে। মিহিল তাদের সেই সব প্রতিবাদের সম্মিলিত রূপ।

আজকের কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলীর সুস্থিত জীবনযাত্রা দেখলে এটা টের পাওয়ার কোন উপায় নেই কতো মিহিলে, কতো রক্তপাতের বিনিময়ে এই সব শহরতলী গড়ে উঠেছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনিচ্ছুক হাত থেকে একটির পর একটি দাবি ছিনিয়ে আনার পরই গড়ে উঠতে পেরেছে এই সুস্থিতির বনিয়াদ। তখনকার মিহিল সূর্য হতো মানুষের বাঁচার তাগিদে। তাই দিনরূপ ঘোষণা করে, বাস নরী টেম্পো ম্যাটাডোরে লোক জমায়েত করে তখন মিহিল করার প্রয়াস ওঠেনি। এটা সেইসব প্রতিবাদী মানুষদের কাছে ছিল অকল্পনীয়। তখন উদ্বাস্তুদের গনসংগঠনগুলিও গড়ে ওঠেনি। সেইগুলি ছিল মরীয়া মানুষদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বাঁচার প্রচেষ্টা। তাই মিহিলের জন্যে লোক জড়ো করতে হতো না, মানুষ নিজেদের মতো করেই পথে নামতো অন্যদের কাছে নিজেদের কথা বলার জন্যে।

এই সব অসংখ্য, অসংগঠিত মিহিল এই রাজ্যের রাজনীতিতে একটা স্যাডিকলাইজেশনের মাত্রা যোগ করছে যখনই বোঝা যেতে থাকে তখনই কমিউনিস্ট ও অন্য বামপন্থীরা যথাশক্তি তাতে সামিল হয় এই নবজাগ্রত রাজনৈতিক চেতনাকে তাদের কর্মসূচির সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়তে। দেশভাগে যারা নায়কত্ব করেছিলেন সেই কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা কিংবা অন্যান্য সাম্প্রদায়িক শক্তি কিন্তু উদ্বাস্তুদের পক্ষে কিছু করেনি। পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে এই মিহিল পর্ব তাই বামপন্থীদের শক্তি ও গণভিত্তি প্রসারের মাধ্যম হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের দিকে এক নজরে তাকালেই সেটা বোঝা যাবে। ১৯৪৮-৪৯ সালে 'ইয়ে আজাদী বুটা হ্যায়' শ্লোগান দিয়ে কমিউনিস্টরা কম আন্দোলন করেনি। কিন্তু দেশের রাজনীতির মূল চেতনার ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের বিশ্বাসের রাজনীতি কোন সাড়া জাগাতে পারেনি বলেই তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়। তখন

অনেকেরই মনে হয়েছিল দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ শেষ। কিন্তু ১৯৫১-৫২ সাল থেকেই গণরাজনীতির পথ ধরে সেই কমিউনিস্ট আন্দোলন যেভাবে এই রাষ্ট্রে রাজনীতির কেন্দ্রে ফিরে আসে সেটা ইতিহাস। একের পর এক বিধানসভা নির্বাচনে কমিউনিস্টসহ বামপন্থীদের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি প্রমাণ করে দেয় সাধারণ মানুষদের জীবন সংগ্রামের শরিক হয়ে থাকলেই রাজনীতিতে নিয়ামক ক্ষমতা দখলের দিকে যাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে গণসমাবেশ, গণরাজনীতি আর গণমিছিল পঞ্চাশের দশক থেকেই একাকার হয়ে যেতে শুরু করে। মিছিল হয়ে পড়ে গণআন্দোলনের বিশিষ্ট রূপ। পঞ্চাশের দশকের কলকাতায় যাদের যৌবন কেটেছে তারা সহজেই মনে করতে পারবেন ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে এক পয়সার আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, ছাত্র-যুব আন্দোলন, বাংলা-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন যা শহর কলকাতাকে ক্রমাগত আলোড়িত করেছে তাদের প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে ছিল এই রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষের নান্দীর যোগ। খাদ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়েই গ্রাম বাংলার মানুষদের সঙ্গে শহর কলকাতার মানুষদের যে রাজনৈতিক সংযোগ ঘটে ১৯৫৯ সালে, সেটাই ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনে হিমালয় থেকে সমতট সারা রাজ্যকে আন্দোলিত করে। তারই পরিণতি ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসায়। এই সূত্রে দু'টি কথা বলা দরকার।

প্রথমত সমস্ত গণআন্দোলন শুরু হয়েছে মিছিল দিয়ে। পাড়ায় এলাকাভিত্তিক ছোট ছোট মিছিল প্রতিবাদী চেতনার মানুষদের সামিল করেছে বিরাট গণআন্দোলনের বিশাল মিছিলে। তার একটির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই বিশালত্ব বোঝা যাবে। ১৯৫৯ সালে আগস্ট মাসের শেষ দিনটিতে চালের দাম এক লাখে ৬০ পয়সা কিলো থেকে বেড়ে ৭৫ পয়সা হয়ে যাওয়ায় গ্রাম বাংলা থেকে আসা প্রতিবাদী এক লক্ষ মানুষের গণডেপুটেশনকে একল্যান্ডেড ইস্টে পথ অবরোধ করে পুলিশের বেপরোয়া লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস যখন মাত্র ২/৩ ঘন্টার মধ্যে ৮-৬ জন মানুষের প্রাণ নেয়, তার প্রতিবাদে পরবর্তী তিন দিন এই মহানগরী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই লক্ষাধিক মানুষকে গ্রাম বাংলা থেকে পয়সা খরচ করে আনতে হয়নি। কৃষক সভার ডাকে তারা এসেছিল প্রাণের তাগিদে। ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন বসিরহাটে নুরুল ইসলাম কিম্বা কৃষ্ণ নগরে আনন্দ হাইওয়ের শহর দেখাতে কোন নেতার ডাকে সামিল হতে গিয়ে আত্মবলিদান দিতে হয়নি। তারা বাঁচার লড়াইয়ে নিজের তাগিদে সামিল হয়ে শহীদ হয়ে অন্যদের বাঁচার পথ প্রশস্ত করে যায়। তাই সেই সব মিছিলের জ্বালাত আলাদা, মেজাজ আলাদা, চরিত্রও

আলাদা ছিল। তার সঙ্গে সমকালের মিছিলের তুলনা করা যায় না।

প্রধানমন্ত্রী জহরলাল যখন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি শহর কলকাতায় মিছিলের প্রাত্যহিকতা দেখে কলকাতাকে ‘মিছিল নগরী’ বলেছিলেন, কংগ্রেসের বিপর্যস্ত শাসন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে কলকাতাকে ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ বলেছিলেন, সেইসব মিছিল বিপুল অর্থব্যয়ে সাজানো গোছানো ছিল না, মানুষ প্রতিবাদী চেতনা থেকেই অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে, ব্যক্তি চেতনাকে সমষ্টি চেতনার স্তরে উন্নীত করতেই মিছিলে সামিল হতো। তাই নেহরুর মিছিল নগরী হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের নগরী। দেশের অন্য কোন শহর এইভাবে একটানা দীর্ঘদিন শাসকদলের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী চরিত্র বজায় রাখেনি।

দ্বিতীয়ত পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনের প্রাণকেন্দ্রে কলকাতা। এখানে যা কিছু ঘটে তাই ধীরে হলেও ক্রমে সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়ায়। কলকাতার রাজনৈতিক প্রতিবাদে ক্রমেই সারা রাজ্যের মানুষ যখন সামিল হওয়ার তাগিদ অনুভব করে তখন জেলা সদর থেকে মহকুমা শহরে, আরো পরে রাজ্যের যেখানেই কোন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ছিল সেখানে মিছিল হতে থাকে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এই রাজ্যে রাজনৈতিক প্রতিবাদের মিছিলরূপ ক্রমেই ভারতের অন্য রাজ্যেও ছড়ায়। বিশাল অঙ্ক সংযুক্ত মহারাষ্ট্র, মহাশূজরাট আন্দোলন, তামিলনাড়ুর ডি এম কে-র আন্দোলন, সেই রাজ্যে হিন্দি বিরোধী আন্দোলন সবই শুরু হয়েছিল মিছিল দিয়ে। গোড়ার দিকে তাদের প্রায় সর্বত্র ছিল অ-সংগঠিত স্বতন্ত্র স্ফূর্ত রূপ, যা আন্দোলনের বিস্তার ঘটানোর জন্য সংগঠিত রূপ নেয়।

এই সূত্রে আরো দুটি কথা বলা দরকার। প্রথমত মিছিল শাসকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদের বিশিষ্ট প্রকাশ হয়ে উঠতে থাকলেও শাসকদের পক্ষ থেকে পান্ট্র মিছিল সংগঠিত করা হয়নি কিনা যায়নি। এই ঘটনাই প্রতিবাদী রাজনীতির সঙ্গে মিছিলের একটা নিবিড় ঐক্যসূত্র গড়ে তোলে। তাই বহু বছর পরে এখনও পথে-ঘাটে কোন মিছিল দেখলে মানুষ কৌতূহলী দর্শক হিসেবে বলে কোন দাবি আদায় করতে এরা পথে নেমেছে। দ্বিতীয়ত এখনকার মতো তখন বন্ধু ডাকার কোন রেওয়াজ তখন ছিল না। ৬০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে রাজনৈতিক পরিভাষায় বন্ধু শব্দটি আমদানী করা হয়নি। তখন হতো সাধারণ ধর্মঘট হরতাল, সর্বাত্মক বন্ধু নয়। তাই সেই ডাক সকলের কাছে পৌঁছে দিতে মিছিল করতে হতো। একালে খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে, বেতার দূরদর্শনে খবর দিয়ে বন্ধু ডাকা যায়। মিছিলের প্রচার এখন অপ্রয়োজনীয়। তাই একদা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মিছিলের যে ভূমিকা ছিল, তার অনেকটাই যে এখন শেষ হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আসলে মিহিলের রাজনীতি পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৯-৭১ সালে 'ঘেরাও'-এর রাজনীতি এবং সমগ্র নব্ব্বাল পর্বের ভিন্ন চরিত্রের রাজনীতির জন্যে কার্যত শেষ হয়ে যায়। তার পরেও জনগণের বিভিন্ন অংশের দাবি দাওয়া আদায় করতে মিছিল হয়েছে। কিন্তু 'ঘেরাও' পর্ব থেকে মিছিল ক্রমশঃ অর্থনৈতিক দাবির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ায়, মিহিলের অঙ্গী প্রতিবাদী রাজনৈতিক রূপ সাগরের ঢেউয়ের মতো একটানা মানুষের চেতনার উপরে অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি, যা ছিল পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে রাজ্য রাজনীতির বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মিছিল পর্ব কিম্বা মিহিলের রাজনীতির সূচনা আর শীর্ষ বিন্দু দুটোই ঘটেছে ১৯৪৭-৬৭ কার্যতঃ বিশ বছরের মধ্যে। এই রাজ্যে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজ্যপাল ধরমসিংহের ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ভেঙ্গে দিয়ে ব্যাপক দমন পীড়ন চালালে সারা রাজ্যের মানুষ পথে নেমে ছিল প্রতিবাদী আন্দোলনে। 'এখন রাস্তাই একমাত্র রাস্তা' কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই এক লাইনের মন্তব্য মিহিলের রাজনীতির যে স্বরূপ প্রকাশ করে, বলা যায় তার পরে মিহিলের যৌক্তিকতা, প্রাসঙ্গিকতা, পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তার রূপান্তরের তাগিদ এই ছোট মন্তব্যে যেভাবে প্রকাশ পায়, তেমন তাগিদ পরে আর অনুভূত হয়নি।

স্বাধীনতার এই প্রথম বিশ বছরে মিহিলের রাজনীতি কোন ব্যক্তি কিম্বা গোষ্ঠী কেন্দ্রিক স্বার্থ কিম্বা লক্ষ্যপূরণে করা হয়নি। বরং গোষ্ঠী স্বার্থ অতিক্রম করে ব্যাপক গণস্বার্থের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেওয়াই ছিল লক্ষ্য। তাই মিছিল করা হতো রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, কোন সীমিত লক্ষ্যের জন্যে, ক্ষমতা দখলের জন্যে মিছিল করা হয়নি। অবশ্যই সরকার দখল করার ডাক দেওয়া হয়েছে মিছিল থেকে। কিন্তু সেটা ছিল বিকল্প নীতির ভিত্তিতে বিকল্প সরকার গড়ার ডাক। সেই ডাক দেওয়া হতো এই রাজ্যের মানুষদের কাছে, যাতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে তারা উদ্যোগী হয়। অন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সরকারী হস্তক্ষেপ, সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলের জন্যে মিছিল করা হতো না। সংগঠিত মিছিল যাঁরা করতেন তাঁরা জনগণকে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, শাসকদের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চাপ দিতেন না।

তাই একালের মিহিলের রাজনীতি ব্যক্তি কিম্বা দল বা গোষ্ঠী স্বার্থে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি, যার সঙ্গে এই রাজ্যের রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐতিহ্যের কোন মিল নেই। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বদলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার উপর ক্ষমতা দখলের জন্যে নির্ভরতা মিহিলের রাজনীতিকে চরিত্রপ্রস্তু করেছে। একথা স্বীকার্য যে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্টের ২৪ বছরের শাসনে

যতো মিছিল হয়েছে তা মূলতঃ সংগঠিত ছিল। তার মধ্যে বামফ্রণ্টের সংঘর্ষশক্তি প্রকাশ পেয়েছে, মানুষের সমাজ পরিবর্তনের জন্যে, বিকল্প ব্যবস্থার জন্যে জঙ্গীচেতনা নয়। এই জঙ্গী চেতনাই ছিল মিছিলের রাজনীতির মৌল বৈশিষ্ট্য, যা ব্যক্তি চেতনাকে সমষ্টি চেতনার মধ্যে মিলিয়ে দিতে চাইতো। সমাজ পরিবর্তনের দাবিতে, জনজীবনে মৌলিক রূপান্তর ঘটানোর লক্ষ্যে একালে মিছিল অত্যাধুনিক। তবু এই সব মিছিল একান্তভাবে নির্ভর করে মানুষের ভূমিকার উপরে, তাদের শক্তিকেই সক্রিয় হতে আহ্বান করে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মানুষের হস্তক্ষেপ সম্ভব করতে চায়। তার জায়গায় অন্য যে ধরনের মিছিল বহু ব্যয়ে সংগঠিত হয়, তা মানুষের, জনগণের ভূমিকার বদলে প্রশাসনের ভূমিকাকেই কার্যকর করতে চায়। এই মৌলিক পার্থক্য মিছিলে জন সমাবেশ যাই হোক না কেন, তাকে 'মহামিছিলে' পরিণত করে না। মিছিলের রাজনীতির মহত্ব এবং মাহাত্ম্য কোন ব্যক্তিকেদ্রিক লক্ষ্যপূরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় না।

দুনিয়ার অন্য দেশে কিন্তু এই একুশ শতকে মিছিলের রাজনীতির মহত্ব এবং মাহাত্ম্য, দুটোই নবতর স্বীকৃতি পাচ্ছে দেখা যায়। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন দেশের সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে যায় মার্কিন দেশের শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষদের মিছিলের রাজনীতিতে। কোন দমন পীড়ন চালিয়েও সেই প্রতিবাদী মিছিল ছত্রভঙ্গ করা যায়নি। গত কেম্ব্রিজীতে ব্যাংককে আক্টাডের সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে যায় থাইল্যান্ডের কৃষকদের মিছিল ও সমাবেশের চাপে। গত এপ্রিল ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সম্মেলন ভেঙ্গে যায় প্রতিবাদী জনতার মিছিলে, দাবিতে। এই সব মিছিলের লক্ষ্য ছিল সামগ্রিক ও সামাজিক। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতানাভের দাবি নয়। তাই প্রশাসনিক ব্যবস্থা শক্তি প্রয়োগ করেও তাদের লক্ষ্যপ্রাপ্ত করতে পারেনি। পশ্চিমবাংলায় সমকালের মিছিলের রাজনীতি আসলে স্বার্থপরতার রাজনীতি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে সমাজভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার রাজনীতি নয়। অথচ বৃহত্তর দুনিয়ায় সেটাই ঘটছে এবং একুশ শতকের বিশ্বপ্রেক্ষিতে তার এই রূপ মিছিলের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে। এটাই আশার কথা।

January, 2000

February, 2000

March 2000

June

ডাকঘর

মাসিক আয় প্রকল্প

এখন একক নামে তিন লক্ষ
এবং যুগ্ম নামে ছয় লক্ষ টাকা
পর্যন্ত জমান যাবে

সুদের হার ১১% ♦ মাসে মাসে দেওয়া হয়
৬ বছরের মেয়াদ শেষে ১০% বোনাস
কোন বাজারগত ঝুঁকি নেই

যে কোন বিভাগীয় ডাকঘরে পাশবই খোলা যায়

প্রয়োজনে ১ বছরের পূর্বে থেকে টাকা তোলা যায়,
যদি ৩ বছর বা তার পরে টাকার দরকাব হয় তবে
তোলার দিন পর্যন্ত ১১% সুদ সমেত সমস্ত টাকা ফেরৎ



স্বল্পসঞ্চয় অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিস্তারিত জানতে হলে নিচের ঠিকানায় পোস্টকার্ডে লিখুন :
অধিকর্তা, স্বল্পসঞ্চয়, রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা - ৭০০ ০০১

স্বাধীনতা

Carl

Ar

সুধীন্দ্রনাথ

শতবর্ষ

৩/৭/০৭



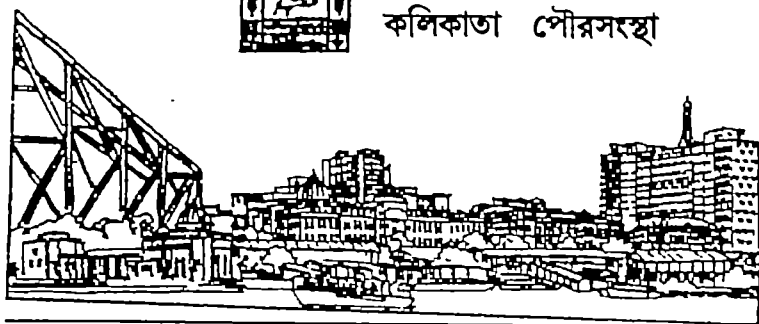
সুধীন্দ্রনাথ

আমাদের লক্ষ্য কলকাতাকে আরো
সুন্দর করে গড়ে তোলা, আরো
উন্নত নাগরিক পরিষেবা

এ কাজে চাই সকলের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা



তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসংস্থা



২০০১ কলকাতা বইমেলায়
বাংলা কবিতার আবৃত্তির আকাশে
উজ্জ্বলতায় অনন্যতায় নতুন সংযোজন

অজিত বাইরীর কবিতা সংকলন

শ্রুতিসন্ধ্যার বন্ধন ৭০.০০

সম্পাদনা : পার্শ্ব ঘোষ গৌরী ঘোষ

প্রকাশক উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, সি-৩ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট,
কলকাতা-৭০০ ০০৭

প্রবন্ধ পাঠ্যসূচীতে বাইরীর কবিতার আলোচনা-গ্রন্থ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরতন সেন, সুমিতা
চক্রবর্তী, পার্শ্বপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, তরুণ
সান্যাল প্রমুখের প্রবন্ধে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়,
শিবনারায়ণ রায়, পবিত্র সরকার, অশ্রুতকুমার সিকদার,
সবোজ্জমোহন মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত, সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়,
নীলান্বিশেষ্বর বসু প্রমুখের পত্রে

তপনকুমার মাইতি সম্পাদিত

সির্জন বদীর কবি ৪০.০০

প্রকাশক ১০৩, কালীকুণ্ড সেন, হাওড়া-৭১১১০৯
দূরভাষ : ৬৫৭-১১৭৯

১০৩০০১
১০০ ২৭

ঈদ-অনির্বাক-প্ৰবীণ, অগ্নি ও জ্যোতির্বেশক	৮০.০০
" উপনিষৎ-প্রসঙ্গ-১ম ভাগ ২৫.০০ ২য় ভাগের	৫০.০০
" ৩য় ভাগ ৩০.০০ ৪র্থ ভাগ ৩৫.০০ হন কৌকিলী	৫০.০০
বিশ্বজিতকুমার দত্ত-প্রাচীন বাঙ্গাল্য-ঐতিহ্য নটক	৩৬.০০
শক্তিচন্দ্র ঘোষ-ইংলিশান কেশী : সাহিত্য সাধনা	৩০.০০
ঐক্য সিংহরায় (সে)-অস্বাভাবিক কল্পনা কবিতা : শিব ও বিদ্রোহ	৪০.০০
শান্তীচরণ ভট্টাচার্য-প্রাচ্য সাহিত্য পবিত্রতা	৩৫.০০
অক্ষয়চন্দ্র সাহা-দেবেন্দ্রনাথ সেন : জীবনী ও কাব্যকীর্তি	৬০.০০
চন্দ্রী ভট্টাচার্য-কথা সাহিত্য-প্রাচ্যবাহুল্য	১১০.০০
বেঙ্গল হটক-সুপ্রসঙ্গ দত্ত : কবি ও কাব্য	৭০.০০
অক্ষয় নিখ-সাহিত্যের বিবরণ	১০০.০০
বহুনাথ কুতুব-প্রাচীন যুগে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবতাবাদ	১২৫.০০
দনস বৈক্য-প্রাচ্য বাঙ্গাল্য ইতিহাস ও নবযুগের বাঙ্গাল্য সাহিত্য	৪০.০০
কল্যাণীশংকর ভট্টক-বঙ্গপ্রদেশ ও সংস্কৃত সাহিত্য	১০০.০০
বিদ্যাব চক্রবর্তী-ঐনিষ শতকব বাঙ্গাল্য সাহিত্য : ভাষ্যবিশেষ	৮০.০০
বিবিষ চৌধুরী কনিষ্ঠ-আত্মজীবনী : লোকসংস্কৃতি	১০০.০০
" নবযুগ চক্রবর্তী : জীবনী ও কল্যাণী ২ ভাগ	৫০.০০
প্রদীপনাথ কবিদেব-আত্মজীবনী ও সিদ্ধান্ত ১ম-৪৫.০০ ২য়-৪০.০০	
হামী কল্যাণ-সোহাগ ও অষ্টভাষ্য ৩৫.০০ বাঙ্গাল্য	৩০.০০

প্রকাশক বিভাগ • কলকাতা, বিজয়চন্দ্র • প্রকাশনাটি বর্ষ ১৯২১-২২

পত্রিকার জালিয়াত জন্ম শিক্ষা।

Car Loan



Housing Loan



Personal Loan



Consumer Loan



ALLAHABAD BANK

A tradition of trust

Visit our website : www.allahabadbank.com

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রকাশক বিজ্ঞান)

বাংলা কবী-এর তালিকা : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার প্রয়োগ—ড. নির্মলকুমার দাস ২২০, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু—ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৪০, কবির অধ্যয়ন—উজ্জ্বলকুমার মহম্মদার ৮৫, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা—ড. সৌরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪০০, কথা ও সুর—জুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৬০, অমর্ত্য ভাবনা (১ ও ২)—সম্পাদনা ড. রাজকুমার সেন ১২, মৃত্যু নিপুণ শিল্প বিকীরণ আঁধারে—সকলক ড. প্রভাতকুমার দাস ১২, ভারতবর্ষ : জালোকিত নিয়ন্ত্রণ—সম্পাদনা পদ্মব সেনগুপ্ত ১৫০, জীবনানন্দ : বিভিন্ন কোরাস—সম্পাদনা পদ্মব সেনগুপ্ত ১৫০, হারকানাথ ঠাকুরের জীবনী—কিশোরীনাথ ঠাকুর ১২৫, রবীন্দ্রনাথ ও পাণ্ডী—সমীক্ষক দ্বন্দ্ব ২০০

< List of English Publication : Reform and Regeneration of Bengal (1734-1828)—Dr. Amiya Mukherjee 250/- Studies in Fundamentals of Induction—Dr. Ram Chandra Pal 225/- The Indian Economic Issues—Editor Dr. Raj Kr. Sen 200/- Freedom of Speech and Expression in the Constitution in India—Dr. Atma Ram Ghosal 200/- Art and Aesthetics of Abanindranath Tagore—Dr. Sudhir Kumar Nandy 200/- Studies in Artistic and Creativity—Dr. Manas Roy Choudhry 175/- Sanskrit Prosody and Its Evaluation—Amulyadhan Mukhopadhyay 180/- Mahatma Gandhi and Islam—Amalendu De 12/-

দ্বিতীয় প্রকাশ : টেক্সটের মরাদ্দ—অম্বাদক ড. লক্ষ্মীনারায়ণ পাচৌরী ১০০, রবীন্দ্রনাথ সমীক্ষা—সম্পাদকমণ্ডলী ১২ চিত্রকলা—ড. লক্ষ্মীনারায়ণ পাচৌরী ১৮০

প্রাপ্তিহীন

৫৬৬, বি. টি. রোড (ময়ূরভট্ট), কলিকাতা-৭০০০৫০

৬/৪, হারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়ী গ্রন্থ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রদর্শনের জন্য রাখা যাবে।

মনীষা প্রকাশিত কয়েকটি বই

গল্প

শ্রেষ্ঠ গল্প :	ম্যাক্সিম গোর্কি	৫০.০০
কলিযুগের গল্প :	সোমনাথ লাহিড়ী	২৫.০০
	উলম্যাস	
বাঁদী :	গোলাম কুদ্দুস	৪০.০০
	কব্যানাট্য	
একগুচ্ছ কব্যানাট্য :	রাম বসু	৮৫.০০
	প্রবন্ধ	
কালিদাস সমীক্ষা :	সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৫.০০
	স্মারকগ্রন্থ	
তত্ত্ব ও সংগ্রামের প্রতীক :	বিশ্বনাথ মুখার্জী	৯০.০০

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০

Telex : 021-4382 CAB-IN
Gram : LOKPAWAN,
CALCUTTA (INDIA)

Office : 350-7928
350-4564
PHONE 351-1097
Works : 334-2230

NATIONAL STEEL CORPORATION

**FERROUS & NON-FERROUS SCRAP &
NON-FERROUS CASTING & GENERAL ORDER
SUPPLIERS**

**OFFICE :
78A, AMHERST STREET
CALCUTTA-700009**

**WORKS & GODOWN :
188, MANICKTOLLA MAIN
ROAD, CALCUTTA-700054**

With Best Compliments from :

ASHOKA TOOLS PVT LTD

MECHANICAL & STRUCTURAL ENGINEERS.

**23A, N. S. Road, 11th Floor
CALCUTTA-700001**

জনগণের দীর্ঘদিনের অভিপ্রেত আকাংক্ষার ফলস্বরূপ জলপাইগুড়ি পুরসভার দায়িত্ব আমাদের হস্তে ন্যস্ত। তাঁদের স্নেহসিক্ত আশীর্বাদকে পাথের করেই আমরা এগিয়ে চলেছি। সীমাবদ্ধ আর্থিক সম্ভ্রতি সত্ত্বেও পুরবাসীর উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং যথাযথ পুর পরিষেবা প্রদান—আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়েই করতে চাইছি।

পুরবাসীর প্রতি আমাদের আবেদন

- ১। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন।
 - ২। পুরের সময় মত পরিশোধ করে উন্নয়নের কাজে সাহায্য করুন।
 - ৩। অনুমোদন ব্যতীত কবর নতুন নির্মাণ কার্য থেকে বিরত থাকুন।
 - ৪। বাড়ীর আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলুন।
 - ৫। পানীর জলের অপচয় বন্ধ করুন।
 - ৬। রাস্তার পাশে বর্শিপাথর ইত্যাদি রেখে বানকলে চলাচলের ব্যাধাত সৃষ্টি করে থেকে বিরত থাকুন।
 - ৭। পৌরসংগঠিত যথাযথ রক্ষা করুন।
 - ৮। মনে রাখবেন পৌরসভার স্বার্থ—নাগরিক স্বার্থ, পৌরসভার মূলশক্তি, নাগরিক চেতনা।
- আপনার শহর, আপনার পুরসভা—জলপাইগুড়ি পৌরসভা।

শিবপদ ষ্টোমিক

পুরপ্রধান, জলপাইগুড়ি পৌরসভা

আভিজাত্যের প্রতীক রেশম শিল্পী

বালুচরী • গরদ • তসর • সিল্ক জামদানী • সিল্ক • বেনারসী
সিল্ক • টাঙ্গাইল • কাঁথা স্টিচ • মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী • চুড়িদার
নাইটি • হাউসকোট • স্কার্ট • শালোয়ার-কামিজ • কাপতান ও
ড্রেস মেটেরিয়ালস্ • রেডিমেড শার্ট • পাঞ্জাবী ও সিল্কের শার্ট
ও পাঞ্জাবীর কাপড়।

পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

(পাঃ বাঃ সরকারের অধীনস্থ সংস্থা)

১২/১, হোয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০১

১২/১, হোয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০১ * ১১-এ, এলাহাবাদ হাউস, কলিকাতা-৭০০ ০৬৬
* ১৫৯/১-এ, হুসকিন্সের এজিন্সি (ফলিগঞ্জ), কলিকাতা-৭০০ ০২৯ * ৮০, অম্বালা লাইট রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০৭ (ড্রেন পিনেমের নিকট) * ১৫৬, বিধান সারী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ (রং
মহল বিহারের হাউস নিকটে) * ৯৮-২৪, ব্রহ্ম-জি, এস-ও, মনিকতলা সিভিক সেন্টার, কলিকাতা-
৭০০ ০৫৪ * সি-১২২, রাজ্য সুবোধকর মল্লিক রোড, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), (গড়ির কান চ্যাপের
নিকট), নতুন রোড, কোচিটি, দুর্গাপুর-১০ * রাজ্য সেন, অসানসোল * বারানসি কলনীর মেড,
২৪ পরগণা (উত্তর)

With Best Compliments from :

McLEOD RUSSEL

ADABARIE T.E.	CENTRAL DOOARS T.E.	TEZPORE & GOGRA T.E.
GINGIA T.E.	JAINTI T.E.	DIROKE T.E.
HALEM T.E.	MATELLI T.E.	MARGHERITA T.E.
HUNWAL T.E.	GLENBURN T.E.	BOGAPANI T.E.
MONABARIE T.E.	SOOM T.E.	DEHING T.E.
NYA GOGRA T.E.	LINGIA T.E.	NAMDANG T.E.
TARAJULIE T.E.	NAGRIFARM T.E.	CHUAPARA T.E.
MATHURA T.E.	BHATPARA T.E.	JAIBIRPARA T.E.

McLEOD RUSSELS IS THE TRADING NAME OF
THE TEA DIVISION OF

***EVEREADY* > > >**

INDUSTRIES INDIA LTD.

FOUR MANGOE LANE, SURENDRA MOHAN
GHOSH SARANI, CALCUTTA 700 001



A MEMBER OF THE WILLIAMSON MAGOR GROUP

স্বল্প খরচে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদানে রাষ্ট্রীয় স্তরে হাডকো কর্তৃক পুরস্কৃত

শহরে কিংবা গ্রামে গৃহনির্মাণ ঋণে আমরাই অগ্রণী
গত ৭ বছরে গৃহনির্মাণ ঋণ বাবদ আমরা ২৪ কোটি
টাকা মঞ্জুর করেছি

স্ট্যাম্প ডিউটির জন্য আমরা কোন ঋণ দাদন করি না,
কারণ আমাদের ঋণগ্রহণের জন্য কোন স্ট্যাম্প ডিউটি
লাগে না

আমাদের গ্রামীণ বিকাশ যোজ্ঞনায় বিনিয়োগ করে ৭৫
মাসে টাকা দ্বিগুণ করুন

কলিকাতা ও শহরতলীতে টি. ভি., ফ্রিজ, আসবাবপত্র
ও গাড়ী ইত্যাদি ক্রয়, গৃহনির্মাণে হঠাৎ প্রয়োজন—
তৎক্ষণাৎ ঋণ (NSC, KVP, LICP) দেওয়া শুরু
হয়েছে

মেয়াদী আমানতে অর্জিত সুদের উপর উৎসমূলে আয়কর
কাটা হয় না

কিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ
এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ
কলিকাতা শাখা (শীততাপ নিয়ন্ত্রিত)

২৫ডি সেক্সপিলার সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০১৭ ফোন : ২৪০

১১৩৮, ২৮০ ৬৬৮১, ২৪০ ১৭৮৬, ফ্যাক্স : ২৪৭ ৭১২৮

PRESERVE & PROSPER

WEST BENGAL STATE WAREHOUSING CORPORATION (a Statutory Undertaking) offers services for storage and preservation of various commodities viz. cereals, pulses, jaggery, cotton, jute, textiles, papers, cement, steel, coal, machineries, fertilizers and other merchandise of any size and weight through its net work of 32 Warehouses in West Bengal. The Corporation also offers storage facilities in open or covered spaces for storage of custom Bonded articles in Calcutta Port area. Warehouse Receipt issued against deposit is good security for raising loan from banks.

The goods stored at the Warehouses are protected against loss by pests & rodents through periodic prophylactic and curative measures. The goods are also insured against various perils like fire, flood, burglary, theft etc.

The Disinfestation Extension Wing of the Corporation situated at 1, Hide Road, Calcutta-700 088, undertakes disinfestation services in hotels, factories, shops, establishments, ships, barges, flour mills etc. against pests & rodents.

For scientific storage and preservation of your merchandise, please contact your nearest State Warehouse or West Bengal State Warehousing Corporation, 6A, Raja Subodh Mullick Square (4th floor), Calcutta-700 013, Phone Nos. 236-6060-62 & 236-5153.

নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের সার্বিক উন্নয়ন ২১ শতকের
মহাসড়কে যোগ্য পথিক পশ্চিমবঙ্গ

গঙ্গার পাড়ে মিলেনিয়াম পার্ক, কলকাতা

মেগাসিটি প্রকল্প

শহরের জঞ্জাল পুনর্ব্যবহারকরণ প্রকল্প

কোনা এক্সপ্রেসওয়ে

গঙ্গার দু'পাড়ের সৌন্দর্যকরণ

কলকাতা-হলদিয়া এক্সপ্রেসওয়ে

পূর্বাঞ্চলীয় এক্সপ্রেসওয়ে

পানাগড়-মেচেদা এক্সপ্রেসওয়ে

কলকাতা শহরে ৬টি নতুন উড়ালপুল

রাজ্যের কলকাতা সহ বড় শহরের সবুজায়ন

কাজের আনন্দে,
সাফল্যের ছন্দে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শুদ্ধ বাংলা

জানতে, লিখতে গেলেই পড়তে হবে

আকাদেমি

বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান

২য় সংস্করণ প্রকাশিত ১৬০

বাংলা ভাষা চর্চাকারীদের পক্ষে
অপরিহার্য গ্রন্থ। তিরিশ হাজারের উপর
শব্দের ব্যুৎপত্তিসংগত অর্থ সমন্বয় ও
ব্যাকরণগত তথ্য সমিবেশিত

প্রতিষ্ঠান

পরিভাষা প্রশাসন (৩য় সং) ২৫

বাংলা বাসানবিশি (৩য় সং) ৫

আকাদেমি বাসান অভিধান ৭০

সীততালি-বাংলা সমন্বয়

অভিধান ১০০ সুবিরাম দাস

সাহিত্যের শব্দার্থকোষ ৪০ সুবিরাম দাস

ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা ১৮ সুভাষ স্ট্রাচার

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

সংবাদ-সাময়িক পত্রে উল্লিখ শব্দের বাঙালি

সমাজ ২৫০ স্বপন বসু • শব্দকোষ-১৬০

অক্ষয়কুমার বসু • এই শব্দের বাঙালি ৬০

শব্দ ঘোষ • শব্দার্থকোষ আলোকচিত্রায় ৪০

অলোকচিত্রায় দাশগুপ্ত • লেখাচিত্রায়

করবালাতে ৪০ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় •

হাজার বছরের বাংলা কবিতা ৬০ অক্ষয়কুমার

সিকদার • ভাষার বসিরাস : কিছু প্রশ্ন ৪০

রমাশ্রীদাস দাস • বাঙালি কি আত্মজাতী ও

অন্যায় রচনা ৬০ বসন্তকুমার দাশগুপ্ত •

বনভ্রম বিবরণ ৪০ বীরেন্দ্রনাথ বার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রচনাসমগ্র

৬ষ্ঠ খণ্ড ১৬০ টাকা

৭ম খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে

সংকলন গ্রন্থ

রবীন্দ্র প্রশঙ্গ ১০০ অক্ষয়কুমার বসু সম্পাদিত • মিষ্টি ছড়া টাপুর ইপ্সর ৪০ • আকাশ প্রদীপ

১০০ শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত • মর্ত্যম বেঙ্গলি পোরোমস ৩০ লীলা রায় অনুদিত •

বেঙ্গলি লিটারেচার ৬০ অক্ষয়কুমার বসু ও লীলা রায় • প্রবন্ধ সংগ্রহ ৪৫ বনমূল

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা প্রাচ্যোদয়

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০

প্রাচ্যোদয়

বইঘর (কলকাতা ফিউ কফি হাউস এবং রবীন্দ্রসদন চত্বর), আকাদেমি ভাণ্ডার ১১৮ হেমচন্দ্র নন্দর
বোড, কুলবাগান বইঘর, পীনবন্ধ মন্ড, শিলিগুড়ি • ন্যাশনাল বুক এজেন্সি • সে বুক স্টোর
• উবা পাবলিশিং হাউস • নয়া উদ্যোগ • স্বকসাবিক যোগাযোগ :
ব্রহ্মদাস ২২০-৯৭৮ ০৫০-০৪০৭ ফ্যাক্স (০৩০) ২২০-০৯৪৬ ই-মেইল : bakademi@vsnl.com

আই সি এ-৭৭

আলোকিত হোক আগামী দিনের পথ

জাতীয় সমৃদ্ধি ও অর্থনীতির উত্তর হল বিদ্যুৎ। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার বরাবরই বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে বিদ্যুতে। শিল্প ও গার্হস্থ্য প্রয়োজন মেটাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে প্রতি বছরই। সম্প্রতি বহু প্রতীক্ষিত বক্সের তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে নির্ধারিত সময়ের আগেই। অষ্টম যোজনার শেষে বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে চালু হয়েছে ৬৩০ মেগাওয়াটের ৩টি ইউনিট। এছাড়াও সৌরশক্তিতে পশ্চিমবঙ্গ এখন প্রথম স্থানে। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে গঠন করা হয়েছে 'গ্রামীণ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম'। তৈরি হয়েছে 'বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন'।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ্য :

- বৈদেশিক সহযোগিতায় বক্সের প্রকল্পের ৪ ও নং ইউনিট চালু। খরচ ১৬২১ কোটি টাকা।
- বক্সের প্রকল্পের অধীনে জাপানি প্রযুক্তিতে গড়ে উঠবে ৩২টি সাব স্টেশন।
- ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি ইউনিট চালু হবে সাগরদীঘি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে।
- ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ইউনিট শুরু হয়ে বলাগড়ে।
- জাপানি কারিগরী সহযোগিতায় চালু হবে পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প (২২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি ইউনিট)। এই সব লক্ষ্য পূরণ হলে সুনিশ্চিত হবে রাজ্যে শিল্পের পুনর্জাগরণ ও গ্রামীণ সমৃদ্ধি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মানুষের কাছে, মানুষের সাথে ২৩ বছর ধরে মানুষের পাশে

রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে নানা মূলগত পরিবর্তন। সাধারণ মানুষকে পাশে নিয়ে এগিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে স্বায়ত্তশাসনের বাতাবরণ। শুধুমাত্র ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণই নয়, সরকার সাফল্য পেয়েছে ভূমি-সংস্কার, কৃষি, বিদ্যুৎ, শিক্ষাপ্রসার ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে। পরিবহন ও আবাসন প্রকল্পে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক উদ্যোগ। তা সত্ত্বেও আত্মতুষ্টির কোন স্থান নেই। চরৈবেতির মূল মন্ত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার বদ্ধপরিকর। দায়বদ্ধ সাধারণ মানুষের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

খড়দহ পুরসভা

খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা

“একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এষুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি—
ঘাতক সৈন্যে ডাকি
“মারো মারো” ওঠে হাঁকি।”

“যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়
অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ
হৃৎভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি
করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ
বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির
সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই
সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে
দেশকে বাঁচাতে পারে।”

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৌলবাদী ধর্মোক্ত সাম্প্রদায়িক শক্তির হাত থেকে দেশকে
বাঁচাতে আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অত্যন্ত জরুরী।
আসুন আমরা সকলে সে কাজে ব্রতী হই।

ব্রজ সাহা

পুরপ্রধান

খড়দহ পুরসভা

অগ্রগতির ২৩ বছর

সবার কাজে..

সবার মাঝে...

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার বিগত ২৩ বছরের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে রাজ্যের সমৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত ও সুস্থায়ী করেছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সরকারের যুগান্তকারী ভূমিকা প্রতিটি ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে সার্থকতার অনন্য নজির।

কৃষিজ ফলন, মৎস্য চাষ ও প্রাণীসম্পদ বিকাশে সর্বাঙ্গীন সাফল্য।
ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ভূমিসংস্কারে নজিরবিহীন সাফল্য
গ্রাম্য জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও লোকসৃষ্টির ধারাবাহিক বিকাশ
নগরায়ন ও আবাসনে গঠনমূলক প্রয়াস
পরিবেশ উন্নয়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ
আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের কল্যাণে সুসংহত কর্মসূচী
জাতীয় সংহতির লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় নিরলস কৃতিত্ব
শিক্ষা পুনর্গঠনে রাজ্যের অর্থনীতিতে সমৃদ্ধির জোয়ার
বিদ্যুৎ, সড়ক যোগাযোগ সহ প্রতিটি পরিকাঠামোয় পরিকল্পিত উন্নতি
জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে কার্যকরী ও যথাযথ
ভূমিকা
পর্যটন শিল্পের প্রসারে আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ

সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের প্রয়াস নিরন্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ-৭৭

পানিহাটীর সমস্ত জনগণের কাছে একটি ঘোষণা

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্য স্মৃতি বিজড়িত পানিহাটীর গঙ্গার পাড়ে ছাত্তুবাবুর বাগানবাড়ী “গোবিন্দকুমার হোম” এর সংস্কার প্রকল্পে পানিহাটী পৌরসভা, জেলাশাসক উত্তর ২৪ পরগনা এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ উদ্যোগ গ্রহন করেছে। প্রয়োজনীয় অর্থ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে এবং সংস্কারের কাজও শুরু হয়ে গেছে। শতাব্দী প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী ইমারত পানিহাটীর গৌরব বহন করে চলার পথে পানিহাটীর সকল মানুষের সহযোগিতা কামনা করি।

পানিহাটী পৌরসভা
পানিহাটী, উত্তর ২৪ পরগনা

শ্রীমনোরঞ্জন সরকার
পৌরপ্রধান

বালি পৌর প্রতিষ্ঠান
৫, গোস্বামী পাড়া রোড, বালি, হাওড়া

“এদেশে সম্প্রদায়ের অভাব নেই। এখনই
যথেষ্ট রহিয়াছে, আর ভবিষ্যতে অনেক হইবে,
সম্প্রদায় থাকুক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক”—
বিবেকানন্দ

অরুণাভ লাহিড়ী
উপ পৌরপ্রধান

কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা
পৌরপ্রধান

Space Donated by :

ARUN CHEMICALS

GANGANAGAR
24 PARGANAS (NORTH)

আগের চেয়ে আরও কাছে পর্যদ আপনার সেবায় আছে

ভাল আছে মন্দ আছে
ভাল মন্দ মিশিয়ে আছে
লোকের মনে ক্ষোভ আছে
কাজেও ভুল ভ্রান্তি আছে,
তবু সবার জন্য আছি
আমরা সবার কাছাকাছি
অভিযোগের জন্য আছি
ক্ষোভ উপশম করতে আছি,
গ্রাহক পরিষেবার তরে
আমরা যাবো ঘরে ঘরে
জন-অভিযোগ পেলে পরে
আমরা আছি সর্ব স্তরে।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ সদর কার্যালয়, সার্কেল ও ডিভিশন অফিসে
আপনার জন্য 'জন-অভিযোগ ও সহায়তা' কেন্দ্র খোলা হয়েছে।
গ্রাহক পরিষেবায় আমরা আপনার পাশে আছি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ

আমরা আর গরীব নই গো

“পঁচিশ বছর আগের কথা। শিবুর বাপ মরল। আমি শিবুর হাত ধরে গাছের তলায়। ঠাই নেই। চলে গেল একফালি ধানিজমিও, এভাবে চলল ক’বছর। তারপর এলো পঞ্চায়েতের লোকেরা, বলল, সরকার ধানিজমি দিচ্ছে। আমার শিবু তখন তেরো-চোদ্দয় পা দিয়েছে। ধানিজমি ফিরে পেয়ে মা বেটায় খুশিতে ডগমগ। শিবু লোন পেলো। কাজ পেলো। শিবুর বে হল। আমার নাতি এখন ইস্কুল যায়। এ বি সি ডি পড়ে। আমরা আর গরীব নই গো। সরকারের লোকেরা আমাদের বড্ড উপকার করেছে।...আহা, শিবুর বাপ যদি আজ বেঁচে থাকতো...”

পঞ্চমী দাসী

রাজচন্দ্রপুর, হাওড়া

মানুষের স্বার্থে,
মানুষের সঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

With Best Compliments From :

P. D. C. S.

(PROJECTED DESIGN & CONSULTANCY SERVICES)

ARCHITECT & CONSULTING ENGINEER

**74, JESSORE ROAD
CALCUTTA-74**

Space Donated by :

A WELL WISHER

Space Donated by :

A WELL WISHER

সম্পাদকীয়

‘পরিচয়’ পত্রিকার জনক, কবি ও প্রাবন্ধিক সূধীন্দ্রনাথ দত্ত-র জন্মশতক ২০০১ সাল। অথচ, প্রকৃত অর্থেই জীবনে ও সাহিত্যচর্যায়া তিনি উত্তরাধিকারহীন। এই একাকীত্ব এসেছে তাঁর বিপুল পঠন-পাঠন, গদ্য ও কবিতার মেধাবী ও সুদৃঢ় গঠনরীতি, শিল্পসৃষ্টির নামে সংকীর্ণনহীনতা, নিখিল নাস্তির সাধনা এবং পরিণামহীন উচ্চাভিলাষ থেকে। অথচ, মনন ও সৃষ্ণনের সমন্বয়ের অধোবায় সূধীন্দ্রনাথ প্রাণপাত করেছিলেন। আমাদের রুচিতারল্য, সহজসাধনের প্রবৃষ্টি এবং স্নায়ুপীড়িত-সাহিত্যবোধকে অশ্রদ্ধাদী পার করে সমর্থ মাটিতে দাঁড় করানোর জন্য তাঁর শ্রম ছিল তুলনারহিত। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই শোনা গিয়েছিল ‘সোহবাবদ’ কবিতায় তাঁর অভিব্যক্তি—

“যেহেতু প্রশয়ী আমি, তাই আজও নয় অপনীত

হিরন্ময় পাত্র, তথা দুনিরীক্ষ্য পূবার কারায়

স্বরটি স্বরূপ লুপ্ত; দেশ-কাল আমাতে হারায়,

অথচ অবিষ্ট তীর্থে, পলে পলে আমি অগণিত।।”

শিকায় ও অনুভবে একই সঙ্গে ক্লাসিক ও আধুনিক মানুষটিকে ধারণ করার বয়স্ক মানসিকতা, বেদনার কথা, সূধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর চল্লিশে বছর পরও আমাদের অর্জিত হয়নি। ফলত, সূধীন্দ্রিয় ডিক্শনেই ‘নিঃসন্তান’ রয়ে গেছেন তিনি। জীবনের শেষ পর্বে, কবিতা রচনায় পরিলুপ্তধৈর্য-ও।

বাংলা-সংস্কৃত, ইংরাজি, ফরাসি ও জার্মান-ভাষায় পারদম সূধীন্দ্রনাথ ‘পরিচয়’ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই পত্রিকাটিতে নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বিভিন্ন মতাদর্শী বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী সম্মানকে নিয়ে মুক্ত চিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিতর্কের পরিধিকে ইতিবাচক অর্থে সুবিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ-সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, “...বিলাতের ‘Criterion’ পত্রিকার ধরনে ‘পরিচয়’ একটা নতুন ধারা প্রবর্তন করছে। বাংলা রচনার তারল্য বর্জন করে গভীর কথা গভীর সুরে শোনার আয়োজন তাতে হচ্ছে, দ্রুত পরিবর্তমান দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞাতব্যকে দেশের মানুষের কাছে তথ্য ও চিন্তার সাহায্যে বিশ্লেষণের প্রয়ত্ন ঘটছে। এমনকি তখনল বহুল পরিমাণে অবহেলিত ও অপরিজ্ঞাত মার্কস তত্ত্বেরও অন্বেষণ ও বিচারের উদ্যোগ দেখা দিচ্ছে। দ্বিশের দশকে জগৎ জুড়ে এধরনের যে একটা আলোড়ন তারই প্রতিফলন যেন এখানে পড়েছিল।

আশ্চর্য নয় যে ‘পরিচয়’-গোষ্ঠীর অনেকেই মার্কসতত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহান্বিত না হলেও মুক্তমতিতর সন্ধানে প্রায় সবাই আকৃষ্ট ছিলেন বলেই দেখা গেল যে তৎকালীন বন্দীশিবিরে বহুসংখ্যক দেশতত্ত্ব যখন জেলখানাতেই নিজস্ব ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ খুলে কম্যুনিজম-এর শিক্ষা আত্মস্থ করতে উৎসুক হলেন, তখন ‘পরিচয়’ তাঁদের কাছে মহামূল্য পত্রিকা বলে স্বীকৃতি পেল।”

বোধ.ও বুদ্ধির প্রথর দীপ্তি বিবরবাসীদের চোখে চিরকালই অসহনীয়। ফলে, আত্মতোষ-বাস্তবী পাঠকদের অনেকেই সুদীর্ঘ-পরিকল্পিত ‘পরিচয়’-কে ‘অভিজ্ঞাত’ জ্ঞানে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। অভ্যাসে অভ্যাসে দীর্ঘ এই পাঠককূলের কাছে পত্রিকাটির অভিনবত্বকে গ্রহণ করা আদৌ সহজ হয়নি। ফলে, দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে প্রতিষ্ঠাতা মানুষটির চৈতন্যকে সময় ও সংস্কৃতির পালাবদলের সঙ্গে মিলিয়ে যে সদর্থক ও ইতিবাচক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম পরিচয়-সম্পাদনার কর্মীরা, তাঁদের ব্রত পালন খুব একটা সুখকর হয়ে ওঠেনি। সুদীর্ঘনাথের পরবর্তী কালে বাস্তবী মনীষার প্রসারতা বাড়লেও গভীরতা ও বিশ্ববীক্ষায় ক্রমাগতিক স্বল্পন ঘটেছে। অপরদিকে বেনিয়া সভ্যতার ঐতিহ্যহীন, শিকড়চ্যুত ভুবনায়নে এবং তাক-কঁকড়কে এক করে দেখানোর দুরভিসন্ধি গোটা দুনিয়ার সঙ্গে এ-দেশেও এমন সর্বনাশ চেহায়ায় আত্মপ্রকাশ করেছে, যাতে পরিচয় পত্রিকার সাম্প্রতিক অবস্থাও দাঁড়িয়েছে কবি বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়—“উন্মাদ জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ”। তবে, এই প্রতিকূলতার প্রবল ও ঝোড়ো বাতাসেও ‘পরিচয়’ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, মরে যায়নি, তার মূলে আছে সেই ঘাতসহ, উদার, মানবিক ধারাবাহিকতা, যার বীজ নিহিত ছিল সুদীর্ঘনাথ ও তাঁর সহযোগীদের মানসে।

অভাবতই, বর্তমান সংখ্যাটি সুদীর্ঘনাথ-সম্পাদিত ‘পরিচয়’-এর বিভিন্ন দিককে একালের পাঠকের সামনে তুলে ধরা, সেই কালপর্বের এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই নির্মিত হয়েছে। সংখ্যাটির প্রস্তুতির সময়ে এমন অনেক তথ্য ও দলিল পত্রিকা-কর্মীদের নিরন্তর অনুসন্ধানে প্রকাশ্য হয়েছে, যা প্রায় অগোচরেই ছিল। ফলে, সংখ্যাটির মূল পবিকল্পনারও কম-বেশি রূপান্তর ঘটেছে, প্রকাশের সময়সীমাও পিছিয়ে গেছে। আমাদের হাতে যা তথ্য এখন জড়ো হয়েছে, তার পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরতে গেলে এ-রকম তিনটে সংখ্যাতেও কুলোবে না। কিন্তু আমরা উপায়হীন। তাছাড়া বণিকসভার অকৃপণ-করুণা ‘পরিচয়’-এর ওপর কোনও দিনও বর্ষিত হয়নি। তবে, আমরা আশা রাখি, সুদীর্ঘশতক থেকে বাংলা সাহিত্যের যে সব নিষ্ঠাবান পাঠক ও কর্মী নতুনভাবে ঐ বহুমাত্রিক মানুষটির রচনা ও কর্মের

পাঠ ও সন্ধানের লিপ্ত হবেন, বর্তমান সংখ্যাটি সে-কাজে একটি নির্ভরযোগ্য
সহায়কের দায় পালন করতে পারবে।

সুধীক্ষসংখ্যার জন্য পরিচয় কোনও 'অতিথি-সম্পাদক'কে আহ্বান
করেনি। পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের প্রত্যেক কর্মীই এটির নির্মাণে
সাধ্যমত নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। তবে, সম্পাদক হিসেবে সম্পাদকীয়
বিভাগের অন্যতম সদস্য অমিয় ধর-এর আবেগদীপ্ত শ্রম, মেধাবী অন্বেষণ
এবং সার্বিক ও মহতী প্রয়াস-কে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাতেই হয়। কালের
পরিবর্তনে আমরা কেউ-ই থাকব না, তবু এই রক্ষণযোগ্য সংখ্যাটির
নিমিত্তিত্তে তাঁর অবদান অমরশীল থেকে যাবে। এ-প্রসঙ্গে বাসব সরকার ও
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের নিরন্তর প্রয়াসের কথা উল্লেখ না করা আমার পক্ষে
অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবেই গণ্য হবে।

এই আয়ত ও ব্যয়বহুল সংখ্যাটি প্রস্তুত করার জন্য যারা লেখা দিয়ে,
তথ্য সংগ্রহ করে এবং অন্যান্য উপায়ে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে
'পরিচয়'-এর তরফ থেকে সাধুবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই বিজ্ঞাপনদাতাদের।
'পরিচয়' তার শুভাকাঙ্ক্ষী পাঠকদের এষণা-র যোগ্য হয়ে উঠুক। বাংলা
সংস্কৃতি সুধীক্ষনাথের 'অধিষ্ঠ'-কে খুঁজে পাক।

অমিতাভ দাশগুপ্ত
সম্পাদক, পরিচয়

কৃতজ্ঞতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শতবর্ষ সংখ্যা প্রকাশে অনেকের সাহায্য-সহযোগিতা আমরা পেয়েছি, তাঁদের সকলের কাছে 'পরিচয়'-এর সম্পাদকমণ্ডলী কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে 'হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন'-এর অধ্যক্ষ ড. মিহির ভট্টাচার্য সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পাণ্ডুলিপি ও তাঁর সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার জেরাজ কপি দেখার ও ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে আমাদের বাধিত করেছে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ ড. স্বপন মজুমদারের অকুপণ সহযোগিতার কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ড. অমিয় দেব লেখা দিয়ে, বই-পত্র দিয়ে, তাঁর সংকলিত 'পরিচয়'-এর রচনা তালিকা ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের প্রতি অতুলনীয় সৌহার্দ্য প্রকাশ করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

'নিউজ লেটার' (স্কুল অব উইমিন্স্ স্টাডিজ, যাদবপুর)-এর সহযোগী সম্পাদক শ্রীঅভিজিৎ সেন, 'র্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট' সংস্থার পক্ষে শ্রীকানাই পাল, 'ভবানী সেন স্মৃতি গ্রন্থাগারের' কর্মাধ্যক্ষ শ্রীঅরুণ ঘোষ, 'লিটল ম্যাগাজিন' লাইব্রেরীর শ্রীসমীপ দত্ত, 'ঐকতান-গবেষণা পরিষদ'-এর সম্পাদক শ্রীনীতীশ বিশ্বাস, প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীনিরঞ্জন হালদার, শ্রীকমল সমাজদার ও শ্রীমতী জোনাকি ঘোষ রায়-এর সহযোগিতার কথাও আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। এছাড়া 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ', 'রামমোহন লাইব্রেরী' ও 'চৈতন্য লাইব্রেরী'র কর্তৃপক্ষের কাছেও আমরা ঋণী।

সম্পাদকমণ্ডলী

পরিচয়

পরিচয়

নভেম্বর-জানুয়ারি ২০০১

কার্তিক-পৌষ ১৪০৭

১০-১২ সংখ্যা ৭০. বর্ষ

এক. মূল্যায়ন : একালের

সম্ভারবি ও সুধীন্দ্রনাথ—সম্রোদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
অসম্ভব শাস্ত্র স্মরণ?—শম্ভু ঘোষ	১৩
এক শতাব্দী দুই কবি—অক্ষকুমার সিকদার	২৩
প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথ : সাহিত্যের গোয়ালে	
ব্যাসকৃষ্ণের চর্চিতচর্চণ?—তপোধীর ভট্টাচার্য	৪১
মিথ-পুরাণ : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়—শুভকর ঘোষ	৫৬
সুধীন্দ্রনাথের ‘জাগ্রত চেতন’ : সমীকর আধার থেকে	
অভীকার নিঃসঙ্গতা—কেকা ঘটক	৭২
প্রসঙ্গ সংবর্ত : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ব্যক্তি ও বিশ্ব	
—হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যশৈলী—উদয়কুমার চক্রবর্তী	৯৪
সুধীন্দ্রনাথের ‘গোধূলি জগৎ’—শিবনারায়ণ রায়	১১৪
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়—নিরঞ্জন হালদার	১১৮
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যভাষা : একটি নান্দনিক আশ্বাদন	
—বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়	১৩৩
হে শব্দ-অঙ্গুরী—পার্বপ্রতিম কুণ্ডু	১৪২

দুই. ব্যক্তিদৃষ্টিতে সুধীন্দ্রনাথ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : পুনশ্চ—অন্নদাশঙ্কর রায়	১৫১
সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা—অমিয় দেব	১৫৩
চিঠির আয়নায় সুধীন্দ্রনাথ—সুরজিৎ দাঁশগুপ্ত	১৬৬
‘বস্’—বাসব সরকার	১৮২

তিন. মূল্যায়ন : সুধীন্দ্রনাথের সমকালের

পত্রাঙ্গাপ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯৯
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও নাস্তিবাদ—মণীন্দ্র রায়	২০৬

দশমী : পুস্তক আলোচনা—বিমল ভৌমিক	২১৯
অর্কেষ্টা—শ্রেমেন্দ্র মিত্র	২২৮
জন্মদাসী—সমর সেন	২৩১
চার. সুধীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য	
সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়	২৩৭
চিঠিপত্র	২৪৪
পাণ্ডুলিপি	২৪৯
রবীন্দ্রনাথ	২৬৯
মনুষ্যধর্ম	২৭৫
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পুস্তক আলোচনা	২৯০
সম্পাদকী	৩০৭
ইংরাজী রচনা	৩১১
বাংলাদেশে রক্ষণশীলতা, প্রগতিবাদ ও ঐতিহ্যদূষণ	৩৩২
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য	৩৪১
পাঁচ. পরিচয় ও সুধীন্দ্রনাথ	
১ম সংখ্যা ও আরও তিনটি সংখ্যার প্রচ্ছদ	৩৫৯
অভিনব ত্রৈমাসিক পত্রিকা	৩৬৩
পরিচয় ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—অমিয় ধর	৩৬৫
১ম সংখ্যার ভূমিকা	৩৭৯
পরিচয়ের জন্মকথা—গিরিজাপতি ভট্টাচার্য	৩৮১
শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও পরিচয় (সম্পাদকীয়)	
—হিরণকুমার সান্যাল	৩৮৪
পরিচয়ের কাহিনী—হিরণকুমার সান্যাল	৩৮৬
পরিচয়ের ৪৫ বছর—গোপাল হালদার	৩৯০
পরিচয়ের দিনগুলি—কুন্দভূষণ ভাদুড়ী	৩৯৪
পরিচয় প্রসঙ্গে—অম্বদাশঙ্কর রায়	৩৯৯
পরিচয়ের সুবর্ণজয়ন্তি—সুশোভন সরকার	৪০১
সৃষ্টির আত্মজ্ঞান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪০৩
ছয়. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পরিচয়-এর রচনাপঞ্জী	
পরিচয়-এর প্রথম বার বছরের সূচী	৪০৭

প্রচ্ছদ : যুধাঙ্গিং সেনগুপ্ত

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক
বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

কর্মাদ্যক্ষ
পার্বপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী
ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী পরমেশ আচার্য
শুভ বসু অমিয় ধর

উপদেশকমণ্ডলী
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

পার্বপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক বোম্ব প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯এইচ/এইচ. গোয়াবাগান
স্ট্রীট, কোলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড,
কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

আবেদন

ক্রমবর্ধমান কাগজের দাম ও ছাপার খরচ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৬০ টাকাই রেখেছি। বর্তমানে বছরে ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হলেও মোট আয়তন আগের চেয়ে বেশি হচ্ছে এবং নিউজ প্রিন্টের বদলে সাদা কাগজ ও লেটার প্রেসের বদলে অফসেটে ছাপতে গিয়ে ছাপা খরচও অনেক বেড়েছে। তাই বাধ্য হয়ে বর্তমান গ্রাহক চাঁদা

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৮০ টাকা
সডাক ১০০ টাকা

কর্মাধ্যক্ষ
পরিচয়



মুন্সায়ন : একালের

সঙ্ঘ্যারবি ও সুধীক্ষনাথ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুধীক্ষের লেখা 'দুরাহ' এই অমূল জনাপবাদের সুর চড়বার অনেক আগেই সুধীক্ষ-রবীক্ষের বৌদ্ধিক মনন গ্রন্থি 'পরিচয়'কে ধরে, অথবা তারও আগে, 'তথী'-র পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের সময় থেকে দুজন আধুনিক ব্যক্তির শুদ্ধ সম্পর্কে রূপান্তরিত হচ্ছিল। রবীক্ষনাথ-সুধীক্ষনাথের সম্পর্কের তুলনা এমন কি আমাদের পুরাণেও মিলবে না—মহান আচার্যের অতীব সুযোগ্য শিষ্যের মহাভারতীয় উপমানের মধ্যে এ সম্পর্কের অনেকাংশ গূঢ়তার সাদৃশ্য নেই। 'নির্মম' এই বিশেষণটিকে প্রচলিত অর্থের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শব্দটিকে প্রকৃত অর্থে পুনর্বাসনের পর তাকে রবীক্ষনাথের কবিতা সম্বন্ধে প্রথম কাজে লাগান সুধীক্ষনাথ। আমরা—অন্তত আমি এই বিষয়কর বিশেষণের পুনরর্থসন্ধারের আলোকে রবীক্ষনাথকে নতুন করে দেখতে পাই। এবং সুধীক্ষনাথকেও। কেননা একথা তো সত্য যে, একজন বড়ো কবির পূর্বগামী কবির কবিকৃতি বিশ্লেষণ কতকাংশে তাঁর নিজেরও কবিস্বরূপের নিহিত প্রতিচ্ছায়ায় দীপিত হতে বাধ্য। সুধীক্ষনাথের প্রথম কবিতার বই 'তথী'-র পাণ্ডুলিপিতে রবীক্ষনাথের সংশোধনী হস্তক্ষেপকে সুধীক্ষনাথই আমন্ত্রণ করেছিলেন। যে-রবীক্ষনাথ এমনকি শিক্ষাদানকার্যেও শিক্ষার্থীকে শিক্ষকসাপেক্ষতা থেকে মুক্ত করে তাকে স্বয়ংস্বর করে তুলতে চাইতেন, সে—রবীক্ষনাথ যে পাণ্ডুলিপির ন্যূনতম রদবদলের কাজেও সুধীক্ষনাথের বিম্ব পরিমাণ রবীক্ষীকরণ করতে চাইবেন না এটাই অনুমেয়। পক্ষান্তরে সুধীক্ষনাথও যখন 'আকাশ প্রদীপ'-এর রসগ্রাহী ব্যাখ্যায় অগসর হন তখন তিনি রবীক্ষনাথকে সমগ্র দেখতে চান। তখনকার সবে চালু হওয়া খুচরো আধুনিক বাটখাড়া দিয়ে রবীক্ষবিচার তাঁর ধাতে ছিল না।

রবীক্ষনাথকে লেখা পত্রে ১১ জুলাই ১৯২৮ সুধীক্ষনাথের যে বিনয় ও বৈদম্ব্যের মণিকাঞ্চনপ্রতিম সমন্বয় আমরা লক্ষ্য করি তাতে আমাদের সানন্দ বিষ্ময় অবশ্যই উদ্গোচিত হয়। বিষ্ময়ের কারণটি উপভোগ্য। একদিকে রবীক্ষনাথ—বিশ্বখ্যাতিতে তিনি তখন খ-মধ্যে, অপরদিকে দিব্যপ্রতিভ এক মনবীম্বক—বিশ্বগ্রাহী কৌতূহল বীর প্রধান অস্তিত্ব। রবীক্ষনাথ 'তথী'কে অভ্যর্থনা করেছিলেন। 'তথী' সম্বন্ধে রবীক্ষনাথের

পদ্মোক্তি কেবল মাত্র 'মহতের লীলা' বলে পরিগণিত হতে পারে না। তবীর অর্ধশৃঙ্গট মুকুলিত আভাসে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন এর ভাবী সাবয়ব সমগ্রতার শৈল্পিক বিভা। তা নইলে তিনি লিখতেন না— 'তোমার কবিতাগুলি হঠাৎ আমার মনটাকে বাংলামুখো করে দিলে। চলেছিলুম একেবারে উন্টোদিকে। ভালো লাগল। ছন্দে ভাষায় ব্যঞ্জনায় বেশ জমট হয়েছে। আমার কাছে ঋণ স্বীকার করে তুমি অসামান্যতা দেখিয়েছ। একেবারেই সাহস করতে না যদি ঋণটা বাইরের জিনিস না হোত। কাব্যে তোমার একান্ত স্বকীয়তা আর সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে প্রকাশ পেয়েছে। তোমার কবিতা যেখান থেকেই তার গয়না নিক না রূপ তো তারই—নিজের চেহারা বন্ধক রেখে সে কিছুই ধার নেয়নি।' এ চিঠি থেকে দুটি কথা বিশেষ অনুধাবনীয়। এক, গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথের কবিতার ভিতরের ব্যাপারটির দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েছিলেন। দুই, জায়মান নবত্বকে অভ্যর্থনা জানাতে তাঁর বিধা হয়নি। ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'সাহিত্যে নবত্ব'। তাতে নিজের তৎকালীন ক্ষীয়মান সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি ছিল। বাংলা আধুনিক কবিদের সঙ্গে ভাবসন্ধি তাঁর তখনো জমট বাঁধেনি— কিন্তু যেটুকু পরিচয় পেয়েছেন তা তাঁকে উচ্চকিত করেছে এ কথাও তিনি বলেছেন। সাক্ষ্য কবিচ্ছায়ায় অমিয় চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্রনাথ কী ভাবে ধীরে ধীরে নিজ নিজ নক্ষত্রদীপ্তিকে স্বতন্ত্র করে তুলছিলেন সে আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। কিন্তু আন্তরঋণ ও বহিঃঋণের প্রশ্ন যদি ওঠেই তার কিছুটা মীমাংসা এখানে আলগোছেই ধরা যায়। মাঝারি কবির কাছে ঋণ কেবল ঋণই থেকে যায়। তখনি তিনি প্রভাবিত কবিমাত্র। কিন্তু যে কবি স্বয়ম্ভর হতে চান, তাঁর কাছে ভিতরে বা বাহিরে ঋণ বলে কিছু নেই—যা আছে তাকে বলা যায় পরিগ্রহণ। রবীন্দ্রনাথের বিশাল মহাজনী কারবারের কাছে হাত পাতেন নি এমন কবি অবশ্য দুর্লভ। তিনি যথার্থ কবি যিনি সেই পরিগ্রহণকে, সেই ঋণকে নতুন লভ্যাংশ আদায়ের কাছে জাগাতে পারেন। এই পরিগ্রহণের ভিতর দিয়ে সচেতন কবি উত্তরসূরী হিসাবে মহান পূর্বসূরীর পিতৃপ্রতিমাকে পুনঃ সংস্থাপিত করেন না, নিজেই আরেকটি প্রতিমা গড়ে তোলেন। সে প্রতিমায় পূর্ব প্রতিমার ছায়া হয়তো দুর্লক্ষ্য-নয়, কিন্তু সন্দেহমাত্র থাকে না তার নবত্বে, তার স্বাতন্ত্র্যে। রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার মধ্যে আনুগত্য সন্ধান আমাদের অভিপ্রেত হতেই পারে না—দুই কবির চিৎপ্রকৃতি ও রূপায়ণকলার প্রভূত ব্যবধানের জন্যই তা সম্ভব নয়। তথাপি আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের 'হবি' এবং সুধীন্দ্রনাথের 'শাস্বতী'

কবিতা দুটিকে একটু কাছাকাছি রেখে দেখতে চাই, তাহলে দেখি দুটি কবিতার মূল ভাব প্রেমিকান্মুতি—দুটি কবিতাতে শেষ কথা বিস্মৃতিকে অস্বীকার। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছেন ‘আজি তাই শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল’ তার আগেই তাঁর আনন্দস্মৃতির অমরত্ব এই কল্পনায় মূর্ত হয়েছে :

মরি মরি, সে আনন্দ ধেমে যেত যদি

এই নদী

হারাত তরঙ্গ বেগ,

এই মেঘ

মুছিয়া ফেলিত তার সোনার সিন্ধন।

তোমার চিকন

চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত

তবে

একদিন কবে

চঞ্চল পবনে জীলায়িত

মর্মর-মুখর ছায়া মাধবী বনের

হত স্বপনের।

কোনো সন্দেহ নেই রবীন্দ্রনাথের মহাজীবন-চেতনাতে তাঁর আন্তরিকের শিকড়। কোনো সন্দেহ সেই শিকড় থেকে রসগ্রহণে সময়ই সুধীন্দ্রনাথের প্রতিবন্ধক। তথাপি বিচ্ছেদকে জয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বললেন, আর বিচ্ছেদের অভিঘাতে পরাজয়কে উপেক্ষা করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ যা বললেন তাদের মধ্যে অন্তর্মিল লক্ষণীয় :

মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে

অনামা কুসুম অজ্ঞানায় ওঠে মেতে।

ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,

অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে;

অমল আকাশে মুকুরিত তাঁর হাদি

দিব্য শিশিরে তারই স্বেদ অভিষেকে।

স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি সম;

সে রোমরাজির কোমলতা ঘাসে-ঘাসে।

‘ছবি’ কবিতা ও ‘শাস্ত্রী’ কবিতার অন্তর্গঠন ও বাইরের প্রকরণের পার্থক্যের মধ্যেও সুধীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের পরস্পর সংস্পর্শ। সুধীন্দ্রনাথের আধুনিকতা ঐতিহ্যবাহিত—অথচ তা ‘আত্মকীয়তা’ অর্জনে ধন্য।

‘আত্মকীয়তা’ শব্দটি রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে ব্যবহার

করেছিলেন। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতেও আনি আত্মকীয়তা পড়ে পাওয়া ব্যাপার নয়। তা অর্জনসাপেক্ষ। তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ ‘অর্কেষ্টার’র পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে আর সুধীন্দ্রনাথের একথা বলার প্রয়োজন হয় না ‘রবীন্দ্রনাথের স্বর্ণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ বলে ধরে নেওয়া প্রায় নিরাপদ।’ এ কথা তিনি বলেছিলেন ‘তম্বী’ কাব্যগ্রন্থটির মুখবন্ধে। অবশ্যই এটা বিনয়। কেননা ‘তম্বী’র মধ্যে পূর্ণাঙ্গিনীর আভাস পরিদৃশ্যমান না হলে রবীন্দ্রনাথ এই তরুণ কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেন না। আপন স্বাতন্ত্র্য চর্চা করতে করতে সুধীন্দ্রনাথ যখন অর্কেষ্টায় পৌঁছলেন তখন দেখা গেল আর এমন কি রবীন্দ্রনাথ কৃত সংশোধনীরও কোন অপেক্ষা তিনি করলেন না। এই অনপেক্ষতায় রবীন্দ্র-সুধীন্দ্র সম্পর্কে যে কোনো ক্ষীণ ছায়াও ফেলেনি তার প্রমাণ ‘আকাশ প্রদীপ’-এর উৎসর্গ পত্র। অর্কেষ্টার প্রকাশকাল ১৯৩৫—আকাশপ্রদীপের ১৯৩৯। আকাশ প্রদীপের উৎসর্গে সুধীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি তবু তোমাদের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্ত প্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি। তাই আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।

‘এমনতরো অস্বীকৃতি’ এই বাক্যাংশে রবীন্দ্রনাথের অন্যসঙ্গে আত্মতত্ত্বের প্রতিফলিত আনন্দ অনুমেয়। ‘তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো’—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানতে চান আকাশপ্রদীপ কতখানি আধুনিক মানসভোগ্য হবে। সুধীন্দ্রনাথ ‘আকাশপ্রদীপ’ পেয়ে আনন্দোচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন—সে তো স্বাভাবিক—কিন্তু সজাগ অবহিত মনেই তিনি আকাশপ্রদীপকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই স্বাধীন অবধানতা আকাশ প্রদীপের পূর্বে ‘বীথিকা’ আত্মদানের কালেই জাগ্রত। সুধীন্দ্রনাথের স্থাপত্যকল্প কাব্যসৌন্দর্য তখন নির্মীমাংস, রবীন্দ্রনাথের নদীপ্রতিম চলিবৃত্তের নৈসর্গিক মহিমায় সুধীন্দ্রনাথ তখন বিস্মিত, কিন্তু অভিভূত নন। তাই বীথিকা পড়ে তিনি বলেন ‘আপনার প্রত্যেক পুস্তকই চরমোৎকর্ষের চূড়ান্তে পৌঁছয়, এবং প্রত্যেকবারই আপনি সে-পরাকাষ্ঠাকে গজব্যরূপে দেখতে অসম্মত হন। এইখানেই আপনার সঙ্গে অন্যান্য মহাকবিদের প্রভেদ।’ আরো বলেছিলেন ‘আপনার পরিণতিবাদ বৈপ্লবিক চেয়েও অনন্ত ও নিরন্তর স্বসমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।’ আগেই বলেছি ন-

চ্যাংড়া ছাড়া, বোষি ও রসগ্রহে সমন্বিত সস্তা যে-কোনো ব্যক্তি রবীন্দ্রকীর্তির সম্মুখে বিস্ময় অনুভব না করে পারবেন না। সুধীন্দ্রনাথও পারেননি—কিন্তু তিনি অনভিজ্ঞ, তাই প্রশ্ন তোলেন ‘গদ্য পদ্যের সেতুবন্ধ করতে গিয়েও পয়ারের প্রথমপর্বকে কি তিন দুই তিন ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। অস্ত্রত আমার সনাতনী কান এইরকম বিভাগে হোঁচট খায়,’—বারো মাত্রার পংক্তিগুলিকেও সুধীন্দ্রনাথ ছাড়পত্র দিতে নারাজ। নিরস্তর ভাঙচুরে ক্রিয়াশীল রবীন্দ্রনাথ গদ্যপদ্যের সেতুবন্ধন অপেক্ষা এখানে আগ্রহী ছিলেন পয়ারের—মিশ্রবৃত্তের সনাতনী বাধ্যক্রমকে ডিঙিয়ে যেতে—এও এক নিরীক্ষণ।

কবিতায় নৈর্ব্যক্তিকতা সুধীন্দ্রনাথের অদ্বিষ্ট। তাই তিনি যখন ‘আকাশ প্রদীপ’ হাতে পেলেন, তখন ‘আকাশ প্রদীপ’কে ঘিরে তাঁর রসগ্রাহী প্রতিক্রিয়া আরো সিদ্ধান্তবাচক। তিনি বলেন—‘বীথিকার সমপাংক্ষেয় কবিতাগুলির চেয়ে আকাশপ্রদীপ যে বেশি নৈর্ব্যক্তিক, এমন কি বেশি নির্মম, তা বোধহয় নিঃসন্দেহ।’ (২৪ এপ্রিল, ১৯৩৯)

সুধীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রানুভূতির একটি দিক এখানে লক্ষণীয়। আকাশপ্রদীপের কয়েকটি কবিতা যথা যাত্রাপথ, ধ্বনি, বেজিং, যাত্রা, ঢাকিরা ঢাক বাজায় প্রভৃতি কবিতায় ‘আমাদের অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা যে-ভাষা পেয়েছে, তার সমকক্ষ সাগর পারেও দুর্লভ।’ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক আদর্শের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা—তথাপি যে সুধীন্দ্রনাথের বিচারে আধুনিক আর বহিরাঙ্গী সমার্থবাচক, তিনি কেন আকাশপ্রদীপ পড়ে (২৫ এপ্রিল, ১৯৩৯) একথা বললেন, ‘আশা হয় আকাশপ্রদীপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধিত হলে বাঙালী লেখকেরাও হয়তো আধুনিকতার অর্থ ধরতে পারবে। (এ)—এর ব্যাখ্যা হয়তো এখানে—‘তুচ্ছাতুচ্ছ ঘটনা বা বিষয় বা উপকরণের সাহায্যে মহৎ কবিতা আপনি আগেও অনেক লিখেছেন। কিন্তু সর্বত্রই আপনার চেষ্টা ছিল ভঙ্গুরের মধ্যে হাফিদের, সীমার মধ্যে অসীমের, বিষের মধ্যে অমৃতের আবিষ্কার। এ-বইয়ে সে চেষ্টার একান্ত অভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথাকথিত আধুনিকদের কোনো বৈশিষ্ট্যই অবশিষ্ট রইলো না।’ ‘তথাকথিত’ শব্দটিতে আধুনিকতার ফেসিয়ানদূরন্ত ফাসাডকে কঠিন কটাক্ষ। তারপরেই সুধীন্দ্রনাথের মোক্ষম উক্তি—‘অবশ্য আধুনিকতার সাক্ষাৎ—এমন কি নকল আধুনিকতার সাক্ষাৎ বাংলা দেশে অজ্ঞাত-অজ্ঞ অবশি পাইনি।’

যে আধুনিকতার কথা রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ অবতরণ করেছিলেন ১৯২৮-এ সে আধুনিকতার ব্যাখ্যা এইরূপঃ

আমার মনে হয় কাব্যের প্রধান অঙ্গ lyricism নয়, intellectualism

এবং এতেই বিভিন্ন মনের আত্মকীয়তার প্রকাশ। কাব্যে intellectualism আনতে হলে প্রাধান্য দিতে হবে চিন্তাকে।

তিনি আরো বলেছিলেন—‘কবিতা চিন্তার বাহক মাত্র, চালক নয়।’ ‘চিন্তার এই গুণ থেকেই ঘটনের উৎপত্তি।’ সেই ১৯২৮ সালে আপন কবি জীবনের প্রবেশ তোরণে দাঁড়িয়ে নিজ কবিত্ব-সংজ্ঞা সুধীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করলেন এই ভাষায়;

ভাব শুধু মেঘ বাঁশী প্রিয়া বিরহ মিলন ইত্যাদি ছুরাজীর্ণ শব্দের করতলগত নয়, তার লোলুপ হাত দর্শন বিজ্ঞানের দিকেও আস্তে আস্তে প্রসারিত হচ্ছে। আজকের এই ‘বিশেষ জ্ঞানে’র দিনে কাব্যের তরফ থেকে আমি পাঠকের কাছে সেই নিবিষ্ট অনুশীলন তিস্তা করি, যেটা সাধারণত অর্পিত হয় অন্যান্য আর্টের প্রতি।

কিন্তু অন্য ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের কাছেই মিলে যায় একই দিনাঙ্কে লেখা একটি চিঠিতে এরই উদ্ভব :

‘ইন্টেলেক্টের ইট সাজিয়ে তুমি যদি কাব্যরূপ গড়তে যাও তবে সেই সৃষ্টিতে প্রত্যেক ইট ঠিক আপন পরিমাণটির চেয়ে আর কিছু দিতে পারে না। কিন্তু সজীব গাছের প্রত্যেক অংশই আপনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে—তার মধ্যে সৃষ্টির মায়া আছে যাতে করে সেই অংশগুলি সমগ্রকে সহজেই স্বীকার করে। কাব্যরূপের কথাগুলির প্রত্যেকটাই যদি রূপবান হয় তবে সমস্ত রূপটিকেই অংশে অংশে পাওয়া যায়। একেই বলে সৃষ্টি। ...মানুষের মধ্যে যে লোকটা বুদ্ধিমান তার দাবীর দিকে না তাকিয়ে যে লোকটা রসবিলাসী তাকে খুশি করবার চেষ্টা করো।’

এই দুটি পত্রাংশের পাশাপাশি উপস্থাপনায় আমরা যতটা রবীন্দ্রনাথকে পাই, ততটাই সুধীন্দ্রনাথকে। বুঝতে পারি আমাদের সাহিত্যে আধুনিকতার প্রথম প্রবক্তা ও ভাষ্যকার সুধীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধ যুক্তি জ্বালেও টলাতে পারেননি রবীন্দ্রনাথকে—বোধ হয় তা বাঞ্ছনীয়ও ছিল না। সুধীন্দ্রনাথ যাই বলুন ‘বেজি’ কবিতায় পরে এত বিতর্ক সত্ত্বেও আমরা শাস্ত রবীন্দ্রনাথকেই পাই, ‘আধুনিক’ রবীন্দ্রনাথের জন্য বায়না ধরি না। কিন্তু আমাদের একবার দেখে নিতে হবে আধুনিক কবি বলতে সুধীন্দ্রনাথের ধারণা আমাদের কাছে আজও কেন স্বীকার্য। টেনিসনীয় ব্যর্থতার ব্যাখ্যা কালে তিনি বলেছিলেন—‘কবির কর্তব্য তার প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতায় একটা পরম উপলব্ধির মাল্যরচনা। কবির উদ্দেশ্য—তার চারপাশের অবিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ। কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উন্মোচন।’ সে কারণেই সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও দেখি মহাকাশের খণ্ড

সীমানা অতিক্রমের জন্য রবীন্দ্রপ্রয়াস কখনো স্তিমিত হয়ে যায়নি। কোথায় ‘রবীন্দ্রনাথের ক্রমপরিণামী গতির উৎস—সে প্রশ্নের উত্তর বোধ হয়—বৈরাগ্যে এবং পরিগ্রহণে। সুধীন্দ্রনাথ ‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থটির আলোচনাকালে আমাদের অনুমেয় এই উত্তরটিকে সমৃদ্ধ করেছেন এই ভাষায়—“ছেলেবেলা”-নায়কবিহীন যুগটিজ্জ’। সুধীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বলেই আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে শুনি—‘এতকাল সাহিত্যের মরমী সংজ্ঞা আমার মনে ধরেনি। কিন্তু “ছেলেবেলা” পড়ে অবধি অন্য কোনো আশ্চর্য মনে আসছে না। হয়তো সাধকেরাই ঠিক বলেছেন; সম্পূর্ণ নিরাসক্ত না হলে আসক্তির মর্মে পৌঁছনো যায় না; আত্মত্যাগই আত্মোপলব্ধির অনন্য পন্থা।’ পরিণামী ডায়ালেস্টিকের বিবর্তনেই সম্ভব হয়েছে ‘ছেলেবেলা’-র গদ্যশিল্প।

বাংলা কবিতার কালান্তরের প্রবেশ তোরণে পা রেখেই আমাদের প্রথম আধুনিক কবি এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে জ্ঞানতে জ্ঞানতে উত্তর আধুনিকতার আভাস দিলেন।

এই পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে জ্ঞানতে জ্ঞানতে বুঝতে চেয়েছেন প্রণিপাতেন—কিন্তু এর পর তাঁর রবীন্দ্রভাবনায় পরিপ্রশ্নের বর্ধিত মাত্রা প্রদান হয়ে উঠবে। সে ক্ষেত্রে আমরা দু’ একটা ব্যাপার লক্ষ্য না করে পারি না। তিনিই প্রথম এই মোক্ষম এবং অশ্রান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন—সমগ্র অভিব্যক্তির বিস্তারেই তিনি এখনও অস্থিতীয়। কিন্তু সেই অভিব্যক্তির বিস্তারের বিচারে তিনি কবিতার প্রবাহিনী নদী কূলে কূলেই বিচরণ করেছেন। উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটক নামে মাত্র স্পৃষ্ট। আমি এখনো বুঝতে পারি না কেন তাঁর বিবেচনায় রাবীন্দ্রিক নাট্যপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা “মুক্তধারা”—তে, বুঝতে পারি না তিনি যদি বা ধরেবাইরের নিখিলেশ সন্দীপের, যোগাযোগের মধুসূদন বিপ্রদাসের প্রসঙ্গ তুললেন, ‘গোরা’ কেন অনুশ্রেণিত—কেন তাঁর মনে হয়েছিল ‘বিশুদ্ধ কল্পনায়’ “সোমের প্রতি তারা” “বিদায় অভিশাপ”—এর চেয়ে উৎকৃষ্ট হোক বা না হোক, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রথম বীরাজনা দেবানীর চেয়ে অনেক বেশী বিশ্বাস্য। এবং তিনি যখন বলেছিলেন “ধ্রুতির পরিশোধ”—ই বোধ হয় নির্দোষ অথচ রসোত্তীর্ণ অমিত্রাক্ষরের প্রথম দৃষ্টান্ত তখন আমরা তড়িৎস্পৃষ্ট হই, কিন্তু আলোকিত হই না। কিন্তু এসব তুচ্ছ প্রশ্ন বৃষ্টি শেষ পর্যন্ত নিরর্থক। কেননা এসব প্রশ্নে সুধীন্দ্রনাথের রবীন্দ্র কবিকৃতি বিচার মোটেই গৌণ হয়ে যায় না। সুধীন্দ্রনাথ যে-সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছিলেন—‘রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ পরিচয় না জানলে, আধুনিকেরা নিজেদেরও চিনতে পারবে না’—যে সিদ্ধান্ত

আজও কার্যকর রয়েছে। সেই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বমনস্ক এবং প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতিবান যুবক ঠিকই বুঝেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ অনুবাদের সংকট কোথায়। বুঝেই বলেছিলেন—‘রবীন্দ্রনাথের বাংলা এক অভিনব ভাষা, তার আঙঠে-পুঙঠে তাঁর সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপের মুদ্রা, এবং তদ্ব্যতিরেকে তাঁকে বুঝতে চাওয়া মরুচারীকে নৌবিদ্যা শেখানোর চেয়েও হাস্যকর’। রবীন্দ্রনাথের মনোমুকুরে স্বদেশের মানচিত্র ফুটেছিল নিশ্চয়, কিন্তু আসল কথাটা হল সে মানচিত্র কোনো অংশেই তাঁর মনগড়া নয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিস্বরূপ দেশাত্মবোধী হয়েই বিশ্বাত্মবোধী। তাঁর নিয়ত টেকনিক সাধনার মূল রহস্য এখানেই। একবার যদি আমরা দুই শতাব্দির দুই দশকবির বহুল পার্থক্যের মধ্যেও সাধারণ ধর্মটি পলকে স্মরণ করি তাহলে বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা উপকৃত হই হবো। টেকনিকের প্রতি, শব্দ সন্নিবেশের প্রতি অসামান্য মনোনিবেশ সঙ্গেও দুজনেই পরিণামী প্রভা বিকীরণ থেকে বিরত হয়েছেন। বুঝিবা বিষয় ও বিষয়ীর দৃষ্টান্ত অল্প সাধনা তাঁদের আকর্ষণ করল না। মধুসূদনের কবি ভাষা তাঁর মহাকাব্যের নায়কের রাজসভার মতোই নানাদিক থেকে আহরিত মণিমাণিক্য মরুততে মুক্ত সুসজ্জিত। কিন্তু তা খোদিত প্রস্তর ভাস্কর্য—তাতে আমরা ঢেউ আশা করতে পারি না। পক্ষান্তরে সুধীন্দ্রনাথের পদ্য ভাষা—গদ্য ভাষাই বা নয় কেন—প্রজ্ঞা এবং মননের বিশ্বক্ষেত্র থেকে চয়ন করেছে শ্রুতের নিশ্চল নিশ্চয়তা, তা নির্ভুল, কিন্তু সেই সঙ্গে অধিকাংশ স্থলে নিঃসঙ্কেতও বটে। মধুসূদন বা সুধীন্দ্রনাথ কেউই অবশ্য দূরত্বের সাধনায় মাতেন নি। কিন্তু মধুসূদনের অতুল কীর্তির মধ্যেও দেখা যায়, কবিতার চরণ থেকে নিগড় সরিয়ে নিয়ে তার সর্বাস্থে পরালেন অলঙ্কারের ঐশ্বর্য। ফলে সে সরস্বতী জন্ম হতে পারলেন না, মহরত্ন তিনি প্রায় হয়ে উঠেছেন গজেন্দ্রগামিনী। ঠিক একই কারণে সুধীন্দ্রনাথের পদ্য ভাষা এবং গদ্য ভাষা এমনই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিম্বানী যে তা ভবিষ্যৎপ্রজন্ম প্রভাবী হল না। মধুসূদনকে অনুসরণ করতে গিয়ে হেমচন্দ্র ও নবীন সেন হাস্যকর—সুধীন্দ্রনাথ আবার এমনই, তাঁকে নিয়ে ক্যারিকেচার করবার মতো মনীষাও মাথা ঝুঁড়লে মিলবে না। পক্ষান্তরে কবিতায় এবং গদ্যে বুদ্ধদেব বসু মুদ্রাদোষ সমেত কতখানি উত্তরকালস্পর্শী তা নিয়ে আলাদা প্রবন্ধই লেখা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ কতখানি আধুনিক? একালের কবিদের কাছে সুধীন্দ্রনাথ তার অপ্রাপ্ত উত্তর দিয়েছেন। যে যাঁর নিজের আধুনিকতার এবং উত্তর আধুনিকতাকে সেই উত্তরের দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখতে পারেন।

আবাল্য রবীন্দ্রনাথ কাব্যকে মুক্তির বিজ্ঞান পথে তাড়িয়ে বেড়িয়েছেন। বিহারীলালের হাত থেকে মাত্ৰাবৃত্তকে তুলে নিয়ে, তাকে নতুন নুপুর পরিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন তার লীলা হয়ে উঠল সভঙ্গিম, দেখা গেল সে আর হৌচটের ভয়ে সত্তর্পিত সঙ্কোচে পদক্ষেপ গুণছে না। ‘মানসী’তেই রবীন্দ্রনাথ অমরত্ব কিনে নিয়েছেন—তা কিন্তু কেবল ছন্দের জন্য নয়। সুধীন্দ্রনাথ বলেননি কিন্তু তাঁর ভাব্যসূত্র থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি ‘মানসী’তে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বিবিক্তি মাঝে মাঝেই দেশকালপাত্রের টানে বিচিত্র হয়েছে। ‘মানসী’ থেকে ‘কল্পনা’ কাব্যার্থে যত বিশ্ময়কর হোক না কেন ‘ক্ষণিকা’তে আমাদের চমকে যেতে হয়। ‘মুক্তির বিজ্ঞান পথ’ এই বাক্যাংশে সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত ‘বিজ্ঞান’ বিশেষণটি তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের যাত্রা পথে সঙ্গী কেউ নেই—অনুসারী ছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু ‘ক্ষণিকা’ যতই মধ্যমপির গৌরব দাবি করুক, ‘ক্ষণিকা’-ও তো রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চিত করতে পারে না। বস্তুত চূড়ায় পৌঁছেও রবীন্দ্রনাথ নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন না—ততক্ষণে তিনি পেয়ে গেছেন দুর্গাহ চূড়ান্তরের ডাক। এই ডাক শোনা ও সাড়া দেওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর ব্যক্তিজীবন, তাঁর স্বদেশ-স্বকাল, তাঁর বিশ্বমনস্কতা। এই ডাক শোনা ও সাড়া দেওয়ার রেখাচিহ্নের মধ্যে আছে কবিজীবনের যথার্থ রহস্য। সুধীন্দ্রনাথের অসামান্য এবং অন্যত্র দুর্লভ কৃতিত্ব এইখানে তিনি কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনী। ‘বলাকা’-র উদ্বর্গ বিহার, ‘পলাতকা’-য় সংসার মুক্তিকায় ফিরে আসা—যার আভাস আমরা পেয়েছিলাম ‘বলাকা’র ৪১ সংখ্যক (‘যে কথা বলিতে চাই/বলা হয় নাই’) কবিতায়। ‘পলাতকা’ থেকে ‘পরিশেষ’ ও ‘পুনশ্চ’ পর্যায় কালের মাপে অনেক দূর নয়, কিন্তু বিরহের মতো আত্মসম্বিতের বিকাশে ও বিবর্তনে বৎসরে কি কালের বিচার হয়। সুধীন্দ্রনাথ নিজ কবি প্রতিভার আলোকে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের সজীব চলিষ্ণু সন্তোকে অনুধাবন করেছিলেন—‘রবীন্দ্র প্রতিভার অত্যাশ্চর্য গুণ হচ্ছে তাঁর প্রশালীর অদ্ভুত অহৈর্ষ, তাঁর অশেষ পরিবর্তন ও অনবতুল বৃদ্ধি।’ তুলনা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতার চঞ্চলা নদীতেই—‘যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই’—মমত্ব বর্জন বৈরাগীর লক্ষণ, পূর্ব সংস্কার বর্জন মহাকবির লক্ষণ—কিন্তু তিনি বাণপ্রস্থে যান না—প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর বারবার সমুদ্রাভিযান। ইতিহাসের নিয়মে একদিন যদি বা অন্তর্হিত রবীন্দ্রনাথের জন্য আমরা মাথামুড় খুঁড়ব না, ‘রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যের আমূল উচ্ছেদেই আগন্তুক নববিধান-বৃহত্তম সংস্কার মহত্তম

মঙ্গল সাধবে' একধায় সায় দিয়েও আমরা জানি :—

‘পক্ষান্তরে সে-দিনেও রবীন্দ্র রচনাবলীর সাহিত্যিক মূল্য তিলাধ কমবে না; তখনকার বিদগ্ধেরাও একবাক্যে মানবে যে, কি গদ্যে, কি পদ্যে, এতখানি রসকৈবল্যে খুব কম লেখকই পৌছাতে পেরেছে; এবং সময়ের গতি যেহেতু সামান্য থেকে বিশেষের দিকে, তাই ভাবী পণ্ডিতেরা যেমন অগত্যা তাঁর সর্বতোভ্রম সৃজনী প্রতিভার গুণ গাইবে, তেমনই অনাগত চিত্রকরেরা ঈর্ষান্বিত চোখে দেখবে তাঁর আলোশ্যশিল্পের অশিক্ষিত পটুত্ব। তাছাড়া ভবিষ্যৎ নিসর্গবিলাসীরা তাঁর স্বভাবোক্তিতে শুনবে বঙ্গভীর মর্মবাণী; আগামী ঐতিহাসিকেরা তাঁর ছোটোগল্পে প্রত্যক্ষ করবে বাঙালী স্ত্রী-পুরুষের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ তথা আচার-ব্যবহার; এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের মন্দারমালায় ফুটে থাকবে বঙ্গীয় চিত্রপ্রকর্ষের অনেকাত্ত সঙ্গতি।’

আমার সমবয়সীরা অনেকে হয়ত আমারই মতো একদা সদ্য উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি মুখস্থ বলতে পারতেন। তবু একটা প্রশ্ন জাগে। সুধীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রজিজ্ঞাসায় স্ববিরোধ কোথায়? যে ব্যক্তি নিজেই আত্মমুখ্যবাদী বলে চিহ্নিত করেন, রবীন্দ্রনাথ, তাঁর স্বীকারোক্তি মোতাবেক, তাঁর কাছেও ‘কাব্যের আনন্দময় স্বরূপ সম্বন্ধে অদ্বিতীয় দীক্ষাগুরু।’ দুঃখ-আনন্দের রবীন্দ্রভাষ্যের কথা এখানে ওঠে না। দুঃখ লাঞ্ছিত গত শতাব্দে ক্রমবর্ধমান আত্মসম্মিতের অভিজ্ঞান নিয়ে একজন প্রধান আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্ত্ববনে, তাঁর অসাধারণ শিল্পকৃতির মধ্যে খুঁজেছিলেন আধুনিকতার হৃদিস। রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের শৈল্পিক সমগ্রতার স্বীকৃতি রয়েছে পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে। বিষয় এবং প্রকাশের গূঢ় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কতখানি আত্মমুখ্য অবহিত তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রসৃষ্টির বিভিন্ন অধ্যায়কে ধরে। তাঁর সেই কবিত্ত্বসম্ভব গভীর ব্যাখ্যা আমাদের কাছে শিক্ষাপ্রদ বলেই সবিনয়ে নিবেদন করি ‘লিপিকা’-র গোত্র নির্ণয়ে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন ছিল না কি? ‘লিপিকা’ কতখানি গদ্য, কতখানি কাব্য এ প্রশ্নের সমীচীনতাকে মেনেও এ কথা তো বলতেই হবে ‘লিপিকা’-র শিল্প স্বাতন্ত্র্যই আসল কথা। সঙ্গ্য কতখানি দিন, কতখানি রাত্রি? সে দিনের শেষটুকু মাত্র নয়, রাতের আরম্ভটুকুও নয়, সে মাত্র সঙ্গ্য।’ ‘লিপিকা’-তে সম্ভর্পিত বিষয় নির্বাচনের প্রসঙ্গ যে অন্য ওঠে না। ‘ক্ষুধিত পাষণ’-এর ভাষায় ‘লিপিকা’ লেখা যেত না—এমন কি ‘জীবনস্মৃতি’র ভাষাতে লেখা যেত না ‘ছেলেবেলা’—এখানেই রবীন্দ্রনাথের বিষয় এবং অভিব্যক্তির অদ্বয় সম্পর্ক সম্বন্ধে অবধানতা। সুধীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেন ‘ছেলেবেলা’র গদ্য গদ্যাভীত হবার

জন্য একটুও ব্যস্ত নয়। অঞ্চ তাতে অগভীরতা নেই। বরঞ্চ আছে এক নৈব্যক্তিকতা—ফলে জীবনস্মৃতি পড়ার পরেও ‘ছেলেবেলা’ আমাদের কাছে নতুন বই—একেবারে আনকোরা নতুন বই। বইটা ধরলেই আমরা টের পাই এ বই দূরত্বের প্রেক্ষণী ব্যবহার করে জীবনস্মৃতির পুনর্ব্যবহার নয়। তুলনা করছি না, তবু ‘ছেলেবেলা’-কে বোধ হয় রাখা চলে টমাসমানের ক্ষুদ্রকায় আত্মজীবনীর সঙ্গে।

মধুসূদন এবং সুধীক্ষনাথের—দুই শতকীয় দত্ত কবির কবিতায় রূপবন্ধচর্চার ইতিহাস অবিস্মরণীয়। এঁরা নিছ নিছ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে বাংলা পদ্যভাষাকে পলিমাটির কোমলতার হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। মোহিতলালের অনবদ্য উক্তি অনুসরণে বলতে পারি, এঁরা দুজনে বাগদেবীকে দেখতে চান নি মঞ্জীর বিলাসিনীরূপে। কমবেশি দুজনেই সরস্বতীকে শাড়ি ছাড়িয়ে বনেট পরিয়ে জঙ্গমা করতে চেয়েছেন—বলছি না জোর করে নাক বিধিয়ে তাদের মুখে বাঙালি ভাব ফোটাতে চেয়েছেন। এখানেই রবীক্ষনাথ আমাদের শিক্ষাদাতা—আমাদের পিতা (কথাটি সুধীক্ষনাথের)। তিনি বাংলাভাষার স্বভাব ও প্রকৃতিকে কৃত্রিমতার হাত থেকে বাঁচালেন, হৃদকে বাঁচালেন আড়ম্বৃত্য থেকে। সুধীক্ষনাথের মতো সাবালক পুত্র সে পিতৃঋণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এই ভাষায়—‘তঁার ঐতিহ্যবোধের মূলমন্ত্র ছিল উত্তরাধিকারের সাদর অঙ্গীকারে পুরুষকারের নিরন্তর চক্রবৃদ্ধি।’ আধুনিকতার হট্টগোলে আধুনিকতাকে মেনেনা—উত্তরাধিকারকে উপেক্ষা যে করে সে আধুনিক নয়, অর্বাচীন। এই বোধকে সঞ্চারিত করার কাজে একদিন পিতা পুত্র এক যোগে এই ‘পরিচয়’-এ ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলা কবিতার পুরোয়ারী প্রতিভা সকলেই তাঁদের চলিঞ্চ সন্ধ্যায় সত্যত সেই বোধের স্বাক্ষর। রবীক্ষনাথের ‘বেজি’ এবং সুধীক্ষনাথের ‘কুকুট’ কবিতার মধ্যে তুলনা করতে গেলে তা তুলনাবিলাস হয়ে যাবে। তবু একবার যদি দুটি কবিতার রূপ পাশাপাশি রাখি তাহলে বিষয় ও প্রকাশের অদ্বয় সীলাকে ছাড়িয়ে একটা ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে। একটিতে পাই তন্মাত্রতা, তন্মিষ্ঠতা, অপরাটিতে পাই বিশ্বগ্রাহী মানসতা। রূপ দুটিরই মূল লক্ষ্য। রবীক্ষনাথের সুধীক্ষনাথকে লেখা চিঠিতে পাই—‘রূপসৃষ্টিই আর্ট—যে রূপের মধ্যে আমি একান্তভাবে অহেতুক ঔৎসুক্যের সঙ্গে reality কে দেখি।’ সত্যের উপলব্ধিরূপে। এই অহেতুক ঔৎসুক্যই নিরাসক্তে রূপাবলোকন—নির্মোহের রূপরচনা। মধুর সৌন্দর্য দিয়ে সুধীক্ষনাথ মন ভোলাতে চাননি—অঞ্চ স্পর্ষিত আধুনিকতার তারস্বরও তার নয়। তাই সুধীক্ষনাথকে রবীক্ষনাথ অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন।

‘পরিচয়’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের চৌত্রিশটি লেখা নবীন পথিকের সম্পাদনার প্রতি ঔদার্যমাত্র নয়। ওই পত্রে ওই সম্পাদকের কাছে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন আধুনিককালের আহ্বান। কোনখানে প্রবীণ ও তরুণ এই দুই কবির মিল সে দিকে বারেক দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্তমান আলোচনায় ছেদ টানছি। সুধীন্দ্রনাথ প্রকরণের দুসাহসায় দুই মহায়ুদ্ধের মধ্যবর্তী বাঙালী মধ্যবিস্তার চিহ্নিত ক্ষুদ্রতায় আঘাত হানতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ চলিষ্ঠ তরঙ্গে তখনো নতুন নতুন ‘দিগন্ত’ খুলে দিচ্ছেন। রূপের সাধনা সুধীন্দ্রনাথেরও, রসের সাধনা রবীন্দ্রনাথের—কিন্তু রূপকে ছাড়িয়ে বা কেলে রেখে নয়।

সুধীন্দ্রনাথের রবীন্দ্র বিচার পড়ে আমাদের মনে হবেই—রবীন্দ্রনাথ শেষ রোমান্টিক কবি যতখানি, প্রথম আধুনিক ঠিক ততখানি। ‘পরিচয়’ পত্রেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার তত্ত্বগ্রহণের প্রধান নিমিতি। একথা ইতিহাসসম্মত—এ ভূমিকায় ‘পরিচয়’-এর গৌরব।

অসম্ভব শাস্ত্রত স্মরণ?

শব্দ বোঝ

কবিতার পাঠক যে খুব বেশি তা নয়। অল্পকজন সেই পাঠকেরও মধ্যে আবার নানারকমের রুচি, নানারকমের গোত্রভাগ। এসব গোত্র যে কবিতাপড়ারই মধ্য দিয়ে স্বভাবত গড়ে ওঠে, এমন কথা সবসময়ে বলা যায় না। চারপাশের আবহ থেকে অনেকে চালিত হন, বিজ্ঞাপন বা প্রচারেরও ভূমিকা থাকে অনেকখানি, জেনে বা না-জেনে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন অনেকে। কিন্তু যেভাবেই হোক, নানারকম রুচি যখন থাকবেই পাঠকদের মধ্যে, একজনের সঙ্গে অন্যজনের পছন্দ না-মিলবার সম্ভাবনা যখন থাকবেই, তখন আমার প্রিয় কোনো কবির রচনায় অন্য আরেকজন যদি খুশি না হন, তাতে অবাক হওয়া সাজে না।

এতটা বুঝেও, বছরেকের আগে অবাকই হয়েছিলাম যখন তরুণ একজন কবি এসে জানাজেন একদিন, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা কোথাও তাঁকে স্পর্শ করে না। কয়েকবার পড়বার চেষ্টা করে তিনি দেখেছেন, কিন্তু তৈরি করে তুলতে পারেননি কোনো-রকম ভালো-সাগার বোধ।

দেশবিশেষের কবিতা পড়বার অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা এর আছে, নিজেও লেখেন ভালো, উৎকর্ষা আছে জীবনকে বুঝে নেবার জন্য, কবিতাকে বুঝে পাবার জন্য। আজকের দিনের এ-রকম একজন পাঠককে যে এভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন সুধীন্দ্রনাথ, এর মানে কী? অসুবিধে কি এ-কবিতার নৈয়ায়িকতায়? দুর্য্যোগতায়? রাজনীতিতে?

কোনো-কোনো কবি থাকেন, সাহিত্যে যাঁরা কোনো-একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা সাজ করে যান, পরবর্তী কাল তাঁদের মনে রাখে কেবল সেই ইতিহাসের প্রয়োজনে। অন্যদিকে, কোনো-কোনো কবি প্রবাহিত হয়ে চলেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। কালগত অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেই কবি নতুন সময়ের মর্মে মর্মে বলতে থাকেন অনেক কথা, যেন সমকালীন কথা।

তেন্ন কোনো-কথাই কি বলেন না আর সুধীন্দ্রনাথ? তাঁর কবিতা কি অনেকেরই কাছে স্তব্ধ হয়ে গেছে তবে? সেই তরুণকে দেবার মতো কিছুই কি তাঁর বাকি পড়ে নেই কোথাও?

সে-বিচারটা অবশ্য তাঁকেই করতে হবে, সেই কবিকেই। আমরা নিজেদের কাছে প্রস্তুত তুলতে পারি অন্যভাবে। পঞ্চাশ বছর আগে আমরা

যারা তরুণ ছিলাম, আমরা কীভাবে পড়েছিলাম সুধীন্দ্রনাথের কবিতা? সে-
কবিতা কীভাবে স্পর্শ করেছিল আমাদের তারুণ্যকে? করেছিল কি কিছুমাত্র?

২

কবিতার বই খুব সুন্দর ছিল না তখন, আমরা যখন নতুন কবিতা পড়তে শুরু করেছি। কখনো অনেক দোকান ঘুরে, কখনো কলেজ স্ট্রিটের রেসিং থেকে, কখনো-বা এর-ওর কাছে খবর পেয়ে এক-একখানা বই তখন হাতে পাওয়া যেত কোনো-রকমে। সুধীন্দ্রনাথ তখন লিখছেনই না কিছু, সেই ঊনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ সালে, কেউ খুব কম লিখলে আমাদের এক কবি-বন্ধু বলতে শুরু করেছেন ‘আপনি কি তবে সুধীন্দ্রনাথ হতে চান?’ তাঁর ‘অর্কেস্ট্রা’-‘ট্রান্সমিটার’ নাম শুনেছি শুধু, কিন্তু তখনও চোখে দেখিনি সেসব বই। হাতে প্রথম এসে পৌছল তাঁর চতুর্থ কবিতার বই ‘উত্তরফাঙ্গুই’। এক হিসেবে হয়তো ভালোই হলো সেটা। পাওয়া গেল আমাদের তখনকার মেজাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল ফুরফুরে কিছু লেখা, কিছু-বা হাইনের হালকা লেখার স্বাদে :

ভালো কি তবে বেসেছি তারে আমি?

বিচ্ছিন্ন হিয়া শিহরে তাই ভয়ে?

কিংবা

আমারে তুমি ভালোবাসো না বলে

দুঃখ আমি অবশ্যই পাই

কিন্তু তাতে বিষাদই শুধু আছে

তা ছাড়া কোনো যাতনা, জ্বালা নাই।

কিন্তু এর অল্প পরেই, সিগনেট প্রেসের প্রকল্পনায়, হাতে এসে পৌছতে লাগল সুশোভন কবিতার বইগুলি : বিষ্ণু দে-র, জীবনানন্দের, সুধীন্দ্রনাথের। ছাপা হলো ‘অর্কেস্ট্রা’র নতুন সংস্করণ, পাওয়া গেল সম্পূর্ণ নতুন কবিতার বই ‘সংবর্ত’। কোনো কবির সঙ্গে কোনো কবির মিল নেই, এক কবিতায় যা পাওয়া যায় অন্য কবিতায় তা নেই, এক কবিতায় যা নেই অন্য কবিতায় তা আছে। সবাইকে মিলিয়ে নিয়ে পাওয়া যায় জীবনের এক মোজাইক নকশা, সবারই কবিতা পড়ছি আমরা দিনরাত্রি, যে-কোনো সময়ে, সুধীন্দ্রনাথের ‘অর্কেস্ট্রা’ আর ‘সংবর্ত’ও তখন আমাদের সঙ্গী। অসুস্থ কোনো বন্ধুর পাশে বসে পড়ে শোনাচ্ছি : ‘একদা এমনই বাদ্যশেষের রাতে/মনে হয় যেন শত জনমের আগে/সে এসে সহসা হাত রেখেছিল হাতে/ঠেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে’। আমরাও তখন প্রথম প্রশ্নী, আমরাও দাঁড়িয়ে

আছি ‘একটি কণার বিধা ধরোধরো চূড়ে’, সে-আবেগ থেকে এ-কবিতায় আমাদের হুঁয়ে যাচ্ছে তার ‘ফসলবিলাসী হাড়িয়া’, কিংবা আমাদের মনের মধ্যে কেবলই তৈরি হয়ে উঠছে গোপন সেই শপথ ‘সে ভুলে ভুলুক, কোটি মনস্তরে/ আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।’ সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে বিকেলবেলার ফুটপাথে পসরা সাজিয়ে বসেছে কোনো অভাবলাঞ্ছিত বন্ধু, আর সেইসঙ্গে সহচর হিসেবে আছে কয়েকখানা কবিতার বই। বহমান পথিকদের কানে চমক লাগিয়ে সরবে সে পড়ে চলেছে : ‘নিবে গেল দীপাবলী; অকস্মাৎ অস্ফুট শুঙ্খন/স্তব্ধ হল প্রেক্ষাগারে’। পথে বসে দীর্ঘ সেই ‘অর্কেষ্ট্রা’ কবিতাটি আবৃত্তি করে চলেছে সে শেষ পর্যন্ত, সবটা যে বুঝতে পারছে তা নয়, কিন্তু নানা ছন্দের বিভ্রমে তার মধ্যে কোনো একটা প্রশয়-নাটকের পর্ব-পর্বান্তর অনুভব করছে, আর তারই থেকে হঠাৎ ঝাপট দিয়ে উঠছে এমন একটা-দুটো লাইন :

মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা

যাতনা, শুধুই যাতনা সুচির সাধী।

এ-উচ্চারণে প্রশ্নই পাচ্ছে তার যৌবন, যে-যৌবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এক মৃত্যু-আকাজকা, যেখানে আশার মধ্যে কাঁপতে থাকে অর্ধই নিরাশা, বাস্তবহীন শূন্যতায় যেখানে কেবলই মনে হয় ‘বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী’। বিরূপ বিশ্বকে আমাদের চারপাশে একটু একটু করে দেখতে পাচ্ছি আমরা, সন্ধ্যাবেলায় ছোটো একটা-পার্কে-বসে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় কজন বন্ধুর সামনে পড়া হয়ে চলেছে সম্পূর্ণ ‘সংবর্ত’ কবিতাটি, ব্যক্তির ভালোবাসার সঙ্গে পরতে-পরতে সেখানে মিলে গিয়েছে বিস্তারিত সমকাল, ‘মৃত স্পেন শ্রিয়মাণ চীন/কবর ফরাসীদেশ’, আর তারই সঙ্গে থাকে দিয়ে ছুড়ে যাচ্ছে : ‘সে এখনও বেঁচে আছে কি না/তা সুদ্ধ জানি না’র মতো আকস্মিক ব্যক্তিগত সুর। বই বন্ধ করে, চুপচাপ পথ হেঁটে, ফিরে যাই আমরা নিজের নিজের ডেরায়, সেই সুর সঙ্গে নিয়ে।

৩

বিবেচনা দিয়ে, সুধীন্দ্রনাথের লেখা আমরা প্রথম পছন্দ করেছিলাম এক ভিন্ন কারণে। আমাদের টান ছিল এর বাচনসংহতির জন্য। সেই সংহতির সঙ্গে একটা চাতুর্যও অবশ্য ছিল, ছিল একটা খেলাচ্ছল, অল্প বয়সে মন ভোলাবার পক্ষে সেটাও নিশ্চয় অনেকখানি। দ্বিতীয় সংস্করণ ‘অর্কেষ্ট্রা’র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নিজের দূরত্ব বোঝাবার জন্য সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : তিনি সূর্য, উদয়াস্ত নির্বিকার : আমি অন্ধকারে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি;

সদগতির আগেই হয়তো তমসায় আবার তলাব।' আমরাও যেহেতু অন্ধকারে বদ্ধমূল, আমরাও যেহেতু আলোর দিকে উঠতে চাই, একধায় আমরা নিজেদেরই স্বরের প্রতিধ্বনি তাই শুনছিলাম। কিন্তু সেইসঙ্গে, চমৎকৃত লাগছিল 'তলাব' শব্দের আচম্কা ওই ব্যবহারে, 'নির্বিকার' শব্দের অনেকান্ত ব্যঞ্জনায়, মাটির ভিতর থেকে উঠে এসে ভেঙে পড়বার লতায়িত ওই ছবিতে। বিস্তর শব্দ ব্যবহার করেও তেমন-কোনো কথা না বলবার অভিপ্রেত ভাবে থাকে আমাদের মুখের ভাষা, লেখারও ভাষা। আমাদের ব্যবহারে ভাষা যেন অনেকখানি আলগা হয়ে আছে, মজ্জাহীন; তার একটা বাঁধুনি চাই, আর সে-কাছে সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া চাই আমাদের ফ্রিয়াপদের প্রয়োগের উপর, এইরকম তখন ভাবতে শুরু করেছি। সেই ভাবনাই প্রশ্ন পেলে সুধীন্দ্রনাথের এই বিবরণে যে 'উড়ে চলে গেছে' শব্দবন্ধকে 'উজ্জীত'-এ পাঙ্গটে নিতে সাতদিন তাঁর সময় লেগেছে। কথাটা শুনে সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছিলেন, এ প্রবণতা চলতে থাকলে কবিতালেশখই বন্ধ হয়ে যাবে তাঁর। কিন্তু আমরা তখন ভাবছিলাম প্রতিরোধী এই প্রবণতার অন্তত সাময়িক একটা দাম আছে। এলিয়ে-পড়া কবিতাশরীরে একটা দৃঢ়তার লাভ্য এনে দেবার কাছে এই প্রবণতার দরকার ছিল সেদিন। গদ্যে কিংবা পদ্যে, সুধীন্দ্রনাথ যে অতিপ্রয়োগ করেন এ-প্রবণতার, তাতে অবশ্য সন্দেহ ছিল না তখনও, 'বৈদেহী বিচিরা আচ্ছি সংকুচিত শিশিরসন্ধ্যায়/প্রচারিল আচম্বিতে অধরার অহেতু আকৃতি'র মতো ছন্দসম্ভার নিয়ে ইষৎ কৌতুক করেছি আমরাও। 'স্বগত'র ভূমিকায় যে সূচনাবাক্য, আমাদেরও তাতে একেবারে সায় ছিল না তা নয় : 'বদ্ধমহলে আমার লেখা দুর্বোধ্য বলে নির্দিশ'। কিন্তু এ-দুর্বোধ্যতা গদ্যে যত, কবিতায় তত নয় বলেই মনে হতো আমাদের, 'বৈদেহী বিচিরা'র মতো লাইনগুলিকে অগ্রাহ্য করলেও আমাদের ভিতরে ভিতরে টান দিত ঠাসবুনোটের অনেক অনেক উচ্চারণ, অল্প আয়োজনে কথা বলবার অনেক হাঁচ : 'সৃষ্টির রহস্যমাত্র আলিঙ্গন, পুনরাঙ্গিঙ্গন' 'আমার স্বতন্ত্র সজা হতে থাকে ক্রমাগত ক্ষয়' 'সে-অনাম চিরসত্তা খুঁজি আমি নিজের অতলে' 'মৃত্যুর মঞ্জীর নীরবে শোনা যায়, শূন্যে মিশে যায় অঙ্গ' 'ভিড়ে মিশে আমি ভেসে যাব একা একা'। বাংলা কবিতার ইতিহাসে ছন্দে ছন্দে প্রবাহিত হয়ে যাবার যে সাবলীলতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, সুধীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই তাকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এইসব একক-পঙক্তির ঘনতায়।

সংহতি বা ঘনতার এই আয়োজন নিছক একটা বাইরের আভরণ হিসেবেই আসেনি সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়। ব্যাংগত আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য তাঁর দরকার হয়েছিল এক আপাত-নৈর্ব্যক্তিক বাঁধের। পুরোনো

দিনের রুদ্ধতা থেকে কবিতা কীভাবে মুক্তি পাবে, এ নিয়ে যখন তাত্ত্বিক স্তরে ভাবেন তিনি, তখন তাঁর মনে হয় ‘আর্টে ব্যক্তিবাদ অচল’, তখন, এলিয়ট-অনুসরণে তিনি ঘোষণা করেন ‘ব্যক্তি যখন বিশ্বমানবের মধ্যে নিঃশেষে ডুবে যায়, তখনই পিঞ্জরিত ব্যক্তিব্যরূপ পায় মুক্তি’। ‘উনিশ-শতকী ব্যক্তিবাদের বিপরীতে সুধীন্দ্রনাথ চান ‘নৈর্ব্যক্তিক কাব্যের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যকে’।

কিন্তু এসব কথা যখন বলছেন তিনি, সেই উনিশশো-তিরিশের এপারে-ওপারে, কতটা নৈর্ব্যক্তিক ছিল তাঁর নিজের কবিতা? ব্যক্তির বাইরে আর কীই-বা ছিল ‘অর্কেস্ট্রা’য়, ‘উত্তরফাছুনী’তে? তাঁর সমকালীন অন্য কোনো কবিরই লেখায় একেবারে নিজস্ব ব্যক্তিগত ইতিহাস এতদূর নাটকীয়তায় দেখা দেয়নি, এতদূর প্রত্যক্ষতায়, তাঁর নিজের কবিতায় যেমন। ‘অর্কেস্ট্রা’ নামের কবিতাটিতে পাঠক-সমালোচকেরা সিম্ফনিক-সংগতি খুঁজে দেখবার চেষ্টা করেননি বসে আক্ষেপ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ, নিজেই খানিকটা বোঝাতে হয়েছে সাত অংশে বিন্যস্ত সেই কবিতার ধাপগুলি। সাতটি অংশেই তিনভাগের পরম্পরায় আছে ‘রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য, শ্রাব্য ঐকতানের অতিশ্রুতি ব্যঞ্জনা, আর শ্রোতৃবিশেষের সমবায়ী ভাবানুযজ’। এই শ্রেষষ্ঠ ভাবানুযজের মধ্য দিয়ে, শ্রোতৃবিশেষের স্মৃতি-উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে, যে প্রশ্ন-নাট্যটিকে আমরা পেয়ে যাই, ‘অর্কেস্ট্রা’ বা ‘উত্তরফাছুনী’র অন্য কবিতাগুলিতেও তো ছড়িয়ে আছে তারই টুকরো টুকরো ছবি। বিদেশিনী কোনো নারীর সঙ্গে (‘কুস্তলে তব শরৎসাঁঝের স্বাক্ষি;/পাকা দ্রাক্ষার মদির কান্তি অঙ্গে’) মিলন হলো, দুজনে হয়ে উঠলেন যেন ‘প্রলয়রাতের শেষ বনিতা-স্বামী’, খেলাচ্ছলে প্রশয়িনীকে জিজ্ঞেস করা হলো ‘তোমার প্রেমে নই কি আমি প্রথম আগন্তক?’ তা’য়ে নয়, প্রশয়ী তা জানালেন, এবং জানবার প্রথম অভিধাতেই মনে হলো ‘একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের ‘পরে’। মনে হলো ‘অন্তমিত বিধির আমি ভুল’। আর তারপর, এই প্রানিবোধ থেকে অঙ্গে অঙ্গে নিজেকে তীর্ণ করে নেওয়া, ‘চিনেছি চিরমানবী তুমি, পাবন তব করুণা’, আর তখন ‘আসে তথাগতি তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে’। অর্কেস্ট্রা শেষ, রঙ্গালয়ের বাদ্যসমবায় বন্ধ হয়ে যায়, পাশেবসা প্রেমিকপ্রেমিকা ‘চলে গেছে অমৃতসংকতে’, উত্তরঙ্গ স্কন্ধ হাহাকারে ভরে থাকে শুধু কবিকথকের মন।

। এই যে কাহিনী, কিংবা এই যে নাটক, এ তো আগাগোড়াই ছড়ানো আছে ও-দুটি কবিতার বইতে। তখনই মনে হয় শাস্ত্রের নিষ্ফল সন্ধানে ফিরে কোনো লাভ নেই আর, কেবল ‘ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে’, তখন কেবলই একাধিক কবিতায় ভেসে আসে ‘সন্তুষ্টিপূর্ণপারের’

নারকেলবনের স্মৃতি ('পশুশ্রম', 'মূর্তিপূজা' বা 'মহাশ্বেতা'য় যেমন), 'আমার বিদেশী নাম বাধে তব অবাধ্য জিহ্বায়', তখন কেবলই মনে পড়ে 'বলেছিলে অকপটে, হে জীলাসসিনী/আপনার অতীত কাহিনী'। একথা যদিও বলেন কখনো কখনো 'অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাস্ত ত স্মরণ', তবু 'চাই চাই আচ্ছও চাই তোমারে কেবলই' এই আত্মনাশেই ভরে থাকে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা, তবু শেষ পর্যন্ত 'শাস্ত'ই তেই এসে পৌঁছয় তাঁর কবিতা, বলতেই হয় তাঁকে :

সে ভুলে ভুলুক, কোটি মঘস্বরে

আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় শব্দে ছন্দে গড়নে যত সংহতি, তার সবই ছিল প্রখর এই ব্যক্তিগতের উপরে একটা নৈর্ব্যক্তিক আবরণ টেনে দেবার আয়োজন মাত্র।

৪

কিন্তু সেটুকুই কি সব? এই ব্যক্তিগতেই কি শেষ তাঁর কবিতা?

এইখানে আমাদের নজরে আনতে হয় কবিতাবইগুলিতে সুধীন্দ্রনাথের কবিতাসংগ্রহের চরিত্র। 'অর্কেষ্টা'র শেষ কবিতাটি পড়ে উঠবার পরেই যদি আমরা পৌঁছই 'ক্রন্দসী'র প্রথম লেখায়, মনে হয় এ এক ভিন্ন জগৎ। ধ্বংসের দায়ভাগে সমান অংশীদার হয়ে দাঁড়ানো আমি আর তুমি এখানে ভিন্ন এক আমি-তুমির স্বাদ দিয়ে আসে, নিয়ে আসে বহু-উচ্চারিত ওই কথ্যাটির সামনে : 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?' লোকায়ত এবং লোকোত্তরে বেঁধে নেবার প্রতিশ্রুতিতে 'ক্রন্দসী' যেন এক নূতন কবির সামনে অধিষ্ঠিত করে দেয় আমাদের।

কিন্তু কোথায় সেই নূতনত্ব? এখনও সেখানে নয়, যেখানে আমরা ব্যাপ্ত সমকালের খোঁজ পাব। 'উটপাখী' কবিতায় 'বর্গীর ধান খায় যে উনতিরিশে' সঙ্গেও 'ক্রন্দসী'তেও শেষ পর্যন্ত আছে এক 'আমি'রই কথা, যদিও 'অর্কেষ্টা'র আমি থেকে সে কিছু ভিন্ন হতে চায়। এ-বইতে আছে এক 'সন্ধান', যে-সন্ধানে নিজেই খুঁজে ফিরছেন কবি, অহরহ, 'কিন্তু যার স্পর্শ পাই, নিগূঢ় বিশ্রুতলাপ বুঝি/অধিষ্ঠ সে নয়'। মননে ও মনীষায়, দেহ ও বুদ্ধিতে যে একান্ত, যার মধ্যে ভেদ দ্বন্দ্ব দেশ কাল নেই, 'আমাকে যে ডাকে মুক্ত পথে/দীক্ষা দিতে, মোক্ষে নয়, স্বায়ত্তশাসনে'—সেই আমিকে আবিষ্কার করে নেবার পথ এই 'ক্রন্দসী'। এ বই পৌঁছে যায় এক অমর্ত্য সংক্রামে', অমৃতবিক্ত অন্তর্যামীকে বুঝুক্ষায় মরে যেতে দেখে যেখানে মনে হয় 'এ

ক্ষুধার পাশে/তুচ্ছ মোর চাওয়া-পাওয়া', এইখানে এসে 'আমার স্বতন্ত্র সত্তা হতে থাকে ক্রমাগত ক্ষয়', আমরা বুঝতে পারি এইভাবে এখন তৈরি হয়ে উঠছে সংবর্ত'তে পৌছবার পথ। স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে তাঁর।

অথচ, 'সংবর্ত' তো নয়, 'ক্রন্দসী'র পরের বই তো 'উত্তরফাল্গুনী'। এ সেই 'উত্তরফাল্গুনী', আমাদের মতো কোনো কোনো পাঠকের কাছে যে-বই ছিল সূধীক্ষনাধের প্রথম পরিচয়, ব্যক্তিগতের টানে ভরে আছে যে-বই। তবে কি 'ক্রন্দসী'র পরে আবার কবি ফিরে এলেন 'অর্কেষ্টা'র মনে?

এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য লক্ষ করা চাই সূধীক্ষনাধের কবিতাগুলির রচনাকাল। কবিতার বইতে এ কবি সব সময়েই তারিখচিহ্নিত করে রাখেন তাঁর লেখা, ফলে সময়ের বিকাশের সঙ্গে মনের বিকাশের সম্পর্কটা বুঝে নেওয়া পাঠকের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে আসে, বুঝতে-যদি চান তিনি। যদি বুঝতে চান তাহলে পাঠক বিস্মিত হবেন এই দেখে যে 'অর্কেষ্টা'র পর 'ক্রন্দসী', 'ক্রন্দসী'র পর 'উত্তরফাল্গুনী'—এ-রকম কালপারম্পর্যের বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই তাঁর কবিতাবিচারে, বস্তুত এই তিন বইয়ের রচনাগুলিকে একটিই মাত্র সময়খণ্ডের অন্তর্গত করে দেখা সংগত। বইগুলির প্রকাশে দুবছরের তিনবছরের ব্যবধান (১৯৩৫-৩৭-৪০), কিন্তু কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল কবে? 'অর্কেষ্টা'র কবিতার সময় মে ১৯২৯ থেকে জানুয়ারি ১৯৩৩, 'ক্রন্দসী'র কবিতাগুলি ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ থেকে নভেম্বর ১৯৩৩—এর, আর 'উত্তরফাল্গুনী'র কবিতা লেখা হয়েছিল জুন ১৯৩২ থেকে নভেম্বর ১৯৩৩। অর্থাৎ 'অর্কেষ্টা' যখন বই হয়ে বেরোল, তার অনেক আগেই লেখা হয়ে গেছে তিনখানি বইয়েরই কবিতা। এর মানে কেবল এই যে ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত ছ-বছর জুড়ে আমার 'ক্ষুধা'তে জঞ্জরিত হতে-হতেই স্বায়ত্তশাসনের মুক্ত পথে পৌছতে চেয়েছেন সূধীক্ষনাধ, প্রায় একইসঙ্গে কাছ করেছে তাঁর দুই মন, প্রায় একই সঙ্গে লিখেছেন দু-রকমের কবিতা, বই হিসেবে সংকলিত করবার সময়ে তাকে সাজিয়ে নিয়েছেন শুধু ভিন্ন ভিন্ন কেসে। আর তারপর, 'ক্রন্দসী' বা 'উত্তরফাল্গুনী'র কবিতাগুলির পর, বেশ-কিছুকাল আর লেখেনই নি কোনো কবিতা।

আজকের দিনে কবিসমাজের যে আবহাওয়া তৈরি হয়েছে—শুধু কবিতাসমাজ নয়, গোটা সমাজেরই—তাতে সংখ্যার হিসেব আর প্রত্যক্ষতার হিসেবকেই ধরে নেওয়া হয় প্রতিভার পরিমাপ, সেই হলে কবিপরিচয় বেঁচে থাকবার হিসেব। প্রকৃতির চেয়ে পরিমাণ আজ বড়ো। অন্তরাল সহ্য করা কবিদের পক্ষে আজ অসম্ভব হয়ে উঠেছে তাই। কবি আজ অনুষ্ঠাতা, প্রবহমান অনুষ্ঠাতা।

এই পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ অনুমান করাও শক্ত যে ১৯৩৪ থেকে ৩৭ পর্যন্ত চার বছর কোনো কবিতাই লেখেননি এই কবি, লেখেননি বিয়ান্দিশ-তেতান্দিশ-চুয়ান্দিশে, লেখেননি ছেচান্দিশ থেকে বাহান্দিশ কিংবা সাতান্দিশ থেকে ষাট। ১৯২৪ থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সাঁইত্রিশ বছরে সুধীন্দ্রনাথের না-রচনারই কাল আঠারো বছর! আর, এক-এক পর্বের স্তব্ধতার পর নতুনভাবে যখন তিনি শুরু করেন আবার, তখন তাঁর কাছে আমরা পাই 'সংবর্ত' (১৯৪০) কিংবা '১৯৪৫' (১৯৪৫) কিংবা 'ঘযাতি'র (১৯৫৩) মতো কবিতা, অথবা 'দশমী'র ১৯৫৪-৫৬) কবিতাশুচ্ছ।

স্তব্ধতার ওই সময়গুলিতে অনেকখানি বদল ঘটে গেছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়। বুদ্ধদেব যদিও লিখেছেন যে 'প্রায় সমগ্র সংবর্ত' লেখা হয়েছে গিয়েছিল তিরিশের দশকেই, কিন্তু তথ্য হিসেবে সেটা ঠিক নয়। 'সংবর্ত'র ষোলোটি ('কৈশোরক' অংশের পুনর্লিখিত সাতটিকে ছেড়ে দিলে) কবিতার মধ্যে সাতটিই লেখা হয়েছে চল্লিশের পর। 'জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে/বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে' যে কথাগুলি তিনি বলছিলেন, গোটা চল্লিশের দশক পেরিয়ে না এলে তার উচ্চারণ সম্ভব হতো বলে মনে হয় না।

শুরু হয়েছিল অবশ্য আটত্রিশ সালেই। সে-বছরের জানুয়ারিতে আশ্র-অনুকম্পায়ীর মতো তিনি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে : 'স্পেন বা চীনের দুর্দশা দেখে আমি যখন মৌখিক অনুকম্পা জানিয়েই খাঙ্গাস, তখন আমার বন্ধুবান্ধবেরা সেই সর্বনাশের আদ্যস্ত উপলব্ধি করেও থামেন না, সেখানকার হতভাগ্যদের সাহায্যকল্পে যথারীতি কোমর বাঁধেন।' লিখেছেন একথা, কিন্তু মৌখিক অনুকম্পাতেই যে থামেননি তিনি, তা বোঝা যায় জুন মাসে লেখা তাঁর 'নান্দীমুখ' কবিতায়, যেখানে শুনি : 'স্পেন থেকে চীন প্রদোষে বিলীন/অথচ তাদের চিনি।' এই কবিতা থেকে শুরু হলো সুধীন্দ্রনাথের নতুন এক পরিক্রমা, যে-পরিক্রমায় সমগ্র সমকালীন পৃথিবী এসে ভর করে তাঁর রচনায়। আগে একবার বলেছি যে তাঁর সমসাময়িক আর কোনো কবিরই রচনায় ব্যক্তিগত ইতিহাস এত প্রত্যক্ষতা নিয়ে দেখা দেয়নি, সুধীন্দ্রনাথে যেমন। আর এখানে, বিষ্ণু দে-র কবিতার কথা মনে রেখেও বলতে চাই যে শিবিরবিভাজিত যুদ্ধক্ষতময় বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর অনুপুঙ্খকে এত প্রত্যক্ষতায় আর কেউ তুলে আনেননি, সুধীন্দ্রনাথ যেমন। এই কবি দেখেন আজ 'নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা', তাই 'মেদিনীমুখর একনায়কের স্তবে'। 'একা হিটলারের নিন্দা সাথে আজ বাধে কি বিবেকে' থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি দেখেন 'হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রাঙ্কি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন' (মনে রাখতে হবে,

একথা ১৯৪০ সালের)। পাঠকদের কবি টান দিয়ে নিয়ে যান পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত, 'দেবে পুষ্ট টান থেকে পেরু;/প্রতিহিংসা মানে না সিঁদুর মানা', আর চারদিকে শুধু ছড়িয়ে থাকে ব্যক্তির ভগ্নাবশেষ।

ব্যক্তির অপঘাত আজও কুরোয়নি। এখনকার পাঠকদের কাছে তার কি আর তাৎপর্য নেই কিছু? 'তাই অসহ্য লাগে ও আত্মরতি'র আঘাত কি নেই কিছু? যুদ্ধকালীন আর যুদ্ধোত্তর সেই পার্শ্ববর্তী ইতিহাসের কোনো তাৎপর্য নেই আর? মনের ভিতরে হঠাৎ কোনো বৃষ্টিধারা নেমে আসবার মুহূর্তে মনে কি পড়ে না : 'ভালোবেসেছিল তারাও আমার মতো,/সীমাহীন মাঠ, আকাশ স্বরাট/তারারানি বাতাহত'? মনে কি পড়ে না 'তার স্বাধিকার আগে ফিরে দিতে হবে' আর সেইজন্যে 'স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে/শুদ্ধির তাগুবে'? না কি স্বীয় শক্তির উপরে সমস্ত আত্মাই লুপ্ত হয়ে গেছে এতদিনে, সম্পূর্ণই অর্ধ হারিয়েছে 'শুদ্ধির তাগুবে'র জন্যই। 'সংবর্ত'র ইতিহাস আমাদের কাছে প্রবহমান ইতিহাস হয়েই বেঁচে থাকে তাই।

কিন্তু বেঁচে থাকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ হয়ে নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে, লগ্ন হয়ে। এই লগ্নতা, মনে হয়, এক আশ্চর্য সমাহার পেয়ে যায় 'সংবর্ত'র নামককবিতাটির মধ্যে। কোনো-এর বৃষ্টির দিনে যখন বৃষ্টি সে আর আমি একাকার হয়ে যায়, তখন তারই মধ্য থেকে ছেগে ওঠে সময়, সময় টেনে নিয়ে যায় এক স্বপ্নে, এমন-এক রাষ্ট্রের স্বপ্নে, যেখানে

ব্যোমযান, কামান, পদাতি

যে-রাষ্ট্রের অঙ্গ নয়; ন্যায়, ক্ষমা, মিতালি, মনীষা

যার মুখ্য অবলম্ব, জিজ্ঞাসাবাদ

সামান্য লক্ষণ—

স্ট্রেসেমান-ব্রিয়ার সন্ধিপঙ্ক্তাবে যেখানে নতুন যুগের সূত্রপাত হবে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাবের অন্তরালেই দেখা দিতে শুরু করেছিল অশনি, দেখা দিয়েছিল 'মুসোলিনী যুদ্ধগামী বর্ষরের মতো/এবং উদ্বাস্ত ট্রটস্কি ইতিমধ্যে দেশে-দেশান্তরে/ঘুরে ঘুরে ছিল' গলফট কুষ্ঠরোগীর মতো আশ্রয়হীন আর এইখানে পৌছেই কবির মনে পড়ে যায়

এক শতাব্দী দুই কবি

অশোকুমার সিকদার

কারো কারো মতে ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়েছে ১৮৯৯ সালে, কিন্তু ভিন্ন মতে বিংশ শতাব্দী শুরু হয়েছে ১৯০০ সালে নয়, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে। আমি যেহেতু আশৈশব অন্ধ কাঁচা, সেই কারণে বিতর্কে না গিয়ে দুই মতকেই মেনে নিই। ফলত মানি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরে ১৮৯৯-তে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রোত্তর কালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি জীবনানন্দ, আর বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম বছরে ১৯০১ সালে আধুনিক কালের আর একজন বড়ো বাঙালি কবি ‘শতাব্দীর সমান বয়সী’ সূর্য্যনাথ দত্ত। জীবনানন্দ সুশিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম নিলেও ছিলেন ‘স্বভাবগাছুক মফঃস্বলবাসী’ ছিলেন না নাগরিক, সামাজিক গুণ ছিল না তাঁর, এড়িয়ে চলতেন বাইরের মানুষজনের সংসর্গ। কবিতা লেখা ছাড়া, সুকিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখা ছাড়া অন্য সব কাজে তিনি ছিলেন অসফল। তিনি জানতেন তাঁর গল্প-উপন্যাস সমকাল গ্রহণ করবে না, তাই সেগুলি তিনি ট্রাংক বন্ধ করেই রেখেছিলেন। কবি হিসেবেও সমকালে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না খুব। দিনের পর দিন চাকরি ছিল না তাঁর, পরনির্ভর হয়ে থাকতে হয়েছে তাঁকে। উদ্বাস্ত হয়ে আর্থিক অসচ্ছলতায় পীড়িত হয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় কবির জন্ম কলকাতার অত্যন্ত অভিজাত কায়স্থ পরিবারে, সোনার চামচ মুখে দিয়ে। অত্যন্ত কান্তিমান ‘সুশ্রী ও বাবু’ সূর্য্যনাথ কবি না হয়ে হতেই পারতেন রাজমন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূত এমন ভেবেছেন বুদ্ধদেব বসু। ‘পরিচয়’ পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছেন, দীর্ঘ দিন সম্পাদনা করেছেন। এই পণ্ডিত বিদ্বদ্ভ মন্থী মানুষটি ছিলেন কলকাতার এস্টিটসমাজের মধ্যমণি। সামাজিক বহু গুণে গুণাবিত এই মানুষটি চারবার বিদেশে গেছেন, একবার তিনি ভ্রমণসঙ্গী হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। জীবনের শেষ পর্যায়ে শিক্ষক হিসেবেও তিনি সফল হয়েছিলেন।

১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে জীবনানন্দের ‘ঝরা পালক’, ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হলো সূর্য্যনাথের ‘তব্বী’—বাংলা কবিতার প্রাঙ্গণে দুই কবির অপরিণত কুণ্ঠিত পদক্ষেপ। রবীন্দ্র প্রতিভা এই সময়ে মধ্য গগনে। তিনি লিখছেন ‘মহায়া’, ‘বনবাণী’, ‘পুনশ্চ’, ‘সীধিকা’, ‘শেষ সপ্তক’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি। বুদ্ধদেব বসু এক জায়গায় লিখেছেন, বাঙালি কবির কাছে, বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে, প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সুধীন্দ্রনাথও সচেতন ছিলেন যে 'উত্তর-রৈবিক কবিশঃপ্রার্থীর পক্ষে সূর্য্যবর্তের আবহ স্বাস্থ্যকর নয়'। স্বাস্থ্যকর যে নয়, তার প্রমাণ ছিল রবীন্দ্রপ্রতিভার শিখায় রবীন্দ্রানুসারী চিত্রল পতঙ্গদের আত্মবিলোপে। সেই সর্বগাশী প্রভাবের থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে 'প্রগতি' পত্রিকায় তরুণ অজিত দত্তের মতো কবিকেও বোষণা করতে হয়েছিল, 'বাংলার কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নেই।' কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ বহিরঙ্গে রবীন্দ্রপ্রভাবকে শিরোধার্য করে নিয়েছেন। 'তবী' কাব্যগ্রন্থ তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে উৎসর্গ করেছিলেন 'ঋণশোধের জন্য নয় ঋণস্বীকারের জন্য'। ভূমিকাতেও বলেছেন এই বইয়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছায়াপাত 'জ্ঞানকৃত'। যদি কোথায়ও উৎকর্ষ মেলে 'তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ বলে ধরে নেওয়া প্রায় নিরাপদ।' এই বইয়ের কবিতার ভাষা আদ্যোপাত্ত শুধরে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এমনকি পরবর্তী 'অর্কেষ্টা'-তেও তাঁর হস্তক্ষেপের কিছু প্রমাণ আছে। এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে কবি নিজে রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লেখেন, 'আপনার ছন্দ, আপনার শব্দ, এমনকি আপনার পদ ডেপ্তরেই আমি আমার কবিতাগুলো লিখেছি...'। 'অর্কেষ্টা'-র ভূমিকাতেও একই স্বীকৃতি, 'রবীন্দ্রনাথের একাধিক পংক্তি তো, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, এসে গেছেই...'। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে জীবনানন্দেরও মনে হয়েছিল এসব যেন 'রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে অন্তর্যামী শিষ্যের লেখা'। রবীন্দ্রনাথকে জোর করে এড়িয়ে যাবার কোন তাগিদ অনুভব করেননি সুধীন্দ্রনাথ, অন্তত বহিরঙ্গে। যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা, সাহিত্য, জীবনদর্শন ও সময়ের ভিতর দিয়ে সময়ান্তরের গরিমার দিকে অগ্রসর হবার পথ নিরঙ্কুশভাবে গঠন করে গেছেন, সেই মহাকবিকে এড়িয়ে যাওয়া উত্তরকালের পক্ষে দুঃসাধ্য একথা জীবনানন্দ জানতেন। কিন্তু কী অন্তরঙ্গে কী বহিরঙ্গে সেই কাজই অবলীলায় জীবনানন্দ করতে পেরেছিলেন। তাঁর 'ঝরা পালক'-এ সত্যেন্দ্রনাথ বা নন্দরঙ্গের ছায়া থাকলেও, পূর্বাপর কোন কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছায়া পড়েনি।

সুধীন্দ্রনাথও 'রবীন্দ্রনাথের আস্ত-আস্ত রচন ব্যবহার করেও' তাঁর নিঃসংশয় স্বকীয়তার শিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার নিলেও সুধীন্দ্রনাথের নিরালোক জগৎ ছিল একেবারে পৃথক। তিনি ছিলেন 'নিরালস্য নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারে বদ্ধমূল', আর মনুষ্য প্রগতিতে আত্মহীন। দুই বছর আগে-পরে জন্ম নেওয়া এই দুই কবি একই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শতাব্দীর প্রথমার্ধের দিনগুলি যাপন করেছিলেন। তাঁরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বিশ্বগত প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে দেখেছিলেন। জীবনানন্দ জানতেন, 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার,

কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।' প্রায় প্রতিশ্রুতি মেলে সুধীন্দ্রনাথের কথায়, 'ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবিজীবনের পরম সার্থকতা।' ইতিহাস-চেতনা, কালজ্ঞান, জাতীয় মানসকে প্রতিবিম্বিত করবার দায় তাঁদের কবিতাকে করেছে মনস্তাপ-অর্জর, বেদনা-পীড়িত, প্রদোষ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আত্মহননকারী লাসকাটা ঘরে শোওয়া মানুষটির ব্যক্তিগত 'অদ্ভুত আঁধার'-কে বিশ্বগত বঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন জীবনানন্দ—'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ'। 'চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ', 'সূর্য নিভে গেছে'।

এ-যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কাস্তিময় আলো

চোখের সুমুখে নেই যাক্রিকের...(১৯৪৬-৪৭)

এই কবিতার পাশে রাখা যেতে পারে সুধীন্দ্রনাথের '১৯৪৫' কবিতাটি। জীবনানন্দ জেনেছিলেন 'অনির্বচনীয় অশ্রু একজন দুঃখনের হাতে', বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতো ঝরে যায়। কুরাষ্ট্রের মুচুতায় মানুষ মনস্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরঙ্করতায় অর্জর। তাই 'সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দেখ।' বুদ্ধদেব বসু একে ধর্মপ্রস্তুতা বললেও, এই ইতিহাস-বোধের জোরেই জীবনানন্দ বড়ো কবি। নইলে তিনিও হতেন এক গৌণ কবি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সুধীন্দ্রনাথও দেখেন, 'শূন্য ঠেকেছে লাভে লোকপানে মিলে'; আর তাই বেদনার্ত কবি বলেন.

এরই আয়োজন অর্ধশতক ধরে,

দু-দুটো যুদ্ধ একাধিক বিপ্লবে;

কোটি কোটি শব পড়ে অগভীর গোরে,

মেদিনী মুখর একনায়কের স্তবে। (১৯৪৫)

দার্শনিকভাবে ক্ষণবাদী এই কবি অক্ষমতা ও নিষ্ফলতাবোধে পীড়িত, বিষাদঅর্জর, একাকিত্ব ভারাতুর।

নিরুদ্দেশের যাত্রী আমার তরী,

নিরবলম্ব নিখিলে সে আজ একা। (অষ্টতরী)

সুধীন্দ্রনাথ নিজেই এক নরকের অধিবাসী বঙ্গে চিহ্নিত করেছেন। তিনি প্রার্থনা করেন, 'জুগুপ্সার শক্তি দাও'।

আত্মরক্ষা হাস্যকর, সুসংকল্প মৌখিক বড়াই,

জীবনের সারকথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,

নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া

শবের সংসর্গ আর শিবির সম্ভাব।

মানসীর দিব্য আবির্ভাব,

সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী...। (নরক)

সুধীন্দ্রনাথ দেখেন 'ভগ্ন সেতু নদীতে নদীতে,/মরু নগরে নগরে।' আর, জীবনানন্দ শোনে, 'দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে;/গ্রামপতনের শব্দ হয়...।'

এই কারণেই দুই কবির কবিতায় মৃত্যুর ছায়া। প্রায় গোড়াতেই জীবনানন্দ বলেন, 'যে নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বৃকের শীত/লাগিতেছে আমার শরীরে—'। ঘুমের কথা তাঁর কবিতায় কতো যে পুনরাবৃত্ত হয়েছে তার হিশেব নেই। এই 'ঘুম নিঃসাড় মৃত্যুর নামান্তর'। চারিদিকের জীবনের স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতির ভয়াবহতা থেকে অব্যাহতির জন্য জীবনানন্দের কবিস্বরূপ ঘুমোতে চেয়েছে, অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছে। 'চাহি না মৃত্যুরে আমি' যদিও সুধীন্দ্রনাথেরই উক্তি, কিন্তু 'দাও মোরে নিশুণ নির্বাণ' প্রার্থনার মধ্যে অবলুপ্তির আকাঙ্ক্ষাই প্রকট। জীবনতরীতে একদা ভর করেছিল 'স্বপ্ন ও স্মৃতি পর্বত পরিমাণ', কিন্তু মহানবের দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে সামান্যও তার পরিভ্রাণ পায়নি।

নির্বাত পালে ঝড় ভ'রে দাও।

মাথার উপরে বজ্রে জাগাও।

মুখলধারার কুশল ঝাপটে

ধূলা ধুয়ে দাও গায়ে।

পরিবৃত্ত করি মহাসংকটে।

তুলে নাও, সখা, নায়ে। (মরণতরঙ্গী)

জীবনানন্দ বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতিমগ্নতা নেই। তবু সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতির কথা যতোটুকু আছে, তার মধ্যে আছে জীবনানন্দের মতো হেমন্ত প্রকৃতির কথা। জীবনানন্দের কোন পূর্বপুরুষ নাকি ছিঙ্গেন পরীতে-পাওয়া মানুষ, ভোরের বেলায় তাঁকে পাওয়া যেতো শিশির-ঝলমল মাঠে। কান্ডে দিয়ে ঘাস কাটতে দেখে যে কবি শৈশবে ব্যথিত হতেন, সেই কবি অন্তত বরিশালপর্বে একেবারে প্রকৃতির কবি। আর সেই প্রকৃতি একেবারে হেমন্তের বিষম-কোমল প্রকৃতি। তাঁর কবিতায় 'প্রথম ফসল গেছে ঘরে,/হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে/শু শিশিরের জল...।' 'হেমন্তের সন্ধ্যায় আফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীর...।'

হেমন্তের নদী, ঢেউ ক্ষুধিতের মতো এক সুরে

হতাশ প্রাণের মতো অন্ধকারে ফেলিছে নিঃশ্বাস— (অনেক আকাশ)

রবীন্দ্রনাথের কবিতায়-গানে হেমন্ত ঋতু প্রায় অনুপস্থিত, কারণ তিনি তো অবক্ষয়ের কবি নন; তিনি সৃষ্টির, প্রাণের, জীবনের কবি। ক্ষয়জীর্ণ পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আধুনিকেরা হেমন্ত ঋতুর মধ্যে পেয়েছেন সমস্ত প্রতীক।

তাই জীবনানন্দ দেখেন সবুজ পাতা অম্রাণের অঙ্ককারে হলুদ হয়ে যায়।
নায়িকার শরীরের,

হলুদ রঙের শাড়ি, চোরকাটা বিধে আছে, এলোমেলো অম্রাণের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর;

চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির... (দুজন)

হেমন্ত প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে সুধীন্দ্রনাথের কবিতাতেও একাকিত্ব,
শূন্যতা আর অবক্ষয়ের ছবি। তবে জীবনানন্দে হেমন্তই যেন প্রসঙ্গ, কিন্তু
সুধীন্দ্রনাথে হেমন্ত ঋতু পটভূমিকা।

ধুমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্ত লোহিত,

তরুণতরুণী শূন্য বনবীধি চ্যুতপদ্মে ঢাকা,

শৈবালিত স্তব্ধ হ্রদ, নিশাক্রান্ত বিষণ্ণ বলাকা,

মান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত।। (হেমন্তী)

রিক্ত মাঠ, শূন্য বনবীধি, হ্রদের অঙ্গে গতি নেই, চেতনাও মান। চেতনা
মান বলেই চরাচরে শূন্যতা আর স্তব্ধতা। শেষ পর্বের কবিতাতেও দেখি,

হেমন্তের বেলা পড়ে আসে :

ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটা হয়ে গেছে সারা,

খামারে খামারে সোনা, ভারা ভারা খড় আশেপাশে;

স্তব্ধ ঘাট, রিক্ত বাট; একমাত্র তারা

অনুমিত পাণ্ডুর আকাশে।। (অগ্রহায়ণ)

অম্রাণের অত্যাচারে পাকা পাতা ক্রমাগত ঝরে পড়ে। গাঢ় প্রসাধনের
রঞ্জনে রূপজীবী অরতীর মতো হেমন্তসন্ধ্যা অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকে
রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

বসন্ত আচ্ছ সুদূর পরাহত,

হেমন্ত ওই দোদুল অঙ্ককারে;

চুকিয়ে দিয়ে পাওনা-দেনা যত

দাঁড়িয়ে আছি খেয়াঘাটের পারে... (ডাক)

সুধীন্দ্রনাথের প্রকৃতি এলিয়টের ‘cactus land’-এর অনুরূপ বক্ষ্য
ফণিমনসায় ভরা—‘শত শ্রেয় মরুভূমি,—সম্মার্জিত সত্ত্বন্ত সিমুমে;/বক্ষ্য
ফণিমনসায় কণ্টকিত, বিষাক্ত ধূসর।’

এই অঙ্ককার, বিষাদ, বিবিক্তি, পাণ্ডুরতা ও বিচ্ছিন্নতাকে দুই কবিই কিন্তু
শেষ কথা বলে মেনে নিতে পারেননি। ‘অর্কেষ্টা’ কাব্যগ্রন্থ নতুন করে
প্রকাশকালে ১৯৫৩ সালে সুধীন্দ্রনাথ যে ভূমিকা লেখেন, তাতে তিনি
বলেছেন; রবীন্দ্রনাথের সৌরকরোজ্জ্বল কবিতার সঙ্গে নিজের তুলনা প্রসঙ্গে
‘আমি অঙ্ককারে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি; সদৃগতির আগেই হয়তো

তমসায় আবার তলাব।' এই সময়ে লেখা 'সংবর্ত' বা 'দশমী' কবিতাগুলো সেই উত্তরণ বেশি নজরে পড়ে না। যখন 'শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে', কবি বসেছেন 'তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে', তখনও কবির মনে পড়ে, তাঁরই মতো যারা ভাসোবেসেছিল,

কল্লতরুর নতশাখে সংস্কৃত

শুরু শশীরে ভেবেছিল করগত।

নগরে কেবল সেবিল গরল

তারাত, আমার মতো।।।...

অশক্য পিতা; বঙ্গীর কঠলগ্ন

মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আত্ম মগ্ন;... (নান্দীমুখ)

এই সময়ে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিল সুধীন্দ্রনাথের কবিপুরুষ, 'আত্মনাদ ছাড়া আত্ম নৈবেদ্যের যোগ্য কিছু নেই' এবং 'স্বপ্ন আত্ম ব্যর্থ বিভ্রম', সর্বোপরি অনাথ সাধীর মতো ধরা যেন ধায় অধঃপাতে'। যে-১৯৫৩ সালে আলোর দিকে উত্তরণের কথা ভেবেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ সেই বছরেই লেখা 'যম্যতি' কবিতায় আমরা পেয়ে যাবো এইসব সুপরিচিত চরণ।

অম্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে

বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে

নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে

যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।

দ্বিতীয় মহাসমরের শেষ পর্বে দাঁড়িয়ে দেখেছেন,

অণুবিদারণে শত সহস্র মানুষ হত

ব্যস্ত অভিব্যক্তিবাদের ফাঁকি;

বেতালগণ্ড বিকলাঙ্গের দুষ্ট ক্ষত,

পরিত্যাক্ত হিরোসিমা, নাগাসাকি। (প্রত্যাবর্তন)

শেষ কবিতার বই 'দশমী'-তে থাকে এই কবিপুরুষের এইসব উচ্চারণ—
'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী', 'অনুচ্চার্য নাস্তির কিনারা', 'এখনও গেল না ভোলা : তীর্থরঞ্জে রক্তের অঞ্জলি' এবং 'ভূবন্তী কাক রক্তপঙ্ক ধোঁটে'।
উত্তরণের ইচ্ছে সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথ তমসাতেই তলিয়ে থাকেন।

এই বিরূপ বিশ্বের অন্ধকারে সুধীন্দ্রনাথের নায়ক একমাত্র উজ্জ্বল পেয়েছিল ক্ষণকালীন নারীপ্রেমে এবং সেই প্রেমের বেদনামধুর স্মৃতিতে।
দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া এই কবির নায়ক মরিয়ার মতো আঁকড়ে ধরেছিল নারীশরীর। সে জানতো,

অগতের শূন্য অন্ধকারে

শরীরের রূপরেখা আমাদের অনন্য সম্বল। (বিলায়)

সেই বিদেশিনী নায়িকা,

সনাতন অঙ্ককারে মিশে

নিঃসংকোচ জৈবধর্মে করেছিল মোরে সম্প্রদান

অনির্বচনীয় তনু। (ব্যবধান)

ফলত সঙ্গমের চূড়ান্ত মুহূর্তে নায়ক ভুলে গিয়েছিল জাগতিক শূন্যতা, মানবিক বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা। এক মুহূর্তে সম্পর্ক স্থগিত হয়েছিল বিশ্বচরাচরের সঙ্গে। সেই মিলনের মুহূর্তে মনে হয়েছিল,

শূন্যে হঠাৎ লুপ্ত বসুন্ধরা;

খিঁভুবনে কেবল তুমি-আমি :

সৃজনপ্রাণের প্রথম যমক মোরা,

প্রলয়রাতের শেষ বণিতা-স্বামী। (অর্কেষ্ট্রা)

শারীরিক মিলন বিশ্বব্যাপী অঙ্ককারকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, ঘটিয়েছিল আত্মবিশ্বাস্তি। কিন্তু মাত্র ক্ষণিকের জন্যে। ক্ষণবাদ-প্রাণিত এই কবির কবিতায় মিলনও ক্ষণকালীন। পরে শুধু পড়ে থাকে স্মৃতি, মাত্র স্মৃতি। সমস্ত ‘অর্কেষ্ট্রা’ কাব্যগ্রন্থটি সেই ক্ষণিক মিলনের স্মৃতিকেই রোমন্থন করেছে। ‘মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে’।

সে শুদ্ধ চৈতন্য, হায়, বৃথা তর্কে আজি দিশাহারা,

বক্ষ্য স্পর্শে পরিণত স্বপ্নগ্রস্ত সে-গাঢ় চূষন;

ভ্রাম্যমাণ আলেয়ারে ভেবেছিল বুঝি ঋণতার,

অকূলে পাথারে তাই মগ্নতরী আমার যৌবন।। (অপচয়)

আত্মদানে পরাঙ্মুখ নায়িকাকে, প্রায় যেন অ্যান্ড্রু মারভেলের To A Coy Mistress-এর ধরণে সুধীন্দ্রনাথের নায়ক বলে,

বুঝিবে কি, হে সুমিতা, অতক্ষিত সে অমানিশীথে—

যে তোমারে চেয়েছিল পূর্ণিমার প্রগলভ উচ্ছ্বাসে,

যদি তারে ক্ষণতরে তবু তনু উপহার দিতে

তিলার্থ প্রভেদ তবু ঘটিত না শেষ সর্বনাশে? (বিলয়)

প্রশ্নটি নিতান্ত আলংকারিক, প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত আছে উত্তর। এই প্রেম, যৌনমিলনের এই তীব্রতা ঋণতারার মতো পারাবার পার হতে পথ দেখায় না, ‘সর্বস্বাস্ত্রে মর্মে শুধু পড়ে রবে অবৈদ্য অভাব।’ প্রেমে সুধীন্দ্রনাথ দেহবাদী, নায়িকার দেহ ছাড়া দেবার কিছু নেই। সুধীন্দ্রনাথের শরীরিণী নায়িকার সর্বস্ব যদিও সংস্কৃত অলংকারের ভূষণ, তবু সে কিন্তু কালিদাসের কালের চতুরিকা মালবিকা নয়, সে আধুনিক নারী।

মানুষের জীবনের বীভৎসতা ‘ব্যবনিক প্রেগের মতন/সকল আচ্ছন্ন শাস্ত বিন্ধুভাব নষ্ট করে ফেলিতেছে মানুষের মন।’ জীবনের ‘ভয়াবহ স্বাভাবিকতা’

ও 'স্বাভাবিক ভীষণতা'—কে, বিষজ্জর অঙ্ককারকে জীবনানন্দও হাড়ে-হাড়ে জানতেন। রক্তনদীর দিনগুলোয় উর্বশী আর অশ্রু ডাহিনি হয়ে যায়। চারিদিকে প্রমত্ত কালো গণিকার উল্লাস সঙ্গীত আর মনস্তর শেষ হলে পুনরায় নবমহত্ত্বের আয়োজন। তবু জীবনানন্দও পৃথিবীর রণরক্ত সফলতাকে শেষ সত্য বলে মেনে নিতে পারেননি। তিনি তমসায় বদ্ধমূল থাকতে চাননি, চেয়েছেন আলোর দিকে উঠতে।

জলও কোন্ অতীতে মরেছে;

তবুও নবীন নুড়ি—নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী...। (জনাঙ্গিকে)

'জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়'। আলংকারিক প্রশ্ন করে নিজেই জবাব দেন জীবনানন্দ,

আমরা কি তিমিরবিলাসী?

আমরা তো তিমিরবিনাশী

হতে চাই।

আমরা তো তিমিরবিনাশী। (তিমিরহনের গান)

হতে চাইলেও হতে পারা যায় না সহজে। একজন বড়ো কবির মতো 'আরো বড়ো চেতনার লোকে' প্রবেশ করতে চাইলেও, তিমিরহনের আকাঙ্ক্ষাকে জীবনের শেষ পর্বে তুমুলভাবে চাইলেও, সেই উত্তরণের উদ্যোগকে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেননি জীবনানন্দ। হয়তো মৃত্যুর আকস্মিকতা শেষ অধ্যায়কে সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছাতে দেয়নি। বীতশোক সিন্ধুতার কথা অনেক সময় আরোপিত মনে হয়। "সময় প্রকৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা করেছি।"—এই কথা বলেছেন তিনি, তিনি চেয়েছিলেন 'শান্তি বা সিরিনিটির সুরে' কবিতাকে বাঁধতে।

উদ্ধারের উজ্জ্বল পথ জীবনানন্দ খুঁজেছিলেন প্রেমে। কিন্তু তাঁর প্রেম সুধীন্দ্রনাথের যৌনমিলনের উদ্দাম শারীর প্রেম নয়। এই প্রেম মরমীয়া প্রায়। জীবনানন্দের নারী দেহহীন প্রায়, নায়িকাদের নাম-ঠিকানা সত্ত্বও। আর জীবনানন্দের নারী সর্বকালের। জীবনানন্দের আস্থা এই চিরকালীন নারীর প্রতি। নারীর প্রেমই নিরাময় আনতে পারে পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ থেকে।

সেই ইচ্ছা সখ্য নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,

আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষী গভীর হৃদয়। (সুরঞ্জনা)

প্রেমই আলো। প্রেমই ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার একমাত্র প্রমিতি। প্রেম যেখানে নেই, সেখানেই রক্তাঙ্কতা অবিরল। জীবনানন্দের অস্তিম মূল্য প্রেম। নদীর মানে যেমন সিন্ধু শুশ্রূষার জল, 'নারীর মানে

তুমি’ এবং ‘তোমার বৃকের পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল’।
জীবনানন্দও প্রেমের স্মৃতির প্রশান্ত বেদনা লালন করেন।

আমি চলে যাবো—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধরে সেই দিন পৃথিবীর পরে;
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে। (নির্জন স্বাক্ষর)

তুমি শুধু এক দিন, এক রজনীরঃ;
মানুষের—মানুষীর ভিড়
তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে—কত দূরে— (সহজ)

আম নিম্ন হিঙ্গলের ব্যাপ্তিতে যে তুমি পড়ে আছে তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয় পঁচিশ বছর পরে—কুড়ি কুড়ি বছরের পরে। যে প্রেমে উদ্ধার, যেই প্রেম আলো, তাকে নিতান্ত নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে সীমায়িত করতে চাননি জীবনানন্দ। যখন তিনি বুদ্ধ, খ্রিস্ট, কনফুসিয়াস, চৈতন্য, মার্কস, সেনিন, গান্ধিজির প্রসঙ্গ আনেন, তখন বোঝা যায় প্রেম অর্থে এক ব্যাপ্ত মানবিক সম্পর্কের কথা বলতে চান এই কবি। জ্ঞান যে প্রেম চায়, ‘মেধা নয়—সেবা চায়’, সেই প্রেমের প্রতিষ্ঠা মানবিক সহৃদয় সব সম্পর্কের মধ্যে, সমস্ত মানুষের প্রতি এক প্রগাঢ় ভালোবাসায়।

জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’-ও আধুনিক ন্যম ঠিকানা পদবী সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথের ‘শাস্ত্রী’-র মতো এক চিরন্তনী। জীবনানন্দ, এই ইতিহাসচেতন ও কালজ্ঞানের কবি, যাকে খুঁজেছিলেন অশোক বিহিসারের ধূসর জগতে, বিদর্ভ বিদিশায় বা শ্রাবস্তীতে, তাকেই তিনি পেয়েছেন শিশিরের শব্দের মতোন সঙ্কায়, সব পাখি ঘরে ফিরে আসার/মুহুর্তে, অন্ধকারে, নাটোর শহরে। সেই চিরন্তনীর চোখে জন্মজন্মান্তরে ক্রান্ত পথিকের আশ্রয়। জীবনানন্দের কবিতাটির মতো সুধীন্দ্রনাথের কবিতাতেও প্রকৃতির পটভূমি—শ্রান্ত বর্ষার পরে ‘আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে’ এবং ‘মাঠে, ঘাটে, বাটে আরক্ত আগমনী’। হাজার-হাজার বছর অতীতে জীবনানন্দ অনেক ঘুরেছেন বটে, কিন্তু অপ্রাপনীয়াকে পেয়েছেন মাত্র এই জন্মে অনেক ক্রান্ত সফরের পরে। আর সুধীন্দ্রনাথের মনে হয়,

একদা এমনি বাদল শেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।

দুই কবিতারই অনুভূতি ‘ধামিল কালের চির চঞ্চল গতি’। জীবনানন্দের কবিতায় যদি থাকে এক মার্কিন কবির সুপরিচিত কবিতার ঈষৎ ছায়াপাত,

তাহলে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় মেলে সংস্কৃত কাব্যের নায়িকা-পরম্পরা। এই শাস্ত্রী 'একবেণী হিয়া', তার শরীর সুষমা বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে গেছে, সংস্কৃত কাব্যের নায়িকার সৌন্দর্য যেমন ছড়ায়। জীবনানন্দের কবিতায় মানসীর প্রতি কোন শপথবাক্য উচ্চারিত হয়নি, সুধীন্দ্রনাথের নায়ক কিন্তু উচ্চারণ করে, 'সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে/আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।'

সুধীন্দ্রনাথ কবিতা রচনায় উক্তি আর উপলব্ধির অদ্বৈতের কথা বারে-বারে বলেছেন। এই শতাব্দীর দুই কবির উপলব্ধির ঐক্যনৈক্য তুলনা সবে সম্ভব করেছে। কীভাবে উক্তি তাঁদের উপলব্ধিকে সাকার করে তুলেছে সেটাও মিলিয়ে দেখা যায়। সুধীন্দ্রনাথ সমস্ত ভারতীয় সত্তাকে ঐতিহ্য বলে মেনে নিয়েছেন, যদিও চিন্তার গড়নে পশ্চিমী প্রভাব তাঁর উপর দুর্লভ নয়। জীবনানন্দের উপর প্রতীচ্য প্রভাব একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু তুলনায় তিনি অনেক বেশি বাঙালি। তাই উদ্ভর-ঔপনিবেশিক যুগের পাঠক তাঁকে অনেক বেশি আপনার করে পায়। পশ্চিমী পুরাণ থেকে জেসনের কথা আসে সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়, তাঁর কবিতায় টুটকি পেয়ে যান প্রায় পৌরাণিক মহিমা।

এবং উদ্বাস্ত টুটকি ইতিমধ্যে দেশে দেশান্তরে

ঘুরে মরেছিল, পুরাকালীন শহরে

গলঘণ্ট কুঠরোগী, যত দ্বার সব বন্ধ দেখে,

যেমন নির্জনে যেত ভিক্ষাব্যতিরেকে।

কিন্তু তার

বহু কেশে অস্তগত সবিতার উত্তরাধিকার,

সংহত শরীরে

ব্রাহ্মণ সিংহাসন কান্তি, নীলাঞ্জন চোখের গভীরে

তাচ্ছিল্যের দামিনীবিজ্ঞাস...। (সংবর্ত)

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাধান্য পায় মার্গ পুরাণ, সর্বভারতীয় পুরাণ—অর্জুন, মহাশ্বেতা, নৃসিংহ, অভিমন্যু, যযাতি, 'নটরাজ মহাশূন্যে নাচে', এবং নটিকেতা।

দাঁড়িয়ে সে নির্বাণের নির্লিপ্ত কিনারে

নিরুদ্বেগ নটিকেতা দেখেছিল অধোমুখে চাহি

সম্মোগ রাত্রির শেষে ফেনিল সাগরে অবগাহি

কবিত কাঞ্চনকান্তি নগ্ন বসুন্ধরা...। (নরক)

কম্প কুসুমাজ্জ হাতে মদনের কথা মেলে, 'মদনের চিত্তানলে অনঙ্গের হবে আবির্ভাব'। আসে কালী-চণ্ডী-পার্বতীর কথা,

নিঃশঙ্কিনী,

জ্ঞানারণ্য উল্লসি, সে চলে,

আস্ফালি উদ্ভত অসি, নির্জিহের মুণ্ডমালা গলে

নির্মল নগ্নতাম্বানি বর্মসম পরি। (কস্মৈ দেবায়)

অথবা,

গৌরী কাপালিকা

দাঁড়াল সম্মুখে অসি, নরমেধ প্রসয়ের শিখা

প্রতিভাত করি তার রৌপ্য স্তনতটে। (পুনর্জন্ম)

জীবনানন্দের কবিতায় পুরাণপ্রসঙ্গ বিরল, যদি কখনো থাকে, যেমন আছে ‘রূপসী বাংলা’ কবিতাশৃঙ্খলে, তাহলে আছে দেশি পুরাণ, বাঙালির নিজস্ব লোকপুরাণ। তাঁর কবিতায় মিলতে পারে ‘পরণ-কথা’-র কাহিনী। আসে রূপকথার ছগৎ থেকে উঠে আসা কেশবতী কন্যার কথা, কঙ্কাবতী শঙ্খমালার কথা, রামপ্রসাদের শ্যামার কথা, সনকা, ফণিমনসার বনে মনসার কথা, চাঁদ সদাগর ও তার মধুকর ডিঙারি কথা বারবার ফিরে-ফিরে আসে, বিশেষ করে বেহুলার কথা।

বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—

কৃষ্ণা ছাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদী চড়ায়—

সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বখবটে দেখেছিল, হায়,

শ্যামার নরম গান শুনেছিল—একদিন অমরায় গিয়ে

ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়...। (রূপসী

বাংলা ৪)

সুধীন্দ্রনাথ ঞ্জলার-কবি। তাঁর কবিতা পড়লেই বোঝা যায়, আমরা এক মননশীল, বহুশাস্ত্রবিদ, তত্ত্বদর্শী মানুষের কবিতা পড়ছি। জীবনানন্দেরও অধ্যয়ন কম ব্যাপক ছিল না, কিন্তু তিনি যেন স্বভাবকবি। সুধীন্দ্রনাথ সচেতন কবি। ‘তিনি কবি যতোটা, তার চেয়ে কারিগর ঢের বেশি’, বুদ্ধদেব বসুর এই কথার দৌলতেই তাঁকে সচেতন কবি বলছি না। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার তৃপ্তিহীন সংশোধন করতেন, ‘উটপাখি’ কবিতাটি দুই বছর ধরে তিরিশবার পুনর্লিখিত হয়েছিল, এই তথ্য জানি বলেই তাঁকে সচেতন কবি বলছি না। চৈতন্যই ছিল তাঁর কবিতার বিষয় সেই কারণেও তিনি সচেতন কবি। জীবনানন্দের কবিতার নির্ভরতা অনেকটাই অবচেতনের উপরে, নির্জ্ঞানের উপরে। তাঁকে প্রাণিত করে অবচেতনে বিমূর্ত স্মৃতি-বিস্মৃতির পুঞ্জ। তাই জীবনানন্দের কবিতার অগ্রগতি উদ্ভিদের অচিস্তিতপূর্ব নিয়মে, তার কোন পূর্ব নকশা নেই। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অগ্রগতি অনেকটা ভাস্কর্যের মতো, এমনকি স্থাপত্যের মতো। সচেতন পূর্বপরিকল্পনার নীল নকশা ভিত্তি করে

যেন গড়ে উঠেছে এইসব কবিতা। বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতা বিষয়ে ঐ কবিকে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তাঁর কবিতার ‘অবয়ব সমূহের সংযোগ সুস্পষ্ট নয়।’ এই অনুযোগের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর নিষ্কের কবিতার ধর্ম। সুধীন্দ্রনাথের নিষ্কের কবিতার অবয়ব সমূহের সংযোগ একেবারে সুস্পষ্ট। এই সংযোগ সুস্পষ্ট হওয়ার কারণ নিহিত আছে তাঁর কবিতার নৈয়ামিক বিন্যাসের মধ্যে। চিন্তাকেই সুধীন্দ্রনাথ প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। তাই রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছিলেন, “চিন্তাও চলে চক্রাকারে... চিন্তার এই গুণ থেকেই গঠনের উৎপত্তি। গঠনের পরিচয় কবিতার পংক্তি বিশেষের মধ্যে না-ও পরিলক্ষিত হতে পারে; কিন্তু একটা কবিতাকে পুরোপুরি নিলে তার মধ্যে একটা ঠাস বাঁধুনি ধাকা উচিত।” চিন্তার গঠনই গড়ে তোলে কবিতার ঠাস বাঁধুনি। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘আমি আবালা যুক্তির ভক্ত।’—যেমন মানুষ হিসেবে, তেমনি কবি হিসেবে। তাঁর কবিতা প্রায় লজিকের সিলজিক্সম পরম্পরায় সাজানো। প্রায় প্রতিটি স্তবক শুরু হয় ফসলত, তথ্যচ, অতএব. তবু, কিন্তু এইসব নৈয়ামিক অবয়ব দিয়ে। জীবনানন্দ কিন্তু ন্যায়পরম্পরার তোয়াক্কা করেন না। শুধু তাই নয়, তিনি লজিক ভাঙেন। একটিমাত্র উদাহরণ দিচ্ছি তাঁর বিখ্যাত ‘আটবছর আগের একদিন’ কবিতা থেকে। এই কবিতার আত্মঘাতী নায়ক নারীর প্রশ্নে ব্যর্থ হয়নি, বিবাহিত জীবনে কোন খাদ ছিল না তার,

হাড়হাতাতের গ্লানি বেদনার শীতে

এ-জীবন কোনদিন কেঁপে ওঠে নাই;

তাই

লাসকাটা ঘরে

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।

আত্মহত্যার কোনো কারণ ছিল না, তাই সে আত্মহত্যা করেছে। এ এক লজিক-উলটে-দেওয়া লজিক! একজন লজিকাল, তো অন্যজন ইল্লজিকাল হতে অকুণ্ঠিত, আর তাই সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান কাব্যতত্ত্ব-শিল্পতত্ত্ব সুররিয়ালিজমের কোন ছায়া নেই, জীবনানন্দের কবিতায় প্রবলভাবে আছে। দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের মধ্যে ব্যবধান ভেঙে দেয় পরাবাস্তবতা, তার থেকেই কবিতার সারাৎসার তুলে আনতে পারেন জীবনানন্দ। বহিঃস্থ বাস্তবতাকে ভেঙে তিনি গূঢ় বাস্তবকে উদ্ধার করেছেন, দেখেছেন ‘পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি/বদলায়ে ফেলে তবুও পৃথিবী’। গভীর এক নতুন বীজগণিত তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বলেই জীবনানন্দের কবিতা এতোটাই ঐতিহ্যভাঙা। প্রথম আবির্ভাবে তাই তাঁকে এতোটাই অপরিচিত মনে করেছিল বিমূঢ় বিভ্রান্ত পাঠক। অন্যদিকে ঐতিহ্য আর

পরম্পরাকে মান্য করেই সুধীন্দ্রনাথের কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ।

সুধীন্দ্রনাথ যুক্তির ভক্ত বলেই তাঁর কবিতার অঙ্গ-সংস্থান এমন সুঠাম এবং প্রকট। জীবনানন্দের কবিতায় তেমন সুনির্দিষ্ট গঠন পারিপাট্য নেই। দুই কবির চতুর্দশপদী কবিতা আর ছন্দ মেলালে দুই ছনের কবিত্বভাবের বৈপরীত্য একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে। অনেক চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়রের অনেক সনেটের অনুবাদকও তিনি। শুটি চারেক বাদে তাঁর সব সনেটেই শেক্সপীয়রীয় রীতির সনেটের মতো তিনটি চতুষ্ক ও শেষে একটি চূড়ান্ত দ্বিপদী সাজিয়ে লেখা আর যুক্তির পরম্পর বিন্যাসে সেগুলি খাঁটি সনেট। সনেটের টেকসই ছাঁচে, আর স্থাপত্যে সুধীন্দ্রনাথ পেয়েছেন বশীভূত মুক্তির স্বাদ। মুক্তি আর স্থিতির সমন্বয়েই মিলতে পারে সনেটে সাফল্য। জীবনানন্দের ‘রূপসী বাংলা’-র অন্তর্গত বেশির ভাগ কবিতা চতুর্দশপদী হলেও, সনেট কিন্তু নয়। তিনি পেত্রার্কীয়। ৮/৬ চরণের স্বরকে এই চতুর্দশপদী কবিতাগুলি সাজিয়েছেন, মিল-বিন্যাসে তাঁর কবিতার চতুষ্ক কখনো বদ্ধ, কখনো মুক্ত। কিন্তু বাইশ মাত্রার চরণগুলি যেমন সুঠাম সংহত নয়, তেমনি এইসব কবিতা অকৃত্রিম সনেটের মতো চিন্তার দৃষ্টান্তক প্রগতির বাহন নয়। সনেটের রূপকল্প ব্যবহারে সুধীন্দ্রনাথ যেমন ঐতিহ্যপন্থী, তেমনি ছন্দের বিষয়েও। কাব্যের মুক্তির ইচ্ছাহার তিনি রচনা করেন, কিন্তু ছন্দের কোন মুক্তির ভাবনা তিনি ভাবেন না। সুধীন্দ্রনাথ নিজেই বলেন, ‘ছন্দোমুক্তি যদিচ সাম্প্রতি কাব্যের মূলসূত্র’, তবুও তাঁর তাতে বিশেষ উৎসাহের নজির মেলে না। গণিতের মতো মাপে-মাপে হিসেব বজায় রেখে এগোয় তাঁর ছন্দ। অনেক ছন্দের ছাঁদে কখনো-কখনো ছন্দত্রীড়া করেন তিনি যদিও, তবুও তাঁর সব কবিতা প্রায় মিশ্রবৃত্তে লেখা। যেগুলি ‘বলাকা’-ধরণে লেখা, তাতেও নেই গতি; আছে স্থিতিময় স্থাপত্য। ছন্দ-অনুশাসন, ছন্দ-পারিপাট্যের দিকেই তাঁর নজর। জীবনানন্দেরও বেশির ভাগ কবিতা অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দে লেখা, কিন্তু এই কবি তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন ব্যক্তিগত স্পন্দন। অভিপ্রেতভাবেই তিনি ছন্দে চারিয়ে দেন এক মছুর আলস্য। তাঁর মিশ্রবৃত্তও যখন ‘বলাকা’-ধরণের তখন তার চলনও গতিময় নয়, মছুর। এই মছুরতা সুধীন্দ্রনাথের গুরুগম্ভীর মছুরতা থেকে আলাদা। ‘এ-ছন্দ ধেমে-ধেমি ঘুরে-ঘুরে চলে’। প্রচুর ড্যাস ও অন্য যতিচিহ্নগুলি ‘musical device’-এর মতো তাঁর কবিতার পাঠকে নিয়ন্ত্রিত করে। ‘সহজ শব্দে শাদা ভাষায়’ লেখা কবিতাগুলির মধ্যে তিনি এনেছিলেন এক ভিন্ন বোধের জগৎ; তার ছন্দে প্রয়োজন হয়েছিল ধ্বনির ভিন্নতা, এবং মাত্রা-গণনার হিসেব বজায় রেখেও ছন্দস্পন্দের ভিন্নতা। সুধীন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্তকে আরো আঁট করে বাঁধেন কবিতাকে সুঠাম করবার প্রয়োজনে, জীবনানন্দ সেই বাঁধনকেই আলগা

করে দিলেন। জীবনানন্দে যুগ্মধ্বনি কম, সুধীন্দ্রনাথে যুগ্মধ্বনি অবিরল। জীবনানন্দের ‘অক্ষরবৃন্তে যুক্তব্যঞ্জন কেবলই বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়তে চায়’, এবং একই শব্দকে দরকারমতো ভিন্ন মাত্রার মূল্য দিতে তাঁর বাধে না। সুধীন্দ্রনাথের হ্রদ কঠিন নিয়মে বাঁধা, জীবনানন্দের স্থিতিস্থাপক। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অঙ্গসমূহের সংযোগ সুস্পষ্ট, হ্রদও তাই অনুশাসিত। জীবনানন্দের কবিতার আপাত-শিথিল সমগ্রতাকে রূপায়িত করতে তাঁর হ্রদও মুক্ত।

মালার্মেপট্টী সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় শব্দের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তাঁর কবিতার শব্দ শুধু ‘অর্থঘন নয়, ভাবঘন এবং আবেগঘন’। সুধীন্দ্রনাথ যদিও এক জায়গায় বলেছেন ‘ভাষা প্রাকৃত না হলে প্রকৃত কাব্য রচনা অসম্ভব’, কিন্তু তাঁর কবিতার শব্দ আদৌ প্রাকৃত নয়, বরং বড়ো বেশি তৎসম শব্দের আড়ম্বর তাঁর কবিতায়। অনেক অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেন তিনি, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অনেক পারিভাষিক শব্দ মূলার্ধে ব্যবহৃত হয় তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতার যতটুকু দুর্বোধ্যতা সে একেবারে ভাষাগত। হাতের কাছে মনিয়ার উইলিয়মস্ ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতা সরল হয়ে যায়। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে ঠাট্টা করে বলা হয়েছিল, এইসব কবিতা বাংলায় অনূদিত হওয়া দরকার। অজিত দত্তের কবিতা উদ্ধৃত করে ‘শনিবারের চিঠি’ হ্রদ-উদ্বেগে জানায়, তাহলে কি আধুনিকদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হলো!

বদ্যিনাথও পদ্য লেখে,

আপন চোখে আসচি দেখে।

চোদ্দখানা ডিক্সনারি

চলন্তিকা সঙ্গে তারি

সামনে থাকে... (পদ্য)

‘নিসনি’-র সঙ্গে ‘ধৃষ্টি’ মেলায় যে বৈদ্যনাথ সে আসলে সুধীন্দ্রনাথ, গোপন খবর যেন ফাঁস করে দেয় ‘শনিবারের চিঠি’। সুধীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছিলেন, “ইনটেলেস্টের ইট সাক্ষিয়ে তুমি যদি কাব্যরূপ গড়তে যাও তবে সেই সৃষ্টিতে প্রত্যেক ইট ঠিক আপন পরিমাণটির চেয়ে আর কিছু দিতে পারে না, কিন্তু সজীব গাছে প্রত্যেক অংশই আপনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।” ‘ইনটেলেস্টের ইট’ কথা অস্পষ্ট ঠেকে, কিন্তু বুদ্ধদেব বসু যখন বলেন, ‘কথাকে তিনি ব্যবহার করেন, যেমন করে বাস্তবশীলী ব্যবহার করে ইষ্টক’, তখন আর কোন অস্পষ্টতা থাকে না। জীবনানন্দের কবিতা তৎসমশব্দ-বহুল নয়, তাতে দেশি শব্দের প্রতি প্রস্রয় অনেক বেশি; তাঁর ভাষাই প্রাকৃত, সুধীন্দ্রনাথের নয়, যদিও সেই দিকে শেষপর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ এগোচ্ছিলেন। তবু ‘বিয়েবারের দেরি নেই’, ‘হলুদ কঠিন ঠ্যাং’, ফিক করে

হাসা, আইবুড়, রগড়, 'হাড়হাভাতে', 'ফিচেল বাতাস', ধোনা দেওয়া, খচ্চড়, গাড়ল—এই সব পদ বা পদশৃঙ্খল সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহার করছেন কল্পনাও করা যায় না। জীবনানন্দের কবিতা সজীব গাছের মতো, প্রত্যেক অংশই আপনাকে ছাড়িয়ে যায়; তাঁর কবিতার বিকাশ হয় উদ্ভিদের মতো গাছের মতো অচিহ্নিতপূর্ব নিয়মে। কিন্তু তাই বলে, যতোই রবীন্দ্রনাথ বলুন, একথা মানা যায় না। যে একটি রমণীয় স্থাপত্য, যতোই ইটের পরে ইট গোঁথে গড়ে উঠুক না কেন, নিতান্তই ইটগুলির যোগফল মাত্র।

আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে একটা পুনরাবৃত্ত অভিযোগ দুর্য্যোধ্যতার। সব সময়ে পুরনো আমলের কবিতায় অভ্যস্ত নতুন প্রজন্মের কবিদের স্বতন্ত্র বিশ্ববীক্ষা ও স্বতন্ত্র কবিভাবার মুখোমুখি হয়ে বিরত হতচকিত বোধ করে। আর তখন নিজেদের গ্রহণীশক্তির অভাব আড়াল করবার জন্যে দুর্য্যোধ্যতার অভিযোগ তোলে। সেই অভিযোগ উঠেছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বিরুদ্ধে, সেই অভিযোগ উঠেছে জীবনানন্দের কবিতার বিরুদ্ধে। আগেই দেখেছি সুধীন্দ্রনাথের দুর্য্যোধ্যতা নিতান্ত ভাষাগত। কিন্তু দুই স্তর মেঘের মধ্য দিয়ে আমরা যখন জীবনানন্দের জগতে প্রবেশ করি, তখন সেই জগৎটাই দুর্য্যোধ্য থেকে। জীবনানন্দের কবিতায় কোন ভাষাগত দুর্য্যোধ্যতা নেই—তাঁর কবিভাষা বোধহয় সমকালীনদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ। কিন্তু সেই সহজ ভাষায় তিনি সৃষ্টি করেছেন এক অনন্য ব্যক্তিগত উপপদ্ধতির ভুবন। তাঁর দৃষ্টি রঞ্জনরশ্মির মতো বহিরাবরণ ভেদ করে এক বাস্তবাতীত উন্মোচন ঘটায়, এক গভীর নিঃসঙ্গ জগতে তিনি আমাদের উপস্থিত করান। আশ্বহত্যার কিনারে নিয়ে যান তিনি, নিয়ে যান এক, অন্তর্দীপ্ত উদ্ভাসে। তিনি যখন 'জীবনের মধ্যে মৃত্যু, আশার মধ্যে নিরাশা, সঞ্চারের মধ্যে স্তব্ধতা', যুগপৎ এক অমোঘতায় উপস্থিত করেন, তখন অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে, গোড়ায় অন্তত, সেই পৃথিবী পাঠোদ্ধারের অপেক্ষায় থেকে যায়।

কিন্তু যতোই মালামর্মেপছী বলে নিজেকে দাবি করুন না সুধীন্দ্রনাথ, যতোই বলা হোক তাঁর কাব্য গড়ে উঠেছে ইটের পরে ইটের মতো শব্দের পরে শব্দ সাজিয়ে, তাঁর কবিতার ইউনিট কিন্তু বাক্য। ঠিকই বলেছেন তিনি, 'আমার আনন্দ বাক্যে'। যেহেতু আবাল্য যুক্তির ভক্ত এই কবি, সেই কারণে দুটি কন্সপ্টের মধ্যে সম্পর্ক বা অময় প্রতিষ্ঠা করে যেই বাক্য, সেই বাক্য সাজিয়ে-সাজিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতা। রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে নিজের কবিতার তুলনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমার লেখায় প্রধানত কল্পনা', অপরপক্ষে 'সুধীন্দ্রনাথের মুখ্য আনন্দ মননে'। জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধেও বলা চলে তাঁর লেখায় প্রধানত আছে কল্পনা। এই কল্পনার সঙ্গে অবশ্য ছড়িয়ে আছে এক নিঃসঙ্গ গহন চিন্তাজগৎ।

সুধীন্দ্রনাথের মুখ্য আনন্দ মননে বঙ্গেই তাঁর 'আনন্দ বাক্য'। সুধীন্দ্রনাথ নিজেও মনে করতেন, “কাব্যের প্রধান অঙ্গ lyricism নয়, intellectualism...কাব্যে intellectualism আনতে হলে প্রাধান্য দিতে হবে চিন্তাকে।” চিন্তার আশ্রয় যেহেতু বাক্য, সেই কারণে চিন্তাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বাক্যই হয়ে উঠেছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার ভিত্তি।

এই দুই কবির কবিতায় দুই স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য। জীবনানন্দের কবিতার হৃদে একটি মহুর আপাত-শিথিল সুর আছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শ্রীমাংসায় এই কবিতা প্রধানত ‘চিত্তরূপময়’। অন্তত জীবনানন্দের গোড়ার দিকের কবিতা সম্বন্ধে এই কথাটা খুবই খাটে। এই পর্বের কবিতা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হয় যে, “তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল, তাঁর চিত্র বর্ণবহুল।” সেই পর্বে তাঁর কবিতা ইমেজপ্রাণিত; নিজের এই পর্বের কবিতা সম্বন্ধেই খেটে যায় তাঁর ‘উপমাই কবিত্ব’ কথাটা। ‘রূপসী বাংলা’ গ্রন্থের কবিতাগুলিতে উপমা অনর্গল, ‘শিকার’ কবিতার ছত্রিশটি চরণে চোদ্দটি পূর্ণোপমা! ‘চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে’; এইখানে, জীবনানন্দের কবিতায়। আধুনিক কাব্যতত্ত্বে ইমেজকে বলা হয়েছে ‘aesthetic monad’—ইমেজ-নির্ভরতায় জীবনানন্দের কবিতা আধুনিক। ‘এখানে সিন্ধু হতেছে কান’, এই পরবর্তী পদগুচ্ছ জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধে ততো খাটে না, যতো খাটে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে। সুধীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন ‘শুধু শ্রুতি জেগে রয়’। জীবনানন্দের কবিতায় উপমার আতিশয্য, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ধ্বনিপ্রধান, সঙ্গীতপ্রধান; সঙ্গীত প্রাধান্যের দাবিতে অনুপ্রাস-মুখর। অনুপ্রাস-আশ্রিত হওয়ায় সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ততো আধুনিক নয়, যতো ঐতিহ্যসম্মত। সংস্কৃত থেকে চলে আসা পরম্পরাকে তিনি যেন শিরোধার্য করেছেন। ধ্বনিসংগতি আনতে গিয়ে অনুপ্রাসের বাড়াবাড়িও ঘটেছে তাঁর কবিতায় কখনো-কখনো। রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথকে দেখা চিঠির একটি বাক্যে খুব অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন, “বহুদিন পরে প্রত্যাগত প্রডিগ্যালকে পুনশ্চ প্রলুপ্ত করতে প্রবৃত্তি হলো না।” তারপরেই যখন লিখেছেন, ‘অনুপ্রাসগুলি স্বতন্ত্রপ্রসূত, চেষ্টাকৃত নয়’, তখন সন্দেহ হয় সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অনেক অনুপ্রাস যে চেষ্টাকৃত তার দিকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের সব অনুপ্রাসকে চেষ্টাকৃত বলা যায় না; অনেক সময়েই সেগুলি স্বতন্ত্রপ্রসূত শুধু নয়, সঙ্গত মধুর।

১ অস্তরের অন্ধকারে অনঙ্গের লঘু পদধ্বনি? (অপচয়)

২ তোমার নিবিড় নিঃশ্বাস বায়ু

করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু। (অর্কেষ্টা)

৩ কিম্বদীপিত কণ্ঠে কক্ষ, কক্ষ কক্ষণার বাণী (প্রশ্ন)

৪ অতিক্রমি কাশবন সিঁতাঘর শ্যামল আশ্বিন। (অকৃতজ্ঞ)

৫ কষ্টককিরীট পরে বিনা ধনুর্বেদে

হলে দুঃস্থ ধূলির সজাট (উজ্জীবন)

৬ চন্দ্রকলার চন্দনটীকা জ্বলে (নাস্তীমুখ)।

স্বরব্যাঞ্জনের অভিবাতে, যুদ্ধস্বনিময় তৎসমশব্দের আড়ম্বরে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা যেন কাব্যসঙ্গীতের এক আশ্চর্য অর্কেস্ট্রা।

সাহিত্য অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রের পেশা নয়, কিন্তু কবিতার প্রতি ভালোবাসায় তাঁর কোন খাদ নেই। এমন একজন মানুষ স্বষ্টি বোধ করেছেন ১৪০৭ বঙ্গাব্দের শারদ সংখ্যা ‘নন্দন’-এর প্রবন্ধে যে, অবশেষে জীবনানন্দ শতবার্ষিকীর সমারোহ শেষ হল। তিনি ক্ষুব্ধ যে, জীবনানন্দের সম্মোহনে ‘বাংলা কাব্যসাহিত্যের দুইয়ের দশক থেকে পাঁচের দশকের উপাস্ত পর্যন্ত ইতিহাস অপাংক্তেয় হয়ে গেল। এই নস্টালজিয়া পীড়িত মানুষটি মনে করেন, ঘোঁষনে যে-সব কবির কবিতা তিনি পাগলের মতো পড়েছিলেন, উত্তরকালও সেইসব কবির কবিতায় মত্তমুগ্ধ হতে বাধ্য। “তাঁর সমকালীন অন্য সমস্ত কবি ও সাহিত্যিককে কুপোকাং করে একমাত্র জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যে নিজেই সুবিশাল সিংহাসন বিস্তার করছেন কয়েক দশক জুড়ে”, এই ব্যাপারটা তাই তাঁর কাছে ভয়ংকর মনে হয়েছে। জীবনানন্দের গদ্যে ‘কোন গাঁধুনি নেই, কোন ধৃতি নেই’ তাঁর মতে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় যে গাঁধুনি বা ধৃতি আছে, তাই কি আছে জীবনানন্দের কবিতাতেও? তথাকথিত গাঁধুনি নেই বলে তাঁর গদ্য একবারের বেশি দু’বার পড়া যায় না, মুখ নিচু করে যাঁরা জ্ঞানান, সেইসব পাঠকেরা জীবনানন্দের গাঁধুনিহীন ধৃতিহীন কবিতাও পড়ে উঠতে পারেন কি? “আমরা সুধীন্দ্রনাথ দস্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তীদের আদ্যোপাস্ত ভুলে থাকবো?” আলংকারিক প্রশ্ন করেন, জীবনানন্দের আধিপত্যের ভয়ংকর ব্যাপারে মর্মাহত এই মানুষটি। আমরা ভুলে থাকবো না, যেমন এখন ভুলছি না সুধীন্দ্রনাথকে। কিন্তু তাঁদের মনে রাখবো ইতিহাস হিশেবে, জীবনানন্দকে ব্যবহার করবো সমকালীন কবি হিশেবে, এক সময়ে জীবনানন্দের কাব্যভাষার অন্তঃশীল স্রোতোধারা ও প্রকরণ অনুসরণ করতেন কোন কোন অনুজ কবি। এখনকার তরুণ কবিরাজকে অনুকরণ করেন না, এই বীজগর্ভ কবিকে আপনজন বলে মনে করেন, সমকালের প্রতিদ্বন্দ্বী বড়ো কবি বলে মনে করেন। এই জীবন্ত কবির অন্তর্বস্ত্র আশ্বাদন করে, তাঁর কবিতার মধ্যে নিজেদের বারে-বারে আবিষ্কার, পুনরাবিষ্কার করেন। পরবর্তী কালের এক কবির মনে হয়, জীবনানন্দ আমাদের নিয়ে যান ইন্দ্রিয়ময় সমস্ত শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার এক তীর

জাটিল বাস্তব অভিজ্ঞতায়।' তরুণতর এক কবির সামনে 'সহস্র সংকেত নিয়ে মেরুসমুদ্রের মতো স্তব্ধ' হয়ে বিরাজ করেন জীবনানন্দ। জীবনানন্দের কবিতার ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে কীভাবে তরুণতর অন্ধকূপ আর অমৃতের বিশ্ব, নিখিল বিষ ও তার মাধুর্য একত্র মিলে থাকে, তার পাঠোদ্ধারে নিযুক্ত থাকেন এখনকার কবিরা, এখনকার পাঠকেরা। তাঁর ইতিহাসের বোধ সহজে অর্জিত হয় না, কিন্তু তাঁর হাত ধরে বাণীর মোহমুক্ত সত্যদৃষ্টি অর্জনের অভিযান জারি থাকে। উত্তরকালের বাঙালি কবিরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের উচ্চতা মেপে নিতে চান। তাঁরা তাঁরই সন্ততি। অন্যদিকে 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থের আর্ত প্রেমের কবি, 'সংবর্ত' ও 'যযাতি'-র ইতিহাসচেতন কবি সুধীন্দ্রনাথ নিজেই আজ ইতিহাস; যেমন আক্ষরিক অর্থে তেমনি রূপকার্থে উত্তরাধিরহীন, নিঃসন্তান।

প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথ : ‘সাহিত্যের গোয়ালে ব্যাসকুটের চবিত্তচৰ্ণ’?

তপোধীর ভট্টাচার্য

যাঁরা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘স্বগত’ নামক প্রবন্ধ সংগ্রহের ‘সূচনা’ অভিনিবেশের সঙ্গে পড়েছেন, তাঁদের কাছে অজানা নয় যে বর্তমান নিবন্ধ- প্রয়াসী শিরোনামের রসদ পেয়েছে সুধীন্দ্রনাথের কাছেই। তবে, লেখা বাহুল্য, প্রস্তাবোধক চিহ্নটি আমার সংযোজন। কারণ, এ লেখার উদ্দেশ্য তাঁর প্রবন্ধের গুণকীর্তনও নয়, ক্রটি-সন্ধানও নয়। কিংবা পরের মুখে ঝাল ষাওয়ারও কোনো ইচ্ছে নেই। শতবর্ষ উদ্যাপনের হুজুগে বাঙালি-স্বভাব কতটা আক্রান্ত হতে পারে, তা রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ অবধি দেখেছি। তবু সমবেত হুল্লোড়ের মধ্যেও গভীর পুনর্বিবেচনার তাগিদ উপস্থিত থাকে—এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় তার ব্যতিক্রম হবে না। তবে এও বলে দেওয়া যায়, সুধীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবের ওপর যতটা বিক্লেষণী আলো পড়বে, তার ছিটেফোঁটা মাত্র বরাদ্দ হবে প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথের জন্যে। তাঁর রবীন্দ্রনাথুদ্যান, প্রতীচ্য সাহিত্যের অনুসৃতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কিছু মৌলিক বিষয় অনুশীলন ইত্যাদির পুনঃপাঠ করে আমরা কিন্তু কালান্তরের সাম্প্রতিক আবহে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ও চিন্তার যথার্থতা বুঝে নিতে পারতাম। এমন হতেই পারে যে, প্রাবন্ধিক প্রতিবেদনের দ্ব্যর্থিত চরিত্র সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের অবস্থান আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে মিলবে না। তাঁর গদ্যরীতি সম্পর্কে আপত্তি তো আগেই ছিল; ইদানীংকার সাড়ে বত্রিশ ভাষার প্রতি আসক্তির প্রেক্ষিতে তাঁর রচনা আরো দুর্পাঠ্য বিবেচিত হতে পারে।

হয়তো এই সবই আশঙ্কার কথা। কিন্তু সত্যাবনার পরিসর অনাবিকৃত সূক্ষ্মতা ও গভীরতার দ্যোতনা নিয়ে দেখা দিতে পারে কিনা তা বিবেচনা করার জন্যেই তো নিবন্ধ পুনঃপাঠ জরুরি। তাঁর মৃত্যুর (১৯৬০) ঠিক চল্লিশ বছর পরে দেখছি, অশ্লু ‘অবিভাজ্য’ চিন্তাবিশ্বে এখন আমরা বাধ্যতামূলক নাগরিক। কোনো কৃত্রিম লক্ষণরেখা দিয়ে চিন্তাকে আর বাঁধা যাচ্ছে না। নতুন চেতনার উপযোগী নতুন নান্দনিক প্রকরণ দিয়ে পুরোনো সম্ভর্কেরও পুনর্বিবেচনা করতে চাই আমরা। ঠিক বাবটি বছর

আগে বেরিয়েছিল তাঁর প্রথম প্রবন্ধ সংকলন, 'স্বগত'। এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয় ১৯৫৭তে। ঐ একই বছর প্রকাশিত হয়েছে 'কুলায়' ও 'কালপুরুষ'। পরিচয় পত্রিকার (১৯৩১) সম্পাদনা করতে করতে অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। দেখা যাচ্ছে যে তিরিশের দশকে আধুনিকতা যখন সাহিত্যচিন্তায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছে, সুধীন্দ্রনাথ সে-সময় নিজের চেতনাবিশ্ব গড়ে তুলছিলেন। সূত্রাং তাঁর ব্যাংক নিঃসনেহে প্রতীচ্যাগত আধুনিকতাবাদী নন্দন ও বিশ্লেষণপ্রবণতা ছিল মুখ্য সঞ্চালক। কিন্তু তিনি সেদিন রবীন্দ্রনাথ্যানেও নিজেকে ব্যাপ্ত রেখেছিলেন। দুটি পরস্পরবিরোধী বিশ্ববীক্ষার মধ্যে অদ্বয় কীভাবে সম্ভব হলো আজকের পাঠক তা জানতে চাইবেন। আবার স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে প্রেক্ষাপটের দ্রুততর পরিবর্তনের নিরিখে নন্দনচিন্তা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি এত অবিশ্বাস্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে যে নতুন যুগের পাঠকের কাছে অনেক কিছুই ধূসর অতীতের বিলীয়মান প্রচ্ছায়া বলে মনে হতে পারে। বিশেষত আজ সব কিছুই এতো সহজলভ্য হয়ে গেছে যে, বিপুল অধ্যবসায় আর মননের সমৃদ্ধি এখন আর খুব বেশি মর্যাদা পায় না।

তবু, পুনঃপাঠের প্রয়োজন এই যে ব্যাংকের অন্ধবিন্দুগুলি শনাক্ত করে বা প্রাবন্ধিকের সুসংহত সংশ্লেষণ প্রণালী অনুসরণ করে প্রতীয়মান আকরণগুলির অন্তরালে গভীর আকরণগুলি আবিষ্কার করতে পারি। তাঁর সমকালে কিংবা উত্তরকালেও এ ধরনের পড়ার রেওয়াজ ছিল না। ফলে তাৎপর্যের অনেক সূত্রই হয়তো দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। এবার শতবার্ষিকী পুনঃপাঠ হতে পারে প্রাবন্ধিকের বিষয়ীসত্তা ও প্রবন্ধ-সন্দর্ভের বিষয়সংবিদ বিনির্মাণের সূচনা-মুহূর্ত। 'স্বগত'-তে যে সতেরোটি প্রবন্ধ রয়েছে, তাতে 'পুনশ্চ' (১৯৫৬) ছাড়া বাকি সবই তিরিশের দশকে লেখা। সূত্রাং অনুমান করতে বাধা নেই, সৃষ্টিশীল ও নিরন্তর চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ নিজেকে কতটা পালটে নিয়েছিলেন, 'পুনশ্চ'-এর দর্পণে অনেকটা বুঝে নেওয়া সম্ভব। তাঁর চিন্তা বিধের প্রবণতা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার আগেই যদি কে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তা হলো, নির্মম আত্ম-সমালোচনার সাহস। ইদানীং যখন 'আমাকে দেখুন'-ই একমাত্র শ্লোগান, আত্মবিজ্ঞাপনের চাতুর্যে সূক্ষ্মতা ও ভব্যতা অবাস্তর—সে সময় সুধীন্দ্রনাথের রুচি-সৌজন্য-বৈদম্ব্যের সমন্বয় আমাদের বিস্মিত করে : 'গত কয়েক বছর ধরে আমার প্রাক্কালীন পদ্য আমাকে কেবলই লজ্জা দিয়েছে। উক্তি ও উপলক্ষের অনৈক্য চিত্রকর্মের পরিবর্তে, কবিপ্রসঙ্গির ব্যবহার ডাবার

সুবিধাবাদী বিকার ইত্যাদি নিকৃষ্ট কাব্যের যত উপসর্গ, সব কটাই আমার পুরাতন লেখায় বর্তমান।’ (প্রবন্ধ সংগ্রহ; ১৯৯৫; ১৮৯) এই মন্তব্য কতটুকু মেনে নেব, সে তো পরের কথা। অন্তত এই নিবন্ধে তা আলোচ্য নয়। কিন্তু এখানেও কিছু কিছু চিন্তাসূত্র পাচ্ছি, যাদের গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। যেসব লক্ষণকে নিকৃষ্ট কাব্যের উপসর্গ বলেছেন সুধীন্দ্রনাথ, সেইসব ব্যর্থ প্রবন্ধেরও দূর্লক্ষণ। যেমন ‘উক্তি ও উপলক্ষের অনৈক্য’।

কোনো সন্দেহ নেই যে, সাহিত্য বাচনের শিল্প। তবে যে-কোনো উক্তি বাচন হতে পারে না। উপলক্ষের আলোয় যা উদ্ভাসিত নয়, সেই উক্তি বাচনের মর্যাদা পেতে পারে না। ‘জীবনানন্দের’ বিখ্যাত উচ্চারণ এখানে মনে পড়ে যায় : অনুভূতিপ্রদেশ থেকে আলো যদি না পড়ে, তাহলে যত কসরত করি না কেন, এসোমেসো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল মাত্র দেখব চারদিকে। উক্তি ও উপলক্ষের অনৈক্য থেকেই এমন হয়। অনুভূতিস্পন্দিত বাচন মূলত ঐক্যের পরিশীলন—শুধু লেখকের দিক থেকে নয়, পাঠকের দিক থেকেও। আর, এভাবে, সুধীন্দ্রনাথের চিন্তাসূত্রকে সম্প্রসারিত করে আমরা পৌঁছে যাই বিশেষ ধরনের পাঠক্রিয়ায়, যাকে মাইকেল রিফাটেরে বলেছেন ‘retroactive reading’, (১৯৯৭; ১৭৩)। এ ধরনের পড়া ‘makes the reader discover that the sequence must be seen rather as a network or system which converts its components into variants of single representation. (তদেব)। সুতরাং আর যাই হোক সুধীন্দ্রনাথের ভাবনায় এমন অন্তঃসার আবিষ্কার করা সম্ভব যা তাঁকে আমাদের সমসাময়িক করে তোলে। তিনি আরো বলেন ‘প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির সন্ধিকর্ষ’ (প্রাণ্ডু) —এর কথা। এমন সন্ধিকর্ষ ‘যাতে স্বপ্রাধান্যের অবকাশ নিতান্ত নগণ্য’ (তদেব)।

॥ দুই ॥

আধুনিকতাবাদী আত্মরূপটি যখন সাহিত্যের যাবতীয় অন্তর্ভুক্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক চেতনার মধ্যে হ্রস্বদৃশ্য তৈরি হচ্ছিল—তখন ‘স্বপ্রাধান্যের অবকাশ’কে প্রত্যাহ্বান করা নিঃসন্দেহে বড়ো ধরনের স্বাতন্ত্র্যেরই অভিজ্ঞান। কেননা স্বপ্রাধান্যের প্রবণতা অবধারিত ভাবে আত্মরূপে পর্যবসিত হয় এবং প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি—দুটোকেই ধ্বংস করে। এ সম্পর্কে নিজের কথা সাজাতে-সাজাতে ‘স্বগত’—এর প্রবন্ধাবলীকে অনুধাবন করার জন্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশও

তিনি দিয়েছেন; 'স্বগত'-এর প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধ সত্য সত্যই নিজের সঙ্গে বাদানুবাদ; এবং আপন ভুলত্রুটির উচ্ছেদ সে-তর্কের মুখ্য অভিপ্রায় বলে, সেখানে বক্তার চেয়ে বক্তব্য বড়।' (তবেদ) অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় রচিত দার্শনিক প্রতিবেদনে যেমন পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের বিন্যাস, তারই সম্যোচিত পুনর্গঠন রয়েছে এইসব প্রবন্ধে। তাহলে বিষয়বস্তু উপলক্ষ ছাড়া কিছু নয়; সম্ভাব্য সমস্ত যুক্তিকে নিরপেক্ষ ভাবে উপস্থাপিত করে চিন্তাবিশ্বকে নিরন্তর পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়াই প্রকৃত অদ্বিষ্ট। আচ্ছও সার্বক প্রবন্ধ কী তাই নয়? অবশ্য বক্তার চেয়ে বক্তব্য বড়ো হওয়ার মানে বক্তাকে মুছে ফেলা নয়; বক্তার দৃষ্টিকোণ কিংবা তাঁর ভাবাদর্শ-স্বাদ বা ভাবাদর্শহিতক অবস্থান বাচনের কোষে-কোষে সঞ্চারিত হবেই। সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা যেমন সত্য, শব্দ ঘোষের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। শেষ পর্যন্ত তাই প্রবন্ধের সন্দর্ভ ব্যক্তিত্বকে মুছে ফেলতে পারে না, আড়ালও করতে পারে না; বরং হয়ে ওঠে ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞান। তা যদি না হত, সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধকে বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ থেকে আলাদা করা যেত না। দেহিদা-কথিত 'পার্শ্ব্য-প্রতীতি'র তাৎপর্য এভাবে পুনরাবিষ্কার করি যেন।

ফরাসি সমালোচকদের অভিমত স্মরণ করে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন; 'স্বীতি আর রচয়িতা অভিন্ন বটে, তবু প্রকারী নিশ্চয় তখনই প্রকারের প্রয়োজন বোঝে, যখন বাধে বহির্বিশ্বের সঙ্গে' যোগসন্ধির বিবাদ, তার পরে শিল্পী যে শৈলীর শরণ নেয়, বিষয়ীর বিষয়নিষ্ঠাই তার উপজীব্য; এবং উদ্দেশ্য আর উপাদানের সহযোগ যেমন সাহিত্য নামে পরিচিত, ব্যক্তিস্বরূপ তেমনই আত্ম-পরের সন্ধি' (তবেদ; ১৮৯—১৯০)। যেভাবে চিন্তাবিশ্বের বিবর্তন সম্পন্ন হয়েছে, তাতে বিষয়ী-পরিসর ও বিষয়-পরিসরের চিরাচরিত সীমান্তগুলি মুছে গেছে। ফলে এদের সংজ্ঞা আর বৈশিষ্ট্য নতুন ভাবে নির্ধারিত হচ্ছে এখন। সেক্ষেত্রে 'বিষয়ীর বিষয়নিষ্ঠা' সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে কিছু সমস্যা হতে পারে। অবলম্বনীয় বা অদ্বিষ্ট বিষয়কে বিষয়ীনিরপেক্ষ অস্তিত্ব ভাবতে পারব কী? এই কূটতর্কের ভেতরে না-গিয়েও বলা যায়, সাম্প্রতিক তত্ত্ববিশ্বের অভূতপূর্ব গ্রন্থিলতা ও অনেকাঙ্গিকতা এমন একটা পর্যায়ে গেছে যে অদ্বিজ্ঞতা ও উপলব্ধি পরিমাপের সমস্ত প্রচলিত পদ্ধতি অবাস্তব হয়ে পড়েছে দর্শন ও বিজ্ঞান কিংবা সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞাপনের নানা শাখার অন্যান্য-উদ্ভাসন আকরণ ও তাৎপর্যের সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপান্তরের সূচনা করেছে। 'উদ্দেশ্য আর উপাদানের সহযোগ' হিসেবে সাহিত্যকে সাধারণ ভাবে যদিও গ্রহণ করা যায়, প্রাপ্ত রূপান্তরের প্রতিক্রিয়ায় নতুন নতুন

স্রষ্টাঙ্গিতা দেখা দিচ্ছে এও অনস্বীকার্য। ফলে, এমন কী, ‘সাহিত্য’-এর সংজ্ঞাও আমূল বিনির্মিত হয়ে যাচ্ছে।

৪৪ বছর আগে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ নিয়ে এত কথা লিখছি কেন আচ্ছ? লিখছি শুধু সূধীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী পুনঃপাঠের প্রেরণায় নয়; লিখছি, কারণ, কথ্যচ্ছলে এমন কিছু চিন্তাসূত্র তিনি তুলে ধরেছেন যাদের প্রসঙ্গত নিরপেক্ষ ভাবেও বিবেচনা করা যায়। ‘সাহিত্যের খেয়ালী আদর্শে আমার আপত্তি আচ্ছও প্রবল’ (পৃ ১৯০), এই মন্তব্য মূলত তিরিশের দশকের সাহিত্য-ভাবনা মনে রেখে। কিন্তু উচ্চারণের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে বুঝে নিই, ‘এ যতখানি প্রাবন্ধিকের বাচন ততখানি ধ্রুপদী কবিরও। যাকে ‘খেয়ালী আদর্শ’ বলছেন সূধীন্দ্রনাথ, তা আসলে রোমান্টিক স্বতঃস্ফূর্ততা; যুক্তি যার নাগাল পায় না তেমন কোনো দিব্য প্রেরণা বা ব্যাখ্যাভীত অনুভূতির সার্বভৌমত্ব স্পষ্টত অস্বীকার করছেন তিনি। এই উচ্চারণ তাহলে তাঁর অন্যতম কেন্দ্রীয় ভাবকল্প যাকে উপযুক্ত গুরুত্ব না দিলে কবি এবং প্রাবন্ধিক সূধীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষার স্বরূপ প্রকট হতে পারে না। এই ভাবকল্পের নিরিখে তাঁর সমস্ত প্রবন্ধের নির্যাস এবং কবিতার অণুবিশ্বকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব—তা হয়তো নয়। ‘খেয়ালী আদর্শ’ এর বিপরীতে তিনি যা প্রতিস্থাপিত করতে চান, তার আদল খুঁজতে হবে বিভিন্ন রচনাতেই। অবশ্য সমস্ত বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলেও মুশকিল। যেমন, ‘আস্তিক্যের ভগবান যেমন পূর্ণ বলে বিদ্যমান, সার্বিক শিল্পবস্তু’ তেমনি বিদ্যমান বলে সর্বগুণাকর।’ (তদেব) অঙ্কের দিনে পূর্ণতা বা বিদ্যমানতার উপর এভাবে আস্থা রাখা কঠিন কেননা সময় ও পরিসরের দ্বিরাঙ্গাপ কেবল গড়ার উদ্যমে নেই, উদ্যম-সাপেক্ষ বা উদ্যম-নিরপেক্ষ ভাঙনেও রয়েছে।

সূধীন্দ্রনাথ আরো জানিয়েছেন : ‘অব্যর্থ উপসংহার আমার অস্বিষ্ট নয়, ‘আমি অগত্যা সন্তুষ্ট পরিণামী সামঞ্জস্যে।’ (তদেব) এই মন্তব্যের সমর্থন বা বিরোধিতা না-করেও আমরা ভাবতে পারি, তাঁর এই উচ্চারণে সন্তবত মুক্ত সমাপ্তি সম্পর্কিত আকারগোস্তরবাদী প্রত্যয়ের দুরাগত পূর্বাভাস খুঁজে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু যিনি পূর্ণতা বা বিদ্যমানতার কথা বলেন, তাঁর ভাবনার সঙ্গে ঐ প্রত্যয় কতটা মানানসই। খানিকটা বাধ্য হয়েই যদিও ‘পরিণামী সামঞ্জস্যে’ আস্থা রাখতে হয়, তাহলে এই শব্দবন্ধের বিশেষ্য এবং বিশেষণ থেকে বিচ্ছুরিত চিন্তাস্মুলিস্ত আমাদের সমস্যা আরো বাড়িয়ে দেয় নাকি। ন্যায়দর্শনের সমবায়ী সম্বন্ধের মতো যে সামঞ্জস্যবোধ পরিণামের দিকে নিয়ে যায়, তা সাম্প্রতিক সময়চেতনায় অগ্রাহ্য। দ্বিতীয়ত তাতে অব্যর্থ উপসংহারই অনিবার্য। আর প্রাবন্ধিক

সুধীন্দ্রনাথ পরিণামী সামঞ্জস্যের কথা বললেও কবি সুধীন্দ্রনাথ তো 'বিংশ শতাব্দীর সমানবয়সী' বলে 'পরিণামী সর্বনাশ থেকে' নিজস্ব নানাধাকার কথাই বলেছেন। এই দুটি পরস্পর-বিপরীত অবস্থানকে মেলাই কীভাবে? কবি সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

ভেবেছি আমার সঙ্গে অদৃষ্টের দ্বৈরথ সমর :
মর্ত্যের প্রতিভু আমি, প্রতিপক্ষ সন্তুষ্ট অমর,
কাছেই নিজস্ব নেই পরিণামী সর্বনাশ থেকে,
তবু যবনিকাপাত দেবে গ্লানি পরাজয় ঢেকে,
প্রতিজ্ঞা অভিয়ানে লোকযাত্রা হবে অগ্ধসর,
আমাকে হৃৎপদ্মে ধরে, ব্যর্থ বীর্ষে যীশুর দোসর,
আমি যাব আয়োপম্য সমাহিত সন্ততিতে রেখে।।'

নিশ্চয় কবিতা ও প্রবন্ধের প্রতিবেদন এক নয়; তাদের স্বভাব আলাদা। তবু ভাববীজ নিয়ে যখন ভাবি, বাচনের বিন্যাসে মূলগত ঐক্য খুঁজে না পেলো সমস্যা হয়ই। 'আয়োপম্য' শব্দটির নিষ্কর্ষ নিয়ে ভাবতেই হয় আমাদের কেনা নৈরাশ্র্যসিদ্ধির কবি আয়োপম্যের ওপর জোর দিচ্ছেন। সম্ভার অস্তিত্বতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরের মধ্যে কোনো কৃত্রিম ছলবিভাজনরেখা কী নির্মাণ করতে চাইছিলেন তিনি? সমাহিত সন্ততির কাছে অর্থাৎ যুক্তিশাগিত উত্তরকালের কাছে নিজস্ব সংবিদ পৌঁছে দেওয়ার অস্বীকার এটা।

স্পষ্টত 'সমাহিত' উত্তরকাল তাঁর সমাধিময় চৈতন্যকে বুঝে নিক, এই হলো সুধীন্দ্রনাথের ইচ্ছিত। তাঁর নির্দিষ্ট উচ্চারণ : 'সাহিত্যসাধনার সিদ্ধিও নির্বিকল্প সমাধির মুখাপেক্ষী' (তদেব)। যিনি আবেগ ও অনুভূতির দ্যুতিতে দেখেছেন শুধু ক্ষণিকের রঙিন মরীচিকা, চিন্তার ডাক্ষর্ষে আশ্রয় করে তিনি ঐ নির্বিকল্প সমাধির স্তরে সাহিত্যের সন্দর্ভকে উত্তীর্ণ করতে চান। এ আসলে আত্মানুসন্ধানের বিশেষ একটি ধরণ। ব্যবহারিকসস্তা থেকে যথার্থ ইচ্ছিত পরমসস্তাকে আলাদা করে চিনে নেওয়ার চেষ্টা, প্রতীয়মানের নিশ্চিন্ত ভিড় ও কোলাহল থেকে একান্ত উপলব্ধির কেন্দ্রে পৌঁছানোর প্রয়াস। এ প্রসঙ্গে 'সন্ধান' কবিতার কিছু পঙ্ক্তি মনে পড়ে;

আপনারে অহরহ খুঁজি।

কিন্তু যার স্পর্শ পাই, নিগূঢ় বিশ্রদ্ধালাপে বুঝি,

অস্থিষ্ট সে নয়।'

তাহলে কী তাঁর প্রকৃত অস্থিষ্ট যা কবি সুধীন্দ্রনাথ ও প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথের সেতুবন্ধন করেছে? প্রবন্ধে যেসব জিজ্ঞাসার যুক্তিস্নাত

উপস্থাপনা আমাদের ভাবায় কবিতায় সেইসব প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তাদের কী বাচনের কৃৎকৌশল বলে এড়িয়ে যেতে পারি? সময়তাড়িত নিরাশ্রয় মানুষ চৈতন্যে সমাহিত হতে চায়। নির্বিকল্প সমাধির সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতার আততি তাকে উৎকণ্ঠিত করে। কী কবিতায় কী প্রবন্ধে ঐ আততির নানা অভিব্যক্তি খুঁজে পাই। দুটি প্রকাশমাধ্যমেই বিষয় গৌণ, উপলব্ধি প্রকাশের ন্যূনতম অবলম্বন মাত্র। অতএব সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় সন্ধানের বার্তা এভাবে ব্যক্ত হয় :

অক্ষয় মনুষ্যবট নির্বিকার যে-প্রাণপরাণে

বিকশিত আশু ক্লান্ত নির্বিশেষ ফলে

সে-অনাম চিরসত্তা খুঁজি আমি নিছের অতলে।' (সন্ধান)

॥ তিন ॥

‘পুনশ্চ’ প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথের বাকবিন্যাস নিবিড় ভাবে অনুশীলন করে আরো কিছু মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন চিন্তাসূত্র সম্পর্কে অবহিত হই। এইসব সূত্র এমন, যাদের প্রসারিত করেই পাঠক তাঁর অদ্বিষ্ট সত্যের স্বরূপ ও সম্ভাবনা বুঝে নিতে পারেন। আজ আমরা ‘নিশ্চয় একমত হব যে ‘সাহিত্যচর্চায় প্রয়োগ ব্যতীত মিথ্যার নিরসন সম্ভব নয়।’ (প্রাশস্ত ১৯১) বিশেষত সাহিত্যতত্ত্ব কখনো প্রয়োগ নিরপেক্ষ হতে পারে না। বিশ্বাস ছাড়া সাহিত্য লক্ষ্যভেদী হতে পারে না, ঠিক। কিন্তু বিশ্বাস যখন অসমীভূত অভ্যাসে তাকে কী বলব কৃষ্ণবিবর ছাড়া। সব আলো, সব সত্য তাতে হারিয়ে যায়। ঐ কৃষ্ণবিবরের বিকট মিথ্যাকে চেনাতে পারে প্রয়োগের বাতিঘর। প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞা সন্দর্ভ—নির্মাতা এবং সন্দর্ভ—গ্রহীতার পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাদের বৈধতাকে মাঝে-মাঝেই বিবর্তনশীল সময়ের নিরিখে যাচাই করে নিতে হয়। কেননা তা না হলে প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞা ও আত্মপ্রত্যয়ক অভ্যাসের ভুলভুলাইয়া। প্রয়োগের আলো ছেলে বুঝে নিতে হয়, কোন্টা নিমজ্জনের পথ আর কোন্টা বিনির্মাণের। সুধীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তিনি ‘রসসামগ্রীর সন্ধানই অধীক্ষার দ্বারস্থ’ (তদেব)। কিন্তু আজকের পাঠকের হয়তো খটকা লাগবে, ঐ অধীক্ষার বৈধতাও যাচাই করা হয়েছিল কিনা। নিশ্চয় এই বিশ্বাস আমরা করতে চাইব যে প্রকৃত অধীক্ষা স্বয়ংপ্রভ। কিন্তু অনতিক্রম্য সময়ের প্রচলন চিন্তায়কগুলি যেহেতু কোনো-না-কোনো ভাবাদর্শ দ্বারা পুষ্ট, একান্তভাবে আত্মদীপ অধীক্ষা কতটুকু সম্ভব? ‘যুগব্যাপির বহুরূপী উপদ্রব’ থেকে বয়ানে বিসংবাদের জর্মি তৈরি হয়, একথা মেনে নিয়েও ‘যুগব্যাপির স্বরূপ নির্ণয় নিয়েই

তো নানা রকম প্রশ্ন তোলা চলে। নিজের প্রতিবেদনকে সুধীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই 'রোমান্টিক আতিশয্যের প্রতিবাদ' (তদেব) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জীবনে অদ্বৈতের অভাব এবং সমস্যার প্রাদুর্ভাব নিয়ে নিজেকে ব্যাপ্ত রেখেছেন, কিন্তু সমাধান প্রস্তাব করার দায় স্বীকার করেন নি। আসলে সমস্যা উত্থাপন আর সমাধান প্রস্তাবনার সহজিয়া রীতি তাঁর কাছে অশ্রদ্ধেয়। বরং তিনি চান, সাহিত্য কিংবা অন্য যে-কোনো অবলম্বনের সূত্রে-ব্যক্তিমানব আত্মজিজ্ঞাসায় মনোযোগী হোক। বিশেষ নয়, নির্বিশেষই প্রকৃত জিজ্ঞাসুর অধিষ্ট এবং একমাত্র এভাবেই 'তার সঙ্গে বিশ্বমানবের সাক্ষাৎ পরিচয় অবশ্যস্বার্থী' (তদেব : ১৯২)। একথাটার গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

কেননা আজ আমরা বিশ্বায়নের যুগে বিমানবায়নের উৎকট প্রতিক্রিয়ার শিকার। অথচ মানুষের পৃথিবী এখন প্রযুক্তির ডানায় ভর করে চলেছে, গতির তাড়নায় সমস্তই বস্তুবিরহিত সংকেত। মানুষকে বাদ দিয়ে তার কল্পিত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিশ্বায়িত; জ্ঞান ও উপলব্ধি ততটুকুই প্রাপ্য মানুষের, উদ্ধৃত আধিপত্যবাদ যতখানি তাকে দেয়। সুধীন্দ্রনাথের ভাবনায় যা বিশ্বমানব, তার কিছুমাত্র প্রাসঙ্গিকতা এখনকার ছন্দজগতে নেই। সাক্ষাৎ পরিচয় তাই অবশ্যস্বার্থী ছদ্মমানুষ ও না-মানুষের সঙ্গে, দানবীয় যান্ত্রিকতা যাকে প্রতাপের উচ্ছ্রিষ্টে রূপান্তরিত করেছে। ইতিহাসের মৃত্যু, সভ্যতার অবসান, জ্ঞানের লুপ্তি, সন্দর্ভের সমাপ্তি—এই যখন অর্জন বিশ্বমানবের সংজ্ঞাও নতুন করে লিখতে হবে নিশ্চয়। তবু, সুধীন্দ্রনাথের চিন্তাসূত্র অন্যদিক দিয়েও বিবেচ্য। নির্বিশেষ-সন্ধানের পথেই মানুষ বিশ্বনাগরিক হয়ে উঠতে পারে অর্থাৎ তাকে কুয়োবাসীর ভণিতা আর বিবরবাসের অভ্যাস ত্যাগ করেই এগোতে হয়। কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্য তৃতীয় সহস্রাব্দের ঢোল শহরতের মধ্যেও 'তাতস্য জঙ্গোয়ম্' ইতি ব্রূবাণা: মাক্ষাতার আমলে খোঁড়া স্বাত থেকে সরে গিয়ে একটুও এদিক-ওদিক তাকাতে রাজি নয়। ৪৪ বছর আগে সুধীন্দ্রনাথ খানিকটা আক্ষেপের ভঙ্গিতে যে লিখেছিলেন : 'আমার সাহিত্যাদর্শে পাশ্চাত্য প্রভাবের আধিক্য দেশদ্রোহের সাক্ষ্য' (তদেব) —এই দৃষ্টিকোণ খুব একটা পালটায় নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিটি শাখায় বিশ্বনাগরিক হতে না পারলে জঙ্গোয়মের দশা হয়, এক পাও এগোতে পারে না কেউ। দর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সক্ষম করি, জ্ঞাতার দেশজ পরিসরকে গুরুত্ব দিলেও জেয় কোনো কৃত্রিম সীমাত্তে রুদ্ধ নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অনুবঙ্গে বিশ্বায়নের ছায়া যখন ক্রমশ গাঢ় থেকে গাঢ়তর, জীবনকথায় সাহিত্যিক প্রতিবেদনে

‘দুয়ার রুদ্ধ পৌরষবনে’। রক্ষণশীলতা উগ্রভাবে চিন্তার সব সীমাতে প্রহরীর ভূমিকায় নেমে পড়ে। মানুষের পৃথিবীতে সব কিছুই আমাদের অনুশীলনযোগ্য; এরই নাম মানবিক উত্তরাধিকার এবং মানববিশ্ব, ভালো বাঙালি হয়েও যোগ্য মানুষ হওয়া সম্ভব; মানববিশ্বের যাবতীয় উপার্জনে নিষেধ হওয়ার পরেই গ্রহণ-বর্জনের প্রসঙ্গ আসতে পারে। নইলে একটি অভিন্ন পৃথিবীর বাসিন্দা হযেও আমরা কার্যত সময়ের বাইরে ছিটকে যেতে পারি।

অতএব সময়ের নতুন, এবং পরিমাপকের দিকে যাওয়ার মুহূর্তে সুধীন্দ্রনাথের এই উচ্চারণের অন্তর্নিহিত গৌরব অনুধাবন করা প্রয়োজন : ‘আমি বাঙালী বলেই পশ্চিমের চিন্তাধারা আমার উপরে এতখানি সক্রিয়; এবং বিগত শতাধিক বৎসরে বাংলার কৃত্তী সজ্ঞানেরা ইংরাজী, তথা ইংরাজীর মারফতে যুরোপীয়, চিৎপ্রকর্ষের সঙ্গে যে-সম্পর্ক পাতিয়েছেন, তার তুলনা মেলে শুধু রোমক সাম্রাজ্যের সেই পর্যায়ে, যখন প্রত্যেক শিক্ষিত রোমান মাতৃভাষায় ও গ্রীকে ছিল সমান ব্যুৎপন্ন।’ (তদেব)। একথা নিশ্চয় না-শিখলেও চলে যে এই বয়ান শুধু প্রাবন্ধিকের সমকালীন ‘চিৎপ্রকর্ষ’কে লক্ষ করে নয়। আঙ্কের ইন্টারনেট যুগে চিৎপ্রকর্ষ ও মানববিশ্ব তো একই মূদ্রার এ পিঠ আর ওপিঠ। অতএব সাহিত্যবোদ্ধাদের হয় সমস্ত ধরনের রক্ষণশীলতা ত্যাগ করতে হবে নয়তো আত্মসৃষ্ট চোরাবালিতে বিকল্পবিহীন ভবে তলিয়ে যেতে হবে। চিন্তাপ্রণালী হোক আত্মজ্ঞাতিক আর আধেয় হোক দেশভক্ত—এই পাঠ আঙ্ক আমরা নিতে পারি প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথের কাছে। কাজটা সহজ নয়। কিন্তু জীবনের মননের অনুভূতির নির্যাস সন্ধানী প্রাবন্ধিক তো সহজিয়া মার্গের উপাসক নন কখনো। তিনি জানেন ‘নিশিতা দূরত্যা দুর্গং পথস্তং’ এর বার্তা বরং ভালো, কিন্তু গাণিতিক ইচ্ছাপূরণের ধরনে রতিন মরীচিকায় আত্মা রাখলে সর্বনাশ। ‘অস্তিপায়ের বোঝা হুত্বাকারে ছড়িয়ে চলার পথে মুখ ধুবড়ে’ (তদেব ; ১৯৩) পড়াই ভবিতব্য তখন। কবি সুধীন্দ্রনাথ এই প্রবণতার কথা লিখেছেন এভাবে;

অথচ আঙ্ক মজ্জাতে চায় মরীচিকাই,

প্রবঞ্চনা পরিবর্তে প্রজ্ঞা বিকাই’ (অসংগতি)

অভাবত তিনি প্রবঞ্চে এই সুসংবেদী উচ্চারণ করতে পারেন; ‘আমাদের জীবনযাত্রায় শ্রেয়োবোধের সার্বত্রিক অভাব আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় ঠেকে।’ (প্রাপ্ত) যা-ই লিখি না কেন, প্রাবন্ধিক প্রতিবেদনে জীবনসম্পর্কিত নিগূঢ় উপলব্ধি এবং শ্রেয়োবোধের সূক্ষ্ম

উপস্থিতি অস্তঃস্বর হিসেবে থাকবেই। এই মৌলিক পাঠ যিনি গ্রহণ করেন নি, তাঁর প্রবন্ধ রচনার বৈদম্ব্যের বিলাস মাত্র।

চার

‘পুনশ্চ’ এর ১৮ বছর আগে প্রকাশিত ‘সূচনা’ নিবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ এই সংকেত দিয়েছিলেন যে তাঁর প্রাবন্ধিক প্রতিবেদন গড়ে ওঠে মূলত স্বগত উজ্জ্বল-প্রত্যুজ্জ্বল বিন্যাসে। তার মানে, ভারতীয় দর্শনের পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ রীতির সমন্বিত পুনর্নির্মাণের ফসল এই বিন্যাস। সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য কেননা এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে এখনও : ‘বর্তমানের সাহিত্যসাধনা যে নৈরাশ্ব্যসিদ্ধির অভাবেই ধ্রুপদী-পদবীর অযোগ্য এবং ইদানীন্তন বিদগ্ধ সমাজ যে আনুপূর্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দোষেই সমন্বিত রসগ্রহণে অক্ষম, এমন একটা স্বতোবিরোধী বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল।’ (পৃ ৪) এখানে যে কেবল সুধীন্দ্রনাথের চিন্তা বিশ্বের অভিজ্ঞানসূচক : ‘নৈরাশ্ব্যসিদ্ধি’র প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, তা নয়; রয়েছে সাহিত্যের ধ্রুপদী স্থিতি সম্পর্কে তাঁর অশ্বলিত প্রত্যয়ের ঘোষণাও। আর আছে বিদগ্ধ সমাজ অর্থাৎ সমালোচক বর্গের ‘আনুপূর্বিক দৃষ্টিভঙ্গি’ সংশ্লিষ্ট সমস্যার কথা ও। সাহিত্যব্রতী কীভাবে নৈরাশ্ব্যসিদ্ধির শক্তিতে ধ্রুপদী পদবীর যোগ্য হয়ে উঠবেন, এর কিছু কিছু সূত্র আমরা তাঁর অন্যান্য বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারি। সত্তার মধ্যেই বিদ্বিত হয় সময় ও পরিসর, জগৎ ও জীবন, গতি ও স্থিতি। তবে ‘কখনো-কখনো প্রতিবিশ্ব আচ্ছন্ন করে দেয় মূল বিগ্রহকে। এই আশঙ্কাকে রোধ করার জন্যেও সত্তাকে সব কিছু থেকে মুক্ত হতে হয়। কেউ কেউ বলবেন, এ হলো শূন্যীকরণের প্রক্রিয়া যা সাধারণত অসম্ভব। কিন্তু সমস্ত ধরনের যথা প্রাপ্ত আবরণের বোঝা না নামানো পর্যন্ত সত্তা নতুন সূচনার প্রস্তাবনা করবে কীভাবে? আশ্রয়তার অতিরিক্ত গোলকর্ষণা তৈরি করে মাত্র; ধ্রুপদী চেতনা আসলে ব্যক্তিগত বোধের ‘কানা গলি দিয়ে’ ভাবের বেগেতে বয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

অন্যদিকে ‘আনুপূর্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দোষ’ কথাটির মর্মার্থ সতর্ক ভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কোন্ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দোষাবহ এবং কেন; এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। যে বিশ্ববীক্ষার ভাবাদর্শগত ভিত্তি নেই এবং যা যুক্তির নিরিখে সুপরীক্ষিত নয়, তা দোষের আকার হতে বাধ্য। তেমনি ‘সমন্বিত রসগ্রহণ’ কথাটিতে সময়স্বভাব নির্ণায়ক হলেও এই স্বভাব কার কাছে কীভাবে ব্যক্ত হবে—তার ওপর রসের

প্রতীতি নির্ভর করছে। আমরা যে বিরল প্রজাতির প্রাবন্ধিকের মুখোমুখি, তা এই উচ্চারণে ধরা পড়েছে; 'সাহিত্যসৃষ্টিতে বিষয়ের প্রভুত্ব খটলেও, সাহিত্যসেবার পুরোধা বিষয়ী (পৃ ৪)। অবশ্য সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যসেবার মধ্যে যেভাবে তফাত দেখানো হয়েছে, তা নিয়ে তর্ক হতেই পারে। কেননা সাহিত্যসৃষ্টিতে বিষয়ের প্রভুত্ব সবাই মেনে নেবেন না। বিষয়ীর গুরুত্ব কোন্ ধরনের সেবায়, এ বিষয়েও খটকা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত মনে হতে পারে, উদ্ধৃতিযোগ্য বাচনে প্রতিবেদনকে ঋদ্ধ করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝে রাকবিন্যাসের মোহে পড়ে গেছেন। এদের চটক আছে কিন্তু চলনে উড়ে-গিয়ে ফুরিয়ে যাওয়া স্কুলিঙ্গের স্বভাব প্রকট। তুলনামূলক ভাবে যেখানে চটক কম, সেখানেই তিনি আমাদের চিত্তাবিশ্বের কাছাকাছি। তবে বহুক্ষেত্রে তাঁর বয়ান 'নারিকেল ফলসম্মিতং বচ্চো ভারবেঃ' সংস্কৃত সাহিত্যের এই বিখ্যাত প্রবচনকে মনে করিয়ে দেয়। যেমন, 'আমাদের বস্তুপ্রভব বাহ্যজ্ঞানের বিশ্লেষণে যেমন বাস্তবের নামগন্ধ থাকে না, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অভ্যেদ্য প্রাচীর বহিঃপ্রকৃতির পথ আগলায়, তেমনই কাব্যবিবেচনা কবির খবর রাখে না, তার আদ্যস্তে ফোটে পাঠকের জীবনতিহাস।' (তদেব) এখানে ভাবার কাঠিন্য নেই ততখানি, যতটা রয়েছে ভাবের কাঠিন্য। দর্শনের বয়ান সম্পর্কে কিছুটা অবহিত না হলে এর মর্মোদ্ধার কঠিন। পাঠকের ন্যূনতম প্রস্তুতি না-থাকলে এই বস্তুবোয় অস্তবয়ন অনধিগম্য রয়ে যাবে। এ ধরনের রচনাবিন্যাসে অস্তঃস্বরই উপলব্ধির চাবিকাঠি।

যাঁর পাঠাভ্যাস আলস্যমহুর, তাঁর জন্যে নয় এই বাচন। পাঠকের হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়ায় একীভূত হয়ে যায় যখন বিশিষ্ট কোনো প্রতিবেদনের বিন্যাস-প্রতিন্যাস, এক হিসেবে তা তো জীবনকথার আরোহী-অবরোহী সুরে-তালে মিশে যাওয়া। সুধীন্দ্রনাথ আজ থেকে ৬২ বছর আগে এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। অতএব তাঁর বস্তুবোয় মধ্যে আজকের পাঠতত্ত্বের আগাম ইশারা হয়তো খুব 'বেশি দূর অবধি খোঁজা যাবে না। কিন্তু এটা তো ঠিক, তাঁর পূর্বোক্ত মন্তব্যে আমরা, আজকের পাঠকেরা, নিজেদের সময়ের উপার্জননের সঙ্গে মানানসই কিছু সংকেত পাচ্ছি। এমন কি, ছয় দশক পরেও। দুরাহতার জন্যে নিষ্পিত প্রাবন্ধিকের পক্ষে এ কম গৌরবের কথা নয়। আমরা আজ সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়তে পড়তে এটা বিচার করব না যে লরেন্স ও উল্ফ, ফক্নার ও গোর্কি, পাউন্ড ও এলিয়ট, ইয়েটস্ ও হপকিন্স কিংবা কাব্যের মুক্তি, ঐতিহ্যবোধ, উপন্যাসের তত্ত্ব ও তথ্য ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর ধারণা

কতটা মান্য! অথবা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিংবা বাংলা সাহিত্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কতটা যুক্তিসহ। 'সাহিত্যের গোয়ালে ব্যাসকূটের চর্চিত চর্বণ' সম্পর্কে সূধীন্দ্রনাথের তির্যক মন্তব্য মনে রেখেও বলব, তাঁর বহুমাত্রিক অন্তর্ভবন স্বাক্ষর সম্ভব আমাদের পাঠসত্তাকে উস্কে দেয়। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় নয়, বিষয়ীর বিশিষ্ট বাচনিক বিন্যাস এবং সেই বিন্যাসের অন্তর্ভুক্তি উপকরণই লক্ষণীয়। আর, এই সূত্রে মনে পড়ে যায় মাইকেল রিফাটেরের এই মন্তব্য : 'Whenever the reader is compelled by intertextuality to relate together signs that their ordinary meanings kept separate, the awareness of a semiotic transformation peculiar to the text causes him to re-read, to double-check. Each re-reading forces him to go through the hurdles of a new unacceptable decoding at meaning level. Each re-reading forces him to work at retrieving the elusive significance.' (১৯৯৭ : ১৮৪)

এই যে পলায়নপর তাৎপর্ষ্যের পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে বলা হলো পুনঃপাঠের অধিষ্ঠ, সূধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্পর্কে তা চমৎকার প্রযোজ্য। তাঁর প্রবন্ধের পুনঃপাঠ, আজ, এত বছর পরেও তো সংকেত-পাঠের প্রত্যাহ্বান হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে কিছু কিছু মৌলিক চিন্তাসূত্রের পুনঃপরীক্ষা, তাৎপর্ষ্যের গভীরতর স্তরে পুনঃপ্রবেশের তোরণ আবিষ্কার। অন্য প্রাবন্ধিকের তুলনায় সূধীন্দ্রনাথের প্রতিবেদনে এ ধরনের তোরণ অনেক বেশি সংখ্যায় পাই। এইজন্যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে ঐসব তোরণ 'ব্যাসকূট'। কিন্তু এদের এড়িয়ে গিয়ে প্রবন্ধের মর্মগ্রহণ অসম্ভব। নিছক সামগ্রিকতার দোহাই দিয়ে আর অনুবঙ্গ-অনুপুঙ্খের গুরুত্ব উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বরং স্বতন্ত্র স্বাধীন চিন্তাসূত্র হিসেবে এরা পাঠকের কাছে নিবিড় পাঠ দাবি করে। যেমন : ক. 'অভিজ্ঞতা অস্তিত্ত অভিজ্ঞের কাছে আত্মপ্রকাশে বাধ্য' (পৃ ৫); খ. 'আত্মপ্রকাশ ভাষার ব্যাপার—অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংস্কারের লালন ব্যতীত তার বাক্যস্মৃতি অসম্ভব' (তদেব), গ. 'অন্তর্দর্শন জন্মাবধি অন্তঃসঙ্গতির মুখাপেক্ষী' (তদেব), ঘ. সঙ্গত অভিজ্ঞতাই দর্শনপদবাচ্য' (তদেব), ঙ. 'নিঃসঙ্গ মানুষ নানাধের নৈরাজ্যেই বাস করে' (তদেব), চ. চৈতন্যের স্বভাব বহিরাযতনিক; বস্তুর পৌত্তলিকতাই তাকে জ্ঞানগোচরে আনে' (পৃ ৬); ছ. 'প্রতিভাকে নিরুপাধিক বিবেচনায় ছেড়ে দিলে হয়তো ভক্তিমাগের চূড়ান্তে পৌঁছনো যায়, কিন্তু জ্ঞানমাগের সূচ্যগ্র ভূমিও দখলে আসে না' (তদেব), জ. 'পৃথক পৃথক মানুষের বৃত্তি পৃথক বলেই, তারা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী' (পৃ. ৮); ঝ. 'অরাধ স্বাধীনতা কেবল নাস্তির

মধ্যেই সম্ভব' (পৃ ৯); এ. 'অসীমের নিমন্ত্রণ আসে কেবল 'সীমার মধ্যে' (পৃ ১০); ট. ব্যক্তিস্বরূপ সদাসর্বদা দ্বিমুখী - ব্যক্তিগত সামর্থ্যের অনুপাতে অসীমতার আতিশয্যই তার ঐকান্তিক উপলব্ধি' (তদেব); ঠ. 'কাব্যরচনা ও কাব্যবিবেচনা একই ব্যাপারের প্রকারান্তর' (তদেব), ড. 'কাব্যে তথা বৈদগ্ধ্য, উভয়-এই কীটস্-প্রশংসিত নিরাসক্তি বা নেগেটিভ কেপেবিলিটি ক্রিয়াশীল' (তদেব)। এছাড়াও মণিমুক্তো প্রতিটি প্রবন্ধেই অজস্র পাওয়া যায়।

পাঁচ

তবে সূক্ষ্মনাথ 'সূচনা' নামক সন্দর্ভের যে-অনুচ্ছেদে (পৃ ১১) প্রবন্ধ সম্পর্কে কিছু নিয়ামক বিধির মনন-সীমিত উল্লেখ করেছেন, সেই অংশটিকে আমরা এখন অনায়াসে প্রবন্ধ সম্পর্কিত ইস্তাহার বঙ্গভাষায় পারি। ৬২-বছর পরেও এর প্রাসঙ্গিকতা অম্লান; একথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। ঐ ইস্তাহারের বক্তব্য এভাবে সূত্রাকারে উপস্থাপিত করা যায় :

১. 'সময়োপযোগিতাই প্রবন্ধের প্রাণ'
২. নৈমিত্তিক বিগ্রহে নিত্যের উদ্বোধন ন্যায়ের সাধ্য নয়, নিষ্ঠারই মুখ্যপেক্ষী'।
৩. 'প্রবন্ধকার কালজ্ঞ মাত্র, উচ্চল নিমেষের পদসেবা তাকে মানায় না।'
৪. প্রাবন্ধিকের 'ভাবনা-বেদনায়' অকপট আন্তরিকতার স্পর্শ না লাগলে সে সহজেই পাঠকের মনোযোগ হারায়'
৫. প্রাবন্ধিক 'যখন সমালোচকের ভূমিকায় লোকসমক্ষে নামে, তখন তার আত্মহারা ক্ষণবাদে তার কুলায় না, ব্যক্তিস্বরূপ না হোক, অন্তত একটা নাতিভঙ্গুর আদর্শ নির্মাণে সে বাধ্য।'

প্রতিটি সূত্র আমাদের ভাবায় এখনো। ছোটগল্প-উপন্যাস-কবিতার মতো 'সৃষ্টিশীল' বাচনিক মাধ্যমে সময়-যুগপৎ অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভুক্ত, তা তো অজানা নয়। কিন্তু প্রবন্ধকে 'সৃষ্টিশীল' মাধ্যম এমনিতেই মনে করা হয় না, তার ওপর সময়ভাবের ছায়ায় তা কীভাবে লালিত—এই প্রশ্নটি কারো বিবেচনায় আসে না। অথচ কেবল পরিস্ফুট সময় নয়, অস্ফুট সময়ের বাচন এবং সেই সঙ্গে প্রতিবাচনকেও আবিষ্কার করেন সার্থক প্রাবন্ধিক। অবশ্য এর মানে এই নয় যে তিনি নিছক সময়ের ভাব্যকার; সময়োপযোগী চেতনার দিশা নির্ণয় করা এবং আপাত-সময় থেকে প্রকৃত-সময়ের অভিজ্ঞানকে আলাদা করে নেওয়াও

তাঁর দায়। আপাত-সময়ের বুদ্ধদপুঞ্জ তৈরি হয় নৈমিত্তিক বিগ্রহ। তাকে অস্বীকার করা যায় না যদিও, নিত্যসত্যের উদ্বোধনে তার কোনো ভূমিকা নেই—এই উপলব্ধি প্রাবন্ধিকের পক্ষে অনিবার্য।

আপাতসময়ের অস্থিরতা, তাৎক্ষণিকের মোহ, নগদবিদ্যায়ের হাতছানি, সমকালের ছোটখাটো মানিয়ে চলার ইশারা—এইসব প্রাবন্ধিকের পরীক্ষাগার। সংশয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর পথ চলা। সংস্কৃত ভাষায় লেখা ‘বিখ্যাত নীতিকথায় পাই : ‘ন সংশয়মনাক্রম্য নরো ভ্রম্মাণি পশ্যতি সংশয় পুনরাক্রম্য যদি জীবতি পশ্যতি।’ তেমনি প্রাবন্ধিককেও পদে-পদে স্বলন, সত্যভ্রম ও ক্ষণিকতার আবর্ত থেকে সত্যকে নিত্যকে চলিষ্ণুতাকে আলাদা করে চিনে নিতে হয়। সংশয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েই নিষ্কের বোধকে অক্ষত রেখে তত্ত্বদর্শী হতে হয়। এই হলো তাঁর কালজ হওয়ার পথ। এই পথে চাতুর্য ও কপটতা দিয়ে কিছু দূর হয়তো এগোনো যায়, কিন্তু তারপর অন্ধং তমঃ, গভীর অন্ধকার। বস্তুত তাঁর সংবেদনশীল অনুভবের জোরে সুধীন্দ্রনাথ ‘ভাবনা-বেদনায় অকপট আন্তরিকতার স্পর্শ’ এর পক্ষে সওয়াল করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের যে ভাবমূর্তি দুর্মর কুসংস্কারের মতো আমাদের মনে গাঁথা, তার সঙ্গে এই বাচন মেলে না যেন। এইজন্যে একটু আগে ‘double-check’ এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। প্রাবন্ধিক সত্যসন্ধ, সত্যে নিঃশ্বাস নেন তিনি; অকপট আন্তরিকতা না থাকলে খুব বেশি দিন পাঠকের অভিনিবেশ তিনি পাবেন না। ভাষায় কিংবা ভাবে যে-আবরণই থাক, সমকাল বুকু চাই না-বুকু, ‘উৎপৎস্যাতে অস্তি মম কোহপি সমানধর্ম্য’—এই অক্ষলিত প্রত্যয়ে মানুষের গ্রহণক্ষমতায় আস্থা রেখে আন্তরিক কর্ণণ তাঁকে অব্যাহত রাখতেই হবে। যেমন রেখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। ‘আত্মহারা ক্ষণবাদ’ নয়, খাঁটি প্রাবন্ধিকের অদ্বিষ্ট ‘অদ্ব্যুত একটা নীতিভঙ্গুর আদর্শ নির্মাণ’। কেননা মানুষের জীবন ও মনন, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, সৃষ্টি ও সংস্কার কোনো-না-কোনো ভাবাদর্শের আদল উপহার দেয়। কী তার তাৎপর্য, দ্রষ্টা চক্ষুর অধিকারী প্রাবন্ধিক শুধু তার হৃদিশ জ্ঞানেন এবং জানাতে পারেন।

‘নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত’ এই উচ্চারণ যিনি কবিতায় এনেছিলেন, প্রবন্ধে তিনি কিন্তু মোটেই একদেশদর্শী পণ্ডিত নন। তাঁর চিন্তাবিশ্বের বিপুল ব্যাপ্তি এবং মননের স্থিতিস্থাপকতা সমস্ত প্রাবন্ধিকের কাছে দৃষ্টান্তস্থল। ‘স্বগত’ এবং ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ এর প্রবন্ধগুলির প্রতি বিহঙ্গদৃষ্টিপাতেও বুঝে নেই, কতটা অধ্যবসায় আর সাহিত্যবোধ থাকলে এমন বহুমাত্রিক বয়ন সম্ভব। একটু আগে যে

সৃষ্টিশীলতার কথা বলেছি, রৌলোবার্ত ও জ্যাক দেব্রিদার কল্যাণে এ সম্পর্কে বহুদিনকার দুর্মর কুসংস্কার অনেকটা কেটে গেছে। কবিতা-হোটগার্ন-উপন্যাস-নাটকই কেবল সৃষ্টিশীলতার অভিজ্ঞান নয়, প্রবন্ধও সৃষ্টিশীল উদ্যমের ফসল—এই সিদ্ধান্তের তাত্ত্বিক সমর্থন এখন পাচ্ছি। কীভাবে পড়ব কবিতা—এই নিয়েও গভীর অনুধ্যানের প্রয়োজন। সুধীন্দ্রনাথ এই মৌলিক বিষয়েও আমাদের অন্তর্দীপ্ত হতে সাহায্য করেন। তাঁর প্রবন্ধ কেবল বৌদ্ধিক চিহ্নলিপি নয়। জোনাথন কুলের যেসব বৈশিষ্ট্যকে ‘intepretive celebration’ (১৯৯৩; ২২২) বলেছেন, তাদের উপস্থিতি প্রমাণ করে, কবিতার মতো তাঁর প্রবন্ধও সৃজনী চেতনার উৎসারণ। নতুন ধরনের প্রাবন্ধিক প্রতিবেদনের পরীক্ষাগারে সুধীন্দ্রনাথ মূলত নিয়ত-তৎপর কুৎকুশলী। মিশেলের ইতিহাসপাঠে বার্ত যেমন ‘a network of themes’ খুঁজে পেয়েছিলেন, সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধেও যে সেই ধরণটি নজরে পড়ে—তা একটু আগে দেখেছি। আজও এইজন্যে প্রাবন্ধিক সমাজে তিনি অনন্য যে তাঁর প্রতিবেদনে বিন্যস্ত অজস্র ‘flickers of meaning’ (Barthes s/2 : 19) পুনঃপাঠে প্রণোদিত করে আমাদের। মননের সৃষ্টিতে তিনি এখনও দিগদর্শক। যাঁরা সৃষ্টি ও মননের মধ্যে কল্পিত জলবিভাজনরেখাকে আঁকড়ে ধরছেন আজো, প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথের পাঠকৃতি তাঁদের চক্ষুস্থান করুক।

মিথ-পুরাণ : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের

আধুনিক কবিতায় মিথ-পুরাণের প্রয়োগ একটি সুনির্দিষ্ট বহুমাত্রিক প্রকরণ শিল্পকেই সূচিহিত করে। সাধারণত মিথ অতিলৌকিক, মিথ্যা বা কাল্পনিক রূপে ব্যাখ্যাত হলেও, মৌখিক সাহিত্য হলেও মিশ্র সাংস্কৃতিক উপাদানে তার নির্মাণ বলেও আলোচিত হয়েছে। এমন ব্যাখ্যাও জেনেছি, 'মিথ হল ব্যক্তিমানসিকানা, ব্যক্তিব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত শিল্পসাহিত্য রচনার আগের পর্যায়ের কথা যখন গোষ্ঠীজীবনের বিভিন্ন ধারণা মুখে মুখে বংশপরম্পরায় গোপীসমাজে চালু থাকত। তখনকার সব বিশ্বাস-সংস্কার অনুষ্ঠান-আচারের বিবরণই হল মিথ। কোনো এক গোষ্ঠী দ্বারা উদ্ভাবিত, বাস্তবে নিরস্তিত্ব গ্ৰহণই মিথ।' কালে কালে মিথের বিস্তার ঘটে, লোকপরম্পরায়, লোকগোষ্ঠী পরম্পরায়, সময় ও সমাজের দ্বৈত প্রক্রিয়ায়; কেউ বা বলবেন, 'মিথ মানুষের নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের অংশ' বা বলবেন, 'ব্যক্তিঅভিজ্ঞতা ও পুরাণ অভিজ্ঞানের মিথক্রিয়ায় সাহিত্য পায় শাস্ত্রত কালমাত্রা।' মিচা এলিয়ড যেমন 'Myth and Reality' সম্পর্কে বুঝিয়েছেন, তেমনি অন্যদিক থেকে অধ্যাপক Wach, Egerton Syked, Bronislav Malinowski, William Bascom, Robert Graves, Thomas Keightley, Nothrop Frye, L. Spence বা Stith Thompson প্রমুখ অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যা করেছেন মিথ নিয়ে, মিথের নানা দিক নিয়ে, মিথের সঙ্গে লোকাচার, বিজ্ঞান, লোকসংস্কার, লোকজীবনের সম্পর্ক নিয়ে। নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছিলেন, 'মিথ মিথ্যা নয়। যত ক্ষুদ্র হোক, প্রতিটি কিংবদন্তী ও পুরাকাহিনীর মূলেই একটি সত্য থাকে। সেই সত্য জাতির জীবনে পবিত্র, তাৎপর্যপূর্ণ আদর্শরূপে থাকে।' পাশ্চাত্যে যুগসত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে মিথ-কাহিনীকে আশ্রয় করে; প্রকাশ ঘটিয়েছেন, এলিয়ট, পাউণ্ড, জেমস জয়েস, টমাস মান, ট্রানহাস কাফ্ফী এবং আরো অনেকে। মিথ পুরাণের নবায়ন ঘটেছে আধুনিক সাহিত্যে। মধুসূদন দত্ত বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের কাব্যে পুরাণের, মিথের প্রয়োগ করেছেন, কোনো নির্দিষ্ট সত্যকে উন্মোচনের জন্য কিন্তু আধুনিক কালে মিথ-পুরাণের ব্যবহার একমাত্রিক নয়, জীবনের জটিলতার স্তরের থেকে তার বহুমাত্রিক উৎসার। জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে এবং আমাদের আলোচ্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মিথক্রিয়ায় কবিতাকে গড়ে তুলেছেন বর্ণময় প্রাণময় অর্থময় রূপে।

এখানে একটি বিষয় অনিবার্যত উঠে আসে, কবিতায়, বর্তমান অবস্থায়, জটিল জীবনে মিথ আসে কীভাবে? একথা তো ঠিকই লেখক এই মিথের ব্যবহার করবেন, 'সচেতনভাবে দেশকালমাত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে।' সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্শ্বপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিষ্ণু দে কালো, কালোত্তরে' গ্রন্থে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, 'টেকনোলজির অস্বাভাবিক বিকাশ, সভ্যতার একপাশে বিকাশ কিন্তু মানুষকে স্বাধীন করেনি, করেছে অসহায় নিজ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন, অথচ মানবকীর্তির নানা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য চতুর্দিকে ছড়ানো, মানব ক্ষমতার চিহ্ন বিকীর্ণ : এই দুয়ের আততিতে স্বাভাবিক ভাবেই মিথ আসে—বর্তমান-অতীতের সম্মিথিতে, সভ্যতার উষাকালের বাস্তব কল্পনার সেই নান্যকেরা, ধীমসমূহ আসে, যাদের উন্মেষে, ব্যবহারে, চিত্রকল্পে, প্রতীকে বর্তমান ধরা পড়ে।' এই আলোচকেরা মেনে নিয়েছেন মিথ বা পুরাণের পক্ষেই আধুনিক জটিল জীবনের ভার বহন করা সম্ভব। 'কারণ মিথ একই সঙ্গে সত্য ও মিথ্যা : পুরাণের সেই দেবতা অতিমানবেরা কল্পনাই। এর অর্থে মিথ্যাই। কিন্তু এই কল্পনাতেই প্রতিবিম্বিত হয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-উদ্ভাস। বিশ শতকের ভয়াবহতা নিদারুণ সত্য, তাকে অস্বীকার করা যায় না, এই সত্যকে উত্তর করতেই হয় : এই 'না' ও 'হ্যাঁ' মিথেরই পাওয়া যায়। অসহায় মানুষ এভাবেই অসীম বিস্তারের দিগন্ত পায়। বর্তমান অচেতন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা মিথের আছে, কারণ মিথ একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক, বস্তুগত ও ভাবগত।'

মিথ-পুরাণ প্রয়োগে বিষ্ণু দেৱ সিদ্ধি প্রমাণীত হলেও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রবল মিথাস্রয়ী বিষ্ণু দেৱ পাশাপাশি সুধীন্দ্রনাথ তাঁর ৬ খানি কাব্যেই কমবেশি মিথের আশ্রয় নিয়েছেন। বৃদ্ধদেব বসু স্বীকার করেছেন, 'সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুভাষাবিদ বিদ্বান; তাঁর পঠনের পরিধি ছিলো বিরাট ও বোধের ক্ষিপ্ততা ছিলো অসামান্য।' ফলে এই কবি যখন কাব্যজীবনের সূচনা থেকেই মিথের ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে কথ্যবৈচিত্র্য প্রত্যাশিত। 'তম্বী' থেকে 'দশমী' অর্থাৎ ২৬ বৎসরের কালসীমায় তাঁর কবিতাসমূহে ইন্দ্র, মহেশ্বর ও অর্জুনপ্রিয়তা হয়তো বারে বারে লক্ষ্য করি কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পুরাণের মিশ্রণও তাঁর কবিতার স্বাভাবিক লক্ষণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। 'পুরাণপ্রয়োগের শৃঙ্খলা'-ও তাঁর কাব্যের বিশেষত্ব। তাঁর অনুবাদগ্রন্থ 'প্রতিশ্রুতি' বাদ দিলে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 'তম্বী' (১৩৩৭), 'অর্কেশ্বর' (১৩৪২), 'দ্রুমসী' (১৩৪৫), 'উত্তরফাল্গুনী' (১৩৪৭), 'সংবর্ত' (১৩৬০), এবং 'দশমী' (১৩৬৩)।

‘কাব্যের মুক্তি’ প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার আধুনিকতার প্রশ্নে অতীব স্বতন্ত্র ভাবনার, ধ্যানধারণার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে তিনি যেমন ক্রমান্বয়ে মৌলিক পথের অভিযাত্রী হয়েছেন, তেমনি এ বিষয়ে তাঁর প্রশালীবদ্ধ চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন আলোচনায়, ‘কবির কর্তব্য’ তার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় একটা পরম উপলব্ধির মাল্যরচনা। কবির উদ্দেশ্য তার চার পাশের অবিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ। কবির ব্রত তার স্বকীয় চেতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চেতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চেতন্যের উদ্ভাষণ। বৈরাগ্যের দ্বারা, ত্যাগের সাহায্যে, আভিজাতিক মর্যাদাবোধের নির্মূলে এ সাধনায় সিদ্ধি পাওয়া যায় না—কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে; এবং কবি যদি মহাকালের প্রসাদ চায়, তবে শুচিবায়ু তার অবশ্য বর্জনীয়, তবে ভূক্তাবশিষ্টের সন্ধানে ভিক্ষাপাত্র হাতে নগর পরিক্রমা ভিন্ন তার গতান্তর নেই। কারণ কাব্যের পথে উল্লঙ্ঘন চলে না। সেখানকার প্রত্যেকটি খাত পদব্রজে তরণীয়, প্রত্যেকটি ধূলিকণা শিরোধার্য, প্রত্যেক কণ্টক রক্তপিপাসু, সেখানে পলায়নের উপায় নেই, বিরতির পরিণাম মৃত্যু, বিমুখমাত্রই অনুগামীর চরণাহত।’ নৈব্যক্তিকতাকে, কাব্যের মুক্তি প্রসঙ্গে, তার প্রাধান্য দেবার প্রয়াস ছিল। তাঁর অভিমত ছিল, ‘ভাষা, ভাব আর হৃদ, এই তিনের সম্মিপাতে কাব্য গড়ে ওঠে।’ কবিতা সম্পর্কে, এইভাবে, বিশেষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অধিকারী সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজ্ঞা ও কালচেতনার আশ্রয়ে মিথকেও ব্যবহার করেছেন অনায়াসে।

সুধীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘তর্কী’। কবিতাগুলি ১৯২৫-থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে লিখিত। তখন তাঁর বয়স ২৪ থেকে ২৬-এর মধ্যে। কিন্তু এই কাব্যে প্রবলভাবে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত। সুধীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন, ‘কেবল রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ বলে ধরে নেওয়া প্রায় নিরাপদ।’ কিন্তু এতটাই রবীন্দ্রপ্রভাব সহ্যেও মিথ-পুরাণ প্রয়োগে সুধীন্দ্রনাথ এখানে তাঁর নিজস্বতাকে চেনাতে পেরেছেন। এমনকি পুরাণকেন্দ্রিকতা কাহিনী হলেও পুরাণ অনুসারী নয়, রবীন্দ্রনার্থকেও যেন কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখেই তাঁর ‘উর্বশী’ কবিতা রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ‘উর্বশী’তে ‘বিশ্বের বিমূর্ত সৌন্দর্য’ কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনায় কেন্দ্রীভূত করবার প্রয়াসে উদগ্রীব। ‘উর্বশী’র পৌরাণিক সূত্রই গ্রহণ করেছেন তিনি, কিন্তু প্রেমভাবনায় তাঁর নেতিবাদকে বিসর্জন দেননি। আধুনিক প্রেমের ক্ষণস্থায়িত্ব ও ‘অন্তঃসারশূন্যতা’ পৌরাণিক প্রেমকাহিনীর ‘সমান্তরাল’ রূপে চিত্রিত হয়েছে—

তোমার সুনীল চীনাংশকের লহরমালা
সিঁদুসম যখন, বালা,
বিরল তোমার রক্তচরণ আচস্থিতে
লুপ্ত স্বর্ণ উর্বশীটির উদয় হল অবনীতে

আজকে তোমার চ্যুতবাসের লীলা খেলা
প্রাণে আগায় অবহেলা
ওই যে তোমার পাতুবুকের কৃষ্ণকূড়া
মধুতে তার নেই সে সুরা;
মর্মরপ্রায়, তোমার উরু আর না দহে;
চুষনে হিম ঝিমিয়ে রহে;
সীলায়িত অরাল ভুজের আলিঙ্গনে
বাঁধনহেঁড়ার দুরাশা আজ জাগে মনের সংগোপনে।

রিস্ততা মোর নগ্নতা মোর, দৈন্য দেখি
উর্বশী আজ পালিয়েছে কি?
সকলই আজ লুপ্ত মোদের চিন্তদেশে
প্রেমের চিতাভস্ম শেবে।

যা শুনে, শতপথ ব্রাহ্মণে, বেদে, বিষ্ণুপুরাণে উর্বশী-পুরুরবার প্রেমকাহিনী
যেভাবে চিত্রিত, কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে উর্বশীর জীবনকথা
যেভাবে উপস্থাপিত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যেভাবে উর্বশী অঙ্কিত, সুধীন্দ্রনাথ
তা থেকে অনেকটাই সরে গেলেন স্বকীয়তার জোরে। মাহবুব সাদিক ব্যাখ্যা
করেন, 'সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় 'আধুনিক কালের রূপচরিত্রই সুপরিষ্কৃত।
তার 'উর্বশী'র সীলায়িত বাহুল্যতার আলিঙ্গন ও আবেগ সম্ভারে ব্যর্থ হয়,
তা বাঁধন হেঁড়ার জন্যে প্ররোচিত করে—তবু তা দুরাশা মাত্র। অবক্ষয়িত
যুগ-সত্য ও রোমান্টিক প্রেমের সংকটই তাঁর 'উর্বশী' কবিতার পুরাণকল্পে
চিত্রিত হয়েছে।' এভাবেই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হবার আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করি, 'তম্বী'
কাব্যে, শতক্রতু, মহেন্দ্র, বিষ্ণু, পাতপত, সীতা, নারদ, একলব্য, ফাঘুনী
প্রভৃতি চরিত্রচিত্রণে।

'তম্বী'র 'পশ্চিমের ডাক' কবিতায় মহাভারত 'শান্তি পর্বের' শতক্রতুর
যজ্ঞের রেকর্ডেলে 'প্রতীচ্যর যজ্ঞাশ্বের দিগ্বিজয়' রূপায়িত হয়েছে। 'পৌরাণিক
অভিধান'-এ জানা যায়, শতক্রতু ইন্দ্রর এক নাম। ইন্দ্র শত্রুদের জয় করবার
জন্য পরপর একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই জন্য ঐর নাম

শতদ্রুত। 'পশ্চিমের ডাক' উচ্চারণের মধ্য থেকে প্রতীচ্যানুরাগের ছবিই পাওয়া যায় না, প্রতীচ্যের যজ্ঞাশ্বের দিগ্বিজয়ের অপ্রতিরোধ্যতাও লক্ষ্য করা যায়, মহেন্দ্র কুলিশ বা কুবেরের ভাণ্ডার তার গতিরোধ করতে পারেনি—

নিত্য তীর্থযাত্রী তুমি। রশ্মিদীপ্ত তব সঞ্চারণ
কী অধরা গাথা তার শূন্যে শূন্যে দেয় বিকীর্ণিয়া।
তোমার মেঘের অশ্ব, শতদ্রুত, মানে না বারণ
স্ববির মুমূর্ষুগণে বিনা ক্ষতে যায় বিদীর্ণিয়া
মহেন্দ্র কুলিশ হানি, পারে নাই তোমারে জ্বিনিতে
কুবের ভাণ্ডার দানি, পারে নাই তোমারে কিনিতে;
অস্থিষ্ট রহস্য তার পারে নাই ধরা গোপনিতে।
প্রলয়সমুদ্রমহি, তুলিতেছ নবীনে সৃষ্টিয়া।

অন্য কবিতায়, বসন্তের আরক্তিম অস্পষ্ট উষ্ম, কৈশোরের উগ্র দূর্পে, গর্বিত আদেশে, কখনো বা প্রমাতুর কঠোর উচ্চারণে শোনা গেছে পুরাণ-প্রতিবেদন, মিথপ্রিয়তা—

দলিতপালিত তব জীর্ণ দীর্ণ সভাসদগণে
দেখায়ে, বলিয়াছি, "ইহারা কি জ্বিনিবে শমনে?
এনে দিবে অমৃত সন্ধান?
ইহারা কৈদাস জঙ্ঘে
যুঝে মহেশের সঙ্গে
পারিবে, আনিতে কেটে হিংসাহতা পাশুপত বাণ?
দাও মোরে তব বীণা, মোর হাতে হবে সে মুখরা।
বিস্ময় নয়নজলে উদ্ধারিব আমি বসুন্ধরা
খোলো দ্বার স্বরা। (অস্তিম গীতিকা)

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অর্কেষ্টা (১৯৩৫) দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যের সর্বত্র প্রায় ভারতীয় পুরাণ প্রসঙ্গ উপস্থাপিত। জগদীশ ভট্টাচার্য 'অর্কেষ্টা'কে 'অনেকান্ত অনুরাগের কাব্য' বলতে চেয়েছেন। এ কাব্যে সুধীন্দ্রনাথকে আর আগাপোড়া রবীন্দ্রনিষ্ঠ বলা যাবে না। এই কাব্যের ভূমিকায় বৈদান্তিক পিতৃদেবের কথা মনে রেখেই নিজের 'অনেকান্ত জড়বাদের আশ্রয়' গ্রহণের কথা বলেছেন। তিনি 'প্রেরণা'র অলৌকিকত্বের আভাস বর্জন করে অভিজ্ঞতাকেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। হ্রোচের উক্তি ও উপলব্ধির অভেদের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠতার বিবাদও তাঁর চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথকে তিনি ছাড়েননি বটে, কিন্তু হাত ধরে নেই। এখানে পৌরাণিক চরিত্র এসেছে মৃত্যু ও ধ্বংসের চিত্রকল্পে, প্রেমের বিচিত্র অনুভবে। ২৫টি কবিতায় ঘুরেফিরে

এসেছে মহাশ্বেতা, ইন্দ্র, ফাঙ্কুনী, কীচক, মহেশ, ইন্দ্রাণী, উমা, রাবণ, শিব ইত্যাদি চরিত্র।

‘মহাশ্বেতা’ কবির কাছে ‘ক্ষণিকা পরমা’। এই মহাশ্বেতা পুরাণ চরিত্র। ‘দেবীপুরাণে’ বলা হয়েছে, দেবী দুর্গা-মহাভাব আশ্রয় করেও শ্বেতা ও উজ্জ্বল মহাদেবকে আশ্রয় করে আছেন বলে ঐর আর এক নাম হয় মহাশ্বেতা’। সমালোচকদের অনুমান, এই পর্বে সুধীন্দ্রনাথ বিদেশগমন করেন ও কোনো বিদেশিনী তাঁর হৃদয় অধিকার করেন, ‘শাস্বতী’ কবিতায় তার ইঙ্গিত এবং ‘তাকেই মহাশ্বেতার অনুবদ্যবাচকতায়’ প্রকাশ করেন। সেই ‘ক্ষণিকা পরমা’কে তিনি সপ্তসিদ্ধিপারে বিচক্ষণ নারিকেল বন ছুঁয়ে লক্ষ্য করেন; বলেন—
সমস্ত ভুবন জুড়ে, আবার এঙ্গে কি

ক্ষণিকা পরমা?

প্রতিবেশী পত্রে পুষ্পে নেহারি যে তোমারি উপমা;

ঘুচে যায় ভয়;

জানি জানি বিধাতা হৃদয়

কোনও দিন পারিবে না অগলিতে সে স্বর্গের দ্বার

ইন্দ্রহের ঋক অধিকার

তোমার প্রেমের স্মৃতি রচিয়াছে মোর লাগি যেথা

অয়ি মহাশ্বেতা।

‘অর্কেষ্টা’য় পুরাণপ্রসঙ্গ, মিথঙ্কিয়া, পুরাণকল্পের ব্যবহার এভাবেই ভিন্ন মাত্রায় সমৃদ্ধ। যেমন—

১. তোমারে ছুলিব আমি, তুমি মোরে ছুলিবে নিশ্চয়;

মদনের চিত্তানন্দে অনঙ্গের হবে আবির্ভাব;

(ভবিতব্য)

২. হায় গর্বাশ্বিতা,

দানবিক আত্মারে যে-অনির্বাপ রাবণের চিতা,

ভস্মান্ত না করে, দহে হৃদয় সৈকতে

ভাবো তুমি জন্মে জন্মে, পুনরুন্মত্ত শপথে শপথে

যোগাও ইচ্ছন তার লাগি?

(কষ্টে দেবায়)

৩. গৌরী কাপালিকা

দাঁড়াল সম্মুখে আসি, নয়মেধ প্রসঙ্গের শিখা

প্রতিভাত করি তার রৌপ্য স্তনতটে।

.....
.....
দলিত সুন্দর, শান্ত শিব পদতলে।

(পুনর্জন্ম)

৪. মহাকাল

আমার ঈর্ষার বিষে নীলকণ্ঠ কখনও হবে না।

মুঢ়তার সেনা

ফাঙ্কুর প্রতিপক্ষে স্বরণের অক্ষম সঞ্চয়

জমাবে না পশুশ্রমে যাবার সময়।

(সর্বনাশ)

৫. উশ্মন আলসে

নিঙাড়ে আয়ুর সার ত্রিকালের স্বামী

নির্মীলিত নেত্রে দেখি আমি

মহাকাল হস্তচ্যুত, অপ্রচুর অস্তিম নিমেষ

ক্ষণে ক্ষণে হয় নিরুদ্দেশ

প্রতিধ্বনি পরিপূর্ণ বিশ্বস্তির অতল পাতালে।

(পুনর্জন্ম)

৬. কিরাতের রক্ত কুশা বাধা আর পায় না ভুতলে।

(অনুষঙ্গ)

‘অর্কেষ্টা’র প্রকরণশৈলী সম্পর্কে পাঠক-সমালোচকদের প্রতিক্রিয়া অনুভব করে সুধীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ছিল, ‘অর্কেষ্টা অভিধেয় বহুরূপী লেখাটা, বাক্যের অসহযোগ সত্ত্বেও, কায়মনের সপ্তপদী; এবং তার সাতকাণহ যেমন গতিমূলক পরাকাষ্ঠার সোপান’ পরম্পরা, তেমনি প্রত্যেক পর্ব আবার ত্রিবিধ উপাধির উপলব্ধির তাৎকালিক সমন্বয়। অর্থাৎ প্রতি ভাগে ঘুরে ঘুরে এসেছে রঙ্গালয়ের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য, শ্রাব্য ঐকতানের অতিশ্রুতি ব্যঞ্জনা, আর শ্রোতৃবিশেষের সমবায়ী ভাবানুষঙ্গ; এবং সমগ্র কবিতার ত্রিবেশীতে একদিনের সাতপ্রহর ব্যাপী অভিজ্ঞতাই কৈবল্যপ্রার্থী নয়, তাতে...বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরাঙ্গার, তথা লোকায়ত ও লোকোত্তরের, অবৈকল্যও অন্তত উহ্য আছে।’ ‘অর্কেষ্টা’ নাম কবিতায় মহত্তম কলাবিধি কবিতার গঠনকে করেছে ঘনপিনক, পর্বে পর্বে বিন্যস্ত হয়ে ‘প্রেমমানসের সংগীত তনু’ হয়ে উঠছে অসামান্য, পুরাণ প্রয়োগে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন—

সে যেন মায়ামৃগী, বিতরি কস্তুরী

পাগল বায়ুসনে খেলিছে সুকাচুরি।

কখনও বনছায়া ঢাকে সে বরকায়া;
কভু সে-পীত মায়া আলোরই কারিশুরি
অঙ্গরীতে প্যানে খেলে কি লুকাচুরি।

গ্রীক পুরাণের প্যান প্রসঙ্গ এখানে চমৎকার তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং তুলনীয় হয়েছে প্রাচ্যপুরাণের অঙ্গরীর সঙ্গে। ‘পাগল বায়ু’ এবং ‘চলচঞ্চলা নদী’র সঙ্গে গ্রীক মেঘপালকের দেবতা প্যান ও অঙ্গরীর তুলনা করা হয়েছে। আবার অন্যত্র মালার্মের ফনের সঙ্গে অর্কেস্টার নায়ক তুলনীয় হয়েছে। দীপ্তি ত্রিপাঠী ‘অর্কেস্টা’র ‘সঞ্চয়’ কবিতার উল্লেখসূত্রে জানিয়েছেন, ‘স্বপ্নভঙ্গে অঙ্গরীর অপ্রাপ্তিজনিত তীব্র হতাশায় ফনের বেদনার মতোই বিদেশিনী নায়িকার নিষ্ঠাহীন বন্ধু প্রেমের জন্য ‘অর্কেস্টা’র নায়কের বেদনা। পার্থক্য শুধু এই যে, মালার্মে তাঁর পাত্রপাত্রীকে নিয়েছেন গ্রীক উপকথা থেকে আর সুধীন্দ্রনাথের পাত্রপাত্রী বিংশ শতাব্দীর।’ কিন্তু ‘অর্কেস্টা’ কবিতাতেই গ্রীক উপকথার রেফারেন্সে সুধীন্দ্রনাথ মিথপ্রিয়তার পরিচয় দিতে কসুর করেন নি।

‘অর্কেস্টা’ নাম কবিতার পঞ্চম প্রহরে মিথের ব্যবহারে রূপক নয়, বর্তমান কালের ‘প্রতিরূপক’ের [allegory] দৃষ্টান্ত—

আজ মহেশ মেলেছে বিলোচন,
পায়ে তাম্বু জেগে উঠেছে;
হল বিজ্ঞের শাপবিমোচন,
পুন সৌরলোকে সে ছুটেছে।
বুঝি উদ্ঘাট দ্বার নরকের;
যত তুণিত পিশাচ মড়কের;
তারা মেতেছে গাঞ্জে চড়কের

এখানে মহেশ, বিজ্ঞ, প্রলয়শের মিথ প্রসঙ্গ এসেছে। সামগ্রিক বিচারে, মাহবুব সাদিকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ‘অর্কেস্টার মিথ-রূপায়ণের মধ্য দিয়ে শুধু জাতীয় মানস নয়, সমকালীন বিশ্বের ভয়াবহ ও ভয়ংকর সংকটই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৈশ্বিক ও ভারতীয় জীবনের সংকট, প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থির পৃথিবীর সামাজিক ও আর্থরাজনৈতিক স্থিতিহীনতা, মানবিক মূল্যবোধের ব্যাপক পরিবর্তন এবং মানবিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ‘অর্কেস্টা’য় আসন্ন প্রলয়ের পুরাকল্প রচনা করেছেন।’

‘ক্রন্দসী’ (১৯৩৫)-র কবিতাগুলি ‘অর্কেস্টা’র সমকালেই রচিত হলেও গোত্রবিচারে স্বতন্ত্র। যুগসচেতন সুধীন্দ্রনাথ এখানে ডেকাডেন্ট কালের ছবি

আঁকতে অনীহা প্রকাশ করেন নি। ভারত পুরাণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ঝোড়ো যুগের সংকেতকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তীব্র অসহায়তার কথা উচ্চারণ করেছেন—

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?

মনস্তাপেও লাগবে না ওতে ছোড়া

অশ্লিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?

কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া। (উটপাখী)

এই কবিতাতেই প্রশ্ন রেখেছেন, ‘অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?’ তাঁর কবিতায়, কি এই কারণে অশ্রুকুমার সিকদার ‘বহ্যাত্ম, অক্ষমতা, নিষ্ফলতাবোধ’ প্রধান কথা ভেবে নিয়েছেন? এই কাব্যে কি সুধীন্দ্রনাথকে কেবল ‘নেতিবাদী, শূন্যতাবিলাসী ও অনিয়মপন্থী’ বলে মনে হয়? ‘ক্রন্দসী’ কাব্যের নানা কবিতায় সঞ্জয়, দুঃশাসন, অহল্যা, নটরাজ, নীলকণ্ঠ, ইন্দ্র, নহষ প্রভৃতি পুরাণচরিত্র উল্লেখিত হয়েছে। ‘অকৃতজ্ঞ’ কবিতায় ‘বিনষ্ট বর্তমান’ বিষয় হয়েছে এবং সমুদ্রমহলের পুরাণকল্প এখানে সমীকৃত হয়েছে সমকালের সঙ্গে

পেয়েছি আমছিয়া কালের বারিধি;

করেছি তা আত্মসাৎ, শুধু বিয়কণ্ঠে গেছে ধামি।

দেখেছি এ মরচক্ষে নটরাজ মহাশূন্যে নাচে;

শুনেছি পার্শ্বব কানে সে নক্ষত্র-নুপুরের ধ্বনি।

তথাপি আমার বীণা বাজিয়েছে বেসুর পিশাচে;

‘প্রার্থনা’, ‘প্রত্যাখ্যান’, ‘প্রতর্ক’, ‘কাল’, ‘নরক’, ‘মৃত্যু’ কবিতায় মিথ-পুরাণের আবহে, প্রয়োগে কবিতার অন্তঃসার আধুনিকের প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে। অশ্রুকুমার সিকদার মন্তব্য করেছেন, “পুরাণকথার মধ্যে নিহিত থাকে অপরিণীত সৃজনীশক্তি। আবহমান কাল ধরে মানবচেতনায় বদ্ধমূল পুরাণকথাগুলির অলৌকিক উপাদানসমূহ বিজ্ঞানযুক্তিবাদের প্রসারে অগ্রাহ্য হয়ে যায়, কিন্তু তার গুঢ় সাংকেতিক দ্যোতনা হারায় না। শৃঙ্খলাহীন নির্জ্ঞান নিয়ন্ত্রণকারী চেতনার মধ্যে নিত্যদ্বন্দ্ব অবশেষে পুরাণের ‘Stylized yet flexible symbolic structure’-এ ঐক্য ও সামঞ্জস্য লাভ করে। এই সাংকেতিকতা নিহিত আছে বসেই ভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটেও পুরাণকথা পুনর্জন্মান।’ এই যে ভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপট, একে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট হিসেবেও চিহ্নিত হতে পারে। পুরাণের এই ব্যবহার পদ্ধতি অর্থের নবত্ব লাভ করে সমকালসূত্রে—

দেখি না কি মোরা নির্বিবাদের

কবিতায় 'জেন্সন-মেদেয়ার-নাম' পাঠ্য পায়। 'ইউরিপিডিস তো 'মেদেয়া' নটিকই লিখেছিলেন ৪৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। সেখানে জেন্সনের স্বার্থবুদ্ধি সমর্থিত না হলেও পরে হাতসর্ব্ব্ব জেন্সনের আত্মনাদে পাঠকের এবং ইউরিপিডিসের সহানুভূতি পায়। 'আপোলোনিয়াসের চার খণ্ডে রচিত 'আর্গোনটিকা' কাব্যে জেন্সন কাহিনী বিশেষ স্থান পেয়েছে। ওভিদের 'স্বতন্ত্র ট্রাজেডি 'মেদেয়া'র কথা শোনা যায়। তাঁর পনেরো খণ্ডে রচিত 'মেটামরফোসিস' কাব্যে জেন্সন কাহিনী জায়গা পেয়েছে। প্রবল মণীষা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ওভিড সেনেকার লেখা 'সুধীক্ষনাধ' অবশ্যই পড়ে থাকবেন। সুমিত্রা চক্রবর্তী মন্তব্য করেন, 'সুধীক্ষনাধ দস্ত কৃত গ্রীক পুরাণের এই প্রাচীন কাহিনীটিকে ব্যবহার করেছেন নিজে মতো করে। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের মানুষের প্রতিনিধি রূপেই তিনি একেছেন জেন্সনকে। সেই মানুষ এক নির্মম সময়ের জাতক, এক নিষ্ঠুর পৃথিবীর নাগরিক। এক জটিল ও আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক সভ্যতার অস্তগত জীব, নিজেও সে কম জটিল নয়। এই জেন্সনকে অনুভব করা; জেন্সন-এর বিশেষত্বকীয় মানুষের আত্মপরতা, কামনা ও উচ্চাশা; আবার একই সঙ্গে ক্লান্তি হতাশা ও শূন্যতাবোধের সংশ্লেষে রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না ইউরিপিডিস, ওভিড বা সেনেকার পক্ষে। প্রাচীন মিশ্রকে নতুন রূপদানে আধুনিক কবির প্রায় আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছেন একালে পৃথিবীর সব দেশেই।' আমাদের এখানে 'সুধীক্ষনাধ দস্ত-ও এই সাফল্যের অধিকারী।

'জেন্সন' কবিতাটি জেন্সনের জীবনবন্দিতে রচিত। বীর ও সীতার দক্ষ জেন্সন প্রথমেই বলেছে—
 'বহু কষ্টে লিখেছি সীতার চরিত্র।
 'অসুখত স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়া শক্ত নয় আর।
 'নদীতেও নানা বাঁক আছে।
 'সেগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে ঠেকে গিয়ে বাঁক
 এমন লোকেও যারা সীতারের সিঁচুই জানেন।
 'সমুদ্র তো তাদের চানে না।
 'শরে বা শৈবালে
 'কিংবা মৎস্যনারীদের সবুল চুলের ঊর্ধ্বাঙ্গে।
 'জড়ায় না তারা কানামাছির মতন।
 'জেন্সন পিতুরাঙ্কো পৌছে দেখেছেন, তাঁর পিতার সিংহাসন অন্যের দখলে। জেন্সনের একপায়ে জুতো। সিংহাসনে আসীন ব্যক্তি তার সম্ভাব্য যাতককে দেখে স্কাট্রোস সংগ্রহে পাঠান। এরপর ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক অভিযান।

জেন্সনের মেদিয়া প্রেম ও প্রেমের ব্যর্থতা বর্ণিত হয়। জেন্সন মেদেয়ার কাছে সন্তান পায়। তবু ঘর বাঁধে নি। জেন্সন রীতি ভেঙে মেদেয়াকে ত্যাগ করে। দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করে। পূর্বপত্নীর সন্তানদের পরিত্যাগ করে। গ্রীকপুরাণের এই কাহিনীও রূপান্তরিত হয়। জেন্সন গৃহধর্ম চায়নি। রাজধর্ম চায়। মেদেয়ার ইচ্ছানুগ না হওয়ায় তার অবধারিত হয়ে যায় সর্বনাশ। মেদেয়া একসময় তাকে ছেড়ে যায়, হত্যা করে যায় দুটি সন্তানকে, মেদেয়ার কারণেই দ্বিতীয় পত্নীরও মৃত্যু ঘটে। কিন্তু মেদেয়ার প্রতি জেন্সনের অন্যায় আচরণ সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে নেই। জেন্সন হতভাগ্য। তার পরিণাম শোচনীয়। তাই বলেছেন,

ফলত নিরালস্য, নিঃসন্তান, নিঃস্ব আত্ম আমি

অন্তর্যামী

সাধ ও সাধের ভেদ গোলায় কেবলই

ঘটে অন্তর্জালি

শতছিন্ন তরণীতে; কিন্তু ভাবি অকুল পাথারে

স্বৈচ্ছায় চলেছি ছুটে; বস্তুত জোয়ারে

ততটাই ফিরে আসি, যতখানি এগোই তাঁটাতে

অশ্রীরীরা, বসে আঘাটাতে

নিশ্চেষ্ট কৌতুক দেখে: স্তম্ভ পাখা

সাগর বলাকা

অধীর চীৎকার হানে সন্ধ্যার আকাশে।

এখানে ‘নিরালস্য, নিঃসন্তান নিঃস্ব আমি’—এ কি সুধীন্দ্রনাথের আত্মকথা? তাঁর ব্যক্তিজীবনের কথাও? কোনো বিদেশিনীর সঙ্গে অপূর্ণ প্রেম, প্রথম পত্নীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, দ্বিতীয়া পত্নীর সঙ্গেও মিশ্র সম্পর্ক, একমাত্র সন্তানের জন্মের অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যু অর্থাৎ সন্তানহীনতা—এর মধ্য দিয়ে অচরিতার্থ স্বপ্নের জন্য হাহাকার ফুটে ওঠে নাকি? জেন্সন কাহিনী শুধু কি ব্যক্তিরই কাহিনী? সময় ও সমাজ সম্পর্কিত নয়? যথোচিত এই অভিমত যে ‘সুধীন্দ্রনাথ দস্তের ‘জেন্সন’ একটি পূর্ণ পুরাণ প্রতীকী কবিতা। এ পুরাণ গ্রীস দেশজাত। কিন্তু পুরাণ কাহিনীটি যখন প্রতীকত্ব পেয়েছে তখন তার নিহিত অবলম্বন হয়েছে বিশ শতকের মানুষ। আন্তর্জাতিক মানুষ। যে মানুষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে নিজের স্বপ্ন আর পারিপার্শ্বিক বাস্তবের বিরোধী আবর্তের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে স্বধর্মে স্থিত থাকার সংগ্রামে বিনাশ বরণ করেছে বীরের মতো। জেন্সন কাহিনীর এক নবীনতর রূপায়ণ এই কবিতা।’

‘যযাতি’ কবিতাটি ১৯৫৩য় রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। কবি খণ্ড

স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক। যুদ্ধ থেকে গেলেও তার রেশ মিলিয়ে যায় না। যযাতি কহ্মাত্রিক কবিতা। এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ও রায়বো স্থান পেয়েছেন। এর থেকেও বোঝা যায় পুরাণ আর ইতিহাস, সময় ও ব্যক্তি হাত ধরাধরি করে উঠে আসছে তাঁর কবিতায়। মহাভারতের আদিপর্বে কথিত চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র যযাতি ও তাঁর দুই স্ত্রী দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার কাহিনী এই কবিতার অবলম্বন। একদা দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার কলহসূত্রে দেবযানীকে কূপে পতিত হতে হয় ও রাজা যযাতি তাকে উদ্ধার করেন। প্রথমে আপত্তি থাকলেও পরে দেবযানীকে বিবাহ করেন তিনি। দুই সহস্র দাসী ও শর্মিষ্ঠাকে রাজা স্বগৃহে নিয়ে এসেন। ‘কালক্রমে দেবযানীর একটি পুত্র হল। পরে শর্মিষ্ঠার ঋতুকাল উপস্থিত হলে তিনি রাজাকে তার ঋতুরক্ষা করতে বললেন, কিন্তু শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠার সহিত সহবাস করতে যযাতিকে নিবেদন করেছিলেন। অবশেষে শর্মিষ্ঠার অনুনয় বিনয়ে দেবযানীর অজ্ঞাতে যযাতি শর্মিষ্ঠার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করলেন। (পৌরাণিক অভিধান)। দেবযানী এই ঘটনা শুক্রাচার্যকে জ্ঞানালে তিনি যযাতিকে ‘দুর্জয় জরাগ্রস্ত’ হবার অভিশাপ দেন। অনেক অনুরোধের পর শুক্রাচার্য বলেন, ‘তাঁর শাপ মিথ্যা হবে না, তবে যযাতি ইচ্ছা করলে অন্যের দেহে নিজের জরা সংক্রামিত করতে পারেন।’ জরাগ্রস্ত যযাতির অনুরোধে দেবযানীর দুই পুত্র ও শর্মিষ্ঠার প্রথম দুই পুত্র তাঁর জরা নিতে চায় নি। পরে শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র রাজি হওয়ায় যযাতি জরা বিনিময় করেন এবং দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার চারপুত্রকে অভিশাপ দেন এবং শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্রকে ১০০০ হাজার বছর পর যৌবন ফিরিয়ে দেবেন, প্রতিশ্রুতি দেন ও রাজ্যপদে বৃত্ত করেন। নিজেই অহঙ্কারবশত ধার্মিক মনে করায়, স্বর্গসুখ সহ্যেও, অস্তরীক্ষ পথে স্বর্গপ্রাপ্ত হন। পথে দৌহিত্র তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁদের পুণ্যবলে স্বর্গে প্রেরণ করেন। এই যযাতিকাহিনী যেন সুধীন্দ্রনাথে এসে ভিন্নতা পায়, আধুনিক যযাতির ভিন্ন কথা পৌরাণিক যযাতি থেকে—

...দেবযানী-শর্মিষ্ঠা কলহকল্লাপে

আমার অদ্বৈত সিদ্ধিপণ্ড হয়ে থাক বা না থাক

অকাল জরায় আমি অবরুদ্ধ নই শুক্রশাপে

অজ্ঞাতগুরুর সঙ্গে ব্যতিহার্য নয় দুর্বিপাক।

অর্থাৎ প্রকট বলে সঙ্কোচের অনন্ত বক্ষণা

পঞ্চাশে পা না দিতেই, অস্তরীক্ষী নৈমিষে নির্বাক :

এবং রটায় বটে মাঝে মাঝে আজও উদ্ভাবনা

পরিপূর্ণ মহাশূন্য ভয়ীভূত জ্যোতিষ্কের থেকে....

শেষ স্তবকের এই উক্তি থেকে স্পষ্ট কবি যযাতির পরিচয় নিতে চান না, পরিচয় রাখতে চান না, মুছে দিতে চান। দেবযানী-শর্মিষ্ঠা, শুক্রশাপ, পুত্র-পুরু প্রসঙ্গ তাঁর জীবনে নেই। তাঁর ব্যক্তিপরিচয় এভাবেই উচ্চাৰিত হয়েছে—

আমি বিংশশতাব্দীর

সমান বয়সী, সম্ভ্রম্যমান বঙ্গোপসাগরে;

নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে বিপ্লবে-বিপ্লবে

বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে

নিরুজ্জর, অস্তিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে

যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।

কবিতার শেষ স্তবকের শেষাংশে নৈরাশ্য, নেতির বিস্তার, আত্মজ্ঞি-আরী ঘৃণার সমার্থকতা চলে আসে। পৌরাণিক যযাতি থেকে ভিন্নতা সাধ করে। সূচনাতেও আধুনিক যযাতির উদ্বীর্ণ পঙ্খাশের আক্ষেপ বা পরিতাপ লক্ষ্য করি। মানুষে মানুষে সম্পর্কের দূরত্ব দেখেও কবি বিমর্ষা যুদ্ধ ও ধ্বংসে পেরিয়ে আসা কবি বসেছেন—

আশ্রিত তীরক

অন্যত্রও অনাগত। জাতিভেদে বিবিধ মানুষ;

নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা। কিন্তু তারা

প্রাচীন পরিখা, রক্ষী, গুপ্তচর ঘেরা প্রাসাদে

উন্নিত যেহেতু, তাই ভগ্নসেতু নদীতে নদীতে

মরু নগরে নগরে। পশ্চাত্তরে অতিবেল কাঁরা

তথা সংক্ৰমিত মেরু ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষ; ঘেবে

পুষ্ট চীন থেকে পেরু; প্রতিহিংসা মানে না সিদ্ধুর মানা।

বিশ্বব্যাপী এই ভৈদ-বিরোধ-সংঘর্ষ পরস্পরে অবিশ্বাস, আত্মহীনতা।

একনায়কেরা নিরঙ্কুশ কিন্তু নিশ্চিন্ত নয়। দেশে দেশে বিদ্রোহ প্রথম স্তবকের

‘আমি’ পৌরাণিক রাজা যযাতির প্রত্যেকে উপস্থাপিত একাধারে ‘পণ্ডলু

বিবেকহীন মানুষের প্রতিনিধি। আবার ধেরতরী, কর্মতালুর্ এবং সম্রাট

প্রশাসনের নির্দয়তায় পিষ্ট জনসাধারণকেও তুলে ধরেছে যযাতির আড়ালে

এই নায়ক। বিশ শতকে যেমন শাস্তি নেই, উনিশ শতকেও ছিল না, মাতাল

তরঙ্গী-রচয়িতা রায়বোরও শাস্তি মেলেই, শাস্তির গ্রাম বৃজে পায়নি।

সুধীন্দ্রনাথ ‘যযাতি’তে পুরাণ প্রসঙ্গ উল্লেখ উপস্থাপনায়, বিশেষত ব্যাপ্ত

বিশ্বের প্রেক্ষিতে, নতুন কোনো বোধ আগাতে চেয়েছেন। ফলে জেমস

জয়েসের ‘ইউলিসিস’, কার্ণকার ‘মেটামরফিসিস’ বা হোমিরওয়ের ‘ওডিস্সিয়ান

সুধীন্দ্রনাথের ‘জাগ্রত চেতন’ :

সমীকর আঁধার থেকে অভীক্ষার নিঃসঙ্গতা

কেক ঘটক

“মানবচেতনের ধারা না বদলাক, তার জটিলতা নিরন্তর বাড়ছে; এবং ফলে আজকালকার সমাজ শুধু শ্রম-বিভাগে বাধ্য নয়, এমন কি এন্টোপির প্রক্রিয়ায় পুরাতন স্ফৈটিকু এখন অচিন্ত্য। সুতরাং শেক্সপীয়ারের যুগ দূরের কথা, টেনিসনের আমলেও দেশভক্তি, প্রেম, ঈর্ষা, দম্ভ ইত্যাদি নির্বিশেষ বিষয়ে যত সহজে কবিতা লেখা যেত, সাম্প্রতিকদের কলম আর তত অনায়াসে চলে না; বরং সাবেকী বিলাসবস্ত্র ইদানীং যেমন নিত্যব্যবহার্যের কোঠায় নেমেছে, তেমনই প্রাচীন কাব্যের মুখ্য উপজীব্য আবেশ আর কারও মুখে রোচে না, পাঠকমাঝেই খোঁজে অনুভূতির বৈচিত্র্য।”—শিল্প ও স্বাধীনতা; কুলায় ও কালপুরুষ। যুগচেতন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ‘অনুভূতির বৈচিত্র্য’-সঙ্কলনী পাঠকের সামনে স্রষ্টা হিসেবে যখন আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাঁর মস্তব্যের উদ্ধৃত নিরিখটি সামনে রাখলে সেই সম্পর্কে কবির ‘জটিল’ চেতনের স্বরূপ হয়তো স্পষ্ট হতে পারে।

প্রাচীন কাল থেকে যে-সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে ব্যক্তিক ভাবনা-অনুভূতির ক্ষেত্র তৈরী হয়ে ওঠেনি। জীবনদৃষ্টির কৌণিক বিশিষ্টতায় বিষয়নিষ্ঠ রূপচিহ্ননই সেখানে ক্রিয়াশীল। রামায়ণের একটি দৃশ্যের কথা ধরা যাক। রাক্ষস অপহৃত হবার পর চেড়ীপরিবৃত্তা অবস্থায় অশোকবনের অন্ধকারে কাটিয়ে এসে পতিমিলনের পরমলগ্নেই অস্ত্রঃসত্তা সীতাকে নির্বাসিত হতে হলো। তারপর তপোবনে দীর্ঘকাল ধরে দুই ছেলেকে একলা মানুষ করেছেন তিনি; অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, কোল জুড়ে থাকা বীরলক্ষণযুক্ত দিব্যকান্তি শিশুরাজপুত্র—এই নিয়ে সীতার দিনরজনী ঘিরে কত না অশ্রুজল। তারপর ঘটনাক্রমে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞসভায় সহস্র মানুষের চোখের সামনে সম্ম্যাসিনীবেশে সীতা যখন এসে দাঁড়িয়েছেন, কতো দিনের অদর্শনের পর তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রেমময় স্বামী, স্বামীপ্রেমের স্বাক্ষর স্বর্ণসীতামূর্তি—এইসব দেখে সীতার আন্দোলিত হৃদয়ের, অথবা ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতিমা সাক্ষী স্ত্রীকে আকস্মিকভাবে রাজসূয় যজ্ঞস্থলে প্রত্যক্ষ করে অপরাধবোধে

বিস্তৃত রামের মনে যে মাধুর্যময় বেদনার ক্ষরপ, তারই অভিব্যক্তি তো হতে পারে—

একটি নিমেষে দাঁড়াল সরণী অুড়ে,

ধামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;

কিন্তু সেকথা বর্ণনার জন্য ধামেননি পুরাণকার। সেই ক্ষণিক মুহূর্তের অনুচিন্তন তো ক্লাসিসিস্টের কাজ নয়। বরং নির্জিন্ত ঔদাসীনে এ সমস্ত সূক্ষ্ম-জটিল ব্যক্তি-হৃদয়ানুভবের পাশ কাটিয়ে যান তিনি। প্রশস্ত জনাকীর্ণ সভায়, সভার বাইরে তখন সাড়ম্বর আয়োজন উদ্বেলিত। সেখানে সমবেত কণ্ঠে সীতার অগ্নিপরীক্ষার দাবীই তাঁর মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। জীবনদৃষ্টির ক্লাসিক অথবা রোমান্টিক ধর্মের মধ্যে যে তফাত, সে দৃষ্টিভঙ্গিরই তফাত। জীবন তো সেই একই, অপরিবর্তিত মানবচেতন্যের ধারাকে; বহন করে চলেছে।

এদেশে উনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত 'বুদ্ধোন্মাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের' নীতিগত তথা ইতিহাসগত ভিত্তি চেপে বসেছিল। সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নৈতিক ভিত একটা সময়ে টলে উঠেছে বিশৃঙ্খলার বিশ্বময় তাণ্ডবে। সুধীন্দ্রনাথ সে-সম্পর্কে জ্ঞানত ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু ধনতাত্ত্বিক সভ্যতা সম্পৃক্ত সমাজের সাংস্কৃতিক তত্ত্ব এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রান্তদেশে এসে পড়া সত্ত্বেও তাঁর আভ্যাসিক আভিজাত্যের কারণেই তাঁর ক্লাসিক-মেজাজ ও আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র ছিল 'অন্তরঙ্গ সৌন্দর্যের আদর্শের'ই মধ্যে। এর আরও একটি কারণ ছিল এই যে, সমাজবিপ্লবপ্রসূত কোনও নবজন্মের সম্ভাবনাতে তাঁর আস্থা ছিল না। সনাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নির্যাস নিয়েই সমকালীন পরিবর্তিত বাতাবরণে কবির এক ধরনের রূপদী অভীক্ষা রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে পাবার প্রেরণা তাঁর পাবার ভাণে তৃপ্তিলাভ করেনি। আত্মকেন্দ্রিকতার আদর্শায়িত দুর্গে আত্মরক্ষায় এক ধরনের "পলায়নী মনোবৃত্তি"র প্রকাশ একথা যেমন তিনি জ্ঞানতেন, তেমনি তাঁর জ্ঞান ছিল—স্বকীয়তা স্বচ্ছাচারের ভেক নিলে সেই বিশিষ্টতা হয়ে দাঁড়ায় অহংকারেরই নামান্তর এবং সেক্ষেত্রে হিংস্র ব্যক্তিবাদের আড়ালে ব্যক্তিস্বরূপ ঢাকা পড়ে যায় (কাব্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ)। তাই সুধীন্দ্রনাথ আত্মরিকভাবেই 'হর্ম্যস্থানকে বাসোপযোগী ও কালোপযোগী' (কাব্যের মুক্তি) করার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছেন। নিজস্ব ধরনে তিনি সচরাচর-অদৃষ্ট রকমের নিষ্ঠায় নিযুক্ত থেকেছেন। তারই টানে পাঠককেও গভীরভাবে নিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এর জন্য উপযুক্ত অনুশীলন সহযোগে অনিবার্যভাবেই ঐতিহ্য ধরে যাত্রাপথের মানচিত্র প্রস্তুত করে নিয়েছেন। প্রকাশশৈলীর দিক থেকে শব্দ, শব্দের

ইতিহাসপ্রস্তুত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হওয়ায় সার্বজনীন আভিবেক (সংস্কৃতির) সঙ্গে ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি-জার্মান সাহিত্য মূল ভাষায় পড়ার সুবন্দে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করা যেত। (যেভাবে ধরেছিলেন, ঠিক তেমন সুবিধে সকলের থাকে না,) অতএব ফ্রেঙ্ক এই ধর্মপ্রাণ সংযম ও ধৈর্য আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতি অনুপ্রাণিত হন। ১৮৮০-৮১ খ্রিষ্টাব্দে একটি মান তৈরি করেছিলেন। সেই রসায়নে স্বাভাবিকভাবেই নিরন্তর মানবজীবনের তীব্র ব্যক্তিগত চরিত্র বা নিখিলজগৎকে ঘেঁষে উঠেছেন জুনিয়র পদার্থবিদ। যেখানে আমরা ভিত্তির প্রেক্ষিতে হলেও কঠিন সত্যের একটি এলিয়ট সম্পর্কেও বলে পাব। দুই কবিই চলে আসছেন কল্যাণের উত্তরের দ্বার। এই উত্তরের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন অক্টোবর ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে কবির মনে। সেই রসায়নের প্রেক্ষিতেই আমরা দিকটি এইখানে, তিনি 'ব্যক্তিগত সমস্যা', আবার তিনি 'অন্য ব্যক্তির দৃষ্টি' আপাত বৈশিষ্ট্যমূলক বলে মনে হলেও সুধীন্দ্রনাথের মনোবিশ্লেষণে সত্য এখন থেকে পাওয়া যেতে পারে। তিনি 'স্বয়ং' কবির মুক্তি প্রবর্তক এলিয়ট প্রদত্ত কবি-উপাধি 'ক্যাটালিটিক' এজেন্টে রূপ উল্লেখ করেছেন। ক্যাটালিটিক এজেন্ট নিজে কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয় না, তা অন্য পদার্থের পরিবর্তন সংক্রান্ত শক্তি। সুধীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধর্মতাত্ত্বিক সভ্যতাকে অগ্রহণযোগ্য বলে বুঝেছিলেন, আবার ভারতীয় ধর্মতাত্ত্বিক সমাজের সীমান্ত প্রবর্তক সীমান্তের সীমান্ত বিমুখ ছিলেন। সেই অবস্থায় তার কবিমন 'মানুষের অন্তর্ভুক্তি' কঠোর ধারণা বলে মেনেছে। তাই তিনি মনে করেছেন 'কাব্যের মুক্তি বৈরাগ্য সাধনে নয়, পরিগ্রহণে। বলেছেন—'কাব্যের পথে উন্নতবন চলে না, তার প্রত্যেক খানাটি পার হতে হয়—হেঁটে, তার প্রত্যেক ধূলিকণাকে চলতে হয় মাড়িয়ে, তার প্রত্যেক কঁটার পিপাসা চরিতার্থ করতে হয় রক্ত দিয়ে।...' এই চিন্তারই অনুক্রমণকালে বলেছেন—'কাব্য কেবল তখনই অমর পদব্যাচ, যখন তার সম্মান প্রত্যেক ছাড়িয়ে পোছায় প্রমিতিতে'। এরই সমর্থন মিলবে প্রগতি লেখক সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনে তার বক্তৃতায়। চণ্ডীদাসের 'সবার ওপরে মানব সত্য' এই শাস্ত্র সত্য-উচ্চারণের উল্লেখক্রমে তিনি 'free intercourse of individuals' কে গুরুত্ব দিয়ে মানবমিলনে মানবমুক্তির কথা বলেছিলেন। কবিতায় 'তাই অসহ্য লাগে ও আশ্রয়িত', গদ্যে, 'অর্কট'র ভূমিকায় 'ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবির জীবনের প্রধান সার্থকতা'—এইসব কথা বলেছেন। অর্থাৎ শতাধিক বর্ষকাল ধরে এদেশীয় সমাজ-সংস্কৃতির ওপরে যে-জ্যোতিষ সুধীন্দ্রনাথের জন্মের সময়

পর্যন্ত চেপে-বসেছিল, তাকে ছাড়াবার উপায় তিনি আন্তরিকভাবে চিন্তা করেছেন। ‘মনুষ্যধর্ম’ প্রবন্ধে বলেছেন—‘গতা দেড়শ’ বছর ধরে আমরা সাহিত্যের সার্বিক আদর্শকে অলাঞ্জলি দিয়ে, সমস্ত প্রয়াস প্রয়োগ করেছি কাব্যকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাহক করে তুলতে।’ অর্থাৎ সুসীম্প্রাণ নীলরক্তসত্ত্ব মানুষ, শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নত শিখরে তাঁর পারিবারিক অবস্থান; অবশ্যস্বীকার্য, মৃতপ্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারার্তার মানসগঠনে অত্যংশীল, তাঁর কবিতার ধমনীতেও প্রবহমান। তিনি ‘অনাভিজাতিক দৃষ্টে’র মাঝে শৈল যথা পরিচ্ছন্ন শিরে নিষ্প্রাণ, নির্লিপ্ত রহে উল্লেস উর্মির আলিঙ্গনে— সেইভাবে নিঃক্ষেপে উপলব্ধি করেছেন। এই দৃষ্ট ও বৈপরীত্যের ছায়াগঢ়করেখেই সুসীম্প্রাণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আত্মমগ্নতা আর ব্যক্তিস্বাধিপ্যের প্রকাশে বিবয়বস্তুর ভিতরে কবিসত্তার সাবলীল উদ্ভাসন মিলিয়ে কিছুটা যেন রোমাটিকতার বিপরীতগামী পথে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনার্বাদিত আত্মদান সৃষ্টি হয়েছে।

আলোচক সুধীন্দ্রনাথ স্বয়ং মানবচেতনের দ্বারাকে অব্যবহিত ছেনেও যুগশয়ী জটিলতাকে মেনেছেন। মানবিক আদান-প্রদান, মিশনসম্বৃত সামগ্রিকতার প্রয়োজনীয়তার কথা গদ্যে বিলঙ্গে কবিতায় নিঃশ্বাস চেপে উচ্চারণ করেছেন।

সহেনা সহেনী আর তনতার জঘন্য মিতালি।

গদ্যোপদ্যেও দীর্ঘশ্বাসের অন্যান্যতর ব্যঞ্জন—‘অজস্র সংঘর্ষের ফলে আজ আমরা শিখেছি যে আসল স্বাভাব্য সংসারে দুর্ভাগ্য তো বটেই, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের নিভৃততম কোণেও তার ঠিকানা নেই। এমন স্বতন্ত্রতাসন্ধিসু একজন সহস্র সামাজিক ব্যক্তিত্বের টানে সাহিত্যে ‘সামাজিক পাপ’ করতে পারেন না। কেননা সমাজের বিনাশের সম্ভাবনায় তাঁর কবিতা সাদাশঙ্কাভারাতুর, বিপন্নতাবোধে আক্রান্ত। তাঁর সমসাময়িক বাংলা কবিতায়, সমাজসচেতনতার প্রচলিত ছকটি তিনি গ্রহণ করতে না পারেন, কিন্তু যুগের সহযোগিতায়ই তার জীবনতত্ত্বটিকে যথাযথ দৃঢ়তায় গ্রহণ করেছিলেন—

(নাট্যচর্চা) । নাট্যভেদেই রচয়িতা গান বিবর্তিত। বলে

অতঃপর ভাষ্যে বসেছি বিজনে, সনৎসীপবনে,

স্বাভাবিক হৃদযন্ত্রচলিত মৃত্যুতে ঘটে (নান্দীমুখ)

স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে
১৯৭১-৭২ সালে ১৮৫ নং ক্যান্টনমেন্ট

— নিমন্ত্ৰণ্য ত্যমি চ্যলিচি। তানম্ভাৰি বিপ্লবন্ত বিধিমানব বিবাদে।

বিশ্বাস ৩৩৩ জন, ৩৩৩ জন, ৩৩৩ জন, ৩৩৩ জন... (এ)

এবং তারপর—তার স্বাধিকার আগে ফিরে দিতে হবে;

নতুবা নগর, তথা প্রান্তর,

ভরে রবে বাসী শব্দে।...

স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে

শুদ্ধির তান্ধবে।। (ঐ)

—আপন শক্তিবলে ‘শুদ্ধির তান্ধবে’ অংশগ্রহণে যুগের সমস্যা, অথচ যুগান্তের তপস্যা—দুটি দিকই প্রতীত; ‘তান্ধব’ শব্দের ব্যবহার শুদ্ধি-প্রযুক্তিতে অনেকটা কমণীয় হয়ে আসে। দৃষ্টান্তমূলক এই প্রয়োগ থেকে সুধীন্দ্রিয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গোত্রগত পার্থক্য বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যখন কবি, তখন ছিল রোমান্টিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের স্বর্ণযুগ। সুধীন্দ্রনাথের সময়ে এই যুগ অবসিত প্রায়। পুরোনো স্বাতন্ত্র্যের অপটীয়মান নৈতিক ভিত্তি এবং সর্বব্যাপ্ত ভারসাম্যহীনতার দ্বারা দৃষ্ট এ যুগের পৃথিবী সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়—

অনাথ সাধবীর মত ধরা যেন ধায় অধঃপাতে;

নিহত সুন্দর শিব অনুচর পিশাচের হাতে;

অরাজক চরাচরে উচ্ছৃঙ্খল বিত্তীষিকা ভ্রমে। (অহৈতুকী)

এমন প্রেক্ষিতে ব্যক্তির অস্তিত্বের অনুভব—

মনে হয় একা আর্মি।—পরিত্যক্ত ভিটার জঞ্জালে

পুরজীর প্রসাধনী ফেলে গেছে কারা যাত্রাকালে। (ঐ)

বিচ্ছিন্ন ধীপথলের মতো লবণাসুরাশির মাঝে মানবাত্মার একাকীত্বের রোমান্টিক উপভোগ্যতা থেকে স্বতন্ত্রচারী সুধীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা কতো দূরে সরে গেছে; অতঃপর চৈতন্যপীড়িত অস্তিত্বের অসহায় যন্ত্রণার স্বরূপ গভীর সংরাগে, সুক্ষ্ম বিশ্লেষণে, মননাত্মকী আবেগে স্পন্দিত কবিতার যে সব ছন্দে অভিব্যক্তি পেয়েছে—তারই দৃষ্টান্ত পরের অংশে—

যে দিকে তাকাই দেখি নিরাশ্বাস বুদ্ধির তিমিরে

মোদের বিয়োগধর্মী চৈতন্যের চক্রচর কণা

স্বতন্ত্র জ্বালার কক্ষে নিরুপায়ে করে আনাগোনা। (ব্যবধান)

বুদ্ধির বহুমুখী গূঢ়াচার স্বাতন্ত্র্যকে স্বস্তিহীন, যন্ত্রণাজনক করেছে; ‘বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজতাত্ত্বিক আদর্শের চাপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নাতিশ্বাস’ এ নয়। বরং বলা যায়, নবজন্মের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী যারা, তাঁদের সঙ্গে, আপন স্বাধিকারের চেতনা থেকে প্রশসচেতন এবং স্বাতন্ত্র্য-তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠার বিশ্বাস তথা প্রবণতাকে সুধীন্দ্রনাথ মিসিয়ে দিতে পারেননি—তার জন্যই তাঁর মানসিক যন্ত্রণা। স্বাধিকারের স্বীকৃতিও স্বাবলম্বী

কর্তাকে শেষ পর্যন্ত স্বয়ং নিজের উদ্দেশ্য থেকে চ্যুত করে, একটি উপায়মাত্র এবং ছিন্নমূল হয়ে যায় সে। আবার সৃষ্টিশীল মনে প্রাজ্ঞন আদর্শের জন্য হাহাকার জাগলেও আশ্বস্ত হবার কোনো সংকেত কবি পান না; প্রতিহত, প্রত্যাখ্যাত হতে হয় তাঁকে—

কৃষ্ণচূড়া নিবেধে মাথা নাড়ে
কুলায় খোঁজে শুক :
চৈত্রশেষ সূচিত হাড়ে হাড়ে
সূর্য অধোমুখ। (নষ্টনীড়)

যাকে পেতে চেয়েছিলেন কেমন ছিল তার স্বরূপ? ওপরের ছত্র কটি রচনার প্রায় দু'দশক আগে কবি সুধীন্দ্রনাথ তাঁর অস্থিরতার কথা বলেছিলেন—

আমি যারে চাই,
তার মাঝে ভেদ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, দেশ-কাল নাই;
মননে ও মনীষায়, দেহে ও বুদ্ধিতে
একান্ত সে;

...আমারে সে ডাকে মুক্ত পথে
দীক্ষা দিতে, মোক্ষে নয়, স্বায়ত্তশাসনে...
...অক্ষয় মনুষ্যবট নির্বিকার যে-প্রাণপরাগে
বিকশিত আশুক্রান্ত নির্বিশেষ ফলে,

সে-অনাম চিরসত্তা ঋজি আমি নিজের অতলে।। (সন্ধান)

এখানেও নির্মুক্ত স্বাধিকার, সেই নির্ভ্রমে প্রবহমান চৈতন্যধারার কথা, শেষের লাইনে অনাম, চিরসত্তা এবং নিজের অতলে—অন্তহীন আশ্র-অশ্রবা, রবীন্দ্রনাথের 'পথের শেষ' খোঁজা, 'আপনাকে এই জানা'র অন্তহীন প্রয়াসের কথা মনে করায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'পথ চাওয়াতেই আনন্দ'—বোধির গভীরে তাকে একরকম করে পাওয়ায়, আবার 'পাবো' এই ভরসাটুকু নিশিদিন ধরে রাখার প্রেরণায় (পাব একবার পাব/শঙ্কচক্র অঁাকা তার রঙিন দ্বারে যাব—অমিয় চক্রবর্তী) আশ্বস্ত হওয়া; সুধীন্দ্রনাথ দু'দশক পেরিয়ে এসে সেখানে দেখেছেন নিরাশ্বাস বুদ্ধির তিমিরে অস্থিরতা, সংশয়—

বিরূপ-বিশ্বে মানব নিয়ত একাকী।

অনুমানে গুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে,

জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে :

তথাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি? (প্রতীক্ষা)

এই প্রত্যয় নিশ্চয়ই বিশ্বাসার্হক নয়; ব্যাকরণের সেই অধিকস্ত কং

ও তজ্জিত—যা থেকে বিশেষার্থের উৎপত্তিলাভ। নিরন্তর বুদ্ধিবিলাস, জটিল গ্রন্থিবন্ধনের পীড়ন থেকে মানবাত্মার মুক্তি-তৃষ্ণার ব্যাকুলিত উৎকর্ষ। অবশ্য নানা মতবিশ্বাসের টানাপোড়নে থেকে শুদ্ধতাকামী কবিচেতনার মুক্তিকামনাও এর মধ্যে স্পন্দিত। সুধীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যধর্ম এখানে একাগ্রতায় সূচীমুখ, ব্যাখ্যিত নিষ্ঠায় ঘনসমৃদ্ধ :

অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই :

অমোক্ষ নিধনশ্রেয়ঃ তো স্বধর্মমৈঃ ; (এ)

সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ পরিচয়-পত্রিকার প্রবন্ধ-নিবন্ধে বিজ্ঞান-মনোবিজ্ঞান-সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান-অর্থনীতি-দর্শনের সমস্ত নিরিখেই যুগধর্মকে যাচাই-এর পথ খোলা রেখেছিলেন। পুস্তক-সমালোচনা বিভাগের জন্য নির্বাচিত বইগুলির তালিকা সম্পাদকের নিরপেক্ষ উদারতার সাক্ষী। পত্রিকা-সম্পাদক হিসেবে যে-বিষয়ে তিনি আপোষহীন ছিলেন, তা হ'ল, রচনার যুক্তিবদ্ধতা, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা এবং উন্নত মান।

উন্নত মননের চর্চায় সুধীন্দ্রনাথের নিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষতা তাঁকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেছে। তথাকথিত রোমাণ্টিকতার পথ না নিয়ে তিনি 'স্বাধিকার', 'স্বায়ত্তশাসনে'র প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ তথাকথিত সমাজতন্ত্র তাঁকে ভরসা জোগাতে পারেনি। কেননা তত্ত্বের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিকদের আর বুদ্ধিজীবীদের সংকীর্ণতা, স্বার্থবুদ্ধি চরিতার্থতার পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতাসম্ভ্রাত বৈদনাময় বোধি এবং প্রাণস্পন্দিত তত্ত্ব যেমন স্বদেশী আন্দোলনের ঝোঁকে অগ্রহণীয় মনে হয়েছিল, তেমনই সুধীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি ও মননাত্মক চেতনা সেই উগ্র আধুনিকতা ও সমাজবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত যুগে গ্রহণযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেনি। আসলে এই বহুদর্শী নিরাসক্ত মানুষটি রবীন্দ্রনাথের চার দশক পরে জন্ম নিয়ে, আরও অনেক দূষণ-রপনক্লিষ্ট পৃথিবীর বাতাস গ্রহণ করে স্বকীয় চেতনা থেকে পৌঁছেছিলেন স্বতন্ত্র উপলব্ধিতে। মূলগতভাবে মানুষ জীবন তথা মুক্তিপিপাসু—এখান থেকেই যুগে যুগে তার স্বতন্ত্রচেতনার উৎসার; আবার এই ভিত্তিস্তর থেকেই মানুষ প্রবৃত্তিগতভাবে, এমন কি ভ্রান্তামির 'মুখোশ' পরে নিয়েও, ঘৃণপোকার মতো স্বার্থপুষ্ট, আগ্রাসী তৎপরতায় অত্যাচারী এবং শোষণগর্হী—এবং যে-ব্যক্তিসত্ত্ব সভ্যতার সম্মত আশ্রয়,

তারও অব্যাহতি নেই অপঘাত থেকে :

একা হিটলারের নিন্দা সাথে আচ্ছ বাধে কি বিবেকে ?

(সংবর্ত)

—ফ্যাসিবাদ কি সমাজবাদ, ব্যক্তি অথবা গণতন্ত্র—সব কিছু সমান

অপারগ 'সত্যতার সম্মত আশ্রয়' দান করতে।

একজন সং ও বিবেকবান ঐশ্বর্য হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ হাজার সন্ধানের পরেও সত্যের সন্ধান খুঁজছেন। যখনই দিনের আলোও ফুরিয়ে গেছে, সন্ধ্যার আলোরও সংকেত পৌঁছায়নি। কোনও তথ্যই যে সুদূরপ্রসারী মুক্তির আলো দেখাতে পারেনি, সেই প্রথম সত্যকে সত্যতার সঙ্গে স্বীকৃতি দানেই রয়েছে সুধীন্দ্রব্যক্তিত্বের অনন্যতা :

আমি বিংশ শতাব্দীর

সম্মানবয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবাক্ষি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরন্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাদ্গমন, ততোধিক বিমুখ অতীতে। (যযাতি)

এমন কি কোনও নৈতিক মানদণ্ড খুঁজে পাওয়া সম্ভব—যা পরমতম এমন সর্বজনের কার্য্যে তার সন্ধান যখন আজও মেলেনি, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষকেই তার প্রথম চেতনার মধ্যে দিয়ে, নতুন করে প্রতিনিয়ত নৈতিক মানদণ্ড স্থির করতে হয়। হয়তো সুধীন্দ্রনাথ এদিক থেকে শানিকটা অস্তিত্ববাদীদের মতো নিজস্ব মূল্যবোধ গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন। প্রথম চেতনা সম্বল করে, নিরলস প্রয়াসের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকাশের ধারা বহন করে চলা মানুষের কাজ; মানুষ যদি আত্মসচেতন ও অনপেক্ষ হয়, হয় স্বাধীন ও নিঃসঙ্গ, তাহলেও তাকে অনিবার্য উদ্বোধ আর যন্ত্রণা বহন করে চলতেই হবে। জীবনের এই যন্ত্রণাই স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের জেগে থাকার পরিণামী স্বরূপ—

যন্ত্রণাই

জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্ধেশে

আমাদের প্রাণযাত্রা সঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে।। (নরক)

চন্দ্রনাথের 'সত্যতার সম্মত আশ্রয়' দান করতে।
একজন সং ও বিবেকবান ঐশ্বর্য হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ হাজার সন্ধানের পরেও সত্যের সন্ধান খুঁজছেন। যখনই দিনের আলোও ফুরিয়ে গেছে, সন্ধ্যার আলোরও সংকেত পৌঁছায়নি। কোনও তথ্যই যে সুদূরপ্রসারী মুক্তির আলো দেখাতে পারেনি, সেই প্রথম সত্যকে সত্যতার সঙ্গে স্বীকৃতি দানেই রয়েছে সুধীন্দ্রব্যক্তিত্বের অনন্যতা :

আমি বিংশ শতাব্দীর

সম্মানবয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবাক্ষি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরন্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাদ্গমন, ততোধিক বিমুখ অতীতে। (যযাতি)
এমন কি কোনও নৈতিক মানদণ্ড খুঁজে পাওয়া সম্ভব—যা পরমতম এমন সর্বজনের কার্য্যে তার সন্ধান যখন আজও মেলেনি, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষকেই তার প্রথম চেতনার মধ্যে দিয়ে, নতুন করে প্রতিনিয়ত নৈতিক মানদণ্ড স্থির করতে হয়। হয়তো সুধীন্দ্রনাথ এদিক থেকে শানিকটা অস্তিত্ববাদীদের মতো নিজস্ব মূল্যবোধ গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন। প্রথম চেতনা সম্বল করে, নিরলস প্রয়াসের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকাশের ধারা বহন করে চলা মানুষের কাজ; মানুষ যদি আত্মসচেতন ও অনপেক্ষ হয়, হয় স্বাধীন ও নিঃসঙ্গ, তাহলেও তাকে অনিবার্য উদ্বোধ আর যন্ত্রণা বহন করে চলতেই হবে। জীবনের এই যন্ত্রণাই স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের জেগে থাকার পরিণামী স্বরূপ—

প্রসঙ্গ সংবর্ত : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ব্যক্তি ও বিশ্ব

হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে মনে হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ছন্দস্বভাবী। সেই কবিতায় মুখ দেখে তার মনের কথা বোঝা যায় না। কানেকানে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে মছরা-সময়ের গভীরে ডুব দিয়ে তুলে আনা অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে ধ্রুপদী মেজাজে ও মর্যাদায় কবিতার অক্ষরে অক্ষরে ছড়িয়ে দিলেও সে বিপুল ভাবনাতার আর তৎসমতার অনতিপরিচয় পার হয়ে তন্ময় পাঠক সেখানে খুঁজে পেতেই পারেন কবিতার ভিন্নতর স্বভাব, কবির রোমাণ্টিক সংবেদন। মালার্মেপট্রী কবির ‘মৈটাইজিক্যাল’ বুদ্ধিদীপ্তির পাশাপাশি তাঁর প্রতিবাদ, পরাভববোধ, এমনকি আত্মশুদ্ধির আশ্রয় আয়োজন। শব্দগত কাঠিন্যকে ছাপিয়ে কবিতা থেকে কবিতায় এই কবি যেন সতর্ক অনুধাবকের মত তাঁকে ঘিরে থাকা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আর্থসমাজের চেহারা ও চরিত্রকে বুঝে নিতে চেয়েছেন। চেয়েছেন তাঁকে বিশ্লেষণ করতে। বিশ্লেষণ করতে করতে বুঝেছেন—সমষ্টির নামে, সংঘের নামে স্বার্থায়েষী কিছু ব্যক্তিমানুষের মিলিত চক্র বিশ্বের দিকে দিকে কেমন করে অনুভূতিসম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ একাকী মানুষকে আঘাত করছে। কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই বিবেকবান ব্যক্তিমানুষের সংশয়াতীত নিরাপত্তা নেই। নেই চূড়ান্ত গ্রহণযোগ্য কোনো মানবিক ভরসা। অর্থাৎ কবির ভাষায় “বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী”। তবু মানুষ নিতান্ত মানুষ বলেই প্রতিবাদ করে, লড়ে যায়। কখনো জেতে, কখনো বা সেই লড়াই ঋণাত্মক ফলাফলে অবসিত হয়; এবং তখন, অনেক ক্ষেত্রে সেই পরাজয় ট্রাজিক মহিমার পরিবর্তে প্রচারনিপুণ গোষ্ঠীতন্ত্রের ধূর্ত কৌশলে পার অহেতুক শ্রানি, কলঙ্ক, অনুচিত নিন্দাবাদ। প্রয়োজনে তথ্যগোপন করে, অর্থসত্তোর আড়াল থেকে এমনকি দল বেঁধে চাপা সন্ত্রাসের বাতাবরণ বিছিয়ে প্রয়োজনে খাটো করা হয় প্রকৃত মহতের প্রাপ্য মহত্ত্ব। সুধীন্দ্রনাথ এই সব দেখেছেন, দেখে বিষন্ন হয়েছে তাঁর কবিতা।

অথচ আপাতদৃষ্টিতে, প্রথমদিকে অন্তত, তাঁর অধিকাংশ কবিতা দারুণ রূপসী। এমন রূপসী, যে চোখের কোণের কালি আর ক্লাস্তির নানা তাঁজ লুকিয়ে রাখে সাজসজ্জায়, রঙপালিশে। এই তব্বীদের শব্দের মিলিত অর্কেষ্ট্রা একই সঙ্গে সুলী এবং সুধী—অর্থাৎ নিবিড়ভাবে সুধীন্দ্রীয়। যেন মনের

দিবাস্বপ্নে দ্যাখা দেশ। সুতরাং প্রথম নজরে এই মোহিনী আড়াল পাঠক সাধারণকে বিপথগামী করতেই পারে। অথচ এই সমুচ্ছলতার পাশে লুকিয়ে থাকে যে শূন্যমন হতাশা এবং অবিশ্বাস, নিছকের সম্ভাকে দুটুকরো করে এই সব কবিতায় কোথাও কোথাও যে শেববিহীন তর্কবিতর্ক; প্রশ্ন এবং পরিপ্রশ্ন—তার বৈশিষ্ট্য এবং বিন্যাসকে না বুঝলে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা বোঝা যাবে না। আর এই বৈপরীত্য তথা ছন্দবৈশিষ্ট্যকে মনে রাখলে এই কবি সম্পর্কে আরেক কবি জীবনানন্দের স্মরণীয় মন্তব্যটিও প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাবে—“তিনি আধুনিক বাংলাকাব্যের সবচেয়ে বেশি নিরাশাকরোচ্ছল চেতনা।” সংক্ষিপ্ততম এই সমালোচনায় নিরাশা এবং ঔচ্ছল্যের এই অসবর্ণ বিবাহ প্রকৃত প্রস্তাবে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার নিছক গেরস্থালিকে সার্থকভাবে চিহ্নিত করেছে।

কিছু নান্দনিক দ্বিধা, কিছু বিপরীতের চোরাটান যেমন তাঁর কবিতার চরিত্র—তেমনই ‘চেতনা’ শব্দটিও, বিশেষত সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে কিছু বিশেষ বার্তা বহন করে। তাঁর বেশ কিছু কবিতা পাণ্ডিত্যময়, যুক্তির শৃঙ্খলায় ছন্দবৈশিষ্ট্য প্রবন্ধই যেন—সাদৃশ্য এবং সত্যক। আবিষ্কারের আবহমান সংস্কৃতি, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, আর্থসামাজিক সংস্বর্ষের উত্তরাধিকার যে অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক এই কবির সৃষ্টিকর্মে মিশেছিল—তার তুল্য ভারতীয় দৃষ্টান্ত কদাচিৎ পাওয়া যায়। ঘটনা দুর্ঘটনার সমকালীন তথ্যগুলিকে সাবলীল কবিতার সত্যে রূপান্তরিত করার ক্ষমতাকেই মুন্সিয়ানায় সুধীন্দ্রনাথের বোধবুদ্ধি ও বোধি বরাবর নিয়োজিত ছিল। উক্তি এবং উপলব্ধির এই অসামান্য অন্বেষকের পুঞ্জিতে যেদিন টান ধরেছিল, যে দিন কবি স্বয়ং ভেবেছিলেন “আমার লেখার যুগ অতীত হয়ে গেছে”—সেদিন বাংলা আধুনিক কবিতার এই অহংকারী অর্জুন নামিয়ে রেখেছিলেন তার সৃষ্টিশীল গাঙীব, বিদায় নিয়েছিলেন কবিতার কুরুক্ষেত্র থেকে।

দুই.

ব্যক্তি থেকে বিশ্বের দিকে নানামুখী সঞ্চার যে কোনও মহৎ সৃষ্টির ধরন। আবার বিশ্বও বিস্তৃত হয় ব্যক্তির মানসপটে। কবিতার গুঢ়-গাঢ় রসায়নও এমনই উভোমুখী বিক্রিয়ায় সজ্জা খুঁজে পায়। ব্যক্তিকে বিয়ে যে বিশ্বাস আর চিন্তার তরঙ্গগুলি, তার নিছকবাসুদেহ, তার অঞ্চল ও প্রদেশের স্থানিক বর্ণ ও বিভায় বিজড়িত হয়ে ব্যক্তির সৃষ্টিশীল অস্তিত্ব ও অস্তিত্বকে গড়ে দেয়—সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার কিছুমাত্র অন্যথা হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই ত্রিশ এবং চল্লিশের বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে যে সব দুর্ঘটনা সহ্য করেছিল, সেই সব স্থানীয় সমস্যা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে ভাষাশরীর পায়নি বললেই চলে।

অনেকেরই মনে হয়েছে এই কবির কবিতা বড়ো বেশি স্বভাবে সাহেবী। যেমন অনুজ কবি মণীন্দ্র রায় বলেছেন :

“সুধীন্দ্রনাথের কিন্তু সে রকম নাড়ীর যোগ নেই নিজের দেশের সঙ্গে। তাঁর কাব্যবর্ণিত নায়িকা বিদেশিনী, প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রায় সার্বভৌম, এবং চীন-পেরু-রাইনের সমস্যা ও হিটলার মুসোলিনী-টুটকি ইত্যাদি ‘আন্তর্জাতিক’ ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি যে পরিমাণ ভাবিত তার শতাংশ মনোযোগও স্বদেশীয়দের ভাগ্যে জোটে নি।”

কিন্তু এই উদাসী অনুশ্রেয় হেতুহীন ছিল না হয়তো বা। প্রত্যেক মানুষের কিছু নিষ্কণ্ড পঙ্কদ-প্রবণতা, রুচি এবং অভিরুচি থাকে। যা ইতিহাসপথে রেখামাত্র চিহ্ন আঁকে না, সেই তুচ্ছতম প্রাত্যহিকে সুধীন্দ্রনাথের রুচি ছিল না। রবীন্দ্র-অনুজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে ‘কুকুট’ লিখলেও এই কবির আসল বিচরণভূমি ছিল দিকচক্রবাল ছাড়িয়ে। সমমনস্ক ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাই বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি খণ্ডন করে এই কবির পছন্দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, বলেছেন :

“যদি কোনো মানুষ তার চিন্তার জোরে বুঝতে পারে যে বিশ্বের আধুনিক সব দুঃখের মূলসূত্র একটি, এবং সেই সূত্র ধরে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসের পথে যাচ্ছে, তখন দেশের বিশেষ দুঃখকে বাদ দেওয়ার পাপ দুঃখের একটি বিশেষ দৃষ্টান্তকে বাদ দেওয়ার চেয়ে বেশী পাপ কি?”

দ্যাখা গেছে, ‘তব্বী’র তুলনামূলকভাবে ব্যক্তিগত অনুভব অর্কেস্ট্রীয় অপহৃত হয়নি হয়তো, কিন্তু শিরোনামেই স্বীকার্য যে ‘অর্কেস্ট্রা’ এককের তান নয়, স্বভাবে সে বহু এবং বহুলয়ের অভিজাহী। অর্কেস্ট্রার অনবদ্য ‘শাস্বতী’ কবিতাতেও আছে বিস্তারের ঐকতান, প্রেমে দূরদেশের স্মৃতি; জনৈকার সোনালি চুল আর নীল আঁখির যৌথতায় যা দূরের ভূগোলে পৌছে দেয় পাঠককে। কবির ব্যক্তিগত চয়নের এই একান্ত ক্ষেত্রটি, লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, রূপান্তরিত হয়ে গেল ‘ক্রন্দসী’তে। গোটা পৃথিবী জুড়ে দুই হাতে কালের মন্দিরা তখন বড় বেসুরো ভাবে বাজছে, ডাইনে বাঁয়ে। ডার্সাই চুক্তিকে পাস্তা না দিয়ে জাপান আক্রমণ করলো মাঞ্চুরিয়া (১৯৩১)। অন্য সব রাষ্ট্রীয় পক্ষকে অঙ্ককারে রেখে ১৯৩৫য়ে অ্যাংলো-জার্মান নৌচুক্তি সম্পাদিত হল। একই বছর ১৯৩৫য়ের অক্টোবর মুসোলিনির ইতালি বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ করে বসলো ইথিওপিয়া। ‘লীগ অব নেশন্স’য়ের কর্তারা চূপচাপ দেখে গেলেন এই বর্বরতা। ‘ক্রন্দসী’র অধিকাংশ কবিতা এই বহিমান সময়ে রচিত হয়েছিল।

‘ক্রন্দসী’র কবি দারুণ প্রমাতুর, ব্যক্তবাসনা অস্তিত্ব আর আন্তিক্য নিয়ে

শব্দে শব্দে অস্থির যেন—অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের ভাষায় “উদ্ভিন্ন নচিহ্নেতা।”^১ তাঁর অনুভূতিতে ধরা পড়ছে “সম্মুখে নিখিল নাশ্টি, পৃষ্ঠদেশে মৌল নীরবতা।” প্রথম যুদ্ধোত্তর শ্মশানশাষ্টিও ততোদিনে শেষ। জার্মানী আর ফ্রান্সের দুই বিদেশমন্ত্রী স্ট্রেসম্যান এবং ব্রিয়ার শাষ্টিদৌত্যেরও ইতি। ইতিহাসের কানাগলি থেকে রাজপথ পর্যন্ত ভাবী নাৎসি সন্ত্রাসের এই উষ্মর পটভূমিতে ‘জন্মদসী’র প্রথম কবিতা ‘উটপাখী’ একটি পৃথক দৃষ্টিকোণ এবং প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পায়—বালিতে মুখ ঠুঁজে থাকা উটপাখীর মতো জ্ঞানপাণী মধ্যবিস্তৃত বুদ্ধিজীবিকাকে যেন রূপকাক্রমে শনাক্ত করেছেন কবি :

“আমি জ্ঞানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের ‘পরে দেনা শোধবার ভার।”

প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয় ১৯২৯য়ে পাশ্চাত্যের মহামন্দার রেফারেন্স—
“বর্গীর ধান খায় যে উনতিরিশে।” একদিকে ঘরে বাইরে ঘনিয়ে আসা সংকট আর অন্যদিকে একদিন-প্রতিদিনের নির্দায় নিরুন্নয়ন বেঁচে থাকার বামনবৃত্তি—
এই দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা যেন ঘোর অসহিষ্ণুতায় কাঁধ
খাঁকায়; আততায়ী আগামী সন্ন্যাসসদৃশ চলনে জনসাধারণের কিছু আসে
যায় না দেখে কবি যেন দিক্কারে ফেটে পড়েন; বলেন সেই কথা, ঘটনার
ব্যথিত প্রতিক্রিয়ায় যা আপাতশ্রুতিতে কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীল মনে হবে—
“সহে না সহে না আর জনতাৰ জঘনা মিতালি”, এই ‘প্রত্য্যখ্যান’ আরো
তীব্র ‘মৃত্যু’ কবিতায় “রব না রব না/পুঙ্খ হুঙ্ক বামনের এ সমষ্টিবাদে”,
অথবা অন্যত্র “ভিড়ের সংসর্গ মোরে করে সদা নৈঃসঙ্গ্যবিরত।” জনসংঘকে
বিত্তীষিকা ভাবটা ক্রসট্রোফোবিয়ার মত অসুখই যেন—একা সুধীন্দ্রনাথ
নয়—আরো কারো কারো সৃজনে চেপে বসেছে যে তা এলিয়টের লেসালেখি
পড়লেও বোঝা যায়, যেমন ‘The Cocktail Party’ কাব্যনাটকেও Celiaর
সংলাপে পাওয়া যাচ্ছে একই সংবেদ : গড়পড়তা মানুষের ভাবাকথা ক্রমশ
যেন হলে যাচ্ছে অর্থহীন শব্দবসন :

“No...it is not I want to be alone.
But what everyone's alone, or so it seems to me
They make noise, and think they are talking to each other;
They Make faces and think they understand each other
And I'm sure that they don't.”

মনে পড়ে জীবনানন্দের ত্রুস্ত মুখ, “ভিড়ের হৃদয় পরিবর্তনের” স্বপ্নকে।
মনে পড়ে তাঁর ‘বোধ’ কবিতার প্রায় আর্তনাদের মতো উচ্চারণ “তবু আমি
এমন একাকী”।

“সমষ্টির অভিসন্ধি নিঃসহায় ব্যাষ্টির সংহারে”—কবির এই ধারণা ‘উত্তরফাঙ্গুণী’তে আরো স্পষ্ট। নিজ সময়কে ‘দুঃসময়’ চিহ্নিত করেই সুধীন্দ্রনাথ থামলেন না এখানে, “অশ্রুধার রাক্ষসীবেলায়” লক্ষ্য করলেন “অন্তরীক্ষে জন্মে বিভীষিকা”। অবশেষে যেন দীর্ঘশ্বাসদীর্ঘ এই সিদ্ধান্তে এলেন :

“সে নহে যোগ্যতা যার দুঃসহ্য শৃঙ্খলে
মানবতা মরে অপঘাতে।”

বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কবির এই ভাবমূর্ত্তিকে, অন্তএব; যখন নির্দেশ করেন এই ভাবে :

“তৃতীয় দশক থেকেই সুধীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমমনস্কদের কাছে এই শতাব্দী বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়েছে। ...এই বিষাদ, ধ্রুনি, পরাভব অথচ জিজ্ঞাসার অপরাভ্রম্য আবির্ভাবে সুধীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট।” তাকে যথাযথ বলে মনে হয় আমাদের।

তিন.

এই ছিল ‘সংবর্তে’র পটভূমি; এই ছিল ১৯৩৯য়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমি। বিংশ শতাব্দীর এই ভয়ানক বিপর্যয়কালের তথ্যভাষ্য বাংলাভাষায় একটি কাব্যগ্রন্থে যদি কেউ বুঝে নিতে চান তবে তার একমাত্র অবলম্বন এবং প্রাপ্তি সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘সংবর্ত’। অধ্যাপক অমিয় দেব সঠিকভাবেই বলেছেন

“...no one else of his generation write so intensely about the war, the most important global event of his lifetime.”

কবিতার পর কবিতায় এই কালবেলার নানা অনুপূঙ্খ বিশ্লেষণী মন্তব্যসহ যেভাবে সম্মিবেশিত হয়েছে, তার প্রামাণিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ পাঠকেরও মনে হওয়া স্বাভাবিক, মহাযুদ্ধের গ্রহণলাগা প্রহরের এ ধারাবিবরণী বিশেষভাবেই সুধীন্দ্রীয় সমাজরাজনৈতিক প্রত্যয় ও বীক্ষণবুদ্ধির জাতক। কিন্তু কবির ইন্টারপ্রিটেশনগুলির অসামান্যতা এই যে প্রায় আধাশতকের মতো সময় পর—সমসাময়িকতার ঘোর শেষে নতুন নতুন গবেষণা যেভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আর্থরাজনৈতিক মূল্যায়ন করছে—অপক্ষপাতের আভিনায় দাঁড়িয়ে যেভাবে বুঝে নিতে চাইছে সেই সময়ের সমাজ-মানস, সেই সময়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, তার গোপন ও প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব এবং সংশ্লেষ—সেই আধুনিক গবেষণাও যেন শেষ পর্যন্ত করতে চাইছে সুধীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তগুলিকেই সমর্থন। করতে চাইছে কবির দূরদৃষ্টিকে অভিবাদন। আউসউইংস-বিকেনাও শিবির সম্মিহিত গণকবরগুলির মর্মান্তিকতা মুছে

যারার আগেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে নতুন গণকবরের খবর, যার দায় মিত্রশক্তি হয়তো অস্বীকার করতে পারবে না। অস্বীকার করতে পারবে না জাপানে পরমাণুপ্রস্রাবের মহালঙ্ঘনকে মাথা পেতে নিতে। কে-ই বা অস্বীকার করবে এই তথ্যের সত্যতা—বিশ্বশত্রুর প্রায় প্রতিটি বড় যুদ্ধ থেকেই মুনাফা নুটেছে মার্কিন অর্থনীতি, তাই বিশ্বজুড়ে সামরিকীকরণের ব্যবস্থাই তাদের ধারাবাহিক লাভজনক লক্ষ্যী। যাই হোক, মহাযুদ্ধের সেই ধ্বংসের তাণ্ডব একপাক্ষিক ছিল না মোটেও—মানবতার চিহ্নিত শত্রু ফ্যাসিস্টদের নজিরবিহীন বর্বরতার কথা মনে রেখেও একথা বলা যায়। বলা বাঙ্ল্য, অমানুষিকতার কোনোরকম গুণগত বা পরিমাণগত তারতম্য বিচার শুধু হাস্যকরই নয়, অন্যায় নিষ্ঠুরতা। যুদ্ধ থেকে যুদ্ধান্তরে ক্রমাগত কাঁটাতার আর রক্তাক্ত মাইলফলকগুলি পার হতে হতে, শরমে ও ঘৃণায় ক্রমশ নিজের কাছে নিজে ছেঁটে হতে হতে মানুষ বুঝেছে মহাযুদ্ধে আসলে জেতে না কেউ, হেরে যায় মানবতা।

বুঝেছিলেন সুধীন্দ্রনাথও। রাজনীতির নামে, আদর্শবাদের নামে আদর্শহীনতার আগ্রাসন কি অস্বাভাবিক ক্রততায় পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সভ্যতার সনদগুলিকে লঙ্ঘন করে আঘাত করছে সমস্ত শুভ এবং শ্রেয়োবোধকে। এর মাঝে ঘটে গেছে স্পেনে জেনারেল ফ্রান্সিস্কোর দানবিক উত্থান, গৃহযুদ্ধ—বত্রিশ মাসের পর অবরুদ্ধ মাদ্রিদের পতন (১৯৩৯); সেখানে লোরকার মতো কবি খুন হয়ে গেলেন। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সংবর্তের প্রথম কবিতা ‘নান্দীমুখ’য়ে লিখলেন ঘনি়ে আসা সেই বিপদের পূর্বাভাস—“স্পেনেও হয়তো অমনই অঙ্গভঙ্গি/চিত্রাংকিত অসংহতির সঙ্গী।” যথার্থ ছিল যোগ্য সমালোচকের এই মূল্যায়ন :

“The prime theme of ‘Samvarta’ was the war, or rather the causality that led to the war, introduced by the very first poem ‘Nandimukh’.”

যারা যুদ্ধ চায়নি কিন্তু ঝরে পড়েছে উলুখাগড়ার মতো, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ লবেজ্ঞান মানুষের ভয়াবহ স্বর ধরা আছে আসন্ন সর্বনাশের প্রেক্ষিতে, এখানে। ‘নান্দীমুখ’ তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

“বিপ্রলদ্ধ বিশ্বমানব বিবাদে

অঙ্গুলি তুলি, দেখায় অলঘ নিষাদে।”

তারা দেখেছেন, “মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন” এবং কবিও দেখেছেন সময়ের আয়নায় রাষ্ট্রনীতির ডুকুটিকুটিল মুখ :

“বুঝি তারা শুধু কুস্মাটিকার চাতুরী :

তবু তুলনায় ধন জাগায় মাধুর্যই;

প্রতীকপ্রতিম তাদের কাস্তে, হাতুড়ি
ফসল মুড়ায়, মানমন্দির পেখে।
মূর্ত নিষেধ, মুক নির্বেদ
তাকায় নির্নিমেখে।”

এখানে চকিতে সুধীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রকাশিত হয়ে গেছে। সুধীন্দ্রনাথ অনুদার আগ্রাসী ‘মনোজিথিক’ মনোভঙ্গিমার ক্ষন্য নাথসিবাদকে ঘৃণা করতেন, কিন্তু মার্কসীয় ধ্যানধারণার মধ্যেও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন পরমতের প্রতি সমান অসহিষ্ণুতা। ফলে তৎসংগতভাবে মার্কসবাদের প্রতিও তাঁর বীতরাগ ছিল। হিটলারকে তিনি অপছন্দ করতেন, অথচ “...he did not approve of Stalin either”। মহাযুদ্ধ সমকালে স্টালিনের পররাষ্ট্রনীতি তাঁকে বিরক্ত করেছিল :

“There events in particular gave him a jolt, events which proved to him that Stalin too was a threat to humanity; these were the Soviet-German treaty, the Soviet invasion of Finland and the assassination of Trotsky.”

১৯৩৯য়ের পয়লা সেপ্টেম্বর জার্মান সেনাবাহিনী রাতের অন্ধকারে ‘ব্লিৎসক্রিগ’ সংকেতনাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো পোল্যান্ডের উপর। পটভূমি প্রস্তুত ছিলই, শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, যাকে ডবলু. এইচ. অডেন চিরস্থায়ী করে গেছেন ‘September 1st, 1939’ কবিতায় :

“As the clever hopes expire
Of a low dishonest decade
Circulate over the bright
And darkened land of the earth.”

তার কিছু আগে, একই যুযুধান পটভূমিকে অনুধাবন করে এদেশে সুধীন্দ্রনাথ দস্ত লিখেছেন ‘উজ্জীবন’—যুদ্ধের ঠিক আগে রণ-রাজনৈতিক নানা সমীকরণের, সুবিধাবাদী ঐকিক নিয়মের চক্রবৃদ্ধি দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন—

“যে পশুবলের কাছে হার মেনে তুমি মৃত্যুঞ্জয়
এবার কি তার উজ্জীবন?”

পশুবলের এই আততায়ী রূপ দেখে অচিরেই বুঝেছেন, “আর্তনাদ ছাড়া আত্ম নৈবেদ্যের যোগ্য কিছু নেই।” নিজে থেকে শুনিবে যেন বলেছেন :

“আসন্ন প্রলয় :

মৃত্যুভয়

নিতান্তই তুচ্ছ তার কাছে।”

তারপর, সারা পৃথিবীর শিরে সংক্রান্তির মতো সেই ‘প্রলয়’ এসে হাঙ্কির

হল উনিশশো উনচল্লিশের শীতরাতে। তার বছরখানেক পর লেখা হয়েছিল 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের সুবিখ্যাত নামকবিতা 'সংবর্ত'—যেখানে মেঘের মতো ছেয়ে থাকা বিপদ যেন শিল্পশরীর পেয়েছে। অধ্যাপক অমিয় দেব বলেছেন :

"But perhaps all his doubts and despair were here most successfully expressed in the title poem of the book, in some ways Sudhindranath's greatest poem,...this was written on 6 September 1940, almost on the first anniversary of the World War II to which the title—Sudhindranath's own english was 'Cyclone'—referred."

এই কবিতার সূচনায় বোঝা যায় না কি বিরাট উচ্চাকাঙ্ক্ষা গর্ভে ধারণ করে আছে 'সংবর্ত'। কিছুটা অটপৌরে ঢঙে, যথেষ্ট লো প্রোফাইলে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের স্মৃতিচারণের মেজাজে কবিতাটির সূচনা—"এখনো বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে"। এই ব্যক্তিগত আলাপনের সরলরৈখিক চলন হঠাৎই বিশ্বগত বহুমাত্রিকতায় বদলে যায়; পুরনো প্রেম আচমকা জাগতিক সমস্যার মাঝে এসে পড়ে—

“হয়তো তখনই

উপশয়ী সংবর্তের আড়ালে অশনি

লেগিহান করবালে ধার দিতে শুরু করেছিল।

প্রবাদের ধূয়ো ধরেছিল

তৎপূর্বে অজ্ঞাত

মুসোলিনী যুদ্ধগামী বর্বরের মতো।”

বিদেশিনীর প্রতি প্রশ্নের নিজস্ব স্মৃতির অনুযায়ে অকস্মাৎ মহাযুদ্ধের মধ্যে এইভাবে চলে আসা এবং অতঃপর যুদ্ধের নানাপর্বের ঘটনাক্রম, ফলাফল, স্তম্ভিত ইয়োরোপের শিল্পনান্দনিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাব দ্বন্দ্ব এবং কবির বিশ্লেষণমুহূর্তে ভবিষ্যতভাবনা কবিতাটিকে যেন মহাকাব্যের মর্যাদা দিয়েছে।

ষ্ট্রেসমান—ব্রিগার লোকোর্নোচুজি (১৯২৯)র সুখদ দিনগুলি কবির প্রেমের দিনগুলির মতোই দ্রুত ফিকে হয়ে এলো। তারপর যুদ্ধ এবং যুদ্ধের সমকালীন নানা টুকরো ঘটনার উল্লেখে এই কবিতা অসামান্য এক পিরিয়ড পিস হয়ে উঠেছে জন্মশ। মুসোলিনীর আভিসিনিয়া আক্রমণ, টুটস্কির সোবিয়েতভূমি ছেড়ে দূর মেক্সিকোয় চলে যাওয়া, তৃতীয় রাইখের উত্থান পতন, হিটলারের একেশ্বর হওয়া এবং “বালখিল্য নাট্যীদের সমস্ত নামসংকীর্ণন” এবং শেষমেষ :

“অজুর্হিত আজ অজুর্হামী :

রুঘের রহসে লুপ্ত লেনিনের মামি

হাতুড়িনিপিপ্টি টুটকি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন,
মৃত স্পেন, স্রিয়মাণ চীন,
কবন্ধ ফরাসীদেশ।”

শিল্প-দর্শন-সঙ্গীত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের শতমুখী উৎসার ঘটেছিল যে জার্মানীর অভ্যন্তর থেকে, সেই জার্মানী এই নাৎসি নৃশংসতারও শায়ীভূমি— এমন বিপ্রতীপ সত্যে বিচলিত কবি আগাগোড়া এই কবিতায় ব্যবচ্ছেদ করেছেন ঘটনাক্রম আর খুঁজে ফিরেছেন কার্যকারণে, নিহিত পাতালছায়া। গোটে, হোল্ডারলিন, রিশ্চের কবিতা, টমাসমানের অসামান্য উপন্যাস, যোহান বাঘের বিশ্ববন্দিত সোনটার জন্ম যেখানে, সেখানেই হিটলার হিমলার, গোবেল্‌স, গোয়েরিংদের বিসদৃশ সহাবস্থান, একই দেশের জঠরে— এই বৈপরীত্য সমাবেশই কি মানবসভ্যতার অনিবার্য স্বরূপ? এই প্রশ্নের পাশাপাশি কবির ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ—মাইক্রো এবং ম্যাক্রো স্তরের ক্রমাগত স্থানবদল, প্রসঙ্গবদলের চমকপ্রদ বিন্যাস এবং ব্যক্তিগত আলাপনের নিভৃততম অভ্যাসের সঙ্গে বিশ্বের বৃহৎ ঘটনাকে এক নিঃশ্বাসে মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে অন্য এক আয়তন গড়া—সব মিলিয়ে এই কবিতার ঐশ্বর্যের তুলনা হয় না। অশ্রুকুমার শিকদার যথাযথই বলেছেন :

“ব্যক্তিগত বেদনাকে বিশ্ব বেদনায়, একক ক্রন্দনকে ব্রহ্মাণ্ডের কান্নায় রূপান্তরিত করার দুর্লভ শক্তি যে তার ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ সংবর্ত কাবোর অন্তর্গত নামকবিতা।”^১

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা জানিয়ে রাখা উচিত। কবির ‘ব্যক্তিগত বেদনা’ শুধু যে কবিতাকেন্দ্রিক তা-ও নয়, তা ছিল আক্ষরিক অর্থে সত্য এক সমকালীন সংকট। বৈশ্বিক বিনাশের পাশাপাশি কবির ব্যক্তিগত জীবনেও তখন সমস্যার অশনিসংকেত। এই সময়েই সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় ‘পরিচয়’ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। মতাদর্শের পার্থক্য ক্রমশ বড়ো হতে হতে মনোভ্রমের কারণ হয়েছিল; আরো একটা প্রধান কারণ ছিল কবির সঙ্গে প্রখ্যাত গায়িকা রাজেশ্বরীদেবীর বিবাহ। প্রথম স্ত্রীর বর্তমানে এই দ্বিতীয় বিবাহ তাঁর অনেক সতীর্থকেই আহত করেছিল, এবং “very few of the ‘Parichay’ friends and not just marxist—approved of his second marriage” সূত্রাং সব মিলিয়ে “The fourth decade of Sudhindranath’s life ended in as much as disaster as this century.”^২ ব্যক্তির সংকট আর বিশ্বের সংকটের এই সম্মেল সাধারণত নাটকেই পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত অনটনকে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ বৌদ্ধিক অনুশীলনের দ্বারা মোচন করতে পারেন, কিন্তু বিশ্বসংকট তো ব্যক্তির মুখাপেক্ষী নয়! একজন ডাবুক এই বিরাট চাপ সহ্য করতে করতে একসময় ভেঙে পড়তে পারেন, ফেটে পড়তে

পারেন নৈরাশ্যে—যা ক্রমশ সঞ্চারিত হতে পারে তাঁর স্বজনস্বভাবে।
সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বোধহয় এমনটাই ঘটছিল।

কবি বিষ্ণু দে বলেছিলেন ‘সংবাদ মূলত কাব্য’। কিন্তু অনুকম্পায়ী পাঠক
জানেন, কাব্য মূলত সংবাদ নয়। আঁকাড়া ঘটনা আর তথ্য কবিতা হয়ে
ওঠে তখনই, যখন তাতে পড়ে শিল্পের ছোঁয়া, রসের জারণ-বিজারণ।
কথাগুলি সংবর্তের ‘১৯৪৫’ শিরোনামা কবিতাটিতে মনে রেখে বলা হচ্ছে।
যুদ্ধশেষের বছরখানিতে পৃথিবীভূড়ে যখন রাজনৈতিক বাটোয়ারা আর শক্তির
ভারসাম্যের অদলবদল চলছে, সুধীন্দ্রনাথ এদেশে বসে রচনা করছেন
‘১৯৪৫’, যেখানে তাঁর সামগ্রিক বীক্ষণ তথা পর্যবেক্ষণ ধরা পড়েছে :

“তুমি বলেছিলে জয় হবে জয় হবে :

নাট্যসী পিশাচও অবিদ্যমান নয়।

জার্মানি আজ প্রিয়মাণ পরাভবে

পশ্চিমে নাকি আগত অরুণোদয়

* * * *

এবারে সমরে, শান্তিতে সহযোগী

মার্কিন ঢালে সমানে শোণিত, টাকা

ধনিক যুগের প্রধান ভূভোগী

ইংল্যান্ডেই সমাজতন্ত্র পাকা।।”

সমকালীন ছোটবড়ো ঘটনার নানা রেফারেন্স, টীকাভাষ্য, বিশ্লেষণ ও
সিদ্ধান্তগুলি গোটা কবিতার শরীর ভূড়ে ছড়িয়ে আছে; ভারতের স্বাধীনতা
স্বাগিত, কারণ “জিহ্মা য়েহেতু বিমুখ গান্ধিবাদে”, ইটালি এবং গ্রীসে
বামপন্থীদের উত্থান, চার্টিলের ভূমিকা, স্পেনের গৃহযুদ্ধের চকিত উল্লেখ,
হাসেরী, চেকোস্লোভাকিয়ায় বিমানহানা, লণ্ডন-লুব্রিন-সানফ্রানসিস্কো-প্রেসব্রেন
ভূড়ে উত্তরসামরিক কূটনীতির বিস্তার—সব মিলিয়ে পাণ্ডিত্যের নিরঙ্কুশ
আয়োজন সত্ত্বেও এই কবিতা ‘সংবর্তের মতো উদ্ভীর্ণ শিল্প হয়ে উঠতে
পারেনি। ইতিহাসের মেধাবী মছন যেখানে দীর্ঘশ্বাসময় পরিণতির প্রান্ত
হুয়েছে, একমাত্র সেখানেই তথ্যের চালচিলের সামনে নির্মিত হয়েছে কবিতার
প্রতিমা—সেরিট্রাল কর্টেক্স ছাপিয়ে সেখানে হৃদয়ের উদ্ভাপ :

“তবু জানি যবে জয় হবে বলেছিলে

চাওনি তখন তুমিও এ-পরিণাম :

শূন্য ঠেকেছে লাভে লোকসানে মিলে

ক্রান্তির মতো শান্তিও অনিকাম।

এরই আয়োজন অর্ধশতক ধরে,

দু দুটো যুদ্ধে একাধিক বিপ্লবে;

কোটি কোটি শব পড়ে অগভীর গোরে

মেদিনীমুখর একনায়কের স্ববে!"

এই কবি তখনো জানেন না, '১৯৪৫' লেখার (১০ এপ্রিল ১৯৪৫) কয়েকমাস পরেই আসবে মানবতা আর সভ্যতার উপর শোচনীয়তম আঘাত। মানবেতিহাসের সেই মলমাস 'উনিশশ' পর্য্যায়ান্তের আগস্ট; সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হল যখন দুটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেল 'দুটি সমৃদ্ধ জাপানী জনপদ! মানুষের মৃগয়ায় মানুষের এই পাইকারি মৃত্যু 'সংবর্তে'র শেষ কবিতা 'প্রত্যাবর্তনে'র বিষয় হয়েছে :

"অণুবিদারণে শতসংস্র মানুষ হত

ব্যক্ত অভিব্যক্তিবাদের ফাঁকি :

বেতালগ্রস্ত বিকলাঙ্গের দুষ্ট দ্রুত

পরিত্যাজ্য হিরোশিমা, নাগাসাকি।"

পাঠক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন কবির দূরদৃষ্টি, বছর পাঁচেক আগে লেখা 'জাতক' কবিতার কিছু ছিন্ন পংক্তিতেও তো রয়েছে এই "অভিব্যক্তিবাদের ফাঁকি"—মানুষ কি তাবৎ সৃষ্টিমণ্ডলে সত্যই মহত্তম প্রাণী? এতো তীব্র জিজ্ঞাসা, এমন হিংস্র জিগীষা সঙ্কেত? 'সংবর্ত'য়ের প্রথম দিকের কবিতা 'জাতক' (১)য়ে কবি বলছেন :

"অতি দৈব বিবর্তনে মনুষ্যই যোহেতু অতুল,

তাই সে আত্মহা আত্ম, তার ধর্ম আত্মীয় সংহার।।"

'যযাতি' সংবর্তের শেষ কবিতা নয়, কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থের আদর্শ উপসংহার আছে এই কবিতাতেই। এই কবিতায় আবার জড়িয়ে গেছে পুরাণ ও বর্তমান, ব্যক্তি ও বিশ্বের যন্ত্রণা। জড়িয়েছে শিল্পের সমুচিত ভাবসামো, নন্দনের বাঞ্ছিত নিপুণতায়। স্পষ্টই বলা যাক, হৃদয়বেশ ছড়িয়ে এই কবিতা বিশেষভাবে আত্মজীবনীমূলক—উত্তমপুরুষে বলা কথাভাষাগুলির প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে তার নানান পরিচয় ছড়িয়ে আছে। যযাতির পৌরানিক স্বপক্ষে কবি যেন স্থাপন করতে চাইছেন তাঁর পঞ্চাশোর্ধ উত্তর-যৌবনের রূপ। বলছেন :

"...আমি বিংশ শতাব্দীর

সমান বয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে; বীর

নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে

বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেশে, মানবধর্মের স্ববে

নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে

যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।"

অথচ নির্বীৰ্য 'যযাতি'র মুখোশটা মুখের মাপমতো খুঁজে নিতে তাঁকে

অতীত-অভিমুখীই হতে হয়েছিল। নিজের দুটি বিবাহকে ঘিরে জড়ো হওয়া সামাজিক সমস্যাকে কবিতায় শনাক্ত করতে তাঁর প্রয়োজন ছিল শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর স্বন্দ্রময় পৌরাণিক উদ্দেশ। ‘সংবর্তে’র কেন্দ্রীয় প্রতীক নিমজ্জমান ভগ্নতরঙ্গী কার্যত এই কবিতারও কেন্দ্রীয় প্রতীক। ছাটিল এক গ্রহনায় কবি সংশ্লিষ্ট কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন যত্নে গড়া গভীরতার ছবি—বিশ শতকের মধ্যপর্বে আক্রান্ত মেধা ও মননের ছবি। এই কবিতার অসাধারণ নির্মাণকুশলতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন আরো অনেকের মতো অধ্যাপক অমিয় দেবও, “...a most remarkable piece especially its technique.”^৪ এই কবিতায় বক্ষ্যা নামকের হাহাকার আসলে সভ্যতার মর্মে জমে থাকা হাহাকারের প্রতিরূপ। অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণে সুধীন্দ্রনাথের বক্ষ্যা যযাতিকে টি. এস. এলিয়টের ‘ওয়েস্টল্যান্ড’ কবিতার অন্ধ টাইরেসিয়াসের সঙ্গে তুলনা করেছেন।^৫ প্রথম মহাযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ফলস ওয়েস্টল্যান্ডের পুরাণপুরুষের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতি ‘যযাতি’র এই তুলনা ঐতিহাসিক কারণেই অনিবার্য। যে সময়সরণি ধরে মানবসভ্যতার হাজার বছর ধরে পথচলা, তার নানা প্রান্তে কিছু কিছু সাদৃশ্যের স্বাক্ষর থাকবেই—স্বপ্ন থেকে স্বপ্নভঙ্গ, আত্মরূপের খোঁজ থেকে আত্মপরিচয়ের সংকট—সর্বত্রই তা থাকবে। ফলে স্তরাগ্রস্ত যযাতির মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ সহজেই বুনে দিতে পেরেছেন যুগের আত্মকথা। ফলে এই কবিতায় অতীত এবং বর্তমানের মুহূর্ত প্রান্তবন্দল স্বাভাবিক এবং শিল্পসার্থক হয়ে উঠেছে।

‘সংবর্ত’ কাব্যগ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কবির লেখা ‘মুখবন্ধ’। সেখানে সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন :

“অন্ততপক্ষে আমার লেখায় আধুনিক যুগের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট,...গত পনোরো বছরের কোনও লেখাকে আমি এখনও গ্রহণ করিনি। কারণ দ্বিতীয় মহাসমরের কয় বৎসর আত্মশুদ্ধি অবসর মেলেনি। ..অথচ উক্ত যুদ্ধ যে-ব্যাপক মাৎস্যন্যাযের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তার সঙ্গে পরবর্তী কবিতাসমূহের সম্পর্ক অকাটা; এবং স্থানান্ত-ব্যতিরেকে সেই অপরিমেয় পটভূমিতে এগুলোর উপস্থাপন দুষ্কর ভেবেই, প্রত্যেকটার কালক্রম অগত্যা সূচিত হল।”

‘সংবর্তে’র কবিতাগুলি সাক্ষী, কবি কিছু ভুল বলেন নি। তাঁর নিজের বিশ্বাস এবং আদর্শ অনুযায়ী, নিজের পরিহ্রিতি এবং পারিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষে ঐকেছেন পৃথিবীর ছবি। আবারো বলা যাক, বাংলাভাষায় লেখা একটি কোনও কবিতাগ্রন্থে এই ব্যাপক, এত প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কবিকল্পনার প্রতিক্রিয়া নেই। সমকালের ইতিহাসও না।

চার.

কুটির আভিজাত্য এবং অভিমাত্রী পাণ্ডিত্য সুধীন্দ্রনাথকে জনসাধারণ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, সাধারণ-তত্ত্বের গাঢ়ালিকাপ্রবাহ আর গতানুগতিকতা তাঁকে ক্লান্ত করতো। এই অনাস্থা ‘পরিচয়’ পত্রিকার বুদ্ধিমাগীয়া আচ্ছাদ ছোট বৃষ্টেই স্বয়ংপ্রকাশ! এই দ্বৈপায়ণী অহং, এই উন্নাসিক সঙ্গীনির্বাচন, কোন অলক্ষ্যে শিল্পে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার নামান্তর হয়ে ওঠে—অনেক সময় বোঝা যায় না তা। ‘সংবর্ত’-উত্তর কালে ক্রমশ করে যাওয়া সুবর্ণগোলকের মতো এই কবির একটু একটু করে ফুরিয়ে যাওয়াটা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তেমন ‘আত্মঘাতে’র অনন্য দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক অরুণ সেন সঠিকভাবেই বলেছেন—

“অসামান্য মণীষা ও মানসিক আভিজাত্য সত্ত্বেও তাঁর কোনো অবলম্বন ছিল না—‘নিরালস্য নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধার’য়েই তাঁর অবস্থান। তিনি ছিলেন আদ্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ইণ্ডিভিডুয়ালিস্ট। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা অথচ চরিত্রের মধ্যে নিহিত এক প্রচণ্ডতা, যা থেকে হয়তো আসে তাঁর অস্বিতা, একটা নিঃসীম শূন্যতা এনে দিয়েছিল তাঁর মধ্যে।”

ভিন্নতর সাংস্কৃতিক বৃষ্টে এক শব্দ মিত্র ছাড়া এই বাংলায় এই প্রতিভাময় অভিমাত্রী অহমিকার তুলনা মেলে না। উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং প্রবল সৃষ্টিভাড়া, মননের অহংকার এবং প্রতিভার বিস্মরণ, দেশীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মৃদুতম কম্পনও সাড়া দেবার মতো অতিজাগর জিজ্ঞাসা এবং অন্তর্গত মৌল বিষাদ, কবিতার বিগুহতায় পবিপূর্ণ আত্মা এবং ব্যক্তিগত বিপন্নতাকে কবিতায় নিছক পরিভাষায় প্রকাশ করার সমবায়িক সামর্থ্য একাধারে যদি কোনো বাঙালী কবির রচনায় খুঁজে পাওয়া যায় তো তিনি নিঃসন্দেহে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এবং সেক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তাঁর পূর্বপুরুষ গণ্য করা চলে। অথবা, মননের মিতা, বিগত শতকের।

তথ্যনির্দেশ :

- (১) শ্রীকানন্দ দাস, ১৯৮৫, কবিতার কথা (‘উত্তরপ্রবন্ধ বাংলা কাব্য’), সিগনেট প্রেস, পৃ-৩৮
- (২) অরুণ সেন (সম্পাদিত), ১৯৯০, ‘এই মৈত্রী এই মনান্তর’ (সুধীন্দ্রনাথ-বিস্মৃ দে পত্র বিনিময়, ২৩নং চিঠি) প্রথম দে’জ সংস্করণ, পৃ-৮৩
- (৩) বশীশ্র রায়, ফাঙ্কন ১৩৬০, ‘সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও নাট্যবিদ্য’, পরিচয় পত্রিকা (ত্রয়োদশ বর্ষ : দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) পৃ-৭৩
- (৪) মুর্জীটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৭, বাংলা কাব্য ও সুধীন্দ্রনাথ (মুর্জীটপ্রসাদ রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড) দে’জ পাবলিশিং (প্রথম প্রকাশ), পৃ-৩৭২

- (৫) উম্মদসুন্দর মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৭, 'ঐন্দ্রসৌর কবি : উজ্জ্বল নটিকতা' (সুধীন্দ্রনাথ ঐন্দ্রসৌর ও সাহিত্য : (সম্পাদিত) ঐন্দ্রসুন্দর মুখোপাধ্যায়), পুস্তক বিপণি (প্রথম প্রকাশ), পৃ-২২৪
- (৬) T. S. Eliot, 1969, 'The Cocktail Party', Faber and Faber (London), pp : 351
- (৭) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬, 'কবিতার কল্যাণ', সান্যাল প্রকাশন (প্রথম সং), পৃ-১৯৬
- (৮) Arniya Kr. Dev, 1982, 'Sudhindranath Datta', Sahitya Akademi (1st Published) New Delhi, pp-45
- (৯) Ibid, pp-78
- (১০) Ibid, pp-62
- (১১) Ibid, pp-81
- (১২) অক্ষয়কুমার সিকদার, ১৯৮৫, 'আধুনিক কবিতার দিক্‌বদল', অরুণা প্রকাশনী (তৃতীয় সং), পৃ-১৫৭
- (১৩) Arniya Deb, Ibid, pp-62
- (১৪) Ibid, pp-87
- (১৫) বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৬, 'বহাতির সমর্থ শব্দ শরীর' (সাহিত্যের মানচিত্র : দীপ থেকে মহাদেশ) দেব প্রকাশন (প্রথম প্রকাশ), পৃ-৬৪
- (১৬) অরুণ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩২

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যশৈলী

উদয়কুমার চক্রবর্তী

কবির গদ্য তথা সমালোচনা একটি বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে আসে আমাদের কাছে। Dyson যখন কবিতা সমালোচনার তত্ত্বগুলিকে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে [Poetry Criticism & Practice : Developments since the Symbolists, 1986, Macmillan] সাজান তখন একটি আলাদা বিভাগ করেন 'The Poet as Critic & Artist' নাম দিয়ে। কবির নিজের কথা আমরা যেমন শুনতে ভালোবাসি তেমনি কবির গভীর অনুভূতির স্বগতকে আমরা ধরতে চাই। কবির ভাবনা, অনুভূতির পাশাপাশি কবির গদ্যশৈলী লক্ষ্য করার আরেকটি বড় প্রাপ্তি আছে আমাদের কাছে। প্রবন্ধের ভাষা মূলত লক্ষিকাল বা যুক্তিসঙ্গত ভাষা। আর কবিতার ভাষা মূলত যুক্তিসঙ্গত নয় অর্থাৎ তা ভাব ও অনুভূতি প্রকাশক ভাষা। সুতরাং কবি যখন প্রাবন্ধিক তখন এই দুই ভাষার একটি বিরোধ তৈরি হওয়া সম্ভব নয় কি? রবীন্দ্রনাথ যখন প্রাবন্ধিক কিম্বা যখন জীবনানন্দ বা শঙ্কর ঘোষ বা বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধ লেখেন তখন অন্যান্য প্রবন্ধ লেখকের তুলনায় বাড়তি একটি মাত্রা এবং টানা পোড়েন (টেনশন) তৈরি হয়ে যায়। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই আমরা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধের ভাষাশৈলী লক্ষ্য করবার চেষ্টা করবো।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রচিত দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ 'স্বগত' এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ' এবং কাব্যগ্রন্থের 'মুখবন্ধ' হিসাবে কিছু রচনা তাঁর প্রবন্ধের নিদর্শন হিসাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। স্বগত প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'ভারতী ভবন' প্রকাশনা থেকে। 'সূচনা' ছাড়া এখানে উনিশটি প্রবন্ধ ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে। এখানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধ এবং তিনটি বাংলা বইয়ের সমালোচনা বাদ দেন। যোগ করেন 'পুনশ্চ' এবং অলডাস হার্সলি ও ওমানি প্রসঙ্গে রচিত একটি প্রবন্ধ। 'স্বগত'-র বাদ দেওয়া প্রবন্ধগুলি এবং আরো কিছু প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশ পায় 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থটি ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে। কাব্যের প্রথমে যে মুখবন্ধগুলি তিনি লিখেছিলেন সেগুলি হল—'অর্কেষ্ট্র' কাব্যের ভূমিকা। 'সংবর্ত' কাব্যের মুখবন্ধ। 'প্রতিধ্বনি' কাব্যের মুখবন্ধ এবং মালার্মের সম্পর্কিত ভাষ্য। এর পাশাপাশি 'অর্কেষ্ট্রা' ও 'ক্রন্দসী' কাব্যদুটির অ্যাক্টে ছাপা বিজ্ঞাপন। এভাবে তাঁর প্রবন্ধ নিবন্ধ জাতীয় রচনার চারটি ধারা লক্ষ্য করা যাবে।

- ক. প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে রচিত
- খ. কাব্যের মুখবন্ধ হিসাবে রচিত
- গ. কাব্যের ভাষা হিসাবে রচিত
- ঘ. কাব্যের বিজ্ঞাপন হিসাবে রচিত

আমরা প্রথমে বিজ্ঞাপন হিসাবে রচিত দুটি বিজ্ঞাপনের ভাষা লক্ষ্য করব। লক্ষ্যণীয় সুধীন্দ্রনাথ এখানে নিজে থেকে নিয়ে নিজেই বলছেন। একটি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ এখানে প্রকাশিত। এখানে দুটি অংশ থেকে উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। যথা—

ক. ‘গ্রন্থকার তাঁর প্রথম কাব্যসংগ্রহ ‘তম্বী’-র মুখবন্ধে নিজে থেকে পূর্বগামীদের ছায়ানুবর্তী বলে ঘোষণা করেন। ‘কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতাগুলির মধ্যে অসামান্য স্বকীয়তার সন্ধান পান’ (অকেন্দিয়া-র বিজ্ঞাপন)।

খ. ‘সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পাঠকসংখ্যা কত, তা বলা শক্ত। তবে তাঁর স্থান যে বাঙালী কবিদের প্রথম শ্রেণীতে, তাতে সন্দেহ মতদ্বৈত নেই।’ (ক্রন্দসী-র বিজ্ঞাপন)।

‘ক’ উদাহরণটিতে যখন দেখতে পাই সুধীন্দ্রনাথ যেন নিজে থেকে নিয়ে লিখছেন না এমনভাবে আড়ালে থেকে যে মন্তব্য করেন তাতে এক ধরনের সঙ্কোচ থেকে গেছে তখন ‘খ’ উদাহরণটির অসংকোচ বক্তব্য আমাদের কাছে বিশ্বাসের বলেই মনে হবে। দ্বিতীয় অংশটির বক্তব্য একেবারে সরাসরি বলা হয়েছে। ‘ক’ অংশে একাধিক বাক্যে anaphora ব্যবহৃত হয়েছে। anaphora-র ভেতুর দিয়ে বাক্যের দুটি বিশেষ্যপদ সমসংস্থযুক্ত হয়ে থাকে। এই দুটি বিশেষ্যপদ যেমন সম-সংস্থ যুক্ত তেমনি প্রথম বিশেষ্য পদটি দ্বিতীয় বিশেষ্যপদের সঙ্গে সি-আধিপত্য (c-command) যুক্ত।

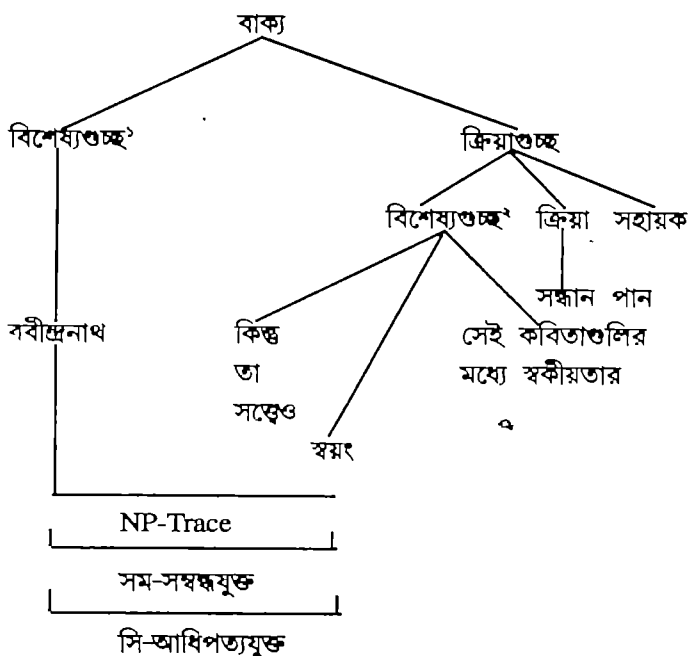
‘গ্রন্থকার তাঁর প্রথম কাব্য-সংগ্রহ ‘তম্বী’-র মুখবন্ধে নিজে থেকে পূর্বগামীদের ছায়ানুবর্তী বলে ঘোষণা করেন।’

এই বাক্যটির অ্যানাফোরা-যুক্ত গঠনটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব—গ্রন্থকার এবং নিজে থেকে সমসংস্থযুক্ত। আর Radford জানান, সমসংস্থযুক্ত (co-referencial) হলে তা অ্যানাফোরা হয় [Radford, 1988, Transformational Grammar, Cambridge, 116]। Levinson মনে করেন একই শ্রেণীর উপাদান বা সমান বিষয় হলে তাকে অ্যানাফোরা বলে [Levinson, 1983, Progenetics, Cambridge, 67]। এখানে উভয়পদই বিশেষ্যপদ। সমসংস্থযুক্ত হওয়ায় এখানে NP trace লক্ষ্য করা যাবে। NP হল ‘গ্রন্থকার’ এবং তার trace (=t) হল—‘নিজে থেকে’ পদটি। বাক্যের আন্বয়িক গঠন বিশ্লেষণ করলে ‘গ্রন্থকার’ হল NP¹ এবং ‘নিজে থেকে’ হল

NP^২ (NP = বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ বা Noun Phrase)। Chomsky প্রবর্তিত Government and Binding তত্ত্ব অনুসারে 'গ্রহকার' পদটি আবদ্ধ করছে NP^২ 'নিজেকে' পদটিকে। এই আবদ্ধীকরণের ক্ষেত্রে c-command বা সি-আধিপত্য কাজ করছে। দ্বিতীয় বাক্যটিতেও এই একই ধরনের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। যথা,

'কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতাগুলির মধ্যে অসামান্য স্বকীয়তার সন্ধান পান।'

এখানে, 'রবীন্দ্রনাথ' NP^১ আবদ্ধ করছে NP^২ 'স্বয়ং' পদটিকে। দুটিই বিশেষ্যপদ এবং সি আধিপত্যের মাধ্যমে সমসংস্করযুক্ত। ফলে, এটিও অ্যানাফোরা হিসাবে উপস্থিত।



অ্যানাফোরা ব্যবহারের মধ্যে এক ধরনের আত্মগোপন ঘটে থাকে। NP^২ মনে হতে পারে পৃথক কোন সত্তা। কিন্তু NP Trace-এর মাধ্যমে বোঝা যায় NP^২ আসলে NP^১ এবং NP^২ প্রকৃতপক্ষে শূন্য অবস্থানগত শ্রেণী বা Empty Category। তাই কবি যখন নিজের সম্বন্ধে অন্য কারো হয়ে বলেন তখন সেখানে সেই পৃথক ব্যক্তি আসলে লেখক নিজেই। আর প্রকৃতপক্ষে সেই পৃথক ব্যক্তির অবস্থানটি শূন্য অবস্থান ছাড়া আর কিছু নয়। 'জন্মদসী'-র

বিজ্ঞাপনে এই ধরনের অ্যানাফোরার ব্যবহার নেই। কিন্তু এক ধরনের পরোক্ষ বচনের মায়াজাল সৃষ্টি হয়েছে। সরাসরি না বলে মাঝে মাঝে একটু পরোক্ষ উক্তির মতো বাক্যাংশ তৈরি করে সরাসরি বলার স্পষ্টতাকে আড়াল করতে চেয়েছেন। যেমন,

‘তা বলা শব্দ’ বাক্যাংশটি ‘তা বলতে পারছি না বা জানি না-র মতো স্পষ্ট নয়। আবার তাতে সম্ভবত মতদ্বৈত নেই, তাঁর অনুগামীরা... করতে ছাড়েন নি, ক্রন্দসীর সমাদর হওয়া উচিত প্রভৃতি উদাহরণ থেকে অস্পষ্টভাবে একটু দূর থেকে দেশের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

দুটি বিজ্ঞাপনেই ভবভূতির মতো সহৃদয় পাঠকের কথা লেখক বলেছেন। স্বয়ং কবি না হলে এই ধরনের আকাক্ষক্ষ তৈরী হয় না। এখানে সেই আকাক্ষক্ষটি তুলে দেওয়া হল,

‘যাঁরা রচনানীতির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বোঝেন, যাঁরা বিষয়বস্তুতে অবাস্তব কল্পনার প্রয়োগ দেন না, চিরপ্রথার খাতিরে মানুষের গভীরতম অনুভূতিকে এড়িয়ে চলা যাঁদের অভ্যাস নয়—তাঁদের জন্য এবং বিশেষভাবে শিল্পে যাঁরা প্রতিভার পক্ষপাতি তাঁদের জন্য অর্কেট্টা বিরচিত।’

[অর্কেট্টা-র বিজ্ঞাপন]

‘‘এখানকার কবিতাগুলিতে প্রকৃতি বা প্রেমসীর আবির্ভাব হয়ত বিরল কিন্তু এতে যে-সব প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে, সেগুলির হৃদয়সংবেদনা প্রকাশ অস্বত বাংলা কাব্যসাহিত্যে সুলভ নয়।’’

[ক্রন্দসী-র বিজ্ঞাপন]

ভাষা হিসাবে বচিত প্রবন্ধটি ‘ফনব দিবাক্ষপ’ মালার্মে থেকে অনূদিত এই কবিতা প্রসঙ্গে কবিতাটির বেশ কিছু ব্যাসকূট বোঝানোর জন্যই রচিত হয়েছে। রোমকপুরুষের ‘ফন’ সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের পাশাপাশি মালার্মের কবিতা সম্পর্কে ধারণা তৈরী করার জন্য এটি রচিত। এর ভাষা ব্যবহারগত শৈলী অন্যান্য প্রবন্ধের মতই, তাই সেগুলির সঙ্গে এই রচনাটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কবব।

মুখবন্ধ বা ভূমিকা অংশগুলিও প্রকারান্তরে প্রবন্ধ। এই ভূমিকাগুলিও আমরা প্রবন্ধের ভাষাশৈলী থেকে আলাদা করে দেখব না। এই ভাষ্য এবং মুখবন্ধগুলি সাহিত্যসম্পর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা প্রবন্ধের অন্তর্গত।

সূচনা, কাব্যের মুক্তি, উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য, রূপদ—শেয়াল, ডি. এইচ লরেন্স ও ভার্ভিনিয়া উল্ফ, ফরাসীর হার্ম্য পরিবর্তন, উইলিয়াম ফক্সন, মাকসিম গর্কি, সোটার্না, গুরুচণ্ডাল, বার্গার্ডশ, লিটন স্ট্রিচি, উইগাম লুইস ও এড্‌লা পাউণ্ড, ঐতিহ্য ও টি, এস, এলিয়ট, ডব্লু. বি গ্রেটস ও কলকৈবল্য, জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স, পুনশ্চ প্রভৃতি বগত প্রবন্ধগ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সাহিত্য-সাহিত্যিক ও সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে রচিত।

‘কুলায় ও কালপুরুষ’ প্রবন্ধ গ্রন্থের মুখবন্ধ, রবীন্দ্রপ্রতিভার উপক্রমণিকা, ববিশষ্য, ছান্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, সূর্য্যবর্ত, দিনান্ত—মূলত রবীন্দ্রনাথকেন্দ্রীক প্রবন্ধ। উক্তি ও উপলব্ধি, অঙ্কশীলা, চোরাবাগি, বাংলাছন্দের মূলসূত্র, শিল্প ও স্বাধীনতা-সাহিত্য নিয়ে রচিত প্রবন্ধ। ‘আঠারো শতকের আবহ’ ও যুগ ও সাহিত্য বিষয় নিয়ে রচিত। ভিক্টোরীয় ইংলণ্ড-ও তাই।

মনুষ্যধর্ম প্রবন্ধে মানবস্বভাব ও কাব্য প্রসঙ্গ, অদ্বৈতের অত্যাচাব প্রবন্ধে দর্শন, বিজ্ঞানের আদর্শ প্রবন্ধে মনোবিকঙ্গন প্রসঙ্গ, উদয়ান্ত প্রবন্ধে দর্শন, অনার্যসভ্যতা প্রবন্ধে ইতিহাস, পিতা পুত্র প্রবন্ধে ঋগ্বেদীয় তন্ত্র, প্রগতি ও পরিবর্তন প্রবন্ধে ইতিহাস ও সভ্যতার বিবর্তন প্রকৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধই সাহিত্য নিয়ে। তার পাশাপাশি দর্শন, ইতিহাস, সভ্যতা, মনোবিকঙ্গন প্রকৃতি সাহিত্যসম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিষয়গত বৈচিত্র্য যেমন বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধে পাওয়া যায় সুধীন্দ্রনাথের, প্রবন্ধে সে ধরণের বৈচিত্র্য নেই।

বিষয়বস্তু অনুসারে ভাবাগত বৈশিষ্ট্য নানাবিধ হতে পারে। বিষয়বস্তু হান্ধা—ভাষাও হান্ধা, বিষয়বস্তু গভীর, ভাষাও গভীর, বিষয়বস্তু সাহিত্য হলে তার ভাষাও সেই ধরনের, দর্শন হলে ভাষা দর্শনের, ইতিহাস হলে ভাষাও সেই ধরণের। যেহেতু সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিষয় শ্রায় কাছাকাছি বা সম্পৃক্ত বিষয় সেহেতু ভাষার মধ্যে সেবকম পার্থক্য চোখে পড়বে না। পরন্তু ভাষাশৈলী নিয়ে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন। স্বগত-ব সূচনা, পুনশ্চ এবং কুলায় ও কালপুরুষ-এর মুখবন্ধে তিনি নিজেব সম্পর্কে যে কথাগুলি লিখেছিলেন তাতে আশ্চর্য, সমর্থনের প্রয়াস আছে। নিজের প্রবন্ধের তথা গদ্যভাষা সম্পর্কে যে ধারণা তাঁর ছিল তা প্রথমে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

১. “বন্ধুমহলে আমার লেখা দুর্বোধ কলে নিম্পিত। হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃত আর ইংবালী ভাষার বর্ণসংস্কর ঘটিয়ে আমি যে-অস্পৃশ্য রচনানীতির জন্ম দিয়েছি। বঙ্গভারতীয় নাট্যমন্দিরেও সে-হরিন্দ্রনের প্রবেশ নিষিদ্ধ; এবং আত্মনির্ভরের অভাব-বশতই আমি যেকালে ওরুজ্জনদের ভর্ৎসনাজাজন, তখন ওই অহৈতুক অপবাদকে অমূলক বিবেচনায় উপেক্ষা করা আমার সাধ্যের অতীত।” [স্বগত, সূচনা, সিগনেট, ১৩৬৪, ১১]

২. “ফলত আমার অল্পবয়স্ক গদ্যে, রূপের আভাস না থাক, রীতির ইঙ্গিত হয়তো আছে; এবং ফরাসী সমলোচকদের মতে রীতি আর রচনিতা অভিন্ন বটে, তবু প্রকারী নিশ্চয় তখনই প্রকারের প্রয়োজন বোধে, যখন বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগলব্ধির বিবাদ। তাব পরে শিল্পী যে-শৈলীর শরণ নেয় বিষয়ীর বিষয় নিষ্ঠাই তার উপজীব্য এবং উদ্দেশ্য আর উপমানের সহযোগে যেমন সাহিত্য- নামে পরিচিত, ব্যক্তিত্বরূপ তেমনই আত্ম-

পরের সন্ধি।” [স্বগত, পুনশ্চ, সিগনেট, ১৩৬৪, ১৯৫-১৯৬]

৩. “অবশ্য শব্দের অপপ্রয়োগ, ব্যাকরণবিভ্রাট, অপটু বাক্যবন্ধের সোপে অর্থের নিপাতন ইত্যাদি সংশোধন “স্বগত”-এর দ্বিতীয় সংস্করণে নেহাৎ নগণ্য নয় এবং কোথাও কোথাও অদল বদল আরও ব্যাপক। কিন্তু তোরালো কথাকে ঘোরালো করে তোলার অভ্যাস পচিশবছরের আত্মধিকারেও কাটেনি; এবং তির্যকরীতির বিপদ এই যে তার ভঙ্গুর অঙ্গবিন্যাসে যোগ-বিয়োগের ভার সয় না, পরিবর্তনের ইঙ্গিতে যে অভিপ্রায়ের বোঝা ছত্রাকারে—ছড়িয়ে চলার পথে মুখ খুবড়ে পড়ে।”

[এ ১৯৯]

৪. “সুতরাং আমার চিত্তাশ্রমী অঙ্কত তাঁদের কাছে বঙ্গীয় লাগবে, যাদের অভিস্রুতায় ভাব ও ভাষা যমজ।” [এ ১৯৯]

৫. “অবশ্য গদ্য আপাতত পরজীবী; এবং কোলরিঙ্ক-ই বলেছিলেন যে তাতে দ্রষ্টব্য উপযুক্ত শব্দের যথোচিত সংযোজনা। কিন্তু চাকুস অভিজ্ঞতাও একাধারে বহিরাশ্রমী ও মধ্যম; এবং সাধারণ ভাষায় অসামান্য উপলব্ধির প্রকাশ তো একাধিক বিষয়ে বাক্যের অপেক্ষা রাখেই, উপরন্তু সম্ভারী চৈতন্য অনুভব যেহেতু অনুশঙ্গপ্রবণ, তাই শুধু সমসাময়িক ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অবিচ্ছেদ্য নয়, ভূত ও ভবিষ্যতের নির্বিরোধ ব্যতীত বর্তমান অগ্রগতি অগ্রাহ।” [কুলায় ও কাসপুরা, ১৩৬৪, সিগনেট, মুখবন্ধ, পৃ-জ]

৬. “সুতরাং তদগত গদ্যও স্বভাবগুণে নৈব্যক্তিক নয়; এবং যে লেখক নিজস্বের মোহে অন্ধ নয়, সে বোঝে যে শৈলীমাত্রই স্বকীয় বলে, তা যখন সর্লী, তখন অনাস্বীয় প্রসঙ্গের দাবী মেটাতে না পারলে, রচনানীতি নিরতিশয় ব্যর্থ।” [এ, পৃ-ভ-ঝ]

এ ধরনের আরো নানা উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারতো। তবে এই উক্তিগুলি থেকে গদ্যশিল্পী সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্বকীয় একটি ধারণা উঠে আসে আমাদের কাছে। এবার এই বক্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, ‘স্বগত’ পর্যায়ে কবি সুধীন্দ্রনাথ নিজের লেখা সম্বন্ধে অধিকতর মাত্রায় কৌতুহলী। এই কৌতুহল আর অভিমত এখানে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। যথা—

ক. নিজের লেখাকে দুর্বোধ্য বলে জানা।

খ. সংস্কৃত আর ইংরেজির মিশ্রণ ঘটানো। ফলে এক অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছেন তিনি।

গ. আত্মনির্ভর হওয়ার অভাব।

ঙ. রূপের আভাস না থাকলেও রীতির ইঙ্গিত আছে তাঁর লেখায়।

চ. ফরাসী সমালোচনার মতে রীতি আর রচরিতা অভিন্ন হলেও তখনই প্রকারী

বা রচয়িতা প্রকারের বা রীতির প্রয়োজন বোঝে যখন বহির্বিশ্বের সঙ্গে আত্মোপলক্ষিত বিবাদ ঘটে।

৯. শিল্পী যে-শৈলীর আশ্রয় নেয় তার উপজীব্য বিষয়নিষ্ঠা।

১০. স্বগত-র প্রথম সংস্করণের শব্দের ভুল প্রয়োগ, ব্যাকরণগত ভ্রান্তি, অপটু অঙ্কন, অর্থের গণ্ডগোল প্রভৃতি দ্বিতীয় সংস্করণে প্রচুর পরিমাণে সংশোধন করে নিয়েছেন।

১১. অদল-বদলও অনেক করেছেন।

১২. জোরালো কথাকে ঘোরালো করে তোলাব অভ্যাস।

১৩. তির্যক রীতির বিপদ।

১৪. ভাব ও ভাষাকে তিনি এক করে দেখেছেন। এটি বঙ্গীয়।

১৫. গদ্য পরজীবী তাতে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার যথোচিত সংযোজনা।

১৬. সাধারণ ভাষায় অসামান্য উপলক্ষের প্রকাশ ঘটানো।

১৭. এই প্রকাশের ক্ষেত্রে একাধিক বিষয় বাক্য দিয়ে বোঝানো হয় না।

১৮. তদগত গদ্যও স্বভাবগুণে ব্যক্তিসাপেক্ষ হয়ে ওঠে।

১৯. শৈলীমাঝেই স্বকীয়।

নিজের গদ্য সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এমনই সব ধারণা ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। একই সঙ্গে তিনি কবিতা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন। এইরকম দুয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। যথা,

১. “পরবর্তী রচনাবলী সেই প্রণোত্তবেব, ফলাফল, এবং কোন্ ঐশ্বর্যে ফাঁকি না পড়লে, আমিও দূরই প্রবন্ধ না লিখে আলোচ্য কীর্তিমানদের মতো আমার নিবেদন রসাস্বক বাক্সেই স্তানাতুম, তার স্বগত উক্তি-প্রত্যুজিতে এ বইখানার নেপথ্য মুখরিত।” [স্বগত, সূচনা, ১২]
২. “অতএব কাব্যরচনা ও কাব্য বিবেচনা একই ব্যাপারের প্রকাবাস্তবঃ এবং কিশোরের অব্যক্ত কবিতা প্রৌঢ়ের বাচাল বৈদগ্ধ্য বদলাক বা না বদলাক, পরিণত কাব্য যে অশৈশব বিতর্ক বিচারের মুশাপেক্ষী, তাতে আমার তিলার্ধ সন্দেহ নেই।” [এ, ১৮]
৩. “তাহলেও আপনার সমালোচনা পরজন্মের জন্য ভুলে রাখতে আমি অপারগ; এবং গত কয়েকবছর ধরে আমার প্রাক্কালীন পদ্য আমাকে কেবলই লজ্জা দিয়েছে।” [স্বগত, পুনশ্চ, ১৯৫]
৪. “অন্তত আমার এক দার্শনিক বন্ধু একবার রটিয়েছিলেন যে, আমার গদ্যভাব যে কার্যে নিযুক্ত, পদ্যে তার নির্বাহ ভাবজীবির কর্তব্য।” [এ, ১৯৬]
৫. “এবং আমার কাব্য কদাচিত্ সার্বজনীন আবেগের প্রসাদ পেয়ে থাকলেও, আমার প্রবন্ধে ব্যক্তি স্বরূপের দৃষ্টবিমূখ ধারণা, আর্থসত্যের প্রতি নির্বোধ পক্ষপাত, এমনকি কবিদের বিষয়ে দুর্মত ভাববিলাস—এ সমস্তের উদ্ভব

স্বদেশী কৈবল্যের অনির্বচনীয় নির্বিরোধে।” [ঐ, ১৯৯]

৬. “কপালদোষে আমি কবি না কোবিদ নই, পদ্মবগ্রাহীদের পদাঙ্কচারী, সেই জন্যে আমার বচনায় সংগঠনের সাক্ষাৎ এখনও দুর্লভ।” [কুলায় ও কালপুরুষ, মুম্বই, ক]

ক. দুর্লাহ প্রবন্ধ লিখেছেন জানানো।

খ. ঐশ্বর্যে কাকি পড়েছে বলেই কাব্য রচনা না করে প্রবন্ধ লিখেছেন।

গ. স্বগত উক্তি প্রত্যাভি দিয়ে তৈরি তাঁর প্রবন্ধ।

ঘ. কাব্যরচনা কাব্যবিবেচনা অর্থাৎ কবিতা লেখা ও সমালোচনা একই বিষয়ের প্রকারান্তর মাত্র।

ঙ. নিজের সমালোচনা এ ভঙ্গিতেই করে ফেলা।

চ. পরিণত কাব্য বিচারের মুখাপেক্ষী।

ছ. নিজের কাছে গত কয়েক বছরের পদ্য লেখা দিয়েছে।

জ. তাঁর গদ্যে যে ভাব যে কাছ করছে পদ্যেও তা করা উচিত বলে তাঁর সম্বন্ধে রটনা আছে।

ঝ. কবিতায় কদাচিৎ সার্বজনীন আবেগ বাহিত হলেও প্রবন্ধে ব্যক্তিস্বরূপের স্বম্বাভিমুখী ধারণা ও আর্থসত্যের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশিত।

ঞ. কপালদোষে নিজেকে কবি বলে স্বীকার না করা।

ট. সেকারণে তাঁর রচনায় সংগঠনের সাক্ষাৎ এখনও নেই।

এখানে কবি তার প্রাবন্ধিকের মধ্যে আপাত কোন ঝগড়া নেই তা স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর কথায়। স্পষ্ট হয় স্বগত কথাবলা কেন্দ্র নয়—উক্তি প্রত্যাভি থেকে তৈরি হয় তাঁর প্রবন্ধ। কবিতা তৈরি হয় এই স্বগত কথা বলা থেকে। কবিতা আর প্রবন্ধ তাঁর কাছে প্রকারান্তর মাত্র। অর্থাৎ দুটি ভিন্ন সংরূপ বা genre মাত্র। ফলে কবির ভাষা না থাকলেও কবির আবেগ তাঁর প্রবন্ধে কত্মান। পরন্তু যুক্তিকে সেই ভাষার মধ্যে তিনি নিয়ে আসেন। এভাবে পরিপূর্ণ একটি স্বকীয় শৈলী তৈরি হয়ে যায়। সেই শৈলীই আমাদের কাছে প্রকাশ করে—এ বচনা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের। আর এই শৈলীকে ধরতে না পেলেই তাকে দুর্লাহ আখ্যা দেন।

লেখক তাঁর নিজের মতো লিখে যাবেন নাকি পাঠকের কথা মতো তিনি চলবেন? পাঠক কি লেখক তৈরি করবার দায়িত্ব নেবেন? নাকি লেখক পাঠককে তৈরি করবেন? আমাদের বাংলা সাহিত্যে মুশকিলটা এখানেই যে, অধিকাংশ পাঠক অজস্র। লেখক সেই পাঠককে হারাবার ভয়ে যেভাবে লেখেন তাতে প্রবন্ধ সাহিত্যে অন্তত খুব বেশি এগিয়ে যেতে পারিনি। খুব বেশি টেকনিক্যালও হতে পারিনি। আমাদের দেশে লেখক-পাঠকের মনস্তত্ত্ব নিয়ে তেমন কোন কাজ হয়েছে কি? পাশ্চাত্যে হয়েছে। Flower বইপত্রের পড়ার মনস্তাত্ত্বিক দিকটি নিয়ে ভেবেছেন লেখকের দিক থেকে [1987, Interpretive acts : cognition and the

construction of discourse. Poetics 16, pp.109-30]। Van Dijk এবং Kintsch W. এটিকে ভেবেছেন পাঠকের দিক থেকে [1983, Strategies of Discourse comprehension, Academic press, New York]। তিনি 'Author's main points' বা লেখকের মূল বিষয় পাঠের পদ্ধতিব কথা বলেছেন। Vipound এবং Hunt বলেন 'Point-driven reading-এর কথা। এখানে পাঠক ঘন ঘন পাঠের বিষয়গুলির যথার্থ দাবী করে। এটি 'Story-driven' পাঠের অর্থাৎ 'কেবল গল্প পড়া' পদ্ধতির বিপরীত [1984, Point-driven understanding : Pragmatic and cognitive dimensions of literary reading, poetics : 13, pp. 261-77] সুধীন্দ্রনাথ যে কাল্পনিক করেছেন তা লেখকের দিক থেকে ভাবনা। পাঠকের মুখ চান নি। পাঠক অর্থাৎ তথাকথিত অঙ্গস পাঠক। পাশাপাশি তিনি অন্যদের মতো বিশ্বাস করতেন না সব পাঠকই ছেলেমানুষ কিছু বোঝে না। পাঠককে তিনি মান করেন সমর্থনী। আর সে কারণে তিনি লেখেন পাঠকের হয়ে। কুসল,

“সম্ভবত সেই জন্যে বঙ্গীয় গদ্যের ধারায় পরিণামী প্রাণবাত্রার কল্যাণ
জটিলতা নেই এবং আমার জ্যেষ্ঠেরা ঊনবিংশ শতাব্দীর আশ্রয়প্রত্যয়,
মানুষ হয়ে, সারল্য আর তারামোর সহজ সম্পর্কতা ধরতে পারেন নি।”

[স্বাগত, পুনশ্চ, পৃ-১৯৮]

পূর্ববর্তী প্রাবন্ধিকের গদ্যে যে সবলতা আনবার প্রয়াস দেখা গেছে সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই তরলতা চলে এসেছে। অনেকেই সবল আর তবলাকে এক করে লেখেছেন। সুধীন্দ্রনাথ তা লেখেননি। তিনি বাঙালী পাঠককে দুখ হুতম হবে না বলে কল্যাণ বাওয়ান নি। তিনি পাঠকের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

“কিন্তু বাঙালী পাঠকের প্রতি তাদের তাঁর তাক্সিলা কদাচিৎ আমাব
ধাত আসেনি এবং আমাব গদ্যে আবর্তের আবিল সূত্রপাত গুণনিম্বার
যৌবনসুলভ প্রকৃতি থেকেই বটে, তাহলেও প্রথম সংস্করণে ‘স্বাগত’
এর অপ্রত্যাশিত কাটতি দেখে আমি বুঝেছিলাম যে বাংলার মনীষ
আসলে স্বভাব নির্গৃহ নয়।” [ঐ, ১৯৮-১৯৯]

সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষায় কোথাও দুঃসহতা সে অনুসন্ধান আনরা যদি করতে চাই তাহলে সবচেয়ে আরো চোখে পড়বে বেশ কিছু শব্দ ব্যবহারের প্রতি তাঁর মায়া। যেমন—জাড্য, অহৈতুক, কদাচিৎ, স্বভাব নির্গৃহ, নৈব্যক্তিক, কলাকৈবল্য, অনুকম্পা, প্রমিতি, আপত্তিক, অবৈকল্য প্রভৃতি শব্দ। এই শব্দগুলি মূলত তৎসম। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে নেওয়া কৃতকৃত শব্দ। তত্ত্ববে যা বলা যেতে পারতো তাকে তিনি তৎসম শব্দে ব্যবহার করেন। যেমন—

সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত

আর অগ্রগমনের হ্রন নেই [কবোর মুক্তি]

তার প্রত্যাবর্তনের পথ [ঐ]

তত্ত্ববে হতে পারতো

আর এগোনোর হ্রন বাঙালিয়া নেই

তার ক্ষেবাব পথ

আমি সাহিত্যে জনমতার পক্ষপাতি
[উইলিয়াম ফকনার]
তাক্ষীরতার ব্যাতি [এ]
নিষিদ্ধ সংযোজনা স্বভাবসিদ্ধ বটে [সেটিনা]
শিল্পসৃষ্টির পটভূমি পলিনেশী চিত্রশ্রবণ [সূর্যকর্ত]
সংসারসীমার বাইরে দুর্নিরীক্ষ্য [অনুব্যর্থ]
সদস্যদের নিষ্পত্তি [উদ্বোধ]

আমি সাহিত্যে সচলতার পক্ষপাতি
নিষ্পত্তি ভাবের ব্যাতি
ছিন্নহীন যোগ স্বভাবসিদ্ধ বটে
শিল্প তৈরীর পটভূমি পলিনেশী হৃদয়ের
উৎসর্গ
সংসার সীমার বাইরে দেখা যায় না।
সংসার অসতের ছিন্নহীনতাও

কেন তিনি সহজ তত্ত্বকে লিখলেন না? তার প্রথম উত্তর—এটাই তাঁর শৈলী।
এভাবেই লিখতে চান তিনি। দ্বিতীয় উত্তর বোধ হয় পাওয়া যাবে তার লেখায়।
তিনি যখন বলেন,

“ধ্বনি রচনা মুখ্যত পদ্যের কর্তব্য হলেও, গদ্য সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ
বঞ্চিত, এমন ধারণা অগ্রাহ্য।”

[কুলায় ও কাঙ্গপুরুষ, ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৩১]

“পদ্যের ধ্বনির সাধারণত সমমাত্রিক ও সুনিয়ন্ত্রিত কিন্তু গদ্য সর্বত্রই
বৈচিত্র্যময়—তার উত্থান পতন অর্থভিন্ন অনাকোনও বিধি-নিষেধ মানে
না। [এ]

এই ধ্বনি সঞ্চার করবার জন্যই সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের
মতো প্রবন্ধের ভাষাতেও ধ্বনিকল্প তৎসম শব্দ ব্যবহার করতে চান। মধুসূদন যে
কাব্যে তৎসম শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন ঠিক সেই ধ্বনি ব্যঞ্জনের
প্রয়োজনেই কেবল কবিতাতেই নয়, গদ্য ভাষাতেও তিনি এক কাব্যময় ধ্বনিতরঙ্গ
সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এই ধ্বনি সচেতনভাবে শৈলী বিষয়ক ভাবনাচিন্তার প্রকাশ।
শৈলী বিষয়ক আরও কিছু কিছু দিক আমরা এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করতে পারি।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য যে দুরূহ লাগে তার জন্য তাঁর গদ্যভাষা তথা শব্দ ব্যবহার
খুব বেশি দায়ী নয়। ওই শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি যে বক্তব্য প্রকাশ করতে
চান সেই বক্তব্যের ক্ষেত্রেই সমস্যা দানা বেঁধে ওঠে। উদাহরণ হিসাবে এই শব্দ
লক্ষ্য করা যেতে পারে।

“প্রাথমিক কবিতার উদ্দেশ্য বিকলন নয়, সম্বলন।” [স্বগত, কাব্যের
মুক্তি, পৃ-২১]

‘বিকলন’ শব্দটির অর্থ নিয়ে সাধারণ পাঠকের কাছে সমস্যা তৈরী হবে। কিম্বা যখন
তিনি বলেন,

‘আবহমান জীবনের স্থিতিনিরূপক-রূপে’ [স্বগত, প্রপদ খেয়ালা, পৃ-৫৭]

‘অবশ্য সেই প্রতিবিম্বনপ্রকরণে কতকটা স্বকীয়তা ছিল।’ [স্বগত,
ফরাসীর হার্দ্য পরিবর্তন, পৃ-৭১]

‘প্রজ্ঞাবিসর্জনের কুমন্ত্রনা মিলবে না’ [স্বগত, মাকসিম গর্কি, পৃ-১০২]

‘আত্মসমাহিতি নামক ত্রৈলোক্যচিন্তামণি সত্য সত্যই বহুপবীক্ষিত

[স্বগত, গুরুচণ্ডাল, পৃ-১১৭]

এইসব বাক্যের ‘স্থিতিনিরূপক’, ‘প্রতিবিম্বনপ্রকরণ’, ‘প্রজ্ঞাবিসর্জন’, ‘আত্মসমাহিতি’, ‘ত্রৈলোক্যচিন্তামণি’ প্রভৃতি শব্দ-ব অর্থবোধ সাধারণ পাঠকের কাছে আয়াসগম্য বলে মনে হবে। অলসভাবে এই সব প্রবন্ধ পড়া যাবে না।

অলসমস্তিষ্কে শিথিলভাবে এইসব প্রবন্ধ পাঠ সম্ভব নয় তা প্রবন্ধলেখকের বাক্য ব্যবহার থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন,

“অদ্বৈতঃপক্ষে এতে সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথের মানসজীবনে নব যৌবনের গুরুত্ব পরিশ্রুত বয়সের চেয়ে অনেক বেশী এবং সুদীর্ঘ শ্রৌড়তার শেষে আজও তিনি বহির্লগ্ন-সমক্ষে আদৌ নিরাগ্রহ নন বাটে, কিন্তু সে-বিষয়ে তাঁর ইদানীন্তন মনোভাব স্মরণে আনে সমাধিমগ্ন সোহংবাদীকে, যিনি অদ্বৈত বলেই, ইন্দ্রিয় থাকলেও নির্বিকার।” [কুলায় ও কালপুরুষ, রবীন্দ্রপ্রতিভার উপক্রমণিকা, পৃ-৭]

এখানে সাধারণ পাঠক এবং অসচেতন পাঠক বক্তব্যবিষয়ের মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পাবেন। কিন্তু সুদীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলী এখানেই তাঁকে বিশেষভাবে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়। বাক্যের মধ্যে যে ছাটিলতা তা নিছক সীর্ষবাক্য জনিত সে কথা বলা যাবে না। এখানে সবচেয়ে আগে দেখা যাবে নেতিবাচক বাক্য এবং নঞর্থক শব্দ ব্যবহার কবাব প্রকণতা। এই বাক্যে প্রথমেই আছে সন্দেহ নেই এবপব নিবাগ্রহ নন নির্বিকার প্রভৃতি শব্দ একাধিকবাব নেতিবাচক বক্তব্য ব্যবহার করে বক্তব্যগত একটি ছাটিলতা তৈরি করেছে। অদ্বৈত শব্দটিও ‘ন দ্বৈত’ বক্তব্য বহন করে। বাটে, কিন্তু ক্রান্তীয় প্রতিষেধক অব্যয় এই ধ্বনাব নেতিবাচক বক্তব্যকে সমর্থন করে একটি ইতিবাচকতার দিকে নিয়ে যায়। এই ধরনের নেতিবাচক শব্দ বা বাক্য তিনি তুলনায় অনেক বেশি ব্যবহার করেছেন। যথা,

১. ‘আমরা মনে রাখি না যে এমন একদিন গেছে যখন তিনি বাংলা সাহিত্যের বিধাতা পদবাচ্য ছিলেন না, বরং তাঁকে লেখকের বিভ্রাতীয় লাগত।’ [কুলায় ও কালপুরুষ, রবিশয্য, পৃ-১৩]

এই প্রবন্ধে আমরা আরো লক্ষ্য কবি ‘সমগোষ্ঠীয় নন’, ‘চিহ্নমাত্র নেই’, ‘লেখেননি’, ‘নগণ্য’, ‘স্রেটাতে পারে না’, ‘সায় দেন না’, ‘নৈব্যক্তিক’, ‘স্থানু নন’, ‘পড়েনি’, ‘অনুপস্থিত’, ‘সম্মান পাননি’, ‘নামগন্ধ নেই’, ‘কমে না’, ‘শৈথিল্যের অভাব নেই’, ‘উহা নেই’, ‘জড়িত না থাকলে’, ‘লাগুক না কেন’, ‘পারতেন না’, ‘নিম্নপদস্থ নয়’, ‘অনুন্নত’, ‘অসম্ভব’, ‘বোঝেননি’, ‘দাঁড়ায় না’ ইত্যাদি অল্প শব্দ। তাঁর প্রবন্ধগুলির থেকে নেতিবাচক শব্দ ও বাক্যের তালিকা করলে তার পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য হবে না। বোঝা যায় বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি এই ধরনের শৈলী বিশেষ পছন্দ

করতেন। নেতিবাচক শব্দও বাক্যের মাধ্যমে বক্তব্যের ইতিবাচকতা প্রকাশ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি শৈলী। আরো দুয়েকটি প্রবন্ধ থেকে এই ধরনের বাক্যের উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক।

২. 'এই স্বাধীনতার স্বভাবদোষে গদ্য ক্ষতিগ্রস্ত নয়, এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না।' [এ ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ-৩১]

৩. 'তাই বলে তাঁরা নিশ্চিন্ত নন; এখানেও তাঁরা রবীন্দ্রনাথেরই অনুকারী।' [এ সূর্যবত, পৃ-৬১]

৪. 'কিন্তু মানবেতিহাসে উপনিপাত এই প্রথম নয়; এবং প্রতিবারে যখন যুগান্তের দুর্যোগ কেটে সুপ্রভাত এসেছে, তখন এ-বারেও, রবীন্দ্রনাথ অন্তর্হিত বসেই, নরলোক চিরতিমিরে তলিয়ে যাবে না।' [এ দিনান্ত, পৃ-৭১]

৫. 'সৌভাগ্যবশত তাঁদের ফাঁকি তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ল না।' [স্বগত, প্রথম খণ্ড, পৃ-৪৪]

৬. 'কিন্তু পরিবর্তন শুধু পরিবর্তন হিসাবেই শ্রেয় নয়; তার পিছনে যখন নিত্যের তাগিদ থাকে, তখনই তা গ্রাহ্য।' [এ, উইলিয়াম ফক্সন, পৃ-৮১]

৭. 'সাহিত্যসভায় আমন্ত্রণীয় বক্তৃতা নিষিদ্ধ বলেই, সেখানে আয়োজিত নিষিদ্ধ নয়; এবং নভেলে ভালোমন্দের ব্যক্তিগত বিচার অশোভন হলেও, তাতে একটা জাগতিক মুসাদ্দান শুধু বাহ্যিক নয়, নিত্য আবশ্যিক।' [এ উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য, পৃ-৮৯]

৮. 'কলাবাহুসা লেখকব্য আমার বাগবিত্ত্যের জন্য অদৌ দায়ী নন এবং পুস্তকই কথাসাহিত্যের প্রশংসনীয় নিদর্শন—অর্থাৎ কোনওটাতে তত্ত্ববিচারের বা মতপ্রচারের প্রয়াস নেই।' [এ, দোতানা, পৃ-১১১]

মনোভাষাবিজ্ঞানে নেতিবাচক বাক্য নিয়ে নানাবিধ কাজকর্ম হইবে। সাধারণ ইতিবাচক বাক্যের থেকে নেতিবাচক বাক্য আমাদের কাছে ধরা পড়ে। কিন্তু সেখানেও একটি নিয়ম আছে। তা হল সাধারণ ইতিবাচক এবং স্বাভাবিক বিষয়ের নেতিবাচক সহজে বোঝা যায়। কিন্তু যেখানে নেতিবাচক বক্তব্য স্বাভাবিক সেখানে দুবার নেতিবাচক বক্তব্য দিয়ে ইতিবাচক বক্তব্য তৈরী করা স্বাভাবিক বা সহজ বোধগম্য নয়। সুধীন্দ্রনাথ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে তৈরি হয়েছে বক্তব্যগত ভটলতা।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য ভাষায় স্বাভাবিক আদর্শ আন্বয়িকরূপ বা Norm-এর প্রয়োগ খুবই কম। Mukarovsky যে বিচ্যুতি বা Deviation-কে কলাভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেছিলেন সেই বিচ্যুতি সাহিত্যের ভাষায় এমনকি আমাদের কথা বলাতেও থাকে। কিন্তু তার প্রয়োগে মাত্রা কবিতার ভাষায় থেকে তুলনামূলক ভাবে বেশি। বাক্যের আদর্শরূপ এবং সুধীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বিচ্যুত রূপ পাশাপাশি রেখে এই বিচ্যুতির বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত বাক্য (বিচ্যুত রূপ)

আদর্শরূপ বা নর্ম

১. 'কাব্যের জন্মবৃত্তান্তে আমাদের প্রয়োজন নেই; সে সন্ধান নৃতত্ত্ববিদের।'

১. আমাদের কাব্যের জন্মবৃত্তান্তে প্রয়োজন নেই নৃতত্ত্ববিদের সে সন্ধান (প্রয়োজন)।

[স্বগত, কাব্যের মুক্তি, পৃ-২১]

এখানে বাক্যের কাব্য প্রধান হয়ে উঠেছে কাব্যের জন্মবৃত্তান্ত বিষয়টি। বাক্যের মাঝখানে থেকে এটিকে বাক্যের প্রথমে নিয়ে আসা হয়েছে। এই পদ্ধতিকে foregrounding বা প্রমুখন বলে। বিচ্যুত রূপ প্রাপ্ত বাক্যের উদ্দেশ্য একটি বক্তব্যকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া। প্রমুখনের মাধ্যমে সেই কাজটি করা হয়। বাক্যের শেষেও যদি বাক্যের প্রথমের উপাদানকে নিয়ে যাওয়া হয় সেক্ষেত্রেও প্রমুখন ঘটে। এখানে নৃতত্ত্ববিদের শব্দটির স্বাভাবিক অবস্থান বাক্যের প্রথমে। বাক্যের শেষে এটিকে নিয়ে যাওয়ার ফলে বক্তব্য বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২. 'এক সময়ে সংসাহিত্যের সার্বজনীন আবেদনে আমার অগাধ আস্থা ছিল।'
[ঐ, মাক্সিম গর্কি, পৃ-৯৭]

২. আমরা একসময়ে সংসাহিত্যের সার্বজনীন আবেদনে অগাধ আস্থা ছিল।

এখানে প্রথম উদাহরণটির তুলনায় বিচ্যুতির মাত্রা কম। প্রথম উদাহরণটির তুলনায় কাব্যিক আবেদনও কম এই বাক্য।

৩. 'অতএব বিশেষ-সাধারণের বিবাদ কবি যত সহজেই মেটান না কেন, তার প্রাপ্তস ব্যাখ্যা তাঁর কাছ থেকে না পাওয়াই সম্ভব সে জানো হতে হয় দার্শনিকদের দ্বাবস্থ।' [ঐ, টি এস এলিয়ট, পৃ-১৫১]

৩. অতএব কবি বিশেষ-সাধারণের বিবাদ যত সহজেই মেটান না কেন, তার প্রাপ্তস ব্যাখ্যা তাঁর কাছ থেকে না পাওয়াই সম্ভব সে জানো ঐতিহ্য ও দার্শনিকদের দ্বাবস্থ হতে হয়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় এভাবেই কাব্যময়তা প্রকাশ পায়। এখানে ক্রিয়াপদকে বাক্যের মাঝখানে নিয়ে এসে এই ধরণের কাব্যময়তা তিনি সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে ক্রিয়াপদকে বাক্যের শেষে ব্যবহার করার জন্য বিচ্যুতির মাত্রা সেভাবে বৃদ্ধি পায় নি। এধরণের কাব্যময়তা সৃষ্টি এমন কিছু উদাহরণ লক্ষ্য করা যেতে পারে।

৪. 'অন্ততঃ পক্ষে স্বকীয় মনীষার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি খুঁজতে গিয়ে তিনি মাতৃভাবাকে যে অভিনব রূপ দিয়েছেন, তার প্রতিভাসে কেবল সুধীসমাজই সমুচ্ছল নয়, অশিক্ষিত বা অশিক্ষিতেরাও উদ্ভাসিত এবং

৪. তিনি অন্ততঃ পক্ষে স্বকীয় মনীষার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি খুঁজতে গিয়ে মাতৃভাবাকে যে অভিনব রূপ দিয়েছেন, সুধীসমাজই তার প্রতিভাসে কেবল সমুচ্ছল নয়, অশিক্ষিত বা অশিক্ষিতেরাও উদ্ভাসিত; এবং তাঁর

তাঁর চিন্তাবৃত্তির অনুকরণ যদিও আত্ম
আর তেমন প্রশংসা পায় না, তবু
অনেকের মতে রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাই
তরুণ সাহিত্যের মূলধন।' [কুলায় ও
কালপুরুষ, সূর্য্যবর্ত, পৃ-৫৫]

চিন্তাবৃত্তির অনুকরণ যদিও আত্ম আর
তেমন প্রশংসা পায় না, তবু অনেকের
মতে রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাই তরুণ
সাহিত্যের মূলধন (হয়েছে)।

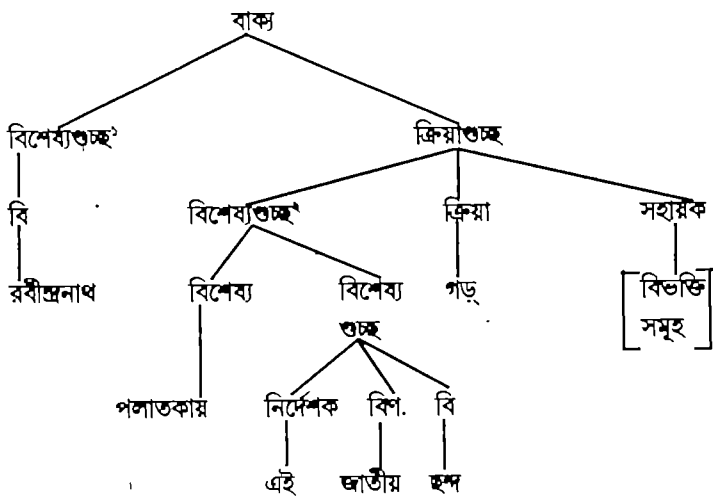
এভাবে ক্রিয়াপদকে বাক্যের মাঝখানে নিয়ে যাওয়া কিম্বা বাদ দেওয়া ভাষাবিজ্ঞানের
তত্ত্ব অনুসারে এক ধরনের সংবর্তন বা Transformation বলা যায়। অবস্থান বদল
বিপর্যাস (Extraposition) জাতীয় সংবর্তন এবং ক্রিয়াপদ বাদ দেওয়া বিলোপন
(Deletion)। বিলোপন ভাষার ক্ষেত্রে একধরনের বিশেষ শৈলী নিয়ে আসে। এখানে
কিছু সংবর্তনের ব্যবহার দেখানো যেতে পারে।

১. 'বাহ্যিত সহজতর শুরু এইখানে।' [স্বগত, কাব্যের মুক্তি, পৃ-৩৭]

মূল বাক্যটি অধোগঠনে (Deep structure) ছিল এই ধবনের—এইখানে বাহ্যিত
সহজতর শুরু হয়েছে। ক্রিয়াপদটি বিলোপিত হয়েছে যেমন তেমন নির্দেশক
'এইখানে' বাক্যের প্রথম থেকে চলে গেছে বাক্যের শেষে। ফলে বিপর্যাস জাতীয়
সংবর্তন ঘটেছে এখানে।

২. 'পলাতকায় রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় হৃদ গড়লেন।' [কুলায় ও কালপুরুষ,
হৃদোন্মুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ পৃ-৫০]

এখানে বিপর্যাস-এর মাধ্যমে বিচ্যুতি ঘটানো হয়েছে। অধোগঠন থেকে কেমন করে
এই বাক্যটি পেলাম তা দেখা যাক। একটি বাক্য দুটি প্রধান পদশৃঙ্খ দিয়ে গঠিত
হয়—বিশেষ্যধর্মী পদশৃঙ্খ এবং ক্রিয়াধর্মী পদশৃঙ্খ দিয়ে। ক্রিয়াধর্মী পদশৃঙ্খে
বিশেষ্যধর্মী পদশৃঙ্খ বা বিশেষ্যশৃঙ্খ থাকে। অধোগঠন—



বিশেষ্যশুদ্ধ এবং বিশেষ্যশুদ্ধ—এর বিশেষ্য পদের অবস্থানগত বিপর্যাস—

পলাতকায় রবীন্দ্রনাথ

ক্রিয়া-সহায়ক রূপগত সংযোগ—

গড়লেন

প্রাপ্ত অধিগঠন—

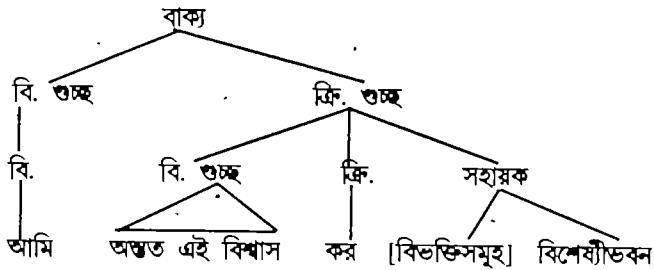
পলাতকায় রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় ছন্দ গড়লেন

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় দেখতে পাই অল্প বিশেষীভূত (Nominalized) বাক্য। এখানে দুয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যথা,

১. “অন্তত এই আমার বিশ্বাস; এবং আমার জন্মভূমিকে আমি ভালোবাসি বলেই, আমাদের জীবনযাত্রায় শ্রোয়াবোধের সার্বত্রিক অভাব আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় ঠেকে।” [স্বগত, পুনশ্চ পৃ-১৯৯]

এই ছটিল বা আশ্রয়ধর্মী বাক্যটির মধ্যে চারটি সরলবাক্য আছে। অর্থাৎ অধোগঠনে চারটির সরলবাক্য সংবর্তনের মাধ্যমে এই ছটিল বাক্যটি নির্মাণ করেছে। সরলবাক্যগুলির সংবর্তন এবং ছটিল বাক্যে পরিণত হওয়ার ক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যাক।

ক. আমি অন্তত এই বিশ্বাস করি।



কর্তা বি. > কর্তা + সম্বন্ধবাচক = আমার

ক্রি. > ক্রি. বিশেষ্য = করা

বিপর্যাস = অন্তত এই আমার

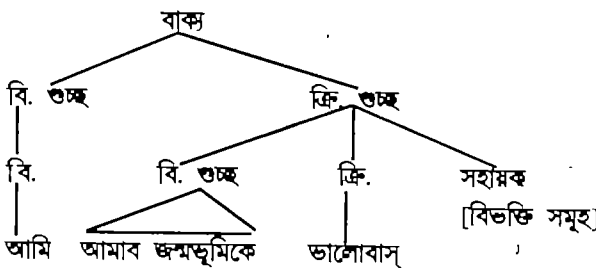
ক্রিয়া বিশেষ্য লোপ

= ∅

অধিগঠনে প্রাপ্ত বাক্য—

অন্তত এই আমার বিশ্বাস

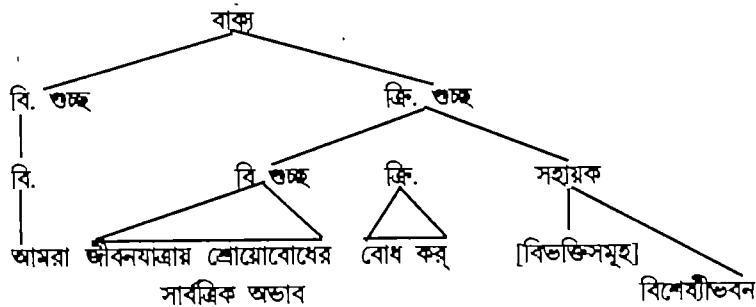
খ. আমি আমার জন্মভূমিকে ভালোবাসি



বিপর্যাস— আমার জন্মভূমিকে আমি

অধিগঠন— আমার জন্মভূমিকে আমি ভালোবাসি

গ. আমরা জীবনযাত্রায় শ্রেয়োবোধের সার্বত্রিক অভাব বোধ করছি।



কর্তা > কর্তা + সম্বন্ধবাচক = আমাদের

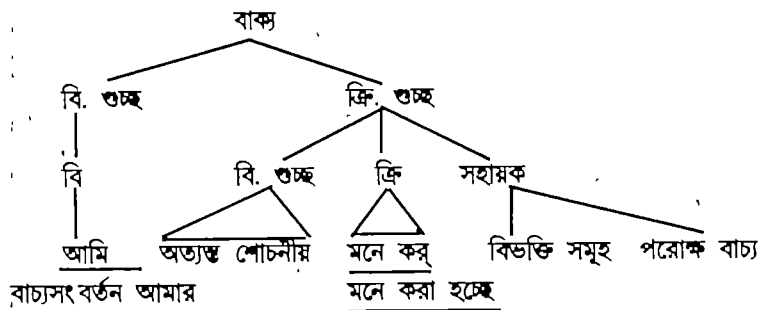
ক্রি > ক্রি. বি. = বোধ করা

ক্রি বিশ্লোপন = ∅

শেষ বাক্যটির বিশেষ ধরনের সংবর্তন ঘটেছে। আসলে বাক্যটি এই ধরনের—

‘আমি অত্যন্ত শোচনীয় মনে করছি।’

কিন্তু বাক্যটির নৈব্যক্তিক চেহারা দেবার জন্য পরোক্ষ বাক্য হিসাবে যেমন সংবর্তন ঘটানো হয়েছে তেমনি পূর্ববর্তী বাক্যটির বিগর্ভন (Embedding) ঘটেছে এখানে।

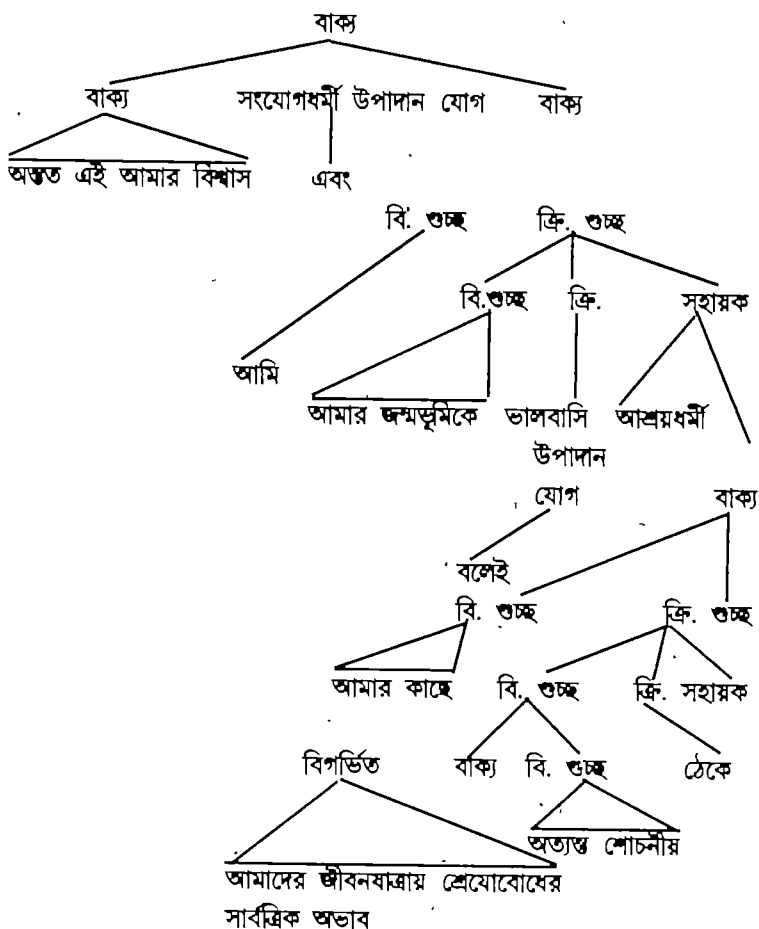


‘কাছে’ যোগ আমার কাছে

‘ঠেক’ ক্রিয়া পরিবর্ত উপাদান হিসাবে যোগ = ঠেকে

আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় ঠেকে

এই সরলবাক্যগুলির নানাবিধ সংবর্তন করে একটি জটিলবাক্যে সংবর্তিত করা হয়েছে। যথা



এই ভাবে নানাবিধ জটিল সংবর্তনের ভিতর দিয়ে সুশীলনাথ যে অজ্ঞত জটিলবাক্য তৈরি করেছেন তা অনেক সময়ই পাঠকের কাছে দুঃসহ বলে মনে হয়। অল্প বিশ্লেষণ যেখানে সহজ হয় না, সেখানে পাঠকের স্বাভাবিক অনায়াস সাধ্য সাহিত্যিক পারঙ্গমতা বোধ Literary competence বাধা পায় বা সহজে প্রবেশ করতে পারে না। সেখানে বিভ্রান্ত ও ব্যাহত না হয়ে সুশীলনাথের গদ্যভাষার অল্প বহুবার পড়লে তবেই পাঠকের মধ্যে তৈরি হবে পারঙ্গমতাবোধ। আর তখন তা দুর্বোধ্য ঠেকেনি এমন পাঠকের সংখ্যাও নগণ্য নয়। সেকথা লেখক নিজেই তাঁর জীবৎকালে উপলব্ধি করেছিলেন। জটিল আনুগমিক গঠনযুক্ত বাক্যের আরো কিছু নিদর্শন এখানে দেখা যাক—

২. ‘আধুনিক কবি আমার এই মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন না করলেও, মানে যে কাব্য যখন মহত্বের কোঠায় পৌছায়, তখন তার সঙ্গে আর সংখ্যার কোনও সম্পর্ক থাকে না, তখন তার ভিতরে পাওয়া যায় শুধু একটা বিরাট সহজতা।

[স্বগত, কাব্যের মুক্তি, পৃ-৩৩]

গঠনগত জটিলতা এবং অর্থবোধগত জটিলতা পরস্পর পরস্পরকে আবদ্ধ করে উপস্থিত। আগের উদাহরণটির মতো নানাবিধ সংবর্তনের ফলে অধিগঠনে এই জাতীয় বাক্য আমরা পাই।

৩. “মহাকবিরা দ্বন্দ্বজন্মা হোন বা না হোন, আজকালকার সংস্কৃতি সম্বন্ধেও তাঁদের অনেকে বেঁচে বর্তে আছেন; এবং সমসাময়িকদের প্রতি অবজ্ঞার মাত্রা কিছু পরিমাণে কমাতে পারলে, আমরা কেবল সুদূর অতীতের মহত্বের সন্ধান পেতুম না, আধুনিকদেরও কীর্তিমান বলে ভাবতুম। তবে তথাকথিত অকাটা নিয়ম সুদ্ধ ব্যক্তিক্রমের অধীন; এবং সেই জন্যে উল্লিখিত সামান্য বিধিসঙ্কেত, অন্তত ভারতবর্ষে, জীবিত লেখকদের মধ্যে শুধু একজন ব্যক্তি প্রাচীনদের সঙ্গে তুলনীয়।” [কুসায় ও কালপুরুষ, রবীন্দ্রপ্রতিভার উপক্রমণিকা, পৃ-১]

এখানে পর পর দুটি দীর্ঘবাক্য দিয়ে প্রবন্ধ আরম্ভ হয়েছে। পরবর্তী প্রবন্ধ ‘রবিশস্য’তেও একাধিক দীর্ঘবাক্য। এবং ‘ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ’, ‘দিনান্ত’, ‘অন্তঃশীলা’, ‘বাংলা ছন্দের মূলসূত্র’, ‘শিল্প ও স্বাধীনতা’, ‘মনব্যবহা’, ‘আন্দোলনের অত্যাচার’, ‘উদযাস্ত’, ‘আঠাবো শতকের আবহ’, ‘ভিক্টোরীয় ইংলন্ড’, ‘পিতাপুত্র’ প্রভৃতি প্রবন্ধ এই ‘কুসায় ও কালপুরুষ’ গ্রন্থে আরম্ভ হয়েছে অন্তত পক্ষে দুটি অতিদীর্ঘ বাক্য দিয়ে। আবার স্বগত গ্রন্থটির অন্তর্গত প্রবন্ধগুলির মধ্যে অতিদীর্ঘবাক্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছে—‘বার্নার্ড শ’, ‘লিটন স্টেচি’, ‘ঐতিহ্য ও টি এস এলিয়ট’, ‘জেরার্ড মানসি হপকিন্স’, ‘পুনশ্চ’ প্রভৃতি প্রবন্ধ। লক্ষণীয় যে, ‘স্বগত’ প্রবন্ধ গ্রন্থে পরপর একাধিক অতিদীর্ঘ বাক্য দিয়ে প্রবন্ধ শুরু করাও ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক সংযত ছিলেন।

‘কুসায় ও কালপুরুষ’ গ্রন্থের প্রথম বাক্যটি জটিল বা যৌগিক কিন্তু অতিদীর্ঘ নয় এ ধরনের প্রবন্ধও আছে। কিন্তু অতিদীর্ঘ বাক্য দিয়ে আরম্ভ এমন প্রবন্ধের তুলনায় কমসংখ্যক। যথা, ‘প্রগতি ও পরিবর্তন’ প্রবন্ধ শুরু হয়েছে এভাবে,

‘মনোবিকলনে ধরা পড়ে যে মানুষ মাত্রেরই পরিবর্তন বিমুখ অথচ প্রতিনিয়ত না বদলে সে বাঁচতে পারে না।’ [ঐ, পৃ-২৪৯]

এর পরবর্তী বাক্যটি অতিদীর্ঘ। এই ধরনের বাক্য ব্যবহার ‘অনার্য সভ্যতা’, ‘বিজ্ঞানের আদর্শ’, ‘চোরাবালি’, ‘উক্তি ও উপলব্ধি’ প্রভৃতি প্রবন্ধে ঘটেছে। ‘স্বগত’ প্রবন্ধগ্রন্থে এই ধরনের আরম্ভ বেশ কিছু প্রবন্ধে ঘটেছে। যথা, ‘ডব্লু. বি. য়েটস ও কলাকৈবল্য’, ‘উইলিয়াম লাইন্স ও এল্লা পাউণ্ড’, ‘গুরুচণ্ডাল’, ‘দোটানা’, ‘উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য’,

‘ডি. এইচ. লরেন্স ও ভার্জিনিয়া উল্ফ’ প্রভৃতি প্রবন্ধ। এর মধ্যে ‘উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য’ প্রবন্ধটির দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের তুলনায় বেশ ছোট।

‘কুলায় ও কালপুরুষ’ গ্রন্থে একটিমাত্র প্রবন্ধ সূর্য্যবর্ত তে দেখা যায় প্রথম বাক্যটি বেশ ছোট এবং দ্বিতীয় বাক্যটি দীর্ঘ কিন্তু অতিদীর্ঘ নয়। যথা,

‘রবীন্দ্রনাথ হাল বাংলার সিদ্ধিদাতা গনেশ।’ প্রথমবাক্য।

‘তিনি তো আমাদের উৎসব-অনুষ্ঠানের সূত্রধার বটেই, এমনকি তাঁর বাণী-ব্যতিরেকে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও লাভ নেই।’ দ্বিতীয় বাক্য।

‘স্বগত’ গ্রন্থে এই জাতীয় প্রবন্ধের সংখ্যা বেশি অর্থাৎ প্রথম বাক্যটি সরলবাক্য ও ক্ষুদ্র, সরলবাক্য না হলেও ক্ষুদ্র দ্বিতীয় বাক্যটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দীর্ঘ অতিদীর্ঘ নয়। যথা, ‘সূচনা’, ‘কাব্যের মুক্তি’, ‘রূপদ-খেয়াল’, ‘ফরাসীর হার্য পরিবর্তন’, ‘উইলিয়াম ফকনর’, ‘মাকসিম গর্কি’ প্রভৃতি প্রবন্ধ। এখানে ‘কাব্য অনাদি’ জাতীয় ক্ষুদ্র বাক্যও ‘কাব্যের মুক্তি’ প্রবন্ধে চোখে পড়বে।

‘স্বগত’-র বেশ কিছুদিন পরে ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ প্রকাশিত হয়েছিল। ‘স্বগত’তে তিনি যেভাবে ক্ষুদ্র বাক্য, সরলবাক্য, দীর্ঘবাক্য এবং অতিদীর্ঘবাক্য ব্যবহার করেছেন, ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ গ্রন্থে তিনি সেভাবে করেননি। প্রবন্ধ আরম্ভের প্রথম দুটি বাক্যের যে পরিসংখ্যান আমরা নিয়েছি তাতে দেখা যাবে—প্রথম দুটি বাক্যের একটি ক্ষুদ্র বা সরল অন্যটি দীর্ঘবাক্য—‘স্বগত’তে ছবি এবং ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ গ্রন্থে মাত্র একটি।

প্রথম দুটি বাক্যের দুটি -ই দীর্ঘ বা একটি দীর্ঘ অন্যটি অতিদীর্ঘ বাক্য—‘স্বগত’তে ছটি এবং ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ গ্রন্থে পাঁচটি।

প্রথম দুটি বাক্যই অতিদীর্ঘ বাক্য—‘স্বগত’তে পাঁচটি এবং ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ গ্রন্থে তেরোটি প্রবন্ধ।

অর্থাৎ ‘স্বগত’ গ্রন্থের মোট সাতাবোটি প্রবন্ধের মধ্যে মাত্র ‘পাঁচটি’ অতিদীর্ঘ বাক্য দিয়ে আরম্ভ। আবার এগুলি বেশির ভাগই শেষ দিকে লেখা। আর ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ গ্রন্থের মোট উনিশটি প্রবন্ধের মধ্যে তেরোটি প্রবন্ধ এই ধরনের। বোঝা যাবে, কমলকুমার মজুমদার যেমন ক্রমশ ভাষাব্যবহার জটিলতার দিকে চলে গিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও তেমনি জটিলতার গহনে চলে গেছেন শেষ দিকে।

‘স্বগত’-র তুলনায় ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ গ্রন্থে অতি দীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা যে বেশি তা প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে। এখানে নমুনা হিসাবে কয়েকটি প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত বাক্যের দৈর্ঘ্য লক্ষ্য করা হল।

কুলায় ও কালপুরুষ	প্রথম পৃষ্ঠা	দ্বিতীয় বাক্য (এক সীমা দশ)	তীর্থবাক্য (এক সীমা পঁচিশ)	অতিরিক্ত বাক্য (অসমাপ্ত)
	অসমাপ্ত বাক্য	২, ৭, ৭, ৭, ২, ৫, ১, ১	১১, ২২, ১৫, ২২, ১৭,	৫৫, ৪৪, ২৮, অসমাপ্ত
	চৈতন্য কোলা	৪, ৬,	১৫, ১৮, ১১, ১৭,	২৭, ৪১, ৫৭, ৫৪, ৫৭, অসমাপ্ত
	কল্যাণের হাল	৮, ৭, ৭, ৭, ৬, ৬,	১৪, ২১, ১১, ১৭, ১৭,	২৭, ৫৫, অসমাপ্ত
	পরিবর্তন		১৮, ১২,	
	চৈতন্য		১৪,	২৬, ২৯, ৫৪, ৬৫, অসমাপ্ত
	চৈতন্যবালি		১৫, ১৮, ২৪	৪০, ৫৫, ৫৪, ৫৬
	মনোবাক্য		২১,	৫৬, ৫৮, ২৮, ৪৫, অসমাপ্ত
	অসমাপ্ত		২২, ১১	৫৫, ৪৮, ৫৪, অসমাপ্ত
	বিজ্ঞানের আদর্শ	৫,	১৭	২৭, ২৫, ৫০, ৪০, অসমাপ্ত

এই নমুনা থেকে প্রমাণিত হবে 'স্বগত' গ্রন্থে যেমন বিভিন্ন আয়তনের বাক্য পাওয়া যাবে তেমনটি পাওয়া যাবে না 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে। অবশ্য 'চোরাবালি' প্রবন্ধটি আগে 'স্বগত' গ্রন্থেই ছিল। এই প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার ৭টি বাক্য পাওয়া গেছে। বাক্যগুলির আয়তন 'স্বগত' ও 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থদ্বয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে তা শব্দসংখ্যা মিলিয়ে দেখালেই বোঝা যাবে। 'স্বগত' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে প্রতি পৃষ্ঠার বাক্যসংখ্যা ১১ থেকে ১৫-১৬টি। 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে ৫-৬টি করে। এভাবেই একটি আপাত সিদ্ধান্ত তৈরি হয়ে যায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ক্রমশ দীর্ঘ আয়তনের বাক্য নির্মাণে যেমন মগ্ন হয়েছেন তেমনই তিনি ক্রমশ সমাসবদ্ধ শব্দ নির্মাণে মনোযোগ দিয়েছেন। দীর্ঘ আয়তনের শব্দ তৈরি করেছেন এটিও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'স্বগত'তে যথাক্রমে (অসমাপ্ত বাক্য বাদে) মোট শব্দ সংখ্যা—২৪২, ২৫০ এবং ২০৭টি শব্দ।

'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে—১৬৮, ১৬০, ১৬৬, ১৬০, ১৪৪টি শব্দ।

'স্বগত'তে গড়ে দূশোর বেশি শব্দ আর 'কুলায় ও কালপুরুষ'—এ গড়ে ১৬০টির মত শব্দ। 'চোরাবালি'—তে ১৯০টি শব্দ—এটি যে 'স্বগত'তে আগে ছিল তার স্মৃতি বহন করছে। 'বিজ্ঞানের আদর্শ'তে ৫ শব্দের বাক্য পেলেও এর শব্দসংখ্যা মাত্র ১৪৪টি। ফলে শব্দের আয়তন যে বেড়ে গেছে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। 'স্বগত'তে 'প্রতিহিংসাতর্পণ', 'পশ্চিমাকাশ', 'নায়কনির্বাচন' (পৃ-৭৩) জাতীয় শব্দ পাওয়া গেলেও তা সংখ্যায় কম। কিন্তু 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে পাওয়া যাবে 'বিনয়ব্যবহার', 'ব্যক্তিস্বরূপ', 'আচারবিজ্ঞান', 'নিসর্গনিপীড়িত', 'সমপাক্ষতের' জাতীয় (পৃ ১৭৫) অজস্র শব্দ।

এভাবেই নিরন্তর শৈলী নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি ক্রমশই সহজ এবং অনায়াস বাক্যনির্মাণ থেকে দূরে সরে গেছেন। জটিল বাক্য ও তাত্ত্বিক বক্তব্যের মাধ্যমে বিশেষ পাঠকের কাছে আবেদন রেখেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের ‘গোধূলি জগৎ’

শিবনারায়ণ রায়

১৯৫৭-৫৮। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব এবং ভারতচর্চা বিভাগে তখন আমি রকেফেলার গবেষক হিসেবে কাজ করছি। আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন অধ্যাপক এডওয়ার্ড শিলস, কিন্তু আমার যাওয়ার ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বয়সে তিনি আমার চাইতে বিশ বছরের বড়ো। কিন্তু এই ব্যবধানকে সহজেই অতিক্রম করে তাঁর সঙ্গে আমার একটি গভীর সৌহার্দের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সৌহার্দের সূত্রপাত ঘটান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠি বন্ধু সম্প্রতি প্রয়াত কবি মণীন্দ্র রায়। চম্পিশের দশকের শেষ ভাগে এবং পঞ্চাশের দশকে এটি গাঢ়তর হয়ে ওঠে।

সুধীন্দ্রনাথ বাংলাভাষায় একমাত্র কবি যিনি একই সঙ্গে শূন্যবাদী, সোহাবাদী, অনেকান্তবাদী এবং অন্যান্তবাদী। তাঁর কবিতায় মনন এবং আবেগ পরস্পরে অনুসৃত। কবি এবং গদ্যকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান অবিসংবাদিত। কিন্তু ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর অসামান্য সাহিত্যকৃতি বিষয়ে অধিকাংশ বাঙালি পাঠক বিশেষ খোঁজ রাখেন না। মানবেন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত “মার্জিয়ান ওয়ে” এবং “হিউমানিষ্ট ওয়ে” ত্রৈমাসিকে সুধীন্দ্রের বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী : The World of Twilight. আমরা উভয়েই যখন শিকাগোতে তখন সেখানে সুধীন্দ্র এটি লেখা শুরু করেন।

বসন্ত সুধীন্দ্রকে তাঁর আত্মজীবনী লেখবার জন্যই এডওয়ার্ড শিলস বিশেষ সম্মান সহকারে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের বিভাগে তাকে নিভুতে বসে লেখবার নিজস্ব ঘর দেওয়া হয়েছিল; সপ্তাহে পাঁচদিন তিনি সেখানে বসে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লিখতেন। লিখতেন এবং কাটতেন এবং আবার লিখতেন। যেমন বাংলায় তেমনই ইংরেজিতে তাঁর একটি নিজস্ব স্টাইল ছিল। প্রতিটি শব্দ, উপবাক্য, উপমা, বাক্যের বিন্যাস, বাক্যপ্রতিমা, পরোক্ষ উল্লেখ ইত্যাদি যতক্ষণ না তাঁর তন্মিষ্ট বিচারে উদ্দীর্ণ হতো ততক্ষণ তিনি আর পরবর্তী বাক্যের দিকে অগ্রসর হতেন না। তাঁর অনেক বাক্যই দীর্ঘায়ত; বিভিন্ন উপবাক্যগুলি অর্থের এবং ধ্বনিবিন্যাসের দিক থেকে পরস্পরের পুরক; যুক্তিশীলতা এবং ছন্দনিপুণতার সার্থক সমন্বয়

তার ইংরেজি রচনাকেও বিশিষ্টতা এবং সম্পন্নতা দিয়েছিল। কিন্তু ফলে লিখতে এবং সে লেখা সংস্কারাঙ্কে অনুমোদন করতে তাঁর প্রচুর সময় লাগত। সারাদিনের পরিশ্রমে যে ফসল খামারে তুললেন তার তুলনায় যে সব খসড়া কাগজ-ফেলবার ঝুড়িতে পরিত্যক্ত হতো তাদের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। বাংলা এবং ইংরেজি দুই লেখার ক্ষেত্রেই এটি দেখেছি।

যেহেতু সুধীন্দ্র-রাজেশ্বরীর আবাস সে সময়ে শিকাগোতে আমার বাসস্থানের সম্মুখেই অবস্থিত, অনেক সন্ধ্যায় আহারপর্বের পর তাঁদের আমন্ত্রণে সেখানে যেতাম এবং কখনো কখনো সুধীন্দ্র তাঁর নির্মীয়মাণ আত্মজীবনীর সদ্য রচিত কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনাতে। শ্রোতাদের মধ্যে অনেক সময় থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রভাবসম্পন্ন তাঁর প্রধান অনুরাগী অধ্যাপক এডওয়ার্ড শিল্‌স। অসমাপ্ত আত্ম-জীবনীর শুধু সূচনাপর্বই তিনি শিকাগোতে লিখতে পেরেছিলেন; তাঁর মৃত্যুর পরে সেটি The World of Twilight সম্বলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। গভীর, ভরাট, সুস্বন কণ্ঠ উচ্চারিত সেই পাঠ শুনতে শুনতে মনে হতো টমাস মান বা মার্সেল প্রুস্ত বা জেমস জয়েসের সমকক্ষ একজন শিল্পীর নির্মীয়মাণ কোনো মহৎ শিল্পকর্মের প্রস্তুতি-পর্ব প্রত্যক্ষ করছি। ধর্মের সঙ্গে জড়িত পুণ্য শব্দটি ব্যবহার করতে আমার বাধে; কিন্তু নাস্তিকের অনুসঙ্গে যদি শব্দটি ব্যবহার করা যায়, তবে এই সোভাগ্যকে আমার আত্মসম্মতি সাহিত্যানুরাগের পুণ্য বলা চলে।

সুধীন্দ্রবর্ণিত শৈশবের সেই 'গোধূলী জগতে' যে পরিবার এবং সমাজপরিবেশের ছবি তাঁর কণ্ঠস্বরে শুনতে শুনতে আমার কল্পনায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত তাতে ব্যঙ্গনা, বেচিত্রা এবং রূপময়তা ছিল, কিন্তু অস্পষ্টতা ছিল না। 'নিশ্চিত বৈদান্তিক' পিতা হীরেন্দ্রনাথের দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল সুধীন্দ্রের 'অনেকান্ত জড়বাদ'; 'আকৌশোব আঁঠেতের অনির্বচনীয় আতিশয্যে উদ্ভাস্ত' হয়ে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন অভিজ্ঞতাকে—'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় একথা তিনি নিজেই লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী শুনতে শুনতে মনে কিছুমাত্র সংশয়ের অবকাশ থাকতো না যে পিতা হীরেন্দ্রনাথকে পুত্র সুধীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা করতেন এবং পিতাপুত্রের মধ্যে নিবিড় অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। হীরেন্দ্রনাথকে তাঁর শেষ জীবনে দু-একবার মাত্র অল্প সময়ের জন্য দেখেছি; কিন্তু সুধীন্দ্রের স্মৃতিচিহ্নে তাঁর যে প্রতিকৃতি রূপায়িত তা রেজাশেটের আঁকা স্কেচের মতোই প্রমিত, গুঢ় ইস্তিক্রাহী, অবিস্মরণীয়। অপরাপক্ষে গড়পড়তা বাঙালির মতো সুধীন্দ্র যে মাতৃভক্ত ছিলেন না তাঁর স্মৃতিচারণে সেটি তিনি গোপন করেননি। ছাপার অক্ষরে মাত্র ৭৪ পৃষ্ঠার এই অসমাপ্ত আত্মকথা থেকে শাখাপ্রশাখায়

বিভূত একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে চরিত্রলিপির বৈচিত্র্যে, ঘটনার বহমানতায়, কৌতুকমিশ্রিত বিবাদের সংযমে, আত্মবিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায় তার তুলনা পাওয়া ভার। The World of Twilight-এর ভূমিকায় শিল্প এ প্রসঙ্গে নীরদ চৌধুরীর আত্মজীবনীর উল্লেখ করেছেন। সেটিও চমৎকার বই; কিন্তু দুই খণ্ড মিলিয়ে সেই মহাকাব্য কাহিনীর সঙ্গে সুধীন্দ্রের লেখাটির তুলনা অসংগত। সুধীন্দ্রের গোথুলি জগতের সমাজতাত্ত্বিক মূল্য আছে ঠিকই, কিন্তু এটি আসলে একটি নিখুঁত শিল্পকর্ম। তাঁর বিশ্ব, সহৃদয়, কৃতকাম দেশপ্রেমিক পিতা; সংস্কারাবদ্ধ কোপনস্বভাব অসহিষ্ণু জননী; বিলাসী, দুর্বলচরিত্র কিন্তু কল্পনাপ্রবণ, স্নেহশীল এবং গল্প বলিয়ে জোঁঠা আর তাঁর উচ্ছৃঙ্খল, অপব্যয়ী, রুচিহীন পুত্র; প্রতিভাবান, অসংযত, বেপরোয়া নট, নাট্যকার, নাট্যাচার্য, মঞ্চাধিকারী কাকা এবং তাঁর অহিফেন-আসক্ত, বুদ্ধিমূল্য বংশধর; সুধীন্দ্রের স্নেহশীলা, আত্মবিশ্লোপিনী, সেবানিবেদিতা বৃদ্ধা ঠাকুমা যাকে ছেলে-বেলায় তিনি 'মিটি মা' বলে ডাকতেন—এঁদের এবং পরিবারের অন্য জীবনরূপের কাহিনী গুনতে গুনতে বাববার আমার নিজের শৈশবকালের কথা মনে পড়ত।

সুধীন্দ্র যেমন ছিলেন ইংবেল্লি এবং বাংলা দুই ভাষাতেই প্রায় সমান দক্ষ, তেমনই তাঁর কবি এবং ভাবুকসত্তার তুলনায় কথকসত্তাও কম নিপুণ বা চিত্তাকর্ষী ছিল না। মনে হয় কথকতার প্রথম শিক্ষা জ্যেষ্ঠার এবং উচ্চারণের প্রথম মডেল কাকর কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর দরচিত ইংবেল্লি গদ্যরচনাপাঠও ছিল অনুশীলিত ও শ্রুতিসুভগ; ইচ্ছে করলে তিনি একজন উচ্চকোটির অভিনেতাও হতে পারতেন। আমার পিতা উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন; তবে নাট্যজগতের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁর সমকালের কয়েকজন অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর জীবনকথা লিখেছিলেন; তাঁদের ভিতরে একজন সে যুগের প্রবাদপ্রসিদ্ধ নট অমরেন্দ্রনাথ। বাবার লেখা এই বইগুলি তখন আর পাওয়া যেত না; সুধীন্দ্র আগ্রহ প্রকাশ করায় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত বইটির একটি ফোটো কপি তাঁকে দেখাই। এই কাকাকে নিয়ে সুধীন্দ্রের পরিবারে অশান্তির অস্ত ছিল না। জ্যেষ্ঠা ধীরেন্দ্রের বিবেচনায় তিনি দম্ভকুলের কলঙ্ক; তাঁকে তিনি বসতবাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন; অমরেন্দ্রের অভিনয়ের বর্ধমান স্ফূর্তি ধীরেন্দ্রের মনে বর্ধমান ক্ষুণ্ণতার উদ্রেক করত। এই কাকার সান্নিধ্যে আসাও বালক সুধীন্দ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তাঁর সুরাসক্তি, অভিনেত্রীদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবেই জীবনযাপন, অপব্যয়ের আতিশয়া, উপচায়মান ঋণ—সব কিছু সন্তোষ ও তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে সুধীন্দ্র নিঃসংশয় ছিলেন। পিতাকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন বাচ, কিন্তু অমরেন্দ্রের প্রতি

আকর্ষণ ছিল দুর্বল। তাঁর স্মৃতির অসমাপ্ত প্রাচীরচিত্রে অমরেন্দ্রের পোর্ট্রেটটি বড়ো যত্নে, স্নেহে, মুনশিয়ানায় আঁকা।

আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য সুধীন্দ্র তাঁর এই আত্মজীবনীর শুধু সূচনাপর্বই লিখতে পেরেছিলেন। মঞ্জুহাসিনী রাজেন্দ্রস্বরীর সুরেলা কণ্ঠে—রবীন্দ্রসংগীত, কাঁচের পাত্রে বিবিধ বর্ণের এবং বিচিত্র স্বাদের সুরার আতিথেয়তা, রসগ্রাহী বন্ধুদের উপনতি-সুধীন্দ্রের কৈশোর-যৌবনের নানা স্মৃতি সেই সুবেদী সন্ধ্যাগুলিতে বাস্তব হয়ে উঠতো। কিন্তু একদিকে লিখিত রূপের মালামারী পরিচরিতার অনতিক্রম্য নির্দেশ, অন্যদিকে সামাজিকতার বিকীর্যমান দাবী—এই সব স্মৃতিকে লিপিবদ্ধ করবার মতো যথেষ্ট সময় সুধীন্দ্রকে দেয় নি। আমাদের কলোজ স্ট্রিটের দপ্তরে আমন্ত্রিত হয়ে শেষবার যখন তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন তখন কল্পনা করতে পারিনি এমন অতর্কিতে মৃত্যুর আঘাত নেমে আসবে। গোধূলী জগতের হৃদয়গ্রাহী চিত্রমালা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়

নিরঞ্জন হালদার

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ গুরু এম. এন. রায়ের বন্ধুত্ব এম. এন. রায়ের বন্ধুগোষ্ঠীর বাইরে খুব কম লোকই জানতেন। এই বন্ধুত্ব একদিকে এম. এন. রায়কে কম্যুনিষ্ট তাত্ত্বিক ও আন্দোলনকারীকে মানবতাবাদী দার্শনিকে উত্তরণে সাহায্য করে; অপরদিকে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন থাকার মতো এক বন্ধু পান এবং ‘পরিচয়’ গোষ্ঠীর কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় ‘ত্রৈমাসিক পরিচয়’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। তিনি প্রথম পাঁচ বছর ত্রৈমাসিক ও পরবর্তী সাত বছর মাসিক পরিচয়ের সম্পাদক ছিলেন। এম. এন. রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের পর তিনি ‘পরিচয়’ পত্রিকাটি বন্ধ করে না দিয়ে কম্যুনিষ্টদের নিকট পত্রিকাটি বিক্রি করেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িতে পরিচয়ের সাপ্তাহিক আড্ডায় বাঙালী কম্যুনিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা একটি সুসংহত গোষ্ঠী হিসাবে নিজেদের সংগঠিত করেছিলেন এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি পত্রিকাটির মালিক হওয়ার পর পরিচয় বাংলার কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের মুখপত্রে পরিণত হয় এবং বাঙালী মধ্যবিত্তদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট মনোভাব সৃষ্টিতে সফল হয়। কম্যুনিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ কেউ সুধীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে আমৃত্যু সম্মান জ্ঞানালেও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয়-পরবর্তী জীবন ও কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেননি। একটি কারণ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে এম. এন. রায়ের বন্ধুত্ব। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রেসিডিয়ামের সদস্য এম. এন. রায় ১৯২৮ সালে জার্মান-প্রশ্নে কমিউটার্স থেকে বিতাড়িত হন। ১৯২৮ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে কমিউটার্সের ষষ্ঠ অধিবেশনে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান রোধ করার জন্য সোশাল ডেমোক্রাট ও সোশালিস্টদের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের মিলিত ফ্রন্ট গঠনের বদলে, জার্মানিতে ওদেরই কম্যুনিষ্টদের প্রধান শত্রু হিসাবে গণ্য করে প্রস্তাব পাশ করে। বুখারিন, ট্রটস্কি, এম. এন. রায় এবং আরও অনেকে কমিউটার্সের ঐ প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। কমিউটার্সের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এম. এন. রায়ের লেখা-ছাপা হলে ১৯২৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর কমিউটার্স ঘোষণা করে যে, “Roy had placed himself outside the ranks of the communist International.” কমিউটার্স থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর রুশ-

বিপ্লব এবং ব্যক্তিগতভাবে স্তালিনের উপর তাঁর আনুগত্য অক্ষুণ্ণ থাকে। তা সত্ত্বেও তিনি কম্যুনিষ্টদের নিকট ব্রাত্য ঘোষিত হন। চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে ও তাঁরা পরবর্তীকালে পরিচিত ছিলেন না। সুধীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছেন, “মার্কসবাদ ও রুশ কমিউনিজম সম্পর্কে তাঁর যদি ‘মোহমুক্তি’ শুরু হয়ে থাকে, তো তিনি এম. এন. রায়ের সঙ্গে গেলেন কেন?”

সুধীন্দ্রনাথ আগেই লিখেছিলেন, “কার্ল মার্কসের মতো পারেতোও বুঝেছিলেন যে ধন-বিজ্ঞানই সমাজ-জীবনের একমাত্র নিয়ন্তা। অর্থনীতির আনুকূল্যেই যে শাসকবর্গ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সে-বিষয়ে কোনো পক্ষেরই সন্দেহ ছিল না।” ঐ প্রবন্ধের অন্যত্র লিখেছেন, মার্কসের বিরুদ্ধে বাকুনি-এর অন্যতম অভিযোগ এই যে সাম্যবাদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত এমনই বাহ্য যে, তাঁর উপদেশে কান পাতা মানে স্টেট সোশালিজমের সাধারণ স্বত্ত্ব ব্যক্তিগতভাবে পিষে মারা।” এসব সত্ত্বেও এম. এন. রায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরেও সুধীন্দ্রনাথ মনে করতেন, মার্কসবাদ ইতিহাস বিচারের সঠিক পদ্ধতি। ১৯৪৫ সালে এম. এন. রায়ের সঙ্গে যখন তিনি ‘মার্কসিয়ান ওয়ে’ (সম্পাদক এম. এন. রায়) বের করেন, তখন ‘ডগমা’ মার্কসবাদকে অস্বীকার করলেও মার্কসবাদকে ইতিহাস ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা পর্যালোচনার সহায়ক বলে মনে করতেন। তত্ত্ব হিসাবে মার্কসবাদকে পরিত্যাগ করেন আরও পরে। যাইহোক, এম. এন. রায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর সুধীন্দ্রনাথ কেন ‘পরিচয়’ গোষ্ঠীর কম্যুনিষ্টদের পরিত্যাগ করেছিলেন, তা অনুধাবনের জন্য সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মানসিকতা জানা প্রয়োজন। কবিতা সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর একটি গোষ্ঠীকে ছেড়ে অন্য গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার মানসিকতা বোঝা যাবে। ঐ চিঠির অংশ বিশেষ :

আমার মনে হয় কাব্যের প্রধান রূপ lyricism নয়, intellectualism এবং এতেই বিভিন্ন মনের আত্মকীয়তার প্রকাশ। কাব্যে intellectualism আনতে হলে প্রাধান্য দিতে হবে চিন্তাকে। সেই চিন্তাই গরীয়ান যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নিজের অবশ্যজ্ঞাহী লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছায়।

কবিতা চিন্তার বাহকমাত্র, চালক নয়। কাজেই চিন্তার রাস্তা মোড়বহুল, গতি অঁকাবাঁকা, পটভূমিকা পরিবর্তনশীল। চিন্তা স্বভাবতই চঞ্চল। তার ধর্ম চলা, কিন্তু তার গতির একটা বিশেষত্ব আছে।

সত্যকে নূতনভাবে দেখতে গিয়ে নূতন রূপকের দরকার হওয়া স্বাভাবিক। এই রূপকের অন্বেষণে কবিকে বিস্তরদ্রষ্টাও মগ্ন করতে হতে পারে। শুধু পারিপার্শ্বিক প্রতীক দেখে যে-কবি তুষ্ট, সেই কবি অলস। কবিকে ব্যাধের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ব্যাধের মত কবিও একটা শিকারের

পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে যদি তার চেয়ে বেশী কাম্য কোনো শিকার দেখে, সে প্রথমটাকে যেতে দিয়ে শেষেরটাকে করে আক্রমণ। এই রকম বাছাবছির পর মনের মতো প্রতীক মেলে।”

এই মানসিকতা সুধীন্দ্রনাথকে এক জায়গায় স্থির থাকতে দেয়নি। যখন পরিচয়ের সাপ্তাহিক আড্ডা চলেছে, সেই সময়ে তিনি সপ্তাহে একদিন ম্যালকম মাগারিঙ্ক, শাহেদ সোহরাওয়ার্দি প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। মাগারিঙ্ক তাঁর ইণ্ডিয়ান ডায়েরিতে ১৯৩৪ সালের ১৯ নভেম্বর লেখেন : “কলকাতার এক চীনা রেস্টোরাঁয় শাহেদ সোহরাওয়ার্দি, ডঃ অপূর্ব চন্দ এবং গোস্বামীর সঙ্গে এক সুন্দর ব্যক্তির পরিচয় হয়। তিনি হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।...দত্ত প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বুদ্ধিজীবীদের অনুসরণ করতেন। এই দিন আলোচনার পর ঠিক হয় তাঁরা সপ্তাহে একদিন মিলিত হবেন।” এই সাপ্তাহিক আড্ডার একজন মাগারিঙ্ক ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে স্টেটসম্যান পত্রিকার সহ-সম্পাদকের চাকরি নিয়ে কলকাতায় আসেন এবং ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের খুঁজে বের করেন। ইতিপূর্বে তিনি ‘ম্যাক্সেস্টার গার্ডিয়ানে’র প্রতিনিধি হিসাবে মস্কোতে ছিলেন। স্তালিনের সত্বাস এবং উদ্দেশ্যে ও ককেশাসের মারাম্বক দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে ম্যাক্সেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় তাঁর রিপোর্ট বের হওয়ায় ঐ পত্রিকা থেকে তাঁর চাকরি চলে যায়। শাহেদ সোহরাওয়ার্দি মস্কোতে স্টানিন্লাভস্কি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বঙ্গশেভিক শাসনকালে তিনি রাশিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হন। সুধীন্দ্রনাথ এই দুই নব্বুর নিকট থেকে রাশিয়ায় স্তালিনীয় সত্বাস ও দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্ট পেতেন। তিনি নিজেও ১৯৩০ সালে জার্মানিতে অবস্থানকালে ফ্যাশিস্টদের তাম্বব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ফলে সাপ্তাহিক বৈঠকে তাঁরা ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ ও দর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদান করতে পারতেন। পরিচয়ের সাপ্তাহিক অপেক্ষা এই সাপ্তাহিক বৈঠক সুধীন্দ্রনাথের নিকট অনেক বেশী আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু তাঁদের এই পারস্পরিক মত বিনিময়ের ব্যবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ স্টেটসম্যানের সম্পাদক মাগারিঙ্ক-লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ দিনের পর দিন না-হাপানোয় মাগারিঙ্ক চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যান। চীনা রেস্টোরাঁ ও হোটেল সাপ্তাহিক আলোচনা সুধীন্দ্রনাথের মানসিক জগৎকে প্রসারিত করে। ইউরোপের ঘটনা তাঁকে ভীষণ রকম আলোড়িত করে। তার প্রকাশ ঘটে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত ‘সংবর্ত’ কবিতায়।

গ্যেটে, হোর্ডলিন, রিস্কে টমাস মানের উপন্যাস

দেওয়ালে খোপে খোপে, বাঘের সনাতা

ক্রোডিয়েরে, শতায়ু ওকের পাটা

তেজস্ক্রিয় উৎকোণ পটলে;

বায়ব্য অঞ্চলে

রক্ষিত মঙ্গলদীপ, অনাদি নগরী

মালা অপে, কাটায় শবরী

স্বপ্নাবিষ্ট সভ্যতার নিশিচিন্ত শিয়রে—

লেগেছিল হাস্যকর স্বভাবত সে-সবের পর

কুটাগার থেকে দেখা স্বস্তিক লাক্ষ্মন

বালখিল্য নাট্যসীদের সমস্বর নাম সংকীর্তন

মশালের ধুমার্ত আলোকে;

আবার অন্যত্র,

কবের রহসে লুপ্ত লেনিনের মামি

হাতুড়ি নিষ্পিষ্ট টুটকি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন,

মৃত স্পেন, প্রিয়মান চীন

কবন্ধ ফরাসী দেশ। (সংবর্ত)

যে-সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিবাদের বিরোধী শক্তি হিসাবে সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং লেনিন-স্টালিন মার্ক্স মার্ক্সবাদে আকৃষ্ট হচ্ছেন, সেই সময়ে ফ্যাসিবাদের নগ্ন চরিত্রের সঙ্গে সোভিয়েত কম্যুনিজমের মানবতা-বিরোধী বৈশিষ্ট্য সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় স্থান করে নিয়েছে। মানবেন্দ্রনাথ রায় যাকে ‘বিপ্লবের অন্যতম নায়ক’ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, সেই টুটকির করুণ অবস্থা ‘সংবর্ত’ কবিতায় বিবৃত হয়েছে। যেমন,

“এবং উদ্বাস্ত টুটকি ইতিমধ্যে দেশে দেশান্তরে

ঘুরে মরেছিল, পুরাকালীন শহরে

গলকণ্ঠ কুষ্ঠরোগী যতদ্বার সব বন্ধ দেখে,

যেমন নির্জনে যেত ভিক্ষা ব্যতিরেকে।”

রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব এবং বিপ্লবের পর লালফৌজ গড়ে তুলে বলশেভিক রাজত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে যীর অবদান সবচেয়ে বেশী, সেই টুটকিকে ১৯২৬ সালে পলিটব্যুরো থেকে অপসারণ করে পরের বছর তাঁকে ও তাঁর নেতৃস্থানীয় সহকর্মীদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। তারপর ১৯২৮ সালে টুটকিকে কাজাখাস্তানের আলমাপাতায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। পরের বছর নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়ে তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তুরস্কে থাকার অনুমতি পান। ১৯৩৩ সালে ফ্রান্সের আশ্রয়প্রার্থী হন। ১৯৩৫ সালে টুটকি ফ্রান্স থেকে নরওয়েতে আশ্রয় নেন। নরওয়ে তাঁকে বেশী দিন থাকতে দেয়নি। টুটকি অবশেষে ১৯৩৬ সালে মেক্সিকোতে থাকার অনুমতি পান, সেখানেই তিনি

খুন হন।*

আর্ম্যানিতে হিটলারের শাসনের এবং রাশিয়াতে কম্যুনিষ্ট শাসনের স্বরূপ সুধীন্দ্রনাথের নিকট কেমন ধরা পড়েছিল, তা প্রকাশ পায় “ম্যাকসিম গর্কি” প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন, “ক্যাসিঙ্কম আর কম্যুনিঙ্কমের উভয় সঙ্কটে শেষোক্ত নিগ্রহনীতিই যথেষ্ট কম অসং বলে আমাদের অবশ্য বরণীয় নয় এবং সমুৎপন্ন সর্বনাশে অর্থত্যাগের হিতোপদেশ যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হোক না কেন, দুটো মন্দের মধ্যে একটার নিবাচন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের অসাধ্য। এক্ষেত্রে সভ্যতার চিরাচরিত মধ্যপন্থা হয়তো অগতির গতি।” সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এখানেই থামেননি। রক্তাক্ত বিপ্লব সম্পর্কেও তাঁর সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত হয়েছে “...বিপ্লবের রক্তগঙ্গায় আভিজাতিক শাসকগোষ্ঠীকে ডুবিয়েও মনুষ্যসংসার প্রজ্ঞাতন্ত্রে এসে কূল পায় না, গণনায়কদের বেবন্দোবস্তে একাধিক যুদ্ধবিগ্রহে আবার স্বৈরাচারে আশ্রয় চায়; এবং আমাদের সামগ্রিক অভিভাবকেরা প্রতিবার শক্তি হস্তান্তরের আগে ও পরে জনহিতের ডাকা পেটান বটে, কিন্তু এই নিরন্তর পরিবর্তন সর্বসম্মতির অপেক্ষা রাখে না, কেবল একাগ্র অনুচরদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়। এমনকি বৃহত্তম সংখ্যার মঙ্গলও একটা কথার কথা।”

এম. এন. রায়ের সঙ্গে পরিচয়ের প্রাক্কালে সুধীন্দ্রনাথ এই ধরণের চিন্তা করছিলেন। আর সেই সময় মানবেন্দ্রনাথ রায় বিপ্লব বাঁচিয়ে রাখার যুক্তি দেখিয়ে ট্রটস্কিকে নৃশংসভাবে খুন করার তালিপিনের বড়যন্ত্র সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন, “যে ব্যক্তি তাঁর প্রধান শত্রু বলে আঙ্গু পরিচিত, তাঁর সাহায্যে তাঁর প্রধান কীর্তি অটুট রয়েছে এবং তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর জন্য ট্রটস্কির নামও সেই সূত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।” আবার, সুধীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ‘সংবর্ত’ কবিতাকে বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসাবে মত প্রকাশ করলেও, সোভিয়েত কমিউনিজমের প্রতি তাঁর আনুগত্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে এম. এন. রায়ের পরিচয় বন্ধুত্বে উত্তরণের বিবরণ মিলবে এম. এন. রায়ের স্ত্রী এলেন রায়ের লেখায় : আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় স্টোর রোডে বীরেন রায়ের গ্যারে। সুধীন শীলা ব্যানার্জী অডেনের সঙ্গে এসেছিলেন। তারপর বীরেন রায়ের বেহালার বাড়িতে। সেদিন তাঁর সঙ্গে সম্ভবত একজন কম্যুনিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। তারপর তিনি পরিচয় পত্রিকার সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করেন। ঐ সভাতেই ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে আমাদের প্রথম উদ্ভেজনাহীন আলোচনা হয়। কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যুক্ত না থেকে সুধীন তাঁর পত্রিকার ভার কম্যুনিষ্টদের হাতেই ছেড়ে দেন। ‘পরিচয়’ পত্রিকার সাহিত্যিকগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরেই

সুধীন এস. কে. দে'র সঙ্গে আমাদের চাঁদনী চকের অফিসে আসেন। প্রথম দিককার সাক্ষাতের মধ্যে ব্যবধান খুবই কম ছিল এবং তারপর থেকে আমাদের যোগাযোগ খুব নিয়মিত ও ঘনিষ্ঠ হয়।”^{১০}

১৯৩৩ সালে হিটলারের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ভারতে ফিরেই সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ফ্যাসিজম’ নামে একটি বাংলা বই লেখেন। কিন্তু সারা ভারতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন এম. এন. রায়। জার্মানিতে হিটলারের পতনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ায় তিনি কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হন এবং তারপর র্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি গঠন করেন। এই সময়েই এম. এন. রায়ের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তির পর জার্মানি রাশিয়ার মিত্র হয় এবং তখন ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা ফ্যাসিস্ত জার্মানির বিরোধিতা করা থেকে বিরত হয়। এই সময়েই এম. এন. রায় কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। সুধীন্দ্রনাথ আগে থাকতেই এম. এন. রায়ের রচনা ও কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ যে-সময়ে জার্মানিতে ছিলেন, তার আগে থাকতে এম. এন. রায় জার্মান পত্রিকায় ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধের কলা-কৌশল নিয়ে প্রবন্ধ লিখছিলেন এবং জার্মানিতে অবস্থানকারী ভারতীয়দের স্বমতে আনতে সচেষ্ট ছিলেন। জার্মান ভাষায় এম. এন. রায়ের ‘চীনে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব’ বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। তাই এম. এন. রায় সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের আগ্রহী থাকা স্বাভাবিক। ভারতে ফিরে আসার পর মৌলিক চিন্তার জন্য সুধীন্দ্রনাথের একটি লেখা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি প্রবন্ধে আলোচিত হয়। তিনি লিখেছিলেন, “মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সম্প্রতি লিখেছেন যে, ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র মুমূর্ষু মধ্যযুগে শ্রেণীর শেষ আশ্রয়ালয় হলেও ফ্যাসিস্ত দর্শন নাকি বেদ-বেদান্তের সমবয়সী।”^{১১} ১৯৪৩ সালের ১১ ডিসেম্বর এম. এন. রায় সুধীন্দ্রনাথকে যে-চিঠি লেখেন, তাতে জানা যায়, তিনি একই সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথকে স্বমতে আনার জন্য বই পড়তে দিচ্ছেন এবং রাজনৈতিক বিতর্কে নামার জন্য প্ররোচিত করছেন। এম. এন. রায়ের ‘লেটারস ফ্রম জেল’ পড়ে সুধীন্দ্রনাথ ১৯৪৪ সালের ১২ জানুয়ারি এম. এন. রায়কে লেখেন, “ভাবছিলাম আপনার কাজ ও চিন্তার মধ্যে প্রকৃত সংগতি ও ধারাবাহিকতার কথা। আপনার এবং বিশ্বয়কর ধারাবাহিকতার গোপন চাবিকাঠিই বা কোথায়? আমার চেনাজানাদের মধ্যে আপনার জীবন অনেক বেশী পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা পরিবর্তিত। আপনি এখনও সুবিশ্বাসী হতে শেখেননি। আপনি এখনও আশাবাদী এবং আপনার আত্মবিশ্বাস এক মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয়নি। আপনার মানসিকতার বিশ্বয়কর পরিণতি হয়তো আংশিকভাবে আপনার অনমনীয়তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু অহমিকাবোধ

দিয়ে ব্যাপারটা কি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায়? অহমিকা বোধ শুণ না দোষ? আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার ব্যাপারে এটা একেবারেই অনলঙ্কারিক প্রশ্ন।...আপনার বিস্ময়কর বুদ্ধিবৃত্তির নিকট আমার মাথা স্বাভাবিকভাবে নত হয়ে আসে।”^{১২} ঐ চিঠিতে তিনি ‘লেটারস ফ্রম জেল’ বইটি সম্পর্কে লেখেন, “বইটি একটি মহৎ সৃষ্টি। উপন্যাসের বাইরে এই ধরণের জ্ঞান ও বোধশক্তি, সাহস ও হৈর্ষ, এমন সহনশীলতা ও সমতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ কদাচিৎ ঘটে থাকে। বইটিতে এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলির সঙ্গে আমি তীব্রভাবে ভিন্ন মত পোষণ করি। যেমন, শরৎচন্দ্রের ‘শেষ প্রশ্ন’ সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশংসা, বর্ণের মতো তৃতীয় শ্রেণীর পদার্থবিদকে গুরুত্ব দেওয়া, হাইসেনবার্গ ও বোর-এর উপর নিন্দা বর্ষণ এবং এ জাতীয় দৃঢ় মতামত আমার মধ্যে জোরালো প্রতিবাদের ঝড় তোলে।” জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্ণ কোয়ানটাম থিয়োরিতে অবদানের জন্য ১৯৪৫ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ কোয়ানটাম মেকানিকস সৃষ্টির জন্য ১৯৩২ সালে নোবেল পুরস্কার পান। পদার্থবিজ্ঞানী ডেনিশ নীলস্ বোর কোয়ানটাম ফিজিক্সের অবদানের জন্য ১৯২২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। আবার ১৯৫৭ সালে তিনি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তিন পদার্থ-বিজ্ঞানী সম্পর্কে দুইজনের ভিন্ন মত থাকলেও, দুজনই ঐ বিজ্ঞানীদের কাম্ব্যকর্ম সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ রাজনীতিকের মধ্যে বিজ্ঞানে আগ্রহ এবং এম. এন. রায় ও বাঙ্গালী কবির বিজ্ঞানের জ্ঞান দেখে অবাক হয়েছিলেন। এলেন রায় লিখেছেন, “একজনের পেশা রাজনীতি ও অপরজনের পেশা সাহিত্য হওয়াতে পরস্পরের পেশার প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল সামান্য। কিন্তু দুজনের আগ্রহ ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিধি এত ব্যাপক ছিল যে, দুজনের পেশাগত আগ্রহের মধ্যে মধ্যে পার্থক্য অপেক্ষা মিল ছিল অনেক বেশী। জেলের মধ্যে ছয় বছর যাবৎ এম. এন. রায় যা লিখেছিলেন, তার নাম দেওয়া হয়েছিল “দি ফিলজিক্যাল কনসিকোয়েন্সেস অব মডার্ন সায়েন্স।” ঐ পাণ্ডুলিপির আলোচ্য বিষয়ই ছিল তাঁদের দুজনের বহু রাত্রির আলোচনার বিষয়বস্তু যা তাঁদের দুজনকে গভীরভাবে ভাবনার রাজ্যে নিয়ে যেত এবং উভয়ের চিন্তাধারার বিনিময় ঘটাত।”^{১৩} সাধাগত শীতকালে এম. এন. রায় ও এলেন রায় কলকাতায় আসতেন এবং গ্রীষ্মে দত্ত-পরিবারের দেরাদুনে যেতেন। দুজনের জ্ঞান ছিল বিশ্বকোষের মতো। তাঁদের আলোচনার বিষয় কেবল বিজ্ঞান বা রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ফাদার পিয়ের ফালৌ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সাহিত্য দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধির কিছুটা পরিমাপের চেষ্টা করেছিলেন। ফাদার ফালৌ লিখেছেন, “বারানসী ও পার্শ্বী তাঁর বিরাট

মানসিকতাকে তৈরি করেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন জগতের মতো ভঙ্গিতেয়ার ও দিদেবোর অষ্টাদশ শতাব্দীর জগতে তিনি সমান স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। মহাভারত তাঁর কাছে ছিল বিষয় ও রূপকের রত্নখনি। গ্যেটে তাঁর অন্যতম প্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ হলেও রবীন্দ্রনাথ ও মালকর্মের নিকট তিনি স্বামী ছিলেন। তিনি ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন আশ্চর্য রকম অনুসন্ধিৎসু।”

এম. এন. রায় ছিলেন বহুভাষাবিদ এবং তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল বহু বিষয়ে। সুধীন্দ্রনাথ এম. এন. রায়ের মতো অতশুঙ্গি ভাষা না জানলেও জ্ঞানের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন সমকক্ষ। সুধীন্দ্রনাথ ১৯৪৪ সালের ১২ জানুয়ারি এম. এন. রায়কে লেখেন : “সি-পি-আই দলে আমার প্রাক্তন বন্ধুদের বক্তব্য অনুসারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পশ্চাদমুখী। এটা খুব বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ঐ সব “প্রগতিশীল” সমাবেশে “বীধন ছেড়ে বের হতে চায়” এমন যুবকদের চেয়ে আপনার মতো মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে আমি অনেক বেশী সজীবতা দেখতে পাই।” “দি লিবারেল রিট্রসপেক্ট” প্রবন্ধে বলেছেন, “মস্তিষ্ক চর্চার মাধ্যমে সাম্যের আদর্শে বিশ্বাসী ১৯২০ দশকের বুদ্ধিজীবীরা ব্যক্তিসত্তাকে মুক্ত করেছিল, বিনা প্রতিবাদে একনায়কত্ববাদ মেনে নেওয়ার জন্য।” তাই এম. এন. রায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার মতো তিনি তাঁর কাব্যাদর্শের ব্যাখ্যার মতো প্রথমটা অথচ পরিচয়গোষ্ঠীকে ছেড়ে দিয়ে শেষেরটা অর্থাৎ এম. এন. রায়ের বন্ধুত্বকে বেছে নিলেন।

এলেন রায় আরও লিখেছেন, “রায় সুধীনের মার্জিত গুণাবলীকে শ্রদ্ধা করতেন। অপরদিকে সুধীন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে রায়ের চিন্তাধারার প্রথা-বিরুদ্ধ মৌলিকতা ও বলিষ্ঠ মননের প্রশংসা করতেন। পারস্পরিক ঐক্য ও মতবৈবক্ষ্য তাঁদের দুজনের পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করেছে। ...এম. এন. রায়ের জীবনের শেষ দশকে, তাঁর পুরানো বন্ধুগোষ্ঠীর বাইরে সুধীন দত্ত রায়ের একজন ব্যক্তিগত এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পেরেছিলেন।” এম. এন. রায় ও এলেন রায় শীতকালে কলকাতা আসতেন এবং প্রতি সম্মান্য তাঁদের মধ্যে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হত। আবার সুধীন দত্ত ও রাজেন্দ্রশ্রী দত্ত গ্রীষ্মে দেবদুনে যেতেন। তাঁদের আলোচনা সম্পর্কে এলেন রায় লিখেছেন, “খুব ভোরে দুজন থার্মোডিনামিক্স অথবা অন্য কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ নীতিবোধের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কথা বলছেন, কথা বলতে বলতে নিজেদের আসন থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছেন, চিন্তাধারার গতিশীলতার জন্য শারীরিক অস্থিরতা প্রকাশ, কথা বলতে বলতে হাঁটা এবং দুজনের নিকট গ্রহণযোগ্য নতুন চিন্তার হসিস পেয়ে হেসে ওঠা—সমস্যাকে এক নতুন

দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা—এ কি বর্ণনা করা সম্ভব?”

সুধীন্দ্রনাথ ও এম. এন. রায়ের যৌথ-উদ্যোগে ১৯৪৫ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক “মার্কসিয়ান ওয়ে”। চতুর্থ বছরে পত্রিকাটির নাম বদলে হিউম্যানিস্ট ওয়ে” রাখা হয়। রায়ের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দলের বন্ধুত্ব শুরু হওয়ার পর থেকে ১৯৫৪ সালে রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথের জীবনের নানা ঘটনা জানার প্রধান সূত্র হচ্ছে দুই পরিবারের মধ্যে বিনিময় হওয়া চিঠিপত্রগুলি। এম. এন. রায় সুধীন্দ্রনাথকে নিজের বই পাঠিয়ে, জ্ঞানচর্চার প্রস্তাবিত পত্রিকাটির সম্পাদক করতে চেয়ে কবিকে সঙ্গে টানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, এই পত্রিকা সম্পাদনা করতে গিয়ে এম. এন. রায়ের “রিডেন, রোমাণ্ডিসিজম এবং রেভুসেশান” বইটি লেখার অদম্য আগ্রহ হয়। এই পত্রিকা এবং বইটির বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সুধীন্দ্রনাথ এম. এন. রায়ের মনোজগতে বিরাট পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কম্যুনিষ্ট নেতা ও তাত্ত্বিক থেকে এম. এন. রায়ের মানবতন্ত্রী দার্শনিকে রূপান্তর ঘটল এবং সুধীন্দ্রনাথের মন থেকে ‘মার্কসবাদ ইতিহাসে বিচারের সঠিক পদ্ধতি’র ধারণা বিদায় নেয় এবং একনায়কত্ব শাসনের বিরোধী মতামত তাঁর কবিতারও বিষয় হয়। এম. এন. রায়ের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের প্রথম পর্যায়ে সুধীন্দ্রনাথ এ-আর-পি’র ওয়ার্ডেন ছিলেন। (আগে অন্য একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি যে, স্টেটসম্যান পত্রিকায় চাকরির সময়েই এম. এন. রায় ঐ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হতে অনুরোধ করেন। নেহরু মিউজিয়ামে রক্ষিত চিঠি থেকে জানা যায়, আমার ঐ বক্তব্য ঠিক নয়। এই সময়ে এম. এন. রায় সুধীন্দ্রনাথকে প্রস্তাবিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা জানিয়ে তাঁকে ঐ পত্রিকার সম্পাদক হতে অনুরোধ জানান। দিল্লির নেহরু মিউজিয়ামে রক্ষিত চিঠি থেকে জানা যায়, সুধীন্দ্রনাথ ১৯৪৪ সালের ১ জুন রায়কে লেখেন যে, সরকারী আইন অনুসারে তিনি প্রস্তাবিত পত্রিকার সম্পাদক হওয়া তো দূরের কথা, পত্রিকার সঙ্গে প্রকাশ্যে কোনো সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হবে পুরোপুরি ‘প্রাইভেট’। অন্যদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তিনি পত্রিকায় পরামর্শদাতাদের নাম ছাপানোর বিরোধিতা করেন। ঐ চিঠিতে জানা যায়, পত্রিকার নাম ‘মার্কসিয়ান ওয়ে’ হবে ধরে নিয়ে তিনি পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র লিখে এম. এন. রায়ের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঐ লেখাটিতে রায়ের ব্যক্তিত্বের যথাযথ মর্যাদা রক্ষিত হয়নি মনে করে তিনি এম. এন. রায়কে লেখাটি ইচ্ছা মতো পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়েছিলেন।” ঘোষণাপত্রে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “ত্রৈমাসিকটি হবে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী বক্তব্য প্রকাশের অনিয়ন্ত্রিত মাধ্যম। ঝগড়া বা নিন্দার কোনো স্থান থাকবে না। আমরা এমন এক দুঃসময়ে বেঁচে আছি, যখন সমাজে

মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করছে, সংচিন্তার মানুষ নিঃশব্দে নিজস্ব চিন্তার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ্যে আলোচনার সুযোগ দেওয়া দরকার। ...সম্পাদক তাঁর আদর্শগত সংগ্রামকে অবদমিত রেখে নিষ্পৃহ দৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাকে বেশী গুরুত্ব দেবেন। বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ও মতাদর্শ এই পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হবে।...ইতিহাস ও দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক চিন্তা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। এই অসুখী দেশ যদি কখনো বিশ্বের সাংস্কৃতিক জগতে আসন পেতে চায়, তাহলে ক্ষমতার সঙ্গে তাল দিয়ে চলার মানসিকতা দূর করতে হবে, আমাদের অতীত ইতিহাসকে নতুনভাবে মূল্যায়ন এবং বর্তমানকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে পুনর্গঠন করতে হবে। আমাদের আগামী ভবিষ্যৎকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কথা ভাবতে হবে।”^{১০} ইত্যাদি। এম. এন. রায় পত্রিকার এই ঘোষণাপত্র বিনা সংশোধনে প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

এম. এন. রায় পত্রিকার সম্পাদক হন। সুধীন্দ্রনাথ জানিয়ে দেন যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাস দূরে সরিয়ে রাখবেন। পত্রিকার নাম সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন জনের মতামত জ্ঞানতে চেয়েছিলেন। একদল বলেন ‘ওয়ে’র আগে মার্কস থাকায় বহু লেখক, বিশেষ করে বিদেশী লেখকেরা পত্রিকা থেকে দূরে থাকবেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে, “শেষ ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্বের এদেশে একটি উম্মাসিক আবেদন আছে এবং যাঁরা আপনার নাম দেখে ভীত হবে না। তাঁরা একটি ভূতের ছায়া দেখে দূরে থাকবে না।”^{১১} সুধীন্দ্রনাথ পত্রিকার উচ্চমান বজায় রাখা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন। দেশের সমস্যার প্রকৃতির কথা মনে রাখলে এটা অসম্ভব নয়। আমাদের আবেদন প্রচার করে উচ্চমানের লেখা পাওয়া যাবে না। সম্পাদক হিসাবে আপনাকে পছন্দ মতো লেখা নির্বাচন করতে হবে এবং সেজন্য আপনার নানা ধরনের শত্রুর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। এম. এন. রায় ১৯৪৪ সালের ১৩ জুলাই এম. এন. রায়কে লেখেন, “পত্রিকার উচ্চমান বজায় রাখার জন্য আমি আপনার উপর নির্ভর করছি। অবশ্য আমি আমার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছি না।” এম. এন. রায়ের নিকট থেকে লেখকদের তালিকা পেয়ে সুধীন্দ্রনাথ ১৯৪৪ সালের ১৩ অক্টোবর লেখেন, “এই তালিকার লেখকেরা উচ্চমানের হবে না। অন্তত প্রথম দুটি সংখ্যায় আপনাকে উচ্চমান বজায় রাখতে হবে। এই তালিকার কয়েকজন বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে ঠিক আছে। কিন্তু তাঁদের লেখা নির্দিষ্ট মানের ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে। নইলে আপনি যখন অজস্র পত্রপত্রিকা মারফৎ নিজের মত প্রচার করতে পারবেন, তখন নতুন করে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করার কোনো অর্থ হয় না।”^{১২}

সম্পাদক থাকতেন দেবাদুনে, পত্রিকা প্রকাশ হয় কলকাতার প্রেস থেকে। সম্পাদক দেবাদুনে থেকে কলকাতায় সুধীন্দ্রনাথের লেখা পাঠাতেন। প্রথম দিকে লেখাগুলি সুধীন্দ্রনাথই সম্পাদনা করতেন। পত্রিকার প্রচ্ছদ শিল্পী যামিনী রায়ের নিকট থেকে আঁকিয়ে আনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রাজেশ্বরী দত্ত। কিন্তু যামিনী রায় রাজেশ্বরীর অনুরোধ ভুলে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় পত্রিকার কাগজ পেতে অসম্ভব দেরি হয়। এম. এন. রায় সুধীন্দ্রনাথের নিকট যে-সব লেখা পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির মহারাষ্ট্রের নেতা লক্ষ্মণশাস্ত্রী যোশী, হিন্দী কবি বাৎসায়নের লেখা এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মরিস গয়ারের একটি বক্তৃতা। সুধীন্দ্রনাথ ১৯৪৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সম্পাদককে লেখেন, “আমি লক্ষ্মণশাস্ত্রীর প্রবন্ধটি পড়েছি। নির্মমভাবে সংক্ষিপ্ত করতে লেখাটি চসতে পারে। লেখাটির প্রথম আটপাতার সত্যি কোনো দরকার নেই।...যদি অনুমতি দেন আমি ওটা ছোট করার চেষ্টা করব।”“আমার নিজের লেখাটাও তৈরি। আপনাকে ওটা অন্য খামে পাঠাচ্ছি। লেখাটি আদৌ আমার মনোমত হয়নি। কাজেই আপনার অপছন্দ হলে লেখাটি বাতিল করতে দ্বিধা করবেন না। আমার নিজের লেখা সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা আমার অসংখ্য ক্রটির মধ্যে একটিও নয়।” ঐ চিঠিতে তিনি আরও লেখেন, “এই মাত্র আমি ডিউই-এর বইটা শেষ করলাম।...বইটির রুশবাদ-বিরোধিতা আমার মতেই তীব্র। ডিউই আমার মতেই ঐকনায়কত্ব বিরোধী, বহু জিনিসের মধ্যে ভাল দেখেন। লেখকের সঙ্গে আমি সব বিষয়ে একমত বলেই আমার মনে হয় না যে, আমাকে দিয়ে বইটির সমালোচনা করানো খুব ভালো হবে। সেজন্য সুশীল সমালোচনার জন্য যে-সব বই বেছেছে, সেগুলির সঙ্গে এটাকে যুক্ত করার কথা বলেছি।” পত্রিকাটি বের করার ব্যাপারে তিনি ঐ চিঠিতে লেখেন, “রাজেশ্বরী সামনের মাসের গোড়ার দিকে লাহোরে যাচ্ছে। সবকিছু বিবেচনা করে আমি ওর সঙ্গে যাচ্ছি না।...ত্রৈমাসিকটি শেষ পর্যন্ত বের করতে হলে আমার এখানেই থাকা দরকার।

সুধীন্দ্রনাথ বাৎসায়নের লেখা বক্তৃতা প্রকাশের উপযুক্ত বিবেচনা করেননি। কিন্তু গয়ারের বক্তৃতা শেষ পর্যন্ত সম্পাদকই বাতিল করেন।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যার লেখাগুলি পেয়ে সুধীন্দ্রনাথ ১৯৪৫ সালের ১৯ মার্চ এম. এন. রায়কে লেখেন, “আপনার সম্পাদকীয় আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার লেখা সম্পর্কে আপনার সমালোচনা যথার্থ এবং সঙ্গত। সুশীলের (আই-সি-এস সুশীল দে) বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। মাত্র একটি এবং নিয়ন্ত্রিত বিষয়ের আওতায় তিনটি ভিন্ন ধরনের এবং সম্পূর্ণ পৃথক প্রবন্ধ সংগ্রহ করা খুবই দুঃসাধ্য কাজ এবং এ ব্যাপারে আপনার কৃতিত্ব

প্রশংসার বাহিরে। আমার শুধু একটা কথাই বলার আছে যে, স্প্রাটের প্রতি আপত্তি বর্ষণে সুবিচার করেননি এবং আমার মনে হয় না যে, আপনি তাঁর বক্তব্যের যথাযথ জবাব দিয়েছেন।^{১৩৩} তিনি প্রবন্ধ হচ্ছে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'দি লিবারেল রিট্রোসপেক্ট', কিলিপ স্প্রাটের 'মার্কসইজম অ্যান্ড এথিকস', সিকান্দার চৌধুরীর 'দি ইকনমিক প্রিরিকিউজিটস অব ডেমোক্রাসি'। এম. এন. রায়ের 'চাইনিজ পাজস' সম্পর্কে একটি বড় লেখা, প্রতিটি লেখার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং 'রেনেশাঁসের সমাজবিজ্ঞান' নামে একটি বইয়ের সমালোচনা। পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাতে নানা বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধের উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকত। সুধীন্দ্রনাথ সভ্যতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিবর্তনে উদারনৈতিক পরিবেশের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। উদারনৈতিকরা কোনো বিষয়ে গোঁড়া হতে চান না বলে বিরোধী বক্তব্য সম্পর্কে ভীত হন না। তিনি তাঁর প্রবন্ধে উদারনৈতিকদের ত্রুটিগুলিও দেখান। অমৌজিতা সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে কী ভাবে চাপ্তি করে, উদারনৈতিকেরা তার খোঁজ রাখেন না। শাসকেরা সব সময়ে জনসাধারণের অজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাদলখলকারী নিছের হয়ে প্রচার করে, লিখতে-পড়তে না-জানা ব্যক্তিদের নিকট ছাপার অক্ষর অত্যন্ত গুরুত্ব পায় এবং পড়তে-না-পারা মানুষ যুক্তি ও বুদ্ধির আনন্দ পায় না।

কিলিপ স্প্রাট নৈতিকতার প্রশ্নে মার্কসবাদের সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। মার্কসবাদ বস্তুবাদী হলে এর কোনো নিঃস্ব নীতিবোধ নেই, আবার বাস্তব দর্শন হিসাবে গণ্য করলে নৈতিক তত্ত্ব প্রয়োজন। গোঁড়ামীর জন্য নেতারা যেমন বিরুদ্ধ সমালোচনাকে পাশা দেন না, এম. এন. রায় ও স্প্রাটের লেখার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্যে মার্কসবাদের ঐ সমালোচনাকে পাশা দেননি। সুধীন্দ্রনাথের চিঠির পর এম. এন. রায় 'অন এথিকস' নামে একটি বড় প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি মার্কসবাদকে একটি দার্শনিক মতবাদ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। মার্কসীয় অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান ঐ দার্শনিক মতবাদ থেকে উদ্ভূত। তিনি মার্কসবাদকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন, মার্কসবাদের মধ্যে নৈতিকতা আছে, তবে তা শ্রেণীস্বার্থে নয় মানুষের সামাজিক দায়িত্বের সচেতনতা থেকে উদ্ভূত। তিনি ফুয়েরবাকের মানবতাবাদকে মার্কসীয় নীতিবোধের ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করেন। সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'ইইডম অব এক্সপ্লেসন' ছাপা হয় 'মার্কসিয়ান ওয়ে'র প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায়। ১৯৪৫ সালে সুধীন্দ্রনাথ স্টেটসম্যান পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালে এম. এন. রায় ও এলেন রায়কে লেখা সুধীন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রী দত্তের লেখা থেকে জ্ঞান যায়, সম্পাদক আয়ান

স্টিফেনসের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের তিস্ততার সম্পর্ক এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে পার্ঠকের কলম সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সারাদিনের পরিশ্রমের পর তিনি কিছুই লেখার মতো অবস্থাতে থাকতেন না। অনেক চেষ্টার পর স্টেটসম্যানের চাকরি ছাড়তে পারেন। দ্বিতীয় বছর থেকে সুধীন্দ্রনাথ পত্রিকার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন নি, কলকাতায় শিবনারায়ণ রায় পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কাজকর্ম শুরু করেন।

এম. এন. রায় 'মার্কসিয়ান ওয়ে' প্রকাশের সময়েই এম. এন. রায়ের 'রিজেন, রোমান্টিসিজম এবং রেভুসেশন' বইটি লিখতে মনস্থ করেন। প্রস্তাবিত বইটির 'সংক্ষিপ্তসার' লিখে তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে জ্ঞানতে চান, তাঁকে ঐ বিষয়ে আর কী কী বই পড়তে হবে। সুধীন্দ্রনাথ ১৯৪৬ সালের ১২ এপ্রিল এম. এন. রায়কে লেখেন, "সংক্ষিপ্তসারটি দেখতে গেলে আনন্দিত হব, যদিও এ-ব্যাপারে আমার যোগ্যতা সম্পর্কে নিজের মনেই সন্দেহ আছে। যুদ্ধের বছরগুলিতে বইয়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তবুও আমার যে-সব তথ্য জ্ঞান আছে, তা সর্বদাই আপনার কাছে লাগতে পারে। প্রতিশ্রুতি অনুসারে ধূজটি গ্রীষ্মে কলকাতা এলে আমি তাঁর নিকট থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত বইগুলির নাম ও অন্যান্য তথ্য জ্ঞানতে পারব।" পরের দিকে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে এম. এন. রায়ের আলোচনা হত ঐ বইয়ের বিষয় ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে। এবং কলকাতায় ও দেৱাদুনে গিয়ে এম. এন. রায়ের 'স্মৃতিকথা' সম্পাদনায় হাত দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে এম. এন. রায় ১৯৪৮ সালে ফৈজাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে সমাজতন্ত্রী-নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেবের অযোধ্যার এক রামভক্ত হনুমান-শিষ্য মোহান্তের নিকট পরাজনের পর র্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তাঁর মনে হয়, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিবোধ গড়ে তুলতে না পারলে ধর্মাত্মতা ও কুসংস্কারকে তোম্রাজ্যকারীরাই দেশের শাসনক্রমতা দখল করবে। 'মার্কসিয়ান ওয়ে' সম্পাদনা এবং প্রতিটি লেখার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য করে এম. এন. রায় জ্ঞানের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় এবং দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা বাড়ে। হিন্দুধর্মে বর্ণ-ব্যবস্থা যে বড় একটি সমস্যা, তাও তিনি অনুধাবন করেন। মার্কসবাদকে তিনি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেও শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদোক্তর 'র্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম' দর্শনের প্রবক্তা হন। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা ও বিতর্কের পরেও গান্ধীজীর কাজকর্ম এবং গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সম্পর্কে তাঁর বিরূপতা একটুও হ্রাস পায়নি। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে এম. এন. রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর জীবনী গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে এলেন রায়ের সহযোগী হয়ে লণ্ডনের এক প্রকাশকের

নভেম্বর ২০০০—জানুয়ারী ২০০১] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৩১

সঙ্গে কথা বলেছিলেন। কিন্তু দুইপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো লেখকের নাম মনোনীত করা সম্ভব হয়নি।

এম. এন. রায়ের মৃত্যুর পর বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ লেখেন, লেনিন, স্টালিন, গান্ধী ও নেহরুর সঙ্গে একই মঞ্চে বসে তিনি স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে শূন্য প্রান্তরে হারিয়ে গিয়েছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং এম. এন. রায়ের বন্ধুত্ব নিয়ে প্রকাশিত কয়েকটি লেখা—এলেন রায় : সুধীন দত্ত ও এম. এন. রায়, নিরঞ্জন হালদার : সুধীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—এম. এন. রায় পত্রাবলী (নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত ‘সুধীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। নিবন্ধন হালদার : সুধীন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বন্ধুত্ব (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—পাঠের পথ), *Selections from the Marxian Way and the Humanist Way* (edited by Dr. R. M. Pal. Shibnarayan Roy : Introduction to above Selection শিবনারায়ণ রায় :

সূত্র :

১. *Selected Works of M. N. Roy, Vol. III* (1990), edited by S. N. Roy (OUP).

২. সুধী প্রধান : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—স্ববিরোধিতার আত্মঘাতী। ধ্রুব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও সাহিত্য। পৃ. ২৩১।

৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কুলায় ও কালপুরুষ। (সিগনেট সংস্করণ) পৃ. ২৫৫।

৪. সুধীন্দ্রনাথের চিঠি : রবীন্দ্রনাথকে। নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত সুধীন্দ্রনাথ। পৃ. ২৩৯।

৫. Malcolm Muggeridge : *Like It Was*. p. 91.

৬. নিরঞ্জন হালদার : রাশিয়ার চিঠি ও বুখারিনের পুনর্বাসন। পৃ. ২০৪।

৭. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : স্বগত। পৃ. ১০৩।

৮. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কুলায় ও কালপুরুষ। পৃ. ২৫৪।

৯. মানবেন্দ্রনাথ রায় : লিয়ঁ টেলস্টয়। চতুরঙ্গ, আশ্বিন, ১৩৪৭।

১০. এলেন রায় : সুধীন দত্ত ও এম. এন. রায়। নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত সুধীন্দ্রনাথ। পৃ. ২০৪।

১১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কুলায় ও কালপুরুষ। পৃ. ২৫৬।

১২. সুধীন্দ্রনাথের চিঠি : এম. এন. রায়কে। সুধীন্দ্রনাথ : পৃ. ২৪৬-৪৮।

১৩. এলেন রায়। ঐ। পৃ. ২০৩।

১৪. ফাদার পিয়ের ফালৌ : সুধীন্দ্রনাথ। নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত—সুধীন্দ্রনাথ। পৃ. ১৯৭।

১৫. সুধীন্দ্রনাথের চিঠি : এম. এন. রায়কে। সুধীন্দ্রনাথ পৃ. ২৪৮।

১৬. Sudhindra Nath : The Liberal Retrospect in the Selections from MW and HW.

১৭. এলেন রায় : সুধীন দত্ত ও এম. এন. রায়। ঐ।

১৮. ঐ।

১৯. Sudhin Datta's letter to M. N. Roy dt. 1 June, 1944.

২০. Radical Humanist. Sudhindranath Datta Number, August 28, 1960.

২১. Sudhind Datta's letter to M. N. Roy. Dated 1 June, 1944.

২২. নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত সুধীন্দ্রনাথ। পৃ. ২৪৯-৫০।

২৩. Quoted by R. M. Pal in the Selections. p. xxvii.

২৪. সুধীন্দ্রনাথ। পৃ. ২৫২

২৫. Philip Spratt : Marxism and Ethics in the Selections. p. 15-35.

২৬. সুধীন্দ্রনাথ। পৃ. ২৫৪-২৫৫।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যভাষা : একটি নান্দনিক আস্বাদন

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-সমকালে অমন ভাবোদ্দীপক গদ্যের দ্বিতীয় প্রজাপতি ছিলেন অকল্পনীয়। তীক্ষ্ণযুক্তির সঙ্গে সরসতার মিশ্রণ প্রথম চৌধুরী তথা ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর গদ্যকে দিয়েছিল অনন্যপূর্ব সৌন্দর্য। মুখের ভাষাকে সাহিত্যজগতে অভিজাত করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল সেই গদ্য। বুদ্ধদেব বসু-র পেলবগদ্য তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিলেও সেই গদ্যের সর্বাস্থেই রবীন্দ্র-সংস্কারের প্রভাব। বিষ্ণু দে-র গদ্যে এলিয়ট-পন্থীর অনুষঙ্গ-প্রিয়তার সঙ্গে দুরাধর্যের প্রতি প্রতিপক্ষপাত পাঠকের পক্ষে কিঞ্চিত ক্লেশদায়ক। জীবনানন্দের দীর্ঘবাক্যের বহু বাক্যাংশে বিভক্ত হয়ে পূর্ণবিরতির দিকে মহুরগমন প্রতি পদক্ষেপে পাঠকের চেতনার সঙ্গে করকম্পন করে, যেমন করে তাঁর কাব্যের বহু সরল নিপাটি উচ্চারণগুলি।...বয়সে জীবনানন্দের অনুজ ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পিতা হীরেন্দ্রনাথের কাছে নিয়েছিলেন দর্শনের পাঠ, কাব্যের পাঠও। রবীন্দ্র-সংসর্গ তাঁর ভাবজীবন গঠনে নিয়েছিল উল্লেখ্য ভূমিকা। ‘অর্কেষ্টা’র পঙক্তিতে রবীন্দ্রনাথের স্মরণ আছে বহুক্ষেত্রে। কিন্তু শুধু কী কবিতায়?

রবীন্দ্রগদ্যের শব্দ-নৌকুমার্যে, বিন্যাসকৌশলে সুধীন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল না ঠিকই, পরন্তু তীক্ষ্ণধার বুদ্ধিদীপ্ত গদ্যের তিনি পরমভক্ত, তথাপি দ্বিধাহীন চিন্তেই লিখেছিলেন :

রবীন্দ্রনাথ হাল বাংলায় সিদ্ধিদাতা গণেশ। তিনি তো আমাদের উৎসব-অনুষ্ঠানের সুত্রধার বটেই, এমন কি তাঁর বাণী ব্যতিরেকে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও লাভ নেই। (সূর্য্যবর্ত)

এই ‘সিদ্ধিদাতা’র গদ্য, সুধীন্দ্রনাথের মতে :

তাঁর পদ্যের মতোই উপমাবহুল, কিন্তু তাঁর গদ্যোপমার সঙ্গে তাঁর পদ্যোপমার কোনও মিল নেই। গদ্যে তিনি উপমা প্রয়োগ করেন সাধারণত অর্থের খাতিরে, সেখানে উপমার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতর... ইত্যাদি (ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ)।

রবীন্দ্র-গদ্যে উপমা যে বহুক্ষেত্রে ‘প্রাঞ্জলতার পরিপন্থী’ সে-কথা স্বীকার করে নিয়েই রবীন্দ্র-গদ্যের স্বর্ণ-সম্ভাবনাকে শ্রদ্ধা আনিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের মত অনতিক্রম্য প্রতিভাধরের গদ্যকে সুধীন্দ্রনাথ উপেক্ষণীয় বা অব্যবহৃত মনে করেন নি কোনদিন। গদ্যে-পদ্যে সমান সিদ্ধ কারিগর রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথের একাধিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হয়েছিলেন সংগত কারণেইঃ “রবীন্দ্র প্রতিভার উপক্রমণিকা”, “রবিশস্য”, “হৃদ্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ”, “সূর্য্যবর্ত্ত”, “দিনান্ত” প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছিল ১৩৩৯ থেকে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে।

সুধীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ সম্ভবতঃ “কাব্যের মুক্তি”। সুধীন্দ্র-অনুজ হরীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন ১৯২৮-২৯ নাগাদ সুধীন্দ্রনাথ যুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই প্রবন্ধের একটি খণ্ডা পাঠ করেছিলেন। সময়টা ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার লেখকদের আধিপত্যের কাল। কিন্তু বন্ধু বা শত্রুমহলে প্রমথ চৌধুরী ব্যতীত গদ্যের লেখকরূপে পরিচিত থাকলেও দুর্বোধ্যতার নিন্দা ছিল না তাঁর। যে-অপ্রশংসাকে শিরোভূষণ করে সুধীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটল, তা হল ‘দুর্বোধ্যতা’। এই অপ্রশংসাকে মেনেও নিয়েছিলেন তিনি :

হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃত আর ইংরেজী ভাষার বর্ণসঙ্কর খটিয়ে আমি যে-অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছি, বঙ্গভারতীর নাটমন্দিরেও সে-হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ; এবং আত্মনির্ভরের অভাব-বশতই আমি যেকালে গুরুজনদের ভৎসনাভাজন, তখন ওই অপবাদকে অমূলক বিবেচনায় উপেক্ষা করা আমার সাধ্যের অতীত।’

তথাপি, দীর্ঘ এই বাক্যটিকে ‘কমা’ ও ‘সেমিকোলন’ চিহ্নের সাহায্যে যেভাবে বিভক্ত করা হয়েছে তার পরিণাম আর যাই হোক ‘অ-সারল্য’ নয়। উত্তরকালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সুধীন্দ্রনাথের গদ্যকে ‘সরল’ বলায় বিরূপ মন্তব্যে আগ্রহ বোধ করেছিলেন আমরা অনেকেই। তথাপি সুধীন্দ্রনাথের বাক্য একাধিকবার নিবিড় পর্যবেক্ষণ করলে ‘তৎসম’ এবং অপরিচিত শব্দের দুর্লভ্যতা ছাড়া অন্য দোষে দুষ্ট হয়েছে কি? সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের শব্দ দুর্লভ্যও বটে। তথাপি প্রতিটি শব্দই যেন বক্তব্যবান্ধ। এইসব শব্দের সমবায়-সম্পর্কে যে Language বা Style of prose গড়ে উঠেছে তা অনেকক্ষেত্রেই অভিধেয় অর্থতাৎপর্য অতিক্রম করে ব্যঙ্গার্থ অথবা লক্ষ্যগত অর্থের কারণে উদ্ভিত্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে উপলব্ধিকে আহ্বান করে আনে। নইলে কিভাবে বোধগম্য হবে এই উক্তিঃ—‘কিন্তু আশ্চর্য মানুষের অহংকার : তার আত্মপ্রসাদ রক্তবীজের বংশধর’।’ মানুষের আত্মপ্রসাদের উপমান ‘রক্তবীজের বংশধর’। এর চেয়ে অপরিচিত এবং আপাত বিভ্রান্তিকর মন্তব্য আর কী হতে পারে? মার্কিন দার্শনিক Peirce (১৮৩৯-১৯১৪) এর একটি মন্তব্য স্মরণে আসছে। Peirce আমাদের এই জটিল যুগকে স্পর্শ

করার আগেই বলেছিলেন ‘no communication of one person to another can be entirely definite, i.e. non-vague.’ আপন করা যে-ভাষার উদ্দেশ্যে সহজবোধ্যতা তার স্বভাবধর্ম কিন্তু যে-ভাষায় মনঃসংযোগের স্পর্শ থাকে, Peirce-এর মতে, তার দ্বারা immediate sensation সৃষ্টি করার জন্য vagueness প্রায় অনিবার্য। প্রশ্ন হল, সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের দুঃসহতা বা দুর্বোধ্যতার কারণ কতটা sensation সৃষ্টির জন্য বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্কজাত অপরিহার্যতায়, কতটা বা চেষ্টাকৃত পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের চাপল্যে? সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তিও জানেন তাঁর প্রবাদপ্রতিম স্বীকৃতি-মালার্মের ভাবধারা তাঁর অধিষ্ট। এবং যেহেতু মালার্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দুর্বোধ্যতার, সুতরাং তাঁর ভাবশিষ্যকেও নত হতে হবে সেই অভিযোগের বিচারালয়ে। এই সরল সমীকরণে অভ্যস্ত গণিত পণ্ডিত হয়ত জানেন না মালার্মে বলেছিলেন, দুর্বোধ্যতার কারণ দ্বিবিধ-বিষয় যদি দুর্বোধ্যতাকে করে অনিবার্য; লেখক যদি দুর্বোধ্যতাকেই ভাবেন পাণ্ডিত্য প্রকাশের সুনিশ্চিত উপায়; অথবা অজ্ঞ পাঠকের যদি দুর্বোধ্যতাকেই ভাবেন পাণ্ডিত্য প্রকাশের সুনিশ্চিত উপায়; অথবা অজ্ঞ পাঠকের যদি ধারণা হয় যে সাহিত্যপাঠ ও বোধের জন্য প্রয়োজন হয় না বিশেষ শিক্ষা বা দীক্ষার। যে-মালার্মে শুধু সংবাদপত্র এবং প্রচার পুস্তিকা ছাড়া সর্বত্রই দেখেছেন কবিতারই বিচিত্র সম্ভবনা, সেই তিনিও কবিতার দুঃসহতার সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করেছেন। মালার্মে-নির্দেশিত সম্ভাব্য কারণগুলি কবিতা বিষয়ে তাঁর অপরিমিত ঔদার্য সত্ত্বেও চিন্তার রসদ যোগায় একাঙ্গেও। তবু বিভিন্ন যুগে কাব্যের দুর্বোধ্যতাকে পাঠকেরা মেনে নিয়েছেন তার প্রজ্ঞাতিগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য। কিন্তু জ্ঞাপনই যার কৃত্য সেই গদ্যের দুর্বোধ্যতার দায়ভার কে বহন করবেন? সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের দুর্বোধ্যতার কারণ ও স্বরূপ অবশ্যই উত্তরকালকে বুঝে নিতে হবে। বুঝে নিতে হবে কেন তিনি অননুকরণীয়। কেন তাঁকে অনুকরণ করতে গেলে ঘটে যায় হাস্যকর বিপর্যয়।

সন্দেহ নেই, সুধীন্দ্রনাথের গদ্যপ্রবন্ধে আমরা পেয়েছি এমন অনেক শব্দ যার ব্যবহার ঘটে না সচরাচর; যেমন, ‘অনুকম্পাময়ী’; পেয়েছি পরিচিত শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ; যেমন, ‘শ্রেষ্ঠ কবি’ অর্থে ‘কবিরাজ’। ‘শ্রবণ সুভগ’ ‘আততি-বিততি’র মত শব্দ বাঙলায় কদাচ চোখে পড়ে তাও যদি তার লেখক হ’ন বিষ্ণু দে-র মত কেউ, এমন কি বুদ্ধদেবও নন। যিনি লেখেন ‘প্রাতিষ্মিক’, ‘পরিবেদনা’, ‘স্বপ্নাদ্য’ : তিনিই অনায়াসে লেখেন ‘আমাকে সোভায় মালার্মের আদর্শ।’ সহজে বুঝি না একথার মানে—‘নিঃসম্পর্কে, নৈমিষে চিরনির্বাসিত থাকতে চান নি ব’লেই গুয়র্ডসওয়ার্থ মহাকবি’। পাণ্ডিত্যপ্রমাণে সমুৎসুক

আমরা হয়ত কখনও অচেনা শব্দ টেনে আনি, তবু রাজশেখর তাঁর 'চলন্তিকা'য় শব্দটির সরলার্থ ছানিয়ে দেন ঠিকই। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের শব্দের তল পাওয়া যায় না মোনিয়ের উইলিয়ম্‌স্‌ বৈটেও। 'নির্ব্যুততা', 'অক্যামী', 'সম্মিপাত', (যে অর্থে তিনি ব্যবহার করেছেন), 'সালোক্য', 'নৈরাশ্বসিদ্ধি', 'কমঠবৃষ্টি', 'নিঃসম্পর্ক নৈমিষে চিরনির্বাসিত', 'প্রকার প্রকারী', 'অনাদ্যন্ত অনৈক্য', 'অভিজ্ঞাতিক বিবিক্ত', 'উচ্ছ্রিত', 'আজীব্য', 'বিকল্পনা'... ইত্যাদি। এই ধরনের শব্দ সুধীন্দ্রনাথের বাক্যকে সপ্ত মহারথী পরিবেষ্টিত ব্যুহবৎ করে তুলেছে সাধারণ পাঠকের কাছে। কেন গড়ে তিনি এমন শব্দ নির্বাচিত করলেন যার সরলার্থ সাধারণ অভিধানে অভাবনীয়? বৌদ্ধ-দর্শন, বোদান্ত-দর্শন, পাশ্চাত্য-দর্শন মছন করে শব্দের ভান্ডার তিনি বৃদ্ধি করলেন কোন্‌ গুঢ়ার্থ দ্যোতিত করার জন্য? সুধীন্দ্রনাথ লিখছেন :

শব্দের অভিধানে উড়িয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু আমার হতে সাহিত্যের শব্দ অভিপ্রায়ের জন্য গৃহীত হয় রূপের তাগিদে; এবং সেখানে প্রত্যেক শব্দ এক একটি ধ্যান, তেমনই ধ্যান বলে, প্রত্যেক শব্দ স্বাধিকারগুণে আনন্দদায়ক।*

‘প্রত্যেক শব্দ এক-একটি ধ্যান’—কথাটা যদি বলতেন কোন ভারতীয় ব্রহ্মবাদী দার্শনিক অথবা আগংকারিক অথবা উচ্চারণ করতেন নিও-কাণ্টীয় আনন্ত্য কেশিরার তাহলে একটুও বেমানান হত না। ধ্যানলব্ধ সত্য ধ্যানীর আপন সম্পদ বসেই সুধীন্দ্রনাথ শব্দ ব্যবহার করতে পেরেছেন আপন ইচ্ছানুযায়ী, রবার্ট ব্রিজেস-কে কবিশ্রেষ্ঠ বলতে তিনি ‘কবিরাজ’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ‘পশুপতি’ শব্দটির দ্বারা কখনও বুঝিয়েছেন ‘মহাদেব’-কে, কখনও ‘মানুষ’-কে। Alliteration কাব্যভাষায় একটি অলঙ্কার; গদ্যশিল্পী তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ের পর একে বর্জ্য জ্ঞান করেন। সুধীন্দ্রনাথের মত নিপুণ পরিণত মনের শিল্পী কিন্তু alliteration-এর প্রতি ঝোঁক ত্যাগ করতে পারেন নি, হয়ত বা খেচ্ছায় ত্যাগ করেন নি। যেমন : ‘নীল নয়নের নির্বাক্ অনবধানে’, ‘নির্বিরোধ ন্যায়ের নিত্য আদর্শই’, ‘তার অভিপ্রায় অবৈদ্য, অভৈদ্য, অনর্থময়’, ‘অনাদ্যন্ত অনৈক্য’, ‘ক্রিয়াপদের অপব্যবহার অল্প-বিস্তার অস্বস্তিকর’, ‘নিপট নিরাসক্তি নিতান্ত নিরর্থক’, ‘ব্যক্তি ও তার সহোদর সাম্রাজ্য সমষ্টির সঙ্গে সসম্মান সজ্জি-স্থাপনের সুযোগ এ-বারেও হেলায় হারালো!’ উপস্থিত উদ্বেজনায় উচ্ছ্বল প্রকাশই তাঁদের সাহিত্য সেবার মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছিল... ইত্যাদি।

সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিবরণত ব্যাপ্তি অসামান্য। অসাধারণ দক্ষতায় তিনি বিচরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং অগ্রজ, অনুজ ও সমকালীনদের

কাব্যজগৎ থেকে যেটস এলিয়ট-পাউণ্ডের কাব্যজগতে; ডি. এইচ. লরেন্স-ভার্জিনিয়া উল্ফ-ফকনর-গার্কির গল্প-উপন্যাসের ভূমিতে; শ-ইবসেনের নাট্যশালায়, অদ্বৈত দর্শন থেকে বৌদ্ধদর্শন-পাশ্চাত্য দর্শনের প্রান্তরে, অনার্য সভ্যতা থেকে ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডে। বুদ্ধি ও জিজ্ঞাসার এই বিশ্ব-পরিভ্রমায় সুধীন্দ্রনাথ সাহিত্যে-দর্শনে-বিজ্ঞানে-ইতিহাসে তাঁর নিয়মকর অধিকারের প্রমাণ রেখেছেন তাঁর প্রবন্ধের ধ্যানলব্ধ শব্দ এবং উক্তির মাধ্যমে। নিত্য ব্যবহার্য শব্দ শুধুমাত্র ব্যবহারের দৌলতে অলীক হয়ে উঠেছে। অল্পকথায় অনেক কথার ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে তিনি যে সক্ষম ছিলেন তার প্রমাণ মেলে বহুক্ষেত্রে। যেমন : ‘আজকের প্রচার-সাহিত্য কালকের রসসাগরী’, ‘মনোবিজ্ঞানের মতে আবেগ, অথবা ইমোশন অবিনশ্বর, এবং অনুভূতি অথবা স্টিলিং ক্ষণভঙ্গুর; কারণ আবেগে দেহধর্মেরই নামান্তর, এবং দেহধর্মের পরিবর্তন এত মন্থর যে তাকে অমর না বললেও দুর্মর বলতে আপত্তি নেই’, ‘নিরালস্য নির্গুণ ব্রহ্মের চেয়েও নঞর্থক’, ‘সুখের বিষয় ভাষা যেমন মানুষী আত্মপ্রবন্ধনার প্রকরণ বিশেষ, তেমনই বিশ্বসাহিত্য ও তার অন্যতম অবদান’, ‘কবি ও পাঠক যদিও ভিন্নধর্মী তবু তাদের আবেগও অনুভূত রস মোটামুটি এক’, ‘স্নাপের রহস্যে মনের নেতৃত্ব সুনিশ্চিত’, ‘কাব্যজাত শব্দসমূহ বস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বী’, ‘বচন মাত্রই বিক্লিষ্ট শব্দের উদ্দেশ্যমূলক সম্মিপাত’... ইত্যাদি।

বাক্যগঠনে সুধীন্দ্রনাথের গদ্য বিচিত্রের আশ্বাদ দেয়। ক্রিয়াপদ নেই এমন আপাত অপূর্ণ বাক্য তিনি লিখেছেন অনায়াসে, নির্দিষ্টায় : ‘অদৃষ্টগতিকে আমিও সেই পঙ্গুসমাজের সভ্য’, ‘আমি সাহিত্যে জঙ্গমতার পক্ষপাতী’, ‘দুঃখের বিষয় বিপ্লবী লেখকরা আর্যসভ্যে স্বীতশ্রদ্ধ’, ‘রবীন্দ্রনাথ হাল বাঙলার সিদ্ধিদাতা গণেশ’, ‘...যদি বাস্তবশ্রুতিতে ক্রিয়াপদের ব্যবহার করে Sov প্যাটার্ন বজায় রাখতে হত তাহলে সর্বত্র ‘ভূ’ ধাতুজাত ক্রিয়াপদ ছিল অনিবার্য। কিন্তু এই ধরনের বাক্যগঠনে তৃপ্তি পাওয়া যেত কি? — ‘অদৃষ্টগতিকে আমিও (হলাম) সেই পঙ্গুসমাজের সভ্য’ অথবা ‘রবীন্দ্রনাথ (হলেন) হাল বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ’। আসলে কবিতার পঙ্ক্তির মত সুধীন্দ্রনাথের গদ্যাংশও একেবারে জন্মগ্রহণ করে, কোনরকম সংস্কার তার সন্ধান না। অশব্দতাই তার নিত্য স্বভাব। বলতে বাধা নেই, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর পর সুধীন্দ্রনাথই অননুকরণীয় গদ্য লেখেন বিশ শতকের বাঙলা ভাষায়। তাঁর ব্যর্থ-অনুকরণজাত বিপর্যয়ের সঙ্গে আমরা একেবারে অপরিচিত নই। কিন্তু সংস্কৃত আর ইংরেজী ভাষার বর্ণসংস্কার ঘটিয়ে যে-অস্পৃশ্যরীতির জন্ম দিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর সেই স্বক্কেত্রে তিনিই সশ্রী। সুধীন্দ্রনাথ

যা mannerism বলে মনে হয়, তা চেষ্টাকৃত দুর্বোধ্যতার প্রকাশ নয়। গাঙ্গীর্ষের ছন্দবেশ তাঁর প্রয়োজন ছিল না পাঠকের সমীহ আদায়ের জন্য। তাই নির্বিধায় লিখতে পেরেছেন : ‘সমালোচনা বন্দনার সপত্নী’^{১১}, ‘সোনার খনিও অবশেষে গজভুক্ত কপিথের সদৃশ হয়’^{১২}, ‘প্রথম দফায় দরকার অবৈকল্য। বিংশ শতাব্দীর মূলমন্ত্র অবৈকল্য আর অস্পষ্টতা’^{১৩} ইত্যাদি। যে-সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের ক্লাসিক গাঙ্গীর্ষ অনেকের মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করে; তাঁর গদ্যের সরসতা কিন্তু কোথাও অস্বাভাবিক বা আরোপিত নয়। উদ্ধৃত অংশগুলির রসসৃষ্টি-ক্ষমতা ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার লেখকগাঙ্গীর্ষের সামর্থ্য স্বরণ করিয়ে দেয়।

দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার সুধীন্দ্রনাথের রচনায় সুপ্রচুর। কিন্তু এ রকম দুই, চার ও ছয় শব্দের বাক্যেরও চমকপ্রদ উপস্থিতি অনস্বীকার্যঃ ‘কাব্য অনাদি’^{১৪}, ‘আমি সাহিত্যের জঙ্গমতার পক্ষপাতী’^{১৫}, ‘এলিয়ট বোধ হয় ওই ধরনের কবি নন’^{১৬}। দীর্ঘ বাক্যকে ‘কমা’ ও ‘সেমিকোলন’ চিহ্ন দিয়ে ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। ফলত সচেতন পাঠক অর্থের বোধ নিয়েই পূর্ণচ্ছেদে উপস্থিত হন। পূর্ণ বিরতির আগে দু’বার স্বল্পবিরতি এবং একটি সংযোজক অব্যয় পাঠকের গতি নিয়ন্ত্রণ করছে এই রকম একটি বাক্যঃ ‘কপাল দোবে আমি কবি বা কোবিদ নই, পল্লবগ্রাহীদের পদাঙ্কচাষী; এবং সেইজন্য আমার রচনায় সংগঠনের সাক্ষাৎ এখনও দুর্লভ’^{১৭}। অবশ্য যদি সংযোজক অব্যয়টি একেবারেই বাদ দিতেন, তাহলে অসুবিধে হত না কোনো তরকেই। উদ্ধৃতিটি যে-অনুচ্ছেদ থেকে গৃহীত তার পঙ্ক্তির সংখ্যা সতেরো, বাক্য সংখ্যা ছয় এবং একটি মাত্র সংযোজক অব্যয়ই (‘এবং’) ব্যবহৃত হয়েছে মোট ছয়বার। সব ক’টি ‘এবং’ অনিবার্য ছিল না। হয়ত ‘সংযোজক’কে ত্যাগ করে পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার বেশী করলে সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের মধ্যে আসত দ্রুতলয় এবং দীর্ঘ বাক্য ব্যবহারের প্রবণতাজাত দোষও হত নিরাকৃত। এছাড়া প্রতিটি বাক্যকে নৈয়ায়িক-শোভন যুক্তিতে সজ্জিত করার একটা প্রাক্ক-পরিকল্পনা সক্রিয় থাকায় ‘কিন্তু’, ‘এবং’ ‘অবশ্য’ অনেক জায়গায় এসেছে মালার মত, গদ্যের স্বাভাবিক চাপ বিনষ্ট করে দিয়ে।

অসাধারণ বুদ্ধিমান কোন প্রাবন্ধিকের রচনা আশ্রয় করার আগে পাঠকের যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, বাঙালী সাহিত্য-রসিকদের তা বুঝিয়ে দিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ। তবু অসঙ্কোচে মেনে নেওয়া যায় না এই ধরনের উক্তি, যেহেতু অনেক শব্দই এখানে অনিবার্য ছিল না : ‘বাংলা কাব্যও অসংলগ্ন ভাবচ্ছবির অনিকাম সংঘট’^{১৮}, ‘চিন্নল পতঙ্গেরা তার দাহময় পরীক্ষার পুড়ে মরে, যিনি অন্নান থাকেন, তিনি বসুধার দুহিতা সীতা; এবং স্বরাজ মজ্জায়

মজ্জায় না ছড়ালে, নৈরাশ্র্য অমঙ্গলপ্রসূ^{১৪}, ‘তাদের রচনারীতি রাবীন্দ্রিক রঙ্গরোলে অনুপ্রাণিত বটে, কিন্তু তাঁদের মনোভাব অধর্মগোচিত বিনয় নেই’^{১৫}। ‘অনিকাম সংঘট’ ‘রঙ্গরোল’, ‘অধর্মগোচিত’, এই ধরনের শব্দে অনুপ্রবেশ অভিধান ভিন্ন সম্ভব নয় বলেই Peirce যে Iconকে (বাহ্যবস্তুর দ্বারা মনের মধ্যে গঠিত ইমেজকে বলা হয়েছে Icon) শিল্পের স্বভাব থেকে অবিলম্বে জ্ঞান করতেন সেই Iconই জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু ‘যিনি অমান থাকেন, তিনি বসুধার দুহিতা সীতা’ আমাদের সংস্কারলব্ধ জ্ঞানের পথে একটা mental image অবশ্যই গড়ে তোলে। কাব্যভাষার ক্ষেত্রে ‘ইমেজ’ ‘বিনিময়যোগ্য’ নয়, কিন্তু গদ্যে ‘ইমেজ’ এনে দেয় ভিন্ন এক মাত্রা। গদ্যভাষাও যে রিচার্ডস-কথিত ‘Stock response’ সৃষ্টিতে সক্ষম তা ‘বসুধার দুহিতা সীতা’ উক্তিটিতে যেমন আছে, তেমনই আছে সুধীন্দ্রনাথের আরও কিছু উক্তি, যার দু’একটি দৃষ্টান্ত এখানে প্রাসঙ্গিক : ‘তিনি ঐতিহাসিক সত্যতাকে দেশাধ্যবোধ-রূপ শনির দশা থেকে বাঁচিয়েছেন’^{১৬} অথবা, ‘অস্ত্রে অমরাবতীর সন্ধান মিললে, পাঠক পর্বতলজ্বনেও কাতর নয়; কিন্তু রামধনুকের গোড়া বুজতে পৃথিবী পরিক্রমা তার মতে পশুশ্রম’। ‘অমরাবতী’, ‘রামধনুক’ নিশ্চয়ই আমাদের মনে অন্য ছবি আনে বা ভাষান্তরে প্রাপ্য নয়।

সুধীন্দ্রনাথের মুখ্য প্রবন্ধগুলি মাত্র দু’খানি গ্রন্থে : ‘স্বগত’ এবং ‘কুলায় ও কালপুরুষ’। প্রবন্ধের সংখ্যা দুটি দীর্ঘ ‘সূচনা’ এবং ‘মুখবন্ধ’ সহ চল্লিশের কাছাকাছি। প্রথম ও সর্বশেষ প্রবন্ধের কালগত ব্যবধান তিন দশকের। যে-কালপর্যায়ে সুধীন্দ্রনাথ, সবুজপত্র-গোষ্ঠী, কল্লোল-কালিকঙ্গমের লেখকেরা আধিপত্য করেছেন, সেই পর্যায়েই ‘পরিচয়’, ‘কবিতা’, ‘বিচিত্রা’, এবং ‘চতুরঙ্গ’ ও ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ। ১৩৩৮-এর শ্রাবণের ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘কাব্যের মুক্তি’ এবং ‘বুড়োর চোখে রাগী ছোকরার দল’ প্রকাশিত হয় ১৩৬৭-এর ২৪শে বৈশাখের ‘দেশ’ পত্রিকায়। কিন্তু নিম্নোক্ত গদ্যাংশ দুটির মধ্যে অন্তরঙ্গ পার্থক্য কোথায়।

ক. অঙ্ককার যেখানে খনায়মান, সেখানেই উভয় আকাশপ্রদীপ অপরিহার্য, নিরুদ্ধিষ্ট চক্রচরণে...যার রুচি নেই, গস্তব্যে পৌছানোই যার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, সেই উক্ত নিয়ামকত্বের অনুগত। (‘কাব্যের মুক্তি’)

খ. সদ্যস্তন সাহিত্যের আলোচনায় নেমে, বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি য়েট্‌স্-এর নাম নেওয়া যে কতখানি অন্যায়, তা আমি জানি; এবং কাব্য-সম্পর্কে আমার মতামতে বিরোধাতাস না থাকলে, তাঁর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আত্মস্বপ্ননের প্রয়াস পেতুম না। (‘বুড়োর চোখে রাগী ছোকরার দল’)

আসলে শুরু থেকেই সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বতন্ত্র, যতই কেন হাল বাংলার সিদ্ধান্তে রাপে তিনি জানুন রবীন্দ্রনাথকে। গড়ে তুলছেন এমন গোপিক ষ্ট্রাকচার যার মর্ম স্পর্শ করার জন্য প্রাচীন গ্রীক হারমোনিক্স বা পিথাগোরীয় জ্যামিতিকে সূত্রেরও সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিক শৈলীর পাশে এই শৈলী স্বতন্ত্র প্রজাতির বর্ণ-পরিচয় ঘটায়। জানি না, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রশংসা সত্ত্বেও আত্মকের পাঠকও ভাবেন কি না যে, 'বঙ্গভারতীর নাট্যমন্দিরেও সে-হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ'। বস্তুত সুধীন্দ্রনাথ, গদ্য বা পদ্য কোন রচনাকেই তাৎক্ষণিক ভাবতেন না, সবই Conscious Calculation-এর ফল পরিণাম। আর্টের ক্ষেত্রে সনিষ্ঠ পরিচর্যা ভিন্ন তাঁর মনস্তত্ত্ব ঘটত না। যেহেতু দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুরূপ সাহিত্যের কোন পাঠশালা নেই, শুধুগুহ কোনকালেই কাব্যচর্চার প্রকৃষ্ট স্থান ছিল না, সাহিত্য-রসিককে বিশ্বপাণ্ডিত্যের সঙ্গে পাঠশালাতেই পানভোজন সেয়ে নিতে হয়, সুতরাং অসীমিতজ্ঞেরও সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশ অবাধ—এমন সুবিধেজনক গণতান্ত্রিক ঔদার্যে সুধীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল না। নিরবধিকাল ও বিপুল পৃথিবীতে জন্ম নেবেই একদিন কোন এক 'সমানর্থমা'—এমন প্রতীক্ষা অন্তরে পোষণ করে অরসিকের কাছ থেকে আপন কাব্যকে রক্ষা করতে চাওয়া সেকালের কবিকে মানাঙ্গেও আত্মকের স্বমায়ু-র দেশে ঐ প্রতীক্ষা আর সম্ভব নয়, 'দুর্বোধতা'কে অনিবার্য ললাটলিপি ছেনেও। সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিনদশক পরে একাঙ্গের শিক্ষিত বঙ্গবাসী নিশ্চয়ই তাঁর বিশেষ বিশেষ শব্দে অতিরিক্ত পক্ষপাত, বাক্য নির্মাণের কিছু কিছু ম্যানারিজম-কে উপেক্ষা করেই তাঁকে ছেনে নেবেন বরগীয়া বাণীর স্মরণীয় রূপকার হিসেবে। তাঁর উক্তি ছিল তাঁর উপলব্ধিরই সাকার বিগ্রহ; নিরাকার ব্যঞ্জনা গোপনে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন তিনি সুরসিকের বোধ ও বোধির জগতে।

প্রতিটি উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ' থেকে। এই বই হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশনের পক্ষে অকণকুমার গুপ্ত-কর্তৃক বাদশপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত। প্রকাশকাল : ১৯৯০ কার্তিক। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫৮।

১. 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ' : পৃ. ৩।

২. ঐ : পৃ. ৩।

৩. ঐ : পৃ. ৩৫৭।

৪. ঐ : পৃ. ৩২৩।

৫. ঐ : পৃ. ৩২২।

৬. ঐ : পৃ. ৩২৬।

৭. ঐ : পৃ. ৩৩৩।

৮. ঐ : পৃ. ৩৩৬।

৯. ঐ : পৃ. ৩৫৭।
১০. ঐ : পৃ. ৩৫৬।
১১. ঐ : পৃ. ২০৪।
১২. ঐ : পৃ. ৩।
১৩. ঐ : পৃ. ৭৭।
১৪. ঐ : পৃ. ৯৮।
১৫. ঐ : পৃ. ২৫৫।
১৬. ঐ : পৃ. ৬।
১৭. ঐ : পৃ. ১৬।
১৮. ঐ : পৃ. ১৮।
১৯. ঐ : পৃ. ১৩।
২০. ঐ : পৃ. ৭৭।
২১. ঐ : পৃ. ১৫৬।
২২. ঐ : পৃ. ১৯৯।
২৩. ঐ : পৃ. ১৯৯।
২৪. ঐ : পৃ. ২৫৪।
২৫. ঐ : পৃ. ২৬০।
২৬. ঐ : পৃ. ৩৮১।

হে শব্দ-অঙ্গরী

পার্শ্বপ্রতিম কুণ্ড

মূল্যহীন সোনা হয় তব স্পর্শে,

হে শব্দ-অঙ্গরী।—

সূধীন্দ্রনাথের কাব্য ভাবনায় এমন ভাবেই মিশে আছে শব্দের পরিক্রমা। তাঁর কাব্যে শব্দভাবনার এমন ব্যাপ্তি, বিষ্ণু দে ভিন্ন অপরাপর কোনো সমসাময়িক কবির ভাবনায় ইতিপূর্বে তেমন ভাবে চোখে পড়েনি। তাঁর ও বিষ্ণু দেব কবিতার আপাত্ত দূর্বোধ্যতা কাটিয়ে শব্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম মূলতঃ মালার্নের এই বিশ্বাস থেকে—‘কবিতা শব্দ নিয়ে সেথা হয়, ভাবনা দিয়ে নয়।’ যদিও আমার মূল আলোচ্যে ‘শব্দ’ ও ‘ভাবনা’ এই দুটি শব্দই অভিন্ন একক শব্দ হিসাবে দেখা হয়েছে। পৃথক অস্তিত্বে নয়।

শব্দ ভাবনার নতুনত্ব নির্মাণে শব্দের গঠন প্রশালী অনেকটা এরকম :

শব্দভাবনা = শব্দ নির্বাচন + শব্দ প্রয়োগ = নবনির্বাচিত শব্দ। সূধীন্দ্রকাব্যে নবনির্বাচিত শব্দ মূলতঃ উঠে এসেছে শব্দের যুগ্ম প্রয়োগে (সন্ধিবদ্ধ বা সমাসবদ্ধ ঘটিয়ে), অর্থহানি না ঘটিয়ে পূর্বব্যবহৃত শব্দের পদলোপের মাধ্যমে (যেমন সম্পাদকীয় → সম্পাদকী, বিনিত্র → বিনিদ প্রভৃতি), উৎসভাষা থেকে প্রতিশব্দ বা পরিভাষা নির্মাণ করে, এবং অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে।

কবিতায় শব্দভাবনার গুরুত্ব শব্দসম্ভারী সূধীন্দ্রনাথের কাছে ছিল অপরিমিত। কারণ তাঁর কাব্যে শব্দচিন্তা একটি বিশেষ সময় ও বিশেষ ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে। অনেক নতুন শব্দ বা বাংলায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ তিনি এমনভাবে অবলীলায় ব্যবহার করেছেন যে আমাদের আপাত্ত অজানা শব্দসমূহ কবিতা গঠনে অনিবার্য হয়ে ভেসে উঠেছে। মনে হয়েছে ঐ দুরূহ শব্দ ব্যবহারই কবিতার প্রাঞ্জলতা এনেছে নয়তো কবিতা অমন ঘন ও সুশৃঙ্খল হত না। এক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য—‘তাঁর পরিচয় পত্রিকা তাঁর কবিতার পাঠক সৃষ্টি করেছে, কবিতার শ্রীবৃদ্ধি করেছে তাঁর উদ্ভাবিত শব্দসমূহ...’ ইত্যাদি। প্রাচীন স্পর্শবাহী বহু শব্দ ব্যবহার করেছে তাই তিনি ছিলেন সমসাময়িকদের মধ্যে আধুনিক। সূধীন্দ্রনাথকে লেখা কবিশুরু চিঠি পড়লে আরও স্পষ্ট হয় তাঁর শব্দভাবনার রূপরেখা। ‘কাব্যরূপের বাহন হোলো শব্দ, বাক্য। শব্দের মধ্যে ফনি আছে অর্থ আছে—কাব্যরূপে দুইয়েরই

প্রয়োজন—কিন্তু অর্থাৎ মুখ্যত সংবাদ দেওয়ার জন্য নয়। অবশ্য সংবাদ দেওয়াও চাই, কিন্তু সেটা গৌণভাবে। সে যদি ছবি দেয়, যদি রস দেয় তাহলেই রূপসৃষ্টির সহায়তা করে। সহানুভূতি শব্দটার ধ্বনিতে সুরও নেই, ছবিও নেই, রসও নেই। দরদ কথটাতে যে কারণেই হোক রস জন্মে আছে। তাই কাব্যরূপে সহানুভূতি কথটা ত্যাগ্য, দরদ কথটা গ্রাহ্য।’ ...‘তোমার রচনার যে বিশেষ আত্মকীয়তা দেখেছি সেটাকে অনাদর করা যায় না। সেই জন্যই ইচ্ছে করি তোমার রচনাগুলিকে কোনো থিয়োরি দ্বারা পীড়ন না করে, অর্থাৎ তাকে সূক্ষ্মাণু জুতো কসেট প্রভৃতি না পরিয়ে এবং মেয়েদের মত জানু ও কনুই পর্যন্ত সাংঘাতিক ঘন সমন্বয় অলঙ্কারের দ্বারা তার অঙ্গটাকে আচ্ছন্ন না করে তার সহজ দেহকে সতেজ সজীবতার লাভ্যে যদি প্রকাশ করো তাহলে তোমার এই লেখাগুলি রসিক সমাজে উপাদেয় ভোজের আয়োজনে লাগবে।’ প্রচ্যুতের রবীন্দ্রনাথকে লেখা সুধীন্দ্রনাথের চিঠি উক্ত শব্দভাবনার রূপরেখাকে আরো বলিষ্ঠ করে—‘আমার থিয়োরিটা মুখ্যত এই। এর থেকে গোটা কয়েক শাখা-প্রশাখা বেরিয়েছে। যথা অসাধারণ চিত্রার অভিব্যক্তিতে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার প্রশস্তঃ কেন না এই ধরনের শব্দ মানবমনের অলস গমনের প্রতিবন্ধক। শব্দ বাধায় ঠোঁড়র খেয়ে অনেকেই হয়তো ঘরে ফিরবে, কিন্তু তারপরেও যারা এগুবে, তারা অন্তত চলবে চোখ খুলে, কান মেলে, প্রতিপদে অগ্র পশ্চাৎ উর্ধ্ব অধঃ দেখতে দেখতে। ...ভাব শুধু মেঘ বাঁশী প্রিয়া বিরহ মিলন ইত্যাদি জরাজীর্ণ শব্দের করতলগত নয়’...ইত্যাদি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মেঘ বাঁশী প্রিয়া বিরহ মিলনমুখী প্রাচীন বাংলা কাব্যের শব্দচিন্তাকে তিনি শুধু আমলই দেননি, পরিবর্তে এনেছেন নতুন শব্দচেতনার কবিতা।

মেঘলা-ঘেরা পৃথুল শ্রোণী ভারে

মরাঙ্গসম নহে সে মদালসা;

তথাপি ঋতু দেহের আড়ে আড়ে

কণে কণে চমকে কী লালসা।।

কদলী-উরু-তোরণ সুশোভিত

লঙ্কাম অমরাবতী পানে;

ভালো কি তবে বেসেছি তারে, আমি?

বিজ্ঞ হিয়া শিহরে তাই ভয়ে? (সংশয়—উত্তর ফাল্গুনী)

মাইকেলের এপিক-ধর্মী কাব্য বিস্তারের সঙ্গে এই কবিতায় সুধীন্দ্রনাথের লিরিক মেজাদের কাব্যের সংহতি লক্ষ্যণীয়। মাইকেলের চেত্রীবেষ্টিত অশোকবনের বর্ণনা মেজাজ অনেকটা অভিন্ন, সংশয় কবিতায়।

১৯২৯ সালে জাপান-আমেরিকা, ১৯৫২তে ইউরোপ ১৯৫৫-৫৬তে ইউরোপে দ্বিতীয়বার এবং ১৯৫৭-৫৯-এ পুনরায় জাপান-আমেরিকা ভ্রমণের

সুবাদে সুধীন্দ্রনাথের বিদেশী ভাষার জ্ঞান ও পুস্তক পাঠের জ্ঞানালোক ছিল এতই প্রখর যে তাঁর কবিতায় বিদেশী কবিদের শব্দের প্রতীকী ব্যবহার ও চিত্রকল্প উপমার আধুনিকতায় শব্দভাবনার বিস্তার ঘটেছে অনেক বেশি। তার ওপর বুদ্ধদেব বসুর ‘আমার সমবয়সী বাঙালি লেখকদের মধ্যে তিনিই (সুধীন্দ্রনাথ) একমাত্র, যিনি বাংলায় ও বাংলায় ব্যবহারযোগ্য প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের নির্ভুল বানান জানতেন, এবং শব্দতত্ত্ব ও ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে যাঁর ধারণায় ছিল জ্ঞানপ্রিত স্পষ্টতা। এই শব্দপ্রেমিক শব্দকে প্রতিটি সম্ভবপর উপায়ে উপার্জন করেছিলেন’—এই প্রশংসার নিরিখে তার শব্দ চিন্তার জগৎ ছিল আবিষ্কৃত। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের প্রভাবে এবং বিদেশী সাহিত্য ও ভাষা জ্ঞান স্বভাবকবির আধুনিক মনস্কতায় তিনি নিজস্ব শব্দ সম্ভারের এক নতুন বাতায়ণ উন্মুক্ত করেছিলেন তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে। তাই তিনি অতি সহজেই লিখতে পেরেছিলেন—‘বর্ষর বায়ু চিরায়ু আঁচল হুঁড়ে’ (জাতিস্মর-ক্রন্দসী), ‘প্রথম দরশপুণ্য সে কুঞ্জে সলাজে’ (অভিসার-তৃতী), ‘বিহঙ্গ বিকচ রৌদ্র নীলিমার হাসিতে মুখর’ (উজ্জীবন-প্রতিধ্বনি), ‘যথাকালে অমৃতের দায় সাক্ষ সন্ততিকে সঁপে অস্তিম শয্যায় নিকামত পারে না আশ্রয় নিতে’ (যযাতি-সংবর্ত) ইত্যাদি বলিষ্ঠ শব্দ-সমন্বিত কাব্যপঙ্ক্তি।

রবীন্দ্রনাথ, সেন্সপীয়র, লরেন্স, হাইনে, এলিয়টের কাব্যবিশালতায় সুধীন্দ্রনাথের কবিমানস উন্মুক্ত হলেও মাঙ্গার্মের কাব্য ভাবনায় তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে বেশি। সংবর্তের মুখবন্ধে তিনি স্বীকারও করেছেন—‘মাঙ্গার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অধিষ্ঠ : আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য। ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে, লব্ধ-শব্দ, দেশী-বিদেশী, এমনকি পারিভাষিক শব্দও আচরণীয় কিনা, সে-অনুসন্ধানও হয়তো কোনও কোনও কবিতায় রয়েছে; এবং শব্দ ছন্দ উভয়ই যেহেতু পরজীবী, তাই বর্তমান শব্দবিন্যাস ও ছন্দোব্যবহারের ভূমিকা লেখকের ভাবনা-বেদনা যার বহিরাশ্রয় আবার ইদানীন্তন ঘটনাঘটন।’

তেমনি, তবী-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও স্বীকৃত। “কেবল রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান সর্বত্রই জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনার অপহৃত ভগ্নাংশ বলে ধরে নেওয়া প্রায় নিরাপদ। তবু এই চুরির জন্যে আমি লজ্জিত নই, কেন না শুধু সুন্দরের মোহ যে চোরকে পাপের পথে ডাকে, সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে।” এই বিষয়টিকে আরো যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য আনাতোল ফ্রান্সের উদ্ধৃতি তুলে বলেন—“তিনি (ফ্রান্সে) একবার এক কবি বংশঃপ্রার্থীকে বলেছিলেন, পূর্বগামীর স্বপ্ন কখনও স্বীকার কোরো না। সে-

কৌশলে অধর্মের বোঝা তো তিলমাত্র কমবেই না, বরং হারাবে পাঠকের দরদ। পণ্ডিত ভাববে, তুমি করছ তার অখিল বিদ্যার প্রতি কটাক্ষ; মূর্খের মনে হবে তার অজ্ঞতা আর তোমার কাছে ঢাকা রইল না।” আমরাও তাঁর ঐ ‘অপহৃত ভগ্নাংশ’-এর দৃষ্টান্ত পেয়ে যাই একটি কবিতায়। কবিতাটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নয়। মালার্মের একটি কবিতার ৪টি স্তবকের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের ‘দ্রষ্টতরী’ (দশমী) কবিতার চারটি লাইন দ্রষ্টব্য।

And Perhaps the masts, inviting tempests
Are of those which a wind bend over ship wrecks
Lost without masts without masts or fertile isles
But oh my heart listen to the Sailors song!

মান্ডল ডেকে এনেছিল অশনিকে
পালে জেগেছিল কেবল ত্রাহিস্বর
ভেসেছিল হাস; সর্বনাশের দিকে
গতি হয়েছিল অবাধ অস্ত্রপর

(দ্রষ্টতরী/দশমী)

কিছা মালার্মের

‘When Sterile winter’s ennui had ‘shown forth’-এর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ‘সহসা হেমন্ত সন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মত।’ (শর্বরী/উত্তর ফাল্গুনী)-র মিল উল্লেখ্য।

তম্বী কাব্যগ্রন্থে ‘বর্ষার দিনে’ কবিতাটি রবীন্দ্র প্রভাবের কথা মনে হলেও ‘বৃষ্টিশীকরসিন্ধু’ কিছা ‘মন্দ্রদ্রোহা শোকে’ শব্দচয়ন সুধীন্দ্র কাব্যের-ই প্রকাশ, ভিন্নতাও বটে। ‘বাৎসরিক’ কবিতায় ‘গতানু শোচনাধূসর’ অথবা ‘দ্রষ্টনীড়’ কবিতায় ‘হিরণ-হরিণী শিকারে’, ‘যৌবন সুরাক্ষরপে’, ‘বক্ষনালোরে’ প্রভৃতি শব্দ সুধীন্দ্রনাথের নিরুদ্ভূত আবেগ, গ্রন্থদী বৈদম্ব্য ও শব্দচেতনার সার্বভৌমত্বের প্রকাশ। প্রতিটি শব্দচয়নের ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত চিন্তা আছে। নয়তো ‘অনাহুত’ কবিতায় কেন শুধুই শব্দের ঝঙ্কার মিমি মিমি কানে বাজে? যেন নিদ্রিষ্ট মনে বীধা কোনো গ্রন্থদী সুর।

‘অযত বিচ্ছিন্ন তব্ধে অশ্রুত যে-সুরের ঝঙ্কার
জাগে মাঝে মাঝে,

.....
হয়তো আশাঢ় রাতে সদ্যন্নাত পল্লব মর্মরে,

‘শান্ত বিদ্রিষ্টবে।’”

যেসব শব্দের প্রকৃতিতে সুর আছে, যাদের পারস্পরিক মিলনে সঙ্গীত তৈরী হয় এবং শব্দ কখনও কখনও তার আভিধানিক অর্থ ছেড়ে নৃত্য

ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, সেই সব শব্দের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের ছিল দুর্মর আকর্ষণ। সুধীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে সেই সব শব্দ-ভাবনা সুধীন্দ্রকাব্যে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করল। কবিতা দুর্বোধ্য মনে হলেও সঙ্গীত শোনা গেলে সেই সব কবিতায়।

ক্রন্দসী কাব্যগ্রন্থে কুচুট কবিতায় ‘কাংসক্রেংকারিত শিশী’, ‘নির্গিগড় বিভীষিকা’, ‘অচ্ছেদ সরসী’, ‘দ্বিস্রাদীপক’ ইত্যাদি কঠিন কঠিন শব্দের প্রয়োগেও কবিতাটি কখনও ভারাক্রান্ত হয় না শব্দের মিলনসঙ্গীতের জোরে।
কিন্তু—

‘অম্মান্তর’ কবিতায় (উত্তর ফাফুনী)

‘আখানা চাঁদ রূপার কাঠির পরশে

জাগায়েছে তার মুখে কী মন্দির কান্তি

নিমেষ নিহত স্বচ্ছ চোখের সরসে

ক্রান্তরকা সম্মানে সংক্রান্তি।’—পড়লে সঙ্গীতের সুরই শোনা যায়।

‘ক্রান্তরকা’-র অর্থ অভিধান ঘেঁটে পরে দেখলেও চলে।

কখনও কি ‘পুনর্জন্ম’ (অর্কেষ্ট্রা) কবিতায়—

‘মোর কঠনাসী

বদ্ধ যেন অগোচর যুগে;

মৃত্যুর প্রবেশ পথ প্রতি রোমকূপে

স্রুদয়ের মহাশূন্য কম্পমান নির্বাণের শীতে;

নিখিল নাস্তিত্বে

মৌনের বিশ্রুতলাপ উপশয়ী বিভীষিকা সনে;

অসীম গগনে...’ পড়তে পড়তে একবারও মনে হয় ‘উপশয়ী’-র অর্থ কি? হয়তো মনে হয়, কিন্তু ঐ শব্দ ভাবনা-ই তো সুধীন্দ্রকাব্যে ব্যতিক্রমী চেহারা নিয়েছে। “একদিন ‘উড়ে চলে গেছে’—এই অপরিচ্ছন্ন ক্রিয়ার ‘উড়িন’ বিশেষণে রূপান্তরের চেষ্টায় আমাকে সারা সন্ধ্যা কাটাতে দেখে, তিনি (রবীন্দ্রনাথ) শূন্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করেও দিয়েছিলেন যে যদি ঐ ভাবে, অত আন্তে আন্তে গিষি, তবে আমার কলম অচিরে একেবারে থেমে যাবে।”—অর্কেষ্ট্রীয় ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতি শব্দ-পিপাসু সুধীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে চিনিতে দেয়। এহেন মুক্ততায় সুধীন্দ্রনাথের কবিতা অভিধান নিয়ে পড়তে বসলেও খারাপ লাগে না।

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বয়ংপ্রভ বিদ্বান্। পরনির্ভর প্রচলিত শব্দ চিন্তায় তাঁর কাব্যভাবনা আটকে থাকেনি। তাঁর নবসৃষ্ট শব্দাবলী বাংলা কাব্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তার সৃষ্ট ‘অস্থিষ্ট’, ‘অভিধা’, ‘ঐতিহ্য’, ‘প্রমা’, ‘প্রতিভাস’, ‘অ-বৈকল্য’, ‘কলা কৈবল্য’, ‘ক্রন্দী’, ‘নৈরাশ্রসিদ্ধি’, ‘পল্লবগ্রাহী’, ‘প্রাতিষিক’,

‘ঐশী’, ‘অতৃপ্তি’, ‘উপমাসংকর’ প্রভৃতি শব্দ-চিন্তাগুলো কোনো একক শব্দ নয়, অনেক সময় সমগ্র বাক্য ভাবনারও প্রকাশ।

তিনি ছিলেন তত্ত্বচিন্তক, স্বাধীন ও আত্মভাষী। তিনি কাব্যসৃষ্টিতে নিজের শব্দমণ্ডল নিজেই গড়ে তুলেছিলেন। স্বাধীন তত্ত্ব-চিন্তাও মাঝে মাঝে নতুন নতুন শব্দের জন্ম দেয়। ধ্বনিময় অনুপ্রাস নির্ভর তাঁর কবিতা। তৎসম শব্দের ব্যবহারে কাব্য-পঙ্ক্তি বিন্যাসে স্বকীয় প্রবণতা আছে। আবেগকে আপন ছন্দ খুঁজে দেওয়ার জন্যই এই প্রয়াস। বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান ও বিশ্বভ্রমণের সুবাদে তামাম বিশ্বের বিজ্ঞান-দর্শন-যুক্তিবাদ আপন মাতৃভাষাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। তাকে কখনও সর্বাংশে পরাশ্রয়ী হতে দেয়নি। তাঁর চরিত্রের উন্নাসিকতা, সংহত স্বল্পভাব, বিষম নেতিবাদী, জীবন দর্শন মাঝে মাঝে কবিতাকে দুঃসাহ করে তুলেছে। কিন্তু কাব্য সৃষ্টিতে কথ্যভাষার সঙ্গে তৎসম শব্দের প্রয়োগ, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব, বিদেশী ভাবনায় শব্দের প্রতীকি ব্যবহার কবিভাবনায় আধুনিকতা এনেছে। মাঝে মাঝে শব্দের অভিধানগত অর্থের বিপর্যয়-ও ঘটেছে। মাঝে মাঝে একই শব্দ ভাবনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কবিতায় এসেছে। তাঁর মরুভাবনা কোথাও ধূ ধূ মরুভূমি (উটপাখী), কোথাও অলৌকিক মরীচিকা (ভাগ্য গণনা), কোথাও শুধুই মরু, কোথাও বা মরুদস্যু, অথবা মরুদেশীয় গল্প ফণীমনসা (মার্জনা)-র রূপে কবিতায় এসে ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকল্প গড়ে তুলেছে। আবার বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে মরুভূমি, নরক, শব, পিশাচ-এর মত একই শব্দ বিভিন্ন কবিতায়।

সূক্ষ্মনাথের ভাষায় শব্দের স্বভাব টাকার মত, বহু ব্যবহারে তা ক্ষয়ে যায়, হস্তান্তরে তাতে কলঙ্ক জমে, বয়স তাকে অচল করে, আবার কালে সে স্থান পায় যাদুঘরে গ্লাস-কেসে (কাব্যের মুক্তি)। তাই তিনি নতুনের খোঁজে পাড়ি দেন। সৃষ্টি করেন ‘অকারী’, ‘গুণ্ণব্যাগাধি’, ‘অনিকাম’, ‘ব্যবর্তনবিধি’, ‘কুসংক্রাম’, ‘সৌজাত্যবিদ্যা’—ইত্যাদির মত অদৃশ্যপূর্বশব্দ। আবেগ-প্রধান বাংলা শব্দ ভাষারে প্রকৃত শক্তি ও সম্ভাবনা, সূক্ষ্মতা ও ব্যাপ্তির পক্ষে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সাধারণ পাঠকের অলস্যমহুর তীর মনন তা বুঝতে পারে না।

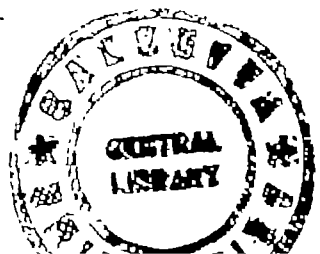
শব্দবিলাসী সূক্ষ্মনাথের কাব্য ভাবনায় শব্দ সন্ধানের অতি সামান্য নিদর্শন এখানে উপস্থিত করা হল। তিনি নিজের সৃষ্টিতে যে শব্দভাষার সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর এই শব্দ মহনের নিঃসঙ্গ অভিযানে আমাদের বিস্মিত ও প্রভাবনত করে। তিনি সত্যই গভীর চিন্তন প্রক্রিয়ার পর শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা কখনই স্বতঃস্ফূর্ত রচনার গতি ও প্রগতিকে ব্যাহত করেনি। ‘অর্কেষ্টার’ ‘স্বর্ণাভ কেশ’ প্রিয়াকে ভুলতে না পারার ব্যথাও শব্দের রূপকে গ্রথিত করেছেন।

“আছে কি স্মরণে সখী, উৎসবের উগ্র উদ্‌যাদনা,
 করতলে পরিপ্লুতি, চারি চক্রে প্রগল্ভ বিস্ময়
 শূণ্যপথে দুটি যাত্রী, সহসা লজ্জার পরাজয়,
 প্রতিজ্ঞার বহুলতা, আলোষের যুগ্ম প্রবর্তনা?—(অপচয়/অর্কেষ্ট্রা)

সবশেষে শব্দের দুরূহতা, রচনার দুরূহতা সম্পর্কে তার নিজের মত
 এখানে অনুধাবনযোগ্য—আমি যে পাঠকের কথা বলছি কাব্যের সঙ্গে সে
 নাড়ির যোগে বাঁধা। রচনার দুরূহতা তার কাছে বাধা নয়, বরং কঠিন কথার
 ধাক্কা তার দরদী কল্পনার জড়তা একেবারে কেটে যায়। কিন্তু পাঠক যতই
 অনুকম্পায়ী হোক, কবি যদি নিজেকে ছুতমার্গের আড়ালে রাখেন, তবে তাঁর
 নাগাল পাওয়া অসম্ভব। দরদী কল্পনার জড়তা কাটিয়ে আমাদেরও কবির
 কাছে পৌছতে হবে। নয়তো তাঁর কবিতায় শব্দের যাদু-স্পর্শ আমরা
 কোনোদিনই পাবো না।



ব্যক্তিদৃষ্টিতে সুধীন্দ্রনাথ



সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : পুনশ্চ

অমদাশঙ্কর রায়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলতেন তিনি শতাব্দীর সমবয়সী। সুতরাং এটা তাঁর জন্মশত-বার্ষিকী। ইতিমধ্যে তাঁর সম্বন্ধে আমার যা বলবার তা 'আমার কাছের মানুষ' নিবন্ধে লিখেছি। 'পরিচয়'-এর সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ও বন্ধুতা। 'পরিচয়' উঠে যাবার পরে তাঁর সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে যাই। তখন তিনি কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পৈতৃক ভদ্রাসন ছেড়ে হাজরা রোডে তাঁর নিজস্ব ভবনে বাস করছিলেন। সেইখানে দেখলুম তাঁর বিরাট পুস্তক সম্ভার। তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরি। তাতে ছিল আধুনিকতম বিদেশী গ্রন্থ। তিনি যেখানেই থাকুন আধুনিকতম চিন্তা তাঁর নিত্য সাথী। এদেশে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে আমরা অনেকেই ছিলাম তাঁর স্নেহভাজন। কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র ছিলেন, যতদূর জানি, তিনজন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি যখন বঙ্কতা দিতে কানাডায় যান তাঁর সঙ্গী হন সুধীন্দ্রনাথ। ফেরবার সময় তিনি সানফ্রান্সিসকোতে অবতরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গুর সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হয় যেন তিনি ইংরেজি জানেন না। তিনি সেখানে অবতরণ না করে চলে যান দস এঞ্জেলস-এ। ততদিনে আমেরিকানদের হুঁশ হয়েছিল। সেখানে তিনি অবতরণ করেন। সুধীন্দ্রনাথ মজা করে বললেন, 'একজন মেয়ে আর-একজন মেয়েকে বলছে' Look at that old man in bathroom.' গুরুদেব মর্মাহত হয়ে সুধীন্দ্রনাথকে বললেন, 'আমাকে কি সে রকম দেখায়?' সুধীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন।

হাজরা রোডের বাড়ি যুদ্ধকালে সরকার রিকুইজিশন করে। তখন সুধীন্দ্রনাথ রাসেল স্ট্রিটে বাসা নেন। সেখান থেকে তিনি যখন আমেরিকায় যান তখন তাঁর টাকার দরকার হয়। ততদিনে দেশ স্বাধীন হয়েছে। তখন তিনি আমার বন্ধু করুণাকুমার হাজরাকে অনুরোধ করেন রিকুইজিশন তুলে নিতে। হাজরা তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। হাজরা রোডের বাড়িটি সুধীন্দ্রনাথ ফিরে পেয়ে বিক্রি করে দেন। সেটা হয় তাঁর সমুদ্রযাত্রার পাথেয়। তিনি বিমানে চড়ে আকাশপথে পাড়ি দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় পত্নী রাজেশ্বরীর সেটা নাকি সহ্য হত না। হাজরা রোডের বাড়িতে আমি তাঁর প্রথম পত্নীকে দেখেছিলুম। ছবির মতো সুন্দরী। নামও

বোধহয় ছবি ছিল। আমরা যারা সুধীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতুম তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ সমর্থন করতুম না। ফলে আমাদের মধ্যে একটা অদৃশ্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। তা ছাড়া তিনি বাংলা সাহিত্য থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। ইংরেজিতেই লিখতেন। ইংরেজ পাড়ায় থাকতেন। তিনি তখন তাঁরই মতো সাহেবদের সঙ্গে মিশতেন। বলা যেতে পারে তাঁর গোত্রান্তর ঘটেছিল।

তবে আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পরে তিনি বাংলা সাহিত্যে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হন। দুঃখের বিষয়, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছিল। ষাট বছর বয়সেই প্রয়াণ করেন। আমরা সকলে শোকে মর্মান্বিত হই।

(অমদাশঙ্কর রায় ১৬/১/২০০১)

সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা

অমির দেব

১: আত্মজীবনীর উপক্রমণিকা

তঁার মৃত্যুর তিন বছর আগে যে-ইংরেজি আত্মজীবনী শুরু করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ব'সে, তা শেষ ক'রে যেতে পারসে তঁার নিছের মুখ থেকেই তঁার ব্যক্তিসত্তার এক পূর্ণ বিবরণ আমরা পেতাম। যা পেয়েছি তা কেবল তঁার শৈশব ও বাল্যের কথা। সেই সঙ্গে তঁার পিতৃমাতৃকুল ও মা-বাবা-জ্যেষ্ঠা-কাকার কথা খানিক বিশদ ক'রে। তঁার পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলেই ছিলো প্রাচীন-চোরাবাগানের দস্ত ও পটলডাঙ্গার মল্লিক। দস্তদের আদি নিবাস ছিলো হুগলি-তীরবর্তী গোবিন্দপুরে, সেই তিনটি গ্রামের একটি যা নিয়ে কলকাতার পত্তন হয়। তাঁরা চোরাবাগানে আসেন আঠারো শতকের মাঝামাঝি যখন দ্বিষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁদের বসতবাটি সংলগ্ন ভূমিতে ফোর্ট উইলিয়ম নির্মাণ করে। চোরাবাগান শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, কোম্পানির সনদ নিয়ে তাঁরা সেখানে যে-বাড়ি বানান তা ক্রমেই শাখাপ্রশাখ্য বৃহৎ হ'য়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষদিকে, ১৮৮৪ নাগাদ, সুধীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ তঁার দ্বিতীয় পুত্র হীরেন্দ্রনাথের বিবাহ উপলক্ষে যখন তঁার বরাদ্দ দুয়ের উপর একটি বাড়তি শোবার ঘর চান সে-প্রার্থনা নামঞ্জুর হয়, যদিও তিনি তখন দস্তদের মধ্যে সর্বাধিক বিস্ত অর্জন করছেন। এমনও নাকি বলা হয়েছিলো যে প্রভূত বিশ্বের অধিকারী হ'লেও তিনি তো আর দস্তবাড়ির একমাত্র সত্ত্বাধিকারী নন। স্কোভে দ্বারকানাথ সে-বাড়ি ছাড়েন, ছেড়ে হাতিবাগানে এসে আলাদা বাড়ি করেন। এই নূতন বাড়ির সামনে শোভা পেতো ঢালাই-করা লোহার তৈরি কয়েকটি শাস্ত্রী—উচ্চতায় দু-ফুট, মাথায় টুপি, রঙিন পোশাক, কোমরে তলোয়ার, চিবুক শত্রুশোভিত—তাদের সুবাদে বাড়ির নাম হয় 'পুতুল বাড়ি'। ঠিকানা ১৩৯ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দ্বারকানাথের মতো সুধীন্দ্রনাথের মাতামহ প্রবোধচন্দ্র মল্লিকও পটলডাঙ্গা ছেড়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে বাসা বাঁধেন, যে-স্কোয়ারের পরে তঁার পুত্রের নামে নাম হয়, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। তঁার পটলডাঙ্গা ত্যাগের কারণ তঁার দ্বিতীয় ভ্রাতা মনমথনাথের বিস্মৃত বাস। তিনি কেমব্রিজে প্রথম ভারতীয় ছাত্র হিসেবে পড়তে গিয়েছিলেন। কালাপানি পেরিয়ে তিনি যখন ফিরে

আসেন তখন তাঁকে ঘরে তোলা নিয়ে পটলডাঙ্গায় আপত্তি ওঠে। কিন্তু প্রবোধ মল্লিক ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁকে বর্জন না করে বসতবাটি বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। বঙ্গীয় বর্ণহিন্দুর জীবনে যে-বদল শুরু হয়েছিলো উনিশ শতকে তারই সাক্ষী এই দুই গৃহত্যাগ—চোরবাগান থেকে হাতিবাগানের বা পটলডাঙ্গা থেকে ওয়েলিংটনের দূরত্ব ততটা স্থানের নয় যতটা কালের। দ্বারকানাথ কুলত্যাগী ছিলেন না, কিন্তু স্বাধীন উপার্জনের সঙ্গে-সঙ্গে এক স্বাভাবিক প্রবোধ সঞ্চারিত হয়ে উঠেছিলো তাঁর মধ্যে। প্রবোধচন্দ্রও কুলত্যাগ করেননি, পাশ্চাত্যস্পর্শ মেনে নিয়েছিলেন। যদি জন্মলগ্নে ‘জিন’ তথা বংশক্রমাগুর প্রভাব মানতে হয়, তাহলে বসতেই হবে উনিশ শতকের এই দুই ধারার উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ; একদিকে ব্যক্তিস্বাভাবিক অন্যান্যদিকে উদারতা।

তাঁর পিতামহকে তিনি দেখেননি, কিন্তু চোরবাগানের যে-বৃহৎ অটালিকা ত্যাগ করে এসেছিলেন তা দেখেছিলেন। বাসক বয়সে তিনি বছরে একবার, দুর্গাপুজোয়, শুরুজ্ঞানদের সঙ্গে সে-বাড়িতে যেতেন এবং পশুবলি দেখে আতঙ্কিত হতেন। হাতিবাগানের নাটমন্দিরে যে যূপকান্ঠ নেই তা তাঁর স্বস্তির কারণ ছিলো। তাছাড়া ঐ অটালিকা ও তার বিপুল সংখ্যক অধিবাসীদেরও তাঁর মনে ধরেনি—বড়ো অতীতমুখী, বড়ো বেশি রক্ষণশীল ও অহংকারী, আধুনিকতায় অস্পৃষ্ট। হাতিবাগানে যে-মুক্তি আছে, তার চাইতেও বেশি ওয়েলিংটনের মামাবাড়িতে, তা চোরবাগানে ছিলো না। অবশ্য অস্তিত্ব কৈশোর অবধি তাঁর ও খানিকটা বংশগৌরব ছিলো—তিনি নিজেই বলেছেন কীভাবে তাঁর ‘উন্নাসিক কৈশোরে এক স্বনামাক্ত পত্রশীর্ষক সুভাষিতের জন্মে’ তিনি বেছে নিয়েছিলেন ‘স্বদেশের আলোকস্তোত্রের একাংশ এবং সেই স্রিপুরি নিচে এক ছলন্ত প্রদীপ বসিয়ে তার সঙ্গে এক গণিক “ডি” জুড়ে এক অতিদুর্লব অসামঞ্জস্য রচনা’ করেছিলেন। আসলে অর্ধচেতনভাবে হ’লেও তিনি অনুকরণ করছিলেন গ্যেটের। কিন্তু কারণটা, তিনি পরে বুঝেছিলেন, নিতান্ত চোরবাগান-প্রসূত নয় : ‘জাল হ’লেও, আভিজাত্যের এক শীলমোহর অধিকারই কেবল এই করুণ রুচিহীনতার কারণ ছিলো না; এবং যেকালে এই নকলনবিশিতে আমি আমার চাইতে অপ্রাচীন অসংখ্য কলকাতার পরিবারের মাত্র অনুবর্তী হয়েছিলুম, তখন তার চাইতে ভিন্নভাবে, এক আন্তর ও আরোহ্য তামসে আমার আচ্ছন্ন লাগছিলো যা আমি না পারছিলাম দূর করতে না মেনে নিতে। অস্তিত্ব আমার কাছে যে-বাহ্য প্রদোষভূমে আমার বাণ্য কেটেছে তা ছিলো এক গভীরতর আঁধারের বহিঃপ্রকাশ; এবং আমি বুঝে উঠতে পারিনি সব মিলিয়ে কী পাঁড়িয়েছিলো ব্যাপারটা—একদিকে বাবার যুক্তিবাদ ও অন্যদিকে গুঢ়েষণা, ধীরেন্দ্র্যেষ্ঠার মর্যাদাবোধ ও উচ্ছ্বলা, মার নির্মমতা ও

করুণা, ভ্রমণের আগে গণকঠাকুরের পরামর্শ, বর্ণবৈষম্যের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এবং ন্যায় দিয়ে ন্যায় খণ্ডন।' ('দ্য ওয়র্ল্ড অব টাইলাইট' থেকে, বঙ্গানুবাদ আমার) পরে স্পেন্সারে ওই স্ববিরোধের ব্যাখ্যা খোঁজবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ।

বাল্যে তাঁর অনেকটা সময় কেটেছিলো তাঁর জ্যেষ্ঠামশাই হীরেদ্রনাথের সঙ্গে, ছুটিতে মধুরা-বারাণসীতে, কোনো-কোনো গ্রীষ্মের দিনে কলকাতার কাছেই তাঁর বাগানে যেখানে আয়না-ঘেরা শূন্য নাচঘর ও শান-বাঁধানো স্তম্ভ পুকুর বাসকের মনোহরণ করতো। চমৎকার গল্প বলিয়ে ছিলেন জ্যেষ্ঠামশাই, তাছাড়া সংগীতজ্ঞ। আর ততদিনে তাঁর মধ্য বয়সের সব বাড়াবাড়ির উপশম হয়েছে—তিনি শুধু অনূতগুই নন, উচ্চবংশীয় পুরুষদের এই উচ্ছ্বসলার তিনি সমালোচকও, তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা অমরেন্দ্রনাথ ও আপন পুত্রের বেলা তো বটেই। তাঁর এই ছোটতুতো দাদার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই তৈরি হয়নি সুধীন্দ্রনাথের যদিও তাঁর খুড়তুতো দাদা অমরেন্দ্র-পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ নিকট ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁর প্রথম ছন্দোচর্চার সাক্ষী, কারণ তাঁর পত্রিকা 'নাট্যপ্রতিভা'তে সুধীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা, টেনিসনের 'দ্য ব্রুক'-এর অনুবাদ বেরোয় যদিও স্বনামে নয়, সম্পাদকের স্বাক্ষরে।

কাকা অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পাননি, কারণ তাঁর জগৎ ছিলো একেবারে আলাদা আর 'পুতুলবাড়ি'তে তিনি ছিলেন ব্রাত্য। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের মা তাঁকে রোহ করতেন। সেই সঙ্গে তাঁর প্রতিভারও যোগ্য সমাদর করতেন। এবং তিনিই জোর করেছিলেন যে অপ্রাপ্তবয়স্ক হ'লেও তাঁর কাকার অভিনয় দেখা উচিত সুধীন্দ্রনাথের। আর সুধীন্দ্রনাথ তা দেখেছিলেন এমন এক মুহূর্তে যখন অমর দস্ত শুধু গিরিশ ঘোষের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীই নন তাঁর জনপ্রিয়তারও তুলে। সিন্ধেভিটের 'কুও ভাদিস'-এর সেই নাট্যরূপ ছিলো তাঁরই দেওয়া এবং তাঁর আমন্ত্রণে ভ্রমণরত এক ইংরেজ নাট্যদল একই সঙ্কেত একই মঞ্চে 'কুও ভাদিস' অভিনয় ক'রে প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলো যে অমর দস্ত অতুলনীয়। ঐ একবারই তাঁর কাকাকে মঞ্চে দেখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, কিন্তু সেই স্মৃতি অক্ষয় থেকে গেছে তাঁর মনে, হয়তো তাঁকে ভেতরে-ভেতরে পুষ্টিও ছুগিয়েছে। কেউ-কেউ এমনও ভাবেন যে সুধীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর পিতার পুত্র তেমনি তাঁর কাকার ভ্রাতুষ্পুত্রও, অর্থাৎ তাঁদের বিপরীত স্বভাব সত্ত্বেও দুয়ের আদর্শই তাঁকে প্রেরণা ছুগিয়েছে। মিত ও অমিতের যে-সংযোগে প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে, তার প্রতীক ছিলেন হীরেদ্রনাথ বনাম অমরেন্দ্রনাথ, অস্তিত্ব সুধীন্দ্রনাথের কাছে।

হীরেদ্রনাথ ছিলেন দস্তকূলে ব্যক্তিক্রম। দস্তরা তখন মনে করতেন না তাঁদের মতো উচ্চবংশে লেখাপড়ার কোনো প্রয়োজন আছে। হীরেদ্রনাথ

লেখাপড়া করেছিলেন এবং শুধু যে করেছিলেন তাই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রও ছিলেন, যদিও তিনি বৃত্তি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন আইন। পিতা ছিলেন এক ইঙ্গ-গ্রীক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ম্যুসুন্দি; তাঁর সেই বৃত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, হীরেন্দ্রনাথ তাতে ভাগ বসাননি। তিনি এটর্নি হিসেবে নিজেই প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বধর্মে স্থিত থেকে অর্ধোপার্জন তাঁর কাছে ছিলো আদর্শেরই সামিল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের কাছেও তিনি তাই প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ যেমন এম.এ. শেষ করেননি তেমনি আইন বা এটর্নিশিপ পরীক্ষাও দেননি। পিতাপুত্রের পরে এতে মনোমালিন্য ঘটে থাকলেও সুধীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতার মূল্যবোধকে অস্বীকার করেননি। এবং যেহেতু তাঁর বিত্ত ছিলো, মূলত পিতৃদত্ত তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র তাই তা পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থে দান করে যান। আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে যে গ্রন্থীতা রূপে বেছে নিয়েছিলেন তা কেবল এই কারণে নয় যে ওখানে তিনি শেষ জীবনে পড়িয়েছিলেন, এই কারণেও যে তাঁর মামা ‘রাজা’ সুবোধ মন্ট্রিকের দানে প্রতিষ্ঠিত যে-বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্যতম স্থপতি ছিলেন তাঁর পিতা তাঁরই উত্তরাধিকারী এই বিশ্ববিদ্যালয়।

পিতৃদেব ‘নিশ্চিন্ত বৈদান্তিক’ই মাত্র ছিলেন না, প্রতীচ্য ন্যায়ের আদর্শকেও তিনি মান্য করতেন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যার পরে বলেছিলেন যে ইংরেজরা এতে তাঁদের নিজেদের ন্যায়বিচারের নিরিখেই অপরাধী। তাঁর কাছ থেকেই সুধীন্দ্রনাথ যুক্তিধর্মে প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ইংরেজি ও সংস্কৃত কবিতা আব্বাদনে তাঁর কাছেই সুধীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি। এবং কোলরিজের ‘দ্য এনশেণ্ট মেরিনার’রে কবিতা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে ভাবতে শিখিয়েছিলেন তিনিই, আর ইবসেন যে শেষ বিচারে ট্র্যাজেডিরই লেখক তাও। তাছাড়া ‘আকেশোর অদ্বৈতের অনির্বচনীয় আতিশয্যে উত্থাপ্ত’ হ’য়ে অনেকাংশ জড়বাদের আশ্রয় নিয়ে থাকলেও তাঁর দর্শনমনস্কতা সম্ভবত পিতৃসংসর্গেই উৎপন্ন। পিতার দৈনন্দিন শৃঙ্খলা ও সরলতায় জীবনযাপন এবং সতত শ্রমশীলতা তাঁকে মুগ্ধ করতো, তাঁর জাতীয়তাবাদী এষণা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে তাঁর ছিলো সমীহ, পাণ্ডিত্য ও মনীষায় শ্রদ্ধা, কিন্তু তাঁর ধ্বংস-চর্চায়, বিশেষত তার বাহুল্যে তথা তজ্জাত ঐন্দ্রজালিকতার প্রতি তাঁর আকর্ষণে পুত্রের সমর্থন ছিলো না। তবে আনি বেসান্টের সঙ্গে তাঁর সৌহার্ষ্যের যে অন্য অঙ্গুরি মাত্রাও ছিলো সে-বিষয়ে পুত্র সচেতন ছিলেন। বারাগসীর আনি বেসান্ট প্রতিষ্ঠিত ধ্বংসক্ষিয়াল-স্কুল, যেখানে তাঁর পিতা তাঁকে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে সত্রাতা পাঠিয়েছিলেন, তাঁর ভালো লেগেছিলো। যেমন বইপাড়ায় তেমনি খেলাধুলায়ও তাঁর আগ্রহ জন্মায় দেখানো। হয়তো যে-যুগপৎ অন্তর-ও-বহিমুখী সুধীন্দ্রনাথকে আমরা পরে দেখি, তত্বদর্শী ও

আড্ডাধারী, তার সূত্রপাত সেখানেই। পিতার কাছে পুত্রের ছিলো এটা একটা বড়ো ঋণ, যদিও কোনো প্রত্যক্ষ ভারতগৌরব ও অতীতচারিতা পুত্রের মনে উগ্ধ ক'রে দিতে পারেননি পিতা। পঞ্চাশত্রে, ১৯২৯-এ তাঁর রবীন্দ্রনাথের সহযোগে গান্ধীর পাশ্চাত্য শিক্ষাবিরোধী প্রস্তাবের প্রকাশ্য প্রতিবাদ পুত্রকে আনন্দ দিয়েছিলো। তবে মেধা সত্ত্বেও পোশাকি পড়াশুনায়, তাঁর পিতার মতো সার্থকতা পুত্রের হয়নি। এম.এ. কেন শেষ করলেন না তার একটা কারণ বোধহয় এই ছিলো যে তাঁকে ক্লাসে চসার আবৃত্তি করতে বলেছিলেন স্বনামধন্য অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরপর দু'বার কি তিনবার তা ক'রে তৃতীয় কি চতুর্থবার তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন, ফলে ক্লাস থেকে বহিষ্কৃত হন। উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আদেশে তিনি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, প্রফুল্ল ঘোষের কাছে মাফ চান বটে, কিন্তু ক্লাসে বসবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের উদ্ভবতনে তাঁর মার হাতও খুব কম ছিলো না। ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের প্রবোধ মন্টিকের কন্যা, হেমচন্দ্র মন্টিকের জ্যেষ্ঠপুত্রী, সুবোধ মন্টিকের বোন, নীরদ মন্টিকের জ্যেষ্ঠতুতো বোন, ইন্দুমতী ছিলেন বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা। নিয়মপালনে তিনি যেমন অন্যদের প্রতি তেমনি নিজের প্রতিও কঠোর ছিলেন। বড়ো বাড়ির বৌদের মতো তিনি কর্তার মর্জি মাফিক চলতেন না—চলতে হ'তোও না, কারণ হীরেন্দ্রনাথ অন্য দম্পদের মতো নৈশবিহারে অভ্যস্ত ছিলেন না। ঘরের বাইরে তাঁর বিহার ছিলো একদিকে জাতীয়তার কাজে ও সারস্বত সেবায়—যেমন বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তেমনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি—অন্যদিকে ধ্বংসফি প্রচারে। এক-দু'বার ইন্দুমতী তাতে স্বামীর সঙ্গে যোগও দিয়েছেন। স্নেহের তাঁর অভাব ছিলো না, যাদের শাসন করতেন তাদের স্নেহও করতেন। রুগ্ন দেওর অমরেন্দ্রকে তিনিই বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আবার প্রৌঢ় বয়সে সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিবাহও মেনে নিয়েছিলেন। বালক সুধীন্দ্রনাথের তাঁর মাকে কেমন লাগতো তার এক উদ্ভাস প্রৌঢ় সুধীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে ধরা আছে—তাঁর মার দৈহিক ও আত্মিক উভয় সৌন্দর্যই তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিলো। একান্তবর্তী পরিবারে আরো অনেকের সঙ্গে তিনি বড়ে হয়েছিলেন, তবু ছোটোবেলা থেকেই রুগ্ন ছিলেন ব'লেই হোক বা মেজো তরফের প্রথম পুত্রসন্তান ছিলেন ব'লেই হোক, একটু বেশি স্নেহ হয়তো তিনি পেয়েছিলেন। একেবারে শৈশবে তাঁর দ্বিতীয় পিতা হীরেন্দ্রনাথের কাছেও—তাঁর প্রথম স্মৃতি সেই স্নেহেরই এক নিদর্শনকে বিরে, তাঁর প্রথম ভ্রমণ উপলক্ষে প্রাপ্ত এক লাল কোটের রং নিয়ে।

হাতিবাগানের বাড়ি ছিলো বড়ো, আত্মীয়-পরিজন ও ভৃত্যদের নিয়ে অনেক লোকের বাস ছিলো তাতে। চার দশক আগের ছোড়াসাঁকোর মতো কোনো ভূত্যতন্ত্র সে-বাড়িতে ছিলো কিনা জানি না, তবে এটা জানি যে এক মুসলমান ভৃত্যের কাছেই সুধীন্দ্রনাথের বর্ণপরিচয় হয়েছিলো। আর পরে, তাঁর প্রথম যৌবনে, তাঁর প্রথম ছন্দোরচনায় অনুলিপি ক'রে দিয়েছিলো বাড়ির সরকারমশায়ের ছেলে, বিভূতি মুখোপাধ্যায়—সূচনার 'শ্রীলী দুর্গামাতা সহায়' সম্ভবত তারই সংযোজন। একটা সময় দুই গৃহশিক্ষকও ছিলেন সুধীন্দ্রনাথের, একজন সকালে অঙ্কের জন্যে, আরেকজন সন্ধ্যায় সংস্কৃত পড়াতে। এমন অনুকূল পরিবেশ সত্ত্বেও হাতিবাগান ছিলো একটু প্রাচীনপন্থী, আসবাবপত্রে তো বটেই, পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারেও। তুলনায় মামাবাড়ি ছিলো আধুনিক। মামা সুবোধ মল্লিককে তিনি খুব বেশিদিন পাননি, কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ মাতামহ হেমচন্দ্র মল্লিকের পুত্র নীরদ মল্লিক তাঁর খুব আপন হয়ে ওঠেন। সুবোধ মল্লিক বিলেতফেরৎ, নীরদ মল্লিকও মেইজি-পরবর্তী জাপান ঘুরে এসেছেন—প্রত্যক্ষ প্রতীচ্য প্রভাব একটু বেশি ছিলো ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। হাতিবাগানে ধুতিই ছিলো চঙ্গ, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ একসময়ে পাংলুনও পরতে লাগলেন। সিগারেটও ধরলেন যা হাতিবাগানে অভাবনীয় ছিলো। যে-সুধীন্দ্রনাথ প্রথমে 'পরিচয়'-এর আড্ডায় ও পরে ৬ নম্বর রাসেল স্ট্রীটে দেদীপ্যমান হলেন তার সূত্রপাত হয়তো বা মামাবাড়ির পরিবেশ থেকেই হয়েছিলো—অজ্ঞাত সেই পরিবেশের এক মুখ্য ভূমিকা ছিলো তাতে। তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধগ্রন্থ 'কুলায় ও কালপুরুষ' যাকে উৎসর্গ করেছিলেন সেই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় ওয়েলিংটনের সূত্রেই—সুবোধ মল্লিকের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। আর ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁকে আলাপ করিয়ে দেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে 'অক্টেপ্টা' কাব্যগ্রন্থ যাকে উৎসর্গ করা। এবং 'অক্টেপ্টা' নাম কবিতা যাঁর জন্যে লেখা সেই অপূর্বকুমার চন্দ্রও বন্ধু হয়ে ওঠেন ওয়েলিংটনের সূত্রেই—নীরদ মল্লিকের বোনের জামাতা ছিলেন তিনি। পরে ১৯২৯-এ যখন সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকা যান তখন অপূর্ব চন্দ্রও রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি হিসেবে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন।

বংশক্রমাপু-বিজ্ঞান এখনো আমাদের পুরোপুরি অধিগত হয়নি। হ'লে জানতাম কোন-কোন উপাদানের সহযোগে তাঁর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিলো। চোরবাগান-হাতিবাগানের দ্বারকানাথ দত্তের পৌত্র, স্বনামধন্য ধীরেন্দ্রনাথ ও পটলডাঙ্গা-ওয়েলিংটনের ইন্দুমতী বসু মল্লিকের পুত্র, নটশ্রেষ্ঠ অমরেন্দ্রনাথ দত্তের স্নাতৃপুত্র সুধীন্দ্রনাথ কী ক'রে সুধীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন? তার কতটা উত্তর তাঁর আত্মজীবনীর উপক্রমশিকাতে আছে?

২. 'বন্ধুমহলে আমার লেখা দুর্বোধ্য বলে নির্দিত'

লেখা তাঁর কতটা নির্দিত আর কতটা আদৃত ছিলো তা আপাতত আমাদের বিবেচ্য নয়, বিবেচ্য তাঁর বন্ধুমহল। আর বন্ধুমহল বলতে আমি কে-কে তাঁর বন্ধু ছিলেন সেই তালিকার কথাও বলছি না। 'পরিচয়'-এর আড্ডায় কারা আসতেন তারা বিবরণ আমরা বিভিন্ন সময়ে পেয়েছি—তৎকালীন বাঙালি মনীষার এক বৃহৎ অংশ। 'পরিচয়' ছেড়ে দেবার পর তিনি যখন রাসেল স্ট্রীটে উঠে এলেন তখন নূতন কে-কে তার বন্ধু হলেন তাও আমরা জানি। এও শুনেছি যে সে-বৈঠকখানায় যাঁরা অতিথি হতেন তাঁরা সকলেই যে জ্ঞানতেন সুধীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবার এক বড়ো কবি তা নয়। বন্ধুমহল বলতে আমি সুধীন্দ্রনাথের বন্ধুপ্রীতির কথা বলছি। ইংরেজ সাংবাদিক ম্যাককম মাগারিজ যে-স্নেহের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের মরণোত্তর ইংরেজি সংকলনের মুখবন্ধে তাঁর রমনীয় ও শীলিত ব্যক্তিত্বের কথা বলেন তা মনে রাখবার। স্বদেশী-বিদেশী উভয় পোশাকেই যে তাঁকে ভালো লাগতো তা তো আমরা যারা যাদবপুরে তাঁর ছাত্র ছিলাম তারাও জানি—পোশাকে ধৃত হতেন না তিনি, পোশাকই তাঁর সঙ্গে শোভা পেতো। তিনি সুদর্শন ছিলেন, সেটা নিশ্চয়ই তাঁর গুণ নয়; কিন্তু সেই শ্রীকে ধারণ ক'রে রাখবার গুণ তাঁর ছিলো। বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডলে এক কমনীয়তা ছিলো য: সংকলকেই টানতো। যাদবপুর আর্টস কলেজে তখন অধ্যাপকদের একসঙ্গে বসবার ব্যবস্থা ছিলো, তিনি কখনো সেখানে প্রবেশ করলে সবাই চোখ তুলে তাকাতেন—তাঁর প্রবেশ যেন ছিলো এক 'আবির্ভাব'। তাঁর চোখে অনেক সময়ই এক কৌতুক খেলা করতো। সেই সঙ্গে মাঝে-মাঝে তাঁর ঈষৎ অশ্লীল বাক্য চমৎকার জোগান দিতো। যাদবপুরেই একবার, ছাত্র-আয়োজিত এক রবীন্দ্রজন্মোৎসবে বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে 'সঙ্ঘয়িতা' থেকে কবিতা প'ড়ে শোনাতে গিয়ে, পাতা ওন্টাতে ওন্টাতে হটাৎ ব'লে উঠেছিলেন, 'জুতা' আবিষ্কার' পড়বো? বুদ্ধদেব বসু প্রায় লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন 'না না'। অথচ বন্ধুবান্ধব তাঁর কেমন ছিলো তার উদাহরণ তো তাঁর প্রৌঢ় বয়সের সতীর্থ বুদ্ধদেব বসু যাঁকে মাঝে-মাঝে তিনি যাদবপুর ফেরৎ বাড়ি পৌঁছে দিতেন। দু-একবার আমারও সৌভাগ্য হয়েছিলো তাঁদের সঙ্গলাভ। একদিন তো মনে আছে বুদ্ধদেব বসুর ঘরে ঢুকে তাঁর দেরি দেখে ব'লেই ফেললেন, 'চলো, চলো, আর কত কাজ করবে?' এমনিতে 'আপনি' বলতেন, অন্তরঙ্গতায় সেই মুহূর্তে 'তুমি' বেরিয়ে পড়েছিলো। তাঁদের এক শেষ সংলাপেও আমি উপস্থিত ছিলাম। 'অবিশৃঙ্খলিতা'র প্রচলিত 'ব'-র জায়গায় 'শ' আবিষ্কার ক'রে বুদ্ধদেব বসু খুব উত্তেজিত ছিলেন। এক ঘরোয়া সভা শেষে

সুধীন্দ্রনাথকে হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে বসেন, বলুন তো 'অবিম্শ্যকারিতা'য় কোন শ/ষ? সুধীন্দ্রনাথ বললেন, কেন, মূৰ্খণ্য, না, না, তালব্য শ। সুধীন্দ্রনাথের পুরোনো বন্ধুরা কেউ-কেউ, সুশোভন সরকার যেমন, বুদ্ধদেব বসুর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন যে তাঁকে যাদবপুরে পড়াতে ডেকে তাঁর আপন ছগতে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি। রাসেল স্ট্রীটে থাকতে-থাকতে তিনি বড়ো বেশি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের অধিবাসী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বন্ধুবাৎসল্যের অন্য এক রূপ আমি দেখেছিলাম ধৃজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বেলা। তাঁর মৃত্যুর বছরেই একদিন আমাকে বললেন—তাঁর ছাত্র ছিলাম ব'লে হয়তো আমাকে একটু স্নেহ করতেন—তোমাকে ধৃজটির কাছে নিয়ে যাবো, বড্ড একা ও, অথচ কথা বলতে কী ভালোবাসতো, মাঝে-মাঝে ওর কাছে যেয়ো। ধৃজটিপ্রসাদ তখন বিদেশ থেকে অপারেশন করিয়ে ফিরে এসেছেন, কথা বলেন ফিস্‌ফিস স্বরে। স্বিজ্ঞেদ্রনাথ মৈত্রেয় বাড়ির চারতল্লায় থাকেন। তিনতলা থেকেই সুধীন্দ্রনাথ হাঁক দিলেন, ধৃজটি, ধৃজটি। চারতল্লার দরজা খুলে একটি শীর্ণ মানুষ ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বেরিয়ে এলেন, কে, সুধীন, এসো, এসো, কাকে নিয়ে এসেছো? ধৃজটিপ্রসাদকে তিনি কিছুদিন নিয়মিত যাদবপুরেও নিয়ে আসতেন যাতে তরুণ সমাজতান্ত্রিকদের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময় হ'তে পারে। সুধীন্দ্রনাথের তিরিশের-চল্লিশের কোনো-কোনো বন্ধুর সঙ্গে আমার একবার কথা বলবার সুযোগ হয়েছিলো—গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, রেবা সরকার, আবু সয়ীদ, আইয়ুব, ইন্দিরা দে, সিন্ধু এমার্সন ও 'পরিচয়'-এর আড্ডার সবচেয়ে নিয়মিত সদস্য, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ। তাঁর স্মৃতির প্রতি সঁকলোই অপার স্নেহ প্রদর্শন করেছিলেন।

তাঁর একটি কাজ নিয়ে তৎকালীন বন্ধুদের অনেকেই আপত্তি করেছিলেন, তা হ'লো তাঁর প্রথম স্ত্রী ছবি দত্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ। মনোমালিন্য যাতে মিটিয়ে নেওয়া যায় তার প্রস্তাবও কেউ-কেউ দিয়েছিলেন, যেমন যামিনী রায় ভেবেছিলেন সবাই মিলে এক স্টীমার ভ্রমণে গেলে কেমন হয়। কেউ-কেউ বলেছিলেন, যেমন সুশোভন সরকার, অবিচার হচ্ছে, কারণ হিন্দু নারীর তো আর দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার নেই (হিন্দু কোড বিলের পূর্ববর্তী ঘটনা এটা)। ধৃজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও গিরিজাপতি ভট্টাচার্য গোড়ায় ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে থাকলেও শেষে মিটমাটের অসম্ভাব্যতা বুঝতে পেরেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু অবশ্য অনড় থেকেছেন। তিরিশের বন্ধুদের সঙ্গে বাইরের দিক থেকে যে একটা বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিলো সুধীন্দ্রনাথের তার একটি কারণ এইই। কিন্তু স্নেহের যে বিদ্রোহ হয়নি তার প্রমাণ তো তাঁর শবযাত্রার সময় সত্যেন্দ্রনাথ বসু কীভাবে তাঁকে একবার দেখবার স্বপ্নে ছুটে এসেছিলেন, ঘে-স্টনার কথা

সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে দিব্যেন্দু পালিত লিখেছিলেন। তাঁর শশ্বমাতার মৃত্যুশয্যায় দাঁড়িয়ে সুধীন্দ্রনাথ কথা দিয়েছিলেন যে ছবি দস্তের কোনো বৈষয়িক অসুবিধে হবে না। সে কথা তিনি রেখেছিলেন, কেয়াতলায় ছবি দস্তের জন্য একটা আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া ছাড়াছাড়ির পর থেকেই তাঁর আয়ের এক-তৃতীয়াংশ ছবি দস্তকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। তাঁর উইলেও তা বহাল থাকে। অনুরূপ না হলেও তুলনীয় একটি কথা কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে দিতে হয়েছিলো রাজেশ্বরী বাসুদেবের পরিবারবর্গকে, যখন তাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও তরুণ সংগীতশিল্পী ও মধ্যবয়সী কবি তাঁদের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন—এই কথা যে তাঁর প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না সুধীন্দ্রনাথ। ছবি দস্তের গর্ভে সুধীন্দ্রনাথের যে সন্তান জন্মায় তাঁদের বিয়ের একবছর পরে তার জন্মমুহূর্তেই মৃত্যু হয়। রাজেশ্বরী দস্তের গর্ভে কোনো সন্তান জন্মাননি, যদিও প্রতিভা বসুর স্মৃতিকথায় আমরা পড়েছি যে, তাঁর কাছে রাজেশ্বরী দস্ত মৃত্যুর আগে বলেছিলেন যে একবার তিনি অন্তঃসত্তা হয়েছিলেন, কিন্তু সন্তানধারণ করতে পারেননি। ‘নিঃসন্তান’ কথাটার এক গাঢ় দ্যোতনা ছিলো সুধীন্দ্রনাথের কাছে। আর সেই যে তাঁর অন্য প্রেমের কথা আমরা অনুমান করে থাকি, ১৯২৯-এর বিদেশযাত্রায়—‘অর্কেষ্টা’র কবিতাশুচ্ছ যার জাঙ্ঘল্যমান সাক্ষ্য আর ‘সংবত’ নাম কবিতার যা ধ্রুবপদ—তার স্মৃতিচারণেও কি বিরাম ঘটে গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে-সঙ্গেই (‘সে এখনও বেঁচে আছে কি না/তা সুদ্ধ জানি না’) ? কল্পনা করছি, সেই বিদেশিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো লোকানর্ঘ্য চুক্তি-পরবর্তী জার্মানিতে যখন মধ্য ইউরোপে বিরাজ করছে শান্তি যার পরিপ্রেক্ষিতে ‘মশালের ধুমার্ত আলোকে’, ‘বালখিল্য নাট্যসীদের সমন্বয় নামসংকীর্ণন’ হাস্যকর ঠেকেছিলো। এও কল্পনা করছি যে পরে ঘনায়মান মহাযুদ্ধই হ’য়ে দাঁড়ালো এই প্রেমের প্রধান অনুবধ। মহাযুদ্ধ যে সুধীন্দ্রনাথকে কতটা উদ্বেলিত করে তুলেছিলো তার প্রমাণ পাই, প্রথমত, ১৯৩৮-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ফাসিবিরোধী লেখক-সংঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা, এবং দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ শুরু হ’য়ে যাবার পর তাঁর ‘সেনাবাহিনীতে নাম লেখানো। তাঁর নিয়োগ হয় এ.আর.পি.তে (বিমান হানা প্রতিবেশ); ১৯৪২-৪৫-এ তিনি সুশীলকুমার দে’র অধীনে এ.আর.পি.র সংযোগ অধিকর্তা ছিলেন। ফাসিবিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর মার্ক্সবাদী বন্ধুদের সঙ্গে তিনটি বিষয়ে তাঁর দ্বিমত থেকে যায়, সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সোভিয়েতের ফিনল্যান্ড আক্রমণ ও টুটকি-হত্যা।

রাজেশ্বরী বাসুদেবের সঙ্গে যখন তাঁর বিয়ে হয় তখনো তিনি এ.আর.পি.তে। বিয়ে হয়েছিলো লাহোরে, হাতিবাগানের অভ্যন্তরে। ফিরে এসে

রাজেশ্বরীকে নিয়ে তিনি উঠলেন বন্ধু সুশীল দে'র ফ্ল্যাটে। তাঁর মেজো ভাই হরীন্দ্রনাথকে প্রথম জানাসেন এবং তাঁরই আগ্রহে রাজেশ্বরীকে নিয়ে হাতিবাগানে দেখা করতে এলেন। বাবা মারা গেছেন, কিন্তু মা তো আছেন। ছবি দস্ত তার আগে থেকেই পিত্রালয়ে। তাঁর সঙ্গে কেন সুধীন্দ্রনাথের দাম্পত্য শেষ পর্যন্ত টিকলো না তার কারণ আমরা জানি না। বাধা কি সুধীন্দ্রনাথের দিক থেকে ছিলো, না কি ছবি দস্তের দিক থেকে, নাকি দুদিক থেকেই? জোড়া লাগাবার চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। হাতিবাগানের একান্তবর্তিতা থেকে স'রে এসে একান্ত দুজনে হাছরা রোডে কিছুদিন ছিলেন, তাতেও লাভ হয়নি। মাঝে-মাঝে তাঁদের সঙ্গে থাকতে এসে পিতা হীরেন্দ্রনাথও অবস্থাটা দেখে গেছেন। এমন কি হ'তে পারে যে সুধীন্দ্রনাথ একটু বেশি বান্ধবীভক্ত ছিলেন এবং ছবি দস্তকে তা পীড়া দিচ্ছিলো? এমন সময়েই তো আবার রাজেশ্বরী বাসুদেবের সঙ্গেও আসাপ। নাকি অন্য কিছু? তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁর সব বৈষয়িক ইচ্ছার আদি শৌরীন্দ্রনাথকে অনেক পরে একটি বন্ধ খাম দিয়ে বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর যদি কোনো কথা তোলেন ছবি দস্ত তাহলে ঐ খাম খুলে যেন তাঁকে দেখানো হয়। তার দরকার হয়নি। এবং ছবি দস্তের মৃত্যুর পরে শৌরীন্দ্রনাথ সেই বন্ধ খাম ছিঁড়ে ফেলে দেন। কী ছিলো সেই খামে? শৌরীন্দ্রনাথ জানতেন না। সুধীন্দ্রনাথ জানতেন এবং সম্ভবত ছবি দস্তও জানতেন।

'পরিচয়' ছেড়ে দিলেও 'পরিচয়' শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর মার্ক্সবাদী বন্ধুদের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন। গোড়ায় স্বহ তাঁরই ছিলো—প্রতি মাসে তাঁকে একটু টাকা দিতে হ'তো—শেষে ১৯৪৮-এ যখন কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হ'লো তখন পুরোপুরি বেচেই দিলেন। ১৯৪৫-এ ফাসিবিরোধী লেখা সংঘ তাঁর 'পুনরুজ্জীবন' মঞ্চস্থ করেন। ইয়েটসের 'দ্য রেজারেকশন' নাট্যকার এই অনুবাদ ইয়েটসীয় মঞ্চরীতি অনুযায়ীই প্রযোজনা করা হয়। আশুতোষ কলেক্স মঞ্চে। পরিচালনা করেছিলেন বিষ্ণু দে। যীশুর মুখোশ একে দেন যামিনী রায় এবং যীশু মূর্তিকে একটা সাদা চাদরে মুড়ে দেবার পরামর্শও তাঁরই। অন্যদিকে, ১৯৪৫-এই মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'দ্য মার্জিয়ান ওয়ে' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ বেরোয় তাঁর 'দ্য সিবাবেজ রিট্রোস্পেক্ট'। মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আসাপ একটু আগে থেকেই। বন্ধুতা হ'তেও খুব দেরি হয়নি। সুশীল দে'র ফ্ল্যাটে তাঁদের দু'জনের যে-বিচিত্র তাত্ত্বিক কথাবার্তা হ'তো মাঝে-মাঝেই—সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, পদার্থবিজ্ঞান কোনো বিষয়ই বহির্ভূত ছিলো না সেই কথাবার্তার—তার সাক্ষী ছিলেন মানবেন্দ্রনাথের পত্নী এলেন রায় ও সদা তরুণ শিবনারায়ণ রায়। সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে এলেন রায় এই সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেছিলেন।

‘রীজন্, রোমান্টিসিজম এণ্ড রেভোলিউশন’ গ্রন্থটি মানবেন্দ্রনাথ লিখে উঠেছিলেন সুধীন্দ্রনাথেরই উৎসাহে। এবং ‘দ্য মার্জিয়ান ওয়ে’র পেছনেও তাঁর উৎসাহ ছিলো। তাঁদের এই বন্ধুতায় তেমন প্রত্যক্ষ তারুণ্যের স্পর্শ হয়তো ছিলো না, কিন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিলো অপার। সুধীন্দ্রনাথের কোনো মতবাদ ছিলো না—মতবাদ যে তাঁর থাকতে পারে না তারই আভাস তিনি দিয়েছিলেন ‘দ্য লিবারেল রিট্রোস্পেক্ট’-এ মানবেন্দ্রনাথকে তাঁর দলে টানার প্রস্নই ওঠে না। মানবেন্দ্রনাথের মতবাদ ছিলো, কিন্তু তিনিও সুধীন্দ্রনাথকে সঙ্গে টানবার চেষ্টা করছিলেন না। তাঁদের সন্ধ্যের সূত্র ছিলো তাঁদের ভাববাদ-বিরোধিতায় তথা এক সর্বব্যাপী ক্ষুদ্রবাদ।

৩. ‘বৈভবের আড়ালে এক ঘোঙ্গী’?

জীবনানন্দে-সুধীন্দ্রনাথে এক বৈপরীত্য দেখেছেন কেউ-কেউ। বলেছেন, যা জীবনানন্দে আছে তা সুধীন্দ্রনাথে নেই আর সুধীন্দ্রনাথে যা আছে তা জীবনানন্দে নেই। ফলে, জীবনানন্দকে পুরো বুঝতে গেলে সুধীন্দ্রনাথকেও খানিক বোঝা চাই যেমন সুধীন্দ্রনাথকে পুরো বুঝতে গেলে জীবনানন্দকেও খানিক বোঝা চাই। এই অভাব-স্বভাব সম্মুত দ্বন্দ্বিকতা নিশ্চয়ই সরলীকরণেরই পরাকাষ্ঠা, তবু সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে লিখতে ব’লে জীবনানন্দ-ভাবনা এসে পড়ছে। এই এসে পড়াকে ইতিহাসচেতনা বলবো কিনা জানি না, তবে এটুকু জানি যে চল্লিশ বছর আগে, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, যা সম্ভব ছিলো, একান্ত সুধীন্দ্রনাথ-ভাবনা, তা আর আচ্ছ বোধকরি সম্ভব নয়। তখন আমাদের মনে একাধিক অতীত একসঙ্গে অধিষ্ঠান করছে; তাদের কোনো-কোনোটি যদি পারস্পরিক সাযুধ্যে বা বৈপরীত্যে বিন্যস্ত হ’য়ে ওঠে তাহ’লে অবাক হবার কী আছে! খুব একটা গঠনবাদ প্রচার না করলেই হ’লো। জীবনানন্দের যে-ব্যক্তিত্বের কথা আমরা শুনেছি, তাঁর যে-বিষয়গুস্ত আত্মমগ্নতা ও ফলত প্রত্যাশিত সামাজিকতায় অসিদ্ধি, তার তুলনায় তো সুধীন্দ্রনাথের ছিলো এক ঈর্ষনীয় সামাজিক দীপ্তি ও স্বচ্ছ আত্মহুতা। জীবনানন্দ শুনেছি ফুটপাতে হাঁটতে-হাঁটতে উন্মোচনিক থেকে ঈষৎ চেনা কাউকে আসতে দেখলে কখনো-কখনো ফুটপাত বদল করতেন। চেনা লোকের সঙ্গে তো নয়ই, অর্ধচেনা বা অচেনা লোকের সঙ্গেও কথা বলতে কোনো সঙ্কোচ বা ক্ষুদ্রতা ছিলো না সুধীন্দ্রনাথের। প্রকৃতপক্ষে আলাপচারিতায় তিনি ছিলেন অধিতীয়, বৈদম্ব্যে অতুল। সেই সঙ্গে গৃহস্থামীর সর্বৈব সহায়তায়ও তাঁর ছিলো। পাঁচের দশকে আমরা যারা কেবল তরুণ নয় অর্বাচীনও ছিলাম তাদেরও প্রবেশাধিকার ছিলো তাঁর বৈঠকখানায়। শুধু তাই

নয়, ভেরিয়ার এলউইনের মতো স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের আলাপ করিয়ে দিতেও তাঁর কুঠা ছিলো না। এবং দিব্যেন্দু পালিত যেমন তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি প্রতি বার দরজায় দাঁড়িয়ে ‘আবার এসো’ বলে সুস্থিত বিদায় জানাতেন। আমাদের কারোর-কারোর মনেও হ’তো, জাগতিক সার্থকতার এক প্রতীক ধারণ ক’রে আছেন তিনি। ৬, রাসেল স্ট্রীটের ছ-নম্বর সুইট’কে তো মনে হ’তো আদর্শ। ঢুকেই চোখে পড়তো উঁচু-উঁচু বইয়ের তাক, মাঝখানে প্রশস্ত খাবার টেবিল, উত্তরে মস্ত জ্ঞানলা, বাঁদিকে মোড় নিয়ে বিরাট বসবার ঘর যার পুর্বের দেওয়ালে যামিনী রায়ের ‘কীৰ্ত্তনীয়া সম্প্রদায়’, দক্ষিণের দরজা খুলে সেই উদার বারান্দা যার কীর্তন ক’রে গেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর এক কবিতায়, এবং বারান্দার বাঁ-কোণে লেখার টেবিল, মাঝখানে বসবার ব্যবস্থা, চেয়ার ও ডিভান। গৃহস্বামী বসতেন বাঁয়ের চেয়ারে। আপ্যায়নের জ্ঞাতি ছিলো না। তিনতলা থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে-নামতে মনে আবেগ জাগতো, এই তো স্বর্গ।

জীবনানন্দের মৃত্যু নিয়ে কারোর-কারোর সন্দেহ হয়েছে, তিনি কি মৃত্যুই চাইছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যু এসেছিলো আকস্মিক। সিন্ধে ও মৃণালিনী এমার্সনের বাড়িতে নৈশ আহার ক’রে এসেছেন, মন প্রসন্ন। শেষ রায়ে শারীরিক অস্বস্তি হচ্ছিলো। সিগারেট ধরাতে গিয়ে পারলেন না, হঠাৎ ঢ’লে পড়লেন। মৃত ডাক্তার ডাকলেন রাজেশ্বরী। ডাক্তার এসে দেখলেন মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হেতু মৃত্যু ঘটেছে সুধীন্দ্রনাথের। ভোর না হ’তেই খবর পেয়ে গেলেন আপনজন ও বন্ধুবান্ধব। মনে আছে, তাঁর অন্তিম যাত্রা রাসেল স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে প্রথম থামলো থিয়েটার রোডে তাঁর পরের ভাই রণেন্দ্রনাথ দত্তের ফ্যাটিবাড়ির একতলায়। মৃতদেহ নামাতেই তার উপর এসে ছমড়ি খেয়ে পড়লেন ছবি দস্ত। তাঁর অন্ত্যেষ্টি শেষে কেওড়াতলায় দাঁড়িয়ে হু-হু ক’রে উঠেছিলো আমার মতো কারোর-কারোর মন। এই তো কয়েক মাস আগে কিরে এলেন তাঁর চতুর্থ বিদেশযাত্রা সমাধা ক’রে। কী উজ্জ্বল কান্দি! আবার সপ্তাহে দু-দিন ক’রে যাদবপুর আসছেন তুলনামূলক সাহিত্য পড়াতে। কলেজ স্ট্রীটে কবিতাপাঠের আসরে হাজির। ‘কবিতা’ পত্রিকার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংখ্যার জন্যে রাজেশ্বরী দত্তের সহযোগে ফরাসি-জার্মান-ইতালীয় থেকে ইংরেজি অনুবাদ করছেন। প্রায় দু-বছর কাটিয়ে এসেছেন বিদেশে, তার মধ্যে। আট-ন-মাস শিকাগোতে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে—কাজ আত্মজীবনী রচনা। জীবনে পরিপূর্ণতা বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে এই তো সেই সময়, যদিও ফেব্রার পথে ইতালিতে বন্ধু সুশীল দেকে বলে এসেছেন যে তাঁর হৃদস্পন্দনে হঠাৎ-হঠাৎ হেঁদ পড়ছে।

তাঁর আত্মজীবনী-র নামে যেমন তেমনি বিষয়েও প্রদোষ। প্রদোষ-ভাবনা

তার অনেক কবিতাতেও। এবং ‘কুলায় ও কালপুরুষ’-এর মুখবন্ধে। তাঁর যে-উজ্জ্বল মূর্তি আমরা দেখেছি ১৯৬০-এ বা তার আগে ১৯৫৬-৫৭-তে তাতে কি কোনো বিষাদের ছায়া ছিলো না? তাঁকে একথা বলতে শুনেছেন আমার বয়সী এক মহিলা যে এখনকার মেয়েরা তো আগেকার মেয়েদের মতো আঁচলে চাবি বাঁধতে জানে না। যাদবপুর ফেরৎ দু-একবার কি কেয়াতলার ছবি দস্তের সঙ্গে দেখা করতেও গেছেন? আমার এক বন্ধুকে নাকি এমনও বলেছিলেন একবার যে তাঁর অনেক স্বীকারোক্তি করবার আছে। তাঁর আত্মজীবনী তিনি কীভাবে শেষ করবেন ভেবেছেন তা দ্বিজেস করতে বলেছিলেন, শয়তানের সঙ্গে এক সংলাপ থাকবে তাঁর ‘আমি’র। মৃত্যুর আগের দিন তাঁর ছোটো ভাইয়ের আপিসে এসে তাঁর অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসেছিলেন। দেখা হয়নি শৌরীন্দ্রনাথের সঙ্গে। কী বলতে এসেছিলেন? বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে কোনো জরুরি কথা? শৌরীন্দ্রনাথকে তাঁর ‘পাওয়ার অব এটর্নি’ দেওয়া ছিলো, সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন তাঁর উইলের অফিস। অথবা অন্য কিছু বলতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় ভাইকে? অপেক্ষা করছিলেন কোনো আন্তর তাগিদ থেকে নিশ্চয়ই। তার সঙ্গে কি এমন বোধও ছিলো যে আর সময় নেই? মাস ছয়েক আগে জার্মান কবি হাল্স এগন হোলটছজেন-এর ‘আখট ভাবিয়াৎসিগয়েন য়ুবার হসাইট উণ্ট টোড’-এর চতুর্থটির অনুবাদ করেছেন, নাম দিয়েছেন ‘মৃত্যুর সময়’। দুই বিপরীত জীবনযাপন করেও মৃত্যুর কাছে এসে কি জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ সমর্পিত হ’য়ে উঠছিলেন?

যে-বৈভবের অধিকারী হয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মসূত্রে, বংশমর্যাদা থেকে শুরু করে বিত্ত গৌরব, বংশক্রমাগুর সার্থক সম্মিবেশেই হয়তো বা যে-গণাবঙ্গী তাঁর আয়ত্তে এসেছিলো, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যে অগ্রবর্তিতা তিনি ভোগ করতেন, সে-সবে কোনো শূন্যতার স্পর্শ কি তিনি পেয়েছিলেন, কোনো অবোধ্য বৈরাগ্যে তাঁর অন্তর হ’য়ে উঠেছিলো আবৃত? আর তা বুঝতে পেরেই কি জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় দেখেছিলেন এক ‘নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা’ এবং আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর ব্যক্তিসত্তায় ‘বৈভবের আড়ালে এক যোগী’কে?

চিঠির আয়নায় সুধীন্দ্রনাথ

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে আমরা জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে ভয়ংকর ধ্বসে আটকে পড়ি। তখন কার্ট রোডের বাংলা বইয়ের দোকান থেকে ‘আঠারো বসন্ত’ নামে একখানি বই কিনি, তাতে ছিল মণীন্দ্রলাল বসুর ‘দার্জিলিঙে’ নামে গল্প, জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ নামে কবিতা এবং এই জাতীয় আরও গল্প ও কবিতা। এর আগে জীবনানন্দ দাশের নাম শুনিনি। দেখলাম, দাদাও নাম শোনেননি। অথচ দাদা রণজিৎ ছিলেন ডাকসাইটে পড়ুয়া ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসার সময় তিনি আমার জন্য নিয়ে আসেন আবু সরীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’। তাতে ছিল জীবনানন্দের ‘শকুন’, ‘নগ্ন নির্জন হাত’ প্রভৃতি আর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘উটপাখী’, ‘শাস্ত্রী’, ‘নরক’ প্রভৃতি কবিতা। তার আগে আমি সুধীন্দ্রনাথের নাম শুনেছিলাম ‘পরিচয়’ পত্রিকার প্রবর্তক-সম্পাদক রূপে, কিন্তু তাঁর কবি-পরিচয় আমার জানা ছিল না। দাদা ছিলেন ‘পরিচয়’-এর গ্রাহক। যাহোক, ম্যাট্রিকে পাশ করে আমি জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে ভর্তি হলাম প্রথমে বিজ্ঞান বিভাগে, কারণ আমার ডাক্তার মা চেয়েছিলেন যে আমি ডাক্তার হই আর পশ্চিম বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড. বি. সি. রায়ও আমার একটা অসুখের জন্য গেলে চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে আই. এসসি পড়তে বলেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে আমি কলা বিভাগে বদলি নিই, শুধু বজায় রাখি একটি বিষয়, অঙ্ক। কলা বিভাগেও দেখলাম, আমার সহপাঠীরা জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথের নাম শোনেননি। আমাদের কলেজ লাইব্রেরির একটি আলমারি থেকে পেলাম বন্যা বিম্বস্ত কতকগুলি বই। সেগুলির মধ্যে ছিল জীবনানন্দের ‘মহাপৃথিবী’, বুদ্ধদেব বসুর ‘কঙ্কাবতী’, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘সম্রাট’ প্রভৃতি কবিতার বই। বোধ হয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জলপাইগুড়িতে অধ্যাপনা করার সময় এগুলি কেনা হয়েছিল। আমাদের বাংলার অধ্যাপকদের দুজন অবশ্য জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের নামের ও লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু—আমার যতদূর মনে পড়ে—দুজনেই কবিতার স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার পক্ষপাতী ছিলেন। আমার পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিচার করে ঠিক করি যে জীবনানন্দের মতো কবিদের ও তাঁর মতো আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রচার করার জন্য একটা পত্রিকা প্রকাশ করব। স্কুলে

পড়ার সময় থেকেই আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রর সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করতাম। তিনি পত্রিকার নাম ঠিক করে দিলেন ‘জলার্ক’—সূর্যের বা জীবনের প্রতিবিম্ব, আবার জলপাইগুড়ির সঙ্গেও ধ্বনির মিল থাকল।

১৯৫১ সালে গরমের ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে এক দুপুরে সুধীন্দ্রনাথের দরজায় হাজির হলাম। একজন সুবেশী পরিচারকের মুখে শুনলাম যে সাহেবকে পেতে হলে সন্ধ্যাবেলায় আসতে হবে। পরে আর-একদিন সন্ধ্যায় গেসাম তাঁর ফ্ল্যাটে। স্নান সেরে ফিটফিট সাজপোশাকে সবে এসে বসেছেন বারান্দায়। তাঁর কবিতা পড়ে যেমন তাঁকে গুরুগম্ভীর মানুষ মনে হয় তাঁর সামনে গিয়ে বসলে আট্টা তা মনে হয় না, বরং মুখোমুখি তিনি ঝগত সজ্জাষণে অত্যন্ত আপন। আগে একদিন দুপুরে এসে ফিরে গেছি শুনে হেসে বললেন, ‘দুপুরটা কারও বাড়িতে যাবার সময় নয়, ওটা দপ্তরে যাবার সময়।’ আমার এখনও মনে আছে যে কর্মস্থলের বদলে ‘উনি দপ্তর’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলাম, ‘আপনি আর লিখছেন না কেন?’ জবাবে বললেন, ‘লেখার জন্য মনটাকে লেখার উপরে রাখতে হয়’, বলে হতে দিয়ে ঢাকনি চাপা দেওয়ার মতো একটা ভঙ্গি করলেন, ‘হ্যাঁচিঙ-এর জন্য সময় চাই, ধৈর্য চাই—আমার সে সময় নেই।’ তাঁকে যখন বলি যে একটা পত্রিকা বের করার কথা ভাবছি তখন উনি বললেন, ‘ব্যাপারটা খুব ভালো ও খুব কঠিন হবে। লেখা ছোঁগাড় করাও কঠিন, খরচ তোলাও কঠিন।’ বললাম, ‘আপনার লেখা চাই।’ ভীষণ হেসে বললেন, ‘আমি আর কোথায় লিখি। তবে কাগজ বের করলে আগে ভেবে দেখো, কেন বের করছ। শুধু নিজেদের লেখার জন্য আউটসেট হিসেবে হসে বসব অনেক কাগজ আছে, সেখানে লেখো। আমি পরিচয় বের করেছিলাম, চেয়েছিলাম মডার্ন ওল্ড-এর পরিচয় বাংলা ভাষায় আসুক।’ এতদিন পরে তাঁর সব সব কথা অবধি মনে নেই, কিন্তু কতকখানি যা মনে পড়ছে তারই ভাবার্থ দিলাম।

জলপাইগুড়িতে ফিরে বনবিহারী দত্ত প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে লেখা সংগ্রহের কাজে লেগে গেলাম। বুঝেছিলাম যে সুধীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চেয়ে লেখা মিলবে না, তাই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চেয়ে এমন ভাবে চিঠি লিখলাম যাতে তাঁর উত্তরটা আমরা ‘জলার্ক’তে ছেপে দিতে পারি। ওঁর কাছ থেকে উত্তর হলো একখানি রেজিস্টার্ড প্যাকেট। খুলে দেখি—এক কপি ‘উত্তরফাল্গুনী।’ প্যাকেটের উপরে প্রাপকের ও প্রেরকের নাম-ঠিকানা ছাড়া আর কোথাও কিছু লেখা নেই। বলে রাখি যে আমার চিঠি লেখা ও তাঁর কাছ থেকে প্যাকেটখানি পাওয়ার মধ্যে বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছিল। সেই প্রথম সুধীন্দ্রনাথের গোটা একটি বই বা এতগুলি কবিতা এক সঙ্গে পড়লাম। একটা জিনিস লক্ষ

করে অবাক হলাম। সেটা এই যে তিনি আমাকে পরিচয় প্রকাশ করার পেছনে যে-উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন—আধুনিকতাকে বাংলায় নিয়ে আসার কথা—তার একটা লক্ষণই তো কবিতায় গদ্যচ্ছন্দকে ব্যবহার করা, অথচ একটা গোটা কবিতার বইয়ে একটিও গদ্যচ্ছন্দে লেখা কবিতা নেই। আমার আগের চিঠির পুনরাবৃত্তি করে আবার চিঠি দিলাম আর তার সঙ্গে জানালাম 'উত্তরফাঙ্কনী'তে গদ্যচ্ছন্দে একটিও কবিতা না থাকার জন্য আমার ধাঁধা। বেশ কিছুদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে জীবনানন্দের কাছ থেকে 'শিরীষের ডালপালা' লেগে আছে বিকেলের মেবে' কবিতাটিও পেয়েছি। দুঃখের বিষয়, এই কবিতাটির একটি ছাপার ভুল সমস্ত কাব্যগ্রন্থেই আজ পর্যন্ত চলে আসছে, কেউ তা শোধরাবার যত্ন নেননি। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের জন্য লেখা ছোঁগাড় করা ছাড়াও আরও অনেক কিছু ছোঁগাড় করার প্রয়োজন হয় সেটা আমরা কাজে নেমে টির পেলাম। সেজন্যই সুধীন্দ্রনাথকে আর তাগাদা দিইনি।

জনপাইগুড়ির এক শীতের বিকেলে পেলাম একটা চিঠি। স্বাভাবিক মাপের চেয়ে একটু বড় মাপের চৌকো ধরনের খাম। উপরে গোটাগোটা খাড়া-খাড়া ইংরেজি হরফে আমার নাম ও ঠিকানা, কিন্তু কে পাঠিয়েছেন তার কোনও হদিস খামের বাইরে নেই। খুলে দেখি—সুধীন্দ্রনাথের চিঠি। ঋতু, তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখেছেন,

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠির জবাব দিতে এত দেরী হলো ব'লে অপরাধ নিও না। সাত-আট মাস অসুস্থ ছিলাম। ফলে অফিসে অনেক কাজ জমে গেছে, এবং সে কাজের বেশ খানিকটা কলকাতায় ব'লে শেষ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ দুমাসে বেশ কয়েকবার বাইরে যেতে হয়েছে; এবং এই পরিস্থিতির মধ্যে চিঠি লেখার সুযোগ করে উঠতে পারিনি। তা ছাড়া তোমার প্রশ্নগুলির যথোচিত জবাব দিতে গেলে প্রবন্ধ লেখা ছাড়া উপায় নেই; এবং তার সময় কোথায়? আমি তো পত্রের ছলে প্রবন্ধই চেয়েছিলাম। তা আর হল না। তিনি আরও লিখেছেন, 'তবু সংক্ষেপে ব'লে রাখি সম্প্রতি বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি সন্দিহান হয়েছি। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু সে-কালের যে-সব তরুণ কবিদের মধ্যে আমরা অপার সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছিলাম তাঁদের অধিকাংশই অন্তত আমার আশাভঙ্গ ঘটিয়েছেন। তবে এ-অভিযোগ শুধু বাঙালী কবিদের সম্পর্কেই খাটে না, আজকালকার পাশ্চাত্য লেখকরাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। একমাত্র এলিয়টই পরিণতির দিকে প্রাণসর।' এর পর নতুন অনুচ্ছেদে লিখেছেন, 'বাংলা গল্প উপন্যাস আমি বড় একটা পড়ি না। হয়তো

সেই জনেই এখনো পর্যন্ত এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল যে ‘গোরা’ই বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ছোটো গল্পের অভাব আমাদের ভাষায় নেই, এবং এখনো ভালো ছোটো গল্প নিশ্চয়ই লেখা হয়, যদিও ‘প্রগতি’র মোহে একাধিক নাম-করা লেখক আজ পথভ্রষ্ট। কিন্তু পশ্চিমেও অপকর্ষের যুগ চলেছে, এবং ইংরেজি বা ফরাসীতে সম্প্রতি কোনো প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস পড়েছি ব’লে মনে নেই।’ এখানেই বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গ শেষ। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ : ‘আমার বইগুলোর পুনর্মুদ্রণ সম্বন্ধে এখনো কোনো বন্দোবস্ত হয়নি। আশা আছে কোনো এক দিন হবে; কিন্তু কবে বলতে পারি না।’ এই সঙ্গে আরও জানিয়েছেন, ‘আড়াই বছর হলো স্টেটম্যানের কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে চাকরি নিয়েছি। কিন্তু অফিসের কাজের জন্যেই যে আমি আজকাল লিখি না, তা নয়। লেখবার বিশেষ কিছু নেই ব’লেই আমার কলম আর চলে না।

তোমার কুশল কামনা করি।

ইতি

৯/১/৫২

সুভার্ণা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

চিঠি শেষ করে আবার যোগ করেছেন,

‘গদ্যচ্ছন্দ আমার অসহ্য লাগে, এবং পদ্যচ্ছন্দে স্বলন-পতন-ক্রান্তির অবকাশ নেই বলেই আমার বিশ্বাস।’

এইটাই আমাকে লেখা সুধীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি ডেবেছিলাম, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে পত্রাকারে তাঁর বিস্তারিত মতামত পেলে আমাদের ‘জলার্ক’-তে তা প্রকাশ করব। কিন্তু চিঠির আকার যা তাতে একটা স্বতন্ত্র রচনা হিসেবে কাগজে ছাপা যায় না। কিন্তু তখন ছাপা না গেলেও আজ যায় এইজন্য যে এতে সুদূর সাহেব বঙ্গে পরিচিত সুধীন্দ্রনাথের অন্য ব্যক্তিত্ব অভিব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য আমি যখন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম তখন জানতাম না যে একটা বড় সাহিত্যিক মহলে তিনি সুদূর ও সাহেব, সেটা জ্ঞানলাম যখন ‘সংবর্ত্ত’ প্রকাশের পরে তাঁকে নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হলো।

এখানে বঙ্গে রাশি, ‘লেখবার কিছু নেই ব’লেই আমার আর কলম চলে না’, তাঁর এই কথাটাও পুরোপুরি সত্য নয়। এসময় তিনি একাধিক পুরনো রচনাকে সংস্কার করে ‘কবিতা’, ‘সাহিত্যপত্র’, ‘পূর্ববাণী’ পত্রিকায় প্রকাশ করা শুরু করেছিলেন। লিখতে লিখতে মনে পড়ে গেল যে তিনি নিজেই বলেছিলেন, বিভিন্ন ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান কবির অনুবাদগুলো আবার ‘ঘবামাজা’ করছেন কবিতার উপের নিছকের মনটাকে রাখার জন্য। সব সময়

নিজের ভেতর কবিতা আসে না, তখন অন্যের কবিতায় 'বাস' করা ভালো। অনুমান করতে পারি যে তখন তিনি মনে মনে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির পরিবেশে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী হয়েছিলেন। কলকাতা আকাশবাণীতে এক কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন স্বরচিত কবিতা পাঠের জন্যে নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করার জন্যে। আমি তখন জঙ্গপাইগুড়িতে। সে যুগে আকাশবাণীর অনুষ্ঠানগুলোর বিশেষ গুরুত্ব ছিল, বিশেষত মফস্বলবাসীদের কাছে। আমরা মফস্বলবাসীরা উৎসুক হয়ে থাকতাম বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির জন্য। আমার এখনও মনে আছে, সুধীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন 'মহ্মা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সুন্দরী তুমি শুকতারা' আর 'যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী' কবিতা দুটি আর আক্রও স্পষ্ট কানে বাজে কেমন করে বলেছিলেন, 'দেখবে আমায় স্বপ্ন-দেখা চোখে/চমকে উঠে বলবে তুমি, 'ও কে/ কোন্ দেবতার ছিল মানসলোকে—এস আমার গানের ডাকে।' সে রূপ আমার দেখার ছায়ালোকে যে রূপ তোমার পরাণ দিয়ে আঁকা।' পরে আমিও কয়েক জায়গায় সুধীন্দ্রনাথের অনুকরণ করে এই 'ছায়ালোক' কবিতাটি পড়েছি এবং একবার শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী ও গায়িকা আমার আবৃত্তির প্রশংসা করে বলেছিল যে তার গায়ে নাকি কাঁটা দিয়েছিল। যাহোক, সুধীন্দ্রনাথের সেই কবিতাপাঠের পরে আমি কোনও কারণে কলকাতায় গিয়েছিলাম, এক ফাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে যাই, কারণ সে-বাড়ির বাতাবরণের একটা দুর্বীর আকর্ষণ ছিল। তখন আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সেই আবৃত্তির কথা বলি। শুনে তিনি বললেন যে তিনিও আগে সুধীন্দ্রনাথের আবৃত্তি শুনেছেন এবং তখন তাঁরও মনে হয়েছিল যে অভিনয়ে থাকলে তিনি শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিতেন। তার পরে যোগ করেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথের কাকাও ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা। সেবার সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। ফিরে এসে তাঁকে চিঠি লিখে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বক্তব্য জানিয়ে যোগ করি যে প্রেমেন্দ্রর কথা শুনে প্রথম সুরজিতের মন থেকে সায় উঠলেও দ্বিতীয় সুরজিতের মনে সন্দেহ জেগেছিল যে সুধীন্দ্রনাথ নাকি মঞ্চের দারুণ সফল হতেন। সেই চিঠি পেয়ে ২৫/৪/৫২ তারিখে তিনি লেখেন, 'তোমার চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি; কিন্তু তার চেয়েও খুশী হয়েছি দ্বিতীয় সুরজিতের 'নাকি' ব্যবহারে। কারণ আমার সহক্ষে প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মতামত তাঁরই অসামান্য উদারতার পরিচয়, আমার গুণের সাক্ষ্য নয়।'

৫২-র জানুয়ারিতে আমাকে লিখেছিলেন বটে যে লেখবার বিশেষ কিছু নেই বলেই লিখছেন না তবু ৫৩-র বসন্তোৎসবের পরেই 'কবিতা' পত্রিকায় 'ব্যাপ্তি' কবিতাটির প্রকাশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের একটা

ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করি। ইতিমধ্যে আমি জলপাইগুড়ি থেকে শান্তিনিকেতনে বি. এ পড়তে গেছি। সে-বছরই বসন্তোৎসবের সময় অন্নদাশঙ্করের উদ্যোগে সাহিত্যমেলা আয়োজিত হয়। অশোকবিজয় রাহা মহাশয় ছিলেন কাব্যশাখার আহ্বায়ক। সাহিত্য মেলার পক্ষ থেকে জীবনানন্দকে আমি মুখে আহ্বান জানালে তিনি আসার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু অশোকদার চিঠির উত্তরে তিনি অক্ষমতা জানালেন। আমি সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গেও কথা বলতে চেয়েছিলাম। তাতে অশোকদা বলেছিলেন যে তিনিই চিঠি দেবেন। যাহোক, সুধীন্দ্রনাথ সে মেলায় আসেননি। কিন্তু তার পরেই আমরা তাঁর ‘যযাতি’ পড়ি। এই প্রসঙ্গে আমার ‘রবীন্দ্রজীবনী’-র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ছে। লাইব্রেরি থেকে সুধীন্দ্রনাথে ‘তম্বী’ কাব্য গ্রন্থখানি পড়ছি দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, “‘স্বগত’ পড়েছ? ‘স্বগত’ পড়লে দেখবে কাব্যের সঙ্গে পাণ্ডিত্য মিলন কীভাবে হয়।’ তাঁর কথাতে লাইব্রেরির অন্য সবুজ মার্বেলপেপারে বাঁধানো ‘স্বগত’ বইখানি পড়ে আমার মনে হয় সুধীন্দ্রনাথের গদ্যর সঙ্গে ‘যযাতি’র গদ্যর একটা ধ্বনিগত বা রূপগত সাদৃশ্য আছে। বোঝা যায় যে একই ব্যক্তির রচনা।

সেবার গরমের ছুটিতে জলপাইগুড়িতে ফিরে সিগনেট প্রেস-এর ‘টুকরো কথা’ নামে যে-বুলেটিন বেরোত তাতে ‘সংবর্ত’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের খবর জেনে ভিপিপি-তে বইখানি আনিয়ে নিই। ‘সংবর্ত’ প্রকাশের প্রস্তুতি পর্বেই তিনি আগাম আনিয়েছিলেন, ‘আমার অসংগৃহীত পদ্য রচনা বোধ হয় শীঘ্রই পুস্তকাকারে বেরোবে সিগনেট প্রেস থেকে; নাম ‘সংবর্ত’।’ বইটি হাতে পেয়ে আস্তে আস্তে পড়ে ফেললাম। সংক্ষেপে তাঁকে আমার প্রতিক্রিয়া আনিয়ে গিখলাম যে ‘জলার্ক’তে বিস্তারিত ভাবে এই বইটির আলোচনা লিখব, সেজন্য এককপি বই পেলে ভালো হয়। উত্তর নেই। অগত্যা আর একটি চিঠি দিলাম। এবার জার্মান কবি স্তেফান গেয়র্গের দুটি কবিতা পাঠিয়ে দিয়ে অনুরোধ করলাম কবিতা দুটির অনুবাদ করে দিতে। সেসময় ‘সাহিত্যপত্র’, ‘উত্তরসূরী’, ‘পূর্ববাণী’, ‘কবিতা’ প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন বিদেশী কবির কবিতার তাঁর করা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল। আমি ভাবলাম যে তাঁকে মূল কবিতা দিয়ে অনুরোধ করলে বুঝি বা ‘জলার্ক’র জন্য অন্তত তাঁর অনুবাদ-করা কবিতা পাওয়া যাবে। আমার সেই চিঠিখানি পেয়েই উত্তরে লিখলেন,

প্রিয়বরেষু,

নানা ব্যস্ততাটে ব্যস্ত আছি বলে তোমার শেষ চিঠির জবাব দিতে পারিনি; আজ আর একখানি চিঠি এসে আমার ঋণ বাড়িয়ে দিল।

সংবর্ত সম্বন্ধে তোমার মতামত পড়ে গর্ব অনুভব করছি। কিন্তু আমার লেখায় এখনও অনেক দোষ ও দুর্বলতা আছে, যদিচ দুর্বোধ্যতা আমার বিবেচনায় অন্যতম নয়। আমার বিশ্বাস একটু ধৈর্য ধরে পড়লে, এবং সঙ্গে কোন কথা কেন লেখা হয়েছে ভেবে দেখলে, প্রথমে যা কঠিন ঠেকে, তা সরল হয়ে আসবে। কিন্তু স্বপক্ষে ওকালতি হাস্যকর; তোমার লিখিত মন্তব্যের জন্যে কৌতূহলী হয়ে রইলুম।

সমালোচনা করবেন বলে দু-একখানি পত্রিকা সংবর্ত চেয়েছিলেন। দিলীপ গুপ্ত সহশ্রয়ের সঙ্গে কথা কয়ে বুঝেছি যে সিগনেট প্রেস সমালোচনার জন্যে বই পাঠান না সাধারণত। তাই আমার তরফ থেকে কোনো কাগজকে বই দিইনি; এবং এখন জলার্ক ইত্যাদির জন্যে যদি দিই তাহলে তাঁদের কাছে অপরাধী হতে হবে।

তোমার মন নানা কারণে চঞ্চল হয়ে আছে জেনে দুঃখিত হলাম। আশাকরি বর্তমান উদ্বেগ সাময়িক।

ইতি

২৩/৯/৫৩

ভবদীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুঃ উপস্থিতি খুবই ব্যস্ত আছি, অসাহিত্যিক ঝামেলায়। এখন গেয়র্গের অনুবাদ সম্ভব নয়। সেজন্যে ক্ষমা করো।'

সংবর্ত কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাতে 'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অধিষ্ঠ' ঘোষণা করে সুধীন্দ্রনাথ বাংলায় মালার্মে-চর্চার দ্বারোদঘাটন করেন বললে ভুল হবে না। আবার একই সঙ্গে তিনি 'উত্তরসূরী', 'পূর্বশা', 'কবিতা' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মালার্মের কবিতার অনুবাদ প্রকাশ শুরু করেছিলেন। ১৯৫৩-৫৪ শীতকালে 'কবিতা'-তে প্রকাশিত মালার্মের 'ফনর দিবান্বপে'কে বলতে পারি তাঁর মালার্মে-চর্চার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। শুধু মালার্মের সেই সুবিখ্যাত কবিতাটির অনুবাদই করেননি, তার সঙ্গে যোগ করেছিলেন তাঁর অসাধারণ ভাষ্য। গবেষকগণ বলতে পারবেন যে এর আগে বাংলায় আর কে মালার্মের অনুবাদ করেছিলেন বা মালার্মের কবিতা ও কাব্যজিজ্ঞাসা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন! এক হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ বাংলায় কাব্যতত্ত্বের বিচারে একটা সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা যোগ করলেন। তাঁর করা মালার্মের যেসব অনুবাদ তখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছিল সেগুলো যে মালার্মের মূল রচনার প্রতি যথেষ্ট অনুগত ছিল না সেটাও আমি জেনেছিলাম শান্তিনিকেতনে থাকার সুযোগ। শান্তিনিকেতনে তখন বিদ্যাভবনের একজন তুর্কি গবেষক ছিলেন, যার নাম আমি ভুলে গেছি। তিনি আমাকে ফরাসি শেখাতেন, আমি তাঁকে শেখাতাম রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পড়ানোর ভিত্তিতে আমি বুঝেছিলাম যে অনুবাদ

করার সময় মালার্মের মূল থেকে সুধীন্দ্রনাথ অনেকখানি দূরত্ব বজায় রাখতেন এবং তাঁর অনুবাদও মালার্মের অনুবাদগুলি নিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি লিখলেন, ‘তোমার ২৭ তারিখের চিঠি এইমাত্র এল। আগের চিঠিও যথাসময়ে পেয়েছিলুম; কিন্তু নিতান্ত সময়ভাবে জবাব দিতে পারিনি, সেজন্য ক্ষমা করো।

মালার্মের অনুবাদ তোমার ভালো লেগেছে ছেনে আশ্বস্ত হলাম। আমার স্বভাবে আত্মবিশ্বাসের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম; তাই নিজের লেখা সম্বন্ধে নিজের মত আমার প্রায়ই নেই।

কোনো কবিতার যথাযথ অনুবাদ আমার বিবেচনায় অসম্ভব। অবশ্য মূলের যথাসাধ্য অনুসরণ অনুবাদকমাত্রের কর্তব্য; তবু এই চেষ্টার ফল শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায়, তা সার্থক হলে, তাকে আর তর্জমা বলা চলে না। তাই আজকাল আমি সব অনুবাদের শিরোনামায় অবলম্বন শব্দটা ছুড়ে দিই।

আশাকরি দুটি আনন্দে কাটছে। শান্তিনিকেতনে ফেরার পথে দেখা করে যেও।

ইতি

২৯/১০/৫৩

ভবদীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

‘সংবর্ত’র ভূমিকা থেকে যেমন মালার্মে-চর্চা শুরু হয় তেমনই ‘সংবর্ত’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে সুধীন্দ্রনাথ-চর্চাও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ-চর্চার প্রধান অংশটাই ছিল সুধীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা। একজনের বিরূপ সমালোচনায় আমি বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছিলাম, কারণ তিনি একজন ভালো কবি এবং আমি তাঁর কবিতার কলাকৌশলের উপর দখল দেখে তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলাম। তা ছাড়া সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসে আমি তাঁর নিকটবর্তী ছিলাম। অথচ আমি যে-দুজন বাঙালি কবিকে কবি হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতাম সেই জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমার পক্ষে মহা অশান্তির কারণ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের একটি চিঠি এখানে উল্লেখ করি। চিঠিটা এই—‘তোমার ২৬ মার্চের চিঠি যথাসময়ে পেয়েও এত দিন নিরুত্তর ছিলাম ব’লে কিছু মনে করো না। হাতে এখন নানা কাজ; এবং উক্ত পত্রের প্রসঙ্গ যেহেতু মুখ্যত আমারই রচনা তাই সে-বিষয়ে নিশ্চয়োক্তি আমার পক্ষে আশোজন। অবশ্য মণীন্দ্র রায় আমার সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই, এবং এই মত-বিরোধের কারণ এই নয় যে তিনি আমার ছিদ্রাবেশে বদ্ধপরিকর, এর কারণ এই যে তিনি কাব্য সম্পর্কে যথেষ্ট ভেবে দেখার অবসর এখনও পাননি, এবং নিজের পক্ষে যে-সকল নজির তিনি উদ্ধার করেছেন তার

‘অন্য ব্যাখ্যাও হয়তো সম্ভব। তৎসঙ্গেও একথা আমি ভালো করে জানি যে আমার সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তে যত লোকের সায় আছে, ওই বিষয়ে অল্পণ সরকারের সিদ্ধান্তে তত লোকের সমর্থন নেই; এবং সেইজন্যে যে যে জায়গায় তোমার মতামত মণীন্দ্র রায়ের অনুগামী, সেখানে ভুলের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প।’ অতঃপর আমার সমাজতত্ত্ববাদ নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ : ‘পক্ষান্তরে তোমার সামাজিক আদর্শ আমার বিচারে ভয়ানক ভ্রান্ত; এবং তথাকথিত বুর্জোয়া দার্শনিকের সম্বন্ধে তুমি যে হঠোক্তি করেছ, তাতে এই কথারই প্রমাণ পেলুম যে তাঁদের লেখার সঙ্গে এখনও তোমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি। প্রচারকের ওজস্বিনী বক্তৃতায় কান না দিয়ে এবং নিজের ভাবপ্রবণ পক্ষপাতে একদেশদর্শী না হয়ে, যদি স্বচক্ষে তথা বিনয় সহকারে গতচল্লিশ বছরের ইতিহাস পড়ো তাহলে গণতন্ত্রের শোচনীয়তা তোমার কাছে ধরা দেবে না, তুমি বুঝবে যে গণতন্ত্রের অভাবেই জার্মানির মতো আশ্চর্য জাতি দু-দুবার যুদ্ধে হেরেছে। পাশ্চাত্য সমাজে পুঞ্জিবাদীদের অপ্রতিহত একাধিপত্য যে কিংবদন্তী তার সাক্ষ্য মার্কিনের ইতিহাসেও প্রচুর; এবং তথ্যমূলক বিশ্লেষণের পরে তুমিও হয়তো মানবে যে একনায়কত্বের যে-সংজ্ঞা তুমি দিতে চাও, তা ঠিক হোক বা না হোক, তাতে সাধারণের মঙ্গল মোটেই নিশ্চিত নয়। তুমি যখন সাম্যবাদী নও, অর্থাৎ ওই মত যখন তোমার ধর্ম হয়ে ওঠেনি, তখন ম্যাক্স ইস্টম্যান, এড্‌মন্ড উইল্‌সন, সিড্‌নি কুক, আস্‌বের কাম্বু, বর্টরেণ্ড রাসেল ইত্যাদির বিরুদ্ধে সমালোচনা প’ড়ে দেখা উচিত। আশা করি ভালো আছে? এখন তুমি জলপাইগুড়িতে কেন? কবে এ-দিকে আসছ?

ইতি

৮ এপ্রিল ১৯৫৪

ভবদীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।’

লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রত্যেকবারই লেখার তারিখ চিঠির শেষে দিতেন এবং তার পরেই সোজা নিজের নাম দস্তখত না করে ‘সভাপতি’ বা ‘বংশবদ’ বা ‘ভবদীয়’ বা গ্রাহকের সঙ্গে প্রেরকের সম্পর্ক-দ্যোতক কোনও শব্দ যোগ করতেন।

এই ৮ এপ্রিলের চিঠি থেকে সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ পরিষ্কার অনুধাবন করা যায়। বিরুদ্ধ মতের প্রতি ধৈর্যশীল ছিলেন, নিশ্চয়োক্তি পুরাঙ্কমুখ, সাহিত্য বিশেষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে বিচারে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি, অন্যকে নিজস্ব চিন্তায় প্রণোদনা দেওয়ার ব্যাপারে অক্লান্ত, এবং সমস্ত বক্তব্যকে উষ্ণ অন্তরিকতায় উপহ্বাপনে সহায়। এই সঙ্গে এটাও জানাতে চাই যে তাঁর প্রতিটি চিঠির কাগজ-খামের নির্বাচন থেকে হাতের সোশা, অনুচ্ছেদ ভাগ, ভাষার বিশ্বাস, পুরো চিঠির পারিপাট্য রচনা সব

কিছুতেই থাকত যত্নের ছাপ তথা গুরুত্ব আরোপের প্রমাণ। যে-চিঠির জবাব দিতেন সে-চিঠির কোনও অংশের বা মন্তব্যের উপর প্রতিক্রিয়া জানাতে ভুলে গিয়ে থাকলে আবার তার উল্লেখ করতেন। যেমন আমার এই চিঠিতে সদ্য প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’র সংকলনে অমিয় চক্রবর্তীর প্রতি সম্পাদকের অতিরিক্ত পক্ষপাত সন্দেহে কিছু মন্তব্য ছিল। আমার তখনও মনে হত এখনও মনে হয় যে অমিয় চক্রবর্তীর অধিকাংশ কবিতায় চোখের সামনে ভেসে ভেসে বেড়ানো দৃশ্যের কাব্যিক বর্ণনা যতটা আছে এবং বর্ণনার চোখ-ভোলানো চমৎকারিছে হৃদকে দুমড়ে মুচড়ে দেবার ঝোক যতটা আছে ততটা হৃদ মেনে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ নেই। অবশ্যই ‘শিল্প’, ‘আয়না’, ‘রাখিয়াপন’, ‘কৈদেও পাবে না তাকে বর্ষার অঙ্কন জলধারে’ প্রভৃতি অসাধারণ কবিতা, কিন্তু সংকলিত তাঁর আরও অনেক কবিতা নিতান্তই দৃশ্যকাব্য। সে-চিঠিতে ঠিক কী লিখেছিলাম মনে নেই তবে আমার এ-ধারণার খুব বেশি বদল হয়নি যে পর্যটক কবির দোষগুণ দুটোই তাঁর মধ্যে বর্তমান। ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’ বইখানি সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম তার জবাবে সুধীন্দ্রনাথ মূল চিঠি শেষ করার পরে যোগ করলেন, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত সংস্করণ পেয়েছি বটে কিন্তু এখনও পড়িনি। তাই সে-বিষয়ে কিছু বললুম না। অনেক বিচক্ষণ পাঠক অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় অভিনব রসের সন্ধান পেয়ে থাকেন।’

এই চিঠিতে আমার সামাজিক আদর্শ নিয়ে সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্যে আমি দমে না গিয়ে আমার বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেলি আর সেটা পাঠিয়ে দিই ‘নতুন সাহিত্য’ পত্রিকায়। আমার সন্দেহ যে সেটি মনোনয়নের ব্যাপারে তরুণ সান্যালের হাত ছিল। ‘নতুন সাহিত্যের’ জ্যেষ্ঠ ১৩৬১ সংখ্যায় সেটি ‘স্বীকৃতি’ নামে প্রকাশিত হয়, শিরনামের নিচে বঙ্কমীর মধ্যে লেখা ছিল ‘সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শঙ্কাস্পদেবু।’ কবিতাটি পড়ে ৩১ জুলাই ১৯৫৪ তিনি লেখেন, ‘তোমার চিঠি ও কবিতা পেয়ে খুশী হলুম। আশাকরি বন্যার বিপদ এতদিনে কেটে গেছে—গত তিন-চার দিনের সংবাদ ভাবিয়ে তুলেছিল। তুমি ও তোমার বাড়ির সকলে খুব মুক্তিলে পড়েছিলে নিশ্চয়ই।’ তখন জলপাইগুড়ি শহরে খুব বন্যা হত এবং আমাদের ও হাসপাতালের রাস্তাঘাট প্রায়ই ডুবে যেত জলে। বন্যার বিষয়ে মন্তব্যের পরের অনুচ্ছেদই লিখলেন, ‘তোমার কবিতাটি দু-তিনবার মন দিয়ে পড়েছি। তোমার বক্তব্য আমার সায় নেই, তা তুমি জানো। কিন্তু এই বক্তব্য তোমার মধ্যে যে-আবেগ জাগায়, তার পরিচয় কবিতায় ধরা পড়ে, এবং সেইজন্যে তর্ক সত্ত্বেও এটি রসরচনা। হৃদেও মোটের উপর ভালো লাগল; তবে দু-এক জায়গায় উচট খেতে হয়; এবং প্রথম পর্বেই হৃদের স্বরূপ ধরতে পারা উচিত ছিল।

তা অন্তত আমি প্রথম পাঠে পারিনি; এমন কি কয়েক সেকেন্ড বুঝতে কষ্ট হয়েছিল রচনাটি গদ্যে না পদ্যে লেখা। আমার মত, হৃদ-সম্বন্ধে এ-রকম সংশয় বাঞ্ছনীয় নয়; বিশেষ করে শুরুতে পাঠমাত্র পরিষ্কার হওয়া উচিত তুমি কী ছন্দে লিখছ।' পরে যখন আমার প্রথম কবিতার বই 'দ্বিতীয় পৃথিবী' বেরোয় তখন এক কপি তাঁকে পাঠিয়ে দিই এবং পাওয়ামাত্র, সেদিনই, ১ মার্চ ১৯৫৬, তিনি লিখলেন, 'দ্বিতীয় পৃথিবী মাত্র উলটে দেখেছি—তাতে যতটুকু চোখে পড়ল তা মনোজ্ঞ। বড় কবিতাটি তো আগেই পড়েছিলুম এবং প'ড়ে ভালো লেগেছিল তাও বোধহয় জানিয়েছিলুম।' এর থেকে বোঝা যাবে যে শিল্প বা কাব্যের বিচারে প্রসঙ্গ বস্তুর চেয়ে প্রকাশ-ভঙ্গিই ছিল তাঁর কাছে প্রধান গণ্য বিষয়। পরে আমিও উপলব্ধি করি যে ত্রুষ্কভের অধীনেও সোভিয়েত রাশিয়া যে সাম্যবাদ প্রবর্তন করতে চেয়েছিল তা সাম্যবাদের প্রচ্ছদে আর এক ধরনের দমনবাদ যার পরাকাষ্ঠা দেখা যায় ১৯৫৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে হাঙ্গেরির স্বাধীনতা স্পৃহাকে ধ্বংস করার জন্য সৈন্য প্রেরণে। আমি যদিও সাধারণভাবে সেই সংস্কৃতির পক্ষপাতী ছিলাম যে, সংস্কৃতির মৃত্যুর নিদান হৈঁকেছিলেন ক্রিটোফার কডওয়েল কিন্তু সমাজব্যবস্থার আদর্শ রূপ তখনও প্রত্যাশা করছিলাম স্টালিনোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শে। তাই হাঙ্গেরিতে সৈন্য প্রেরণের ঘটনাকে ভেবেছিলাম জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের আয়োজন এবং সুধীন্দ্রনাথ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, অম্লান দত্ত প্রমুখ যখন সেই রুশ অভিযানের প্রতিবাদ করেন তখন আমি তাঁদের প্রতিবাদের প্রতিবাদ করি। এই প্রতিবাদের উত্তরে তিনি আমাকে লিখলেন, 'তোমার ১৮ তারিখের চিঠির জবাব দিতে দেরী হল ব'লে কিছু মনে কোরো না। আমাদের ফ্ল্যাটে মেরামত হচ্ছে, কাগজ-পত্র কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিল তার ঠিক ছিল না, এমনকি এমন একটু পরিষ্কার জায়গা পাচ্ছিলুম না, যেখানে বসি।' এর পর আসল কথা। 'হাঙ্গেরী-সংক্রান্ত আমাদের প্রতিবাদ তোমার কল্পমে যে-প্রতিবাদ জাগিয়েছে, তা প'ড়ে স্তম্ভিত হয়েছি। সে-বিষয়ে আরও কথা কয়ে লাভ নেই, সময়েরও অভাব।' ব্যাস, তাঁর ভর্তসনা ওইটুকুই। এবং ওইটুকু বলেই তা বিরাট আকারে মনের উপরে এসে পড়ল। আরও জানাবার কথা এই যে তার পরের অনুচ্ছেদেই লিখেছেন, 'তোমার বন্ধু কলকাতায় এলে তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো—আমাদের অফিসকে বলব তাঁকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে।' এই চিঠির তারিখে ২৮ নভেম্বর ১৯৫৬। আমার অভিজ্ঞতা আছে, একজন বিখ্যাত উপন্যাসিক ভারতের ইতিহাস ও কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা নিয়ে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন আর আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম সাপ্তাহিক দর্পণ পত্রিকায়। তিনি ভীষণ রেগে পোস্টকার্ড লিখেছিলেন যেন আমি তাঁর

সঙ্গে যোগাযোগ না রাখি। কিন্তু পরে ডি. এম. লাইব্রেরিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বুক জড়িয়ে ধরেছিলেন। ইনিও খুব বড় মাপের মানুষ ছিলেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ শুধু বড় মাপের মানুষ ছিলেন না, তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাও ছিল অপার। ওই যে আমার জলপাইগুড়ির বন্ধুর তাঁর ওখানকার কর্মস্থল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অপিনিয়ন-এর অফিসে চাকরি বা কাজের ব্যাপারে তাঁর সাধ্যমতো করার আশ্বাস দিয়েছিলেন তা তাঁর মহানুভবতারই পরিচায়ক। একই সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র ভর্ৎসনা আর ওই রূপ ভরসাদান আর কে করতেন জানিনা।

আগেই উদ্ধৃত করেছি তাঁর একটি চিঠি যাতে তিনি ‘স্বচক্ষে তথা বিনয়সহকারে’ ইতিহাস পড়ার কথা লিখেছিলেন। রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্বন্ধে মতামত গঠনের ব্যাপারে এটাই ছিল তাঁর শিক্ষা। পরের মুখে ঝাল না খেয়ে নিজে যাচাই কবে দেখা। তা ছাড়া তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ছিল অধ্যয়নে। ১৯৫৪-তে আমি বিশ্বভারতী থেকে পাশ করে কলকাতায় ইতিহাসে এম.এ ক্লাসে ভর্তি হই। তখন প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম আর তিনি একদিকে টোমাস মান-এর জোসেফ অ্যাণ্ড হিস ব্রাদার্স, লোটে ইন হাইমার, আদ্রে জিদ্-এর দি ইমমরালিস্ট, কাঙ্ক্ষ্য-র দ্য প্লেগ প্রভৃতি উপন্যাসের নাম করতেন আবাব অন্যদিকে মিলোভান জিলাস-এর দ্য নিউ ক্লাস প্রভৃতি সমাজ বিজ্ঞান বিষয় আলোচনা, পড়ার জন্য পরামর্শ দিতেন। প্রকৃতপক্ষে প্লেগ উপন্যাসখানি বাজারে পাইনি শুনে উনি নিজের কপিস্থানি দিয়ে কথা আদায় করে নেন যে কবে সেটা তাঁকে ফেরত দিয়ে যাব। বেশ চলছিল কলকাতায় আমার এম. এ পড়া। পুঙ্খের ছুটিতে জলপাইগুড়ি গিয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। গলা থেকে অকস্মাৎ প্রচুর রক্তপাত। ডাক্তার বললেন, মাস ছয়েক শুয়ে থাকতে হবে। শুয়ে শুয়ে বেতারে শুনলাম জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি। সঙ্গে সঙ্গে দুজনকে দুটি চিঠি দিলাম। দুদিন পরে আমার বন্ধু বনবিহারী আমাকে দেখতে এসে বলল, জীবনানন্দের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেদিন আমি ঘুমোতে পারলাম না। সেদিনই বা তার পরের দিন সুধীন্দ্রনাথের চিঠি পেলাম। সেটা এই—‘তোমার চিঠি পেয়ে যদিও খুশী হয়েছি, তবু তুমি অসুস্থ জেনে খুবই ঋণাত্মক লাগল। অল্প বয়সে হু মাস সময় এমন কিছু নয়; এবং সে-সময়, বাড়ি ব’সে থাকলেও তুমি নষ্ট করবে না তা আমি জানি। তবু রোগভোগ অল্প বয়সেই দুঃসহ, এবং আজকের দিয়ে অনাবশ্যকও হওয়া উচিত। যাহোক আশা করি আগামীবারের পরীক্ষায় কারণ ধরা পড়বে, এবং তার পরে যথোচিত চিকিৎসার ফলটি হবে না। ‘সে-দিনের কবিতাপাঠ তোমার পছন্দ হয়েছে শুনে উল্লসিত হয়েছি।

বেতারের কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন যে অপ্রকাশিত কবিতা পড়ি। অপ্রকাশিত মূল কবিতা হাতে ছিল না ব'লে অনুবাদই পড়তে হলো। 'আত্মপরিচয়' নামক শেষ অনুবাদটার আদিপুরুষ হইনে—তুমি ঠিকই শুনেছিলে। অন্য দুটো গ্যেটে অবলম্বনে লেখা। তিনটিই আমার আগামী বই 'প্রতিধ্বনি'তে থাকবে। সে-বই আর মন্ডখানেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু আধুনিক কালে যা উচিত, তা বিরল।

“জলার্ক” এখনও পাইনি আজ-কালের মধ্যে নিশ্চয়ই আসবে। এ-বারে শারদীয়া পাঁচ-ছানা কাগজে আমার কিছু কিছু লেখা আছে; কিন্তু এক আনন্দবাহার ছাড়া বাকি অনুবাদ। ইতি ১৬ অক্টোবর ১৯৫৪।

আমার অসুস্থতার সমস্ত লক্ষণ মিলে যাচ্ছিল যক্ষ্মার সঙ্গে কিন্তু জ্যাবরেটরির পরীক্ষায় ধরা পড়ছিল না। আর জলপাইগুড়ির একমাত্র এক্স-রে মেশিনটা তখন খারাপ। তাই মা আমাকে নিয়ে কলকাতায় এসেন। তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেখতে এলেন ও তাঁর মুখেই জীবনানন্দের মৃত্যুখবর পেলাম। সুভাষ বা সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের কোনও মিল ছিল না, কিন্তু দুজনেই সে মৃত্যুখবর পেয়ে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য জীবনানন্দের কথা কিছু লেখেননি, তবে আমার কলকাতা থেকে লেখা চিঠির উত্তরে লিখলেন, ‘তোমার ঠিকানা দেখে বুঝলুম, তুমি এখন কলকাতায়। স্বাস্থ্য কেমন? বাড়ি থেকে বেরোও কি? যদি ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি পেয়ে থাকো, তাহলে সামনের সপ্তাহে পাঁচটা নাগাদ কোনও এক দিন আমাদের ওখানে এসো; সাক্ষাতে কথা হবে।’ কলকাতায় ড. অরুণকুমার নন্দী ছিলেন মায়ের বন্ধু ও নীলরতনের মেডিসিনের অধ্যাপক। সমস্ত রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে তিনি যক্ষ্মাই নির্ণয় করলেন, কিন্তু স্পুটাম-এ রোগ ধরেনি। ড. নন্দীর চিকিৎসা-ব্যবস্থা নিয়ে আমরা জলপাইগুড়িতে ফিরে এলাম। এসেই ‘জলার্ক’র জীবনানন্দ সংখ্যা বের করলাম। তার পরেই শয্যাশায়ী। ১৯৫৫-র ৩রা জানুয়ারিতে সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন, ‘রোগের বিরুদ্ধে ধৈর্যধারণ করা ছাড়া উপায় কি? জলপাইগুড়ির আবহাওয়া শুনেছি স্বাস্থ্যকর, এবং এখন সময় তো অনুকূল। তোমার বয়সে আমিও অনেক দিন অসুস্থ ছিলাম; তখন যা পড়াশুনো করতে পেরেছি। যাই হোক, সাবখানে থেকে, এবং যথাসম্ভর সেরে ওঠো।’ মা নিজে ডাক্তার, সর্বদা ব্যস্ত। মায়ের কোয়ার্টার্স হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে। বাড়ির সামনে দিয়ে যে বড় রাস্তা গেছে তার ওপারেই মস্ত ঝিল, শিরীষ সারি, তার পেছনে একদিকে দিগন্ত ব্যাপী মাঠ, অন্যদিকে ফার্মেসি ট্রেনিঙ্ক স্টোর বা দু-বছর আগে ছিল ব্রিটিশ আমলের মেডিক্যাল স্কুল। সবে স্ট্রিপটোমাইসিনও বেরিয়েছে। ঐতিহ্যসম্মত চিকিৎসার সঙ্গে আধুনিক ঔষধের চিকিৎসায় আমি তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে

লাগলাম। ওই সেন্টারে তখন কার্তিক লাহিড়ি পড়াতেন রসায়ন বিদ্যা। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন সাহিত্যের মানুষ। সেন্টারে পড়ানোর কাজ সেরে রোজ একবার আমার দেখতে আসতেন। অন্যান্য বন্ধুরাও আসতেন। মাস তিনেক পরে হাসপাতালের এক্স-রে মেশিনটা আবার চালু হলে ছবি নিয়ে দেখা গেল কতস্থান সারতে শুরু করেছে। সে-কথা জানাতে সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন, ‘তোমার স্বাস্থ্যের খবরে যৎপরোনাস্তি খুশী হয়েছি। তুমি সেরে উঠবে তা আমি নিশ্চয় জানতুম কিন্তু এত শীঘ্র সুস্থ হয়ে যাবে এমন আশা করতে ভয় পচ্ছিলুম।’ সাবধানে থাকার বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে যোগ করলেন, ‘“প্রতিধ্বনি” শুনেছি ছাপা শেষ হয়েছে। তাহলেও দিন-পনেরোর আগে বইখানা আমার হস্তগত হবে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। পেলেই তোমাকে পাঠাব।’ এই লেখাটা লিখতে লিখতে আমার ‘প্রতিধ্বনি’ বইখানা বের করে দেখলাম তাতে সুধীন্দ্রনাথের দস্তখতের তারিখ ৬.৪.৫৫। জীবনানন্দ-সংখ্যা প্রকাশের পরেই ‘জলার্ক’ পত্রিকা বন্ধ করে দিই—কিছুটা আমার অসুস্থতার জন্য, কিন্তু প্রধানত জীবনানন্দ ছিলেন ‘জলার্ক’ প্রকাশের পেছনে সূর্যের মতো।

যাহোক প্রচুর বিশ্রাম ও ঔষধের দৌলতে আমি ছ-মাসের মধ্যেই রাস্তা পেরিয়ে ঝিলের ধারে ও মাঠে বেড়াতে আরম্ভ করি। তারপর ১৯৫৫-র নভেম্বরে আসি কলকাতায়। থাকতাম সেন্ট্রাল পার্কে দিদিমার কাছে আর পাশেই মায়ের সদ্য কেনা জমিতে একটি ছোট বাড়ি বানানোর কাজ তদারকি করতাম। তখন ‘প্রতিধ্বনি’র একটা সমালোচনা অধুনা-সুপ্ত ‘দীপিকা’ পত্রিকায় লিখি। তারপর সেটি কপি করে পাঠিয়ে দিই সুধীন্দ্রনাথকে। ১ মার্চ ১৯৫৬ তারিখে তিনি লিখলেন, ‘“প্রতিধ্বনি”র উদ্ধৃত সমালোচনার জন্যে আমার কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জেনো। রচনাটি খুবই সুস্বাদু; তবে আমার প্রতি তোমার যে পক্ষপাত আছে তা তাতে অপ্রকট নয়।’ দুঃখের বিষয় ১৯৬৪ সালে আমরা যখন সেন্ট্রাল পার্ক ছেড়ে যাই তখন অনেক কিছু ছেড়ে যাই এবং সে সময় আমাদের অনেক কাগজপত্র চিরতরে হারিয়ে যায়, সেসবের সঙ্গে ‘প্রতিধ্বনি’, ‘দশমী’, ‘জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা’র আলোচনা প্রভৃতিও ছিল। ‘দশমী’র সমালোচনা লিখেছিলাম ‘সাহিত্যপত্রে।’ সেটি পড়ে ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬-তে লিখলেন, ‘“দশমী” প্রসঙ্গে তুমি যা বলেছ, সে-বিষয়ে কিছু লেখা আমার পক্ষে শক্ত। তবে অতটা প্রশংসা নিশ্চয়ই আমার প্রাপ্য নয়। আবার লিখলে, আমার বিরুদ্ধে মতামত কি, তা আরও বিশদ কোরো। তুমি নিজেই জানিয়েছ যে তোমার বর্তমান প্রবন্ধ একটু অগোছাল; কিন্তু প্রায় সবই যুক্তিসহ, এবং আমার মনোভাব ও কাব্যদর্শ বোঝার জন্যে তোমার নিরন্তর চেষ্টা আমার পক্ষে গর্বের বিষয়’ এসব চিঠি

থেকে বোঝা যায় যে তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসা করে লিখলে তিনি কৃতজ্ঞ বোধ করতেন, কুণ্ঠিতও বোধ করতেন এবং বিরুদ্ধ মতামত থাকলে তিনি কৌতূহল বোধ করতেন বিশদভাবে কারণ জ্ঞানবার জন্য সম্ভবত সংস্কারের সম্ভাবনামূলিকে অনুধাবনের অভিপ্রায়ে। তাঁর সমস্ত চিঠিতেই এক অভিজাত বিনয় ও ভদ্রতার পরিচয় দেখা যায়। ওই ১/৩/৫৬-র চিঠিতেই লিখেছিলেন, ‘আমরা ১৩ (ফেব্রুয়ারি) তারিখে কলকাতা পৌঁছেছি প্রায় ন মাস পরে। মুখ্যত ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্পেন, ইটালি, গ্রীস ও ইজিপ্ট—এই কটা দেশে অধিকাংশ সময় কেটেছে, যদিও এক স্পেন ছাড়া অন্যত্র বেশী ঘোরাঘুরি করতে পারিনি। ভ্রমণকাহিনী লেখা আমার আসে না—এবং অনেক বছর আগে যখন প্রথম দেশের বাইরে যাই তখন অল্প বয়সের গুণে ও অপরিচয়ের বিষ্ময়ে মানস প্রতিক্রিয়া যদিও খুব সুগভ ছিল, তবু আমার অভিজ্ঞতা যে অত্যন্ত সাধারণ তা বুঝতে কষ্ট হয়নি। সেই আত্মজ্ঞান আজ আরও জোর পেয়েছে।’ তার পরে তাঁর কথা ছেড়ে আমার কথায় এসেছেন। ‘সে যাই হোক, তুমি নিজে কেমন আছ? কলকাতায় যখন রয়েছ তখন বোধ হয় ভালো। এখন কি তুমি বাইরে যাও? আমাদের ফ্ল্যাটের পর্বতপ্রমাণ সিঁড়ি ওঠার অনুমতি আছে? থাকলে একদিন এসো। নচেৎ হির হয়ে বসতে পারলে আমিই তোমার সঙ্গে দেখা করে আসব।’

১৯৫৬-র ২৬ মার্চ তারিখের চিঠিতে সুধীন্দ্রনাথ এক স্থানে লিখেছিলেন, ‘আমার সমস্ত লেখাই তোমার মনে ধরবে এমন প্রত্যাশা আমার নেই। বরঞ্চ যখন মনে পড়ে যে তোমার আর আমার মধ্যে মতান্তরের অন্ত নেই। তখন যতখানি তোমার ভালোলাগে, তা দেখেই আমি আশ্চর্য হই এবং কৃতজ্ঞবোধ করি।’ আর আমি আজও এই কথা মনে করলেই অভিভূত হই যে তাঁর মতো কর্মী কবি ও ব্যস্ত মানুষ নতুন করে কাব্যে ও সাহিত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠার এবং অধ্যাপক রূপে পরিচয় নির্মাণের কালে আমাকে কীভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই সময় তিনি ‘সাহিত্যপদ্রে’ একটি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখছিলেন যেটির উপরে কিছু বিরাগ মস্তব্য করে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলাম। তার উত্তর না পেয়ে ধরে নিয়েছিলাম যে তিনি বোধহয় আমার মতামতে অসন্তুষ্ট হয়ে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। কিন্তু তাঁর ১৯৫৭-র ২২ জানুয়ারির চিঠিতে জানলাম ‘অকাজের চাপ অফুরন্ত’, সেজন্য জবাব না দেওয়ার অপরাধ যেন না নিই। আর লিখেছেন, “‘সাহিত্যপদ্রে’র লেখাটা সম্বন্ধে দরহতার অভিযোগ একাধিক সমঝদারের মুখে শুনেছি; এবং সে-অপ্রাঞ্জলতার ব্যাখ্যা আমার অক্ষমতা। অর্থাৎ যে-বিশ্বাসের উপরে আমার সাহিত্যবিষয়ক রচনার ভিত্তি, তাই এখানেও ফ্রিয়াশীল; এবং সে-বিশ্বাস কাব্যবিবেচনার বেসায় যদি বাধা সৃষ্টি না করে, তবে অন্যত্রও তাকে প্রাঞ্জল লাগাই উচিত।

সেটা লাগছে না হয়তো আমার রীতি দর্শনালোচনার উপযুক্ত নয় ব'লে।' এটা তাঁর রচনার দোষ দেখিয়ে চিঠির একটা উত্তর। এর অল্প কিছু দিন পরে আমি কাম্যুর 'দ্য মিথ অফ সিসিক্স' বইটি পড়ে তাঁকে আমার প্রতিক্রিয়া জানাই। উত্তরে ৫৭-র ২০ মে তিনি লেখেন, 'কাম্যু-র বই তোমাকে অভিভূত করেছে জেনে খুব খুশী হলাম; আরও খুশী হতুম তাঁর প্রভাবে যদি তোমার ভাববিলাসী আশাবাদ চিড় খেত। তবে প্রত্যাশার মধ্যে ফাঁকি কোথায় তা ধরতে পারার ব্যয় এখনও তোমার হয়নি। তাই তোমার সম্বন্ধে আশঙ্কও আমি হতাশ নই।' এই চিঠিতেই তিনি জানিয়েছিলেন, 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামক-রূপে দেখা দিয়েছে ব'লে, সে-অঞ্চলে আমার ভ্রমণ উপস্থিত বন্ধ করে দিতে হলো। আমেরিকা যাওয়ার আগে ওদিকে ঘুরে আসতে পারব কিনা বলা শক্ত। না পারলে সেপ্টেম্বরের শুরু পর্যন্ত দেশে আছি।' সেবার তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর রূপে আট-ন মাস যুক্ত ছিলেন। ফিরে এসে যোগ দিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমিও তখন কলকাতায় এবং যথেষ্ট সুস্থ, ফলে তাঁর কাছে মধ্যে মধ্যে আলোচনার জন্য যেতাম, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান স্বাভাবিক কারণেই কমে যায়। যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীর গল্পও করতেন, তবে অমিয় দেব-এর কথাই সবচেয়ে বেশি বলতেন। অনেকখানি তাঁরই উপদেশে আমিও আবার ইতিহাসে এম এ পড়া শুরু করি ওই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি বলেছিলেন যে আমি যখন যাদবপুরেই থাকি তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়া উচিত, কারণ আগের মতো বাড়ি থেকে দূরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত যাতায়াত করা আমার স্বাস্থ্যে না-ও সহিতে পারে।

আমার কাছে এখনও সুধীন্দ্রনাথের সেশা ২৭ খানি চিঠি আছে। এইসব চিঠিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের নানা দিক প্রকটিত। এখানে সবগুলির উল্লেখ করা গেল না, সবগুলি থেকে উদ্ধৃতিও দেওয়া গেল না। তবে একজন তরুণের মনে বিশ্ব-পরিস্থিতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতনতা জাগাবার জন্য তাঁর আগ্রহের পরিচয় এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই বাক্যে যে আমি সূত্রচলিত 'সচেতনতা'-র বদলে 'সচেতন' শব্দটি ব্যবহার করেছি, এটাও সুধীন্দ্রনাথের শিক্ষার ফল। 'ত্ব' বা 'তা' প্রত্যয়যোগে কৃত্রিম শব্দ রচনাকে তিনি পরিহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। এবং সামগ্রিকভাবে তিনি ছিলেন বৈষয় ও চিন্তা, যত্ন ও যুক্তি, নিষ্ঠা ও স্নেহ, সংস্কৃতি ও সুরচির এক জীবন্ত বিগ্রহ। অপরের শূণ্য সন্মানেও তিনি ছিলেন সর্বদা উৎসুক। তাই তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের জাদুতে কী পরিমাণ বশীভূত হয়েছিলেন তার সাক্ষ্য দেওয়ার মতো ব্যক্তির সংখ্যা এখনও প্রচুর।

‘বস্’

বাসব সরকার

অনেকদিন হয়ে গেল, প্রায় ৪৬ বছর। সেটা ছিল ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি একটা দিন। তারিখটা মনে পড়ে না। তখন আমরা কয়েকজন বেকার, যেমন যাঁটে সকাল সন্ধ্যা টিউশনি করি, আর সারাটা দিন কলক্স স্ট্রীট কফি হাউসে কাটাই। বাড়িতে থাকে তখন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখন কফি হাউস খুলতো বেলা সাড়ে এগারোটায়, আর বন্ধ হতো সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। কয়েকজন বন্ধু মিলে সারাটা দিন সেখানেই কাটাতাম। ঘণ্টাখানেক অন্তর এক কাপ কফি আর তার সঙ্গে প্রচুর জল। ছাত্র জীবনের সুরু থেকেই, ১৯৪৬ সালে কলেজে ঢোকার সময় থেকেই, কফি হাউসে যাতায়াত। বেয়ারারা সবাই চিনতো। তাই টেবিল আটকে বসে থাকলেও গুঁঠার তাগিদ দিতো না। চেনা লোকজনদের প্রতি হয়তো সমবেদনা কিছু ছিল। আর এক ঘণ্টা অন্তর এক কাপ কফি নিয়ে কফি হাউসের ম্যানেজমেন্টকেও নিরন্তর রাখা যেতো।

সেই রকম একটা দিনে আমরা বন্ধু বোথায়ন এসে বললে একটা চাকরি আছে, বোরাঘুরি, খাটাখাটনির কাজ। আমি চাইলে সে কথা বলতে পারে। অন্যদের না বলে চাকরির কপটা আমাকে বলার দু’একটা কারণও ছিল। আমার অন্য বন্ধুরা তখন এ. জি. বেসল, ডি. এ. জি. পি. টি. প্রভৃতি আপিসে দরখাস্ত করে, পরীক্ষা কিম্বা ইন্টারভিউ দিয়ে ডাক পাওয়ার আশায় বসেছিল। আমি হয় কলেজে মাস্টারী নয়তো তার প্রতীক্ষায় বসে থাকতে মনস্থির করেছিলাম। বোথায়ন যে চাকরির কথা বলে সেটা কলেজে না হলেও, দশটা-পাঁচটার সরকারি চাকরি ছিল না। আরো একটা কারণ ছিল। তার আগের বছরেই বোথায়নের বাবার এক স্কুলে গড়পায়ে আমি মাস ছয়েক হেডমাস্টারি করেছিলাম। অস্থায়ী পদ, কারণ হেডমাস্টার মশায় ছুটিতে গিয়েছিলেন। ফিরে আসায় আমার মাস কাবারে মাইনে পাওয়া প্রথম চাকরিতে ইতি হয়ে যায়। বোথায়নের কথায় আমি তখনই রাজী। তারই দিন দুয়েক পরে তার সঙ্গে গেলাম একটা আপিসে। ঠিকানা লেসলি হাউস, চৌরঙ্গী, দো-তলায়। লেসলি হাউস বাড়িটা এখনও আছে। তার উত্তরে গায়ে লাগানো তখনকার বিখ্যাত ফার্পো হোটেল, আর দক্ষিণে একটা প্যাসেঞ্জ ছেড়ে টাইগার সিনেমা হল। লেসলি হাউসের একতলায় চৌরঙ্গীর উপরে ছিল তখনকার বিখ্যাত অস্টিন

মোটর গাড়ির শো-রুম। কথা মতো ঠিক সময়েই গিয়েছি। আপিস, তার সেকেন্সন, কর্মকর্তা সম্পর্কে বোখায়ন খুব বেশি কিছু বলেনি। বোখায়ন আসার সঙ্গে সঙ্গেই লেসলি হাউসের দো-তলায় ওঠা গেল। টানা লম্বা বেশ বড়োসড়ো একটা করিডর। একদিকে সারি সারি ঘরে নানা আপিস। তারই একটায় সুইং ডোর ঠেসে ঢুকে লম্বা একটা টেবিলে বসে থাকা কিছু লোকের ত্রিভাসু দৃষ্টির সামনে আমাকে বসিয়ে রেখে, বোখায়ন ভিতরে চলে গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যে বেরিয়ে এসে আমায় 'ডেকে নিয়ে গেল ভিতরে।

যে ঘরে প্রথম গেলাম সেটা কাঠের পার্টিশান দেওয়া ছোট লম্বাটে একটা ঘর। তার দু'দিকে দুটো টেবিল। একটা অপেক্ষাকৃত বড়ো টেবিলে দপ্তর সাজিয়ে বসে আছেন ঐক ভদ্রলোক। সৌম্যদর্শন আমাদের চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো মনে হলো। অন্য টেবিলে ঝকঝকে সাদা প্যান্ট সার্ট পরা একটি ছেলে টাইপ মেশিনের সামনে। মাঝখানে প্যাসেজ। সেই ঘর থেকে গেলাম আরেকটা ঘরে। বেশ বড়ো মাপের। সেখানে সুইং ডোর ঠেসে ঢুকেই প্রায় চোখ আটকে গেল একটা মস্তো বড়ো সেক্রেটারিয়েট টেবিলের অন্যদিকে বসে থাকা একজন মানুষের উপর। তিনি কিছুটা অন্যমনস্কভাবে আমাদের ঢোকান পথের দিকে চেয়েই বসে ছিলেন। বোখায়ন বললে, এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। তিনি সরাসরি আমার দিকে চাইতেই আমি হত তুলে নমস্কার করলাম। তিনি সামনের দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে স্থিত হেসে বসতে বললেন। তারপরেই সামান্য দু'একটা প্রশ্ন। আমি কোথায় থাকি, কতোদূর লেখাপড়া করেছি, যে ধরনের কাজের জন্যে গিয়েছি তার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা, কলকাতার বাইরে দরকার হলে যেতে পারবো কিনা ইত্যাদি। আমি দাঁড়িয়েই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হওয়ার পরেই বললেন, ওর কাছে নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে যান আর একটা দরখাস্ত তার সঙ্গে দস্তর অনুযায়ী। সেই প্রথম চোখ ফিরিয়ে দেখলাম সেই বড়ো ঘরটার এক কোণে কাঠের পার্টিশানের পার্শেই আরেকটা একটু ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিলে একজন সুন্দরী মহিলা কাগজে কিছু একটা লিখছিলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন বাঁশি এর নামঠিকানা রেখে দাও। তাঁর নাম যে বাঁশি সম্বোধন সূত্রে সেটাও জানা গেল। নাম ঠিকানা লিখে দেওয়ার সময় শ্রীমতী বাঁশি কেবল বললেন দরখাস্ত যেন দু'একদিনের মধ্যেই দিয়ে যাই। ইন্টারভিউ পর্ব শেষ। আমার প্রশ্নকর্তা ও শ্রীমতী বাঁশিকে নমস্কার করে বেরিয়ে আসছি, দেখলাম ঘরের আরেক কোণে শ্রীমতী বাঁশির টেবিলের উল্টো দিকে আরেকটা টেবিল আছে। সেটা খালি। সেখানে যিনি বসেন তিনি নেই।

প্রথমে যে ঘরে বসেছিলাম সেখানে আসতেই বোধায়ন ও অন্যরা জিজ্ঞেস করলেন প্রায় এক সঙ্গে কি হলো? তখন আমার ধন্দ কাটেনি, কাজটা পেলাম কিনা বুঝতে পারছিলাম না। এরই মধ্যে আরেকজন যে ঘরে ঢুকে ভিতরে চলে গেছে খেয়াল করিনি। হঠাৎ দেখি একজন ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আমার প্রশ্ন করলেন ইংরেজিতে কবে কাছে যোগ দিতে পারি। কয়েক সেকেন্ড সেগেছিল আমার উত্তর দিতে। হয়তো কিছু বেশিও হতে পারে। প্রশ্নটা বুঝে উত্তর দেওয়ার সময় মনে হলো কাজটা পেতে পারি। উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্ন বোধায়নকে দেখিয়ে, ওর কাছে নিশ্চয়ই শুনেছ এখানে মাইনে এবং অন্যান্য অর্থকরী ব্যাপার কি এবং কতো। আমি উত্তর দেওয়ার আগেই বোধায়ন বলে দিল সে সব কথা বলা হয়েছে। বোঝা গেল আমরা প্রথম প্রশ্নকর্তা নিজে সে সব কথা না বলে, আপিসের ভারপ্রাপ্ত আরেকজনকে সেটা জানানোর ভার দিয়েছেন। বোধায়নের পরে আমি শুধু বলেছিলাম সে সব কথা আমার শোনা হয়ে গেছে। তিনি ভিতরে চলে গেলেন। পরে জেনেছি এই লোকটির নাম জনৈক শাস্ত্রী। বাড়ি মধ্যপ্রদেশে, পরে তার সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছিল। তবে শাস্ত্রী বেশিদিন থাকেনি। অন্য কোথাও চলে যায়, বেশি মাইনেতে কিম্বা অন্য কোন কারণে ঠিক ছানি না।

কিছু দিনের মধ্যেই আমি আপিসে যোগ দিলাম। আপিসের নাম ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ওপিনিয়ন। একটি সর্ব ভারতীয় সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ শাখা, এখনকার পরিভাষায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল চ্যাপ্টার'। শাখার ডিরেক্টর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আমার প্রশ্নকর্তা। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর এই এক বছর ন' মাস সুধীন্দ্রনাথের অধীনে আমার চাকরি। তার মধ্যে অবশ্য বেশ কয়েক মাস তিনি ছিলেন না। বিদেশে গিয়েছিলেন। সেই বিদেশ ভ্রমণের কাহিনী পরোক্ষভাবে কোন বন্ধুকে জানানোর সুবাদে সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের আরেকটা দিক দেখেছিলাম। যথাস্থানে সে কথা বলা যাবে। কলকাতায় থাকলে ডিরেক্টর সুধীন্দ্রনাথ নিয়মিত আপিসে আসতেন সকালের দিকে এগারোটার মধ্যে। ডিরেক্টরের পরিচালনগত দায়িত্ব পালন করা ছাড়া আর কি করতেন ছানি না। তবে প্রায়ই চিঠিপত্রের ডিস্ট্রিকশন দিতে শুনেছি। সেগুলি টাইপ হয়ে গেলে দস্তখত করে, পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে তবে যেতেন। দরকার হলে আমাদের মতো বিকেল পর্যন্ত থাকতেন, লাঞ্চের সময় বাদ দিয়ে। লাঞ্চের পরেও তাঁকে আসতে দেখেছি, সকালে না এলে। আমাদের উপরে নির্দেশ ছিল প্রতিটি সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর নিজের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সিখিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার। রিপোর্ট আমরা

জমা দিতাম শ্রীমতী বাঁশীর কাছে। ততোদিনে জেনে গিয়েছি তার পুরো নাম, বাঁশরী মিত্র। স্যার ধীরেন মিত্রের কন্যা। স্যার ধীরেন আমাদের সংস্থার পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

বাঁশী মিত্র আমাদের রিপোর্ট পড়তেন অনুমান করা যায়। কোথাও বক্তব্যে অস্পষ্টতা থাকলে জিজ্ঞেস করতেন। ডিরেকটরকে তিনি সব রিপোর্ট পড়তে দিতেন কিনা জানি না। তবে গোড়ার দিকে সুধীন্দ্রনাথ যে আমাদের সকলের রিপোর্ট পড়েছিলেন, তা বোঝা গিয়েছিল। কারণ রিপোর্টের কোন কোন অংশ কি দেখে অথবা কি ভেবে লেখা হয়েছে, তিনি জানতে চাইতেন। আসলে আমাদের অনেকেই গোড়ায় রিপোর্ট দেওয়াটা নিতান্ত গতানুগতিক ব্যাপার ধরে নিয়ে কিছু মনগড়া কথা লিখি। কিন্তু তাঁকে ফাঁকি দেওয়া যায়নি। ভবিষ্যতে রিপোর্ট দেওয়ার সময় কাজের মধ্য দিয়ে যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে যাতে সেটাই বাগাড়ম্বর ছাড়া লিখতে পারি, এটা ছিল তারই ইশিয়ারী। ততোদিনে আমি সমেত সকলেই জেনে ছিলাম সুধীন্দ্রনাথের কবি পরিচয়। তাই অনেকেই ভেবেছিলাম ভাব জগতে বিচরণকারী কবি মানুষ রোজকার জীবনের তেল নুন লকড়ির সমস্যা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত, নানা দলের নানা নীতির, মত ও পথের দ্বন্দ্ব, এতো সব স্থূল অকবিসুলভ বিষয়ের খোঁজ খবর বিশেষ কিছু রাখেন না। চৌরঙ্গীর সাহেব পাড়ার বাসিন্দা সুধীন্দ্রনাথ যে কঙ্গকাতার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের, শহরতলীর, মফঃস্বলের শহর এমন কি গ্রাম বাংলা সম্পর্কেও যথেষ্ট খোঁজখবর রাখতেন, সেটা আমাদের অনেকেরই অজানা ছিল। তাই আমাদের চালাকি সহজেই ধরা পড়ে যায়। আমাদের প্রথম গাফিলতি, তিনি চালাকিটা ধরার মধ্য দিয়েই বেশ সমঝে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যতের পথে সেটাই যথেষ্ট ছিল। আবার রিপোর্টে কোথাও তাঁর কৌতূহল জাগ্রত করার মতো বিষয় থাকলে তিনি খুঁটিয়ে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। সেই অভিজ্ঞতাও আমাদের হয়েছিল।

আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি এসব কথা বলতেন আলাদা করে। সকলকে নিয়ে একসঙ্গে কথা নয়। সহকর্মীদের চোখে আমরা যাতে অনিচ্ছা কিম্বা স্বেচ্ছাকৃত কোন কারণে ছোট হয়ে না যাই, মনে হয় সেদিকে তাঁর নজর ছিল। এই ধরনের কথাবার্তার সময় আমার মনে হয়েছে, ‘বস’ নয়, আমরা যেন আপিসের প্রবীণ, অভিজ্ঞ সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলছি, যিনি ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে আমাদের মনস্ক করতে, কাজে বেশ পাকা করে তুলতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে এই অভিজ্ঞতা আমার বেশ কয়েকবার হয়েছে। ততোদিনে আমরা আপিসে, কর্মসূত্রেই কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়েছি। আপিসের বাইরে

তার মূল্য কতোটা ছিল, জ্ঞানার সুযোগ হয়নি আদৌ। তাঁর বাড়ির দরজা পর্যন্ত যাইনি কখনো, তাই মানুষ সুধীন্দ্রনাথের পরিচয় আমার অজানা থেকে গেছে। তবু আপিসের ঘনিষ্ঠতা যে কিছুটা হয়েছিল, তার ভিত্তি ছিল আকস্মিক একটা ঘটনা।

আমি যখন সুধীন্দ্রনাথের আপিসে যোগ দিই, তখন আমার সহকর্মীদের মধ্যে অন্তত দুজন ছিলেন যারা সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালি’ চলচ্চিত্রায়ণে সহকারী। তাঁদের একজন সত্যজিৎ বাবুর প্রোডাকশন ম্যানেজার অনিল চৌধুরী, অন্যজন পথের পাঁচালির সহকারী পরিচালক আশিস বর্মণ। আমি যখন আপিসে যোগ দিই, তখন কিম্বা তার কিছুটা আগে পরে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ ‘প্রতিধ্বনি’ প্রকাশিত হয়েছিল। ব্যাপারটা হয়তো এমনিতে আমাদের নজরে পড়তো না। বেশ জমকালো ভাবে নজরে এলো সেদিন, যখন কবি অনুবাদক স্বয়ং আশিসের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের পরিচয় অনেক আগে থেকে এবং গভীরতা সময়ের হিসেবে না হলেও বই উপহার পাওয়ার মতো ঘনিষ্ঠ। তারই কিছু দিন পরে, তখন বোঝায় আমাদের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে, আমরা বাইরে থেকে শুরুর এসে রিপোর্ট দিয়ে কিছুটা হাস্য ভাবে দিন কাটাচ্ছি। আপিস সহ সকলের মেজাজ শরিফ। সেই রকম একটা দিন বিকেলে সুধীন্দ্রনাথ আপিসে ছিলেন খোশ মেজাজে। তখনই আশিসসহ আমরা বেশ কয়েকজন তাঁকে একটা কবিতা আবৃত্তি করার অনুরোধ জানাই। আমাদের প্রথম কাক্সের সাফল্যের খুশি ভাব হয়তো তাঁকেও স্পর্শ করেছিল। কারণ ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর দিল্লী থেকে সর্বভারতীয় বড়ো কর্তা এরিশ্ ডা কোস্টা সাহেবের তারিফের চিঠি তিনি আগেই পেয়েছিলেন। ‘প্রতিধ্বনি’ কাব্যগ্রন্থ আশিসের সঙ্গেই ছিল। তাই কোন বই কাছে নেই বলে সুধীন্দ্রনাথ এড়িয়ে যেতে পারেননি। মনে পড়ে দুটি কবিতা পড়েছিলেন, একটা মালার্মে এবং অন্যটি সম্ভবতঃ হাইনের। একটু এধার-ওধারও হতে পারে, বলা কঠিন এতো বছর পরে।

ঘটনাটা ভুলিনি এতোকাল পরেও যেহেতু সুধীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠের মধ্যে এমন একটা অসাধারণত্ব ছিল যা আমরা আগে কখনো শুনিনি। তখনও আবৃত্তিকার শব্দ মিম্বের পরিচয় তাঁর ঘনিষ্ঠজনের বাইরে অজানা। এর আগে আমাদের পাড়ায় বাগবাজার লাইব্রেরীর দোতলার হলে একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কবি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা পাঠ শুনেছি। পাড়াতেই ঘরোয়া আরেক অনুষ্ঠানে নীহাররঞ্জন রায়ের রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠও শুনেছি। কিন্তু কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের ভিতর থেকে নাড়িয়ে দেওয়ার অভিজ্ঞতা কখনো চাক্ষুষ করিনি। কবির ভাব তন্ময়তা, রূপ তন্ময়তা তাঁর

স্বরক্ষণের শুণে আমাদের মনেও একটা ঘোর সৃষ্টি করেছিল। এর অল্পকাল পরেই তিনি বাইরে চলে যান অনেকদিনের জন্যে। না হলে আমাদের সাহস বেড়ে যেতে পারতো। আমরাও তাঁর কাছে কবিতা পাঠের এমন সংক্ষিপ্ত আসরের জন্যে হয়তো অনুরোধ করতে পারতাম। সেই সুযোগ আর আসেনি।

আপিসে সুধীন্দ্রনাথের পোষাকী চেহারাটা আমাদের কাছে বেশি প্রকট ছিল। সেটা তাঁর ব্যক্তিসত্তার একটা দিক। তাই আপিসের কর্তা হিসেবে তিনি যা কিছু করণীয় তার নৈষ্ঠিক রূপায়ণে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। এর আগে তিনি যে সব কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেখানে যারা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা কি ছিল জানি না। কিন্তু আমাদের আপিসের মতো একটা সমীক্ষা-গবেষণা কেন্দ্রে কি ভাবে কাজ করলে স্কসের মিলিত প্রচেষ্টায় কাজটা যথাসাধ্য ভালো হয়, তিনি তার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের কাজ ছিল নির্দিষ্ট একটা প্রশ্নপত্র নিয়ে নানা মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে মতামত যাচাই করা। প্রশ্নগুলো এমন কায়দায় সাজানো যে পরপর প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হলে উত্তরদাতার চিন্তা ভাবনার একটা আভাস পাওয়া যাবে। কেউ জবাব না দিতে পারেন, জানি না বলে এড়িয়ে যেতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে উন্টেপান্ট জবাব দিয়ে নিজের মতামত, পক্ষপাত গোপন করতে পারবেন না। প্রশ্ন সাজানোর মধ্যে তাই একটা কৌশল থাকতো, যা আমরা সমীক্ষকরা নিজে না বুঝলে প্রশ্নগুলোই ভালো ভাবে করা যেত না। তাই সমীক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপার ছিল। আরেকটা সমস্যা ছিল প্রশ্নগুলো কোথায় অর্থাৎ স্থান নির্বাচন এবং কাকে অর্থাৎ ব্যক্তি নির্বাচন, কিভাবে করতে হবে। সমীক্ষা বিজ্ঞানসম্মত করার জন্যে দ্বিতীয় কাজটা বিশেষ জরুরী ছিল।

প্রথম কাজে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব সুধীন্দ্রনাথ নিজেই নিয়ে ছিলেন। প্রশ্নগুলি নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করেন তিনি, কারো এর পরেও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে, তারও জবাব দিতেন। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর কিম্বা সম্ভাব্য উত্তর কি হতে পারে, সেটা বলতেন না। কারণ আমরা কেউ কেউ তখন সেটাই আপিসের কর্মকর্তাদের মত ধরে নিয়ে কাজটা হাফাভাবে করতে পারতাম। আর দ্বিতীয় কাজের প্রশিক্ষণের জন্যে আনা হয় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে। তখন এই সংস্থা প্র্যানিং কমিশনের পক্ষে দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে নমুনা সমীক্ষা বা Sample Survey করছিল। সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরাও যাতে সমীক্ষার স্থান নির্বাচন এবং উত্তরদাতা নির্বাচন করতে পারি, তার জন্যেই প্রশিক্ষণ দরকার ছিল। মোহনলাল সুধীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বেশ কয়েকদিন এসে আমাদের হাতে

কসমে পদ্ধতিটি শিখিয়ে দিয়ে যান। যতোটা সময় নিয়ে তিনি আমাদের প্রশিক্ষণ পর্ব চালান, সুধীন্দ্রনাথ ততোটা সময় সেখানে থেকে কাজে সহায়তা করতেন। এটা এতো বিস্তৃতভাবে বলার উদ্দেশ্য হলো আপিসের কাজে কর্মকর্তা হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা। সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর প্রাপ্ত উত্তর নানা সারণিতে সাজিয়ে মোটামুটি বিভিন্ন প্রশ্নে মতামতের প্রবণতা বের করাই ছিল আমাদের কাজ। এর জন্য কিছুটা প্রশিক্ষণের ব্যাপার ছিল। দিমির তাড়া থাকায় শেষ পর্যন্ত কাজটা স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটকে দিয়ে দেওয়া হয়।

বেশ কিছু দিন ধরে এই ধরনের কাজের সূত্রে আমাদের মতো ছোট একটা সংস্থায় ডিরেক্টরের ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি হয় কিনা জানি না। কিন্তু এখানে দেখেছি ডিরেক্টর একটা দূরত্ব সব সময়েই বজায় রেখেছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যেহেতু দপ্তরের কাজের সূত্রে, তার পরে আমাদের অন্য ভূবন, তাই সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসভার নিষ্কণ্ণ জগতে আমাদের ঊর্ধ্বমুখি মারার সুযোগও ছিল না। আমার মনে হয় সেটা আমাদের পক্ষে ভালোই হয়েছিল। কারণ আপিসের ‘বস’ হিসেবে তাঁকে জানার যে সুযোগ আমরা পেয়েছি সেটা সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটা স্বতন্ত্র দিক তুলে ধরে, যার অভিজ্ঞতা তাঁর অন্যান্য ঘনিষ্ঠজনের নেই।

চেহারা ও মেজাজে জন্ম-অভিজাত সুধীন্দ্রনাথ তাঁর অধীন ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ ঠিক সেই পরিমাণ ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে চাইতেন যাতে প্রত্যেকের কাছ থেকেই তার কর্মদক্ষতার সবটুকু ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর বিদেশ সফরের পর আপিসের কাজে যোগ দিয়ে বেশ কিছুদিন কেটেছিল নানা কর্ম তৎপরতার মধ্যে। তার পাশাপাশি ছিল তাঁর নিজের কাজের চাপও। চাপ কখনো সচেতনভাবেই বলছি যেহেতু লেখক সুধীন্দ্রনাথের একটা দিক কিছুটা দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। তখন বিলেত থেকে কংগ্রেস ফর কালচারাল প্রিন্সিপলসের মাসিক পত্রিকা ‘Encounter’ প্রকাশিত হতো। সেই সময় এই পত্রিকায় ‘Great Cities of the World’ শিরোনামে বেশ কিছু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। কলকাতা সম্পর্কে লেখার দায়িত্ব ছিল সুধীন্দ্রনাথের। সেই লেখার জন্যে তাঁর নানা বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার দরকার হয়। সুধীন্দ্রনাথের বাড়ির কাজের লোক আমাদের আপিসে বেয়ারার কাজ করতো। বেশ হাসিখুশি মেজাজের লোক, আর সাহেবের প্রতি তার একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা ছিল। সুধীন্দ্রনাথের সামান্যতম অসুবিধা দূর করতে, মেজাজ ঠিক রাখতে সে যথাসাধ্য করতো। তার নাম ছিল কুদ্দুস।

মনিবের প্রসঙ্গ নিয়ে আপিসেও সে গল্প করতো। তার মধ্যে মনিবের পারিবারিক জীবনকথাও সে নির্দিষ্টায় বলতো, যদি তার বিবেচনায় সেখানে সুধীন্দ্রনাথকে অথবা কোন কারণে অসুবিধা ভোগ করতে বা কষ্ট পেতে হতো। কুন্দুস আপিসে আসতো বেশ আগে, সাহেবের ঘর খুলে সব গোছগাছ করে রাখা আপিসে তার নিত্য আর প্রাথমিক কর্ম ছিল। একদিন দেখি কুন্দুস আপিস এলো বেশ বেলা করে, আমরা পৌঁছে যাওয়ার পরে। দু'হাতে নানা মাপের অনেক বই। আমাদের ঘরের টেবিলে বই নামিয়ে রাখতেই আমরা কৌতূহলী হয়ে পড়লাম। কুন্দুস বলে সাহেবের দরকার। তাই ন্যাশনাল লাইব্রেরী, আর কয়েকটা জায়গা থেকে সাহেবের চিঠি নিয়ে বই এনেছে। বেশ মনে আছে মোটা মোটা দুটি বই ছিল কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'র দুটি খণ্ড, আঠারো ও উনিশ শতকের ইতিহাস। তখনও অবশ্য আমরা জ্ঞানতাম না যে সুধীন্দ্রনাথ Encounter পত্রিকার জন্যে কলকাতার উপরে প্রবন্ধ লিখছেন। সেটা ছেনেছি পরে যখন সেটা টাইপের জন্যে আপিসে দিয়েছিলেন।

তখন প্রায়ই দেখতাম একটা লম্বা সাইজের লাইন টানা খাতা দু'ভাগে ভাঁজ করা অবস্থায় হাতে নিয়ে আসতেন। অনেকটা উকিলবাবুদের হাতে ব্রিকের মতো। আপিসে তাঁর কাজ না থাকলে সেটায় বসে লিখতেন। সব সময়েই, অন্য সময়ে যা দেখিনি, একটা চিত্তার ছাপ থাকতো মুখে। একদিন দেখি, আপিসে যেতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, আমার সকালে দক্ষিণ কলকাতা যাওয়ার জন্যে। মিউজিয়ামের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপিসের দিকে চলেছেন তিনি। দোতলা বাস থেকে দেখা হাতে কোটা ভাঁজ করা, আর রয়েছে তাঁর বিশেষ ব্রাশের সিগারেট টিন এবং লম্বালম্বি ভাঁজ করা সেই খাতা। দীর্ঘদেহী মানুষ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটেন, ইংরাজদের কায়দায়, যাকে ওরা বলে stooping gait। অনেকটা সেই রকম। মুখে চোখে চিত্তার ছাপ। লেখা টাইপ করতে দেওয়ার পরে যে ছেলেটি টাইপ করতো সে মাঝে মাঝে আমায় তাঁর হাতের লেখার কোন অংশের বানান ঠিক ধরতে না পারলে আমায় ভেঙে জিজ্ঞাসা করতো, নীচু গলায় যাতে ডিরেক্টর শুনতে না পান। সেই সূত্রেই আমার সুধীন্দ্রনাথের ইংরাজি রচনার পাণ্ডুলিপি দেখা। তখন তাঁর সঙ্গে কাজের কথা ছাড়াও দু'একটা অন্য কথা জিজ্ঞাসা করার মতো অবস্থা হয়েছে। তাই সেই ইংরেজি পাণ্ডুলিপি ভাঁজ করা খাতার একবার এদিকে আরেকবার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্য দিকে লেখা দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন এই রীতি। সুধীন্দ্রনাথ কয়েক সেকেন্ড আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন সংশোধনের জন্যে। আমার মুখ

ফসকে বেরিয়ে যায় আপনি...আপনার লেখায় সংশোধন। একটু হেসে বলেন করতে হয় বৈকি। প্রতিটি অনুচ্ছেদের পাশে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান জায়গা ছেড়ে ছেড়ে লেখার রীতি দেখে বুঝেছিলাম উদ্ভলোক perfectionist, মনের ভাব ঠিক ঠিক প্রকাশ করতে পারার জন্যে শব্দ বদল করে থাকেন। পরে জেনেছি এটাই সুধীন্দ্রিয় পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য।

সুধীন্দ্রনাথকে যে এই সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পেরেছিলাম তার পিছনে ছোট দুটি কাহিনী আছে। দীর্ঘ বিদেশ সফর সেরে দেশে ফেরার পরে তিনি বেশ কিছু ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আপিসে ডিস্ট্রিশন দিয়েছিলেন। এই রকম একটা চিঠিতে লিখেছিলেন 'when I had stayed put in বলে একটা জায়গার নাম ছিল, বোধহয় রোম। কথাগুলি মনে আছে এই জন্যে যে টাইপিস্ট ছেলেটি এখানে এসে ধমকে যায়। তার সংশয় ছিল যে কথাগুলি ঠিক শুনেছে কিনা। আমায় জিজ্ঞাসা করায় আমিও বলি অর্ধ আমার জ্ঞান নেই। তারপর কি খেয়াল হলো আমি সরাসরি তার ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম had stayed put এর মানে কি? প্রশ্নে বিস্মিত সুধীন্দ্রনাথ আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইলেন। বুঝলাম আমার অজ্ঞতার গভীরতা পরিমাপ করে নিলেন। আমি যে গায়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে খাতির জমাতে যাইনি বোঝার পরে বললেন, 'কোথাও গিয়ে একটু শুছিয়ে নিয়ে বসা'।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো মজার। সেদিন আপিসে গিয়ে জ্ঞান গেল কুন্দুসের মুখে সাহেব আজ আসবেন না। তাঁর ঘরে করিডরের দিকে দরজা খোলা হয়নি। ফলে আমাদের প্রায় স্বরাজের অবস্থা। দরজা দিকে পিছন করে বসে আমি আবৃত্তি করছিলাম হয় 'পাতী অরণ্যে কার পদপাত শুনি' অথবা 'অপমৃত ভগবান, অস্তাচলে জ্বলন্ত অঙ্গার', এই দুটি কবিতার কোন একটি বেশ উচ্চস্বরে। এমন সময়ে বিনা নোটিশে কর্তার প্রবেশ। যারা দরজার দিকে মুখ করে বসেছিল, তারা তাঁকে ঢুকতে দেখেই নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। আমি তার ফুরসৎ পাইনি। সুধীন্দ্রনাথ এক ঝলক আমার দিকে চেয়েই ভিতরে ঢুকে গেলেন। আমার অবস্থা কহতব্য নয়। খালি ডাবছি এই বুঝি ভিতর থেকে ডাক এলো। সকালবেলায় আপিসে কাজের সময় কবিতা আবৃত্তি, দপ্তরের শৃংখলার উপর এমন আঘাত, নিশ্চয়ই জঘন্য অপরাধ। ডাক এলো কিছুটা পরে। ঘরে যেতেই বললেন কাজ নেই। আমি ঘাড় নাড়তেই বললেন, 'নাহিবা থাকলো তা বলে আপিসে এই সব'। কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আমি বলি ভুল হয়ে গেছে। 'আচ্ছ যাও'। সুধীন্দ্রনাথের গলায়, কথায় কোথাও প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু তিরস্কারও ছিল না। শুধু ছিল মনে করিয়ে দেওয়া আপিসেও কিছু অবশ্য পালনীয় নিয়ম বিধি আছে।

ডিরেক্টর নিজেও তা মান্য করতেন অবশ্যই তাঁর মতো করে।

আমাদের পাশেই ফারপো হোটেলের দোতলার যে হলটা সরাসরি দেখা যেত, সেটা ছিল বার। দিল্লি থেকে বড়োকর্তা ডা কোসটা কলকাতায় এসে দেখেছি দু'একবার দুপুরে তাঁরা ফারপোর বারে বসে মদ্যপান করতে করতে কিছু আলোচনা হয়তো করতেন। একবার দুপুরে সুধীন্দ্রনাথ আপিসে থাকবেন সেই মতো কাজকর্মের নির্দেশ দিয়ে বার থেকে বেরিয়ে আপিসে আর থাকতে পারলেন না। দৃশ্যতই একটু টিপসি হয়ে ছিলেন। আপিসে এসে ঘরে ঢুকে থাকছি না বলার সময় তাঁর সেই টিপসি ভাব চেপে রাখা যায়নি। এছাড়াও দেখেছি কোন কোন দিন আপিসে আসার সময় কোটের পকেটে ছোট মাপের চ্যাপ্টা একটা টিন নিয়ে এসেছেন। মাঝে মাঝে সেটা থেকে নির্ভগ্না কিছু পানীয় গল্যায় ঢেলেছেন। কিন্তু কাজ বা কথায় তার ছাপ পড়েনি। 'বস' হিসেবে আপিসের বিধি লঙ্ঘনের এই রকম দু'একটা অকিঞ্চিৎকর ঘটনা ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। তাই আমি যে তিরস্কৃত হইনি, সেটা সৌভাগ্যের লক্ষণ ছিল বলতেই হবে।

আরেকটা মজার কথা এই সূত্রে বলা যায়। ১৯৫৬ সালে, যতদূর মনে পড়ছে সুধীন্দ্রনাথকে কবি সম্বর্ধনা দেওয়া হয় রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে। গোড়ার দিকে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো ছোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। মূল বাড়ির ভিতরে উঠানে শ্রোতা-দর্শকদের ফরাসে বসার ব্যবস্থা। আর জ্ঞানী শুধীজন, যাঁরা গান করতেন কিম্বা প্রবন্ধ পাঠ বা আলোচনা করতেন তাঁরা উঁচু বেদির মতো দালানে বসতেন। তখন ভিড় বিশেষ হতো না। আমি প্রতি বছরই যেতাম। সে বছরও গিয়েছি। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বেই কবি সম্বর্ধনা। তখনল জ্ঞানতাম না কে সম্বর্ধিত হচ্ছেন। নাম ঘোষণার পরই দেখি ধূতি পাঞ্জাবি পরিহিত সুধীন্দ্রনাথ। সাহিবি পোষাকের চেয়েও আরো সুন্দর লাগছিল। সম্বর্ধনার আগে কোথায় বসেছিলেন জানি না, অনুষ্ঠানের পর বেদির যেখানটায় এসে বসলেন সেটা আমার অদূরেই। না তাঁর কোন ভাবান্তর দেখিনি, কিন্তু এটাও বুঝতে ভুল হয়নি যে তাঁর আপিসের এক ছোকরা দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে এটা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাতে আমার সম্পর্কে কোন পরিবর্তন হয়নি ঠিকই, কিন্তু এটাও ঠিক এই আপিসে যারা কাজ করে তাদের কারো কারো আরেকটা জীবন আছে, যেখানে কবি হিসেবে তাঁর গত্যন্ত আছে। সেই ধরনের একটা প্রতিক্রিয়া ঘটা অস্বাভাবিক ছিল না।

নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় সুধীন্দ্রনাথ অচেনা কিম্বা অর্ধ-চেনা মানুষদের কাছে কি পরিচয় দিতেন জানার কোন সুযোগ হয়নি। তবে একটা

ব্যতিক্রমী ঘটনা আমার চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছি। তখন এদেশে কংগ্রেস ফর কালচারাল ব্রিডম সংস্থার মুখপত্র ছিল বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'কোয়েস্ট' পত্রিকা। তার সম্পাদক ছিলেন নিসিম এজাকিয়েল। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্র জানা নেই। কিন্তু এজাকিয়েল সাহেবকে সুধীন্দ্রনাথ চিঠি লিখছেন, সম্ভবতঃ প্রথম চিঠি যেখানে নিজের ঠিকানা দেওয়ার সময় নিজেকে কবি হিসেবে উল্লেখ করছেন। তাঁর ডিস্টেট করা চিঠি তখন টাইপ করা প্রায় শেষ, সুধীন্দ্রনাথ নিজের ঘর থেকে একেবারে টাইপিষ্টের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। টাইপিষ্ট ছেলোট মাঝে মাঝেই আমাকে তাকে কিছু পড়ে সাহায্য করার জন্যে ডাকতো। সেদিনও তাই হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ এসে চিঠির প্রেরকের ঠিকানা লেখানোর সময় বললেন 'কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' লিখতে। ছেলোটর হতচকিত ভাব দেখে বসে দিলেন 'Kavi' লিখতে নামের আগে, 'poet' নয়। এবার বিস্মিত হওয়ার পালা আমার। পরে ভেবে দেখেছি তাঁর আসল পরিচয় তিনি 'কবি'। অবান্তালি হয়তো অ-ভারতীয়দের কাছে তিনি সেটাই তুলে ধরতে চাইতেন। এই বিশিষ্ট বাঙালি কবি পরিচয়, ইংরেজি poet কথাটির মধ্য দিয়ে ফুটতো না। চিঠির প্রাপক উত্তরে কি লিখেছিলেন জানি না। কিন্তু পত্রলেখক কোথাও কোন অস্পষ্টতা না রেখে বাঙালি কবি হিসেবেই নিজের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। তথ্য হিসেবে বলা দরকার পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে সুধীন্দ্রনাথের কিছু কবিতার কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ কলকাতার কোন প্রকাশন সংস্থা Literary Miscellany নামে এক সংকলন প্রকাশ করেছিল।

আগেই বলেছি আপিসের কাজে ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করার সময় তিনি আমাদের সকলের কাজকর্মের একটা মূল্যায়ন করেছিলেন। আমি প্রথম যে সমীক্ষায় কাজ করি তা কলকাতার বদলে মফঃস্বলে, জেলা সদর মহকুমা এমন কি গ্রামেও চালানো হয়। আমরা প্রশ্নমালা দেখেই সংশয় প্রকাশ করে বলেছিলাম তার উত্তর পাওয়া কঠিন হবে। ডিরেক্টর আমাদের কথায় আমল দিতে চাননি। যেমন আমি নির্দেশ অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলা সদর, বিষ্ণুপুর ছাড়া এমন সব দূর গ্রামে গিয়েছি যা এই চার দশক পরেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতির হালফিলের খবর রাখে বলে মনে হয় না। দেশে তখন Transistor বিপ্লব হয়নি। খবর পড়া দূরস্থান কানে শুনেও কিছুটা ধারণা করা তখন সম্ভব ছিল না। আমাদের রিপোর্ট পড়ে ডিরেক্টর মনে মনে আমাদের আশংকার যৌক্তিকতা নিশ্চয়ই মেনে ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমরা দুই বা তিনটি consumer survey করি, কলকাতা ও কাছাকাছি শহরগুলিতে। বিভিন্ন কোম্পানী তাদের পণ্যের চাহিদা

বিক্রয়যোগ্যতা যাচাই করার জন্যে আমাদের সংস্থাকে ভার দিয়েছিল। দিল্লির কর্তারা কলকাতার রিপোর্টে খুশি হয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ ফিরে আসার পর আমরা যে দু'একটা সমীক্ষা চালাই, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কলকাতার বাছাই করা কিছু লোকের মধ্যে। সব মিলিয়ে শ'খানেক মানুষ। এদের বাছাই করেছিলেন আমাদের আপিসেরই এক পদাধিকারী, যিনি ডিরেক্টরের নীচেই ছিলেন। ততোদিনে বাঁশরী মিত্র চলে গিয়েছেন শুনেছিলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে। এসেছিলেন পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্তর ছোট ভাই দিলীপ গুপ্ত। বিরাট দশাসই চেহারা, আমুদে মানুষ, আমার থেকে বয়সে কিছুটা বড়ো তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের প্রায় সমসাময়িক। আমার মুখচেনা ছিল। তার গানের গলা খুব ভালো ছিল, একসময় গণনাট্য সংঘের গানের স্কোয়াডে ছিল। অচিরে বেশ ভাব জমে যায় সকলের সঙ্গে। এই আপিসে যোগ দেওয়ার কয়েক মাস পরেই আমি কলেজে চাকরি পাই। দুটো কাজের মধ্যে সময়ের সংঘাত না বাধলে দুটো চাকরি করার আইনগত কোন বাধা তখন ছিল না। কারণ UGC বেতনক্রম তখনও অজানা। দিলীপ আমায় নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। যেমন যে সমীক্ষার কথা বলছি তাতে কিছু বিশিষ্ট অধ্যাপক যাতে আমার ভাগে পড়ে, সেটা তার জন্যেই সম্ভব নয়।

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ নিজে আমায় দিলেন তিনজন বিশিষ্ট আমলার সাক্ষাৎকার নেওয়ার ভার। প্রথমজন কে. কে. হাজরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Legal Remembrancer, দ্বিতীয়জন জে. সেনগুপ্ত অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব, আর তৃতীয়জন বিখ্যাত আই. সি. এস. দেবেশ দাস। এটা আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, যার সবটাই সুধীন্দ্রনাথের অবদান। তিনিই সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক করে প্রতিবারই আমায় নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে কোথায় যেতে হবে বলে দিতেন। আর ফিরে এসে তাঁর কাছেই রিপোর্ট করার নির্দেশ ছিল। প্রথম দু'জনের সঙ্গে মোকাবিলা মহাকরণে। দেবেশ দাসের সঙ্গে কথা বলছি তাঁর লী রোডের বাড়িতে। মহাকরণে তখন ঢোকার ব্যাপারে রুড়াকড়ি এখনকার মতো ছিল না। তবু গেটে সার্জেন্টের কাছে নাম বলে যেতে হতো। আমি ঢোকার সময় কার কাছে যাচ্ছি বলা মাত্র সার্জেন্ট বলে দিলেন দোতলায় ডানদিকে যান। বোঝা গেল গেটে হাজরা সাহেব বলে রেখেছিলেন। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে তাঁর সঙ্গে নানা কথা, তাঁর অভিজ্ঞতার নানা কাহিনী শুনতে হলো, কিন্তু কোন প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না কার্যতঃ। তিনি প্রশ্নপত্র আগাগোড়া না পড়ে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে নারাজ। নানা কথার মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে কোন প্রশ্নের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছি মনে হলোই

ধুরন্ধর হাজরা সাহেব প্রসঙ্গান্তরে চলে যান। একঘণ্টা পরে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে উঠলাম। মনটা খুবই খারাপ। কর্তার দেওয়া কাজের ভার কিছুই করা গেল না। আপিসে ফিরে সুধীন্দ্রনাথের কাছে রিপোর্ট দিতে গিয়ে প্রথমেই শুনলাম ঠিক আছে। আসলে আমি মহাকরণ থেকে বেরোবার পরেই বোধহয় সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে হাজরা সাহেবের টেলিফোনে কথা হয়ে যায়। আমার চেষ্টার যে কোন ফলটি হয়নি সেটা তিনি টের পেয়ে যান। এবং এটাও বোঝেন তাঁর নির্দেশ মতো আমি প্রশ্নপত্র হাজরা সাহেবের হাতে দিইনি। অনিচ্ছুক উত্তরদাতার কাছ থেকে কিছু প্রশ্নের উত্তর পেতে আমি যে আগাগোড়া সচেষ্ট ছিলাম হাজরা সাহেব সম্ভবতঃ সেকথাও বলেছিলেন।

কয়েক দিন পরে আমায় সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে বলেন মহাকরণে। ব্যবস্থা আগের মতোই সব করা ছিল। সেনগুপ্ত সাহেব কাজের মধ্যে প্রায় ডুবে ছিলেন। তারই মধ্যে একটু সময় বের করে মাঝে মাঝে আমার দু'একটা প্রশ্নের জবাব দেন। কিন্তু রাজনীতির গন্ধ থাকলেই চূপ করে যান। অনেক সময় নিয়ে এই সাক্ষাৎকার পর্ব শেষ হলো কিন্তু কুড়ি শতাংশের বেশি উত্তর পাওয়া গেল না। বেরিয়ে আসার সময় কেবল মন্তব্য করলেন এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে অনেক ঝঁকা সময় চাই, তাও সব উত্তর দেওয়া যাবে না। আপিসে ফিরে রিপোর্ট করার সময় এবারেও একই অভিজ্ঞতা। বোঝা গেল রিপোর্ট মোটামুটি সুধীন্দ্রনাথ আগেই পেয়ে গেছেন। এরপরই আমায় বলা হলো দেবেশ দাসকে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে ধরতে হবে। একদিন সকালে ঠিক আটটায় দেবেশ দাসের লী রোডের বাড়ীতে যাওয়া গেল। দরজায় ঘণ্টা বাজাতেই বেয়ারার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্তা ভিতরে আসতে বললেন। আমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন ব্রেকফাস্টে বসার আগে। টেবিলে শ্রীমতী দাসও বসেন তবে তিনি কেবল শ্রোতার ভূমিকায়। আমি গোড়ায় কিছুটা আড়ষ্ট ছিলাম নিশ্চয়ই। দাস সাহেব হাস্যভাবে দু'চার কথা বলে পরিবেশটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক করে দিয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎকারে আমার সাফল্য পঞ্চাশ শতাংশের বেশি। দাস সাহেব মন্তব্য করেছিলেন আমাদের অনেক প্রশ্নের চট্‌জলদি উত্তর দেওয়া কোন সরকারি কর্মচারির পক্ষে সম্ভব নয়। সব কথাই ডিরেক্টরকে রিপোর্ট করি। তবে সাফল্য যে আগের তুলনায় অনেক বেশি, এতেই সন্তুষ্ট, সেটা বলেও ফেলেন। আমার অন্য সহকর্মীদের অভিজ্ঞতা এই রকম ছিল না। তাঁরা নানা প্রশ্নের উত্তরে একটা কিছু জবাব সরাসরি পেয়েছেন। আমার ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম। লিখিত রিপোর্ট দেওয়ার সময় আমি এই অভিজ্ঞতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলাম।

মানুষ আর আপিসের কর্তা সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আর দুটো অভিজ্ঞতার

কথা না বললে, স্মৃতিচারণ সম্পূর্ণ হবে না। অল্প অভিজ্ঞাত সুধীন্দ্রনাথ মোটেই একালের বড়লোকদের মতো চটকদার, দেখলেই খুব দামী বোঝা যায়, তেমন পোষাক পরতেন না। তবে তাঁর হাতে সিগারেটের যে টিন থাকতো তা অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারতো না। ময়ূরকন্ঠী রত্নের একটা টিন, গায়ে লতাপাতা আঁকা। দেখলেই বোঝা যায় শুধু বিদেশী নয়, বিশেষ ধরনের বিদেশী। সেই টিন নিয়ে আমার কৌতূহলের শেষ ছিল না। একটা সময় সুধীন্দ্রনাথ যখন আমার কাছে ডিরেক্টরের স্তরে থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন তখন একদিন কথাটা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমার কিছু অদ্ভুত প্রশ্নের কথা আগেও বলেছি। আমার কথার জবাবে বললেন ইজিশিয়ান একটা ব্যাপ্ত। পরে একদিন আপিসেই কি একটা আলোচনা হচ্ছিল বিকেলের দিকে। যাওয়ার আগে টিন থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে তিনি সরাসরি আমার দিকে চেয়ে ‘you can take it, if you like’ বলেই টিনটা আমার দিকে ঠেলে এগিয়ে দিলেন একটু। টিনে দুটো সিগারেট ছিল আমিই নিলাম। টিনের গায়ে ফরাসি ভাষায় সিগারেটের নাম। এখন আর মনে নেই। তার নীচেই ইংরেজিতে ‘ইজিশিয়ান ব্যাপ্ত মেড সিগারেট লেখা। কুন্দুসের মুখে শোনা গেল পার্ক স্ট্রীটের একটা দোকানেই কেবল এই টিন পাওয়া যায়, তারা আমদানী করে বাঁধা ধরা কিছু জেনতার জন্যে। সেখানে থেকেই সাহেবের সিগারেট মাসিক রসদ হিসেবে কুন্দুন কিনে আনে। এই ব্যাপ্তের দুর্লভতা তার আকর্ষণ আর আভিজাত্যের অন্যতম কারণ হতে পারে।

সুধীন্দ্রনাথের এই পরিচয় যে তাঁর ব্যক্তিত্বের সবটুকু নয় তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্য এক সুধীন্দ্রনাথকে আপিসেই আমরা দেখেছিলাম। যিনি তাঁর কর্মচারীদের এই আপিসের প্রায় সকলের আর্থিক কিছু দাবি প্রায় এককথায় নাকচ করে দিয়েছিলেন। কোন বৃত্তি শুনতে চাননি। টাকা পয়সার ব্যাপারে ডিরেক্টরের কড়া নজর থাকবে। তিনি হিসেবী পরিচালক হবেন। এতো যে কোন সংস্থার নিষ্কল কথা। সেখানে কর্মচারীদের বলার কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে বেতনক্রম বিধীন চাকরিতে বছর শেষ হওয়ার পরে আর্থিক কিছু পরিবর্তনের কথা বলা অস্বাভাবিক ছিল না। আপিসে তাই আমরা ঠিক করেছিলাম ডিরেক্টরকেই কথাটা বলতে হবে। ঘটনাচক্রে আমি হয়ে পড়ি মুখপাত্র। কথা সূত্রের মুহূর্ত থেকেই সুধীন্দ্রনাথের মুখের ভাবান্তর ঘটতে থাকে। একটা সময় আলোচনা ভেঙ্গে দিয়ে উঠে পড়েন তিনি, আর সময় দেওয়া সম্ভব নয় বলে। মজার কথা হলো এই আলোচনার মাঝামাঝি পর্ব পর্যন্ত তিনি যথারীতি আমার



মূল্যায়ন : সুধীন্দ্রনাথের সমকালের

পত্রালাপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

ডাক্তার শ্রীবৃন্দ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে আগেই বলেছি গদ্য প্রবন্ধের ভার বইতে আমার মন চায় না। বয়স যখন অল্প ছিল তখন প্রাথমিক দেখাওনার ফসল সংগ্রহ করে চিঠিতে চালান করতে ভালোবাসতুম। তার প্রধান কারণ মনটা তখন পক্ষে ঘাটে পলাতকা হয়ে বেড়াত, যা দেখত যা শুনত তাতেই তার ছিল ঔৎসুক্য। এই ঘোরাকেরা আর চিঠির বকুনি এক জাতের। তখন বৈঠকে বসা মেজাজ তাকিয়া হেলান দিয়ে গোঁফে তা দেওয়া শুরু করেনি। দেহের কথা বলছি নে, মনের দিকে দেয় নি তখনো গোঁফের রেখা। সেদিন চিঠিগুলো উঠত অজস্র ফেনিয়ে বাইরের দিকের চলাচলের মছনবেগে। ছিন্নপত্রে তার পরিচয় পেয়েছ। বুদ্ধির দোষে ওগুলোকে আড়ত রাখি নি। তখন জানতুম চিঠি চাষের ফসলের জন্যে নয়, ও আপনি গজিয়ে ওঠে রাস্তার ধারে, চিহ্নিত করে দেয় পথচলার ইতিহাসকে, কেবল শস্যটুকু ঝাড়াই-বাছাই করে নিয়ে ডালপালা সব বাদ দিলে ওর মানে যায় চলে।

তারপরে এল প্রবন্ধের মাল বোঝাই করার পালা। প্রধানত এই পর্ব দেখা দিয়েছিল বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় পর্যায়ের যুগে। মন ভারাক্রান্ত ছিল কর্তব্যবুদ্ধিতে। সেই ভার চেপেছিল গদ্যের ক্ষুদ্রে। ফিরে যখন তাকাই তখন কলমটাকে মনে হয় আদিম যুগের অতিক্রম জন্তুর দলে। কিছু কাল তার আধিপত্য ছিল। একেবারে তার দিন যায় না, কিন্তু যে আত্মপ্রাণের অভিব্যক্তির মুখে তার ল্যাজ প্রসারিত হয়ে চলেছিল, তার জোর কমছে। বাছলো তার আর রুচি নেই।

এখন লিখি লিখতে যদি মন যায়। লেখার পায়েচলার পথে চলি আলাপ জমিয়ে যাবার ঝোঁকে। তার দায়িত্ব বহু লোকের কাছে নয়। যাকে ভালো করে চিনি তার সামনে বসে বকে যাওয়া সহজ, কেননা সেও ভিতর থেকে বকিয়ে নেয়। লেখাটার পরিমাণ থাকে দুটি মনের

মাপে। যুগ্ম তারা চলে পরস্পরের কাছ থেকে অলক্ষ্য টান ধার ক'রে নিয়ে, চিঠির চাল সেই অলক্ষ্য সেনাদেনার চাল।

আজ তোমাকে লেখবার উপলক্ষ্য হোসো সুধীন্দ্র দত্তর স্বগত বইখানি পড়ে। পড়তে কিছু কাল ইতস্তত করেছিলুম, ভয় ছিল আমার দেহের বর্তমান অবস্থায় ওটা উপযুক্ত লঘুপথ্য হবে না। কিন্তু জনশ্রুতি ক্রমশই অত্যাঙ্কির দিকে চলে। সুধীন্দ্রের লেখা দুঃসহ এ বাণীর সুর অনবধানে চড়ে যাচ্ছে। তাহলেও সংস্কারটার একেবারেই মূল নেই এও বলতে পারি নে। হয়তো তাঁর গদ্য চলতে চলতে আপন পথ পাকা ক'রে নিয়েছে, গোড়ায় সে চলত বন্ধুর পথে। তা হোক কিন্তু তাঁর গদ্য কেন যে জ্বলের মতো সহজ কখনোই হোতে পারে না তার কারণ আছে।

এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আগেকার চিঠিতে তোমাকে জ্ঞানিয়েছিলুম বাংলায় “চিন্তা” শব্দটাকে ইংরেজি “থট্” শব্দের জায়গায় বসিয়ে দিতে পারব না। সুধীন্দ্র ওকে “মনন” বসেছেন যে অর্থে ওতে ভাবনার একটা প্রক্রিয়া বোঝায়। কিন্তু যে বিষয়টাকে নিয়ে মনন করা যায় এবং যা মননের পরিণতি তাকে বাংলায় “মত” বললেই ভালো হোত, সে সুযোগ আর নেই। তাই আমি মনে করি “মস্তব্য” শব্দটাতে কাজ চলতে পারবে।

সুধীন্দ্রের লেখা পাঠকদের কাছ থেকে ভাবনার দাবি করে, কেননা মননশীল তাঁর মন। সাহিত্য-রচনায় কারো বা চিন্তাবৃত্তিতে কল্পনার কর্তৃত্ব কারো বা মননের। আরো একটা প্রবর্তন আছে তাকে বলা যেতে পারে লোকহিতৈষা, তাতে শ্রেয়োবুদ্ধির ফসল চাষ হয়। আমার নিজের লেখা নিজে বিচার করতে সম্মতি যদি দাও তাহলে বলতে হয় আমার লেখায় প্রধানত কল্পনা আর শ্রেয়োবুদ্ধি এই দুটোরই চালনা। সুধীন্দ্রনাথের মুখ্য আনন্দ মননে, শিক্ষা দেওয়ার উপদেশ দেওয়ার আভাস যদি কোথাও দেখতে পাওয়া যায় সেটা নেহাৎ গৌণ, এমন কি মনে হয় তার প্রতি অশ্রদ্ধা আছে। মননে যার প্রয়োজনাভীত আনন্দ তার কাছে নিশ্চিত সিদ্ধান্তের পাক্কা দাম নেই। তাই সুধীন্দ্র অনায়াসে বলতে পেরেছেন এ বইয়ে তাঁর অনেক পুরোনো মতের সঙ্গে তাঁর এখনকার মত মেলে না অথচ তাই ব'লে তাঁর কাছে সেগুলো পরিত্যাগ্য ব'লে মনে হয় নি, কেননা তিনি মনন-বিসারী। গীতার সঙ্গে এই ভাবটার সুর মেলে, যে গীতা বলেন ফলের দিকে দৃষ্টি রেখো না। যে সাধনার মূল্য সাধনাতেই প্রকাশ পায় বিশেষভাবে সিদ্ধিতে নয় তার এই দশা। কিন্তু তাঁর লেখার কোন্ এক জায়গায় মনে হয়েছিল তিনি “আর্ট ফর

আর্টস সেক” মতটাকে বুদ্ধি অমান্য করেছেন। যদিচ তাঁর ব্যবহারে তার প্রমাণ পাই নি। তিনি ভাবতে ভালোবাসেন সেই ভালোবাসাটাই তাঁর দান। আর্টিস্ট মাত্রেরই চরম শক্তি, প্রকাশ করবার ভালোবাসায়। গদ্যে সুধীন্দ্রনাথ মননের আর্টিস্ট। তার একটা পরিচয় পাঁই ভাষার শব্দের উপরে তাঁর একান্ত অনুরাগে। যারা যথার্থ সাহিত্যিক, শব্দে তাদের নেশা। এই নেশার মৌতৎ দুই জাতের। রসসাহিত্যে ধ্বনি আর রূপকের ব্যঞ্জনা প্রধান উপকরণ, মনন-সাহিত্যে যথার্থ্যের সুস্বভাব। অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দে তার অর্ধটা আভিধানিক চাপে কঠিন দানা বেঁধে গেছে, সে অর্ধ ব্যবহারের দ্বারা স্বীকৃত, চেহারার দ্বারা পরিচিত নয়। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ে প্রয়োজন অনুসারে বিস্তর নতুন শব্দ চালিয়েছেন। যাদের অর্থগুলি সজীব। তত্ত্বসাহিত্যে তাঁর জ্ঞান আছে তবু তিনি তত্ত্বজ্ঞানী নন, তিনি আর্টিস্ট। তাঁর মননের আনন্দ বাছাই-করা শব্দের খেয়ায় চেপে বসেছে। শব্দগুলি অপরিচিত সূত্রাং সাধারণ পাঠককে বুঝতে বাধা দেবে এ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে ঠেকায় নি। তাঁর লক্ষ্য মুখ্যত রচনার প্রতি গৌণত পাঠকদের দিকে। কেননা পাঠক সম্প্রদায়টা স্থগু নয় সে সচল—সে কোনো এক বিশেষ যুগের শিকলে বাঁধা জীব নয়—না আধুনিকের না সনাতনের। যে লোক বাঁধা যুগের বেতনে লোভ রাখে তার লেখা স্বত্ব-পরিবর্তনের, বিদায়-হাওয়ায় ঝরা পাতার মতো খসে পড়ে। কিন্তু জরুরী ক’রে লাভ নেই। কোন্ রচনা যে চলতি যুগের রথে চলেছে চিরন্তনের গম্যত্বে তার নিশ্চিত পরিচয় পাব কার কাছ থেকে। “সময়হারা” বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম তার মূলকথাটা এই, বর্তমানে আমরা সময় হারাতে পারি কিন্তু ভবিষ্যতের সুখপ্লের পথ হারাই নে, হতভাগার শেষ সম্বল ঐটে, চেম্বরলেনের শাস্তির আশার মতো।

ও কথা যাক। আমি বলতে যাচ্ছিলুম যোগ্য লেখকের প্রধান নির্ভরদণ্ড তার সাহস। তার লক্ষ্য লেখার দিকে, পাঠকের দিকে নয়। সুধীন্দ্রের ঐ গুণটি দেখেছি, তিনি পাঠকদের কাছে পাওনা হিসাব ক’রে দমে যান নি। তার লেখা পড়ে অল্প লোক। রসসাহিত্যে লোকের ভিড় অসহ্য; কাউকে কোন টিকিট দেখাতে হয় না। এই বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার বাংলা দেশের মনকে অলস ক’রে দিয়েছে, এখানে অযোগ্যর অহংকারে কোনো বাধা নেই। মনন-সাহিত্যে অনুশীলনের অপেক্ষা আছে, সেটা কুঁড়ে মনের কর্ম নয়। সেইজন্যে আমাদের দেশে ঐ বিভাগে বঙ্গা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।

সুধীন্দ্রনাথের এই বইখানিতে জমেছে তাঁর মনন-সাধনার ফসল। তাঁর এই সংকলন সম্বন্ধে তিনি আমার মত জ্ঞানতে চেয়েছিলেন। আমাকে ফাঁকি দিতে হবে। চিঠির কোণটুকুর মধ্যে প্রবেশ ক'রে দায়িত্বের আয়তন খাটো করা সহজ। বিচারকের সঙ্গে লেখকের স্বাভাবিক ঘাটা চাই, সুধীন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রভেদ আছে অনেকখানি। যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ সংকলন, কোনো এক কালে হয়তো আমি সেখানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলুম, কৌতূহল যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এখন সেখানে আমার চঙ্গার পথে ঘাস উঠে গেছে। অনেক দিন থেকে আমাকে অন্য রাস্তায় টেনেছে সে তুমি জানো। কর্তব্যসাধনার কাছে আমাকে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছে তার মধ্যে বইপড়াটাই সর্বপ্রধান। সুধীন্দ্র দেশবিদেশের নানা সাহিত্যক্ষেত্রে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন—মনের অভিজ্ঞতা কেবলি বাড়িয়ে চঙ্গায় তাঁর শখ,—সে শখ নিছক আরামে মেটাবার নয় ব'লেই আমাদের দেশে মননভূমির ভবঘুরে এত অল্প। আমার জ্ঞানান্বেষণের মধ্যে আর এক জন লোক জানি যিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি মননবিলাসী, তিনিও গ্রন্থবিহারী। তিনি অনেক ভাবেন, অনেক পড়েন, অল্প বয়সেও তাঁর সঙ্গে পান্না দিতে পারি নি। তাঁর লেখা যখন পড়ি মনকে বলি,—মন তুমি কৃষিকাজ বোঝো না—চাষ-আবাদ করা হয় নি, লোনা যদি পেয়ে থাকি সে পড়ে-পাওয়া। এই প্রসঙ্গে প্রমথের রচনা সম্বন্ধে এ কথা বলা আবশ্যিক যে তাঁর লেখায় কেবল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নয় প্রাণের সরস প্রবাহ প্রবল।

সুধীন্দ্র নানা বিষয়েই পড়াশুনো করেছেন কিন্তু কোনো বিশেষ বিষয়ে তাঁর মন জমাট বেঁধে যায় নি। জ্ঞানের ও ভাবের রাজ্যে উনি যাবাবর। ওঁর সঙ্গে আমার তহবিলের তুলনা হয় না কিন্তু একটা জায়গায় মেলে সে ওঁর পথ-চলতি মন নিয়ে। যদি উনি শঙ্করাচার্য বা বার্গস-র মতের দূরদূরান্তে পথেরের স্থায়ী দেয়াল গোঁধে বসতেন, এমন কি ফ্রয়েডের মনোবিকলন-শাস্ত্রের সব ক'টা চারিত্রগ্রন্থের কুটিল তত্ত্ব পারিভাষিক সমেত মুখস্থ ক'রে বৈজ্ঞানিক লাইসেন্স পাওয়া কুৎসাপ্রয়োগের যথেষ্ট দাবি করতে পারতেন, তাহলে মাথা হেঁট করে ওঁর পাশ কাটিয়ে চলতুম। যাঁদের বচনে ও ব্যবহারে আছে সবজ্ঞানার সুগোচর বা অগোচর ঔদ্ধত্য তাঁদের পাণ্ডিত্যকে বরাবর ভয় ক'রে এসেছি, অধিকাংশ সময় অন্ধ শ্রদ্ধা করেছি। কিন্তু আপন লোক ব'লে মেনেছি মাননিক পণ্ডের পণ্ডিকদের, দুর্গম যাত্রী হোসেও। ভ্রমণের শখ ভ্রমণকারীর সংসর্গে অনেকখানি মেটে।

স্বগত বইখানির অনেকটা অংশের আলোচনা যথা নিয়মে করতে পারি নে। কেননা সুধীন্দ্র তাঁর লেখায় যে-সব বিদেশী লেখকদের উল্লেখ করেছেন তাঁদের অধিকাংশের বই আমি পড়ি নি। সেটা আমার শরীরের ক্লাস্তিতে, কাজের ব্যস্ততায়। প্রথম বয়সে যখন ইংরেজি সাহিত্যের রস-সূত্রে প্রবেশ পেলুম তখন মেতে ছিলুম দিনরাত্রি। সেই ব্যগ্রতার চাঞ্চল্যে মনের সৃষ্টি চলেছিল এগিয়ে। বিষয়বস্তু যা পেয়েছিলুম তার চেয়ে বেশি ক'রে নাড়া দিয়েছিল চিন্তের মহনবেগ। ক্রমে সেটা নিজের ভিতরকার অজানা সম্পদকে তীরে তুলে এনেছিল। বাইরের পাওয়ার আবেগেই নিজেকে পাওয়ার পালা শুরু হয়। বাইরে থেকে সঞ্চয়টা এর প্রধান জিনিষ নয়, তার চেয়ে ভিতর থেকে নিজের পরিচয়টি আরো বড়ো। সেই আত্মপরিচয়ের এলাকায় এসেছি। এখন সেই আপনাকে পাওয়ার ভূমিকাতেই সকল পাওনাকে আত্মসাৎ করবার সময়। যদি এখনকার কালে জন্মাতুম মনের কী চেহারা তৈরী হয়ে উঠত কেমন ক'রে বলব। সভ্যতার নানা অধ্যায়েই বিচিত্রের মিশ্রণ সৃষ্টির কাজ করতে থাকে। যে সভ্যতায় মিশ্রণের বাধা ঘটে সেখানে আদিম মালমসলা একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির দৈন্য প্রকাশ করে। তাই যে-সব তরুণ দলের চিন্ত এখনকার যুগের প্রবর্তনায় আলোড়িত আমি তাদের নবজীবনের দৃশ্য দেখছি দূর সমুদ্রের প্রবাসধীপের মতো। যদি সময় থাকত তাহলে নৌকো বেয়ে সেখানে কিছুদিনের মতো সায়েব করে আসা যেত। মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে তাই তোমাদের মতো সিদ্ধবাদ নাবিকদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। সুধীন্দ্র সেই সিদ্ধবাদের দলের একজন। এই “স্বগত” বইয়ে তিনি আলাপ জমিয়েছেন। কিন্তু সে আলাপ সম্পূর্ণ আমাদের মতো আনাড়িদের লক্ষ্য ক'রে নয়। তিনি ধরে নিয়েছেন এখনকার কালের সকলের কামিংস এজরা পৌণ্ড ইডিথ সিটওয়েল এলিয়ট অডেন স্পেন্ডার সম্প্রদায়ের সভ্যত্বের অবাধে যাওয়া-আসা আছে। কাজেই তাঁর এই অংশের সাহিত্যসোচনায় সমজ্ঞদারদের মধ্যে মাথা-নাড়ানাড়ি চলবে। আমার মতো সেকেলে লোক ভালোমানুষের মতো গুনবে আর মেনে নেবে। আমি সম্মোগ করতে পারি, এই বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে যে-সব কথা উঠে পড়ে এমন কি তা নিয়ে তর্কও করতে পারি। একটা দৃষ্টান্ত, যেমন বিষ্ণু দেব চোরাবালি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বক্তব্য। ঐ বইটি এবং ঐ নামের কবিতাটি পড়েছি। বোঝবার এবং ভালো লাগবার একান্ত ইচ্ছা করেছি। বুঝতে পারি নি। কিন্তু নিজের মনের অভ্যাসের উপর নির্ভর ক'রে সুধীন্দ্রনাথের মতো অভিজ্ঞ সমজ্ঞদারের প্রশস্তিবাদ উড়িয়ে দিতে

সাহস হয় না। মনে ভাবি তিনি এখনকার কাগের যাচাইখানা থেকে যে কষ্টিপাথর পেয়েছেন সে আমার জানানর মধ্যে নেই। তাঁর নির্দেশমতো বোঝবার চেষ্টা করলুম।

একটা সংশয় তাঁর আশ্বাস সঙ্গেও রয়ে গেল। তিনি বলেছেন এই কবিতাটির অবলম্বন রিরংসা নয়। প্রথম পড়বার সময় সে-সংশয় স্বভাবতই আমার মনে ছিল না, তাই অর্ধ বুঝতে অত্যন্ত গোল ঠেকেছিল। সুধীন্দ্র সংশয়কে নিরস্ত করতে গিয়েই তাকে জাগিয়ে দিলেন। কাব্য হিসাবে এর গুণপনা আছে, কিন্তু শ্রাব্য হিসাবে এটা আমার কাছে বহদুরে বজ্রনীয়। তাতে প্রমাণ হোতে পারে আমি এখনকার দিনের নই। তা নিয়ে লজ্জা করব না কিন্তু এখনকার দিনের সম্বন্ধে লজ্জা করবার কারণ আছে দেখতে পাচ্ছি। অত্যন্ত রিরংসার বাস্তব চিত্রের অভিযোগ বাঁচাবার জন্যে সুধীন্দ্র এর মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষ ও ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ করেছেন। মেলাতে পারলুম না। বিষ্ণু দেব কবিতার সৌন্দর্য সুধীন্দ্র যথাযোগ্য ভাবে দেখিয়েছেন কিন্তু স্বভাবগত বিশেষত্ববশত বিষ্ণু দেব লেখায় একটা কারণে আমাকে ষটকা লাগে। আমরা যুরোপীয় সাহিত্যে এক সময়ে গভীর আনন্দ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই পড়েছিলাম। মনটা তার সঙ্গে ভাবের কারবার করেছিল কিন্তু বিদেশী নামগুলো স্বভাবতই রচনার মধ্যে এসে পড়ল না। ভাষার মধ্যে তাদের প্রসঙ্গতা সহজ হয় নি, জীবনের ব্যবসায়ে তাদের চলন নেই। পড়া বই থেকে গায়ে পড়ে লেখার মধ্যে নামগুলো টেনে আনতে পারি কিন্তু সেটা হয় অস্তঃপুরে মেমসাহেবের আগমনের মতো, অন্য মেয়েরা আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রেসিডা পাশ্চাত্য পুরাণের তর্জমা সাহায্যে আমাদের কাছে বাহির মহলে পরিচিত, তার সঙ্গে মনের এত বেশি মাখামাখি হয় নি যে, ভাবের অন্তরঙ্গ মহলে যখন-তখন সে আপনি এসে চেনা ছায়গা নিতে পারে। এলিয়ট-এর কবিতায় ভাষার আত্মীয়মহলে অসংকোচে বিদেশী নামের বা পুরাণের ঢুকে-পড়া দেখেছি, তাঁর সেই বিশেষত্ব এত স্বকীয় যে অন্য কারো পক্ষে এটা অনুকরণের সুস্পষ্ট মূদ্রাদোষ হয়ে পড়ে। এ-রকম স্বজন যদি দৈবাৎ হয় তবে সেটাতে লজ্জিত হওয়া প্রত্যাশা করি কিন্তু বারবার যদি হয় তবে সেটাক্ষে কী বলব। বিশেষত তুচ্ছ না ক'রে দেখলে দেখা যাবে স্বদেশীয় পুরাণ থেকে সুপরিচিত নাম কবির কাব্যে পথ পায় না। সহজ বলেই কি? যাই হোক, বিষ্ণু দেব কবিতা থেকে সুধীন্দ্র যে টুকরোগুলি তুলে দিয়েছেন, আমার উপভোগের পক্ষে বিশেষ কাজে লাগল।

গদ্যকাব্যে আমার ছন্দোমুক্তি প্রসঙ্গে তিনি যে ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রয়োজন ছিল। অনেকের কাছে ভাষনা পেয়েছি। আমার কৈফিয়ৎ এই, গদ্যকাব্যে যে বিশেষ জাতীয় রসরচনার অবকাশ পাওয়া যায় তার থেকে সাহিত্যকে বঞ্চিত করা অন্যায্য।

আমাদের দেশে যোগী সম্যাসী যারা, বিশেষ সাজ ও বিশেষ আচরণের দ্বারা সাধারণের থেকে তাঁরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র, তুই ভেকধারণের সাহায্যে তাঁদের চেনা সহজ কিন্তু যে যোগী সংসারের মধ্যেই আছেন তিনি যথার্থ মুক্ত, সাজের দ্বারা সম্যাস আশ্রমের আচারের দ্বারা বদ্ধ নন। প্রথাগত দৃষ্টিতেই যারা দেখতে অভ্যস্ত তিনি তাদের চোখে পড়েন না। অথচ তাঁর মধ্যে সাধনার যে সত্য আছে সেটা প্রচলিত পরিচয় ও পদ্ধতির বাইরে ব'লেই তার মধ্যে থেকে একটা গভীর নিজস্বীয়তা জেগে ওঠে, সেটা মূল্যবান,—সংসারের সঙ্গে সংসারাতীতের সামঞ্জস্য ঘটিয়েই সেই মূল্য প্রকাশ পায়। গদ্যকাব্য ভেকধারী নয়, তাই তার মধ্যে সাহিত্যের হরিদ্বন ও জাতকুলীন সহজে মিলে গিয়ে কবিত্বের সম্মান পেতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দ্বারা আমার মতের সমর্থন এহ বাহ্য, কোনো বিশেষ পরিবেশ থেকে আন্তরিক স্বভাবের প্রেরণায় কাব্য দেখা দিল কি না-দিল সেটা সহৃদয়হৃদয়বেদ্য। সলোমনের গীতিকে রসিকেরা জ্ঞাতে ঠেলেন না সে প্রচলিত ছন্দের সাজে সভাস্থলে আসে নি ব'লেই। মনে পড়ছে যেন কোনো চীন জ্ঞানী বলেছেন যে, যে-রাজ্যে রাজত্বকে অতিশয় দেখা যায় না শ্রেষ্ঠতা সেই রাজ্যেরই। হৃদ সন্মুখে অত বড়ো কথা বলতে মুখে বাধে, কেননা তার সঙ্গে আমার মনের মেলামেশা বাস্তবিক থেকেই। কিন্তু একথা ছোর ক'রে বলতে পারি যে, যে হৃদ বাইরে থেকে অতিপ্রত্যক্ষ নয়, আসন যার কাব্যের গুঢ় অস্তরে, শাসন তার নেই ব'লেই তার গৌরব। যে হারুন-আল-রসীদ আমির-ওমরাহদের মধ্যে সিংহাসনে বসেন তাঁকে তো সেলাম দিয়েই থাকি, রাজদণ্ড ফেলে দিয়ে অগোচরে যিনি সাধারণ প্রজাদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান মনে মনে তাঁকে যদি মান দিতে না পারি তবে সেটাতে আপনাকেই খর্ব করি বাদশাকে নয়।

চিঠি লিখে প্রবন্ধ লেখার দায়িত্বভার হালকা করলুম-তার একটা কারণের আভাস দিয়েছি পূর্বেই, অর্থাৎ এই বইখানি সম্বন্ধে সব কথা বলবার মতো আয়োজন আমার ভাণ্ডারে নেই, আর একটা কারণ এই যে আমার বর্তমান অবস্থায় আপন লোকের পাশাপাশি পায়চারি করতে করতে আলাপ করা আমার পক্ষে সহজ, দশ জনের কাছে জবাবদিহির সতর্কতাটা সর্বদা মনে রাখতে হয় না। ইতি ১১।৪।৩৯

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও নাস্তিবাদ

মণীন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথ একবার সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পর্কে বলেছিলেন, “জ্ঞানের ও ভাবের রাজ্যে উনি যাযাবর। ওঁর সঙ্গে আমার তহবিলের তুলনা হয় না, কিন্তু একটা জায়গায় মেলে সে ওঁর পথ-চলতি মন নিয়ে।” আজ প্রায় এক-যুগের ব্যবধানে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের কথা সত্য হয়ে উঠেছে বিপরীত অর্থে।

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের মন ‘পথ-চলতি’ ছিল। তাই তিনি সাহিত্যসাধনার কোনো এক স্তরে থেমে যাননি, নতুন কালের নব-চেতনাকে ভাষা দিয়ে নিজের কৃতকর্মতার দ্বিধাকে কেবলই প্রসারিত করে গেছেন। কিন্তু তাই বলে ‘যাযাবর’ তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। তাঁর মন ছিল বাংলাদেশের মাটিতে বাঁধা। পৃথিবীর এমন জায়গা নেই, যেখানে তিনি না গেছেন; কিন্তু বার্লিনে বসেও তিনি কবিতা রচনা করেছেন বাংলাদেশের নদীপ্রান্তর মেঘরৌদ্র ও মানুষ নিয়ে। ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’ এই ছিল তাঁর সারাজীবনের মূলমন্ত্র।

সুধীন্দ্রনাথের কিন্তু সে রকম নাড়ীর যোগ নেই নিজের দেশের সঙ্গে। তাঁর কাব্যবর্ণিত নায়িকা বিদেশিনী, প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রায় সার্বভৌম, এবং চীন-পেরু-রাইনের সমস্যা ও হিটলার-মুসোলিনী-ট্রুটস্কি ইত্যাদি ‘আন্তর্জাতিক’ ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি যে-পরিমাণ ভাবিত তার শতাংশ মনোযোগও স্বদেশীয়দের ভাণ্ডে জ্বোটেনি। এবং কেবল তাই নয়, বিভিন্ন কবিতায় তিনি দেশের সাধারণ মানুষের বিষয়ে তীব্র বিতৃষ্ণাই প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ হিসাবে উপস্থিত করা যায় এই পংক্তিগুলি—

সহে না সহে না আর জনতার অগ্ন্য মিতালি।

প্রণয়ের মমত্ববন্ধন,

পতঙ্গের সাম্যবাদ, কৃপাজীবী ক্লীবের ক্রন্দন,

হে ভৈরব, জীবনেরে করেছে দুঃসহ।

(প্রত্যাখ্যান : ক্রন্দসী)

কিংবা,

....বশ্মীকের সাম্যময় স্বপ্নে
নির্লিপ্তি, নির্বাণ, শান্তি কেবলি স্বপন।...
রবো না, রবো না
লুপ্ত, ক্ষুদ্র বামনের এ-সমষ্টিবাদে

(মৃত্যু : ঐ)

অথবা,

...লোকাসয়—সে কেবল নাম।
সেধা শিবি নেই বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র শিবা লাখে লাখে
সিংহের ভূজাবশিষ্ট খোপে খোপে জমা করে রাখে,
ভাঙে যৌথ অনুলাপে শ্মশানের একান্ত বিশ্রাম।

(উপসংহার : সংবর্ত')

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। কারণ-উদ্ধৃতিসহযোগে প্রমাণ করার ব্যাপার এটা নয়। এ একরকম মনোভাব, যা সমগ্র কবিতার মধ্যে অনুরণিত। অথচ তিনি মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এবং অধুনা যেমন তিনি রাজনৈতিক কবিতা লিখছেন, তাতে এমন ধারণাও হয় যে তিনি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যার বিষয়ে ওয়াকিবহাল। এ এক আশ্চর্য পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাব—সাধারণ মানুষকে নগণ্য মনে করে সাধারণ মানুষের জন্যেই উৎকর্ষিত হওয়া। একটু অনুধাবন করলেই টের পাওয়া যায় যে আসলে বাস্তব মানুষ নয়, মানুষ নামের একটি নির্বস্তক ধারণাই তাঁর মনোযোগের কেন্দ্র, নির্বস্তক এ মানুষও আবার কোনো বিশেষ দেশের মানুষ নয় স্বদেশের বাস্তব মানুষ তো নয়ই। প্রকৃত আত্মজ্ঞাতিকতা এ নয়। এ হল এক ধরনের ‘কসমোপলিটান’ মনোভাব, যা দেশকে বাদ দিয়ে ‘বিশ্বের’ ভাবনা করে, এবং পরিণামে বিশ্বকেও ফাঁকি দেয়। রবীন্দ্রনাথ যে সুধীন্দ্রনাথকে জ্ঞান ও ভাবের রাজ্যে যাযাবর বলেছিলেন, সে উক্তি এই দিক দিয়ে সত্য হয়ে উঠেছে।

॥ দুই ॥

যাই হোক এবার দফাওয়ারী আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

সুধীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতাগ্রন্থ ‘তর্কী’ প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ সালে, অর্থাৎ ইংরেজী ১৯৩০-এ। ঐ সময় এ দেশের সামাজিক পরিস্থিতি কী ধরনের ছিল তা আশাকরি সকলেরই জানা আছে। বিশ্বব্যাপী মন্দা, জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা, মধ্যবিশ্বের বেকারজীবন এবং সমাজের নিচের দিকে গণচেতনার প্রসার—এই বিচিত্র টানাপোড়েনে আমাদের

জাতীয় মানস তখন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তার মধ্যে একদিকে ছিল বর্তমানের স্বাসরোধকারী যন্ত্রণা, অন্য দিকে ছিল ভবিষ্যতের পথ-আবিষ্কারের ব্যাকুলতা।

কিন্তু 'তবী'র মধ্যে হতাশার সুরই বড় হয়ে উঠেছে। জীবনের যে ডাঙা-গড়ার ছন্দ ক্রমেই উদ্ভাল হয়ে উঠছিল, তার ছাপ (একমাত্র শব্দবিন্যাসের মধ্যে ছাড়া অন্যত্র) তেমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়নি। তিনি নিজেই 'তবী'র প্রথম কবিতাতে বলেছেন—

তবী সে যে।

জীবনের রুদ্র বহি তাই কি নিস্তেজে
জ্বলে ক্ষুদ্র চক্ষুদীপে তার?

... ...

সে যে অনামিকা

অনিত্যা মুমূর্ষী অম্মা, তবু তার রূপমরীচিকা

নিশ্চয় অমিত শূন্য মরুভূমিমাঝে

অস্তিম সম্বলসম দিশাহারা নয়নে বিরাজে ॥

অতঃপর প্রিয়তমার এই 'রূপমরীচিকা'ই কবির প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠল। কিন্তু প্রেমের কবি শাস্তি পান না, বলেন—

কাত্তার ক্ষীণাঙ্ঘি তনু বক্ষে ধরে দুর্বিসহ বলে,
চেয়ে আছি তাপদগ্ধ বুড়ুকার আবিল অতলে।

(শৃঙ্গার : তবী)

এবং শেষপর্যন্ত তাঁর ধারণা জন্মে—

আঁধার আঁধার ঘোর নিয়ত আঁধার

নীরব নিবিড় স্থির নিখিল আঁধার।

পলকের দুরাশার অচির বিদ্যুৎশিখা,

জীবনে উদ্ভাস-স্পৃহা, জীবিতের দৃপ্ত অহমিকা,

ছালে না পথের বাতি সনাতন তামসের বৃকে।

(নিকষ : তবী)

'তবী'র পর্যায়ে অবশ্য এ ধারণা একেবারে নিশ্চয় হয়ে ওঠেনি। এর ভেতর থেকেও কবি মাঝে মাঝে মুক্তির উপায় খোঁজেন—

মোর জীর্ণ স্বরদের দীর্ণ অন্তঃপুরে,

একই রূপদ, হায়, বাজিবে কি অনাদি অশেষ?

রুদ্রবীণা উগ্ররোবে মুহূর্তেক ভীম গর্জে উঠে,

ভৈরব বজ্রার তুলে বিকীর্ণ আকাশে ছুটে ছুটে,

হবে না কি লুপ্ত নিরুদ্দেশ?

(ঐ)

কিন্তু এ-প্রশ্ন তাঁর কবিসত্তার কাছ থেকে যোগ্য সদুত্তর পায় না। তাই পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ ‘অর্কেস্ট্রায়’ এ-সব দুশ্চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে তাঁকে পুরোপুরি প্রেমের দিকে উৎসাহিত হতে দেখি।

॥ তিন ॥

অথচ প্রেমের মধ্যেও যে সুধীন্দ্রনাথ আত্মোপলব্ধির পথ খুঁজে পেয়েছেন, তা নয়। প্রেমের ব্যাপারে তাঁর ধারণা আমাদের আবহমান কালের বিশ্বাসের পরিপন্থী। তিনি ভোগবাদী, কিন্তু প্রকৃত ভোগের ক্ষেত্রে তাঁর মন হতাশায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার কারণ বোধহয় এই যে তিনি নিজেকেই শুধু ভালবাসেন আর কাউকে নয়। তাই ভোগে তাঁর আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় না : মৃত্যু-আলিঙ্গনে আবদ্ধ পুং-মৌমাছির মতো নিজেকে একেবারে নিঃশেষে ক্ষয় করে ফেলার আগে যেন তাঁর মুক্তি নেই। তাই তিনি বলেন—

মৃত্যুর পাথের দিতে কানাকড়ি মিলিবে না যবে,
রূপাক্ষ সুবার আশ্রি সেইদিন মহাসত্য হবে।

(মহাসত্য : অর্কেস্ট্রা)

সংকল্প হিসেবে একথা তিনি উচ্চারণ করেন যে,

ফুটিবে গাধায় মোর দুঃস্থ হাসি, সুখের জ্বন্দন,
দৈনিক-দীনতা-দুঃখ বাঁচিবার উল্লাস কেবল,
নিমেষের আত্মবোধ, নিমেষের অধৈর্য অবল,
অশ্বশু-নির্বাণ-ভরা রমণীর তড়িৎ চুম্বন।।

~ (হৈমন্তী : ঐ)

কিন্তু কার্যকালে যা ঘটে তা এই—

গোপন বৈভব আমি ব্যক্ত করি নি প্রিয়ারে;
বুঝি নাই বিনিময়, বিনাবরে কুড়ায়েছি পূজা;
অস্তিব্যাপ্ত ক্ষুধা মম অবরোধে ঘিরেছে তাহারে;
পরিতৃপ্তি বিতরিতে পারে নি স্বয়ং দশভূজা।।

(অকৃতজ্ঞ : জ্বন্দসী)

এবং পরিণামে মেনে নেন,—

নির্বাণ নিশীথে
কারারুদ্ধ আয়ুর মিয়াদ,
রোমস্থ বিশ্বাস,
বিষায়িত ভবিষ্যের ধ্যান,

অভিজ্ঞান

শকুন্তলের স্পর্শ কলুষিত।

(সংবর্ত : সংবর্ত)

কিংবা—

অর্ধনারীশ্বর নয়, স্ত্রী-পুরুষ দ্বন্দ্বে প্রিয়মান :

মিথুন নিমিত্ত মাত্র, কর্মকর্তা প্রতিযোগী প্রেত :

তুমি, আমি সর্বস্বান্ত, পৈশাচিক ঋণ শুধে শুধে।।

(জাতক—১ : সংবর্ত)

ফলে পরিস্থিতি দাঁড়ায় এই রকম—

তোমার সান্নিধ্যে তাই বসে থাকি আমি মৌনপ্রায়।

সৌজন্যের ঘটাপোষে আপনাকে পাকে পাকে ঘিরে ;

যে-দিকে-তাকাই দেখি নিরাশ্বাস, বুদ্ধির তিমিরে

মোদের বিয়োগধর্মী চৈতন্যের চক্রচর ফণা

অতদ্ব জ্বালায় কঙ্কে নিরুপায়ে করে আনাগোনা।

(ব্যবধান : উত্তরফাছুনী)

‘স্বয়ং দশভূজা’ যাকে পরিতৃপ্তি দিতে পারেননি, প্রেম-যে তাকে ‘নিরাশ্বাস, বুদ্ধির তিমির’ থেকে অন্য কোথাও পৌঁছে দেবে না, এ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। তাই তাঁর প্রেমের কবিতায় জ্বালা আছে, কিন্তু প্রগাঢ়, বেদনা নেই—নেই দেহ-মনে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠার প্রেরণা। এ এক অদ্ভুত জৈব-বন্ধন—‘সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিস্নন পুনরালিস্নন’—যা কেবলই পীড়ন করে এবং পাঠককে পীড়িত করে তোলে।

তার প্রধান হেতু এই যে, সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় প্রিয়তমার স্থান খুবই নগণ্য। প্রেমিকের ভোগলিঙ্গা চরিতার্থ করা ছাড়া তারও যে নিঃস্ব আনন্দবেদনাময় জীবন আছে, তার কোনো পরিচয় এই সব প্রেমের কবিতায় নেই। প্রেমের অপূর্ব বিন্যাস আমরা পেয়েছি চণ্ডীদাসের পদাবলীতে, পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে; সেখানে প্রেমের দ্বৈতসম্পর্ক স্বীকৃত। বিরহের যন্ত্রণা ও মাথুর সে-সব কবিতাতেও কম প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু তাতে প্রেমিকযুগলের পরস্পরের প্রতি গভীর আকর্ষণ এবং সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে বেশি। সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় এই পারস্পরিক ব্যাপারটা অনুপস্থিত—আগাগোড়াই প্রায় এক উচ্ছ্বাস। কিন্তু নাটক বা আখ্যায়িকায় যেমন প্রতিনায়কের চরিত্রে সঞ্জীবতা না এসে নায়কের চরিত্র সঞ্জীব হয়ে ওঠে না, তেমনি অস্পষ্ট তুলনা হলে প্রেমিকাকেও জীবন্ত ভাবে উপস্থিত করা দরকার। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় তা ঘটেনি বলে প্রেমিক হিসাবেও তাঁর ভূমিকা বিবর্ণ এবং অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। তাই চণ্ডীদাস-

রবীন্দ্রনাথে প্রেম মানবিক, সুধীন্দ্রনাথে প্রেম অমানবিক।

ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, মাঝে মাঝে সুধীন্দ্রনাথের মতো বিচক্ষণ সর্বজ্ঞ ব্যক্তিরও চোখে মায়াঞ্জন লাগে। তখন তিনি বসে ওঠেন—

একটি কথার দ্বিধাধরধর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থামিলো কালের চিরচঞ্চল গতি;

... ..

স্মৃতিপিপীলিকা তাই এ-মাধুরী হ'য়ে
অমার রক্তে পুঞ্জিত করে কণা;
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মমতাস্নেহে
আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না॥

(শাস্তী : অর্কেস্ট্রা)

কিংবা অকপট বেদনার স্বাক্ষর রাখেন—

নব বসন্তে নায়িকা নির্বিশেষে
দিইনি যে-ফুল ক্ষণিকার হাতে তুলে;
সে-কুসুমে রচি অঞ্জলি অক্লেশে,
রাখিয়াছিলাম তোমার চরণ-মূলে।
একবার তুমি তাকালে না তার পানে;
গন্ধে পরাগে নিসে না নিজেই ভরি;
কণিকাসার তাই সে দিনাবসানে;
ত্রিসীমায় আর আসিবে না মধুকরী।

(প্রত্যাহ্বান : সংবর্ত)

এই সব পংক্তিতে কবির বৈশিষ্ট্য অটুট আছে; অথচ আবেগেও দানা বেঁধে উঠেছে। যে সংযম এবং দৃঢ়সংবদ্ধ পদরচনা সুধীন্দ্রনাথের বান্ধিত, তা তাঁর আত্মপ্রকাশের বিরুদ্ধাচরণ না করে অর্থনারীশ্বরের মতো কাব্যশরীরে এক হয়ে গেছে। তেমনি পার্থক্য হয়ে উঠেছে চপলা নামক কবিতাটি—

জনমে জনমে মরণে মরণে,
মনে হয় যেন তোমারে চিনি।
ও-সরমার্ত অরূপ আনন
দেখেছি কোথায় হে বিদেশিনী?... ০

ইত্যাদি। কিংবা 'নাম' শীর্ষক কবিতাটি—

চাই, চাই, আচ্ছো চাই তোমারে কেবলি।

আজ্ঞো বলি

জনশূন্যতার কানে রুদ্ধকণ্ঠে বলি, আজ্ঞো বলি—

অভাবে তোমার

অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,

কাম্য শুধু স্বপ্নের মরণ।...

কিন্তু এ রকম অকুঠ অস্বপ্নকাশের সুযোগ সুধীন্দ্রনাথ খুব বেশী গ্রহণ করেন নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর বাগবাহুল্য প্রায় ডিসিসর্ব্বই হয়ে উঠেছে।

॥ চার ॥

প্রেম ছাড়া সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে অন্য যে-লক্ষণ প্রধান হয়ে উঠেছে সে হচ্ছে তাঁর দৃশ্যদৃশ্যপারসমূহের প্রতি মনোযোগ। মনুষ্যজন্মের সার্থকতা, মৃত্যুরহস্য, সমাজে ব্যক্তির স্থান ইত্যাদি তত্ত্বালোচনায় তাঁর আগ্রহ অনেক রচনাকেই দার্শনিকতার পর্যায়ে নিয়ে গেছে। প্রচুর পড়াশোনা করেছেন তিনি, নানা তথ্যের সমাবেশে রচনাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলায় দিকে ঝোঁক তাঁর অত্যন্তই বেশী। কিন্তু মুক্তিলাভ হয় এই যে সে-সব Logic-এ Major Premise তাঁর মনগড়া হওয়ার জন্যে Deduction-ও হয় অবাস্তব। তাঁর এমনি একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, মানুষ মূলত একা—বিচ্ছিন্নতার অনন্ত সমুদ্রে তারা দ্বীপপুঞ্জের মতো অবস্থান করছে।

...সে-খণ্ড বিশ্বের

মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি না কি জানি

নাস্তিরই বিবর্তবাদ।...

(যযাতি : সংবর্ত)

হয়তো এটা ঠিক যে, সুধীন্দ্রনাথ যেকালে কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন তখন এই বিচ্ছিন্নতার দিকটাই প্রবল ছিল; এবং এখনও তার দায়ভাগ আমাদের বিড়ম্বিত করছে। কিন্তু সেটা যে স্বাভাবিক অবস্থা নয়, এ চেতনা তখনও সহৃদয় ব্যক্তির ছিল, এখনও আছে। বরং সময় যতো অগ্রসর হচ্ছে ততোই স্পষ্ট হয়ে উঠছে এই অস্বাভাবিক ব্যক্তিবিশিষ্টতার কারণগুলি। মানুষ-যে স্বভাবতই সামাজিক জীবন, এবং স্বার্থাশ্রয়ী বিভেদ চক্রান্তের সুবিধাবাদকে অতিক্রম করে সে-যে সমাজবাসী ব্যক্তি হিসেবেই সার্থক হতে চায়, মনুষ্যধর্মের এ অভিব্যক্তিও ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে আজ। এবং সুধীন্দ্রনাথ যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন, তখনও এ-চেতনা অনাবিষ্কৃত ছিল না। কিন্তু প্রত্যয় হিসেবে এর উন্টোটাঁই তিনি গ্রহণ করলেন; তাই বিচ্ছিন্নতার জন্যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল কম—নিরুপায় আর্তিই প্রধান হয়ে উঠল।

এবং শুধু তাই নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের যেহেতু কোনো যোগাযোগের ভিত্তি নেই, সেই কারণে মানুষের ভবিষ্যতেও কোনো বিশ্বাস নেই সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়। তাই তিনি বলেন—

....সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা;

বিদ্রোহে স্বাতন্ত্র্য নাই; মুক্তি মানে নিরুপায় ক্ষমা;

সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গন, পুনরাঙ্গিন।।

(সৃষ্টিরহস্য : জন্মদসী)

কিংবা

মনে হয় তাই

আত্মরক্ষা হাস্যকর, সুসঙ্কল্প মৌখিক বড়াই,

জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,

নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া

শবের সংসর্গ আর শিবির সদৃশ।

মানসীর দিব্য আবির্ভাব,

সে-শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী;

(নরক : জন্মদসী)

এবং তারপর—

মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ

সংক্রমিত মড়কের কীট;

শুকায়েছে কালঘোতে, কর্দ্দমে মিলে না পাদপীঠ।

অতএব পরিজ্ঞান নাই।

যন্ত্রণাই

জীবনে একান্ত সত্য, তারি নিরুদ্ধেশে

আমাদের প্রাণযাত্রা সাজ হয় প্রত্যেক নিমেষে।

(ঐ)

বর্ণনা এমন ছোরালো যে, পাঠক যদি এর দ্বারা প্রভাবিত হন তো অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এই ভবিষ্যৎহীন শ্বাসরোধকারী পরিণতির কথা শোনার জন্যেই কি কবির কাছে মানুষ আসে? জীবনে যন্ত্রণা আছে, বিশেষ করে স্বদেশে ও স্বসমাজে, কিন্তু সেই যন্ত্রণাবোধ জাগিয়ে আমাদের চিন্তবৃত্তিকে অসাড় পঙ্কু করার জন্যে কাব্যপাঠের প্রয়োজন হয় না, বাস্তবজীবনই যথেষ্ট। কাব্য দেবে তার মুক্তির পথ— প্রত্যক্ষে না-হোক পরোক্ষে।

তাই প্রকৃত কবির কাছ থেকে সমাজ চায়, নিদাক্ষণ দুঃখের দিনেও জীবনের সদর্থক ধারণাগুলির পুনরুচ্চারণ। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়

সংবর্তের (অর্থাৎ ধ্বংসের) বিত্তীষিকা ছাড়া আর কিছুই প্রায় স্থান পায় না। মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নেই, কারণ তার মর্মে মর্মে মড়কের কীট বিরাজ করছে। অতএব বেশ গৌরবের সঙ্গেই বলেন, তিনি

...বিপ্লবে বিপ্লবে

বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী

(যযাতি : সংবর্ত)

কাছেই চরম দুর্দিনেও যে-পৃথিবীতে নবনারী ঘর বাঁধে, শিশু আশ্তিনায় খেলা করে এবং বারবার প্রত্যাহত হয়েও জীবন নবউদ্দীপনায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়, সে পৃথিবী তাঁর কাছে মায়া বলে মনে হয়।

মাঝে মাঝে অবশ্য নিজেই বুদ্ধিবিলাসী মনকে ডেকে তিনি বলেন—

কাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?

মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।

অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেই খাবে?

কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।

... ..

তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।

অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরি ক্ষতি।

শ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।

(উটপাখী : কন্দসী)

এবং এমন ধারণাও মনে জাগে যে—

তার স্বাধিকার আগে ফিরে দিতে হবে;

নতুবা নগর, তথা প্রান্তর,

ভ'রে রবে বাসী শবে।

... ..

স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে

শুদ্ধির তাওবে।। (নান্দীমুখ : সংবর্ত)

কিন্তু পূর্বাপর যে নিশিহ্ন হতাশার অন্ধকার ঢেলেছেন তিনি, তার মধ্যে এই প্রত্যয়গুলি জোনাকীর চেয়েও ক্ষণস্থায়ী মনে হয়।

তথাপি বসতে হবে, 'উটপাখী' কবিতাটি অনবদ্য—বাস্তবের ধূলিঝড়ের সামনে বালুতে মুখগোঁজা বুদ্ধিবাদী শ্রেণীর সার্বক কাব্যরূপায়ণ ঘটেছে ঐ কবিতায়। এবং আবেগ এখানে যথার্থ বলেই তার বহিরঙ্গণেও কোনো কণ্ট-কল্পনার ছাপ নেই। সংবর্তের 'জেসন্' কবিতাটিতেও প্রায় অনুসূপ

সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর ‘ত্রিশঙ্কু’ যা বোধহয় গ্রন্থাকারে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে সর্বশেষ রচনা, মোটেই স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠেনি। নানা মিল, এবং বিশেষ করে অন্তর্মিলে, আঠারো মাত্রার পয়ারের প্রয়োগনৈপুণ্যে এবং মেটিমুটি রচনায় একটা নাটকীয় গুণ বজায় রাখার প্রচেষ্টায় এ কবিতাটি হয়তো বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তবে সাধারণ পাঠক এখানে বিড়স্থিতই হবেন। এই কবিতা এবং সুধীন্দ্রনাথের অনেক রচনার বিষয়েই তাই মনে পড়ে আলংকারিক কুস্তকের সাবধানবাণী—

অতিশয় আসক্তি-হেতু বর্ণগুণি প্রযত্নপূর্বক বিরচিত হলে প্রস্তুত বিষয়ে ঔচিত্য-

হানি হয়, এবং ফলে বাচ্য-বাচকের পরস্পর-স্পর্ষিত-রূপ সাহিত্যগুণ নষ্ট হয়।

(বঙ্গোপদ্রোহীবিহিত, ২।৪, বৃত্তি)

এই প্রসঙ্গেই আমরা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাবার আলোচনায় আসছি।

॥ পাঁচ ॥

বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কদিনের যত্নে যে ভাষা গড়ে তুলেছিলেন তা যে ২০-’৩০-এর পরিবর্তিত ও পরিবর্ধনশীল জাতীয় মানসকে উপযুক্তভাবে প্রতিফলিত করতে পারছিল না, এ চেতনা রবীন্দ্রনাথেরই শেষ বয়সের রচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অমিত রায়ের মুখে ‘বিদ্রোহের রেখা’ ‘বর্ষার ফলা’ বা ‘ন্যুরালজিয়ার ব্যাধা’ ইত্যাদির তুলনা উপস্থিত করে এই প্রয়োজনকেই ঠাট্টার ঘুরপথে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তিনি। বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্র অনুকারকদের চিত্তাহীন গতানুগতিকায়। এই তারল্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে নতুন কিছু সৃষ্টি করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

সুধীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার সেই প্রয়োজনীয় বহিরঙ্গ-সংস্কারে মনোযোগী হয়েছিলেন। এবং স্বীকার করতে হবে, রচনাকে অভ্যস্ত পদনালিত্য থেকে মুক্ত করে একটা বলিষ্ঠ কাঠামো দিতে পেরেছিলেন, এবং পাঠকের খিমিয়ে-পড়া স্নায়ুকে খানিকটা সজাগও করে তুলেছিলেন।

কিন্তু আমরা জানি, কাব্য রচনা কেবল বহিরঙ্গের ব্যাপারই নয়। আন্তরিক ভাবসম্পদের সঙ্গে একাত্মতা লাভ না করলে তা কেবল আলংকারিকেরই কৌতূহল মেটায়, কাব্যরসিকের আনন্দ জাগায় না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা অধিকাংশ জায়গাতেই ভাব ও ভাষায় কালিদাস-কথিত সেই পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো অভিন্ন হয়ে উঠতে পারেনি।

এবং তার কারণ বোধহয় এই যে, নবযুগের দাবী মতো তিনি ভাষা গড়েছেন, কিন্তু নবযুগের প্রেরণা মতো, ভাবসম্পদ আহরণ করেননি। ভাষার দিক থেকে তিনি আধুনিক, ভাবের দিক থেকে গতানুগতিক—বরং কোনো কোনো দ্বন্দ্বগায় রীতিমত অতীতমুখী। সেই আরিস্টটলীয় অনুশাসন “...it is not the function of the poet to relate what has happened, but what may happen,—what is possible according to the law of probability or necessity.” সে বিষয়ে মোটামুটি তিনি প্রায় অচেতন। তাই কাব্যের ভূমিকায় শব্দপ্রয়োগ নিয়েই বেশি ব্যাপ্ত।

সম্প্রতি প্রকাশিত সংবর্ত কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন, “...বিশ বৎসর যাবৎ আমি...জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই।...উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য। ছন্দে শৈথিল্য প্রশ্রয় না দিয়ে, লঘু-শুরু, দেশী-বিদেশী, এমন কি পারিভাষিক, শব্দ আচরণীয় কিনা, সে অনুসন্ধানও হয়তো কোনো কোনো কবিতায় রয়েছে।” এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে আমি শুধু বলতে চাই, সুধীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষার স্তরে রয়ে গেছে, কাব্যসার্থক হয়ে ওঠেনি। এই একান্ত বুদ্ধিনির্ভর শব্দের স্থাপত্য এবং আলংকারিক বন্ধোক্তি-পাঠে মনে পড়ে সংস্কৃত-কবি ভট্টির কথা, যিনি নিজের কাব্যের সম্বন্ধে সগর্বে বলেছিলেন—

—“আমার কাব্য কেবলমাত্র ব্যাখ্যার সাহায্যেই বুঝতে পারা যাবে। এ হবে সুধীগণের বিপুল উৎসব-স্বরূপ। বিদ্বানদের আমি ভালবাসি বলে, এই কাব্যবিষয়ে অল্পবুদ্ধিগণ আমায় নিহত হল।” (ভট্টিকব্য, ২২১৩৪)

এর উত্তরে ভট্টির সমসাময়িক আলংকারিক ভামহ বলেছিলেন—

—“কাব্যগুলিও যদি শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় ব্যাখ্যার সহায়তায় বুঝতে হয়, তবে সুধীগণেরই উৎসব বটে। হায়, হায়, মন্দবুদ্ধিগণ মারা গেল।”

সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বেলাতেও মোটামুটি প্রায় একই অবস্থা ঘটেছে। ‘গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ’ ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি এমন এক কাব্যভাষার আশ্রয় নিয়েছেন যা গদ্যেরও নয়, পদ্যেরও নয়। পাঠকদের কাছ থেকে বেশি মনোযোগ দাবী করতে গিয়ে তিনি কাব্যরচনার পরিবর্তে শব্দময় বাক্যরচনায় উৎসাহী হয়ে পড়েছেন। অথচ আসলে যে তিনি একজন কবি, সে-পরিচয়ও তাঁর কোনো কোনো কবিতায় পাওয়া যায়। মনে হয়, নিজের এই স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশকে সযত্নে চাপা

দেওয়াতেই তাঁর আনন্দ। না হলে চাঁদের প্রতিশব্দ হিসাবে ‘শশী’ অরণ্যকে ‘বিপিন’ এবং বাহুকে ‘ভূজ’ বলার আর কি সার্থকতা থাকতে পারে?

অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ যে এ পথের প্রথম পথিক তা নয়। প্রায় একশ বছর আগে মধুসূদনও এমনই অপ্রচলিত শব্দ এবং বাগভঙ্গী ব্যবহারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপক্ষে একথা বলার আছে যে, তিনি আমাদের নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার বর্ণাঢ্য কাব্যরূপ উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন—বীররস, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং অপ্রচলিত নায়ক নির্বাচন করে তিনি যে মহান সমুদ্র-গর্জনের মতো কাব্যরচনা করেছিলেন, তাঁর কাব্যভাষা ছিল তারই অনিবার্ণ উপাদান। সুধীন্দ্রনাথের কল্পনা ও বক্তব্যের তেমন কোনো বিজ্ঞত পটভূমি নেই। বরং আছে এক সর্বগ্রাসী বিবর্ণতা ও বিবাদ। ফলে তাঁর ক্ষেত্রে অপরিচিত গুরুগম্ভীর শব্দপ্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। মনে হয় এ যেন একটা সজীব আত্মবিকাশ নয়, যান্ত্রিক নির্মাণ। তাতে পাঠকের মনে বিস্ময় ছাগলেও আনন্দ জন্মে না।

॥ ছয় ॥

কিন্তু আগেই বলেছি, পাঠকের কথা ভেবে কলম ধরেননি সুধীন্দ্রনাথ। ভারতীয় রসশাস্ত্রের আদি প্রবক্তা ভরত মুনির সময় থেকেই একথা স্বীকৃত হয়েছে যে, কাব্য রচিত হয় ‘সহৃদয় সামাজিকের’ জন্য। সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য বলতে পারেন, তাঁর কালে এবং তাঁর দেশে সামাজিকেরা ‘সহৃদয়’ নয়। কিন্তু এ অভিযোগ পুরোপুরি অমূলক না হলেও বলতে হয়, আমাদের ঔপনিবেশিক শিক্ষিত সমাজেও মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ পাঠের পর একশ্রেণীর পাঠক দেখা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেই বা কয়জন সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে নিজের ভাবনা বেদনার প্রতিচ্ছবি দেখে খুশি হন। আসলে সহৃদয়তা কেবল সামাজিকেরই আচরণীয় নয়, কবিরও বুঝতে হয় সামাজিকের সুখদুঃখ। তবেই সম্ভব হয় আলংকারিকদের কথিত সেই ‘সাধারণীকরণ’, যার মারফৎ কবিতা হয় Communication. সুধীন্দ্রনাথ কাব্যের এই পরমাগতি, অর্থাৎ পাঠক মনের বিষয়ে বিশেষ ভাবিত বলে মনে হয় না। তাই তাঁর কাব্যে ‘সাধারণীকরণ’ নেই, আছে কতকগুলি আপ্তবাক্য। ফলে তিনি যে বলেছেন, “আমার লেখায় আধুনিক যুগের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।”—সে-উজ্জিকোও খণ্ডসত্য হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

কেননা, তিনি আমাদের সমগ্র দেশের নয়, সাধারণ-শিক্ষিত পাঠক-

শ্রেণীরও নয়, একমাত্র সেই মৃষ্টিমেয় বুদ্ধিবিলাসী সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি, যাঁরা সমস্যাাকে বাস্তব-বিচ্ছিন্নভাবে নিছক সমস্যা হিসাবে দেখেন। এবং সেই জন্যে সমস্যারও তাঁদের শেষ হয় না, বাস্তব জীবনের দায়িত্ব স্বীকার করারও অবকাশ ঘটে না। আসলে বাস্তবকে পরিহার করার জন্যেই তাঁদের এই জটিল তত্ত্বালোচনার আগ্রহ। তাই গভীর কোনো মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করাও তাঁদের আদর্শের পরিপন্থী।

সুধীন্দ্রনাথের কবিমানসেও দেখি এই বিরাট নৈরাজ্যের বিশৃঙ্খলা। প্রেম তাঁকে বিশেষ আশ্রয় দেয় না, প্রকৃতি তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করে না, মানুষ তাঁকে তেমন উৎসাহিত করে না। তিনি নিজে একবার বলেছিলেন, নাস্তিজ্ঞাত মানুষ নাস্তিতেই শেষ হয়; সেই কথাকেই ঘুরিয়ে আমরা বলতে পারি, নাস্তিজ্ঞাত কবিতাও শেষ হয় নাস্তিতে। নিজের এই ‘অশ্লীল ক্ষুধাকে’ সংযত করে তিনি যদি ‘লোকায়তে’ ঘর বাঁধতেন, বাংলা সাহিত্যে হয়তো তিনি মধুসূদনের উত্তরসাধক হিসেবে মর্যাদা পেতেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় পদ রচনা করলেও বাংলাদেশ তাঁর কাব্যচেতনার বাইরে।

তাই তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধানে সমুদ্র এই দিগ্বিজয়ী চিন্তা-‘যাযাবরে’র বিষয়ে আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের পথনির্দেশ—

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।।

দশমী

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সিগনেট প্রেস।। এক টাকা।।

সুধীন্দ্রনাথ প্রকরণ-নিপুণ আঙ্গিকসিদ্ধ কবি। কবিতা যে আসলে একটা সম্ভ্রান শিল্পকর্ম এবং উচ্চারণ-পদ্ধতির নিছকতা যে অর্জনের সামগ্রী সুধীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চায় সেকথা সর্বতোভাবেই স্বীকৃত। কলাকৌশল স্বাচ্ছন্দ্যের জন্মশত্রু—এই বিশ্বাসবশ বর্তিতায় বাঙলাদেশে অনেক কাঁচা কবিতার অতি-উৎপাদন ঘটেছে। সুখের কথা, সুধীন্দ্রনাথ তাঁদের দলভূক্ত নন। উন্নাসিক আবেগবাদীদের মতে নিষ্ঠা ও শ্রম কাব্যসিদ্ধির পক্ষেই হিসেবে যত অকিঞ্চিৎকরই হোক, একথা মানতেই হয়, কোনো শিল্পকর্মেই ও-দুটোকে বাদ দিয়ে সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়।

‘দশমীর’র কবিতাওচ্ছ কবি সুধীন্দ্রনাথের রূপকারী ও পরিশ্রমী কবিকর্মের নিদর্শন। হৃন্দের কঠিন কাঠামোয় কবি স্বেচ্ছাবন্দী। এবং এই বন্ধন স্বীকারেই সুধীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের মুক্তি। ‘দশমী’তেও তাঁর স্বকীয় ও স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর চিনতে একটুও ভুল হবার কথা নয়। ইতিপূর্বে ‘যযাতি’ ও ‘ফনের দিবাস্বপ্ন’ কবিতা দুটিতে বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ যতিপাতে তিনি যে আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা যে নেহাত আকস্মিক নয়, নতুন করে তার প্রমাণ মিলল ‘দশমী’তে। ‘তীর্থপরিক্রমা’, ‘ভূমা’, ‘উপস্থাপন’ যতিপাতের বিচিত্র জটিল ও আশ্চর্য সফল নিদর্শন হিসেবে স্মরণীয়।

সুধীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা লেখেন না। হৃন্দের নিয়মানুবর্তিতা মেনে নিয়েই কবিতায় তিনি গদ্যের দৃঢ়তা আনেন। যুক্তিনির্ভর গদ্যের চালটাই তাঁর স্বকীয় বাচনপদ্ধতি।

‘আমি ক্ষণবাদী; অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়

নিমেবে তামাদী আমাদের ইচ্ছিয় প্রত্যক্ষ, তথা

তাতে যার ছের, সে সংসারও।’ (উপস্থাপন)

মিলটা পদ্যের, কিন্তু চালটা গদ্যের। ‘ক্ষণবাদী’র সঙ্গে ‘তামাদী’র অপ্রত্যাশিত গোপন মিলে কান সজাগ হয়ে ওঠে, অথচ যতিপাতের

কৌশলে হৃন্দোবদ্ধ পদেও আসে গদ্যের ঋজুতা। ভাষা-ব্যবহারে এ-কবি গদ্যপ্রতিম রীতিরই পক্ষপাতী। গদ্যকবিতা নয়, ছন্দের নিয়ম রক্ষা করেই সুধীন্দ্রনাথ পদ্যের পেলব শরীরে আনেন গদ্যের পেশল বিন্যাস।

গদ্যের সঙ্গে পদ্যের বর্ণবৈষম্য নিয়ে বিবাদ জীবন্ত ভাষার পক্ষে বড় বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়, গোঁড়া সীমান্তরক্ষীর কড়া নজর এড়িয়ে গদ্য যখন পদ্য হয়ে ওঠে, এবং পদ্য কখন গদ্য হয়ে ওঠে—তা নিয়ে নিছক গোঁড়ামির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কথায় ও লেখায় আমরা যে-গদ্য ব্যবহার করি, পদ্য থেকে তার সম্পূর্ণ বহিষ্কৃতি সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। কবিতা নিশ্চয়ই ব্যবহার্য ভাষার অনাখ্যীয় হবে না, এবং আমাদের রসনার স্বাদবদলেরও প্রয়োজন। বহুকালের অভ্যাসে কবিতা বলতে কোমলকান্ত পদাবলী ছাড়া আর কিছুই বুঝি না। কিন্তু যে-ভাষা চলেফিরে বেড়ায়, আমাদের প্রাত্যহিকতায় বহু দায় যাকে মেটাতে হয়, তাকে অস্ত্রজ বঙ্গে কাব্যের আসর থেকে বিদায় দিলে কবিতার পক্ষে ক্ষতির কারণই ঘটবে। সুখের বিষয়, কবিতার লালিত্যে গদ্যের কাঠিন্য যোজনা করে সুধীন্দ্রনাথ প্রমাণ করতে পেরেছেন, কবিতা শুধু লালিত্যে চলে না, বক্তব্যের প্রয়োজনে যথেষ্ট ঋজুভঙ্গিও তার আয়ত্তে। অবশ্যই একটা প্রশ্ন ওঠে। সুধীন্দ্রনাথের যদুচ্ছ যতিপাত, যার ফলে কবিতায় আসে গদ্যের ঠাট, তার অনেকখানিই বুঝি-বা অব্যয়নির্ভর। অর্থাৎ—অপচ-এমন-বটে-কিন্তু-র মতো অব্যয়বহুল বাকবিন্যাসমাত্রকেই গদ্যজাতীয় বলা চলে না। আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই, সুধীন্দ্রনাথে কথ্যভাষার ব্যবহার নেই, এমনকি নেই এমন ভাষা যার গায় প্রাত্যহিক ব্যবহারের ধুলোমাটি লেগেছে। শুধু কি কতগুলো অব্যয়-যোজনায় সম্ভব লিখিত গদ্যের সঙ্গে নিঃসম্পর্কীয় পদ্যের সম্পর্কস্থাপন? আসলে এজন্যে প্রয়োজন মানুষের দৈনন্দিন ভাষার কাছ থেকে পাঠ নেওয়া। জনকল্যাণ-বোধের প্ররোচনায় নয়, জাতীয় জীবন ও লোকযাত্রার সঞ্চয়কে আত্মসাৎ করাতেই কবির অভীষ্টসিদ্ধি সম্ভব। আমাদের একান্ত নাগরিক সংস্কৃতিই বাদ সেধেছে। লোকায়ত সংস্কৃতির দিকে পিঠ ফিরিয়ে কবিতার সুরে গদ্য তথা কথরীতির স্বরযোজনা কদাচ সম্ভব নয়। আজো যে আধুনিক বাঙলা কবিতা পদ্যের ললিত আসর ছেড়ে জীবনকে অঙ্গীকার করে স্নাত্ত রৌদ্রে নেমে আসতে পারে নি, তার জন্যে আমাদের পদ্যভুক রুচি যতটা দায়ী, তার চেয়েও বেশি দায়ী আমাদের পুঁথিসর্বশ্রম জীবন। অগত্যা কবিতায় গদ্যের দার্দ ও কথ্যভাষার বৈচিত্র্যের জন্যে আরো প্রতীক্ষার প্রয়োজন।

কবিতায় সুধীক্ষনাধ দুরূহ শব্দব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁর ভাষা সাহ্য শব্দ সংস্কৃতবহুল, চাল ধ্রুপদী। ‘দশমী’তেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। অবশ্যই বাঙলা শব্দের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে এ প্রয়াস কার্যকর, তবু বুদ্ধি না, কবিতা কেন অভিধান-নির্ভর হবে। চলতি জীবনের অপরিমেয় শব্দভাণ্ডার থেকে কিছুই কি তাঁর নেবার নেই? একথা অবশ্যই বলি না, কবি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পাঠকের সংখ্যান্নতা বিবেচনা করে কবিতা লিখবেন। পাঠক যদি অনুপযুক্ত হন, তবে সে দায় অংশত পাঠকেরও। সেজন্যে কবিকে বোলো আনা দোষের ভাগী করা নিরর্থক। কিন্তু প্রশ্ন এই, শব্দনির্বাচনে কবি যখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দুরূহতার আশ্রয় নেন, তখন তা নিশ্চয়ই কবিতার পক্ষে অপরিহার্য বলেই গ্রহণীয়। ইন্ডিয়গ্রাহ্য বিশেষ একটি জগৎ হয়তো বিশেষ একটি শব্দে, এবং একটি মাত্র শব্দেই, ব্যঞ্জিত হতে পারে। ত্রিভুবন খুঁজে কবি হয়তো সেই শব্দটিকে আবিষ্কার করেন। এবং তার মধ্যে দিয়েই ইন্ডিয়গ্রাহ্য পুরো একটি জগতকে কবি ছুঁতে পারেন। শব্দটির সার্থক প্রয়োগেই অনেক ব্যঞ্জনা ও অর্থগুণতায় কবির বক্তব্য অব্যর্থ হয়ে ওঠে। তাই, একেই বলে কথা আবিষ্কার। এবং এই অর্থে কবিতা শব্দাশ্রয়ী বই কি।

কিন্তু সুধীক্ষনাধের শব্দনির্বাচনের অতি-আভিধানিকতা কি এই জন্যেই? ‘দশমী’র দশটি কবিতার একটিতেও এমন ধরনের অব্যর্থ ও বিশেষ গুণাঙ্কিত শব্দপ্রয়োগের নমুনা পেলাম না। দুরূহে আপত্তি নেই, কিন্তু সেটা পাধর হয়ে চেপে বসবে না, হীরে হয়ে জ্বলবে। শব্দ তার নিষ্কম্ব আভাষ, প্রতিবেশকে আলো করে তুলবে। যে-টুকু বলা যেত তার চেয়েও অনেক বেশি বলা গেল, এই জন্যে একটি শব্দের ওপর কবির পক্ষপাত থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু অভিধান-শোভন শব্দে ভারী ‘দশমী’তে সে প্রয়াস কোথায়?

শব্দের আরো একটা গুণ আছে। সে হচ্ছে ধ্বনিগৌরব। বিশেষ একটি আকাঙ্ক্ষিত ধ্বনিকে আভাসিত করার প্রয়োজনে অপ্রচলিত, অব্যবহার্য, এমন কি উৎকট শব্দব্যবহারকেও আমরা মানতে প্রস্তুত আছি। অবশ্য নিছক শব্দালঙ্কার যে কতদূর অশ্রাব্য হতে পারে, তার নজির প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে ছুরি ছুরি। সুধীক্ষনাধ রূপদক্ষ কবি। তিনি জানেন শব্দকে কী করে বাজাতে হয়। কিন্তু শব্দের ধ্বনিক অর্থবহ করে তোলার দিকে কখনই তিনি নজর দেন না। কখনো কখনো শব্দব্যবহারে সুধীক্ষনাধ উলটোরীতি মেনে চলেন। শব্দকে ব্যবহার-বিন্যাসে আরো বেশি অর্থবহ না করে, অর্থহ্রাস ঘটান, অনুবঙ্গমুক্তি

ঘটিয়ে শব্দকে শোঁড়া করে তোলেন। ‘অস্তিম কুম্ভক’, ‘বরকটি অক্ষয় অশোকে’ ইত্যাদি প্রয়োগ শব্দের অর্থহ্রাসের নমুনা হিসেবেই গ্রহণযোগ্য।

শব্দধ্বনির যে স্বতন্ত্রমূল্যের কথা বলেছি, ‘দশমী’তে সুধীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কেও অনীহ। ‘দশমী’তে শব্দের ধ্বনি অর্থনির্ভর, এবং একান্তভাবেই অর্থনির্ভর। ধ্বনির নিজস্ব কোনো মূল্য স্বীকৃত হয় নি। ধ্বনির বিচিত্র মিশ্রণে শ্রুতির সুখ সুধীন্দ্রনাথের কাম্যই নয়। তাই তাঁর শব্দ যতটুকু অর্থের ওজন বহন করে ততটুকুই তার দাম। শ্রুতি ও স্মৃতি— সুধীন্দ্রনাথে এ-দুয়ের দাবি সমভাবেই অস্বীকৃত। তিনি যা দিতে চান তা হচ্ছে ‘বুদ্ধির সুখ’। শুধু এইটুকুর জন্যে অভিধানের শরণাপন্ন হতে ভরসা হয় না, কেননা সেক্ষেত্রে শ্রমটা নেহাতই পশুশ্রম; এবং চলনসই বাঙলা অভিধানের ওপরও পরিপূর্ণ ভরসা করতে গেলে ঠকতেই হয়।

চিত্রকল্প ব্যবহারে ‘দশমী’র কবিতাগুলি সুধীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নতুন করে বলার মতো নয়। এমনকি একদা ‘অর্কেষ্টা’র বা তার পরের কাব্যগ্রন্থগুলিতে ইমেজ সৃষ্টিতে কবি যে সার্থকতা আয়ত্ত করেছিলেন, ‘দশমী’তে তা যেন অনেকটা স্বেচ্ছায় পরিত্যক্ত :

‘তোমারই কেশের প্রতিচ্ছায়ায়

গোধূলির মেঘ সোনা হয়ে যায়;

পাকা দ্রাক্ষার অরাল জতায়

তোমারই তনুর মদিরা ভরা;’ (চপলা)

কিংবা, ‘সেদিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া

মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে’ (শাস্তী)

ইত্যাদি অজস্র চিত্রকল্পব্যবহারে সুধীন্দ্রনাথ যে অবিস্মরণীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, ‘দশমী’র একটি কবিতাতেও তার রেশ পাওয়া গেল না।

‘শরতের সমারোহ প্রকাশ প্রান্তরে;

চক্রবালে শুভ্র মেঘপাল

নিশ্চিন্তে বেড়ায় চ’রে; কদাচিৎ খোঁড়ায় রাখাল

স্নিগ্ধ বনাঙ্করে।’ (নৌকাডুবি)

কিংবা, ‘হেমন্তের বেলা পড়ে আসে

ক্ষেতে ধান ক্ষেতে কাটা হয়ে গেছে সারা

খামারে খামারে সোনা, ভারা ভারা খড় আশে, পাশে;

স্তম্ভ ঘাট, রিক্ত বাট; একমাত্র তারা

অনুমিত পাণ্ডুর আকাশে।।” (অগ্রহায়ণ)

সুধীক্ষনাধের পূর্বাধিত সাফল্যের তুলনায় এগুলো যেন নিতান্তই নিম্নাভ।

এই কারণেই মনে হয়, সুধীক্ষনাধ ‘দশমী’তে বহুব্য বিষয়েই অধিকতর মনোযোগী। যে বৈরাগ্য ও নির্বেদবাদ সমগ্র ‘দশমী’র দর্শন, কাব্যরীতিতেও সে বৈরাগ্য প্রসূত হয়েছে। ক্রোচে-কথিত উক্তি ও উপলব্ধির অধীনে কবি বিশ্বাসী। অতএব অনুভূতিতে যে বৈরাগ্য, কবির রূপকল্প ও অলঙ্কারেও যেন তার আভাস মেলে। ‘দশমী’ পূর্বতন কাব্যগ্রন্থগুলির তুলনায় অনেকখানিই নিরলঙ্কার। ‘দশমী’তে সুধীক্ষনাধ যে অনেকখানিই নিরাবেগ সন্দেহ হয়, তার উৎস কি এই বৈরাগ্যই?

কবির শূন্যতা ও রিক্ততাবোধে ‘দশমী’র কবিতাগুলো বিষাদগ্রস্ত বর্ণরিক্ত, ধূসর সায়্যাহ এ কাব্যের পটভূমি; কবির কণ্ঠস্বরেও সীমাহীন ক্লান্তি। স্বপ্নহীন, কল্পনাহীন, ভবিষ্যতহীন অথচ অন্ধকারে রাগগ্রস্ত কবির জগৎ। মানবেতিহাস—সে শুধু ‘সর্বনাশেরই দেশনা’। সমস্ত কর্ম, সমস্ত প্রয়াস, সমস্ত উদ্দীপনা অভিশপ্ত বন্ধ্যাত্মে আচ্ছন্ন। কবির বিশ্বরূপদর্শন কবির গোচর আনে শুধু ‘অমা’কেই :

‘অস্তিত্ব এতে সন্দেহ নেই আর

অলাতচক্রে ঘুরে ঘুরে; সংসার

অনাদি অমাকে আনে আমাদের গোচরে।’

এই বিশ্ববীক্ষায় কবি ‘নির্ভার আবহে স্মৃতি অস্ত্রভৌম আমার সরিতে’ মজ্জমান। তাই তো কবি সিদ্ধান্ত টানেন ‘বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী’। এক অমোঘ নিয়তিবাদেই স্বস্তি পান কবি, ‘আমাদের নিয়তি অগন্ত্যযাত্রা’।

‘বিশৃংখলার পরাকাষ্ঠায় স্থাপু

পৃথিবী অনাধ; যথেষ্ট পরমাণু,

প্রগতিক শুধু কালভৈরব সদসে,—

মোহমুক্ত তিক্ততা কবিকে এই ভয়াবহ নৈরাশ্য ও শূন্যতায় নিয়ে যায়। তাই বুঝি সুধীক্ষনাধ বৈনাশিক কণবাদেরই প্রত্যয়শীল।

আসলে ‘দশমী’তে সুধীক্ষনাধ যতখানি তাত্ত্বিক, ততখানি কবি নন। এ কবির সূয়োদর্শনের সঙ্গে আমার মতানৈক্য অবশ্যস্বার্থী। যদিচ একথা স্বীকার্য যে সুধীক্ষনাধের কবিস্বভাবে যে নৈরাশ্যবোধ পূর্বাপর ক্রিয়াশীল দ্বিতীয় মহাবুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতেই তার শিকড়। জীবন যে প্রতিদিন প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে পীড়িত, এবং অনেক প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধই যে ভঙ্গুর, এমন অনুভবকে একেবারে মূল্যহীন বসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

একথাও হয়তো সত্য যে এই যন্ত্রণাবোধের দিকে সম্পূর্ণ পিঠ ফিরিয়ে আজ নির্ভেজাল ‘বিশুদ্ধ আনন্দ’-র কাব্য রচনা হয়তো সম্ভবই নয়। মনুষ্যত্বের সর্বব্যাপী অপজ্ঞাপে সংচেতন কবির পক্ষে নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যবাদ হয়তো নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিপর্যয়কে জানা আর ভগবান বলে মানা এক নয়। কবির নাস্তিক্যবুদ্ধি যদি ‘অমোঘ নিয়তি’ ও ‘চক্রচর কালে’র আস্তিক্যে অতিবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, তবে নিঃসন্দেহেই সেই নেতিবাদী আস্তিক্যে শঙ্কাশীল হওয়া যায় না। পরস্তু জীবনের প্রতি দুর্জয় অভিমান থেকে এই নিরস্ত শূন্যবাদের জন্ম, ‘দশমী’-র পাঠকের পক্ষে এ ব্যাখ্যা বড় অস্বস্ত বলেই ঠেকবে। ‘দশমী’তে সুধীন্দ্রনাথ নেতি ও নাস্তিক্যের নগুর্ধক জগতের বাসিন্দা। মানবসভ্যতা এই ভূয়োদর্শনে আস্থাশীল হলে উটপাখির সঙ্গে মানুষের তফাত থাকে কিসে?

আসলে কিন্তু আপত্তিটা সেখানেও নয়। আপত্তি এইখানেই যে, সুধীন্দ্রনাথ ‘দশমী’তে যে অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করেছেন, তা বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তো বটেই, এমনকি বাঙলা সাহিত্যেও পূর্বনুবৃতি। এমনকি এ নৈরাজ্যবাদ সুধীন্দ্রনাথের পূর্বতন কবিতাগুলোতেও বহুবার বহুভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সংকটবোধ ও বিপর্যয়বাদে ঠাসা ‘কঁাপা মানুষ’গুলোর কথা আমরা এতবার এতভাবে শুনেছি যে, ‘দশমী’ কাব্যের উপলব্ধি আজ আর নতুন করে একটুও সাড়া জাগাতে পারে না।

এবং আরো বড় আপত্তি ওঠে এই কারণেই যে, সুধীন্দ্রনাথ উপলব্ধির প্রয়োজনে কবিতার উদ্ভিপদ্ধতির নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। কবিতা নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতার নিষ্কর্ষ। কিন্তু শুধু কি তাই? কবিতার আরো বড় কাজ পাঠককে সে অভিজ্ঞতা পাইয়ে দেওয়া। কবির ভাবনার সঙ্গে আমার মতের গরমিল থাকতে পারে, কিন্তু সেটা কাব্য-উপভোগের ব্যাপারে খুব বেশি বড় বাধা নয়। কবি শুধু জীবন সম্বন্ধে ‘বাণী’ দেন না, জীবনকে যে-ভাবে তিনি দেখেন, সে-ভাবে দেখাতে পারাটাই বড় কথা। যে বিরল অভিজ্ঞতা কবির ভাব-পরিমণ্ডলে বৈদ্যুতিক আবেগের সঞ্চার করে, পাঠকের মধ্যে তাকে সঞ্চারিত করাই তো কবিতার কাজ। ঘোষণাসর্বস্ব বা বাণীপ্রধান কাব্যকে এই কারণেই কাব্য আখ্যা দিতে আমার বিবেকে বাধে। উপলব্ধির মোহনায় পৌঁছতে গেলে কবি যে-অভিজ্ঞতার যন্ত্রণাময় তরঙ্গে আন্দোলিত হন, প্রয়োজন পাঠককেও তার অংশভাক্ত করা। কবি কী ভাবেন, সেটা নিশ্চয়ই বড় কথা। কিন্তু কবি

কেমন করে ভাবেন এমন কেনই বা ভাবেন, সেটা আরো বড় কথা। নেহাত অনুমানের ওপর এ দায় চাপিয়ে দিলে পাঠকের ওপর সুবিচার হয় না। আমার বিশ্বাস, কোনো ভালো কবিতাই তা করে না। ‘ওয়েস্টল্যান্ড’-এ যুদ্ধকৃত পৃথিবীর বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলো কবি জীবন থেকে তুলে আনতে পেরেছিলেন, সমস্ত ইওরোপের ক্ষয়ের সংকটময় চেহারা কবিতাটিতে ধরা পড়েছিল। ‘অসত্য শহর’ কিংবা ‘লণ্ডন সেতুর পতন’ যে ভয়ংকর ভাঙনের ছবি তুলে ধরে, একটা বিরাট সভ্যতার পতনের যে অনুভব কবি সঞ্চারিত করেন, ব্যবহারগুণে তা যেন প্রতীক হয়ে উঠেছে। আসলে ভালো কবিতায় একটি পঙ্ক্তিকেও আসনচ্যুত করার পথ নেই। কিন্তু দুঃখের কথা সুধীন্দ্রনাথের মতো প্রকরণসিদ্ধ কবির ‘দশমী’ কাব্যে অভিজ্ঞতার সন্নিপাত ঘটে নি। কেন যে একটি বিশেষ জায়গা থেকে শুরু করে একটি বিশেষ জায়গায় কবিতা শেষ হল তা বোঝাবার দায় নেই, কবি জীবনকে তুলে আনতে পারেন না বলেই শেষ পর্যন্ত শুধুই আর্থ ঘোষণা।

তুলনা করতে চাই না, তবু এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশকে স্মরণ করা চলে। বলা বাহুল্য জীবনানন্দও একান্ত নৈঃসঙ্গের কবি। ধূসর জীবন ও যন্ত্রণাময় নরকদর্শন থেকে তাঁরও অব্যাহতি ছিল না। কিন্তু আর্থঘোষণাও তাঁর কবিতায় কদাচিৎ বিড়ম্বিত হয়েছে। জীবনানন্দের কবিতা শেষ করে তাঁর ধূসর অনুভবের বিচিত্র আলো-আঁধারের ছোঁয়া পেয়ে আমরা যেন কবির অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে দিয়ে কবির হাত ধরে পরিক্রমণ করে আসি। জীবনানন্দ কেন, অর্কেস্ট্রা’র কবির তীব্র অনুভবগুলিই কি ভোলবার? দশমীতে কেন যে সুধীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতার ছলটুকু বাদ দিয়ে তত্ত্বের ক্ষীরটুকু দেবার নীতি নিয়েছেন, তা দুর্বোধ্যই ঠেকে। এ নীতি নয়। বিভিন্ন উল্লেখ, অনুবঙ্গ, রূপকল্প ও ভাবচ্ছবি দিয়ে কবি তাঁর নিজস্ব জগতটিকে তৈরি করেন। উপলব্ধির যে চূড়ায় কবির বাস, কবিতাই সেখানে পৌছানোর পথ। কবিতার মধ্যে জীবনকে এমনভাবে তুলে আনতে হয়, তা চিরকালীন না হলেও অদ্ভুত তৎকালীন সত্যে সার্থক। তা না হলে কবিতা শুধুই বৈদম্য হবে, কাব্য হবে না কোনোক্রমেই। ‘দশমী’ কাব্যে কবির অভিজ্ঞতাগুলোতে আমরা ছুঁতে পারি না। আধুনিক অনুষঙ্গবর্জিত শব্দে, দূরত্ব সাহিত্যভাবায়, দূরধিগম্য তত্ত্বে ভারাক্রান্ত ‘দশমী’। আমাদের মতো স্বল্পবিদ্য পাঠকের কবি নন সুধীন্দ্রনাথ।

‘দশমী’ সম্পর্কে আরো একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। যে বস্তুনিষ্ঠা

ধাকপে বিশ্বসংকটকে সত্য সত্যই মূর্ত করে তোলা যায়, কবি যেন তাতে উদাসীন। এ কাব্যে সুধীন্দ্রনাথের তমিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি যথোচিতভাবে প্রতিফলিত হয় নি। ‘দশমী’তে কবি যেন বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক! অথচ বক্তব্য-প্রকাশের ভঙ্গিতে ভুল বোঝার অবকাশ থাকে। মনে হয় বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কবি বুদ্ধি বড় বেশি সচেতন। আমার মনে হয় এইখানেই সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের স্ববিরোধিতা। কেউ কেউ বলেছেন, সুধীন্দ্রনাথ ‘বিরল আত্মজ্ঞাতিক চেতনা’র অধিকারী। ঠিক তার বিপরীত কথাটাই আমার সত্য বলে মনে হয়। বস্তুনিষ্ঠতা কখনোই পুরোপুরি সত্য হয়ে ওঠে না তাঁর কাছে। এক অর্থে সুধীন্দ্রনাথ নয়া মায়াবাদী। ‘সংবর্তে’ তবু ব্যাপ্তি ছিল, ছিল সমরশ্বসিত পৃথিবীর সমূহ সংকট সম্পর্কে কবির ভাব্য; কিন্তু ‘দশমী’তে সে ব্যাপ্তি অনুপস্থিত। কবিতা হয়তো এক অর্থে-ভাষণই। কিন্তু তমিষ্ঠ কবিমাত্রেরই বিশ্ববীক্ষা বস্তুজগৎ থেকে উপজাত। কবির নৈরাশ্য বোধ যদি শূন্য থেকে উদ্ভূত হয়ে শূন্যের দিকেই ধাবিত হয়, তবে তার বস্তুনিষ্ঠ নিশ্চয়ই নয়। এবং সুধীন্দ্রনাথের বস্তুনিষ্ঠা বহিরাঙ্গিকমাত্র।

সুধীন্দ্রনাথ তাঁর পুনর্মুদ্রিত ‘অর্কেষ্টা’ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন, ‘ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোনাই কবিজীবনে পরম সার্থকতা।’ অর্থাৎ ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাটিকে কবি আরো কিছুটা এগিয়ে দেন। বৌদ্ধক্ষণবাদের উল্লেখ থেকে স্বভাবতই সন্দেহ হয়, সুধীন্দ্রনাথ বুদ্ধি জাতীয় ঐতিহ্যকেই আশ্রয় করেছেন। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেয়ি হয় না। ‘দশমী’র কবির ক্ষণবাদ শুধু উল্লেখমাত্রেই পর্যবসিত। এবং বৌদ্ধতত্ত্বের আধুনিক সংরক্ষণ হিসেবেই তাঁর কাব্যের গুণাগুণ বিশ্লেষণের উপযোগিতা নিরর্থক। কবিতায় তাত্ত্বিককে আমরা ততটাই মানতে প্রস্তুত যতটা সে কবিতার যোগান দেয়। আবেগ সঞ্চারণের যোগ্যতাকে কবিতা বিচারে ছেঁটে ফেলার উপায়ই নেই। ‘দশমী’তে কোথায় সেই আবেগ, অভিজ্ঞতার রূপায়ণ যা না হলে কবিতা কবিতা হয়ে ওঠে না এবং তত্ত্বজ্ঞেরও মন ভরে না? একটা অপরিপুষ্ট ও খণ্ডিত দার্শনিকতায় ‘দশমী’ বিড়খিত। এবং দর্শনের হৃন্দোবদ্ধ রূপায়ণই কি কবিতা?

কি ভাববাদী কি জড়বাদী সকল কবির উপলব্ধিই অভিজ্ঞতাজাত। বিশেষ থেকে নির্বিশেষ এবং সামান্যের যোগেই অসামান্যের যোগফল। জীবনকে আমি কিভাবে দেখি, কিভাবে দেখতে চাই এবং কিভাবে দেখতে পাই না বলে আমার ক্লেভ—সব কবিকেই এ প্রশ্নের মধ্যে

দিয়ে যেতে হয়। জীবন থেকে কী চাই, এবং কী চাই না— একথা সব কবিকেই নিজের মতো করে বলতে হয়েছে। জীবন সম্পর্কে প্রস্তাব দিতেই হবে, তা বলি না, কিন্তু অভিজ্ঞতা মাত্রেরই উৎপত্তির সূত্রটা পাঠকদের হাতে ধরিয়ে দিতে হবে। এবং একান্ত বিবিধ কবিকেই জ্ঞানানি দিতে হবে, কেন এবং কোথায় এই নৈঃসঙ্গ্যের উৎস।

সুধীক্ষনাধ তা করেন না তাঁর কবিতা ‘অনুমানে গুরু সমাধা অনিশ্চয়ে’। কবি বলেন, ‘পাতী অরণ্যে কার পদপাত শুনি’—তখন বিমূঢ় হয়ে দ্বিগ্ধাঙ্গা করতে সাধ জাগে, কার পদপাত? ‘তখাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি’? —কেন এবং কী প্রয়োজনেই বা?

‘হঠাৎ শুনি মৌনে কানাকানি

কোথায় যেন কিসের উপক্রম?’—

কার কানাকানি এবং কিসেরই বা উপক্রম? যদি ধরা যায় কবির শূন্যবাদের হ্রাস ঘটেছে এবং ক্রমশ এক অনতিস্ক্রুট আশাবাদের ব্যসন আসছে কবিতায়, তবু দ্বিগ্ধাঙ্গা থাকে, কেন এবং কোথায়ই বা তার উৎস?

‘দশমী’তে তার উত্তর নেই। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং কুশঙ্গী কবি হিসেবে সুধীক্ষনাধের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। তাই আশা করি ‘দশমী’র পরবর্তী কোনো পূর্ণাঙ্গ কাব্য সংকলনে আমরা কবি অভিজ্ঞতার সহযাত্রীদের অধিকার পাব। এবং তাঁর কবিতার রসোপভোগের দরজা মেচ্ছাকৃত স্বল্পবাঞ্ছিতায় ও বাক্যসংবরণের তাগিদে তিনি দশমীর মতো রুদ্ধ করে রাখবেন না।

বিমল ভৌমিক

অর্কেষ্ট্রা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রীসুধীন্দ্র দত্তের নতুন কবিতার বই ‘অর্কেষ্ট্রা’ পড়তে বসে পড়তে বসে প্রথমেই তার কোষ্ঠিকা খোঁজ করবার কৌতূহল যে হয়েছিল একথা স্বীকার না করে পারছি না। ব্যাপারটা সত্যিই অস্বাভাবিক বোধ হয় নয়। ‘অর্কেষ্ট্রা’র কবিতা সে জ্বালের নয় যাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা যায়। বয়সসন্ধিগত কিশোরী অহেতুক আনন্দের উচ্ছ্বাসে যখন তখন নিজের মনে এসব কবিতার কপি আবৃত্তি করেছে, এ কথা কল্পনা করা শক্ত। এ কবিতা তার চেয়ে অনেক পরিণত মনের বায়না নিয়েছে। ‘অর্কেষ্ট্রা’-কে বুঝতে হলে শুধু নয়—উপভোগ করতে হলেও তার জ্বাতকের রাশিচক্র প্রভৃতি জ্ঞানতে হয়।

‘অর্কেষ্ট্রা’-স্বপ্ন-পত্রিকায় যাদের প্রভাব পড়েছে সে সমস্ত নক্ষত্র নির্ণয় করা কিন্তু একটু কঠিন। গ্রহাবরণে প্রকাশের ইঙ্গিত থেকে কোনো সাহায্যই পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের কথা অবশ্য বাদ দিলাম কারণ আমাদের আকাশের ধূমকেতুরাও এখনও সৌরমণ্ডলের সম্পর্ক ছাড়াতে পারে নি। কিন্তু আবার যে-সব প্রভাব এ কাব্যের রূপ নিয়ন্ত্রিত করেছে তাদের উৎস সহজে ধরা যায় না। এ যুগের আরো অনেক কবির মত আধুনিক বিদেশী কবিতার আওতাতেই অর্কেষ্ট্রার কবির প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছে বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কিন্তু সে ধারণা ঘোপে ঢেকে না। অড়েন প্রভৃতিকে পেরিয়ে গিয়ে ইলিয়ট পাউণ্ডের সঙ্গেও তাঁর কুলজি কোনো রকমে মেলে না। তার আগের নক্ষত্রেরা তো অনেক আলোকবর্ষ দূরে।

বিশেষ থেকে দৃষ্টি স্বদেশে ফিরিয়েই ‘অর্কেষ্ট্রা’র প্রেরণার উৎস যেন পাওয়া যায়। পশ্চিমের দিকে একান্তভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ফলেই বোধ হয় সন্ধান গোড়ায় দূরত্ব মনে হয়েছে। ‘সোনার পাথর বাটির’ মতো অসম্ভব শোনাতেও অর্কেষ্ট্রা দেশী সুরেরই ঐক্যতান। সংস্কৃত কবিদের পাহাড়বাঁধানো হৃদ খরতোয়া নদী হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তার পিতৃ-পরিচয় প্রচ্ছন্ন নয়। সুধীন্দ্র দত্তের কবিতায় ভঙ্গিমার যে নতুনত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,

প্রকাশ-সীতির যে দুর্বলতাহীন ঋজুতা আমাদের কৌতূহলী করে তোলে, ভূঁইফোড় অর্থে তা মৌলিক নয়। তার ডিৎ সভাই আছে ঐতিহ্যে।

অর্কেষ্ট্রার কবিতা কিন্তু তাই বলে প্রবণতী নয়। মোহিতলালের ক্ল্যাসিসিজমের পরিণামই বোধ হয় তাঁর পরবর্তী কবিদের সে প্রবণতা অনেকটা শুধরে দিয়েছে। সুধীন্দ্র দত্ত গীতি-কবিতাকেই অতি-লাঙ্গিত্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করবার দুরাহ সাধনায় লেগেছেন। তাকে দিতে চেয়েছেন গ্রুপদের মর্যাদা।

বাংলা কবিতায় এ চেষ্টা সুধীন্দ্র দত্তের রচনা প্রকাশিত হবার আগে থাকতেই হচ্ছিল, হওয়া অনিবার্য ছিল। সে চেষ্টা নানা কবির মধ্যে অবশ্য বিভিন্নরূপ নিয়েছে। কবি মোহিতলালই এ বিষয়ে আধুনিক কবিদের অগ্রণী। বাঙালি কবিতায় ভাস্কর্যের ছায়া প্রথম তার লেখাতেই পাই। সত্যেন্দ্র দত্তের খ্যাতি-নির্নাদিত যুগে রচনা শুরু করলেও তিনি আধ-আধ-স্পর্শিত ভূষণ ও নিছক ছন্দ-চাতুর্যের মোহ পেরিয়ে এসেছিলেন দৃঢ় ব্যঞ্জনার পৌরুষত্বে। শেষ পর্যন্ত প্রাণহীন ক্ল্যাসিসিজমের নীরস মরুতে গিয়ে না পড়লে তার কাব্য-প্রতিভা এমন অকালে শুকিয়ে বোধহয় যেত না। বাংলাকাব্য তাঁর দ্বারা আরো সমৃদ্ধ হতে পারত। তবু মোহিতলালের ভাস্কর্যে মসৃণ মার্বেলের লীলায়িত রেখাই পাই—আয়নার মত তা পালিশ করা। সে লীলায়িত রেখাকে ভেঙে দেয়ার চেষ্টা বা সাহস তাঁর ছিল না। অপ্রত্যাশিত কোণ তুলে ধরে দুঃসাহসিক নূতন বিন্যাসের সৌন্দর্য-সৃষ্টি করবার কল্পনাই তিনি সম্ভবত করেননি। সচেতনভাবে যাঁরা এ চেষ্টা করে সার্থক হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্র দত্তের নাম কিন্তু সর্বাগ্রে নয়। তাঁর কাব্যে ঋজু দৃঢ়তা আছে কিন্তু তাকে কেমন আড়ষ্টতা বলেই সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। তাঁর বসিষ্ঠতা অধিকাংশ সময়ে কাঠিন্যের বেশি আর কিছু নয় এবং সে কাঠিন্য কৃত্রিম না হলেও নিতান্ত বাহ্যিক। নরম ‘পুত্রের’ ওপর তিনি প্রধানত শব্দের কড়াপাক লাগিয়েছেন। শব্দ-কষ্টকিত তাঁর কাব্যের চেহারা তাই বেশিক্ষণ মৌকা দিতে পারে না, তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে যায়। বোঝা যায় আধুনিক অন্যান্য কবিদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি মামুলি। কিন্তু সেই মামুলিয়ানাতেই তাঁর শক্তি ও সার্থকতা।

মামুলি শব্দটা আমাদের ভাষায় দাগি হয়ে গেছে, বর্তমানে আমরা কণাটা প্রায় গালাগালির সামিল করে তুলেছি। তাই এখানে একটু টীকা বোধহয় প্রয়োজন। ‘অর্কেষ্ট্রা’- কবি এই অর্থে মামুলি যে রসের সনাতন উৎসেই তাঁর নির্ভা অটুট আছে। কাব্যের হাঁচ বদলাবার উদ্দেশ্যেই জীবনের হুকু ও বাতিল করবার উন্মত্ততা তাঁর ভেতর দেখা যায় নি, কোনো কোনো সমসাময়িক

কবির মত। ভাবাবেগ-ভীতিও ব্যাধিরূপে তাঁর ভেতর সংক্রামিত হয় নি। সুদীর্ঘ দশ এ দিক দিয়ে একান্তভাবে সনাতনপন্থী। উদ্ভট ইঙ্গিত ও উল্লেখের ছড়াছড়ি করে রচনাকে বুটা ছোঁলুস দেবার আধুনিক বাস্তব থেকেও তিনি সৌভাগ্যক্রমে মুক্ত। তাঁর রচনায় শব্দের ভুলটি যতই থাক, তার অন্তরালে সেই পরিচিত পৃথিবীই দেখতে পাই যেখানে সূর্য ওঠে, মানুষ ভালবাসে, বেদনা পায়, ব্যাকুল প্রশ্ন তোলে। সংস্কৃত-সমৃদ্ধ আধুনিক মনের আধারে তাই চিরন্তন রস-ধারাই উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

ক্রন্দসী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সমর সেন

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটি ঐতিহাসিক, সুতরাং নৈতিক, ভিত্তি ছিল। কিন্তু এই সর্বগ্রাসী ভূতকে ঘাড় থেকে নামানোই হল আঙ্গকের দিনের প্রধান সমস্যা। বর্তমান পৃথিবীতে তাই সনাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নৈতিক ভিত্তি আর নেই। সুধীন্দ্রনাথ মৃতপ্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কবি; কিন্তু আঙ্গকের বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলার কথা এবং কারণ, তাঁর অজ্ঞাত নয়। তবু জ্ঞানের চেয়ে মোহ বড়, এবং অভিজ্ঞতাটো সুধীন্দ্রনাথের কবিতার রঙে মেশানো। সেজন্য বারে বারে তাঁর মন পুরাতন স্বাতন্ত্র্যের অসম্ভব আদর্শের দিকে ছোটে, এবং ব্যর্থতায় ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে। এরই স্বাতন্ত্র্য-প্রতিঘাত তাঁর কাব্যের মূল প্রেরণা। দুটি পৃথিবীর মধ্যে তিনি দণ্ডায়মান, তার একটি মৃত, আর একটি জন্মবার ক্ষমতাহীন। মৃত পৃথিবীর বিষয় আমাদের কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু নবজন্মের সম্ভাবনায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মানসিক যন্ত্রণা শেষ পর্যন্ত ফাঁপা বলে ঠেকলে অবিচার হবে না। তিনি এসে পড়েছেন বিমর্ষপ্রায় বণিক বিশ্বের প্রান্তে, উত্তরকালে তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, পূর্বকালের স্মৃতি তাঁর কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেছে। প্রাক্তন, জাতিস্বয়ং ইত্যাদি কথা এবং পৌরাণিক কল্পনার প্রানুর্ভাব তাঁর কাব্যে সে জন্মই হয়তো বেশি। রাণীকে মৃত জ্ঞানলেও বাঁদীতে তাঁর কোন আসক্তি নেই। ব্যক্তিগতভাবে সনাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আমি আস্থাহীন, তবু ফীড্রাসের উদ্ধৃতিতে শ্রদ্ধা করতে পারি, কারণ এটা তো সহজে কল্পনা করা যেতে পারে যে, ‘অস্তুরঙ্গে সৌন্দর্য্যের আদর্শ আর তার সম্ভাবনার মাঝখানে আছে অনাগত সমাজ-বিপ্লবের ব্যবধান। ততদিন অস্তুরঙ্গে সৌন্দর্য্য আনাটা নেহাৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার; আধুনিক অভিজ্ঞাতের এই ক্রন্দসী অভীক্ষার প্রতি প্রবল অনুরাগ আনাটা ততদিন শক্ত, কারণ বছদিন থেকে সুক্ক করে আঙ্গ পর্যন্ত এই আদর্শ আঙ্গকেমে আশ্রয় নেওয়ার খোঁজস হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। ‘ক্রন্দসী’ পড়ার সময় উপনিষদের বৃক্ষের পরিবর্তে চোখের সামনে ভাসে শূন্যমুখী শিকড়, উৎপাটিত গাছের ছবি। ‘What are the roots that clutch,

what branches grow'—এই প্রশ্নের উত্তর 'জন্মদসী'তে মেলে না।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় আকর্ষণের অনেক জিনিস আছে, আঙ্গিকের এবং মননের দিক দিয়ে। তাঁর কবিতার মেরুদণ্ড অত্যন্ত দৃঢ়, যেটা অধিকাংশ বাঙালি কবিতে একান্ত বিরল। আঙ্গিকের দিক দিয়ে ছন্দের বলিষ্ঠ এবং বেগবান স্বাক্ষর 'জন্মদসী'র প্রধান বিশেষত্ব। তাঁর লেখায় কয়েকটি বহুদীর্ঘ উপাদান বর্তমান, যেমন স্থানে স্থানে পুনরাবৃত্তির এবং অতি-কঠিন শব্দের প্রাচুর্য। এখানে দুটি জিনিস উল্লেখ করা উচিত। প্রথমত, ছন্দের গতিবেগে অধিকাংশ কঠিন শব্দই নিজেদের বোধগম্য করতে সমর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সঠিক শব্দ ব্যবহারের সতর্কতা 'জন্মদসী'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুধীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার প্রায় প্রত্যেকটি পংক্তিও বিস্ময়কর এবং বেগবান সংহতি আছে। দু-একটি পংক্তিই তিনি যা প্রকাশ করেছেন তা অন্যান্য কবিদের হয়তো একটি সম্পূর্ণ কবিতার খোরাক জেটাতে পারে। তবু তাঁর দীর্ঘ রচনার কয়েকটিতে পংক্তিগত সংহতি সত্ত্বেও অসংহতি দোষ বর্তমান।

'জন্মদসী'র পটভূমিকা প্রধানত ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য, কিন্তু আধুনিক জ্ঞানের রসায়নিক প্রক্রিয়া তাকে বিচित्रভাবে রূপান্তরিত করেছে। এতদিন বাঙালি সাহিত্যিকেরা রামায়ণ ও মহাভারতের মূল উপাখ্যান ও বহুবিধ ঘটনাবলীকে চলতি ভাষায় 'গল্প' হিসেবে ব্যবহার করে এসেছেন। বর্তমান সমাজ এবং ইতিহাসের আলোয় যারা উপরোক্ত ঘটনাবলীকে নবরূপ দিতে পেরেছেন, সুধীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। তথাকথিত প্রেমের কবিতা 'জন্মদসী'তে একটিও নেই, এ-ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য। 'জন্মদসী'-র মূলভাবের কথা প্রথমেই লিখেছি। ধ্বংসপ্রায় ব্যক্তিব্যক্তির বিশ্ব সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে ব্যর্থতাবোধ এনেছে, এবং এটিই 'জন্মদসী'র বিশিষ্ট বৈচিত্র্য। এর ফলেই তিনি লিখতে পেরেছেন :

মিশরী সমাধিসম মরুগ্রস্ত এই যাদুঘরে।

নিঃস্ব রোমহুঙ্ক কাল আপনারে পরিপাক করে।

(যাদুঘর)

এ জিহ্বা-সেনার পাছে, জানি জানি, আঙ্গিকের মতো
অমিবে কবজযুগ্ম, অঙ্ককার, অস্ত্র বিভীষিকা,
নৈর্ব্যঙ্গিক হাহাকার, আঙ্গিসার, শূন্য মরীচিকা,
মড়ক কঙ্কাল-শেষ, বিকলাঙ্গ গতানুশোচনা,
অক্ষম ক্রোধের দাহ, নিষ্কারণ অতৃপ্তি যন্ত্রণা,
স্কন্ধ আত্মধিকারের ধূমাক্তিত, খিন্ন তুযানল।

(বর্ষ পঞ্চক)

মনে হলো আশা নাই,
 মনে হলো ভাষা নাই পিঞ্জরিত ব্যর্থতা বলার।
 মনে হলো
 সঙ্কুচিত হয়ে আসে মরণের চক্রবাহ যেন।
 মনে হলো রক্তচ্যারী মুখকের মতো
 সঞ্চিত অঞ্জলিকণা কুড়ায়েছি এতকাল ধরে
 কৃপণের ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে;
 এইবার ফুরিয়েছে পালা
 ঘাতক যন্ত্রের কারা অবরুদ্ধ হলো অবশেষে;
 এইবার উন্মোচিত সম্মানজনীমূলে
 পিষ্ট হবে অচিরে অকিঞ্চন উল্লেখ্য মন।।

(সমাপ্তি)

‘ত্রন্দসী’র শেষ কবিতা ‘প্রার্থনা’র মতো ব্যঙ্গ রচনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। আশাকরি সুধীন্দ্রনাথের ব্যর্থতাবোধ ভবিষ্যতে বেদনাবোধ দ্বারা সমৃদ্ধ হবে। মহাভারতে কথিত অরবিন্দ পূর্ব পুরুষদের দুর্দশা দেখে তাদের দুঃখমোচন করেছিলেন; তখন সেটার চেষ্টা না করে মুখিকরাণী কাল দ্বারা হিমপ্রায় শীর্ণসূত্রের জন্য বিলাপ করতে শুরু করলে যে ছবিটা আমাদের মনে আসে তার সঙ্গে ‘ত্রন্দসী’র অধিকাংশ কবিতা তুলনীয়।



সুধীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়

অমিয় ধর

“সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এমন একজন কবি যার প্রতিভা প্রাচুর্যের কথা ভাবলে প্রায় অবাকই লাগে যে কবিতা লেখার মতো একটি নিরীহ, আসীন ও সামাজিক অর্থে নিষ্কল কর্মে তিনি গভীরতম নিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

কেননা সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুভাবাবিধ পণ্ডিত ও মনসী, ঐক্য বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তথ্য ও তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান; তাঁর পঠনের পরিধি ছিলো বিরাট, ও বোধের ক্ষিপ্রতা ছিলো অসামান্য। সেই সঙ্গে যাকে বলে কাণ্ডক্ষম, সাংসারিক ও সামাজিক সুবুদ্ধি, তাও পূর্ণমাত্রায় ছিলো তাঁর, কোনো কর্তব্যে অবহেলা করতেন না, গার্হস্থ্য ধর্মপালনে অনিন্দনীয় ছিলেন, ছিলেন আত্মপদক, রসিক, প্রবর ব্যক্তিত্বশালী, আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ সচেতন, এবং সববিষয়ে উৎসুক ও মনোযোগী।” —বুদ্ধদেব বসু

জন্ম ও বংশপরিচয়

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও ইন্দুমতী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীন্দ্রনাথ ইংরেজি ১৯০১ সালের ৩০ অক্টোবর কলকাতার হাতিবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। ভাই-বোনদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর আট বছরের বড় এক দাঁদ, আর হরীন্দ্রনাথ, নর্মদা, রণেন্দ্রনাথ, রমা, শৌরীন্দ্রনাথ ও ইলা—মোট আট ভাই-বোন। পিতা হীরেন্দ্রনাথ কলকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এ্যাটর্নি, জাতীয়তাবাদী, থিয়সফিস্ট ও বৈদ্যান্তিক পণ্ডিত। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে পিতার সম্পর্কে লিখেছেন—“a liberal humanist and a practising puritan, unvacillating in his personal faith and yet an upholder of religious toleration, a great scholar, and an eminent man of affairs.”—(The World of Twilight: Page 9)। মা ইন্দুমতী দেবী কলকাতার পটলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ বসুমল্লিক বংশের প্রাবোধচন্দ্র বসুমল্লিকের একমাত্র কন্যা ও স্বনামখ্যাত রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিকের ভগিনী। ব্যক্তিত্বময়ী, স্নেহীলা এই রমণী সর্বার্থেই দম্পতিবাদের কর্মী ছিলেন।

“সুধীন্দ্রনাথ যে দম্পতি বংশে জন্মগ্রহণ করেন তা আট প্রাচীন ও বুনিয়াদি বংশ। কলকাতাতেই এঁদের আদি বাস।” সুধীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ সুবিশ্বাস্যত সওদাগর রেলি ব্রাদার্সের মুৎসুদ্দিগিরি করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। পারিবারিক অশান্তির কারণে তিনি মুন্ডারামবাবু ষ্ট্রীটের পৈত্রিক বাড়ি থেকে চলে এসে হাতিবাগানে নতুন বাড়ি করেন। দ্বারকানাথের চার ছেলে।

জ্যেষ্ঠ হীরেন্দ্রনাথ, মধ্যম হীরেন্দ্রনাথ, তৃতীয় অমরেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ বিজয়েন্দ্রনাথ। হীরেন্দ্রনাথের অনুজ অমরেন্দ্রনাথ সে-যুগের একজন প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার। সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—Bengalis are by and large natural actors; and uncle Amar was in addition endowed with a fine presence, a handsome face,...But his open eyes, expressive gestures, and glorious voice had acquired thier capacity for manifesting the slightest modulations of feeling throught years of self-discipline.”—(The World of Twilight; page 34-35)। বালক সুধীন্দ্রনাথের মনে তাঁর কাকা অমরেন্দ্রনাথের একটা স্থায়ী প্রভাব পড়েছিল। পরবর্তীকালেও সে-প্রভাব যে মুছে যায়নি তা- তাঁর কণ্ঠস্বরে, শব্দোচ্চারণে ও নাটকীয় বাগ্‌ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেত। এ বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তিও আমরা পেয়েছি—“নাটকী নায়করূপে আজীবন দেখেছি নিজেকে।”—(‘কল্লুকী’, ‘সংবর্ত’)। শুধু অভিনয় নয়, অভিজ্ঞাত্যেও তাঁর স্বভাবগত। পিতৃকুলের ঐশ্বর্য, ঐতিহ্যপ্রীতি ও অভিজ্ঞাত্য, মাতুলালয়ের পাশ্চাত্যধর্মী উদারমুখ আধুনিকতা এবং পিতার মনীষার উত্তরাধিকারের সঙ্গে পিতৃব্যের অভিনয়পটুতা যুক্ত হয়ে সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে এক রাজকীয় মহিমায় উন্নীত করেছিল; তবে সে-মহিমা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও সুহৃদ-সম্মত আচরণে স্রীমণ্ডিত হয়েই প্রকাশিত হত। সুধীন্দ্রনাথের সহপাঠী স্বনামখ্যাত গোপাল হালদার লিখেছেন,—“কলেজে প্রথম দর্শনেও তাঁকে যে মনে হয়েছিল অদ্বিতীয় তাব কারণ, তখনো তাঁর মুখে ছিল সেই স্বাভাবিক মহিমা—যা চোখে না পড়ে পারে না। আর তাঁর কণ্ঠস্বর, শব্দোচ্চারণ, বাগ্‌ভঙ্গি কৃত্রিম হলেও মনে হত ব্যক্তিত্ববাপ্তক।...সেখলাম—সুধীন্দ্রনাথ জগ্ন্য-অভিজ্ঞাত। অস্রাস্ত্র প্রমাণ তাঁর শালীনতা, সতীর্থের সঙ্গে তাঁর হৃচ্ছন্দ আলাপ-আলোচনা এবং তার চেয়ে বড়ো কথা, নিরতিমান অভিজ্ঞাত ব্যবহার।”—(কপনারানের কুলে, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮-৬০)।

শিক্ষা

বারো বছর বয়স পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ বাড়িতেই পড়াশুনা করেছেন। তাঁর স্কুলের শিক্ষা শুদ্ধ হয়েছিল ১৯১৪ সালে কাশীতে—আনি বেসান্ট-স্থাপিত থিয়সফিক্যাল স্কুলে। সেই স্কুলে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি ভালোভাবেই শিখেছিলেন, কিন্তু বাংলা চর্চার তেমন সুযোগ পাননি। পরে ‘মাতৃভাষাকে স্ববশে আনবার জন্য ও নিজের কবিত্ব-শক্তিকে উদ্ভুদ্ধ করার জন্য’ নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর বেশ মিল দেখা যায়। কাশীর থিয়সফিক্যাল স্কুলে সুধীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাই হরীন্দ্রনাথ ১৯১৪ থেকে ১৯১৭—তিন বছর পড়াশুনা করেছিলেন। ১৯১৭

সালে তাঁদের কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হল এবং তাঁরা ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হলেন। এই বিদ্যালয় থেকে ১৯১৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সুধীন্দ্রনাথ স্কটিশচার্চ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট আর্টস-এ ভর্তি হন। ‘এ সময়ে খুড়তুতো ভাই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ‘নাট্যপ্রতিভা’ পত্রিকায় বে-নামে তাঁর একটি অনুবাদ কবিতা প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—“it was in his imitative magazine that my poor verses appeared for the first time.”—The World of Twilight; page 37)। ১৯২২ সালে সুধীন্দ্রনাথ ডিস্টিংগিশন-সমেত বি. এ. পাস করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংবেজি বিভাগে (১৯২২-২৩) এম. এ.-তে ভর্তি হন এবং একই সঙ্গে ল পড়া ও পিতার কাছে অ্যাটর্নিশিপ-এর শিক্ষানবিশী করেন। তবে ল বা অ্যাটর্নিশিপ-এর কোন পরীক্ষাতেই তিনি বসেন নি। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জনের পড়াশুনা সুধীন্দ্রনাথের কোন দিনই উৎসাহ ছিল না। তবে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিক্ষায়, জ্ঞানার্জনে, দেশ-বিদেশের সাহিত্য পাঠে ও কবিতা রচনায় ‘তিনি গভীরতম নিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।’

প্রথম বিবাহ

সুধীন্দ্রনাথ যখন তেইশ বছরের যুবক, হীরেন্দ্রনাথ তখন পুত্রের বিবাহ দেবেন স্থির করলেন। পাত্রী নির্বাচন কবলেন ৭২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সরোজেন্দ্র বসুর কন্যা ছবিরাগীকে। ছবিরাগী সম্ভ্রান্ত-ধনী পরিবারের সন্তান, দীর্ঘদাঁ ও কাপবতী—বনেদী দত্তপরিবারের রূপবান জ্যেষ্ঠ পুত্রের খুবই উপযুক্ত পাত্রী। পাত্রীকে দেখে সুধীন্দ্রনাথেরও পছন্দ হয়েছিল। ১৯২৪ সালের ২২ জুলাই ছবিরাগী ও সুধীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৯২৫-এর মে মাসে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয়, কিন্তু জন্ম মুহূর্তেই শিশুটির মৃত্যু ঘটে। সন্তান-হারানোর সেই বেদনা সুধীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশও করেছিলেন—

“কে তোরে ডাকিয়াছিল? কেন এলি? কেন গেলি চ’লে?”

সহিল না ত্বরা?

আয়, বৎস, আয় ফিরে, আমাদের ক্ষীর্ণ ব্রীহীন

রিক্ত বক্ষ ভরা।”—(অনাহুত; তবী)।

সাহিত্যসাধনা—প্রথম পর্ব

সুধীন্দ্রনাথ গভীরতম নিষ্ঠায় কাব্যরচনা শুরু করেন একুশ বছর বয়সে। “হাপার অক্ষরে তাঁর যে-সব কবিতার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেগুলির আদি

ও পরবর্তী লেখন সবই রক্ষিত আছে, তাছাড়া আছে দুটি প্রাথমিক খাতা, যাতে তাঁর কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়েছিল। সর্বপ্রথম খাতাটির তারিখ বঙ্গাব্দ ১৩২৯, অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১৯২২, সুধীন্দ্রনাথের বয়স তখন একুশ।”—(বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ-এর ভূমিকা-থেকে)। ১৯২২ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে সাতখানা খাতা ভর্তি করে সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে ৫, ৬, ৭ সংখ্যক খাতার কবিতাগুলি পরবর্তীকালে ‘তদ্বী’ (১৯৩০-এ প্রকাশিত) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয়। হাতিবাগান থেকে জোড়াসাঁকোর দূরত্ব খুব বেশি নয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার খুবই পরিচিত, অই জোড়াসাঁকো গিয়ে কবির সঙ্গে তিনি নিঃসঙ্কোচে দেখা করতেন, সমকালীন সাহিত্য নিয়ে আলোচনাও করতেন। রবীন্দ্রনাথও সুধীন্দ্রনাথের মননশীলতা, সাহিত্যপাঠের ব্যাপ্তি ও কাব্যরচনায় নিষ্ঠা দেখে তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। কবির স্নেহানুকূলে সুধীন্দ্রনাথের ‘কুকুট’ নামে একটি কবিতা ‘প্রবাসীতে’ (আশ্বিন, ১৩৩৫) প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে তাঁর সহপাঠী ও ‘শনিবারের চিঠি’র মণ্ডলীভূক্ত সাহিত্যিক গোপাল হালদার লিখেছেন,—“শোনা যায়—কবিকে সুধীন্দ্র বলেন, কবিতা যে-কোনো বিষয়ে লেখা যায়। কবির হাতে ছিল বৃহৎ মুগী আঁকা সে-মাসের ‘শনিবারের চিঠি’। তিনি বললেন—‘তাই নাকি?’ ছবিটা দেখিয়ে বললেন, ‘লেখো দেখি এ-বিষয়ে কবিতা’। তারই ফল ‘কুকুট’। তাব শেষ কথা ‘বাণী দে, বাণী দে’—রাত্রির অন্ধকারের প্রার্থনা পূরক। এই বোধ হয় ছাপার অক্ষরে সুধীন্দ্রের প্রথম প্রকাশ। ‘প্রবাসী’তে এ কবিতা ছাপা হলে তার অভিধানিক শব্দ-আড়ম্বরে সকলেই চমকিত হয়। ‘শনিবারের চিঠি’তে তাই শ্রীযুক্ত জীবনময় রায় তার ব্যঙ্গানুকরণে লিখলেন কবিতা—‘মংকুন’—তার শেষ কথা ‘পানি দে, পানি দে’—মাথা ঠাণ্ডা হোক কবির।”—(রূপনারায়নের কূলে-২য় খণ্ড: পৃ. ৬৩)।

প্রথমবার বিদেশ যাত্রা

১৯২৯ সালের ১ মার্চ সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়ে প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণে যান। সেই বিদেশ যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন সুধীন্দ্রনাথেরই বন্ধু ও আত্মীয় অপূর্বকুমার চন্দ। ১৯২৯-এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর—প্রায় একবছর সুধীন্দ্রনাথের প্রবাস-জীবন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানে, আমেরিকায়, তারপর একাধী ইউরোপে। এই বিদেশ ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা ও কবিমানসের বিকাশের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছিল। কারণ প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পিতার ছত্রছায়া থেকে দূরে গিয়ে, ‘আত্মদীপ’ হয়ে আত্মায়েষণ ও আত্মজিজ্ঞাসার নির্বাহ সুযোগ তিনি

পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন পশ্চিমের সমাজ-সংস্কৃতির অবক্ষয়, ফ্যাসিস্তন্ত্রের অভ্যুত্থানের মুখে পশ্চিমী গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়। ১৯২৯ সালের শেষ দিকে জার্মানিতে অবস্থান কালে জার্মান তরুণদের হিটলার ভাষনার উগ্রতাও তাঁর নজর এড়িয়ে যায়নি ('While in Germany Sudhindranath was once accosted by some Hitler youths for not wishing them the 'Heil Hitler'.—'Sudhindranath Datta'—by Amiya Dev, page 24)। 'বিরূপ বিশ্বের' এই সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 'আধুনিক সভ্যতার অনতিক্রম্য সংকট', আর যুগগত বিষাদ, নৈরাশ্য ও ব্যক্তি-মানুষের একাকিত্বের বেদনা। প্রবাসে আর একটি ব্যাপারও সুধীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সেটি 'তাঁর জীবনে প্রেমের প্রথম প্রবল ও আত্ম অভিজ্ঞতা।' এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তিনি 'হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন প্রেম ভঙ্গুর বলেই তা এত তীব্র, তা অনির্ভরযোগ্য তবু অবিস্মরণীয়, তাতেই শাস্ত্রীর অকাল বোধন'... 'স্বাধীন বয়ঃপ্রাপ্ত প্রেমের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত এই বোধ সুধীন্দ্রের কবিতায় এবং প্রবন্ধে স্বকীয়তা, দৃঢ়তা এবং প্রাবল্যের সন্ধারে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল।'—(শিবনারায়ণ রায়; 'স্বদেশ স্বকাল স্বজন'/পৃ. ১৭৭-৭৮)।

পরিচয়-প্রকাশ ও সৃষ্টির সফল পর্যায়

বিদেশ থেকে ফিরে এসে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তম্বী' (১৩৩৭) প্রকাশ করেন এবং ১৩৩৮ (ইং ১৯৩১)-এ তাঁর সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ত্রৈমাসিক অবস্থায় পাঁচ বছর (১৩৩৭-১৩৪৩) ও মাসিক অবস্থায় সাত বছর (১৩৪৩-১৩৫০) তিনি তার সম্পাদক। কিছুকাল (১৩৪৬-১৩৫০) হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে যুগ্মসম্পাদক। আষাঢ় ১৩৫০-এ সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেন এবং কিছুদিন পর 'পরিচয়'-এর স্বত্বও বিক্রি করে দেন। 'পরিচয়' সম্পাদনা সুধীন্দ্রনাথের বিরাট কীর্তি। এবং এই পর্বেই তাঁর সৃষ্টি-শক্তিরও চরম প্রকাশ ঘটে। তাঁর 'অকৌটু', 'দ্রুদসী', 'উত্তর যাহ্ননী', 'সংবর্ত'-এর প্রায় সব কবিতা, অধিকাংশ অনুবাদ কবিতা, 'স্বগত' ও 'কুলায় ও কালপুরুষ'-এর প্রবন্ধাবলী—১৯৩০ থেকে ১৯৪২-এর মধ্যে সমাপ্ত করেন। এর পরে 'দশমী'-র কবিতাগুচ্ছ ছাড়া মৌলিক রচনার পরিমাণ সামান্য; তবে বহু কবিতার আদি রূপের পরিবর্তন ও পরিমার্জন অবশ্য করেছেন।

'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' বিমুক্ত কবি সুধীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা, নাগরিক বৈদগ্ধ্য, মার্জিত রুচি, পরিশীলিত প্রজ্ঞা, পৌরুষ গাভীর ও স্বভূতা তাঁকে রবীন্দ্রোক্ত কবিতার ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে স্থান দিয়েছে। তাছাড়া পদ্য ও

গদ্যের রচনারীতিতে দুরাহ শব্দ প্রয়োগ, যুক্তিনিষ্ঠা, বুদ্ধিদীপ্ত তির্যকভঙ্গি এবং সংযত ভ্রাবোগ ও মননশীলতার প্রকাশে তিনি যে নিজস্ব রূপদী রীতির প্রবর্তন করে গিয়েছেন তার উত্তরসূরী না মিললেও তিনি পুরোধা আধুনিক কবি ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

কর্মজীবন, দ্বিতীয় বিবাহ ও বিদেশ ভ্রমণ

কর্মজীবনে সুধীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। প্রথম দিকে তিনি পিতার সলিসিটর প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশি করেন (১৯২২-১৯২৭; কিছুদিন (১৯২৮-২৯) 'ফরওয়ার্ড' দৈনিকপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের অবৈতনিক কর্মী এবং ঐ সময়ে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্মেলনের প্রচার বিভাগের একজন কর্মী হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। 'সুবুদ্ধপত্র'র নবপর্যায়ের সূচনা থেকে বিলুপ্তি পর্যন্ত (১৯২৫) যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০-১৯৩৩ পর্যন্ত লাইট অব এশিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ করেন। ১৯৪২-৪৫ পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ এ. আর. পি.-র প্রধান কর্মাধ্যক্ষ। প্রথম দ্বী ছবিদেবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না—এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুধীন্দ্রনাথ ১৯৪৩ সালের ২৯ মে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী রাধেশ্বরী বাসুদেবকে বিবাহ করেন। এরপর তিনি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন (১৯৪৫-১৯৪৯)। এবং ১৯৪৫ সালে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্ত থেকে 'মার্কসিয়ান ওয়ে' এবং পরে 'হিউম্যানিস্ট ওয়ে' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪৯ সালে 'স্টেটসম্যানে'র সহ-সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। এবং পরে 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের' গৃহ-সংযোগ অফিসার নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৪ পর্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ১৯৫২) তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে আসেন। ১৯৫৪-১৯৫৬ পর্যন্ত তিনি ইনস্টিটিউট অব পাব্লিক ওপিনিয়ন-এর কলকাতা শাখার পরিচালক হিসাবে কাজ করেন এবং ঐ সময়ে (১৯৫৫-৫৬) তৃতীয়বার ইউরোপীয় দেশসমূহ ভ্রমণ করেন। ১৯৫৬ সালে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য-বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯৬০) তিনি ঐ পদে বৃত্ত ছিলেন। তবে মধ্যবর্তী দুই বৎসর (১৯৫৭-৫৯) তিনি প্রবাসে ছিলেন। ১৯৫৭ সালে ফুলরাইট বৃত্তি নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে গবেষণার জন্য তিনি সঙ্গীক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। এই চতুর্থবার বিদেশযাত্রা কালে তিনি জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। বঙ্কু এডওয়ার্ড শিল্‌স্-এর আগ্রহে ও ব্যবস্থাপনায় তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হয়ে প্রায় সাত মাস অবস্থান করেন। এবং শিল্‌স্-এর প্ররোচনাতেই সুধীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে

আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন। কিন্তু সে আত্মজীবনী সম্পূর্ণ করতেন পারেন নি—বোলোটি অধ্যায়ে শুধু বাবা-মা-কাকা-ছেষ্ঠাদের কথা আর পরিবার-পরিবেশে নিজের অসুস্থ শৈশবের কিছু স্মৃতি অনুপম শিল্পসৌকর্যে চিত্রিত করে গিয়েছেন। ১৯৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ শিকাগো ছিলেন, তারপর নিউইয়র্ক-লণ্ডন হয়ে ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সতীক কলকাতায় ফিরে আসেন।

অন্তিম পর্ব

দু-বছর পর কলকাতায় ফিরে পুরানো বন্ধুদের সাহচর্যে সুধীন্দ্রনাথের মনে খুব আনন্দ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার অধ্যাপনার কাজে বেশ উৎসাহ ভরে যোগ দিলেন ('When he resumed work at Jadavpur he was bubbling with good humour'—Sudhindranath Datta—Amiya Dev, page 116)। সুধীন্দ্রনাথের বয়স তখন ঊনবাট; কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনায় তখনো তিনি প্রাণোচ্ছল, তরুণ। ১৯৬০ সালের ২৫ জুন, রাত্রি ৩টায় 'নানাপ্রসন্নময়িত', 'সদাহাস্যময়' উচ্ছল মানুষটির আকস্মিক জীবনাবসান ঘটে। সে-দিনও তিনি সতীক বন্ধুপত্নী এমার্সনের বাড়িতে নৈশভোজ্য সেরে, রাত সাড়ে এগারোটায় রাসেল স্ট্রিটের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎই একটা অস্বস্তি বোধ করায় ঘুমোতে পারেন নি—'He woke up sometime after 3 a.m. and complained of uneasiness. He asked for a cigarette, lit it but could not relish it. He coughed once and then all at once it was collapsing. Death came with a shattering quickness, after that lone cought.'—(The Sunday Hindusthan Standard; June 26, 1960)। শনিবার অপরাহ্নে কেওড়াতলা শ্মশানে অগণিত অনুরাগী সাশ্রুনেত্রে কবিকে শেষ বিদায় দিয়ে আসে। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকা লিখেছিল—“তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্য-জগতে একটি দীপ নির্বাণিত হল। সুধীন্দ্রনাথ কবি, মনসী, আত্ম-সচেতন ব্যক্তিদের আত্মশ্রম অধিকার।...সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য ভাবনার এমন ব্যাপক বৈদম্ব্য নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে ইদানীং আর কেউ প্রবেশ করেন নি; তাঁর কালে এমন সুসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব নিয়েও আর কেউ সাহিত্য ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন না।”—(পরিচয়; ২৯ বর্ষ আষাঢ়, ১৩৬৭)।

এম. এন. রায়ের চিঠি : সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে

আনুয়ারি ২৮, ১৯৪৪

(সম্ভবত দেৱাদুন থেকে)

প্রিয় সুধীন,

জবাব দিতে দেরি হওয়ার যথার্থ কারণের বর্ণনা সহ আপনার চিঠি দিগ্ভিত্তে পেয়েছিলাম। অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত পরিবেশ থেকে চিঠি লেখার বাসনার জন্য আমার উত্তর দিতে দেরি হল। ছয়টি ব্যস্ত উদ্বেজনাপূর্ণ সপ্তাহ কাটিয়ে আমরা ফিরেছি। উল্লেখ না করলেও চলে যে, প্রচুর আগ্রহ ও যথেষ্ট পরিমাণে অস্বস্তি নিয়ে আমরা আপনার চিঠি পড়েছি। বইটিতে আপনার “প্রবলভাবে আপত্তি জানাবার” মতো কিছু না থাকলে বইটির গুণাবলী সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিত। পরের বার আমরা যখন কলকাতায় যাব, তখন ঝগড়া করার মতো অনেক বিষয় থাকবে। কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একটি কথা। আমি এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে তর্কে নামতে সাহস পাব না। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আপত্তির ক্ষেত্রে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। ‘অহমিকাবোধ’ সম্পর্কে আপনার মতামত খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এটা শুণ, না দোষ? আমার মনে হয়, শেষটির জন্য আমি গর্বিত। আমি অতিরিক্ত গর্বিত বলেই আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শুণ অর্জনের সুযোগ নেই।

আপনার অসুস্থ হওয়ার সংবাদে আমরা খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম। আশা করছি, আপনি আবার আগের মতোই কর্মক্ষম হয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে, রেনেশাঁসের এই জাতীয় চিন্তাকে আপনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি। আপনি নিজের মতো করে ভারতমাতার পুনর্জন্মে সাহায্য করলে আমার নিশ্চয়ই আপত্তি আছে। আমি তাঁকে খুব কমবয়েসী তরুণী হিসাবে দেখতে চাই। আমার রুচির পক্ষে তাঁর বয়েস বেশী।

রয়েল সোসাইটির সেক্রেটারি অধ্যাপক এ. ডি. হিলের সঙ্গে পরিচয় হল। এই ভদ্রলোক সম্পর্কে আমি আগেও আগ্রহী ছিলাম। কারণ তিনি মনস্তত্ত্ব ও পদার্থবিদ্যার মধ্যে একটা সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। আমি একাজ তত্ত্বগতভাবে করেছি। তবে আপনার মতো সম্প্রদায়বাদী (আপনি কি নৈরাশ্যবাদী?) ব্যক্তি এটাকে অনুমান-ভিত্তিক বলতে পারেন। হিল এক সপ্তাহ বা ঐ রকম সময়ের মধ্যে কলকাতায় যাবেন। আমি ইতিমধ্যে বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং রেনেশাঁস সোসাইটির উদ্যোগে ওঁর একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে।

হিল দিল্লিতেও একটা বন্ধুতা দিয়েছেন। তাঁর মতো একজন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ঝঞ্জাট এড়ানোর মতো অতটা অলস আপনি না হতেও পারেন। আমার মতে, হিলের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা বলার পরিশ্রম সার্থক হবে।

আপনার অসুখের পর স্থান পরিবর্তনের কথা ভাবছেন কি? আমরা এখানে মার্চের প্রথম পর্যন্ত থাকব। শীতকালের বৃষ্টির পর্ব শেষ হয়েছে। গোটা ফেব্রুয়ারি চমৎকার আবহাওয়া থাকবে। এখানে চলে আসুন না কেন? লেবুগুলি আর গাছে নেই। বোধে যাওয়ার আগে আমরা ওগুলি পেড়ে ফেলে একটি অসাধ্য সাধন করেছিলাম। একদিন দুপুরে দুখুড়ি লেবু নিংড়ে সাত বোতল লেমন স্কোয়াশ তৈরি করি। লোভনীয় গিমলেট বা হট রামের বিকল্প হিসাবে এর চেয়ে আর কিছু ভাল ভাবতেই পারবেন না। এই শেষোক্তটি আপনার শীতে জমে যাওয়া শরীরকে চাঙ্গা করে তুলবে।

আপনাদের আমাদের উভয়ের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আপনাদের

রায়

পাদটীকা

১. এম. এন. রায়ের 'লেটারস ফ্রম জেল'।

২. সুধীন্দ্রনাথ বসুটিতে শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রহর' সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশংসা সঠিক মনে করেন না। জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স বর্ক (১৮৮২-১৯৭০), জার্মান পদার্থবিদ হাইসেনবার্গ (১৯০০-১৯৭৬) এবং ডেনিশ পদার্থবিদ নীলস বোরের (১৮৮৫-১৯৬২) বিজ্ঞানে অবদান সম্পর্কে দুজন ভিন্ন মত পোষণ করতেন। এম. এন. রায় তাঁর একটি চিঠিতে ম্যাক্স বর্ককে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে হাইসেনবার্গ ও নীলস বোরের নিন্দা করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে এম. এন. রায়ের বক্তব্যের আপত্তি জানিয়েছিলেন। কোয়ানটাম থিয়োরিতে অবদানের জন্য ম্যাক্সবর্ক ১৯৫৪ সালে এবং কোয়ানটাম মেকানিকস সৃষ্টির জন্য হাইসেনবার্গ ১৯৩২ সালে নোবেল পুরস্কার পান। কোয়ানটাম ফিজিক্সে অবদানের জন্য নীলস বোর ১৯২২ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি আবার ১৯৫৭ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

৩. এম. এন. রায় 'মাদার কান্ট'-কে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি করার বিরোধী ছিলেন।

৪. বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়ে বিদ্যাসাগর কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের খ্যাত ও কবি সংস্থায় যোগ দেন। অবসর গ্রহণের পর আমৃত্যু শান্তিনিকেতনে বসবাস করতেন।

অনুবাদ : নার্সিস সান্তার

সম্পাদনা : নিরঞ্জন হালদার

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের চিঠি : এম. এন. রায়কে

স্মৃতি-৬

কলকাতা

মে ৭ (১৪৪৬)

প্রিয় রায়,

গত ২২ এপ্রিল আমি এই শহরে ফিরে আসার আগেই আপনার চিঠি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। গতকাল আর একটা চিঠি পেলাম। কিন্তু সুসীকৃত কাজ আমার কাটানো ছুটিটাকে আকর্ষণহীন করে তুলেছে এবং এখনও পর্যন্ত সমালোচনা লেখার জন্য বসতেই পারিনি। এই কারণেই আপনার প্রথম চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি। যাইহোক, সমরেন' গত শুক্রবার আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং জানিয়ে গিয়েছেন যে, প্রেস প্রবন্ধগুলি কম্পোজ করার কাজই শেষ করেনি, সুতরাং ক্যাসলার এবং ধূজটির বই' নিয়ে একটা দ্রুত সমালোচনা' লেখার সময় এখনও আছে। যদিও এই সপ্তাহান্তে ছুটির দিনটিতে লিখতে বসতেই পারিনি। আমি আশাহীন নই এবং একথা বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, আমি দু-একদিনের মধ্যে ওটি লিখে ফেলব। অবশ্য, দৈনন্দিন কাজ এবং লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনার জন্য আমার মন খুবই বিক্ষিপ্ত। তাই লেখাটা আদৌ ভাল হবে না। আমার প্রতিশ্রুতির শোচনীয় পরিণতির জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কোনো ভাল কাজ করার পক্ষে দেশের গোটা পরিবেশটাই সত্যিই পীড়াদায়ক। তাছাড়া, আবহাওয়া সত্যিই বিষ্ময়কর। আমি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই স্নান করে উঠেছি বলে আমার এরকম মনে হচ্ছে। এমনকী, এই চিঠিটাও ক্রমে ক্রমে আরও অসংলগ্ন ও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, তা আপনিও বুঝতে পারছেন। যাইহোক, ব্যক্তি হিসাবে যতটা সম্ভব, রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমার বিরূপ মনোভাব আলোচনার বাইরে রাখার চেষ্টা করব। সুতরাং এলেনের' দৃষ্টিভঙ্গির কোনো কারণ নেই।

আমি সুশীলের' প্রতি দীর্ঘনিশ্বাস। মানালী ও দেবাদুন সমাজ থেকে এতই বিচ্ছিন্ন যে, ঐ দুটি স্থান গজদস্ত মিনারের সঙ্গে তুলনীয়। তা সত্ত্বেও আমি আশা করি যে ও দেবাদুন খুব উপভোগ করেছিল এবং মানালীতেও নিজেদের উপভোগ করবে। আপনার গ্রীষ্মকালীন পরিকল্পনা কতদূর? আপনি গরম এবং ভারতীয় রাজনীতির তিক্ততার বাইরে অবশ্যই চলে যাবেন। 'বিপ্লব' অথবা 'আমাদের সময়ের বিপ্লব' বইটার কী হল?

রাজেশ্বরী* এখন কান নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে, নইলে আমরা ভালই আছি। সুশীলের অনুপস্থিতি কলকাতাতে তিনগুণ শূন্য করেছে, যদিও আমাদের অনেক বেশী বাইরে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

এলেন ও আপনাকে আমার ভালবাসা।

সুধীন

পাদটীকা

১. সমরেন রায়। তখন ‘মার্কসিয়ান ওয়ে’ প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে এম. এন. রায় সম্পর্কে কয়েকটি বইয়ের লেখক।

২. অর্থার কেসলারের ‘যোগী অ্যাণ্ড দি কমিশার’ এবং খুজটিপ্রসাদ মুখার্জির ‘অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি : এ স্টাডি ইন মেথড’।

৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই সমালোচনাটি ছাপা হয় ‘মার্কসিয়ান ওয়ে’র প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (এপ্রিল-জুন, ১৯৪৬)।

৪. এলেন রায়—এম. এন. রায়ের দ্বিতীয় স্ত্রী।

৫. সুশীল কুমার দে : আই-সি-এস। ‘মার্কসিয়ান ওয়ে’ পত্রিকায় সিকান্ডের চৌধুরী নামে লিখতেন। পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত লেখার নাম ছিল, ‘দি ইকনমিক থিরিকুইজিস অব ডেমোক্রাসি’, প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় ছাপা হয় ‘ফুল এমপ্লয়মেন্ট ইন দি ইণ্ডিয়া’, তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয় ‘প্লানিং অ্যাণ্ড ডেমোক্রাসি’। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে প্রথম কমিশনার হিসাবে তিনি তুগমূল থেকে উন্নয়ন কর্মসূচী তৈরির পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সচেষ্ট হন এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বোজনা কমিশনের উপর থেকে তৈরি পরিকল্পনা পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে ‘প্লানিং ফ্রম দি বিলো’ পদ্ধতির প্রবক্তা হয়েছিলেন।

৬. এম. এন. রায় প্রতি বছর গ্রীষ্মে তাঁর অনুগামী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে সেরাদুনে স্টাডি ক্যাম্প করতেন।

৭. রাজেশ্বরী দত্ত—সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দ্বিতীয় স্ত্রী। এই আই-সি-এক কন্যা রাজেশ্বরী বাসুদেব এক বছরের জন্য শান্তিনিকেতনে গান শিখতে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্য শান্তিনিকেতনে প্রাইভেটে ‘সংস্কৃত’ বিষয়ে এম. এ. পড়ানোর ব্যবস্থা করে তাঁকে আর লাহোরে ফিরতে দেননি।

অনুবাদ : নার্গিস সাভার

সম্পাদনা : নিরঞ্জন হালদার

রাজেশ্বরী দত্তের চিঠি : এলেন রায়কে

হিমালী

কালিম্পং

৩০.৩.৪৬

আমার প্রিয় এলেন,

তোমার মিস্তি ছোট চিঠিটার জন্য ধন্যবাদ। ঐ চিঠি পেয়ে আমরা দুজনেই খুব আনন্দিত। আমাদের সঙ্গে তোমাদের থাকাটা যে উপভোগ্য হয়েছিল, একথা লেখার জন্য ধন্যবাদ। তোমাদের সাহচর্যে আমরা অনেক বেশী আনন্দিত হয়েছিলাম। এবং তোমরা চলে যাওয়ার পর তোমাদের অভাব বোধ করছি।

অবশেষে আমরা এখানে ছুটি কাটাতে আসতে পেরেছি। কলকাতা ও তার ভিড় থেকে এখানে আসতে পারায় আমার খুবই ভাল লাগছে। জায়গাটি এত নিঃশব্দ ও বিশ্রাম নেওয়ার উপযুক্ত যে, এখানে ক্লান্ত মনকে শান্ত করতে পারে। স্টেটসম্যানের কাজ থেকে সুধীন এখানে ভালই বিশ্রাম পাচ্ছে। এই মুহূর্তে সে একটি বাংলা লেখা নিয়ে ব্যস্ত। এই লেখাটি শেষ হলে সম্ভবত সে 'হ্রস্ববেশী ক্যাশিস্ত' লিখতে শুরু করবে। সে সমালোচনা লেখার জন্য রায়ের ও ক্যুসলারের বই দুটি সঙ্গে নিয়ে এসেছে এবং আশা করছে যে, সে এখানে সব লেখাগুলি সম্পূর্ণ করতে পারবে। হাতে সময় খুবই কম। এখানে আসার পর দশদিন ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে। সামনের মাসে কলকাতার মারামারক গরমের মধ্যে ফিরে যেতে হবে। এটা ভাবতেই খারাপ লাগছে।

রায় এখন কেমন আছেন? আশা করছি, তাঁর নাক এখন আর তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে না এবং অস্ত্রোপচারের ফল ভালই হয়েছে। আমার কানে কষ্ট হচ্ছে এবং অস্বস্তিতে ভুগছি। এছাড়া, এখানে থাকাটা আমরা খুবই উপভোগ করছি। শীগগিরই লিখবে।

আমাদের দুজনের ভালবাসা। রায়কেও

রাজেশ্বরী

পাদটীকা

১. এম. এন. রায়ের 'দি রাশিয়ান রেভুলেশান' ও আর্থার ক্যুসলারের 'যোশী অ্যান্ড দি কমিশনার'।

অনুবাদ : নার্সিস সান্তার।

ভেঙেচিন্নে মবে গান, তাদের সাদর সম্মুখ
 শ্রানিলে চলিতে পাঠে ; ভেঙেচিন্নে তোরা বর্তমান,
 বৃক্ষশীলের মক্ষ, দ্বিবিহী, চির আয়ুধমান,
 নহিস্ন মনের দাম্প ; তাদের ও-মস্তুর সার-
 যুগল, দাতিত সখ্য ; এমন ভূতের পাবাড-
 উদ্ভূত অসহযোগ নিত হবে পরিমোহি করে ।
 যেতিলে ক্ষত দেহ ডাঙা হক্ক তাই চলে বীরে,
 ফিরায়ে অন্য পৃষ্ঠ, বসেচিন্নে প্রমত্তের পূনা,
 উদাস্যউল্লাসভরে । নিষিদ্ধ পাঠে যেন তাকান,
 অসীম আমর যাত্রী, নীতিহারা, উড়ুনি বলাকা,
 তবাত কি নিবোধ ? বুঝিনাই জেদীন মনে,
 দ্বিবিহা প্রসাদের নিকট সঙ্কটিক বাতায়নে
 অবস্থা বড়নি মাস, তবাত যে, যাপ্ত কানে-

মূর্খ যাহি মূর্খত্ব ; অচিন্তিতা কালার মালত-
 গন্ধিত লক্ষ্যে গাণ ; প্রথম প্রসঙ্গ নিম্নলিখিত,
 ত্রিভুজ বিলম্ব হইবে অমুদ্রিত জাতিক লগ্নে
 পাতুল শ্রম তপস্বীর নিষ্কাম নির্বিকার চিকিৎসা
 অকস্মাত | নিষ্করন ঘণ্টাধ্বনি প্রথম প্রহরে
 ত্রিভুজ অমলমুখ প্রদায়ক মুখের ফলকে
 যে-মূর্খত্ব উল্লেখ্য হইবে বিলম্বিত আলোক আলকে,
 কে জানিত, (অইদে, হইত তার আলো পাতুলিমা
 উদ্ভাসিত বসন্তের প্রলয়দ ঘনঘোর শ্রম
 ত্রিভুজত্রেত্র (অই) কে জানিত, পাঁচটি বসন্ত
 উল্লেখ্য অমুদ্রিত কাণ্ড উপলব্ধিত অকস্ম
 পাতুলমীলিত হইবে একবার পালকি লগ্নে ॥

ମୁନିକିତ ସୁବିଧାନ ଆର୍ତ୍ତବିହୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗେ-
 ବିକ୍ରୟ କରିବେ ଆମେ ଚେତନା ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତିର-
 ନବ ପ୍ରାଣୀକାର ବାଡ଼ା ; ଆଧୁନିକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ-
 (ହାସ୍ୟ ଓ ଶାକ୍ତ୍ୟରୁ, ଶକ୍ତିରୁ, ବିକ୍ରୟ ବଳରୁ
 ଆହୁତ କାଳର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଯେଉଁଠି ମିଳିବେ ;
 ଆହୁତ କାଳରୁ ମନରୁ ଆହୁତ ମିଳିବେ ଆମେ
 ଆହୁତ କାଳରୁ ମନରୁ ଆହୁତ ମିଳିବେ ନବ-ହାସ୍ୟରୁ ;
 ବିକ୍ରୟ-ମାଧ୍ୟମ କର, ଏହାକୁ ପୁଣି ଆହୁତ,
 ଆହୁତ ମାଧ୍ୟମ ମାନ, ଯେଉଁଠି ଯେ-କି ଆହୁତ
 ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟାପକ ଶକ୍ତି ଦିଏ ମଣିଷ ଲିଖନ,
 (ଅ-ପାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାପକ ନୟ ବାରିଷ-
 ଆହୁତ ମିଳିବେ ଦିଏ । ଭାବିବାର ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ :
 ମାନିଷ ଲିଖନ (ହାସ୍ୟ, କାଳ୍ପନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅନ୍ୟ, ମାଧ୍ୟମ,
 ହାସ୍ୟରୁ, ଆହୁତ କାଳରୁ କାଳରୁ ପୁଣି ମିଳିବେ-
 ହାସ୍ୟରୁ କାଳରୁ ମିଳିବେ ମିଳିବେ ମିଳିବେ- ।

(ହାସ୍ୟ ଓ ଶାକ୍ତ୍ୟରୁ, ମାନିଷର ମାନ-ଆହୁତ
 ଯେ-କି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ, ମାନିଷର ମାନ-ଆହୁତ
 ହାସ୍ୟରୁ ମାନିଷର ମାନ-ଆହୁତ ମାନିଷର ମାନ-ଆହୁତ,
 ମାନିଷର ମାନ-ଆହୁତ ମାନିଷର ମାନ-ଆହୁତ,

(୧୬)

ହୃଦୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଧରଣର ଚିତ୍ରର ମାଧ୍ୟମରେ ।
 (ଜାତିର, ଡିମ୍ବ ମୁଖ, ଦେଖାଯିବ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପକାଳ,
 ଶାରୀରୀୟ ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ମତ୍ତ ମତ୍ତ କରିବ ମିଶ୍ରଣ ।
 ତାହାକୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ନୁହେଁ ମରାହତର ଚରମ ବିକାଶ-
 ଧୋଷିତ ଚାହିବ ମଡ଼ି । ଧରଣ ଅଳ୍ପ, ଅଳ୍ପର ବିକାଶ
 ଶାରୀରୀୟ ଶାନ୍ତି ରାମି ବିଚାରିବ କିମ୍ବା ମାତ୍ର,
 ତାହାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦୁଇ ଧରଣର ଧରଣର ଅନ୍ତର ।
 ଆଜିର ସାରାଜାଣି ତାହାକୁ ହୃଦୟ ଧରଣ-
 କରିବ ହେଲା ଶ୍ରୀ ।

ଏହି ଜାଣି କେତେ ଧରଣ କଥା
 ଦୃଶ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶରା ନିୟତିର, ଶାରୀର ଧରଣ,
 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀନ ଦୁଇାଳର ମତ
 ଧରଣର ଧରଣ କରି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶରା ଧରଣର ନିୟତି
 ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଧରଣର ।
 ଧରଣର ଧରଣ ଦୁଇ ଦୁଇ କାଳରେ ଧରଣର ଧରଣ,
 ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର,
 ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର
 ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର
 (ଧରଣର ଧରଣର, ଧରଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଧରଣର ଧରଣର
 ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର
 ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର
 ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ଧରଣର ॥

ଶ୍ରୀମତୀ :

୧୨୧ କାଳକ୍ରମ, ୧୭୭୭ ।

উটপাখী (Pico)

আমার কথা কি স্মরণ পাতুনা তুমি ?
 কেন মুখ গুঁজে থাকে তার মিছে চলে ?
 কোথায় লুপ্ত ? ই হু করে অকস্মিক ;
 আরে আরে চাখা মারে গোষ্ঠে মাদুলে ।
 আর দিগন্ত সমীচিকাও যে নেই ;
 নীল, নীল, নিঃশব্দ মহাকাশ ।
 নিষাদেব মন মায়াভাগ মজে নেই ;
 তুমি কি তার অমূল্য অধুনাস ।
 কোথায় লুপ্ত ? চুপে বা আর কখন
 উদাসীন কালি চাকরনা পদবিশা ।
 প্রাকৃতিক বস্তুবস্তু যত
 বিগত অসহ, তুমি অসহ্য একা ॥

ହାତେ । ଡାମ୍ ଯାଏ ତା ଦିଅନ୍ତୁ କି ଫଳ ପାଏ ?

ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲାଗାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ।

ଆମିନ ଶୁଣିବ ଶାସ୍ତ୍ର କି ନିଷାଦ ଯାଏ ?

(କହନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି) ଚଳାନ୍ତୁ ଆମିନ ଶାସ୍ତ୍ର ।

କାହା ଚାହେଁ ଯାଏ ଆମିନ ଶୁଣିବ ଯାଏ ,

ଅନ୍ଧାଧାନ୍ଦା ଆସିବ ଯୁକ୍ତି ଯାଏ ।

ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯାଏ ଶୁଣିବ ଯାଏ ;

ଶୁଣିବ ଯାଏ କହନ୍ତୁ ବିଷୟ ଯାଏ ।

ନବ ଆମିନ ଯାଏ ତା ଯାଏ ଯାଏ ।

ଯାଏ ଯାଏ ନିଷ୍ଠା କହନ୍ତୁ ଯାଏ ।

ଶିଳାବ ଯାଏ ଯାଏ ନାନା ଯାଏ ,

ଆମିନ ଯାଏ ଯାଏ ଆମିନ ॥

କହନ୍ତୁ ଯାଏ ଯାଏ ଆମିନ ଯାଏ

ଶାସ୍ତ୍ର ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ;

ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ

ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ।

ଶୁଣିବ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ

ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ

ଓଷାଠ ଗରବ ଓଷାଠ ପଦସ୍ତୁତି
 ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରାଚାରୀ
 ତୋହାର ନିବିଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ରାଚାରୀ ପୁଣ୍ୟପୁଣ୍ୟ,
 ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲାଠି ଯାହା ତୋହାର ମିତ୍ର;
 ମେ-ପାଠ୍ୟ-ପୁଣ୍ୟ ସୁଧାସୁଧା ସୁଧାସୁଧା
 ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଯାହା ମେ ଓଷାଠିକିନି ॥

ଆମି କାମି ମହେ ସୁଧେ ମାଧୁକାୟ
 ଆହାର ସୁଖୀ ଅଧାର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ
 ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆହାର କାହାନ୍ତି ଆମି;
 ଆହାରୀକ ମହେ ମନା ମୋହରୀକ ଜାଣି
 ଜାଣି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଲାଠି ୩-ଆହାରୀକ ।
 ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କି ମନାକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଆହାରୀକ ?
 ଆହାରୀକ ମହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବିଡ଼ି ଶାଢ଼ି ।
 ମାଧୁକାୟ ଆହାରୀକ ପୁଣ୍ୟମାଧୁକାୟ ।
 ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମନା ଆହାରୀକ ମହେ କାହାନ୍ତି
 ମହେ ମନା ବିବିଧୀ ଆହାରୀକ-ଆହାରୀକ
 ପୁଣ୍ୟ ନିବିଡ଼ ଶାଢ଼ି ଆହାରୀକ ଲାଠିକାହାନ୍ତି,
 ତୋହାର, ବନ୍ଧୁ, ଆମି ଲାଠିକାହାନ୍ତି ଶାଢ଼ି ॥

ଅଥବା ଭାବର ସମସ୍ତା (ଅପମାନ
 ନିମିତ୍ତେ ନୁହାଏ ତୋହର ଆଡ଼ାରେ ? ଆମର ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତେ ବାନ୍,
 ଦୁଃଖାବିଧିର ନିବିଡ଼ି ଲଗନେ । ଅବିହାର ସମ୍ଭାଷଣ
 ତୁମେ କୌଣସି ମିଶ୍ର-କରି, କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିତି ?
 ମୁଁ ଲୋଡ଼ିବି ଏକତା ନାହିଁ । ଆମେ ହାସିବି ଏହାକୁ
 ଅସମ୍ଭାବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ? କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସ୍ଥିତି ?

ଦୁଃ (ହାଟିଲ, କଥାବସ୍ତୁ,
 ତିନିଗୋଟି, ୮୨ ବର୍ଷରେ, ୧୯୪୦

୨୨୨୨ ୧୯୪୦

କଥାବସ୍ତୁ,
 ଅସମ୍ଭାବିତ ଅବସ୍ଥାରେ
 କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସ୍ଥିତି ?
 କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସ୍ଥିତି ?

কিছু মেয়ে

সুখস্বামী, তোমার লাগি নয়

হাস, গম্ভীরতা,

নিম্নদেহ অস্তরঙ্গনে যে- সুসুস্ক-হাসনের ভিত্তি-

দলের-আত্মাত্ম মোর অস্তরঙ্গ কবিত্বে দহন,

জাহ্নবী ইন্দ্র,

জাহ্নবী, মোসাইলে তুমি যুগে যুগে, কখনে কখনে?

স্বিমিত্র,

আবিষ্কার, তোমার লাগি

আমি লাগি

অন্যদিক দিনমান, ইচ্ছাকৃত নিশা?

~~নিম্নদেহ অস্তরঙ্গনে যে- সুসুস্ক-হাসনের ভিত্তি-~~

বিদ্যুৎ কক্ষানিকটে

মুদ্রিত নিবৃত্তি কঁদে কঁদে প্রাণের গহবর?

প্রাণবাহি তোমার নিশা

দাম্পত্য আশা

তোমার চরিত্রিক আশ্রিত হস্তি-দোহন

বিকল্পে বিকল্পে

মাত্র হাত,

প্রকটন দিগন্তে কান

ମୋତାଙ୍କାବିତ ସିଂହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏପରି ନିମାମନ ।
 ଘୋର ଡାଲି
 ଏକଦା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରା
 ଜନାତନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗତ
 ବିଶ୍ୱାସକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଏହାବଦ୍ଧ ଚିହ୍ନ
 ଅନ୍ତତଃ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ-ହତ-ବିମାୟନ-କାଳେ
 ଖଲେ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ି କଥା, ବିଜ୍ଞାନିନୀ ମୋତାଙ୍କୁ ଅନିୟା

ଘରୁ କାନ୍ଦି ଚାଲି
 ଘୋର ଚିତ୍କାର କରି ଘାରି ଘାରି
 ମୋତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସିଂହା ନିମାମନ :
 ଘୋର ହିଂସ୍ର ଘେନି ଏହା
 ଘୋର ଘେନି ନାମ
 ମିଆଁମୁନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘୋର ଘୋର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ।
 ନିହତ ନିଶିଂସ
 ନିବିଡ଼ ଘୋର ଘୋର ମୋତାଙ୍କୁ ଘୋର, ଶୁଦ୍ଧିମୋଡ଼,
 ସବୁବେଳା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ;
 ଘୋର ଘୋର
 ଘୋର ଘୋର ଘୋର
 ଘୋର ଘୋର ଘୋର ଘୋର ଘୋର ଘୋର ଘୋର ।

অংশুবেব প্রাণত্মা তিমিত্বে

অদম্যত্ব ইত্যং ফিত্বে-

অজ্ঞাত, অজ্ঞানবাসী, আত্মবিক্রম-ভীষ্ম-বাস, ,
জাহ্নবী অমৃত অলম্বন

জাই নহে জোমা লাগি, হে দাঙ্গিনীমুখী ॥

অমৃতের উদাত্ত মার্ভিতঃ

প্রনব আশ্বাসে যাব প্রতিক্ষিত ভুলে অবিহত,

জৈ আশ্বাসে নব-অনুভূতিগীত-মত-

নম্র নেত্র, বস্ত্র ম্রমে, বাজারীয়া কুণ্ঠিত কিস্কিনী।

জৈ যে নিঃশাঙ্কিনী,

কিনারীম পম মাস্তি চল,

আত্মহীন উদ্বৃত্ত অসি, নিষ্কৃত্ত্ব মূর্ত্তমানা গলে,

নির্মল নম্রভূমি। বর্ম্মভম পারি ।

যেহনীবি কলুষ কোঁঠক

চাবমার কবি,

নিবলিত ন্যসেব নিবন্ধ কার্ম্মক

বর্ষে নিবৃত্ত

অম্ম-ভৌমী উল্লসিত ~~ক~~ প্রাণিময় মত ।

অম্ম-ভৌমী
অম্ম-ভৌমী

দুই গিরি স্তম্ভ স্তম্ভস্বয়ং ,
 তেজস্বি অ-বর্ষক স্মৃতি
 এতদন্য চরম নগ্নে এতদপি এতদপি কবি ।
 তত্ত্ব সাধে স্মৃতিবৃত্তা এত-
~~স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি~~
~~স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি~~
~~স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি~~
 স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি , স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি ,
 স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি , স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি ।
 তাই মোর স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি
 স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি
 স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি ।
 অ-স্মৃতি স্মৃতি ,
 স্মৃতি স্মৃতি , স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি ;
 তত্ত্ব স্মৃতি
 স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি , স্মৃতি স্মৃতি , স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি ॥

পাঠ্যনিবন্ধসমূহ , ক্রিষ্টাব্দ
 ডিসেম্বরে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯

(স্মৃতি)

ଭୌମ

ଏହି କବି ସିଂହାର୍ଣ୍ଣ ମାତା;

ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମ ଦେଶ ପାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନାମ ।

ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମନ ବାକି ଅନୁଷ୍ଠାନ;

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋମଳତା ଚିତ୍ତ ଗିରି ବାକି

ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମ ମାତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଦାନ ନା ।

ଅମୃତ ତା ଆଦର ଗୋପନ ନା ।

ଆଉ ବା ଶେଷର

ବିଷୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦୂରର ଦୃଶ୍ୟମାନ

ଦୃଶ୍ୟ ନା ଗୋପନ କରା ଶାନ୍ତିର ମତ୍ତନ ॥

ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୃଶ୍ୟମାନ

ଆଦର ସିଂହାର୍ଣ୍ଣ କବି ମତ୍ତନ(ଅନୁଷ୍ଠାନ) ।

ବିଷୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ

ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ (ମାତ୍ର ଅନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ) ଅନୁଷ୍ଠାନ

ଆଦର ଦୃଶ୍ୟମାନ ମାତ୍ର; ଅନ୍ତରୀ ଆଦର

ଆଦର ଆଦର ଦୃଶ୍ୟ; ଅନ୍ତରୀ ଦୃଶ୍ୟମାନ

ଆଦର ଆଦର ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତରୀ ଦୃଶ୍ୟ ॥

ଆଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ମାତ୍ର ନା ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ।

ବିଷୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ

ଆଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ; ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅନ୍ତରୀ ଦୃଶ୍ୟମାନ;

ଆଦର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୃଶ୍ୟ ।

ଆଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ; ଆଦର ଦୃଶ୍ୟମାନ,

ଅନୁକୂଳ ବନ୍ଦରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୃଷ୍ଣେ ଯାଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ,
 ତେ (କାହାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଯାଏ, କାହିଁ ନା ଚିନ୍ତା ।
 ସଦା ସାନ ହୃଦୟ ନାହିଁ ହେବା ;
 ମହାଶୟିତ୍ର ହୃଦୟର ବିଶେଷତା ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ॥

କେଉଁ ଏକେ କୋଉଁ
 ଓହ୍ଲାଇ ଅବିଚାରରେ ସ୍ବାଦେଶର ଶେଷେ ଯିବ ଯାଏ,
 ଯୁକ୍ତିନୀୟ, ଶାନ୍ତତା, ଅନ୍ୟତା ଦେଖ
 ତେହାଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ସିନ୍ଧୁ, ମିଳିଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୋଟିଏ ।
 ଅନୁକୂଳ
 ସ୍ବାଦେଶର ଅନ୍ତ କହ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଚଳନ୍ତ, ଚାହୁଁଛି ;
 ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ
 ତେହାଙ୍କ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ; ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଏ
 ଅବିଚାର ଯାଏ ଯାଏ ଅନ୍ୟତା ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଏ ଯାଏ ॥

(ସ୍ବାଦେଶର ଅନୁକୂଳ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଏ ।
 ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଅନ୍ୟତା ଯାଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ;
 ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ,
 ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଏ, ଯାଏ ମିଳି ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ।
 ଯାଏ ଯାଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ
 ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଏ, ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ
 ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ।
 ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ
 ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ଯାଆନ୍ତାହୁଏ ,

ଭୁନି ମି ଶାନ୍ତିର ଚାପ ସୁବିଶାସିତ ହେଉ ॥

ହଳତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶସ୍ଥ, ନିଃଶ୍ଵାସ, ନିଃସ୍ଵ ଆଉ ଆସି ;
ଅନ୍ଧାରୀୟା

ଆସି ଓ ଆସିବ ଡେଇଁ ଡୋଳାଏଁ ଡେଇଁ ।

ଘାଟେ ଅନ୍ଧାରୀୟା

ସଞ୍ଜିତ ଡେଇଁତ ; କିନ୍ତୁ ଭାବି ଅନ୍ଧାରୀୟା

ସ୍ଵାଧୀନ ଚଳିଛି ଘାଟେ ; ଅନ୍ଧାରୀୟା

ଢେଇର ଡେଇଁ ଆସି, ଧରଣୀ ମୋର ଡେଇଁତ ।

ଅନ୍ଧାରୀୟା ହେଉ ଅନ୍ଧାରୀୟା

ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ନାହିଁ । ଅନ୍ଧାରୀୟା ।

ଆଗରୁଆଗରୁ

ଅନ୍ଧାରୀୟା ଡେଇଁତ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାରୀୟା ॥

ଘାଟେ ଡେଇଁତ

ଘାଟେ ନାହିଁ ଡେଇଁତ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାରୀୟା

ନୂଆଁ ନାହିଁ ଡେଇଁତ, ଡେଇଁତ,

ନାହିଁ ଡେଇଁତ

ଘାଟେ ନାହିଁ ଡେଇଁତ, ଅନ୍ଧାରୀୟା ଅନ୍ଧାରୀୟା

ଘାଟେ ନାହିଁ ଡେଇଁତ, ଅନ୍ଧାରୀୟା ଅନ୍ଧାରୀୟା ?

ଘାଟେ ନାହିଁ ଡେଇଁତ, ଅନ୍ଧାରୀୟା ଅନ୍ଧାରୀୟା

ଘାଟେ ନାହିଁ ଡେଇଁତ, ଅନ୍ଧାରୀୟା ଅନ୍ଧାରୀୟା,

ଘାଟେ ନାହିଁ ଡେଇଁତ, ଅନ୍ଧାରୀୟା ଅନ୍ଧାରୀୟା, ଅନ୍ଧାରୀୟା ॥

স্বপ্ন গান্ধী চরিত্র চিত্রিত্বা,

স্বপ্নচিহ্নিত দেহে গান্ধী স্বপ্না

বিশ্ববিশ্বা

১৮-১৯৩৩ খ্রিঃ

ভাষ্যে গান্ধী নি সিন্ধু, গান্ধী বা সিন্ধু গান্ধী

গান্ধী-গান্ধী গান্ধী ~~১~~ নদীস্রোত, গান্ধী

স্বপ্নচিহ্নিত স্বপ্না, স্বপ্নচিহ্নিত পিতা ও পুত্র,

স্বপ্নচিহ্নিত, স্বপ্ন, স্বপ্নচিহ্নিত ॥

৩ জুলাই ১৯৩৩ }
১০-১১-১৯৩৩ }

৭২

রবীন্দ্রনাথ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

‘পরিচয়’-এ রবীন্দ্রনাথের শোকলেখন। ‘পরিচয়’-এ সুধীন্দ্রনাথের শেষ রচনা। স.প.

বুদ্ধির সিদ্ধান্তে বিশ্বাসের সমর্থন যেমন সাধারণত দুঃপ্রাপ্য, তেমনই ওই স্বতোবিরোধী বৃত্তিস্বয়ের সহযোগী নির্দেশ ব্যতীত জ্ঞানমার্গের মতো কর্মকাণ্ডও অলাভচক্রের প্রকারভেদ; এবং সেই জন্যে যদিচ আবাল্য বুঝে আসছি যে অতিমানুষ রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ চিরায়ু নন, তবু একাশি বৎসরে তাঁর আমহর ভবলীলাসংবরণ অস্ত্রত আমার কাছে যে-পরিমাণ আকস্মিক লেগেছে, সে-রকম অভিভাব আপাতত আধিদৈবিক সর্বনাশেরই অনুবর্তী। অবশ্য প্রায় বিশ বছর আগে তাঁর অকাল মৃত্যুর অমূলক সংবাদে কলিকাতা নগরী যখন একবার বিচলিত হয়ে উঠেছিল, তখন ট্রামে সে-স্বপ্ন শুনে, মনে পড়ে, আমি চোখের জল সামলাতে পারি নি; এবং তার পরেও নানা সময়ে অনুরূপ জনরবে যে-শোক পেয়েছি, তার পুনরতিনয় চম্পিশোধে যত না অশোভন, ততোধিক অসাধ্য। উপরন্তু ইতিমধ্যে রাবীন্দ্রিক জীবন-বেদের বিপরীতে চলতে চলতে, লোকযাত্রা, আমাকে ও আমার সমবয়সীদের নিয়ে, আছ যেখানে উপনীত, সেখান থেকে দেখলে, তিনিও বুদ্ধ, ক্রাইস্ট প্রভৃতি অনর্থক প্রবক্তাদের অস্পষ্ট প্রেতচ্ছায়াতেই মিলিয়ে যান; এবং তৎসত্ত্বেও না মেনে উপায় থাকে না বটে যে, তিনি সাহিত্য প্রগতির অত্যাধুনিক পথ প্রদর্শকেরও শীর্ষস্থানীয়, তথাচ সেই সঙ্গে এ-মস্তব্যও অনস্বীকার্য ঠেকে যে, কল্যাণের বিক্ষোভ পর্যন্ত তাঁকে সংস্কারমুক্তির প্রেরণা ছোঁগায় নি বলেই, তাঁর ভাগ্যে শুদ্ধ রূপ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রীতির অবহিত ধ্যান-ধারণার অপার সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু এ-সমস্তই বুদ্ধির ব্যাপার, এতে যেহেতু বিশ্বাসের অনুমোদন নেই, তাই রবীন্দ্রনাথের তিরোধান, কেবল আমার কেন, প্রত্যেক অর্বাকপঙ্খাশ বাঙালির পক্ষে পিতৃবিরোগের সমকক্ষ; এবং এ-উক্তি উৎপ্রেক্ষামূলক রূপকমাত্রই নয়, পিতা শব্দের সনাতন সংজ্ঞা-কটা মনে রাখলে কথাগুলো অক্ষরে-অক্ষরে সত্য।’

সুতরাং আছ এ-বিবেচনায় আমাদের সাক্ষ্য নেই যে, রবীন্দ্রনাথের মতো স্বাবলম্বী ও সিদ্ধার্থ পুরুষের কাছে বার্ষিকের স্ববির মৌন নিশ্চয়ই দুর্বিবহ ঠেকত; এবং পুরাকালে সফোক্লিস আর ইদানীং গোল্ডে ও টেনিসন বাদে অপর কবির বাধন আশির পরে কলম চালাতে পারেন নি, তখন তিনিও

সম্ভবত 'হেলেবেলা'য় তাঁর অতুলনীয় সৃজনী শক্তির উপাস্তে আব 'রোগ শয্যা', 'আরোগ্য', 'ছন্দদিনে', ইত্যাদি বই ক-খানিতে উক্ত প্রতিভার প্রাস্তে পৌছেছিলেন। কারণ যৌথ-পরিবার-ভুক্ত পুত্র যেমন নিজের বা পিতার বয়স ভুলে মনে করে যে তিনি নিত্যকালে তাকে বিপদে পরামর্শ আর সম্পদে সাধুবাদ জুগিয়ে যাবেন, তেমনই, আর সকলের উল্লেখ স্থগিত রাখলেও, অন্তত বাংলার উদীয়মান লেখক মাদ্রেই প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ভেবে এসেছে যে এ-দেশের কবিশুরু অকুণ্ঠিত অভিনন্দনে তার মৌল সঙ্কোচ ঘুটিয়ে, তারই অহেতুক আশ্বসাদ বাড়াবার জন্যে, স্বকীয় সাম্রাজ্যের কোনো একটা পরিত্যক্ত বা সদ্যবিজিত অংশে তাকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেবেন; এবং বদান্যের দানও যেহেতু অবিস্মরণীয়, তাই বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রতি তাঁর প্রকৃতি-কাপণ্য-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরই সাম্প্রতিক স্বীকারোক্তিতে আমরা বিনয়-ব্যবহারের বিন্দু-বিসর্গ খুঁজে পাই নি, নিরাসক্ত-সমালোচনা-নামক কৃতজ্ঞতার বিকারে ভজাতে চেয়েছি যে, সহস্র ঋণ সত্ত্বেও আমরা এমনই অকিঞ্চন যে, তাঁর ঐশ্বর্যে ফাঁকি না থাকলে, আমাদের দূরবস্থা অসম্ভব হত। বিশ্লেষণে ধরা পড়বে এতাদৃশ মতামতের আড়ালে যে ঈর্ষা আছে, তা শিল্পী-সাহিত্যিকের সুপ্রসিদ্ধ পরীক্ষাতরতাই নয়, এ-রকম সাহচর্য নাতিহ্রস্ব অপত্য সম্পর্কের অনিবার্য উপসর্গ; এবং রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে আমাদের ব্যক্তিগত অশক্তির দায় মূল্যভাবে আমাদেরই উপরে পড়বে জেনে আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানি নি যে, তাঁর মধ্যে মানুষী দোষগুলোর অপ্রতুল নেই বলেই তিনিও মৃত্যুর ইচ্ছাধীন।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা সাহিত্যের পিতৃ-পদবাচ্য নন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যে প্রতিফ্রিনার নাম আরোপ, তারই সার্বভৌম অভিব্যাপ্তিতে তিনি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালির মানসিক প্রতিমূর্তি; এবং রাবীন্দ্রিক ভাবার কলগত সামান্যীকরণই যদিও এই অদ্বৈতসিদ্ধির মুখ্য হেতু, তবু ভাষা ও অভিজ্ঞতার সংযোগ যেকালে নিতান্ত দুশ্ছেদ্য, তখন আমাদের ভাবনা-বেদনাও, মোটের উপর, তাঁর দৃষ্টান্তে নিয়ন্ত্রিত। পঞ্চাশতাব্দে, এ-রকম প্রভাব রৈবিক মহাশ্যের নিঃসংশয় প্রমাণ হলেও, উক্ত সোহং-বাদের দুর্বীণিত বিজ্ঞাপনই বাঙালিকে আর সকল ভারতবাসীর চক্ষুশূল করে তুলেছে; এবং বাঙালির ঔদ্ধত্যের জন্যে রবীন্দ্রনাথের বিদূষণ অন্যায় বটে, কিন্তু আমাদের আত্মদ্রাব্ধা তাঁর আত্মসচেতন ব্যক্তিস্বরূপেরই অপকর্ষ। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের অধিতীয়তা যে-পরিমাণে সর্বগ্রাহ্য, বাঙালির জাতাভিমান ঠিক সেই কারণে অস্বীকার্য; এবং একথা সে নিজেও মানে বলে, একদিকে সে যেমন, পঞ্চাশতাব্দে, সাধ্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্কে চলে, তেমনই অন্য দিকে, পাছে ছোঁয়াচ লেগে তার প্রাতিভাসিক কীর্তিকলাপের বিলোপ ঘটে,

সেই ভয়ে সে নিজের সঙ্গে অপর প্রাদেশিকদের নিঃসন্দেহ সাদৃশ্যটুকুও মানতে চায় না। একটু খুঁজলেই, ধরা পড়বে যে এতখানি মমত্ববোধ কেবল তাদের বেলায় সহজ, যারা নিজেদের আকৃতি ভুলতে না পেয়ে মৃত্যুর আশঙ্কায় নিরন্তর তটস্থ থাকে; এবং মরণের উপলব্ধি যেহেতু সর্বত্র পরোক্ষ, তাই উগ্রতম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যও ব্যতীত আর কোনো উপায়ে মুমূর্ষু নিঃশ্বের মানরক্ষা সম্ভব নয়। এতদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবন ও অনুপম সাধনা, প্রতিবিম্বপাতে বাঙালির মুখ বাঁচিয়ে আসছিল, তাঁর দেহাবসানে বাংলার আবরণ যুড়ে, ফুটে বেরলো তার অকিঞ্চিৎকর আর্তি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙালির যথাসর্বস্ব হলেও, তাঁর বিশ্ববীক্ষা অত্যন্তকালের মধ্যেই বাংলার ঐতিহাসিক, তথা ভৌগোলিক, চতুঃসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল; এবং যে একদেশদর্শী শুভবাদ তাঁর প্রাকাম্যের উত্তর সাক্ষ্য, তাতে যদিও ধ্রুপদী মনুষ্যধর্মের সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য নেই, তবু মহামানবের প্রতিনিধিত্বে তাঁর পদমর্যাদা ব্যাস, হোমর ও সেক্সপীয়র-সমান। কারণ সংসারে অমঙ্গল ও অন্যায় যত প্রশ্রয়ই পাক না কেন, সে সমস্তের অভিধা কখনো শ্রেয়োবোধের মতো নির্বিকার থাকে নি, যুগে যুগে, উপলক্ষে উপলক্ষে বদলেছে; এবং তাই সফ্রেটিস-প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও ভাবতে পেরেছিলেন যে, রাহ্য সুযোগ-সুবিধার দিকে না দেখে, অন্তর্যামীরা পানে তাকালেই, আত্মস্থ মানুষ আর্যসত্যের স্বরূপ চিনবে। সূত্রাং রবীন্দ্রনাথ স্থান-কাল-পাত্রের নিয়োগ সাধ্যপক্ষে সইতে চান নি; সকল প্রকার প্রথা ও প্রতিষ্ঠান তাঁকে পীড়া দিয়েছিল; এবং তাঁর সাধনালব্ধ স্বাচ্ছন্দ্য সহধর্মীর অভাবে শেষ পর্যন্ত যাতে স্বৈরাচারে না দাঁড়ায়, সেই চেষ্টায় তিনি যৌবনে শাস্তিনিকেতন আর শ্রোচ বয়সে বিশ্বভারতীর বিরাট প্রাঙ্গণে স্বদেশবাসীকে সাহচর্যে ডেকেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর পৌনঃপুনিক আহ্বানে দেশ-বিদেশে আশানুরূপ সাড়া না জাগলেও, তাঁর ত্যাগে পুষ্ট এবং শিক্ষাপরিষদের প্রযত্নে, শুধু বঙ্গীয় সংস্কৃতি নয়, সমগ্র ভারতের চিৎপ্রকারেই আজ বেশ খানিকটা উন্নত; এবং তৎসত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের নাম মনে পড়লে, সমস্তলবোপ্তিত কোনো এক সমুচ্চ শৈলশৃঙ্গের ছবিই মানসপটে ভেসে বেড়ায় বটে, তথাচ এই অপ্রতিকাৰ্য স্তরভেদের মানি তাঁর আদর্শ বা উদ্যমকে কদাচিতঃ ছোঁয় নি, সেজন্যে দায়ী তাঁর পরমুখাপেক্ষী স্বজাতির স্বার্থবুদ্ধি। তা হলেও আমার বিবেচনায়, তাঁর অব্যর্থ জীবনের যৎকিঞ্চিৎ বৈফল্য ওইখানেই; এবং সে-বৈফল্যের ব্যাখ্যা বোধহয় এই যে প্রান্তিসঙ্গিক মহত্বের সম্পূর্ণ উপলব্ধি থেকে জনসাধারণকে প্রজ্ঞা করতে শিখে তিনি চোখ-কানের আপত্তিতেও বোঝেন নি যে প্রাচ্য পুরুষসিদ্ধির প্রস্তাব আদ্যন্ত মৌখিক।

অবশ্য তার মানে এ নয় যে তিনি এশিয়ার মোহপাশে জড়িয়ে পড়ে

মুরোপকে তফাতে রেখেছিলেন; এবং তাঁর অধিকাংশ ইংরেজি বক্তৃতা যেমন পাশ্চাত্য শোষণনীতির তীব্র প্রতিবাদ, তাঁর অনেক বাংলা প্রবন্ধ তেমনই ভারতীয় অনাচারের অগ্রিম নিন্দা। তা হলেও দুর্মুখ যে সতানিষ্ঠার একমাত্র আদর্শ, তাঁ তিনি মানতেন না, তিনি জ্ঞানতেন যে অনেক সময় অনুকম্পার অভাবেই অপরাধ বাড়়ে; এবং সেইজন্য তিনি আমরণ কখনো শুচিবায়ুর প্রশ্রয় দেন নি, কি পূর্বে, কি পশ্চিমে, যেখানেই স্বরাট মানবাত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, সেখানেই তাকে অকাতরে অর্থনিবেদন করে গেছেন। আসলে মানুষের কাছে তাঁর প্রত্যাশা ছিল অসীম; তাঁর দীর্ঘ জীবনে একাধিকবার নরপিশাচদের ধ্বংসশাস্ত্র দেখেও তিনি মুহূর্তমাত্র ভাবতে পারেন নি যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতায় সকলের অধিকার ও আস্থা সমান নয়; এবং এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আশা-আকাঙ্ক্ষা যদিও অন্ধ-উপাধিরই উপযুক্ত, তবু সে-অন্ধতা যে দুর্বল দুষ্-শক্তির নিদর্শন নয়, নিরপেক্ষ সঙ্কল্পের অত্যাশ্রিত উদাহরণ, তাও এক রকম তর্কাতীত। কারণ সুধীশ্রেষ্ঠ ফর্স্টার ঠিকই বলেছেন যে ব্যক্তির মৃত্যু আর সভ্যতার বিনাশ দুইই নিরতিশয় নিশ্চিত বটে, কিন্তু উভয়ত্র আমাদের কর্তব্য এমন ভাবে চলা যাতে দর্শকের মনে বিশ্বাস জন্মায় যে ব্যক্তি অমর আর সভ্যতা চিরন্তন; এবং উক্ত প্রতিজ্ঞাধ্বয় সর্বৈব মিথ্যা হলেও, যে-কোনো একটিকে ছাড়লে মনের মুক্তি ত দূরের কথা, সেহের পুষ্টি পর্যন্ত দুঃসাধ্য লাগে। আমার বিচারে, এই দুটি লোকোত্তর প্রত্যয়ের প্রাদুর্ভাব রবীন্দ্রনাথের চরিত্র ও চর্যায় যতখানি স্পষ্ট, অন্য কোথাও তত পরিষ্কার নয়; এবং তাই তাঁকে হারিয়ে বঙ্গদেশই সর্বস্বান্ত নয়, সারা পৃথিবীও দুর্দশাগ্রস্ত—বিশেষত আজ যখন সমস্ত আকাশে সংবর্তের ঘোর ঘটা, ঝঞ্জাবাতে অতি জীবিতের আত্ননাদ আর নবজাতকের অব্যদ্য ক্রন্দন, সঙ্কীর্ণগণের আলোকে অনিশ্চয়, হতাশা আর অভীকার দৃশ্য।

স্বভাব বৈশিষ্ট্যে আমি আত্মশ্ম, দুঃখবাদী; আমার অনুমানে সমাজবিবর্তন তো জীবপ্রগতির বিমুখ বটেই, এমন কি জড় জগতের মতো মনুষ্যসংসারেও যাদুত্বিক শৃঙ্খলার আনুপূর্বিক হ্রাস সকল রকম ক্ষতি পূরণের অন্তরায়; এবং সেই জন্যে আমার ভয় হয় যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত ও দিগ্বিজ্ঞান ব্যতীত প্রলয়-সঙ্কুল কালক্রোতে সভ্যতার নিরুদ্দেশ যাত্রা বৃষ্টি বা কুল খুঁজে পাবে না। কিন্তু মানবেতিহাসে উপনিপাত এই প্রথম নয়; এবং প্রতিবারে যখন যুগান্তের দুর্যোগ কেটে সুপ্রভাত এসেছে, তখন এবারেও, রবীন্দ্রনাথ অন্তর্হিত বলেই, নরলোক চির-তিমিরে তলিয়ে যাবে না। উপরন্তু এ সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই গণনীয় যে, শুধু আমাকে আর আমার ভোগবিলাসী স্বগোষ্ঠীদের ঝেঁটিয়ে ফেলে নয়, রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যের আমূল উচ্ছেদেই আগন্তুক নববিধান বৃহত্তম সংখ্যায় মহত্তম মঙ্গল সাধবে; এবং সেই ব্যবস্থা পরিবর্তনের পর

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও সংস্কারস্বপ্ন হয়তো তদানীন্তন বিবেচকদের কাছে ঠিক ততখানি কৌতুকপ্রদ ঠেকবে, বর্তমান উদারচেতাদের বিচারে যতটা হাস্যকর মনুসংহিতার বিধি-নিষেধ। পক্ষান্তরে সে-দিনেও রবীন্দ্র-রচনাবলির সাহিত্যিক মূল্য তিলার্থ কমবে না; তখনকার বিদ্বৎসেৱাও একবাক্যে মানবে যে, কি গদ্যে, কি পদ্যে, এতখানি রসশৈল্যে খুব কম লেখকই পৌছতে পেরেছেন; এবং সময়ের গতি যেহেতু সামান্য থেকে বিশেষের দিকে তাই ভাবী পণ্ডিতেরা যেমন অগত্যা তাঁর সর্বতোভদ্র সৃজন প্রতিভার গুণ গাইবে, তেমনই অনাগত চিত্রকরেরা ঈর্ষান্বিত চোখে দেখবে তাঁর আশ্চর্য শিল্পের অশিক্ষিত পটুত্ব। তাছাড়া ভবিষ্যৎ নিসর্গবিলাসীরা তাঁর স্বভাবোচ্ছ্বাসে গুনবে বঙ্গভীর মর্মবাণী; আগামী ঐতিহাসিকেরা তাঁর ছোটগল্পে প্রত্যক্ষ করবে বাঙালি স্ত্রী-পুরুষের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, তথা আচার-ব্যবহার; এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সম্পদ মাল্যে ফুটে থাকবে বঙ্গীয় চিত্তপ্রসারের অনেকান্ত সঙ্গতি।

আমার বিশ্বাস সারস্বতসমাজ শ্রেণী বিভক্ত নয়, সে-গণতন্ত্র সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত; এবং সাহিত্য-সমালোচকদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যদিও এ অনুমানের বিপক্ষে, তবু লেখকবিশেষের পদবীপরিচ্ছেদ শিল্পবৃদ্ধির বিষয়বহির্ভূত বিবেচনায়, আমি সাধ্যপক্ষে বিচার করতে প্রস্তুত নই রবীন্দ্রনাথ ভাবী পাঠক-পাঠিকাদের ভোটে কোন কবির ঈষদূর্ষে বা 'নাতিনিঙ্গে স্থান পাবেন। তবে আমার ব্যক্তিগত জীবনে তিনিই আদি ও অকৃত্রিম কবি; এবং অন্তত মনোবিকলনীদেব মীমাংসায় প্রাথমিক প্রবর্তনাই পরিণামের বিধানকর্তা। স্মরণে আসে অল্প শুল্কজনদের অল্প এত বিদ্রূপ সয়ে, যেন যুগান্তরে, রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে আমার পুলকিত পরিচয়; এবং অব্যবহিত পূর্বে পিতৃদেবের অধ্যাপনায় কোলরিজ পড়ে আমি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলাম সত্য, কিন্তু হয়তো মাতৃভাবার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কবিতার হৃদয়-সংবেদ্য, ঐকান্তিক আবেদন আমাদের মর্মে পৌছয় না বলে 'এনশেণ্ট ম্যারিনর'-ও আমাকে 'গীতাঞ্জলি'-র মতো মাতিয়ে তোলে নি। অবশ্য দেশান্তর অস্ত্রাকাশে পাখা ঝাপটাতে শিখে, দূর থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে বিরাট দৃশ্য দেখেছি, তার পাশে স্বদেশের সব কিছুই কেমন নাতিবিদীর্ণ ঠেকেছে; এবং ইতিমধ্যে রৈবিক আদর্শে কাব্যসৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টায় আত্মবিকৃত যৌবন কাটিয়ে, অবচেতন অঙ্ককার তাড়নায় আমি রটাতে ছাড়িনি যে, রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমী কবিদের চেয়ে নিকৃষ্ট বটেই, এমন-কি সেই সঙ্গে তিনি অক্ষম অনুকারক মাত্র। তাহলেও যখনই ভেবেছি, তখনই না মনে উপায় থাকে নি যে কাব্যের আনন্দময় স্বরূপ সম্বন্ধে তিনিই আমার অদ্বিতীয় দীক্ষাগুরু; এবং তৎকাল্যে বোধির অতিযুক্তি উদ্ভাসে বুঝতে পেরেছি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে রসোপলব্ধি কেন ব্রহ্মাবাদের সহোদর। কাব্যকলার

কৌশল সম্পর্কেও বাংলাদেশের যতখানি জ্ঞান, সে-সমস্তই তাঁর শিক্ষাপ্রসূত, তথা দৃষ্টান্তস্বরূপ; এবং সেইজন্যে, ভক্তবৃন্দের মনে আঘাত লাগবে ছেনেও, আমি একবার সিখেছিলাম যে রৈবিক সাহিত্য-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য এই যে আত্মকালকার কবিশেষঃ প্রার্থীদের রচনারস্বত্বও প্রাপ্ত-‘মানসী’ কবিতাবলির চেয়ে অধিক অনবদ্য।

আসলে আমাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মূল্য-নিরূপণ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার চেয়েও হাস্যকর; এবং সে চেষ্টায় আমি স্বভাবত উদাসীন। এমন কি আমার পক্ষে তাঁর বিভিন্ন পুস্তকের স্তরভেদ নির্ণয় শুদ্ধ সহজসাধ্য নয়; তাঁর রচনারীতি, চিন্তাপদ্ধতি ও অনুভূতি-প্রকরণের নিঃসন্দেহ ক্রমবিকাশ সত্ত্বেও, প্রায় তাঁর প্রত্যেক বই-ই আমার কাছে অনিন্দ্য ও অখণ্ড ঠেকে; এবং সেগুলির যে কোনোটিতে তাঁর কাব্যজীবনের সমাপ্তি ঘটলেও, আমি তাঁকে মহাকবি বলেই জ্ঞানতুম। উপরন্তু এই প্রাতিপদিক অবৈকল্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যেও সুসঙ্গত নয়; এবং স্মৃতিনির্গমের দাবি যদি বর্ণবিচার ব্যতীত না টিকে, তবে রবীন্দ্রনাথ, শুধু উল্লিখিত কুসলস্বর্ণের জোরেই, অক্ষয় স্বর্গে উচ্চাসন পাবেন। কিন্তু সে অমরাবতীর পরিধি যত না অপরিসর, তার অধিবাসি সংখ্যা ততোধিক অপরিমেয়; এবং অদ্ব্যুত জীবনদশায় রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন যে আভিজ্ঞাতিক বিবিকির সূযোগ জ্ঞানগণের আয়ত্তে না এসে, সভ্যতা মিথ্যা, মানবজাতি অসার্থক। অতএব ব্যক্তি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টাঙ্কেতই, আমার মতে তাঁর চরম ও পরম পরিচয়; এবং পৃথিবী সম্বন্ধে আমার যে অল্প পরিচয় আছে, তার নির্বন্ধে আমি অগত্যা মানতে বাধ্য যে নিহক কবিত্তে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হোন বা না হোন, নিপাট মনুষ্যত্বে তাঁর সমকক্ষ আমাদের যুগে খুব বেশি জন্মায় নি। তাই করুণা জাগে সেই অজ্ঞাত নর-নারীদের জন্যে যারা তাঁকে চিনবে কেবল তাঁর গৃহাবাসির মধ্যস্থতায়, যাদের মানসে তিনি আঁকা থাকবেন মাত্র নাম-মাহাত্ম্যে; এবং যখন মনে পড়ে যে আমার ভাগ্যে তাঁর সাক্ষাৎ স্নেহ প্রচুর পরিমাণে জুটেছিল, তখন প্রাণধারণের গানিও আর অসহ্য লাগে না, খেদ স্কোভের তলায়-তলায় বুঝতে পারি তাঁর সংস্পর্শে আমার দিনগত পাশের বোঝা কতখানি ক্ষয়ে গিয়েছিল। তবে এ-রকম স্মৃতি শেষ পর্যন্ত হানিকর, এর উপসংহার শ্মশানবৈরাগ্যের অকর্মণ্য উচ্ছ্বাসে; এবং রবীন্দ্রনাথ অসংযমকে সর্বাধিক ঘৃণার চক্ষে দেখতেন, তাঁর ঐতিহ্য বোধের মূলমন্ত্র ছিল অতীতের উত্তরাধিকার সমাদর সহকারে অস্বীকার করে, পুরুষকারের সাহায্যে তার নিরন্তর চক্রবর্ত্তি।

(‘পরিচয়’ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৯-এ প্রকাশিত)

মনুষ্যধর্ম

সুধীক্ষ্মনাথ দত্ত

মানুষের চরিত্রে এমন কতকগুলো বিরোধ আছে যে তার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর চেষ্টাও বিড়ম্বনা; এবং হয়তো উক্ত বিসংবাদের অনুগ্রহেই কোপার্নিকাস্ যে-যুগে পৃথিবীর অহংকার ঘুটিয়ে তাকে সূর্যের আত্মাচক্রে আনলেন, ঠিক সেই সময়ে মনুষ্যধর্মের আকস্মিক স্ফূর্তি ছড়িয়ে পড়ল যুরোপের সর্বত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনুপাতে মর্ত্যলোক আশোরণীয়ান, একথা শুনেও পশ্চিমের উজ্জীবিত মানুষ বেতসীবৃষ্টির পরিচয় দিলে না, ধ্রুপদী সভ্যতার দৈবানুগত্যে ফিরে গেল না; মধ্য যুগের পারলৌকিক অভিনিবেশ ঝেড়ে ফেলে, সে টেনেস্-এর ভাষায় হঠাৎ বলে উঠল, “আমি মানুষ, মনুষ্যত্বের অপকর্ষও আমার অনাধীন নয়।” এই বিশ্বাসের সার্থকতা কতখানি সাহস ও স্বার্থত্যাগের অপেক্ষা রাখে, তা যিনি বোঝেন, তাঁর কাছে পশ্চিমের পরবর্তী উন্নতি আর রহস্যময় ঠেকবে না। মনুষ্যসংসারে মানুষই নিত্য, মনুষ্যসমাজে মানুষই সর্বব্য, মানুষিক মঙ্গলই মনুষ্যধর্মের একমাত্র লক্ষ্য— এই মহাসত্যে যে-জ্ঞাতির শিল্প ও সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন, জীবন ও মরণ অনুপ্রাণিত, তার অভ্যুত্থান স্বভাবতই অনিবার্য। কোনও লুপ্ত অমরার গুপ্ত আকর্ষণে, সে দিগ্বিজয় দিশা হারায়নি, সেই জন্যে সারা জগৎ জেগেছিল তার শঙ্কনাদে; আকাশকুসুমে সে জয়মাল্য গাঁথা হয়নি, তাই কৃপণ প্রকৃতিও তাকে ভেট পাঠিয়েছিল মুক্ত হস্তে; তার রাধীবন্ধনে পরমার্থ আর পুরুষার্থের চির বিবাদ মিটেছিল, কাজেই অজ্ঞানার অভিসারে বেরিয়ে, বুদ্ধি রিথলাপেও ভয় পায়নি।

দুর্ভাগ্যক্রমে অবিমিশ্র সিদ্ধি অশেষ স্বর্গের মতোই শুধু কবিকল্পনা : জীবনে জন্ম-মৃত্যুর সীমাসন্ধি অনিশ্চিত; এবং শীতের পশ্চাতে বসন্ত যেমন আসে, বসন্তের পরে গ্রীষ্মসমাগম হয়তো ততোধিক ধ্রুব। বুদ্ধি বা তাই নবজাত মনুষ্যধর্ম বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই ব্যক্তিবাদে বদলাল। বিশ্বমানব যদিও অতিবাস্তব, তবু সে হাওয়ার মতো; তাকে বাদ দিয়ে বাঁচা শব্দ, অথচ তার চাক্ষুষ উপলব্ধি একেবারেই অসাধ্য। কিন্তু ব্যক্তি স্পর্শনীয় : তার ধাক্কায় পথে চলা বিপদ, তার সংসর্গ সঙ্কল সঙ্কেও এড়ানো দুষ্কর। উপরন্তু সে কালটা ছিল বিশেষের অনুকূল। শূন্য সেই সবে অন্ধকূপ ভেঙে বাইরে

বেরিয়েছে। সমাজপতিদের অনুরূপ শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধের সুযোগে সে তখনও বঞ্চিত। সুতরাং সে সম্ভবত তখনও বোঝেনি যে আলোর আশীর্বাদ গিরিশুঙ্গেরই সর্বাঙ্গে পৌছালেও, পর্বতচূড়া নিরবধি অনূর্বর; সে-আলো চরিতার্থ সমুদ্রমির সাফল্যে। কারণ যাই হোক, মানুষ সে-দিন তার অন্তরের বিশুদ্ধ শূন্যতায় ব্যক্তির পাদপীঠ-স্থাপনে বিজয় করেনি; এবং বোধহয় সেই জন্যে ধর্মকে বিজ্ঞানের শিকল পরাতে চেয়ে ক্রনো প্রাণই হারালেন, স্বায়ত্তশাসনে নৈতিক নৈরাজ্যের অভিশাপ খণ্ডাতে পারলেন না। অবশ্য রোমান্টিসিজম-এর প্রথম প্রবক্তারা নিজেদের মধ্যে দ্বিপৃষ্ঠ পত্তর যথেষ্টাচার দেখে যৎপরোনাস্তি লজ্জা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু উনিশ শতকের পুনরুজ্জীবিত খেয়ালীরা বিনয়ের প্রয়োজন সুদ্ধ মনে রাখেননি; এবং তাঁদের চরম প্রতিনিধি নীটশে নিত্যনৈমিত্তিক সংসারে অতিমানুষের আতিশয্য অচল জেনে অবশেষে আশ্রয় নিলেন পাগলাগারদে।

ইতিহাসের সর্বত্র কার্য-কারণের পরম্পরা থাক বা না থাক, তার সারল্য নিশ্চয়ই কাল্পনিক; এবং সেই জন্যে আমার বলতে বাধে যে ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ রিনেসেন্স-প্রসূত ব্যক্তিবাদের অমোঘ পরিণাম। পক্ষান্তরে উক্ত কুরুক্ষেত্র সর্বনাশেরই উপক্রমণিকা; এবং ব্যক্তি ও তার সহোদর সাম্রাজ্য সমষ্টির সঙ্গে সম্মান সন্ধি-স্থাপনের সুযোগ এ-বারেও হেলায় হারালে, আগামী প্রলয়ে উভয়ের বিলুপ্তি এক রকম অবশ্যজ্ঞাবী। তবে তার মানে এমন নয় যে, জনসাধারণই কাণ্ডজ্ঞানের তথা শুভবুদ্ধির রক্ষণকর্তা; এবং মহতের মর্যাদাহানি তো আমার অনতিপ্রেত বটেই, উপরন্তু এও আমি মুক্ত কণ্ঠে মানি যে সম্মিলিত, সমবেত মানুষ বারংবার যেমন আচার-ব্যবহারের পরিচয় দেয়, তা হয়তো বুদ্ধি বিবেচনাহীন পত্তর কাছেও অপ্রত্যাশিত। কারণ দলভুক্তি ভাবকের পক্ষে যত শক্ত, ভাবালুর পক্ষে তেমনই সহজ; এবং যেহেতু একদেশদর্শীর ষৌক বিচারের দিকে নয়, ব্যক্তিচারের দিকে, তাই তার মধ্যে আবেগ স্বভাবতই আবেশে বিকৃত। তাহলেও আমি জানি যে মহৎ মানুষ, অমানুষ বা অতিমানুষ নয়; এবং আমার পাশে তাকে যতই গগনস্পর্শী দেখাক না কেন, তার মনুষ্যত্ব সীমাবদ্ধ, যার জন্যে মানবসমষ্টির প্রতিযোগে তার পরাজয় অনিবার্য। আসলে মহামানব বিশ্বমানবের প্রতিভূ; এবং তার সঙ্গে আলোয়গিরির তুলনা চলে। তাকে প্রশাঙ্গী করে যে-সীপ্তি, যে-তেজ, যে-দাহ অতিভূমিতে গুঠে, সে-সমস্তই মানুষের অন্তর্ভৌম গৌরবের কণা মাত্র। এবং সেই প্রচ্ছন্ন ঐশ্বর্যের বাহক যদিও আমাদের নমস্য, তার প্রতিনিধিত্বে যে অমেয় মুক্তির প্রেরণা আছে, সে-উন্মাদনায় মাত্রবোধের উচ্ছেদ যদিও প্রায় অপ্রতিকাৰ্য, তথাচ এতাদৃশ দর্প কোনও মতে পোষণীয় নয় যে একজন মহামানব এমনকি জগতের মহামানবসমবায়, বিশ্বমানবের

চাইতে গরীয়ান্।

উপরের কথাগুলোয় যে অর্থবিরোধের আভাস রয়েছে, তা হয়তো একটা উপমার সাহায্যে কটবে। সৌরমণ্ডলে যেমন সূর্যের প্রাধান্য অনস্বীকার্য, মনুষ্যসমাজে তেমনই মহামানব নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সমগ্র সৌরমণ্ডলের অনুপাতে স্বতন্ত্র সূর্য যে-কারণে গোপ, ঠিক সেই কারণে মানবগোষ্ঠীর তুসনায় মহামানব নিকৃষ্ট। সৌরমণ্ডলকে সূর্যের চেয়ে বৃহৎ বলা সম্ভব, কেননা তাতে সূর্যের স্বকীয় গুরুত্ব বাদ পড়ে না, বরং আরও অনেক গ্রহাদির গুণাবলী তার অধিকারে আসে; এবং মানবসমষ্টি মহামানবের বিয়োগে সংগঠিত নয়, মহামানব ও ক্ষুদ্র মানবের সমন্বয়ে উৎপন্ন। পক্ষান্তরে সৌরমণ্ডলের অধিপতি সূর্য ও তার তুচ্ছতম প্রজা উদ্ধার উপাদানে যে মূলগত ঐক্য বর্তমান, তারই শাসনে তারা উভয়ে একটা বিশেষ আয়তনে, একটা বিশেষ আচরণে, একটা বিশেষ অয়নে চিরকাল আবদ্ধ; এবং মহামানুষ আর মামুলী মানুষ একই ধাতুতে নির্মিত, একই প্রবর্তনায় চালিত, দু'জনেরই গুরু জন্মে আর শেষ মৃত্যুতে। অবশ্য এক আর দুই, এই সংখ্যাভেদের মধ্যবর্তী অফুরন্ত ভাষাংশক্রমের মতো জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে তারতম্যের ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই পরিধির ভিতরে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা শুধু অগণ্য, অনন্ত নয়; এবং বৃদ্ধবদ্ধ ব্যোমে, তথা সুপরিমিত সংসারে বামন ও অসুরের পার্থক্য ততটা স্বভাবসিদ্ধ নয়, যতটা স্বভাবসিদ্ধ তাদের সাদৃশ্য। উপরন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের উক্ত অধিকার কেবল অর্থালঙ্কার হিসাবেই গ্রাহ্য নয়, অনুরূপ সামান্যীকরণ ব্যতীত সমাজবিজ্ঞানের প্রসার অভাবনীয়; এবং মনস্তত্ত্বে মন-গড়া মীমাংসার বাগাড়ম্বর কমাতে চাইলে, তাকেও জড়বিজ্ঞানের অনুগামী হতে হবে।

বলাই বাহুল্য বিজ্ঞানে আমার অজ্ঞানতা মানতে গেলে, সুমেরুকেও মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না; এবং বোধহয় সেই জন্যে ফরাসী রাসায়নিক স্তেফান লদ্যুক্-এর অস্‌মোসিস-সংক্রান্ত গবেষণার কথা শুনে আমি এত বাস্তব হয়ে উঠেছি। কিন্তু বিভিন্ন দ্রাবণের ইচ্ছাকৃত সংমিশ্রণে যখন এ রকম ছত্রক, তৃণ, বীজ, পুষ্প, পত্র, প্রবাল, শঙ্খ ইত্যাদির উৎপাদন সম্ভব, যা দেখে বিশেষজ্ঞেরও ভুল ঘটে, তখন প্রাণরহস্যের প্রস্তাবনায় প্রশংসার প্রয়োজন নেই। জীববিজ্ঞানের সমস্তটা এখনও গণিতের সাক্ষেতিকে প্রকাশ্য নয় বটে, কিন্তু তার নিয়ম-সজ্জনে মৃত্যুই অনিবার্য; এবং প্রমাণভাবে জীব আর জড়ের সাদৃশ্য আদ্য যদিও পোষণীয় নয়, তবু জীবনের জাড্য ও পরবশতা পুনরুজ্জ্বলির অপেক্ষা রাখে না। আসলে জীববিজ্ঞান জড়বিজ্ঞানের অপেক্ষা অধিক রোমহর্ষক নয়; এবং প্রথমার্ধ থেকে নীহারিকা পর্যন্ত জড়ের সকল আকার-প্রকার যেমন জড়বিজ্ঞানের অন্তর্গত, তেমনই এককোষী শস্প থেকে বহুলাঙ্গ মানুষ পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেক পর্যায় জীববিজ্ঞানের আচ্ছাবাহী।

তবে প্রাধান্য জড়বিজ্ঞানেরই; কারণ জীবনের সূচনা জড়বিজ্ঞানের নিয়ম না মানুক, তার বৃদ্ধি ও স্থিতি সম্পূর্ণভাবে সেই নিয়মের অধীন; এবং অন্তত রসায়নবৈজ্ঞানিকের স্বত্বভেদের স্বাতন্ত্র্য স্বমুখস্থ অবৈকল্যের পৃষ্ঠপোষক। অবশ্য আধুনিক কণাদেরা আর এখানে থামতে প্রস্তুত নন; কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে শৃঙ্খলা আনার উদ্দেশ্যে বস্তুমাত্রকে খাঁর দ্বিবিধ বৈদ্যুতিক শক্তির যোগ-বিয়োগে গড়াতে চান, তাঁরাও জানেন যে বিকীরণব্যাপারে নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারের অবকাশ নেই।

ফলত জড়ের প্রসঙ্গে বৈশেষিক মতই প্রযোজ্য; এবং অতীন্দ্রিয় পরমাণুর উদ্ভব রহস্যে শুণ যদিচ সংখ্যারই স্বল্প আর স্বাতন্ত্র্য সমষ্টিরই ধর্ম, তবু অন্ধ নিয়তির অনিশ্চয়-বিধি সেখানেও সর্বসর্বা। সূতরাং ব্যক্তিতে জড় তো জীবের প্রতিদ্বন্দ্বী বটেই, এমনকি জড় যেকালে প্রজননের দায়িত্ব-মুক্ত, তখন স্বয়ংসম্পূর্ণতাতেও সে জীবের উর্ধ্ববর্তী। অর্থাৎ ইসপ-এর হিতোপদেশে জীবের ভক্তি অচঙ্গা : সে জানে ঐক্যই তার সামর্থ্যের উৎস এবং বিরোধ বিনষ্টির উপসর্গ। কারণ শুধু বংশবৃদ্ধির জন্যে সে বিপরীত জাতির ঐকান্তিক সহযোগের মুখাপেক্ষী নয়, তার পৃথক সত্তাও অদ্বৈতসিদ্ধির ফল; এবং তার সাবয়ব দেখে যেমন ভেদবুদ্ধির নাম গন্ধ নেই, তার মন তেমনই ভূত-ভবিষ্যতের তীর্থসঙ্গম। আমার বিশ্বাস এই নিগূঢ় সাযুজ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত বসেই, জীবজগৎ জড়জগৎকে হার মানিয়েছে। জড় সাধ্যপক্ষে তার স্বকীয়তা বাঁচিয়ে চলে। তৎসঙ্গেও মাঝে মাঝে সংহতি ঘটে; কিন্তু সে-যোজন্য প্রবর্তনা আন্তরিক নয়, তার হেতু দৈবদুর্বিপাক। তাই আবার বাহির থেকে যেই বিকসনের তাগিদ আসে, সে অমনই তার আপত্তিক সম্বন্ধ বন্ধন সৃষ্টিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে প্রাণের মিলন সাধিত হয় আশ্রাবণের আদান-প্রদানে, অস্মোসিস-জাতীয় কোনও এক প্রক্রিয়ার আশ্রয়নিময়ে। কাজেই বিচ্ছেদের বাহ্য আদেশে দুটি সংশ্লিষ্ট প্রাণকোষ তাদের সৌহার্দ্যসূত্র ছিঁড়তে পারে না, সহমরণবরণ করে; এবং আশ-পাশের সঙ্গে এইরকম নিবিড় কুটুম্বিতা পাতাতে না পারলে, প্রাণপ্রবাহ গত পঞ্চাশ কোটি বছরে একাধিক বা নিশ্চয়ই হারিয়ে যেত।

তাহলেও প্রাণের প্রবাহ অলৌকিক নয়; এবং জীব যে বিশ্বজয়ী, এমন প্রত্যয়ে আমার জীবোচিত আশ্বপ্রসাদই প্রকাশ পাচ্ছে। কারণ নিরপেক্ষ বিবেচকের কাছে জীবের পরাধীনতা তর্কাতীত; এবং ইষ্টসিদ্ধির জন্যে সে অন্য জীবেরই সাহায্যপ্রার্থী নয়, নিসর্গের লালন-ব্যতিরেকেও তার দিনপাত অসম্ভব। সাম্প্রতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে সৃজনের প্রাণুঘায় সমস্ত আকাশ জড়ের যে নির্ভার ও নিরন্তর ব্যাপ্তিতে আচ্ছন্ন ছিল, তারই স্বাভাবিক সঙ্কোচ আজ পুঞ্জ-রূপে প্রতিভাত। জীবনের বিকাশে এই প্রাথমিক জঙ্গমতাও ধরা

পড়েনি; সে চিরকালই আলালের ঘরে দুলাল, পরোপকারী প্রতিবেশীর সৌজন্যকে আপন প্রভুত্বের নিশ্চিন্ত নিদর্শন বলে ভেবেছে। তাই কোটি কোটি বৎসর ধরে, সার্বত্রিক সমুদ্র যত দিন নিঃশ্রোত থেকেছে, তত দিন শুষ্কির নিরাপদ সোথে টাইলোবাইট-এর ঘুম ভাঙেনি। কিন্তু নিশ্চেষ্টা শেষ পর্যন্ত জড়জগতের অসহ্য লেগেছে; আস্তে আস্তে এখানে ওখানে দুটো একটা পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, দুটো-একটা নদী মহাসাগরে আলোড়ন জাগিয়েছে; এবং যুগের পর যুগ ধাক্কার উপর-ধাক্কা থেকে কঙ্কু-জাতি অঙ্গে অঙ্গে বুঝেছে যে বাঁচার জন্যে অভ্যেদ্য দেহ যথেষ্ট নয়, এমন শরীরের দরকার যা স্রোতে নুইবে, অথচ মচকাবে না। এই ঠেকে শেখাই তার মেরুদণ্ড-আবিষ্কারের মূল কথা; এবং এর মধ্যে যিনি প্রাণীর স্বাধীনতা ও প্রাণের অতিমর্ত্যতার প্রমাণ দেখবেন, তাঁর দৃষ্টি সত্যই দিব্য। জীব অবশ্যই বংশপরম্পরার মধ্যে আপন অস্তিত্বকে অক্ষুন্ন রাখতে চায়; কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির উৎপীড়ন ভিন্ন সে কবে কোন্ স্বতন্ত্র প্রণোদিত পরিণামবাদ-স্বীকার করেছে, তা অন্তত আমার জানা নেই।

উন্মিষিত পুনরাবৃত্তের অন্য ব্যাখ্যাও নিশ্চয় সম্ভব; এবং আমাদের পিতামহেরা ভেবেছিলেন যে জীববিদ্যা একাধারে উৎস্বতন ও বিবর্তনের সাক্ষ্য। কিন্তু মেরুদণ্ডের জন্মবৃত্তান্তে প্রগতির সন্ধান মিলুক বা না মিলুক, কুকলাস-জাতির উচ্ছেদে কেবল অবনতিই ফুটে ওঠে; এবং ভূগর্ভ খুঁজে যেহেতু অনাগতের আভাস পাওয়া যায় না, অতীতের ধ্বংসাবশেষই চোখে পড়ে, তাই অন্তত ভূতত্ত্বের আলোচনা আমাদের এই সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে যে অতিবৃদ্ধি প্রকৃতির অনভিপ্রেত; এবং অবর, ইতর অপাংক্লেয়, অবজ্ঞেয়রাই ধরিত্রীর মাতৃস্নেহে অধিকারী। কারণ প্রাক্‌পুরাণিক অতিকায় জন্তুদের সম্বন্ধে যা স্মরণীয়, তা বোধহয় এই যে তারা প্রত্যেকে তাদের সময়ে উন্নতির চূড়ান্তে পৌঁছেছিল; কিন্তু বৈশিষ্ট্যের মোহ তাদের সেখানে থাকতে দেয়নি, এবং সুনির্দিষ্ট গতি পেরোতে গিয়েই তারা আছ শূন্যে মিশেছে। তাদের অগ্রজ অভ্রভেদী বনস্পতিদের লসালসিপিভেও পাঠান্তর নেই; তারা এখন কয়লাখনির বাসিন্দা; অথচ যে-শৈবাল, যে-শিলাবদ্ধ ঝড়ে ভাঙে না, রৌদ্রে শুকায় না, জলে ধোয় না, জীবনের আরম্ভ থেকে অদ্যাবধি তারাই রয়েছে নির্বিকার। জীবাণুদের বেঙ্গাও এ-নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি; এবং টিরানোসারাস-এর প্রস্তরিত কঙ্কালে কয়ের যে বীজ মুদ্রাঙ্কিত, আধুনিক যক্ষারোগীর অস্থিতেও সেই এখনও ঘৃণ ধরায়। সুতরাং প্রগতিপূজা হয়তো মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর : প্রাণসরনীতির প্ররোচনায় পূর্বগামীদের শোচনীয় পরিণাম কলমে, মনুষ্য-জাতিরও নাম গন্ধ থাকবে না; এবং যেখানে জাতির আশ্রয়ালন নিষিদ্ধ, সেখানে ব্যক্তির আতিশয্য টিকবে না : সে যদি ভালোয় ভালোয়

না মানে, তবে প্রকৃতি তাকে মেয়ে শেখাবে যে আত্মজ্ঞানী জীবকোষের মতো অহংসর্বস্ব ব্যক্তিও নিজের অজ্ঞাতসারেই মুমূর্ষু।

ভূতবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগ থেকে খুশিমতো দৃষ্টান্ত কুড়িয়ে, আমি মানবস্বভাবের যে-ছবি আঁকতে বসেছি, তা নিশ্চয়ই অনেকের মনে ধরবে না; এবং তাঁরা প্রতিবাদে বলবেন যে প্রাচীনেরা যেমন জড়জগতের উপরে মানুষী ভাব চাপিয়ে করুণার অপব্যবহার করেছিলেন, আমিও তেমনই মানুষকে অচেতনের পর্যায়ে নামিয়ে বিপরীত আশ্বির প্রশ্ন দিচ্ছি। অবশ্য মানুষ যে বুদ্ধিমান ও নির্বাচনক্ষম, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু শুধু সেই জ্ঞানে সে পশুর কুটুন্নিতা-মুক্ত নয়। কারণ নাড়ীমণ্ডলের সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে একাধিক মনোবিজ্ঞানীর মতে বুদ্ধি আর সংঘটিত স্নায়ুপ্রতিক্রিয়া তুল্যমূল্য; এবং নির্বাচনক্ষমতা যেকালে সহজাত প্রবৃত্তিরই রূপান্তর, তখন সে-শক্তি মনুষ্যেতর জীবেরও আয়ত্তে। আসলে নাড়ীমণ্ডলের আদিম উদ্ভাবকই মানুষকে বুদ্ধির পথ দেখিয়েছিল; এবং যে-জন্তু সর্বপ্রাণে নিজের অন্ধকে অজীর্ণ রেখে খাদ্যপরিপাকের কৌশল শিখেছিল, সেই আমাদের উদরপূর্তির উপায় যুগিয়েছে। নির্বাচনপদ্ধতির ইতিবৃত্ত আরও পুরাতন। সৃষ্টির প্রথম প্রাণী, প্যারামিসিয়াম্-নামক এককোষী কীটও বিপৎপ্রাণ তথা ইষ্টাশ্রয়ী : সেও শত্রুর আক্রমণ থেকে পলায়, তথা আহাৰ্যের দিকে এগোয়; এবং তার আত্মরক্ষণিক দেহ নাড়ী-মস্তিষ্কহীন হলেও, প্রবৃত্তির প্রসাদে বক্ষিত নয়। অতএব যদি ভাবা যায় যে আত্মরক্ষার প্রাক্তন সংস্কারই বিষাক্ত অ্যাপেন্ডিক্স-এর অস্ত্র-চিকিৎসায় চিরক্রিয়; তবে আমাদের অহমিকা তৃপ্তি না পাক, ন্যায়নিষ্ঠার অমর্যাদা ঘটে না; এবং সংস্কারে বিবেচনার মূলানুস্থান বিশ্বয়বোধের অন্তরায় নয় বটে, কিন্তু জড়ের চেষ্ঠা সংক্ষেপ হয়তো আরও আশ্চর্যজনক।

প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধি বোম্বির অপভ্রংশ নয়; এবং প্রজ্ঞা উপজ্ঞা আর অভিজ্ঞার সংমিশ্রণ। অবশ্য এই অপূর্ব সমাবেশ সত্যিই একটা অঘনসংঘটন; এবং এরই জোরে মানুষ আজ পশুপতি। কারণ তার অগ্নিজেরা এমন কোনও প্রশালীর খোঁজ পায়নি, যাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বাদেও জীবনযাত্রা সম্ভবপর। ফলে তাদের সংসার অপচয়ে ডরা; বংশকে বংশ, জাতিকে জাতি উজাড় হয়ে গেলে, তবেই এক গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা আর এক গোষ্ঠীর আয়ত্তে এসে পৌছাত। যোগ্যতা-সঞ্চয়ের এই সর্বনাশা প্রতিযোগে মানুষ ঢুকল তার ভঙ্গুরতা নিয়ে; এবং পুরাতন প্রথায় প্রাণপাত করে প্রকৃতির বরণমালা ফুড়াবার সাধ যদি বা তার থেকে থাকে, সাধ্য আদৌ ছিল না। সুতরাং সে অল্প দিনে বুঝলে যে যারা বাঁচতে চায়, তাদের প্রয়োজন পরোক্ষ বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ সঙ্কট তরে যাওয়ার বিদ্যা; এবং ভাবা যেকালে সেই যৌব প্রঘটনের

পদ্ম পুরস্কার, তখন উক্ত আবিষ্কারও কোনও অনির্বচনীয় রহস্যের ধার ধারে না। অর্থাৎ বিল্লিষ্ট ব্যক্তির দায়মোচনের জন্যেই ভাষার উৎপত্তি; এবং তার কর্তব্য প্রতিকূল পরিবেষ্টনকে সামবায়িক সাধনার বশ মানানো। কিন্তু বাগ্যন্ত্রের অপপ্রয়োগ মনুষ্যসমাজে সুলভ; এবং অনাচারে পশুকে হারিয়ে আমরা প্রায় ঐশী প্রেরণার দোহাই দিই। উদাহরণ হিসাবে স্মরণীয় মানুষের আশ্চর্যহরিক রিরংসা; এবং অস্তুজগতে মানুষের নিকটাত্মীয় বানরই বোধহয় একমাত্র প্রাণী, যার মৈথুন ঋতুনিরপেক্ষ। তাহলেও আশ্চর্যের সারস্বতীর বরপুত্র নয়; এবং তাই কামাখ্যার আনাচে-কানাচে অনঙ্গের ক্রিম আরাধনা সেরে তারা সদরে পাশব-শব্দকে যৌন ব্যভিচারের বিশেষণ-রূপে চালাতে পারে না।

সুখের বিষয় ভাষা যেমন মানুষ আত্মপ্রবক্তার প্রকরণবিশেষ, তেমনই বিশ্ব-সাহিত্যও তার অন্যতম অবদান; এবং আমার মত-শব্দে সভ্যতাভিমাত্রীরা সে-দিকেই তর্জনীনির্দেশ করবেন। কিন্তু গত তিন-চার হাজার বছর ধরে সত্য, শিব, সুন্দরের মূর্তি-নির্মাণে সে অনেক করকৌশল দেখিয়েছে বটে, তবু মানুষ হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই আজ পর্যন্ত দেহাঙ্গ-প্রত্যয়ের দাস; এবং যদিচ মনোবিকলনের সিদ্ধান্ত এখন তর্কসাপেক্ষ, তথাচ শিল্পরচনা চিরকাল অতৃপ্ত ক্ষুধার অবাস্তব অন্নই যুগিয়েছে। অর্থাৎ মানুষের অন্যান্য উদ্যোগের মতো সাহিত্যের মূলও দৈন্যগ্রস্থি; এবং অনটন যখন আর বাণিজ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদে মেটে না, তখনই আমরা কাব্যলক্ষ্মীর সিংহদ্বারে ধরনা দিই। ফলত আড়লার-প্রমুখ মনোবেত্তাদের মতে নৈবদ্য, তথা অবিকল, মানুষ কল্ললোকের জীব; এবং দৈনন্দিন পৃথিবীতে যারা জন্মায়, তাদের উপকরণে 'যেহেতু সকল গুণের সমন্বয় একেবারে অসম্ভব, তাই মানুষমাত্রই তার প্রাক্তন স্বভাব উত্তরিয়ে আদর্শ সম্পূর্ণতার আশ্রয় চায়। কিন্তু সে-আদর্শ পরিণামবাদীর কৈবল্য নয়, বাঁচার জন্যে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সঙ্গে যে-সম্ভাব জীবগোষ্ঠীর প্রয়োজন, উক্ত আদর্শ তারই নামান্তর; এবং নির্দোষ ব্যক্তি সেই, যার সঙ্গে প্রতিবেশের সর্বাঙ্গীন সঙ্গতি ঘটেছে। তাহলেও এমন লোক স্বভাবতই সর্ববিধ কর্মপ্রবর্তনায় বঞ্চিত; এবং সাহিত্যসৃষ্টিও একটা সজীব প্রক্রিয়া ব'লে, সে-সাধনায় সিদ্ধি কোনও না কোনও অসংস্থিতির মুখাপেক্ষী। অতএব একের সামঞ্জস্যপদ্ধতিকে দশের গোচরে এনেই সার্থক সাহিত্য সমাজের উপকার সাধে, এবং জৈবিক প্রতিষ্ঠার প্রকার-সন্ধান বিমুখ হলে, এই বিষয়াসক্ত সাগর থেকে তারা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা যে বহু পূর্বেই উঠে যেত তা, নিঃসন্দেহ।

তবে আমরা স্মনতে বাধ্য যে ভাষা, তথা সাহিত্য, মানুষের অন্যান্য অঙ্গ-বিক্ষেপের মতো যদিও একটা স্থিতিস্থাপক ভঙ্গি-মাত্র, তবু তার বর্তমান

পরিণতি, অত্যন্ত জটিল; এবং উদাহরণ, শাসন ও অভ্যাস—এই তিন দীক্ষাগুরু পরামর্শে নবজাত শিশুর ক্ষুধিত জন্মনে যেমন দু দিনেই অন্নপরিবেষণের আজ্ঞায় রূপান্তরিত হয়, তেমনই কামনার তাড়নে আজ আর আমরা সঙ্গিনীহরণে বেরোই না, ঘরে বসে প্রেমের কবিতা লিখি। কারণ অসাধ্যসাধনেই সভ্যতার সার্থকতা; এবং আমাদের চিত্তপ্রকর্ষ যতই বাড়ছে, আমাদের সহজাত প্রতিক্রিয়া ততই কমে আসছে। ব্যাপার সম্প্রতি এত দূর গড়িয়েছে যে ইদানীং এমন মানুষ খুবই সুলভ যার কার্যকলাপের কোনও নৈমিত্তিক ভিত্তি নেই, যে পুঁথিজাত ভাববিলাসে কাল কাটায়, যাকে জীবনের তাগিদ আর টলাতে পারে না, কথাই মাতিয়ে তোলে। কিন্তু মদনসখার সংস্পর্শে আমাদের আদিপুরুষের দেহে একদা যে-অবস্থা জাগত, এখনও সেই মদস্রাব প্রশ্ন নামে অভিহিত; এবং উক্ত গণনিঃসার আপাতত আবহের কবল এড়িয়ে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির আয়ত্তে এসেছে বটে, তথাচ তার কারণেই বদলেছে, ফল রয়েছে যথাপূর্ব—নূতন পটভূমিতে অভিনব অভিনেতার নেমেছে, নাটক আছে নির্বিকার। এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে কলা চলে যে আবেগের প্রকারভেদ নেই, পার্থক্য শুধু তার উৎসে ও উপলক্ষে; এবং সম্ভবত সেই জন্যে কবিরা প্রেমাস্পদের মধ্যে বাছেন না, প্রত্যেককে প্রতীক বিবেচনায় সনাতন প্রেমানুভূতির চিরাচরিত লক্ষণসঙ্গীতে বারংবার বাহ্য জ্ঞান হারান।

আসলে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা, ভাবনা-বেদনা, আবেগ-উদ্বেগ—এ সমস্তের সূত্রপাত দেহে; এবং সে-সত্য অনুব্যবসায়ীদেরও সুবিদিত। অস্তিত্ব পক্ষে উইলিয়ম্ জেম্‌স্-ই প্রথম দেখান যে প্রাণী যখন ভয়াবেগ অনুভব করে, তখন তার শরীরের অবস্থান্তর গৌণ নয়, মুখ্য; এবং আমাদের হাত-পা কঁচকে যায়, নিঃশ্বাসের বেগ বাড়ে, হৃৎস্পন্দ দ্রুত তালে চলে ব'লেই, আমরা ভয় পাই, ভয়ানুভূতির ফলে ওই বিকারগুলো নজরে আসে না। অবশ্য এই রকম কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপরে দাঁড়িয়ে সংবিৎকে উড়িয়ে দেওয়ার দুরাশা হাস্যকর; কিন্তু এ-বিষয়ে বোধহয় আর মতবৈত নেই যে ক্ষুধার বশে মানুষের জিহ্বায় যেমন লালা ঝরে, তেমনই অন্য সকল উদ্বেজনাতেও আমাদের বিভিন্ন গুণ রসান্বিত হয়ে ওঠে আঙ্গকারিক রস হয়তো ওই প্রাকৃতরসেরই প্রতিরূপ; এবং নাসীহীন গণের রসসম্ভারে আমাদের বাতবহা নাড়ীর কেন্দ্রগুলো না ডিঙলে, বীরত্ব, স্নেহ, সৌন্দর্য, অধ্যাত্ম ইত্যাদির উপলব্ধি বৃদ্ধি বা অসম্ভব। অর্থাৎ মানবচৈতন্যকে দেহাতিরিক্ত ভাবা অনাবশ্যক; এবং আমার মতো চার্বাকপন্থীর কাছে চৈতন্যের সার্বভৌমত্ব ও অবিদ্বন্দ্বত্ব অন্য কোনও সিদ্ধান্তের সাহায্যে বোধগম্য নয়। যে-শাস্ত সত্য, যে-সনাতন শুভ মানুষকে গত পাঁচ হাজার বৎসর ধরে মাতিয়েছে, মজিয়েছে, তা সম্ভবত এমন রসস্রাব

যা দেহীর পক্ষে মহত্তম মঙ্গলের কারণ; এবং সে অমর, কেননা অভ্যাঙ্গে মানুষের আঙ্গিক প্রতিক্রিয়ার নিরোধ যদিও সহজ, তবু পূর্বোক্ত গুণনিঃসারের অবদমন অভাবনীয়। সুতরাং চৈতন্যের বেশ-ভূষাতেই পরিবর্তন ঘটে; তার স্বরূপে বৈলক্ষ্য ধরা পড়ে না; এবং উল্লিখিত রস যেহেতু রসায়নের নিত্য নিয়মে বাঁধা, তাই তার ফলাফল সকল কালে ও সকল ক্ষেত্রে সমান, আর মানবচৈতন্যের তুল্যমূল্য অপেক্ষাকৃত অক্ষয়।

এ-দিক থেকে দেখলে, ভাবা শব্দ যে কবি স্বর্গের চক্রান্ত; এবং আমাদের মতো অসম্পূর্ণ মানুষ হয়েও সে আমাদের তুলনায় অনেক বেশী আশুচেতন বলে, প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনের অবিরত চেষ্টায় তার প্রশাসীহীন গণ্ডগোল নিশ্চয়ই অত্যন্ত সংবেদনশীল। ফলে যতটুকু বা যে-রকমের অভ্যাঘাতে তার দেহে সরসতা আসে, তদপেক্ষা অধিক ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত আমাদের শরীরে হয়তো আন্দোলন জাগে না; এবং মহাকবি তিনিই, যিনি দৃশ্যমান বস্তুমাঝের প্রচ্ছন্ন উদ্দীপনাশক্তিকে নিজের শরীরে ধরে, সেই দুর্বল উদ্বেজনাতে অনুকূল ঘটনাচক্রের অনুগ্রহে পাঠকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে দেন। এ ক্ষেত্রে ভাষাই ঘটনাবহ; এবং ভাষা যে শুধু ধ্বনিরূপ উচ্চতম উদ্দীপকের আধার, তাই নয়, সভ্য মানুষের পক্ষে শব্দ আর বস্তু প্রায় অভেদাশ্রয়। সুতরাং কাব্যরচনার উপলক্ষে কোনও অলৌকিক প্রেরণা কবিকে পেয়ে বসে না, তিনি অভিধানে এমন শব্দরূপ, এমন ধ্বনিতরঙ্গ খোঁজেন যা তাঁর মৌল উদ্বোধনের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহার্য; এবং কবিতা তখনই সার্থকতার পর্যায়ে ওঠে, যখন অবশ্যজ্ঞাবী বাক্যবিন্যাসের সংঘাতে কবির শরীরে ঈশ্বিত আবেগের পুনরভিনয় চলতে থাকে। কারণ আবেগের ঝোঁকে কথা কইবার সময়ে মানুষের বাগ্যস্ত কতকগুলো নির্দিষ্ট আদর্শ মানে; এবং ছন্দোবদ্ধ শব্দ-শৃঙ্খলার শুণে পাঠকের কণ্ঠে সেই সে-রূপকল্পের অনুকরণ করে, অমনই তার মানসপটে ফুটে ওঠে কবির ধ্যানতন্ময় চিত্রকল্প। এখানে মনে রাখা দরকার যে চেষ্টিয়ে পড়ায় আর মনে মনে পড়ায় খুব বেশী তফাৎ নেই; এবং যারা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাই শুনেছেন যে চিন্তাকালে আমরা শুধু মস্তিষ্কে কাজে লাগাই না, সারা শরীরে আন্দোলন তুলি।

পূর্বেই জানিয়েছি যে উদ্দীপনায় যতই তারতম্য ঘটুক, তার দৈহিক প্রতিঘাত সার্বত্রিক ও সমান; এবং সেই জন্যে কবি ও পাঠক যদিও ভিন্নধর্মী, তবু তাদের আবেগ ও অনুভূত রস মোটামুটি এক। অন্যথায় কবিতা কেন চির পরিচয়ের বিশ্বয় জাগায়, কাব্যপাঠের বেলা হর্ষ, বিবাদ, উৎসাহ ইত্যাদির উপলব্ধি কেন শারীরিক হয়ে ওঠে, রসাত্মক বাক্য কেন গদ্য ভাষ্যের তোয়াক্কা রাখে না—এ সমস্ত সমস্যার সমাধান অসাধ্য; এবং শুনেছি বটে যে যোগীর

সমাধি অধৈতের অনির্বচনীয় সীলাভূমি, কিন্তু সাধনার সে-স্তরে, শুধু আমার নয়, মহাকবিদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ। কারণ ভাষা প্রতিবেশজন্মের পরমাত্র; এবং মানুষের প্রতিবেশ যেখানে মুখ্যত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তখন অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অচিন্ত্যের দ্বৈত্য ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এমনকি বিজ্ঞানের পারিভাষিকেও নিরুপাধিকের স্থান নেই; এবং হয়তো মর্ত্যসীমায় আবদ্ধ থাকতে সম্মত নয় বলেই, অর্বাচীন পদার্থবিদ্যা প্রাচীন পরাবিদ্যার মতো স্বতোবিরোধী। যে-মানুষ নিজের অন্ধ-সম্বন্ধে অচেতন, তার কাছে চতুর্ধ আয়তন খুব জোর উৎপ্রেক্ষামাত্র; এবং সমষ্টির পরিসংখ্যানে ব্যক্তিগত গতিবিধির ব্যাখ্যা খুঁজলে, সান্ত্বের অনন্ত ব্যাপ্তির মতো অসম্বন্ধ প্রসঙ্গ অনিবার্য। অস্তিত্ব পক্ষে বর্তমান যুগ শব্দভেদের মন্ত্র ভুলে গেছে; এবং নিষ্কর্ষের চূড়ান্তেও আমরা যেহেতু চক্ষু-কর্ণের দাস, তাই মরমী মৌনব্রতের উদ্‌যাপন আমাদের অবগতি বাড়ায় না, অনর্থের প্রশ্রয় দেয়। অতএব আবেগ ও বাগ্যব্দের প্রাণ্ড আত্মীয়তা অবশ্যস্বীকার্য; এবং এমন সিদ্ধান্ত থেকেও অব্যাহতি নেই যে মানুষের কান যে-নিয়মে একটা সুপরিমিত শব্দপর্যায়ের উপরে-নীচে বধির, মানুষের চোখ যে-নিয়মে একটা নির্দিষ্ট বর্ণস্তরের অধে-উর্ধ্বে অন্ধ, ঠিক তেমনই কোনও নিয়মেই মানুষের কণ্ঠ একটা নাতিবৃহৎ আবেগগণ্ডির বাহিরে নিষ্ক্রিয়।

অর্থাৎ কবির প্রেরণা, সাধকের উপলব্ধি, দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টি মহৎ হোক বা না হোক, তাঁদের ভাষায় কেবল ততটুকু বর্ণনীয়, যতটুকুর ভার তাঁদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সয়, অথবা যতখানির জড়া না খেলে, তাঁদের বাগ্যব্দের জড়তা কাটে না; এবং তর্কের খাতিরে যদি বা মানি যে এমন সিদ্ধপুরুষ এখনও বর্তমান, যাঁর দিব্যকর্ণ গ্রহ-নক্ষত্রের নৃপূরনিকশে অহনিশি ঝঙ্কত, তবু সে-দুর্লভ অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যরচনার উপাদান যোগাবে, এ-ধারণা হাস্যকর। অবশ্য তারার নৃত্য হয়তো মদিরেক্ষণেরই উপভোগ্য; এবং যে-জাতিস্মর শ্রুতিবোধের শুণে পিথাগোরাস্ গোলকের স্বরগ্রাম-আবিষ্কার করেছিলেন, বিবাদী সূরের সাম্প্রতিক অসঙ্গতি স্বতই তার পরিপন্থী। কিন্তু তুলনীয় অতিকথা আধুনিক সাহিত্যে বিরল নয়; এবং আজকালকার অধিকাংশ কবিই সাহিত্যের ব্যবহারিক ধর্মে আস্থা খুঁয়ে কাব্যের কাঁধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিপুল বোঝা চাপিয়েছেন। ফলে আমরা ভুলতে বসেছি যে সাহিত্যের কর্তব্য নেপথ্য অনুপ্রাণনার প্রকাশ্য প্রযোজনায় লেখকের অনুভূতিসম্বন্ধে পাঠকের চৈতন্যকে জাগিয়ে দেওয়া; এবং অলসস্বভাব চৈতন্য যেমন বিনা ধাক্কায় কাছে লাগতে রাজী নয়, তেমনই যখন ধাক্কা অবিরত চলে, তখন তার সাড়া পাওয়া অসম্ভব। কারণ দীর্ঘসূত্র উদ্দীপনাই অভ্যাসগঠনের অনুকূল; এবং কলকাতার কলকোলাহলে যাঁদের কাল কেটেছে, তাঁরাই জানেন যে রাজ্যপথের অবিশ্রান্ত ঘর্ষে তাঁদের ঘুম ভাঙে না বটে, কিন্তু পাশের ঘরে অনুচ্চ আলাপ শোনামাত্র

তারা চমকে ওঠেন। সুতরাং শিল্পসৃষ্টিতে আত্যন্তিক স্বকীয়তা পশুশ্রম; এবং বৈচিত্র্যের অভাবে মনোবোণ যতই কিমিয়ে পড়ুক না কেন, তা আগা-গোড়া নূতন, তাতে শেষ পর্যন্ত সে হকচকিয়ে যায়।

উক্ত সত্য অ্যারিস্টটল-এরও সুবিদিত ছিল; এবং প্লেটো-পরিকল্পিত বিশুদ্ধ রূপে ব্যক্তির পরিচয় মেলে না বলে, তিনি যদিও গুরুতর প্রতিবাদ করেছিলেন, তবু ব্যক্তির মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও সাধারণের সন্নিপাত তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। উপরন্তু তিনি বুঝেছিলেন সে সম্বন্ধ সমানধর্মীর মধ্যেই সম্ভবপর; এবং জ্ঞান যেকালে সম্বন্ধেরই প্রকারান্তর, তখন ব্যক্তির বিশিষ্টাঙ্গেত অবগতির অতীত, তাঁর ভিতরে যেটুকু সামান্য, আমরা শুধু সেইটুকু জানি। এ-মতে বোধহয় অধিকাংশ মনস্তাত্ত্বিক সায় দেবেন : অস্তিত অনুবঙ্গবাদীরা মানবেন যে অতীতপূর্বের অভ্যাসেতে দেহাচার দুষ্ট; সে-অন্যে পূর্বাঙ্কিত অভিজ্ঞতার অনুমোদন অপরিহার্য। কারণ বাস্তবতা নাড়ীর মারফৎ বাহ্য উদ্বেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছালে, মস্তিষ্ক সে-উদ্বেজনা কে ভেঙেচুরে, প্রাক্তন প্রতিক্রিয়ার খোপে খোপে সাজিয়ে বেলে; এবং মানুষ কর্মপ্রবর্তনার ততটাই নেয়, যতটা সেই ছকে ধরে। বাকীটা হয় উৎসর্গে যায়, নয় অবচেতন দূরদৃষ্টির যত্নে সুদৃঢ়জাত হয়ে ভবিষ্যৎ অনুবঙ্গের গভীরতা বাড়ায়; এবং বুদ্ধি বা তাই শ্রেষ্ঠ শিল্পসামগ্রীর বিশ্লেষণে প্রাচীন-অবচীনের নিপুণ সংমিশ্রণ চোখে পড়ে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা একটা একান্ত পরিবারের নামমাত্র; এবং সে-পরিবার এখনও সনাতন পদ্ধতি কাটিয়ে উঠতে না পেরে সাবেকী ভ্রমাসনকে সদর আর অন্দরে বেঁধে রেখেছে। এখানেও সদরে যা ঘটে, তা শাস্ত, সহজ ও সার্বজনীন; এবং অন্দরবাসিনীরা যথারীতি পরামর্শবী ও অসূর্যস্পশ্য। সুতরাং প্রথম দিকটা আমাদের কর্মকৌশল শেখায়, ভিন্ন ভিন্ন আচরণের নিমিত্ত যোগায়, প্রবর্তনাসমূহের প্রকারভেদ চেনায়; এবং দ্বিতীয় দিকটা আমাদের ভাব আগায়, ছবি আঁকায়, স্মৃতির আহার-বিহারের ব্যবস্থা করে।

ভাবা-রূপ পরিবর্তিত প্রবর্তনাসমূহে ওই ঘেঁষা বিদ্যমান; এবং প্রবীণ আলফারিকেরা শব্দের স্বভাবে লক্ষণা, ব্যঞ্জনা, অভিধা প্রভৃতির শ্রেণীবিভাগ এনে সম্ভবত ওই পার্থক্যেরই খবর দিয়েছেন। উদাহরণত নীল-বিশেষণটি বিবেচ্য; এবং তার যে-অর্থ সাধারণগোচর, তা এই যে নীল রঙের বস্তু লাল বা অন্য বর্ণের বস্তু নয়। কিন্তু নীলের অন্তরঙ্গ ভাবচ্ছবি বচনাশীত। চণ্ডীদাস তাতে হয়তো দেখতেন নীল সাড়ীর আড়ালে রক্তকিনীর তপ্তকাঞ্চনকাঙ্ক্ষি; স্বয়ং রামীর কাছে রংটা নিশ্চয় তার আতিব্যবসায়ের মর্যাদা পেত; এবং আমার প্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাঁধাই যেহেতু নীল ছিল, তাই আমি ওই বর্ণে আমার স্বর্ণীয় গুরু মহাশয়ের অবাকসুমসকাশ্য লুক্কায়িত প্রত্যক্ষ করি। বলা বাহুল্য যে এক নীল-শব্দের দ্বারা অত রকম তাৎপর্ষ্য প্রকাশ্য নয়; এবং

কোনও বৈষ্ণব কবি যদি ভাষার বহিরাশ্রয়িতা ঘুটিয়ে শুধু নীল-শব্দের পুনরুক্তিতে ইষ্টসন্দর্শনের মহানন্দ লোকসমক্ষে ফোটাতে চান, তবে তাঁর সাধ মিটবে না, মুদ্রাদোষেই লোক হাসবে। কারণ বিশ্লেষণালপ অন্তরেই সাজে; এবং প্রিয়সম্বোধন যখন সদরে শুনি, তখন চপল শ্রোতার বাচালতা থামানো যাক বা না যাক, রসিক জনের বিরক্তি রোখা যায় না। অবশ্য শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অবরোধপ্রথার উচ্ছেদ অনিবার্য; এবং এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, এক বক্তৃতাভাষণে, এক বাজারের ভেজাল সওদায় স্বাস্থ্য হারিয়ে, আমরা সকলে হয়তো একই ভাবনা ভাবি। সম্ভবত সেই জন্যে ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাত্যেরাও সম্প্রতি গৌড়া হিন্দুয়ানির ধ্বংসা ওড়াচ্ছেন; এবং বাঙালী মুসলমানেরা আকাশকুসুম কুড়াতে বেরিয়েছেন আরবমন্ডলের কণ্টকিত অভাবে।

কিন্তু যাঁদের কাছে ইতিহাসের সাক্ষ্য একেবারে মিথ্যা নয়, অন্তত তাঁরা মানতে বাধ্য যে সংসারের নটমঞ্চে তাজ্জ্বল ব্যাপার অচল; এবং অভিজ্ঞতা ও ভাষার প্রকৃতি যতই বদলাক না কেন, সদরের বাসিন্দারা বাটনা বাটতে বসবে না, অবশুষ্টিতারাও পুরুষালিতে হাত পাকাবে। পক্ষান্তরে নিরুদ্বে যদিও এটোপি-র নিয়ম খাটে, এবং কালক্রমে যদিও অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞত কুলপ্রধায় জনতার স্থূল হস্তাবলম্ব লাগে, তবু উপলক্ষিমাত্রেই সাধারণ্যে আসে না, কেবল সেই অনুভূতি বিশ্বমানবের আদর পায়, যা সার্বজনীন স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী। কারণ পাভলোভ পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়েছেন যে শাশ্বতপরিবেশের সঙ্গে কুকুরকে প্রত্যহ একটা নির্দিষ্ট সুর শোনালে, এক দিন খাদ্য বাদ দিয়েও সেই সুরের সাহায্যে তার জিভে লাল ঝরানো সম্ভব; এবং জৈব প্রয়োজনের বিচারে মানুষ যেহেতু কুকুরে সমকক্ষ, তাই তার বেলাতেও উদ্বেগজনকপরিবর্তনের প্রকারান্তর নেই। অর্থাৎ শিক্ষার সোপানমার্গ নিশ্চিত ও নির্বিকার দেহপ্রতিক্রিয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত; এবং অবিরাম অভ্যাসে প্রাণিবেশের পরিচিত উদ্দীপনা বদলিয়ে, তার জায়গায় প্রায় যে-কোনও নূতন উত্তেজনার উপস্থাপন সুসাধ্য বটে, কিন্তু সে-ব্যাপারেও তার সহজ পরাবর্তকই কর্মকর্তা। সুতরাং সঙ্গীতের প্রতি কুকুর বা মানুষের অনুরাগ আসলে স্বভাবগত নয়; নানা আওয়াজের মধ্যে তারা রাগ-রাগিণীর ঠাট তখনই চিনতে শেখে, যখন তা ছাড়া তাদের জীবনযাপন দুঃস্বপ্ন।

ধরা যাক আমি পাহাড় চড়তে চড়তে পা পিছলে চলেছি নাস্তির দিকে : হঠাৎ একটা খোঁচে অবলম্বন জুটে গেল; এবং সেটাকে আঁকড়ে যেখানে ঝুলে রয়েছি, তার নীচে ঋত, আর ঋতে মৃত্যু। এ-অবস্থায় মৃত্যুভয় সামঞ্জস্যসিদ্ধির মুখ্য প্রবর্তনা; এবং সেই জন্যে, এখন ধারালো পাথরে আঙুল কেটে দুশানা হবার জোগাড় ছেনেও, আমার বাহ্যপেশী নড়বে না, দেহযন্ত্র স্বজ্ঞাপ্রণে বুঝবে যে বর্তমানে জ্বালার প্রতিকার খোঁজা ভারসাম্যরক্ষার

অস্তরায়, উপস্থিত ক্ষেত্রে বুঙ্গে থাকাই বলহিত্তির অধ্বিতীয় উপায়। বাঁচার গরজে আহত পেশীর অনিকাম প্রসার-সঙ্কোচ যেমন নিরুদ্ধ, তেমনই নিষিদ্ধ স্বগত ভাষার অতিবাস্তব যথেষ্টাচার; এবং কুমীর-রাপী জীবনের সঙ্গে বিবাদ বাঁধিয়ে যে-কবি কালক্রোচে ভেলা ভাসাবেন, অপঘাত থেকে তাঁর নিস্তার নেই। অবশ্য আমি অবগত আছি যে ইতিপূর্বে দু-চারজন লেখক সমসাময়িকদের অবজ্ঞা কুড়িয়েও পশ্চাদ্গামীদের অর্থ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের বেলাও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি; এবং জীবদ্দশায় ডান, ব্রেক, কীটস্ প্রভৃতির অমর্যাদা তাঁদের অক্ষমতার পরিচয় দেয় না, প্রমাণ করে তৎকালীন সমাজের দুগতি। অর্থাৎ তাঁরা মহাকবি : মানুষের চিত্তস্তন অতীতাই তাঁদের কাব্যে উৎসারিত; এবং যে-যুগে তাঁদের জন্ম, তার কৃত্রিম আবহে প্রত্যক্ষ প্রেরণার অবকাশ ছিল না বলেই, তদানীন্তন পাঠকবর্গের অনুকম্পা তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি, সেকালের শুচিবায়ুর মধ্যে তাঁদের কাল্পাতীত সরলতা স্বভাবতই অনুকম্পারী লেগেছিল।

সম্ভবত সভ্যতাই প্রাকৃত কাব্যের পরিপন্থী; এবং এমন কবির অভ্যুদয় হয়তো এখনও অব্যবহিত কাব্যে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের বিজ্ঞাপন যার বিবেকে বাধে, যিনি আত্মরতির মোহ কাটিয়ে, তথা ম্যাথু আর্নল্ড-এর উপদেশ শুনে, সাহিত্যকে দেখেন যুগচৈতন্যের নিকষ হিসাবে। তাহলেও তাঁরই সমূহ বিপদ; এবং নিরাসক্ত আত্মসমর্পণে এগিয়ে তিনিই বুঝি বা মর্মে মর্মে বোঝেন যে মানুষের অনুসন্ধিৎসা আজ যেকালে অরূপরতনের স্ফোভে রূপসাগরে ডুবুরি নামিয়েছে, তখন ইন্ড্রিয়সাপেক্ষ ভাষা সুবিধা নয়, বরঞ্চ বাধা। কারণ দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, রঞ্জনরশ্মি, ছায়াচিত্র ইত্যাদির অনুগ্রহে চৈতন্য সম্প্রতি অলঙ্ঘ্যে দিশাহারা; এবং সে-বিমূর্ত লোকে অলঙ্কারশাস্ত্র আচরণীয় বটে, কিন্তু যেখানে অ্যামিতির প্রবেশ সূচু নিষিদ্ধ, সেখানে এমনকি ব্যাকরণও যেন কার্ডিওগ্রাম-এর দিনে সহস্রমারী কবিরাজের অতিজীবিত নাড়ীজ্ঞান। ফলত অধুনাতন কবিদের আত্মপ্রাণে জটিল রচনার মাত্রাভেদে বাড়ে, কমে; এবং উগ্র বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার ব্যতীত শুধু পাঠকের মনোহরণ অসাধ্য নয়, শিক্ষার ব্যাপ্তিতে ও কৃষ্টির বাহুল্যে সেও ইদানীং সাহিত্যিকের মতোই অসামান্য। আগে পরমার্থের বার্তাবহ বলে, সুখে-দুঃখে কবিদের ডাক পড়ত; কিন্তু কাব্যের সাধুনাবাগীতে বারংবার এত ছিন্ন বেরিয়েছে যে বিপদে-আপদে আজ আমরা বিজ্ঞানের মন্দিরেই পূজা মানি। একদা সভা-সমিতির অবসরবিনোদে কবিরাই দলপতি ছিলেন; কিন্তু এখন তেমন আসর হয় উঠে গেছে, নয় তার অধিকারী রাষ্ট্রনেতা আর ব্যামামবীর।

অগত্যা কাব্য আজ খামখেয়ালী; কবির স্বকীয়তা এখন শিশুসুলভ খেচ্ছাচারের ডেক পরেছে; ব্যক্তিস্বরূপ হারিয়ে সে সম্প্রতি আঁকড়ে ধরেছে

হিংস্র ব্যক্তিবাদকে। অতএব আবার মনে করার সময় এসেছে যে সকল পারদর্শিতার পিছনে যে-রকম প্রাক্তন সংস্কারই উহা থাক না কেন, সেই যৌক, সেই অধিসংক্রান্তি, সেই “অ্যাটাভিজ্‌ম্” মোটেই অলৌকিক নয় : অথবা তাতে যদি দৈবের প্রসাদ দেখি, তবে নিপুণ ফুটবল-খেলোয়াড়ও অধরার প্রিয়পাত্র-রূপে গণ্য; এবং লেখক-পাঠকের সংবাদে মরমী আদান-প্রদানের রহস্যারোপ সম্ভব হলে, সাহিত্য-পদবাচ্য আত্মপ্রকাশ নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন, যেই তৃতীয় নয়ন খুলে চাইবে, পাঠক অমনই বুঝবে লেখকের হৃদয় কোন্ উপলব্ধিতে উদ্বেল। আসলে সাহিত্যসৃষ্টি, তথা সাহিত্যসম্ভোগ, অনুকূল আবেষ্টনের গুণ; এবং ভিন্ন ভিন্ন মানুষের প্রতিবেশ যেহেতু অঙ্গ-বিস্তার ভিন্ন, তাই কেউ লেখে কাব্য, কেউ মাতে গণিতশাস্ত্রে, কারও জিহ্বা গো-নামে রসিয়ে ওঠে, কেউ ভাবে গান্ধী ভগবতী। উপরন্তু ব্যক্তির মতো, যুগের পরিমণ্ডলও পরিবর্তনশীল; এবং সেই জন্যে অষ্টাদশ শতকের কবিতা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছড়ার মতো শোনায়, শেক্সপীয়র-এর প্রহসন প’ড়ে পরীক্ষার্থীর কান্না আসে, “সং অফ্ সলোমন্”-এর আধ্যাত্মিক রূপক আধুনিকদের কামানলে ঢালে ঘৃতাঘৃতি। অথচ এমন অনুমান বোধহয় একেবারে অমূলক নয় যে মানুষের অধিকাংশ ভাবনা-বেগনায় শিক্ষা, সমাজ ও সময়ের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট বটে, তবু তার দেহের কতকগুলো প্রতিফলিত অনাদ্যন্ত, কতকগুলো প্রবৃত্তি দুর্দমনীয়, কতকগুলো অভিজ্ঞতা মজ্জাগত; এবং যে-কবি সেই সনাতন ধর্মের প্রচারক, তাঁর স্থান হয়তো কালাবর্তের কেন্দ্রে, যেখানে সর্বব্যাপী অসংস্থিতির মধ্যেও তাঁর পদযুগল অটল।

আমার বিশ্বাস, এই নৈরাশ্বরীতিতেই বিশ্বসাহিত্যের ঐক্যসূত্র অনুসন্ধানীয়; এবং উক্ত সর্বসম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ব’লেই, সকল জাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে প্রসঙ্গ, পদ্ধতি ও আবেদনের এতটা সৌসাদৃশ্য সম্ভবপর। কিন্তু কাব্য তথা মহাভারত বিজ্ঞেয়পণে যীরা হেতুবাদেব শরণ নিতে অনিচ্ছুক, তাঁদের মতে বুদ্ধ বা কালিদাস প্রয়োগাগারে না জন্মানো পর্যন্ত মহাপুরুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কৌতূহল কেবল নিরর্থক নয়, উপহাস্যও; এবং যখন এ-মনোভাবের অঙ্গি-গলিতে প্রবেশ করার মতো পথজ্ঞান আমার নেই, তখন আমি মানতে বাধ্য যে ভূতবিদ্যার সাহায্যে হিমালয় গড়া না গেলেও, গিরিরাজের উদ্ভব-সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তই প্রমাণসহ। তবে এটা ঠিক যে জড়ের বিষয়ে আমাদের অস্তিত্ব যেমন ব্যাপক, পরীক্ষা-নিরীক্ষার অলৌকিক-বশত জীবন-প্রসঙ্গে আমরা তেমন নিশ্চিত নই; এবং তৎসঙ্গেও গবেষণালব্ধ উপায়ে আজ যেহেতু প্রাণীর শিঙ্গ বদলানো যায়, প্রণয়াসক্তির মতো নিত্য প্রবৃত্তি প্রতিলোমের আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠে, দ্রাবণজাত লতা-পাতা আসল ডাল-পালাকে লজ্জা দেয়, তাই একথা অবশ্য স্বীকার্য যে জীব-বিদ্যাতেও আমাদের ব্যুৎপত্তি প্রত্যহ

বাড়ছে। অন্তত পক্ষে আমাদের প্রাণসংক্রান্ত অনুমান যতই অসম্পূর্ণ হোক, কোথাও অযৌক্তিক নয়; এবং এ-জাতীয় প্রকল্পের পিছনে যে-মনোভাব বিদ্যমান, পদার্থবিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য আপাতত তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত।

অবশ্য জীববিদ্যার নিঃসংশয় বিভাগে জন্তু আর উদ্ভিদই অবগতির প্রধান অবলম্বন; এবং মানুষের মেধা বা মনীষা সম্ভবত অতিজ্ঞাতব। কিন্তু এও মর্ত্যেরই মহিমা; এবং এর সমস্ত অন্ধি-সন্ধি এখনও আমাদের নখদর্পণে আসেনি বলে, একে যদি স্লোকোস্তর লাগে, তবে না মেনে নিস্তার নেই যে বাণের চাল-চলনও অলৌকিক। আসলে চাকা গড়িয়ে যায় স্বভাবগুণে, আর মানুষ মনস্বী ঘটনাগতিক; এবং ঘটনাগতিকের সংজ্ঞা বেশ একটু আবছা রকমের বটে, তবু তার প্রতিকারে লীলাবাদের অবতারণা জিজ্ঞাসার আত্মহত্যা। কারণ সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি আর অনির্বচনীয়ের অস্বীকার প্রায় সমার্থবাচক; এবং রূপহীন ভাবনা ভাবনা নয়, ভাবনার ভান-মাত্র। পক্ষান্তরে সংস্কৃতির বিকাশ মহাপুরুষেরই চেষ্টা-প্রসূত; এবং সেই অন্ত্যে উপসংহারে একধার পুনরাবৃত্তি অত্যাবশ্যক যে প্রাক্তম্মরগীয়দের মর্যাদা-লাঘব বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ আমার বক্তব্য এই যে তাঁদের সঙ্গে আমার অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য না থাকলে, মনুষ্যজন্মের যিকারে আমি কবে নিজেই হারিয়ে ফেলতুম; এবং হয়তো উক্ত সাদৃশ্যের দোষেই মহাত্মারাও আমার বিচারে পরমাখ্যার সমকক্ষ নন, বিধানবিকল্প দেহী। অর্থাৎ ব্যক্তির মহত্ত্ব সংসারসীমার বাইরে দুনিরীক্ষ্য; এবং শিলাময় তটের ধাক্কাতেই প্রচুতার পরাক্রম যেমন আমাদের চোখে পড়ে, তেমনই আমরা মহাপ্রাণ ওষেলোকে তখনই চিনি, যখন বুঝি তাঁর অধঃপাতের হেতু কত অকিঞ্চিৎকর।

পুস্তক আলোচনা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

The Sound and the Fury—WILLIAM FAULKNER (Chatto & Windus), All Passions Spent—V. SACKVILLE WEST (The Hogarth Press), The Grasshoppers Come—DAVID GARNETT (Chatto & Windus).

উইলিয়াম ফকনারের দ্বিতীয় পুস্তক “দি সাউন্ড এন্ড দি ফিউরি” একটি দুঃস্থ পরিবারের অধঃপতনের ইতিহাস। বাপ মাতা, মা চিরকুম্ভ স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ, এক ছেলে জন্মমূঢ়, আরেক ছেলে আত্মঘাতী, তৃতীয়টি সয়তান, মেয়ে স্বৈরিণী, দৌহিত্রী হট্টচারিণী, আত্মীয়স্বজন পরাম্রজ্ঞীবী, পরিচারকবর্গ নিগ্রোজাতীয়, অশিক্ষিত ও উৎপীড়িত। উপন্যাসখানির মধ্যমণি হচ্ছে মেয়ে ক্যাডি; লোকনিন্দার ভয়ে গর্ভবতী ক্যাডি একটি অভ্যঙ্গনকে বিয়ে করে; কিন্তু বেশিদিন তাকে স্বামী-ঘরে থাকতে হয়নি, কুইন্টিনের জন্মের খবর যখন আর চাপা রাখা গেলো না, তখন সে স্বশ্রমালয় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই মুখ্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ওই অসাধারণ পরিবারটির দুর্দশার ইতিবৃত্ত চার পর্বে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ড ক্যাডির অবোধ ভাইটির জালায়িত প্রলাপ। তার মনে কার্যকারণের শৃঙ্খলা নেই, অতীত আর অধুনা হরিহর আত্মা, আত্মীয় ও পর দু’দলই সমান অনিষ্টকারী। এই অসম্বন্ধ প্রাণের উন্মাত্র নিবুদ্ধিতার একমাত্র আধারবিন্দু হচ্ছে ক্যাডি। তাই বেন্জি কিছুতে মানতে চায় না যে, ক্যাডি এখন অজ্ঞাতবাসিনী, ক্যাডি এখন মধ্যবয়সে পা দিয়েছে, ক্যাডি আর কখনো তার পিতৃগৃহে ফিরবে না। সেই জন্যেই সন্ধ্যাবেলা স্কুলের মেয়েরা যখন ঘরে ফেরে, বেন্জি তখন বাগানের রেলিঙের ভিতরে মুক্তিকামী পশুর মতো ছুটোছুটি করতে করতে ভাবে, তার বোনও বুঝি সেই মেয়ের দলে লুকিয়ে আছে; সেই জন্যেই গল্ফকোর্সে খেলোয়াড়েরা যখন অনুগামী ‘ক্যাডি’কে ডাকে, তখন তেত্রিশ বছরের বেন্জি ককিয়ে কেঁদে ওঠে পাঁচ বছরের ছেলের মতন।

দ্বিতীয়ভাগে ক্যাডির আত্মঘাতী ভাইটির চরমোক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে। মুমূর্ষুদের মনেও কালসংজ্ঞা খুব সতেজ নয়, তাই এ-খণ্ডও নৈয়ামিক

পরস্পরের কোনো ধার ধারে না। মৃত্যুর প্রবোধদ্বারা নিত্যনৈমিত্তিকের সীমাসন্ধি লুপ্ত হয়ে এসেছে, চাক্ষুষ ঘটনার স্রোত স্মৃতির উন্মহনে আবিল, বন্ধের মধ্যে চলেছে কাম্মাহাসির মল্লযুদ্ধ। কুইন্টিনের প্রাণও ক্যাডিগত, সেইজন্যে ক্যাডির চরণচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনও শিথিলবৃত্ত হয়ে পড়ে,—এর পরে, মৃত্যুই তার একমাত্র পরিণতি। কিন্তু একটা কথা এখানে অবশ্যবক্তব্য, কুইন্টিনের আত্মহত্যার মূলে অবিশিষ্ট ভ্রাতৃত্বাব না-ও থাকতে পারে।

তৃতীয়কান্তের উত্তমপুরুষ ক্যাডির কনিষ্ঠভ্রাতা জেসন। এখানেও পিছনে ফিরে সিংহাবলোকনের অভাব নেই, কিন্তু মুখ্য ব্যাপারটা সদ্যস্তন। এ-অধ্যায়ের প্রধান পাত্রী আর ক্যাডি নয়, ক্যাডির কানীন কন্যা কুইন্টিন। ক্যাডি এখন সুদূরপর্যায়ত ঝড়ের মতো, তার তর্জ্জনগর্জনের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাঝে মাঝে কানে বাজে বটে, কিন্তু তার বিদ্যুৎবিলাসে চোখ আর ঝলসে যায় না। না, উপমাটা ঠিক হলো না; সে সুদূর হতে পারে, কিন্তু পরাহত কোনোমতেই নয় : যুগযোজনের আড়াল থেকেতারি স্রষ্টি এই পরিবারটিকে ধ্বংসপথের পথিক ক'রে রেখেছে। ক্যাডির কন্যা কুইন্টিন উপলক্ষ মাত্র, জেসনের অক্লান্ত প্রতিহিংসা আসলে ক্যাডিকেই আঘাত করতে চায়। এ-পরিচ্ছেদটায় কালের গতি সহজ, সঙ্গতি সর্বত্রই বিদ্যমান, তবু সমস্ত দুঃপাঠ্য বইখানার মধ্যে এই অংশটাই বোধহয় সব চেয়ে কষ্টপাঠ্য। জেসনের সমান শয়তান জীবনে তো বিরল বটেই, এমন কি সাহিত্যেও খুব সুলভ নয়, কিন্তু তার হাবভাব-ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন একটা বাস্তবিকতার ছাপ আছে যে, মনে হয় ও-রকমের মানুষের পরিচয় আমরা পথে ঘাটে প্রায়ই পেয়ে থাকি। পাঠকের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি ভয়ে ভয়ে নিজের অন্তরে অন্বেষণ ক'রে দেখে ওই অমানুষিকতার মূল আপনার মধ্যেও নিহিত আছে কিনা।

আখ্যায়িকার উপসংহার ধ্রুপদী নাটকের মতো নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু শেষাক্ষর সূত্রধার নিগোপরিচারিকা ডিলসি, তারি কণ্ঠের নেপথ্যে লালিত, নির্জিত ও নির্বল বিশ্ব আর্দ্রনাদ ক'রে ওঠে। লেখকের আবেগ সংরক্ত হলেও অসংযত নয়। ফলে তিনি নিগোনিগ্রহের বিষয়ে এখানে এখানে যে ইঙ্গিত করেছেন, তা কখনো আর্টপ্রস্ট হয়ে হিতৈষণার ভাবালু পক্ষে নিমজ্জিত হয়নি। কারণ এই সকল মন্তব্যের মধ্যে তর্কের কোনো চেষ্টা নেই, আছে কেবল অনুকম্পনের স্বাক্ষর, আছে কেবল আবেগের হৃন্দ। এই জন্যেই বোধহয় বইখানার ভিতরে এমন অনেক বচন আছে, যেগুলোকে গদ্য বলা চলেনা, কাব্য আখ্যা দিতে হয়, কারণ মনের

দরবারে গদ্যের আবেদন পৌঁছয় যুক্তির মারফতে, কিন্তু কাব্যের দাবি মধ্যস্থের তোয়াকা রাখে না, মোস্তারকে ডিঙিয়ে বিচারকের চিত্ত দ্বীতে অনুরণিত হতে থাকে।

“দি সাউণ্ড এণ্ড দি ফিউরি”র মতো বইয়ের সারসংগ্রহ করতে যাওয়ায় দুঃসাহসিকতা আছে, উপরোক্ত সংক্ষেপ সম্পূর্ণতার গর্ব করে না, ওটা আংশিক, অত্যন্ত আংশিক। মূল গল্পটি স্বচ্ছ হলেও, পুস্তকখানি গ্রন্থিল, তাতে শাখা-প্রশাখার অভাব তো নেই-ই, বরং ডালপালার আধিক্যে পাঠক প্রায়ই দিশা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই বাহুল্যকে অবাত্তর বলে ভাবলে অন্যায় হবে। মণিশিল্পীর হাতে নিটোল হীরে যখন শতমুখী হয়ে ওঠে তখন তার দাম যেমন বাড়ে বই কমে না, রূপকারের স্পর্শে গল্পের অবস্থাও হয় তেমনি,—শত বাতায়ন দিয়ে সহস্র রশ্মি এসে গল্পের অন্তিম ঐক্যটিকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। উপন্যাসের এই অদ্বৈত সাধিত হয় অবৈকল্যের গুণে। এই অবৈকল্যের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের স্বলন-পতন-ক্রটির কোনো সংশ্রব নেই, এটা তার লেখার একটা সাধ্বিক গুণ যার আশীর্ব্বাদে অতিবড় আঘাতে গল্পও পাঠকের মনে সত্য ঘটনার পাশে আসন পায়। এই অসাধ্য সাধন যুক্তির পৃষ্ঠপোষণে সিদ্ধ হয় না, সম্ভব হয় আবেগের অনুকম্পনে। ফক্নার এই দুর্ভল সিদ্ধিতে অধিকারী।

আধুনিক বিজ্ঞাপনের দিনে অসাধারণ শব্দটার অপপ্রয়োগ সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু উইলিয়ম ফক্নারের জিপিনৈপুণ্য সম্বন্ধে ওইটাই একমাত্র বিশেষণ। এই আপাত-উচ্ছৃঙ্খল বইখানির সংযম ও মাত্রাজ্ঞান সত্যই বিস্ময়কর। লেখকের হাতে কলম কেবল শব্দগঠনের উপকরণ নয়, একেবারে অলঙ্কারভেদী বাণ। তার নিষ্কম্প নির্ণয়ে অন্তরের নিভৃততম অন্তঃপুর পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। এই গ্রন্থকারের প্রথম উপন্যাস “দি সোলজারস্ পে” পড়ে আর্নল্ড বেনেট বলেছিলেন, ফক্নার কথাসাহিত্যের ভারী সম্রাট। সে ভবিষ্যদ্বাণী “দি সাউণ্ড এণ্ড দি ফিউরি”তে হয়তো সফল হয়নি কিন্তু পুস্তকখানির প্রতি অঙ্করে যে-মহান প্রচেষ্টার পরিচয় আছে, তার সামনে সাহিত্যসেবীমাত্রকেই মাথা নোয়াতে হবে। মানুষের চৈতন্যস্রোতের চালনে যত উপন্যাস সম্প্রতি অকূলে ভেলা ভাসিয়েছে, তাদের মধ্যে এইখানির গতিই সব চেয়ে দ্বিধাবিরহিত। গতি নিশ্চয়তা অবশ্য গন্তব্যে পৌঁছানোর নামান্তর নয়। উপরন্তু গল্পটি বীভৎস, এত কুৎসিত গল্প গত কয়েক বছরের মধ্যে পড়েছি বলে মনে হয় না; এবং রচনারীতির ঐচ্ছিক দুঃসহত্যায় আখ্যানভাগের ভয়ঙ্করতা বেড়েছে বই কমে নি। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি

যে, উপন্যাসকে যাঁরা অবসরের সাধী ব'লে বিবেচনা করেন, কল্পনার বৈচিত্র্যময় রোমহর্ষণে জীবনের নিবির্ভাকার মানিকে অন্তত কিছুকণের জন্যে ভুলতে চান, চিন্তার জ্বালা জুড়তে ডুব দেন কথাসরিৎসাগরে, এ-বই তাঁদের হাতে না-পড়াই ভালো। কিন্তু যাঁরা বিশুদ্ধ চিন্তার ভক্ত, সাধনাকে যাঁরা সিদ্ধির চেয়ে বড় ক'রে দেখেন, উপাখ্যানের উর্গতস্তর অবলম্বন খোঁজেন জীবনসৌধের কোণে কানাচে, তাঁরা হয়তো মানব-মনের অন্ধকার মহলে এই কণিক প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে উইলিয়ম ফক্নারকে ধন্যবাদ জানাবেন।

“দি সাউথ এণ্ড দি ফিউরি” শেষ করার পরে “অল প্যাসন্স স্পেস্ট” বইখানি হাতে নেওয়া ঝঞ্ঝাবাতের উন্মত্ত কোলাহল থেকে নিবাত নিরুদ্ভূত দীপালোকে আসার মতো। শ্রীমতী সাকুভিল্ ওয়েষ্টের শেষ উপন্যাসখানিতে একটা প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞার সাড়া মেলে যেটা সত্যসত্যই সমস্ত চিন্তাবেগকে অতিক্রম ক'রে গেছে। শুনেছি লেখিকার বয়স খুব বেশি নয়, তবে তিনি এই বানপ্রস্থ-নির্ব্বাণের সন্ধান পেলে কোথা থেকে? বইখানি একটি অশীতিপর বৃদ্ধার মানসজীবনের ইতিহাস। লেডি গ্লেনের স্বামী কম্ব্বীর ছিলেন। তাঁর কারয়িত্রী প্রতিভার সম্মুখে কোনো দ্বার বন্ধ থাকেনি, ভারতের উপরাজত্ব থেকে সুরু ক'রে ইংলণ্ডের প্রধান সচিবের গদি পর্য্যন্ত সমস্ত পদই তিনি একদিন-না-একদিন অলঙ্কৃত করেছিলেন। ফলে তাঁর ব্যক্তিতা পূর্ণ পরিণতি পেলো বটে কিন্তু তাঁর সহধর্ম্মিণীর ব্যক্তিস্বরূপ সমাহিত হলো, কারণ লেডি গ্লেনের প্রতিভা ছিলো তাঁর স্বামীর বিপরীত, অর্থাৎ ভাবরিত্রী। বিবাহের পূর্বে লেডি গ্লেনের ইচ্ছা ছিলো চিত্রকর হবার; কিন্তু সে-আকাঙ্ক্ষা যখন ভাবী স্বামীর কানে পৌঁছলো, তখন গ্লেন উত্তর দিলেন যে, শিল্পনিপুণা মেয়েদেরই তিনি পছন্দ ক'রে থাকেন, এবং তাঁর স্ত্রী যদি তাঁদের পর্য্যটনকালে বিদেশের উধাও স্মৃতিগুলিকে চিত্রার্পিত ক'রে রাখতে পারেন তাহলে স্বামী খুশিই হবেন। এর জ্বাবে লেডি গ্লেন বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, তিনি যে-ধরনের ছবি আঁকতে চান, তা দিয়ে সচিত্র ডায়েরি লেখা অসম্ভব; কিন্তু গ্লেন হেসে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, অবিলম্বেই অন্য রকমের এত সৃষ্টির ভার তাঁর উপরে অর্পিত হবে, যে আসল কলাচর্চার প্রবৃত্তি বা অবকাশ তাঁর থাকবে না। এর পরে চূপ ক'রে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না এবং শীঘ্রই সন্তানসন্ততির অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় লেডি গ্লেনের শৈশবস্বপ্ন আর মাথা তোলার ফাঁক পেলো না। কিন্তু বিরতি আর বিলুপ্তি এক কথা নয়, কাজেই বিরাশী বছর বয়সে লেডি গ্লেন যখন বিধবা হলেন তখন তিনি

মৃত্যুর কবল থেকে চিত্রবিদ্যা শেখার উপযুক্ত সময় হিনিয়ে নিতে না-পারলেও, পূত্রপরিজ্ঞনের আগল থেকে আপনার পিঞ্জরিত স্মৃতিকে মুক্তি দিতে ইতস্তত করলেন না। ফলে তিনি খামখেয়ালী ব'লে প্রসিদ্ধি অর্জন করলেন বটে কিন্তু যে-কটি দুর্লভ বন্ধুর সন্ধান পেলেন তাদের কল্যাণে আজন্মের দুখের পিপাসা না-মিটলেও, ঘোল যে ভূরি পরিমাণে পাওয়া গেলো, তাতে আর সন্দেহ রইলো না।

এই কাহিনীটির পিছনে যদি কোনো মতামতের সূত্র থাকে, তবে তা শ্রীমতী ভারজিনিয়া উল্ফের “এ-রুম্ অফ ওয়ান্স ওন”-নামক প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্যের অনুরূপ। এইজন্যেই অনেক সমালোচক এই উপন্যাসটির উপরে শ্রীমতী উল্ফের প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু আমার মতে “অল্‌ প্যাসনস্‌ স্পেস্ট”-কে “এ-রুম্ অফ ওয়ান্স ওন” হতে ব্যুৎপন্ন বলা অন্যায়, কেননা শ্রীমতী উল্ফের উক্ত সন্দর্ভ স্বকীয়তার কোনো দাবি করতে পারে না। কয়েক বছর থেকে নারীজাগরণের যে-সাড়া শোনা যাচ্ছে, উভয় পুস্তকই সেই সাড়ার প্রতিধ্বনিতে মুখর। দুই লেখকই সমসাময়িক, সমজাতীয় এবং সমান ভাবে সচেতন; কাজেই এঁদের মনের একটা বাহ্য সাদৃশ্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভিতরের মিল প্রকাশ পায় অভিব্যক্তির রীতিতে, এখানে এঁদের দুজনের ধারণা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তা বোধ করি তর্কাতীত। শ্রীমতী উল্ফের মন অধিকরণনিষ্ঠ, কিন্তু শ্রীমতী স্যাক্‌ভিঙ্ক ওয়েস্ট অম্বয়ধর্মী, অর্থাৎ প্রথম মানসচারিণী কিন্তু দ্বিতীয়া মানুষপন্থী, একজন বিকলনে সিদ্ধহস্ত, অন্যজন সঙ্কলনে অদ্বিতীয়।

‘আসলে উদ্ভিখিত পুস্তক-দুখানির মধ্যে অল্পবিস্তর প্রচারবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো ঐক্য খুঁজে বার করা দুষ্কর। কিন্তু এই অতিরেকটুকু বাদ দিয়ে যদি কেবল আখ্যান বস্তুটিকে নেওয়া যায়, তাহলে বোধহয় “অল্‌ প্যাসনস্‌ স্পেস্টে”র পূর্বগামীকে আবিষ্কার করা সহজ নয়। আমি যে লেখিকার কথা ভাবছি, তিনি, যত দূর জানি, মাত্র একখানি বই লিখেছেন। কাজেই সেই অখ্যাতকুঙ্গশীল ঔপন্যাসিকটির সঙ্গে শ্রীমতী ওয়েস্টের মতো লরুকাঁপ্তি কবির তুলনা করতে সমালোচকেরা সম্ভবত দ্বিধা বোধ করেছেন। কিন্তু লর্না রিয়ার ‘সিক্স্‌ মিসেস্‌ গ্রীন’ যিনি পড়েছেন, তিনিই আমার কথায় সায় দেবেন। অবশ্য, শ্রীমতী ওয়েস্টের হাত আরো পাকা, তিনি ইতিপূর্বে ‘এডোয়ার্ডিয়ানস্’-নামক পুস্তকে তার ঔপন্যাসিক প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু তাই ব'লে প্রথম মিসেস্‌ গ্রীনের সঙ্গে লেডি স্নেনের রঙের সম্বন্ধ শিথিল নয়। স্নেন-পরিবারের অন্যান্য চরিত্রগুলিও গ্রীন-পরিবারের দ্বিতীয় পর্যায়ের

মতো অহংসকর্ষ বাগ্জীবন ও উপহাস্য। এবং স্লেডি স্ট্রেনের প্রাপৌত্রীর পাশে কনিষ্ঠ গ্রীনের তরুণী ভাৰ্য্যাকে বসালে, প্রথমার প্রতি কোনা অবিচার করা হয় না। অবশ্য লর্না রিয়ার উপন্যাসে “অল্‌ প্যান্সন্স স্পেণ্টে”র গভীর দার্শনিকতা নেই, কিন্তু উভয় লেখিকাই তরুণিমাতে একমাত্র আশা ভরসা ব’লে নির্দেশ করেছেন, এটা নিশ্চয়ই প্রশিধানযোগ্য।

কথা প্রসঙ্গে উপরে নৈব্যক্তিক ও বস্তুগত রচনার উল্লেখ করেছি। শ্রীমতী স্যাকভিল্ ওয়েস্ট্ ও উইলিয়ম্ ফক্নার, এঁরা দুজনেই কাহিনীর পাত্রপাত্রী হতে নির্দিষ্ট থাকার চেষ্টা করেছেন এবং মাত্রাভেদে কৃতকার্যও হয়েছেন। কিন্তু আসলে ওই দুটি ধ্রুপদী গুণের পূর্ণ পরিণতি দেখতে চাইলে, আজকের দিনে এক ডেভিড্ গার্নেট্ ছাড়া গতি নেই। অজ্ঞকালকার ইংরেজ কথকদের মধ্যে বোধহয় কেবল তিনিই তাঁর রচনার আভ্যন্তরিক স্বায়ত্তশাসনে এমন কোনো ছিন্ন রাখেন না, যার ভিতর দিয়ে বহির্বর্তী বুদ্ধির শনি সে-অন্তর্লোকে প্রবিষ্ট হতে পারে, অর্থাৎ একা তাঁর গল্পই গল্প, গল্পের ছন্দবেশে আত্মজীবনী অথবা সামাজিক নিবন্ধ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই রকমের পবিত্রতা বর্তমান জগতে এতই বিরল যে, অধিকাংশ সমালোচকই গার্নেট্‌কে তাঁর প্রাপ্যটুকু দিতেও কুণ্ঠিত। তাঁদের মতে গার্নেট্‌র প্রথম দুটি গল্প “স্লেডি ইনটু ফক্ন্স” ও “দি ম্যান্ ইন্ দি জু”-তে যে উৎকর্ষের সূচনা ছিলো এখনো পর্য্যন্ত তা সিদ্ধিতে পরিণত হয়নি। এঁদের বিবেচনায় “এ সেলার্স্ রিটার্ণ্”, “গো শি মাষ্ট্”, “নো লাভ্” ইত্যাদি পুস্তকগুলির রচনারীতি নিখুঁত ও অনাড়ম্বর হলেও, ও-গুলির আখ্যানভাগ কেমন যেন কুয়াসাচ্ছন্ন, অর্থাৎ তাঁর লেখার চুনকামকরা সাদা দেওয়ালগুলির পিছনে কি আছে, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দুষ্কর। যদি বলা যায় সেজ্ঞানের মতো ডেভিড্ গার্নেট্‌ও সাদা দেওয়ালের অবিকল ছবি আঁকতে পারলেই তুষ্ট, দেওয়ালের পিছনের রূপকথার রাজকন্যার প্রতি তাঁর নজর নেই, তাহলে এঁরা লেখকের প্রথম কাহিনী দুটির দোহাই দিয়ে ব’লে থাকেন গার্নেট্‌ রূপক রচয়িতা, অতএব তাঁর শুক্তির ভিতরে যুক্তির মুক্তা থাকতে বাধ্য।

অবশ্য মানতেই হবে যে, কল্পনাপ্রধান সাহিত্যমাঝেই এক হিসেবে রূপক, অর্থাৎ কল্পনার আদূতে পারিপার্শ্বিক বস্তুই রূপান্তরিত হয়ে কল্পাতে পরিণত হয়। এদিক দিয়ে দেখলে ডিফোর “রবিন্সন্ জুসো” এবং গার্নেট্‌র “দি গ্রাস্‌হপার্স্ কাম্” এ-দুই গল্পই রূপক। কিন্তু আমার মতে আসল রূপকের প্রবর্তনা আর শিশুমনকে চিনির পাকে নিম্ন ষাওয়ানোর ইচ্ছা, ও দুইই এক পর্য্যায়ের জিনিষ। “রবিন্সন্

ক্রসো” অথবা “দি গ্রাস্‌হপার্স্‌ কাম্” ও-রকমের লোকশিক্ষার কোনো তাগিদ নিয়ে জন্মায়নি, এ-কথা আশা করি রসিকমাত্রেই স্বীকার করবেন। পক্ষপাত-ব্যতিরেকে শিক্ষক হওয়া অসম্ভব, এবং গার্ণেটের আর যা-ই দোষ থাকুক, তিনি পক্ষপাতবিবর্জিত, তা-ও বোধহয় সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু এ-গুণটি আজকের দিনে এতই দুর্লভ যে, ওটিকে আমরা বিনাবাক্যে গ্রহণ করতে পারি না। গার্ণেটের স্বচ্ছ উপাখ্যানগুলি আড়াল থেকে একটা গুরুগম্ভীর লোকশিক্ষার প্রবৃত্তিকে টেনে বার করার ব্যর্থ চেষ্টার ব্যাখ্যা বোধহয় এইখানে।

গার্ণেটের রচনা সরল, স্বল্পাঙ্গ ও অহংজ্ঞানশূন্য বলে তাতে ওজনের অভাব আছে, এমন কথা ভাবলে খুবই অন্যায় হবে। “দি গ্রাস্‌হপার্স্‌ কাম্” বইখানির গল্পটি অবশ্য অত্যন্ত লঘু। একজন স্বল্পমতি নারী স্থির করলেন যে, তিনি বিমানপথে বিনাবিরামে ইংলণ্ড থেকে হক্‌স্‌ পর্যন্ত উড়ে যাবেন। এই উদ্দেশ্যে একটি একচক্ষু পাইলট নিযুক্ত হলো এবং এই পাইলটের তত্ত্বাবধানে শুভদিনে তিনি ও তাঁর প্রণয়ী বিমানবিহারে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথম রাত্রি বেশ নিরাপদে কাটলো, কিন্তু পরের দিন প্রত্যুষে এনজিনের দোষে এয়ারোপ্লেনখানি ধরাশায়ী হলো। পাইলট ওস্তাদ ছিলো, তাই যাত্রী দুটির গায়ে আঁচড়টি লাগলো না। কিন্তু তার নিজের পা গেলো ভেঙে। ভাঙারে খাদ্যাভাব, নিকটে লোকের বসতি নেই, চারপাশে চৈনিক মকুর উবরতা। কাজেই রমণীটি তাঁর প্রেমিকের হাত ধরে লোকালয়ের সন্ধানে চলে গেলেন; বিমানপোতে অল্পজলের যেটুকু ব্যবস্থা ছিলো, তা-ও তাঁরা ছেড়ে যেতে পারলেন না। পাইলট রইলো একা, বিনাখাদ্যে, আহত পায়ে যন্ত্রণায় মুচ্ছাপন্ন। বলাই বাহুল্য, সে-স্ত্রীপুরুষ দুটির আর কোনো সন্ধানই মিললো না, এবং পাইলটটি অনশনে কঠাগতপ্রাণ হবার পরে, একদল পঙ্গপালের হঠাৎ সমাগমে, জন্ দি ব্যাপটিষ্টের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে কোনোট্রমে আবার শক্তি ফিরে পেলো। এর অল্প পরেই একটি মাসলীয় এয়ারোপ্লেনের সাহায্যে সে আবার মনুষ্যসমাজে ফিরতে পারলো।

এ-গল্প নিশ্চয়ই খুব হালকা। সেই জন্যেই বিস্মিত মন জিজ্ঞাসা করে, এর উপরে এত অভিজ্ঞতার ভর সইলো কেমন করে? কাহিনীর আয়তন এক শ পাতা, আয়ু সপ্তাহ মাত্র, পাত্রপাত্রী তিনটি, অথচ বইখানি শেষ করবার পরে শুধু এই তিনটি ব্যক্তি নয়, জগতের অনেক জিনিসের সম্বন্ধেই পাঠকের অজ্ঞানাজ্ঞকার পাংলা হয়ে আসে। আর এ পরিচয় কেবল মৌখিক নয়; গার্ণেটের ভাষা শুধু বস্তুমাত্রাকে জড়িয়ে

থাকে বটে, কিন্তু সে-অবেষ্টন এতই নিবিড় যে তার সূত্রে প্রাণের নিগূঢ়তম স্পন্দন সুদূর সঞ্চারিত হয়। একেই বলে অনুকম্পন। এ-অনুকম্পন স্বপ্রধান লেখকের মধ্যে কখনো দেখা যায় না, একে পাওয়া যায় আত্মবিসম্বন্ধনের ফলে। দর্শক ও দৃশ্যের মধ্যে যখন সকল ব্যবধান অস্তিত্বহীন হয়, প্রবৃত্তি আর প্রবর্তকের মধ্যে তিলার্ধ স্থান থাকে না, তখনই এই অস্তিত্বহীনতার সন্ধান পাওয়া যায়, নৈমিত্তিকের ঔরসে তখনই হয় নিত্যের জন্ম। ‘দি গ্রাস্‌হপার্স্ কাম্-এর মতো ক্ষীণাঙ্গ পুস্তক সম্বন্ধে এত বড় কথা না-খাটলেও, তার প্রণেতার মহৎ মনের সম্বন্ধে এ-প্রশংসা নিশ্চয়ই অতিকণন নয়। এ-বইখানি অমৃতের অধিকারী না-হতে পারে, কিন্তু যিনি এটির পরিকল্পনা করেছেন তাঁর ভাণ্ডারে সে-সনাতন ঐশ্বর্য্য লুকানো আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

Henri Fauconnier—Malaisie (Stock), Andre Malraux—La Voie Royal (Grasset), Maurice Bedel—Philippine (N. R. F), Andre Maurois—Le Peceur d' Arne (N. R. F.) Roger Martin du Gard—Confidence Africaine (Sans Pareil), Marc Chadourne—Cecile de la Folie (Plon). Georges Limbour—L' Illustre Cheval Blanc (N.F.R.), Andre Gide—Oedipe (La Pleiade).

এবারকার গঁকুর-পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, “মালেসি”-রচয়িতা আঁরি ফোকো-নিয়েকে। উপন্যাসখানা যখন “নুভেল রেভু ফ্রাঁসেস”-পত্রে ধারাবাহিক ভাবে পড়েছিলুম, তখন খুবই ভালো সেগেছিলো বটে, কিন্তু মনে হয়নি সেখানার অদৃষ্টে এই সম্মান আছে। যুদ্ধের পর থেকে গঁকুর-পরিষদ এতই সাম্প্রতবিদ হয়ে উঠেছে যে, এই আড়ম্বরশূন্য, স্বচ্ছ, সংযত উপখ্যানটির সে-সুধীসঙ্ঘের চিত্তাকর্ষণ করেছে শুনে প্রথমটা বিস্মিত হয়েছিলুম। ভয় হয়েছিলো লেখাটা বুঝি ঠিক ক’রে মনে নেই; আলস্য ক’রে পড়েছিলুম ব’লেই হয়তো এই সদ্যোক্ষিত প্রতিভার চাকচিক্য চোখে পড়েনি। তাই বইখানাকে আবার নেড়ে চেড়ে দেখলুম; কিন্তু এই নবীন লেখনীর মুখে অভ্যস্ত বিষটুকু কোনো মতেই খুঁজে পেলাম না; সূর্যের কলঙ্ক আবিষ্কারে এই তরুণ লেখকের চমৎকার নৈপুণ্য এক মুহূর্তের জন্যেও কোথাও থেকে আভাস দিলে না; এমন-কি হাল ফেশানের বিশ্বব্যাপী বিরতির সাড়া পাওয়া সুদূর শব্দ হলো। শুধু তাঁর ছলাকলাহীন সরলতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অনুকম্পা, বর্ণনার বিনম্র অনুচ্চতা অবাক ক’রে দিলে। এর থেকে যদি কেউ ভাবেন যে, পুস্তকখানার পটভূমিকা সাবেকি আমলের স্ফৈর্যে মৈর্যে ভরা, তাহলে তিনি হতাশ হবেন। ফোকোনিয়ের মন অত্যন্ত নতুন, এতই নতুন যে, দশ বৎসর আগে পশ্চিমে তার নামগন্ধ ছিলো না। ইনি যে-যুগের লোক, সে-যুগে উত্তর-সামরিক ধ্বংসোন্মাদনার স্থান নেই; সে-যুগে প্রলয়ে পরাস্তমুখ না-হলেও, বিনাশের চেয়ে সৃষ্টিকেই শ্রেয় ভাবে। কিন্তু সে জানে এই সৃজনব্যাপারে পারিপার্শ্বিক জগৎ তার সহায় হবে না। তার সমাজ, তার পরিবার, তার উত্তরাধিকার যুরোপীয় যুদ্ধের ঘৃণি হাওয়ায় শুঁড়ো হয়ে উড়ে গেছে; চার দিকে যে-ধ্বংসের ধূলি পড়ে আছে, তার উপরে কোনো রকমের ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপনা করতে যাওয়া বাতুলতা। তাই তার মন বেরিয়েছে ভ্রমাসন-নির্মাণের জমি খুঁজতে। কিন্তু এমেরিকা, দক্ষিণসাগরের দীপাবলী, চীন, শ্যামরাজ্য মালয়-উপদ্বীপ, আরব, আফ্রিকা, রুশদেশ, কোনোটিই তার মনঃপুত হচ্ছে না। অবশেষে

হয়তো তাকে স্বদেশের সর্বনাশের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে, কিন্তু ইতিমধ্যে এই নিরুদ্দিষ্ট চক্রচরণ একেবারে ব্যর্থ নাও হতে পারে; অজ্ঞানার অভিসারই হয়তো জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

একটা আখ্যায়িকার এই রকমের ব্যাখ্যাতে, জ্ঞানি, অনেকে অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু “মালেসি” উপন্যাস শুধু বাহ্যরূপে। মালয়ের আদিম বনের সাংঘাতিক সংঘাতে একজন শীঘ্রচেতন পাশ্চাত্য যাযাবরের মর্মে মর্মে যে আশা-নিরাশার সুর বেজেছিলো, আসলে এটা হচ্ছে তারি প্রত্যক্ষ বিবরণ। কিন্তু তা বলে কেউ যেন না-ধরে নেন যে, “মালেসি” বিংশ-শতাব্দীর প্রথম বর্গের সমস্যামূলক গল্প-নাটকের বংশধর। একটা বিশেষ মনোভাব প্রকাশ করা এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও, যে-পাত্রপাত্রীর মারফতে এই মনোভাবের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তারা, যদিও সংখ্যায় অতি অল্প, তবু জীবন্ত, অতিশয় জীবন্ত। তবে এদের জীবনের ওজন বাস্তব জীবনের মতোই হালকা, ঘটনাবলী নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাবলীর মতোই অবিচিত্র। সারা বইখানায় একটিমাত্র অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হলো নায়ক রোল্লের দেশীয় চাকর স্মাইলের ভূতে পাওয়ার কাহিনীটা,—এ ঘটনাও ভারতীয় পাঠকের কাছে অত্যশ্চর্য্য ঠেকবে না। তবে ছায়গাটা বিশেষ করে দ্রষ্টব্য। অলৌকিকের বর্ণনা করা সহজ নয়; একটা অনুপযোগী শব্দের আওতাজে, একটা অতিরঞ্জিত লাইনের ফলে একশ’ পাতার অক্লান্ত চেষ্টা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া সাহিত্যে খুব বিরল নয়। কিন্তু এই কঠোর পরীক্ষায় ফোকোনিয়ি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন, সম্ভবত তাঁর অকৃত্রিম লেখনীর গুণে। তাঁর অসাধারণ তুলির টানে ব্যক্ত অব্যক্ত দুইই সমান পরিস্ফুট, গাছপালা-জন্তুজানোয়ারের পরম সম্ভাটুকু নরনারীর পরমাখ্যার চেয়ে কম স্পষ্ট নয়, বর্বরতার ছবি সভ্যতার চিত্রের মতই সংযত ও সুবোধ্য। অল্প কথায় এই কাহিনীর ধারা বিরাট নদীর মতো মন্দ, মহর, কৌটিল্যহীন; তাতে নির্ঝরের আঘাত দীপ্তি বা কলকোলাহল নেই, আছে শুধু গভীরতা, অবাধ নিরপেক্ষ গভীরতা।

উপন্যাসটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে প্রণয়-সম্বন্ধে চর্চিত, চর্চণ নেই। পাত্রী দুটিরই ভূমিকা গৌণ তারা কথা কয় যেন ভাববাড়্যে। প্রথমটিকে আনা হয়েছে কেবল দেশটার স্বকীয় রঙ ভালো করে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়টির প্রয়োজনীয়তা হয়তো আর একটু বেশি, কিন্তু পুস্তকখনার শোকাবহ পরিণামের জন্যে অলঙ্ঘ্য বনদেবতার দায়িত্ব তার চেয়ে অধিক কিনা, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া শক্ত। বইখানার সম্বন্ধে বস্তুত যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহলে সে হচ্ছে পদে পদে এই অলৌকিকের অবতারণা। কিন্তু মধ্যবৃন্তের দুর্দান্ত অরণ্যে প্রবেশ করার

সুযোগ যাঁর ঘটেছে, তিনিই মানবেন যে, লেখকের উপরে আধিভৌতিকের আধিপত্য অতিরিক্ত হলেও; অমাজ্জনীয় নয়।

“মালোসি”-র নায়ক রোজেঁ মালয়ে-উপদ্বীপে বানপ্রস্থে গিয়েছিলো আধুনিক কুরুক্ষেত্রের শোকে; সভ্যতার লঙ্কাকাণ্ড তার বৃকে নিষ্ঠুরভাবে বেজেছিলো ব’সেই, সে যবনিকা-পতনের আগে রঙ্গালয় ছেড়ে পালিয়েছিলো। কিন্তু “লা ভোওয়া রোইয়াল”-এর নায়ক পেরকঁ অন্য ধাতুতে গঠিত। শ্যামরাজ্যের গহন বনে সে প্রবেশ করেছিলো গর্বিভা সভ্যতাকে মারবার অস্ত্রসংগ্রহকল্পে। মালয়ে এসে রোজেঁ তপোবনের শান্তি খুঁজে পেলে, এবং অবশেষে যখন তার দারুণ দুর্দিন এলো, তখন হয়তো সেই বনই তাকে মায়ের মতো নির্বিঘ্ন অঙ্কে তুলে নিলে। কিন্তু পেরকঁর ধ্বংসে বন আহত পত্তর মতো সংহার মুর্ষি ধ’রে, সিঁদ্রির সমীপ লগ্নে তাকে গ্রাস ক’রে ফেল্লে। যোকোনিয়ে আর মালরোর চিত্তবৃত্তির মধ্যে আকাশ-পাতালের তফাৎ; তবু সকল চরমপন্থীর মতো ঐদের দুজনের একটা ঐক্যও দেখা যায়। যোকোনিয়ের সাধনা হচ্ছে বর্ষরতার সাহায্যে নির্বীৰ্য্য সভ্যতার শক্তিবৃদ্ধি করা; মালরোর চেষ্টা বর্ষরতার পৃষ্ঠপোষণে মুমূর্ষু সভ্যতাকে জগৎ থেকে অব্যাহতি দেওয়া। উভয়েরই যাত্রাস্থল এক,— জীবনকে স্বাস্থ্যবান ও সবল ক’রে তোলা; এবং দুজনেই স্থির করেছেন যে সভ্যতার বর্তমান অবস্থা অসহ্য; বর্ষরতাই যে এ-রোগের একমাত্র প্রতিকার এ-সম্বন্ধে দুজনের মতবৈধ নেই। তবে এক পক্ষ বলেন, কানা মামার চেয়ে মামা না-ধাকাই ভালো; অন্য পক্ষের বিশ্বাস, মাছুসের অন্ধতা স্বপ্নলব্ধ ঔষধের কল্যাণে সারলেও বা সারতে পারে। এ-দুদলের ঝগড়ার মধ্যস্থ হওয়া শক্ত, কারণ কারোরি যুক্তির অভাব নেই। তবে আমার নিজের পক্ষপাত মালরোর দিকে। আজকে আমরা যেখানে পৌঁছেছি সেখানে জন্মই সহজ, মৃত্যু অত্যন্ত কঠিন। কাছেই, বর্ষণের পরে ব্যাঙের ছাতার মতো, সৃষ্টির বীভৎস উর্বরতার যখন নিরঙ্কুর মাটিকেও বাদ দিতে রাজি না, তখন স্বাতন্ত্র্যবিলাসী মায়েই ধ্বংসের কথা ভাবতে বাধ্য। বাঁচতে হলে এই অনাচ্ছত্তদেরও স্থান চাই, ফাঁকা চাই, নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ চাই। আধুনিক জগতের সঙ্কীর্ণতা ক্রমশ অসহ্য হ’য়ে আসছে।

কিন্তু কথাসাহিত্যের দার্শনিক টীকা টিপ্পনী সব দিক দিয়েই অসঙ্গত। উপরন্তু মালরো নিজেকে নিছক ঔপন্যাসিক ব’লে সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন। এই হিসেবে তাঁর বইখানা যোকোনিয়ের বইটার মতো তৃপ্তিদায়ক নয়। “লা ভোওয়া রোইয়াল”-এর আখ্যানবস্তু “মালোসি”-র তুলনায় অনেক বেশী ঔৎসুক্যপূর্ণ; কিন্তু ঘটনাবৈচিত্র্যই এর দোষ দাঁড়িয়েছে। গল্পের ধারা যেন অনবিচ্ছিন্ন নয়। গাঁথুনিতে যে-ফাঁক র’য়ে

গেছে, পাঠকের কল্পনা তার ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায়। কথাপ্রসঙ্গে পেরকীর জীবনের অনেকখানি অবাস্তব অংশ ফুটে উঠেছে, কিন্তু তবু আমাদের কৌতূহল মিটতে চায় না; মন শুধায় তার অব্যক্ত বিদ্রোহের কারণ কি? হঠাৎ গারবোকে টেনে আনার সার্বকর্তাই বা কোথায়? এর পাশে রোল্টের বসালেই আমার কথটা স্পষ্ট হবে। রোল্টের অতীত ইতিবৃত্ত আমরা জানি না বললেও চলে, তবু তার সম্বন্ধে আমাদের কোনো জিজ্ঞাসাই অতৃপ্ত থাকে না। কিন্তু পেরকীর নাড়ি-নক্ষত্র জানার পরে রহস্য যেন ছাটিলতর হয়ে ওঠে। তবে এমন হতে পারে যে গ্রন্থকার ঠিক এই পিপাসাটুকু পাঠকের মনে জাগিয়ে রাখতে চেয়েছেন। “লা ভোওয়া, রোইয়াল” একটা বহুশব্দার্থী আখ্যায়িকার প্রথম ভাগ; অন্য সর্গগুলি এখনো অপকাশিত, সম্ভবত অলিখিত। কাজেই এখানার যথার্থ বিচার করার সময় এখনো না-এসে থাকতে পারে। এখানে যে-সূত্রগুলোয় গ্রন্থী পড়লো না, হয়তো অন্যত্র সেগুলো বিনুনি পাকিয়ে উঠবে। তবে পেরকী-চরিত্র বোধহয় হেয়ালী হয়েই থেকে গেলো, কারণ “লা ভোওয়া রইয়ালে”—এর সমাপ্তি পেরকীর মৃত্যুতে।

মুন্সিল এই যে মালরো নাম-করা লেখক; “লে কঁকেরা” বেরনোর পরে তাঁর কাছ থেকে আমরা এত প্রত্যাশা করি যে, পান থেকে চুন খসলেই মনে হয় ঠকছি। আসলে তাঁর অসামান্য শক্তির হ্রাস হয়নি; ক্রোদের পিতামহের চিত্র “লে কঁকেরা”—র কোনো চরিত্রের কাছেই হার মানেনি, এবং ক্রোদের মা যে-অল্প কটি কথায় বর্ণিত হয়েছে, তার জোড়া খুঁজে বার করা দুষ্কর। পেরকীও রহস্যময় মাত্র, কিন্তু কলের পুতুল নয়; অখ্যাত জনপদে চিকিৎসাবিহনে মৃত্যুমুখ পেরকীর রমনী-সন্তোগের ছবিতে যে-প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় পাই, তার কণামাত্র থাকলে অনেক উপন্যাসই দাঁড়িয়ে যেতো। এই স্থানটা পড়বার পরে, পেরকীর মহত্ত্ব-সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না; মনে হয় আমরা বুঝি কোনো অসুরের অনন্ত প্রমাণের সাক্ষী। এই দৃশ্যটা ছাড়া “লা ভোওয়া রোইয়াল”—এর অন্য কোথাও নারীর সংস্পর্শ নেই, যদিও তাদের নাম এখানে ওখানে, নানা জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। “মালোসি”র সঙ্গে “লা ভোওয়া রোইয়াল”—এর এইখানে আর একটি সাদৃশ্য; আরো একটি হচ্ছে পাত্রপাত্রীর স্বল্পতায়; এই শুণে মালরো ফোকোনিয়ের উপরেও টেকা দিয়েছেন; এক রকম বসতে গেলে পেরকী আর ক্রোদ এই দুটি মাত্র চরিত্র নিয়েই সমস্ত বইখানা বিরচিত।

উপরে বলেছি যে মালরো সম্প্রতি নিজেকে নিখাদ ঔপন্যাসিক বলে আহ্বির করেছেন। এই আত্মপরিচয় বেরিয়েছে এপ্রিল মাসের “নুভেল রেডু

ফ্রীসেস"-পত্রে, ট্রট্‌স্কির লেখা "লে কঁকেরা"-র সমালোচনার জবাবে। উক্ত সমালোচনায় ওই বইখানির গুণকীর্তন করার পরে ট্রট্‌স্কি দেখিয়েছেন, ইতিহাস হিসেবে "লে কঁকেরা" কেন অশ্রদ্ধেয়। প্রবন্ধটা অবশ্য-পাঠ্য; তাতে ট্রট্‌স্কির বিখ্যাত ঝগড়াটে স্বভাব, বিনা প্রমাণে সিদ্ধান্ত করার অভ্যাস, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা দোষ থাকার সত্ত্বেও মোটের উপরে লেখাটা খুবই সারগর্ভ। তাঁর মূল কথাটার সমর্থন না করে থাকা দুঃসাধ্য। তিনি বলেছেন, বিপ্লব নিয়ে খেলা চলে না; যে-বিপ্লোহ সময়গতিকে আপনার আদর্শকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না, তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। মালরো এর বেশ চোখা চোখা জবাব দিয়েছেন, কিন্তু আমার মনে হয় পাঠকের দরদ ট্রট্‌স্কির দিকেই ঝুকবে। তবে একটা কথা ভুললে চলবে না; স্থান-কাল-পাত্রের ষড়যন্ত্রে স্বয়ং লেনিন সুদ্ধ সমস্টিবাদের মূলসূত্রকে অন্তত আংশিক ভাবে উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পূর্বোক্ত অসাধারণ বই দুখানার সঙ্গে "ফিলিপিন"-এর মতো মামুলি উপন্যাসের নাম নিতে সঙ্কোচ লাগছে। তবুও উল্লেখ করছি দুটো কারণে। প্রথমত, এই তিনখানা ছাড়া আর কোনো আধুনিক ফরাসী উপন্যাস সম্প্রতি পড়িনি; দ্বিতীয়ত "ফিলিপিন"-এর জ্যেষ্ঠ "জেরোম, উ সোওয়াসাঁং দেখে লাতিতুদ নর" বছর চারেক আগে "মালোসি"-র মতোই সম্মানিত হয়েছিলো। মনে আছে সেবারকার গক্কুর-পারিতোষিকের উপযাচকদলে যোগ্য ব্যক্তির অভাব ঘটেনি। কিন্তু "সেসম্ দ লা রুৎ"-এর রচয়িতা অঁদ্রে শাঁস, "ভাস্কো"-লেখক মার্ক্‌ শাদুর্ণ, "মেরল্যা"-প্রণেতা জঁ প্রেভো ইত্যাদিকে ডিঙিয়ে মোরিস্ বেদেল্ যখন "জেরোম"-এর জোরে পুরস্কৃত হসেন, তখন দু-এক জন সমালোচক অল্পবিস্তর বিস্ময় প্রকাশ করলেও, হাততালিতে কম পড়েনি। সে-বছরের অন্যান্য উপন্যাসের সমকক্ষ না-হলেও "জেরোম" বইখানা সুখপাঠ্য, অত্যন্ত আধুনিক এবং শ্লেষোক্তির সম্মিপাতে সজ্জার মতো কণ্টকিত। সে-গল্পের নায়কও উদ্বাস্ত, তারও সম্মান বাসাবাঁধার উপযুক্ত শাখা। সেই অশেষণের তাড়নায় বেদেল্ সেবারে স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় উপনীত হয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার অর্ধসভ্য তরুণীদের উপভোগ্য স্বচ্ছাচারের দাপটে বেচারী জেরোম স্বদেশের সুকোমল অঙ্কে আশ্রয় নিতে ইতস্তত করেনি। জেরোমের অনুজ্ঞা ফিলিপিনেরও সেই দশা, তবে এবারে দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে, ফিলিপিনের পটভূমিকা মুসোলিনির পদানত রোম। কিন্তু তার সমস্তই যথাপূর্বম্ : নিৰ্ব্বন্ধিতায় লাটিনেরাও নর্ডিকদের সমতুল্য; ইতালীর বুড়োরা মেরুপ্রান্তের বুড়িদের মতোই বাকসর্ব্বশ; এখানকার প্রেমার্শ যুবকেরা, সেখানকার প্রেমার্শ যুবতীদের চেয়ে কম কামপরায়ণ নয়। অল্প কথায় ফরাসীরা

সভ্যতায় অধিতীয়, সাধুতায় সর্বশ্রেষ্ঠ, হৃদয়ব্যাপারে, একদিকে বর্বর পাশবিকতা এবং অন্যদিকে প্রস্তরিত পবিত্রতা, এই উভয়-সঙ্কটের মাঝখান দিয়ে অক্লিষ্ট নৌচালনায় যুলিসিসকেও হার মানিয়ে দেয়। বইখানার প্রত্যেক শব্দটি আত্মপ্রসাদের চর্কিতে পরাকাষ্ঠা। এখানাকে দশ বছর আগে পড়লে হয়তো উপাদেয় লাগতো, আজ কেবল হাই ওঠে। প্রথমটা মনে হয়েছিলো এর ঠাট্টা মস্কারা স্বর্ণীয় জেরোম, কে, জেরোমের রসিক মস্তিষ্কে আসন পাবার যোগ্য, কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে অতটা বঙ্গা অন্যায হবে; ফিলিপিন আপনার অগ্রজ জেরোমের কালহাস্যের প্রতিধ্বনি মাত্র, তাই সে নিত্প্রাণ। হতে পারে একটু বাড়াবাড়ি করছি, সমালোচকদের প্রশংসা দেখেই বইখানা পড়তে বসেছিলুম, কিন্তু বেদেলের শেষ-উপন্যাস “মসিনফ্, এঁদ্র্ এর লোওয়ার”-এর প্রাণময় নবীনতায় গত বৎসর আমার রোগশয্যার বিরক্তি এমনই লাঘব হয়েছিলো যে, আজকে ফিলিপিনের রোমহুনে বক্ষনাবোধ ছেগে ওঠা অনিবার্য।

মার্ক শাদুরণ-এর “সিসিল্ দা লা ফোলি” বইখানা পড়ার অবকাশ এখনো ক’রে উঠতে পারিনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না। উপন্যাসটির প্রশংসা সর্বত্রই দেখতে পাই, উপরন্তু যে হাত দিয়ে “ভাস্কো” বেরিয়েছে, সে হাতের লেখা নগণ্য হওয়া অসম্ভব।

আঁদ্রে মেরোওয়ার “ল প্রেসার দাম” পুস্তকখানি আকারে উপন্যাসের সমান হলেও, তাকেও কথাসাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত করাই বোধ হয় সম্ভব। সে যাই হোক, এখানা পড়ার পরে মোরোওয়ার শতমুখী প্রতিভাকে অভিবাদন না-ক’রে থাকা যায় না। এই মোরোওয়া আর “এরিয়েল” ও “ডিসরেলি”-র সৃষ্টি যে একই লোক, তা বিশ্বাস করা কঠিন। এমন কি ভাষা এবং রচনারীতি সুদূর আলাদা। গল্পটি পো-হুউসমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তবে রোমহর্ষণে মোরোওয়ার কলম দুটি লেখনীর অনেক নীচে। তা হলেও কাহিনীটা অপ্রত্যাশিত এবং উপসংহারটি চমকপ্রদ। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও এর থেকে পরিচয় পাওয়া যায় শুধু মোরোওয়া-সাহেবের লিপিতাত্ত্ব্যের, তাঁর মনপ্রাণের ঠিকানা মেলে না।

এর পাশে রোজে মার্ত্ত দু গার-এর “কফিগাস্ আফ্রিকেন্” গল্পটা বসালেই সাহিত্যে অকৃত্রিমতা কাকে বলে তার যথার্থ স্বর পাওয়া যাবে। তবে কৃতিবাগীশদের সাবধান ক’রে দিচ্ছি, এই অগম্যগামী প্রেমকাহিনীটি নীতিপরায়ণ নয়। এমন জীবন্ত লেখা খুব কমই পড়েছি; পড়েছি বলেই মনে হয় না, বোধ হয় ছবি দেখছি। রচনা পাকা হাতের, প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক বাক্য ওজ্জন ক’রে বসানো, তার একটি নড়চড় হলে গল্পটির স্বরূপ বদলে যাবে বলে ভয় হয়। অথচ কোথাও অতিরঞ্জনের লেশ মাত্র নেই,

এই অসামান্য ছবির একটি রেখাও অবাস্তব নয়।

কাব্যজগত জরজর ল্যাবুরের “লিল্যুসত্র শভাল্ ব্লা” উল্লেখযোগ্য। এই বইখানাকে কাব্য বলছি, সমালোচকদের খাতিরে। তাঁরা যদি চোখে আঙুল দিয়ে কাহিনী-তিনটের প্রচ্ছন্ন কাব্যগীটুকু দেখিয়ে না-দিতেন, তাহলে বইখানাকে কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতুম। এখনো, তাঁদের অনুদেশ স্বেচ্ছা, নিঃসন্দেহ হতে পারিনি; তবে এটা মানছি, রচনাগুলি গদ্যপদ্যের সীমাসন্ধিতে অবস্থিত,—কোনোটোর ঝাঁক গদ্যের দিকে বেশি, কোনোটোর বা পদ্যের দিকে। এটাও স্বীকার্য যে, এগুলো যদি সংস্কৃত ভাষায় লেখা হতো, তাহলে আলঙ্কারিক বইখানাকে কাব্য আখ্যাই দিতেন। কিন্তু তখন কাব্য বললে বোঝাতো, রসাত্মক লেখা মাত্র, সে-নামের সঙ্গে রচনা-পদ্ধতির বিশেষ কোনো সংশ্রব ছিলো না। আজ আমরা যে-সুখার তাড়নায় কাব্যের দ্বারস্থ হই, সেটা কেবল পেটের ক্ষুধা নয়, চোখেরও। অর্থাৎ আজকে আমরা শুধু রসেই তৃপ্ত থাকতে পারি না, রূপকেও চেয়ে বসি। এর থেকে কেউ যেন না ভাবেন যে আমার মতে গদ্য রূপহীন। তা মোটেই নয়, তবে আমার মনে হয় কাব্যের রূপ আর গদ্যের রূপ ভিন্ন প্রকৃতির, এবং এই বিভিন্নতা সংরক্ষিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করা উচিত, আমাদের সাহিত্য স্বল্পজ্ঞ ব’লেই হয়তো আমি এই বহুলাঙ্গতার পক্ষপাতী; যেদেশে বাহুল্য আজ জটিলতায় গিয়ে ঠেকেছে, সেখানে কাব্যের মৌল সম্ভার পুনরুদ্ধারণই স্বাভাবিক। দিন কতক আগে ফরাসী বিদ্বেরা আবে ব্রেমের প্রতিধ্বনি করে বলতে শুরু করেছিলেন, কবিতার মানে না থাকলেও চলে, কিন্তু তার অক্ষিসন্ধিতে ভাবাত্ত, ধ্বনিবিজ্ঞান, মনোবিকলন, মন্ত্রসিদ্ধি, ধর্মপ্রাণতা ইত্যাদি অত্যন্ত দুর্লভ বিশেষজ্ঞানের চমক থাকা চাই। ল্যাবুরের আকস্মিক প্রতিপত্তি হয়তো সেই হঠাৎকারি পাল্টা জবাব।

“লিল্যুসত্র শভাল্ ব্লা”-র সঙ্গে আমরা ঝগড়া শুধু পরিভাষা নিয়ে। গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, এই নবীন লেখনীর মুখে প্রতিভার ইসারা আছে। ল্যাবুরের জাদুতে পশুপক্ষী মানুষের চেয়ে বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে, জলজন্তুর কানাকানি প্রতিগম্য হয়ে আসে, শূন্য যেন মুক্তিমান হয়ে দেখা দেয়। এই কাহিনীগুলোর মুখ্য ভূমিকায় মানুষ নেই, নায়কের স্থান অধিকার করে রেখেছে দুটি ঘোড়া আর একটি পাখী। কিন্তু এই জন্তুগুলির সৃষ্টি ব্যাপারে অতিমর্জের হাত খুবই স্পষ্ট। প্রথম গল্পের প্রধান পাত্র একটি বুড়ো ঘোড়া; তাঁর সারা জীবনটা কেটেছিলো এক খনির অন্ধকারে, কিন্তু একটি সারকাসদলের কল্যাণে ছাড়া পেয়ে সে যখন নিশ্চিন্ত লগুনের পথ দিয়ে সগর্বে পা ফেলে চলে, তখন মনে হয় স্বয়ং উচ্চৈঃশ্রবা বৃষ্টি অধরার

আকৃতি প্রচার করতে জগতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার পরের গল্পটির কেন্দ্রেও দেখি একটি ষোড়াকে। এটির জীবন আরো রহস্যময়। অশ্ববজ্রিত ভেনিসের ঘাটে সে একদিন কোন অজ্ঞানার পার থেকে এসেছিলো, এবং পঞ্চিল সহরের বীভৎস আলোড়ন যেদিনে দুঃসহ হয়ে উঠলো, সেদিন তার মানবী প্রেমসীকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও উধাও হয়ে গেলো, কেউ তার ঠিকানা পেলো না; কিন্তু সকলেই বুঝলে এই প্রাচীন নগরীর সমস্ত সৌন্দর্য, তারি অনুসরণ করেছে। শেষের কথাটির নায়ক একটি অলৌকিক পাখী। কোনো ব্রাত্যের ঔরসে সে জন্মেছিলো এক জাদুকরীর গর্ভে। বহুদিন পরে তার জন্মদাতা যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে এক অনাম মরুর মাঝে কঁাসিকাঠে ঝুলছে, তখন সে এসে তার পিতাকে রক্ষা করলে। তার পর সে মৃত্যু বরণ করলে এবং তারই চিতার জীবনের অবশিষ্ট মহত্বটুকু সহমরণে গেলো।

গল্প জিনিষটাকে সংক্ষেপ করা বিপজ্জনক; উপরোক্ত বর্ণনা পড়ে মনে হতে পারে বইখানা আবাড় গল্পে ভরা। কিন্তু আসলে লেখকের বাস্তবিকতা অবাক করে দেয়। অদ্ভুত অতিকথনের মাঝে মাঝে এমন এক-একটা নির্ভূর স্পষ্টাঙ্গি আছে যার সংঘাতে দম বন্ধ হয়ে আসে। ফরাসী মনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে এই আতি বারে বারে জঙ্গজগতের অন্তরতম শোকে প্রবেশ করতে পেরেছে। কিন্তু ল্যাবুরের লেখা পড়ে সা ফাঁতেনকে মনে পড়েনা, এমন কি দমেসঁকেও মনে পড়ে না; স্মরণে আসে ডি, এইচ, লরেন্সের নাম। এই উচিত ক্রোধের উদ্দীপনা এই অহেতুক বিপ্লবের উচ্চতা কেবল “সেন্ট মর”—এর মধ্যেই দেখছি। আবার মরুভূমির বর্ণনায় মিলটনের ছায়া আছে; এই বিরটি শূন্যের পরিকল্পনা, এই দুর্বোধ্য দৃশ্যপট একেছে ওয়ে বিয়ার্ডস্‌মির প্রেতাশা, এই ধরনের অবক্ষরপ্রীতি এক তারি ছবিতে দেখা গেছে। ল্যাবুরকে একবার অনুবাদকরাপে দেখেছিলুম, অনুদিত কবিতাগুলির মূল ইংরেজি ভাবায় রচিত। এ-প্রমাণ যদি না-ও থাকতো, তবুও বুঝতুম ইংরেজি পরিশীলনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অতিশয় ঘনিষ্ঠ।

নাটকের মধ্যে জীদের “জিপি” অবশ্য-পাঠ্য। কয়েক বছর থেকে অতীতকে বর্তমানে টেনে আনার যে-হাওয়া উঠেছে, এই নাটকখানি হয়তো তার পরিসমাপ্তি। কিন্তু অভ্যস্ত হ্যামলেটকে গল্ফ ক্লাব হাতে নিয়ে আসরে নামতে দেখে আমাদের যে-কৌতুহল মেটে, এই নাটকখানি পড়ে চরিতার্থ হয় ঠিক তার বিপরীত মনোভাবটি। প্রথম চেষ্টাটি দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দূরকে নিকটে আনার চেষ্টা, তার মূল কথা ব্যবধান-বিনাশ; কিন্তু জীদের পুস্তকখানি দূরবীনের উদ্দেশে দিক দিয়ে প্রতিবেশকে দেখার মতো, আত্মীয়কে

পর ক'রে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য, তার প্রয়াস ব্যবধান-সৃষ্টি। হ্যামলেট যেই কথা কইতে সুরু করে অমনি ভুলে যাই, তার পরনে কোন যুগের ছদ্মবেশ, কিন্তু এই নাটকখানির প্রথমভাষ্যের প্রথম কথা থেকে যবনিকা পতন পর্য্যন্ত আমরা মুহূর্তের ক্ষণেও ভুলতে পারিনা যে, বিগ্রহের প্রাবরণ যে-যুগেরই হোক, তার ইডিপাস যদি অভেদাশ্রয়ই নয়, তবে নামকরণের সার্থকতা কোথায়? আমার বিশ্বাস এর মূলে আছে তাঁর স্পর্ধা, সফোক্লিসের প্রেতাশ্রমকে ডাক দিয়ে, তিনি হয়তো এই কথাই বঙ্গতে চেয়েছেন,— মিসিয়ে দেখো, তোমার মতো মনস্বী আর্টিস্টের পক্ষে কেবল দম্ভের খাতিরে কোনো কিছু করা অসম্ভব। হয়তো বাঞ্ছিত অবচ্ছিন্নতার স্বপ্নানই তাঁকে এই প্রাকপোরাণিক জগতে টেনে এনেছে, হয়তো বর্তমানের বিরূপ ব্যাকুলতার ছবিখানাকে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রতীপগমন অনিবার্য। তবে এই ধরনের পিছু হাটার প্রবৃত্তি প্রায়ই জন্মায় ভয়ের থেকে। সৌভাগ্যক্রমে জীদের অসীম সাহসের নতুন প্রমাণ অনাবশ্যক; তাই বলতে হয়, এই অপসরণের মূলে আতঙ্ক নেই, আছে হয়তো ঐচ্ছিকতা। আমাদের খেয়ালী জগতে ইডিপাসের রূপদী সমস্যার উত্তর খুঁজে পেতে হলে যে-পরম প্রজ্ঞার দরকার, তা হয়তো জীদেরও নেই। এ-যুগের ট্রাজিডি দেবতার কোপে ঘটনা, ঘটনা শুধু জ্ঞানের অভাবে; এমন-কি এখনকার শোকাবহ পরিণতির মধ্যে ট্রাজিডির মহত্বটুকুও নেই, আছে কেবল দরদের উপলব্ধি অশুচি সম্পর্কসঙ্কর অসহ্য বলে আমাদের ইডিপাস রুগ্নদৈবের উদ্দেশ্যে চক্ষুবলি দেয়না, সে চোখ উপড়ে ফেলে আত্মধিকারের তাড়নে, সে চোখ উপড়ে ফেলে, ভূত ভবিষ্যতের অনন্ত অন্ধকারে তার অহংকৃত দৃষ্টি নিতান্ত নিষ্ফল, তাই। গ্রীক, ইডিপাস আর ফরাসী ইডিপাসের মধ্যে তফাৎ এইখানে; একজনের জীবন দৈবপ্রাবর্ত্তিম, অপরের জীবন অবিদ্যার অধীনে; একজন আত্মবিসম্বর্ত্তন দিয়ে দেবতার আশীর্ব্বাদ পায়, অপরে সর্ব্বদ্বৈ হারিয়ে শুধু বোঝে যে, তার স্বপ্ন, তার সিদ্ধি, যে-সমস্তই বিধিবদ্ধ।

জানিনা, ঠিক এই কথাই জীদ বলতে চেয়েছেন কিনা। হয়তো বইখানা লেখার সময় হিতোপদেশের নামমাত্র তাঁর মনে ছিলোনা; সে-যুগের অনুপ্রাণনায় তিনি লেখা সুরু করেন, তার মূল মন্ত্র ছিলো; art for arts' sake। কিন্তু উদ্দেশ্য থাকুক আর নাই থাকুক, বইখানার ফাঁকে ফাঁকে যে-দুর্ব্বল আত্মজ্ঞানের, যে-অসহ্য নৈরাশ্যের, যে-দারুণ বেদনার ইসারা দেখেছি, উপরোক্ত উচ্ছ্বাস সেই সংরুদ্ধ আঘাতের প্রথম প্রতিক্রিয়া। নাটকখানা-সম্বন্ধে আরো অনেক দোষগুণের কথা বলবার রইলো, কিন্তু বাচালতার ভয়ে এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ টানছি।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

জনসন্-এর ক্রেশকর প্রতিবাদ তিনি ভোলেননি। কাজেই তিনি আসলে বস্তুকে উড়িয়ে দিলেন না, প্রয়োগাদির সাহায্যে প্রমাণ কবলেন যে অতিবস্তুও বস্তুর মতোই সত্য, এবং মানুষ যদি পৃথিবীর বাসিন্দা হতে পারে, তবে ভূত-প্রেত, অশ্বর-গন্ধর্ব্ব, দেব-দেবী প্রভৃতির ক্ষেত্রেও চুৎসম্মত অচল। তবু যে আমরা তাদের মানতে অনিচ্ছুক, তাব কাবণ বিশ্বচরাচরের সম্পূর্ণ উপলব্ধি আমাদের নেই; এবং প্রত্যুত্তর নখদর্পণে না এলে আমরা যেমন প্রাকৃতিকীকৃত অস্ত্র-শস্ত্রকে লোষ্ট্র ভেবে, অন্যামনে ফেলে দিই, তেমনি বিদেহ নগরের সাক্ষাৎ পরিচয়েও আমাদের চোখ ফোটে না অবিদ্যারই অনুগ্রহে। কিন্তু অজ্ঞান কেবল অশরীরী-সম্পর্কেই অস্বস্তা আনে না, প্রত্যক্ষও সমান দুর্জয়; সেখানেও ইন্দ্রিয়লব্ধ বিগ্রহের মধ্যে বিগ্রহাতীতকে না খুঁজে, অভিজ্ঞতা-নামক পাষণপ্রতিমা নিয়ে আমরা মতি খেলায়। কিন্তু বিজ্ঞানেব দস্ত্র আঁকড়ে ধকলে আর চলবে না; অভিজ্ঞতার করাঘাতে মানের দরজা খুলতে খুলতেই বসতে হবে যে সে-আগন্তুক যে দেশের দূত, তার আক্রমণও যদিও মারাত্মক, তবু তার অভিপ্রায় অবৈদ্য, অভেদ্য, অনর্থকম। এর পরে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা মূল্যহীন, বরং অতিসাধারণই বরণীয়; কারণ তার সম্বন্ধে আর কিছু না বুঝলেও, অস্ত্রত এইটুকুর স্ববব আমরা রাখি যে মর্ত্ত্যধামে তাকে ফিরে ফিরে পাঠিয়ে মানুষের ভাগ্যবিধাতা তার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখাচ্ছেন। কিন্তু বিধাতা-শব্দের ব্যবহারে হয়তো যেটস্-এব আপত্তি আছে; কেননা অনুষ্ঠের পরিকল্পনায় তিনি কোনো বিরাট পুরুষের শরণ নেননি। তাঁর অনুসারে বৈদান্তিক ব্রহ্মের মতো একটা স্বতঃকিরোদী উদ্ভাস্ত চৈতন্য স্বভাববশে দানা বেঁধে মাঝে মাঝে বাস্তবের আকার ধরে ব'লেই, তিনি মানুষের স্বপ্ন-পতন-ক্রটি কোনো বস্তুতে সাথে যান। সেইজন্যেই নাটকেও তিনি চরিত্রচিত্রণে উরাসীন, তাঁর ব্যঙ্গরচনায় প্রাধান্য পায় চরিত্রগত আবেগ, আবেশ ও অনুভূতি।

এতক্ষণ যা বকলুম, তাতে প্রোটাইনাস্-এর প্রভাব কতখানি ছানি না; তিস্ত লাইব্রিৎস্ ও কাশ্-এর এই উৎকৃষ্ট সংমিশ্রণ যে দর্শন বা কাব্যবিবেচনা নয়, তা আমার কাছেও সম্পষ্ট। তবু যেটস্-এব মতো সংযতবাক্ লেখকের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বানিকটো দুর্কোথাতো অনিবার্য, এবং দর্শনের পবিত্রতার মতো সাহিত্যের সাক্ষাতিকও যত গজ্জাষ, তত বর্ষায় না! উদাহরণ হিসেবে 'পিওর পোয়েট্রি' নামক কাব্যকবলার উল্লেখ করা যেতে পারে; এবং অলস মনে পড়লে যেটস্-এর অনেক কবিতাতেই সেই অমানুষিক লক্ষণ ধরা পড়বে। কিন্তু নিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্য রচনায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, অস্ত্রত ইংরেজী সাহিত্যে, বিরল হলেও, তাঁর লেখায় সুইনবর্ন-এর মঞ্জুল বাক্যসকলই নেই; অর্থহীন অনুলাপের সাহায্যে তিনি পাঠককে মত্তনুষ্ক করতে চান না; তাঁর কাব্যেব ইন্দ্রজাল সুপরিষ্কৃত চিত্রকল্পের প্রসাদ। যেটস্-এর সাহিত্যসাধনা যখন সূর্য হয়, তখনও ব্রাউনিং জীবিত, মেরিডিথ্ বুদ্ধিজীবীদের ইষ্টদেবতা, ফ্রান্সিস্ টমসন্-এর প্রসিদ্ধি কুচিবাণীশ্বরের মধ্যে বাড়ছে। তৎসঙ্গেও তাঁদেরও পদাঙ্ক এই কবিশ্বঃপ্রার্থীকে টানেনি। হয়তো 'কৃষ্ণ সাধনের মোহ' তাঁকে কিশোর বয়সেই মজিয়েছিলো; এবং তিনি প্রাক্তন সংস্কারের কল্যাণেই বুঝেছিলেন যে সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যাসকূট সহরুসাধ্য, আপাত-প্রাঞ্জলতাই প্রাণপাত

পরিশ্রমের ফল। নয়তো উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আলেখ্যশিল্পের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেননি; এবং প্রথম জীবন সেই পৈত্রিক বিদ্যাভ্যাসে কাটিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে ভালো ছবি বাগার্ণের অতীত, প্রকৃতির প্রতিভা হওয়া তার ব্যবসা নয়, সে অব্যক্তের প্রতীক, আপন গঠনসৌষ্ঠবের গুণে দ্রষ্টার কল্পনাকে অসীমে পাঠানোতেই তার চরিতার্থতা। সেইজন্যেই ‘রাইমার্স ক্লাব’-এর উদ্যোক্তা হিসেবে তরুণ য়েট্‌স্‌ য়ে-কাব্যাদর্শ প্রচারের ব্রত নেন, তার মধ্যে নিরাকার প্রত্যয় আদর পায়নি, তার পৃষ্ঠপোষণে বিদ্যাভিমতীর আশ্রয়িতা ভাগেনি, তার অধিকার চর্চায় দার্শনিকের অয়ঙ্কল ঘোচেনি; সে-কাব্য আসাপথ চেয়েছিলো শুধু সঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতার আর সঙ্গ তিপ্রমিত দর্শকের। অবশ্য সে-কবিতাব মর্মানুসন্ধানও পণ্ডিত্রম নয়; কিন্তু সে প্রতীক, তার অর্থগৌরব পাঠকদের ইচ্ছাধীন। তাহলেও য়েট্‌স্‌-এর প্রতীকপূজা মালার্মের অনুবাদ নয়। তার ‘ট্রেনিং অফ দি ভেস্‌’-উপাখ্যে আত্মজীবনীর নামকরণের সেই কবির প্রতিধ্বনি যদিও অভিপ্রেত, তবু ফরাসী প্রতীকীরা য়েট্‌স্‌-এর থেকে পৃথক। অন্তত মালার্মের চক্ষে স্বপ্নই একমাত্র সত্য ছিলো, এবং দৈনন্দিন সংসারকে তিনি এমনি অবাস্তব কল্পতেন, কবি প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ সাদা কাগজের নিষ্কলম্‌ মৌনিতায়। এ-মতে য়েট্‌স্‌-এর সমর্থন নেই; এবং তিনি বস্তুকে অস্বাভাবিক বিশেষণ দেন বাটে, কিন্তু স্বপ্নকে ততোধিক অবিনশ্বর মনে করার হেতুও তাঁর অবিদিত। সুতরাং যে-ভাষা বস্তুর পদসেবা, তার সঙ্গে স্বপ্নেরও কোনো বিবাদ নেই। আসলে য়েট্‌স্‌-এর ভাষা অতিশয় সাবলীল এবং চিত্তপরিবর্তনশীল, তার নিগড়ে ভাব কখনো পঙ্গু হয় না। শব্দব্রহ্মের সহস্র সৃজনীশক্তির উপরে তাঁর আত্ম আগ্রহ; এবং তিনি যেহেতু বর্ণনায় যত্নবান নন, ব্যঙ্গনায় প্রয়াসী, তাই তাঁর অর্থ বা বিষয়বস্তু অনেকের কাছে রহস্যাবৃত যত্নবান নন, ব্যঙ্গনায় প্রয়াসী, তাই তাঁর অর্থ বা বিষয়বস্তু অনেকের কাছে রহস্যাবৃত ঠেকালেও, সে-কাব্যের আবেদন সার্বভৌম। কাব্য জাতিগত সংস্কৃতি ব্যতিরেকেও যখন বিদেশীরা পরদেশী সাহিত্যেব মনে বোঝে, তখন সাহিত্যের অর্থ নিশ্চয়ই সার্বকতার নামান্তর। কিন্তু এই ধরনের সাহিত্যবস অনেক সময়ে শুধু বিলাসিতার অনুপান জোগালেও, স্বভাবসৌন্দর্যের অনটনে যেমন পূর্বপুরুষের পরিশীলন-সম্পদই উত্তরপুরুষের অবজ্ঞাজনন, তেমনি য়েট্‌স্‌-এর কবিতাও সার্বজনীন অনুকম্পার অধিকারী শুধু স্বসমুখ রূপের জোরে।

কিন্তু রূপ আর কলাকৌশল বিভিন্ন প্রকৃতির; এবং শেবোক্তের অভাবে শিল্পসেবা যদিও বিড়ম্বনা, তবু রূপের আশীর্বাদেই ললিত কলা কারুকার্যেব অগ্রগণ্য। কারণ কলাকৌশলের শেষ উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহারে; উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে উৎপাদক ও স্বাদকের যে মানসিক কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে, এমন সম্ভেদও তাকে বিচলিত করে না; অবাধ্য উপাদানকে বাশে এনে, তার কাঠামোর রচয়িতার স্বকীয়তা ফুটিয়ে তোলার ভার রূপের উপরে ছেড়ে দিয়ে, সে যথাসম্ভব কলা-কৌশলের উন্নতিকল্পে অভ্যাস ও উৎকৃষ্ট উদাহরণ যথেষ্ট। কিন্তু রূপের পবিত্র সন্মত জীবনযাত্রার মুখাপেক্ষী। চরিত্র আর ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে হার্ট রীড্‌ যে-বৈপরীত্য দেখেছেন, আমার মতে রূপ আর কলা-কৌশলের মাঝেও সেই ব্যবধান বর্তমান। কলাকৌশল চাবিত্রের অভিব্যক্তি আর রূপ ব্যক্তিস্বরূপেব; এবং চরিত্রওণ

একবার অর্জন করলে তাকে হারানো যখন শক্ত, তখন কস্মাকৌশল শিল্পসৃষ্টিতে সংহতি ও স্বেচ্ছাই আনে, প্রাণসংস্কার রূপের কাজ। উপরন্তু চাবিত্র্য অনুকরণের ফল; আত্মীয়বন্ধুর উপদেশ, প্রতিবেশের শাসন ও কুলসংক্রমণ, এই তিনের ঘাত-প্রতিঘাতই মানুষকে চরিত্রবান করে। কিন্তু ব্যক্তিরূপ জন্মায় আত্মজিজ্ঞাসার উদ্যোগে। অতএব তার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সম্পর্ক নিকট; কারণ অভিজ্ঞতা আত্মজিজ্ঞাসার সহচর, ব্যক্তিগত উপলব্ধির সঙ্গে চিরপ্রথার বিবোধ না-বাধায়ে প্রত্যেকের সুযোগ আসে না। তাহলেও ব্যক্তিরূপ অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি নয়, বরং তাকে অভিজ্ঞতার নিকব বলাই বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিরূপও একটা প্রতীক, ব্যক্তির প্রবর্তমান সম্রাই তার পটভূমি, দৈনিক অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে, একটা অবিচ্ছিন্ন বিশ্বব্যাপী দর্শনে উপনীত হওয়াই তার উদ্দেশ্য; এবং সেইজন্যই চারিত্র্যের মতো কৃপণ বা দ্বৈপায়ন উপাধি তাকে সাজে না; দৈবাগত সম্পত্তি খোঁচালেও তার যোহেতু প্রাণসংশয় ঘটে না, তাই পাছশালাকে দুর্গে পরিত্যক্ত করার প্রয়োজন বা প্রয়োজন তার নেই; সে আনন্দ পায় চলে, স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়ানোই তার বৈশিষ্ট্য। এ কথা যেটুকু জানেন, এবং সেইজন্যই সাধনার চেয়ে সিদ্ধিতেই তাঁর আগ্রহ; কেবল অনবদ্য কস্মাকৌশলে তাঁর সাধ মোটোনা, তিনি প্রতিনিয়ত খোঁজেন রূপের পরিপক্বতা। কিন্তু রূপ আর জীবন হরিহরাম্বা। কাজেই যেটুকু-এর সাহিত্যসেবা শুধু গ্রন্থাগারে আবদ্ধ থাকে না; সমাজে ও সংসারে, রাষ্ট্রনীতিতে ও হিতৈষণায়, প্রচারকার্যে ও সংগঠনে নিজের প্রতিভা ও প্রজ্ঞার নিদুর্লভ বিতরণে তিনি তাঁব ব্যক্তিত্বের সীমা বাবদ্যাব পেরিয়ে যান। ফলে তাঁর ক্ষুদ্রতম কবিতার অমৃতলোকে আধুনিক মন ও বর্তমান যুগই চিরন্তন মূর্তি পায়নি, নিববধি কল ও বিপুল পৃথ্বীও সেই মায়া মুকুবে অক্ষয় রেখায় চিত্রার্পিত। ডব্লু-বি যেটুকু জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিসেব সংগেত, উপরন্তু তাঁর মহান হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তিনি এখানে নিঃশেষ করেননি; তাই তাঁর সীমাহীন আয়ু ও সবল স্বাস্থ্য সকল শিল্পানুবাগীরই একান্ত কাম্য।

দুর্ভাগ্যবশত শুধু যেটুকু-জ্যেষ্ঠীর উল্লেখ করেই এবাবকার সম্পাদকীতে ছেদ টানা যাবে না। গত দু মাসের শোকসংবাদও বিস্তর। অর্জ রাসেল (এ-ই) ও আরি বার্বাস্-এর তিরোধান কেবল যুরোপীয় সাহিত্যেরই ক্ষতি হলো না, এই দুই দিকপাল নক্ষত্রের অন্তর্গমনে ঘনায়মান পশ্চিমাঞ্চলের অন্ধকারও হয়তো বাড়লো; এবং দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যু তাঁর বন্ধুদের পক্ষে যেমন অকৃতুদ, তাঁর দেশবাসীর পক্ষে তেমনি অপ্রতিকাৰ্য্য। এদের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার যোগ্যতা আমার নেই; কারণ এক এ-ই বাদে এরা কেউই স্বভাবসাহিত্যিক ছিলেন না। এমন-কি এ-ই-ও কবি হিসেবে যতই প্রশংসনীয় হোন না কেন, তাঁব প্রতিভার প্রধান ঈর্ষিত্বস্বত্বগুলি শিল্পোন্মত্ত ক্রেতাই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সুকুমার কস্মায় এদের চেয়ে অরূপীয় ব্যক্তি থাকুন বা না-থাকুন, অকৃত্রিম মানবধর্ম্মেব গুণে এরা প্রত্যেকেই সার্ব্বোচ্চ সিংহাসনের অধিকারী; এবং সে-গুণে আধুনিক জগতে এতই দুর্লভ যে সর্বাঙ্গ বৈদম্ব্যের সাধুবাদ ছাড়াও এরা মানুষের কৃতজ্ঞ অন্তরে অমরতা পাবেন।

(পরিচয় ৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৪২)

THE MARXIAN WAY

Vol. I, No. 1, July-Sept. 1945

The Liberal Retrospect

Sudhindranath Datta

An eminent Victorian, Browning, said to type in inviting us to grow old along with him; and we, who are otherwise conditioned, find ourselves as naturally opposed to his endemic optimism, as he was to the antediluvian pessimism of the eighteenth century that had come to such an untimely end in the French Revolution. Perhaps, of the two, our attitude is the more widespread among men; and, although in our individual hearts we feel ourselves to be exempt somehow from the universal laws of decay and death, once we have admitted our senility, we can no longer believe honestly that what has yet to be is the best. Being on the wrong side of forty and recognizing the normality of my psychology, I must, unlike my progressive juniors, differentiate between angury and wishful thinking; and, while, notwithstanding my anachronism, I have so far remained reasonable enough to acknowledge that the future of literature is not in the least affected by my increasing infirmity. I am, at the same time, unable to agree with those who would compare the literary achievements of the past to the feats of an infant prodigy with his tremendous destiny still unfulfilled. Hence not only my appreciation but also my apprehension of literature is retrospective; and, much as I should like to pretend that my references are motivated by an acute sense of history, I am too well aware of the implications of contemporary science to maintain that these radiations of my ego are not just chance-impelled. For the human mind is analogous to the scintillation screen physicists employ to study the behaviour of the electron; and not everything that impinges on it can cause a glow, most particles going unnoticed right through it to transform

themselves into waves of probability on the other side. Consequently, I feel no shame in confessing that, in common with the rest of existence, my retrogressive approach has no necessity behind it; and if, on ultimate analysis, its contingency should appear to be partially sociological, even then the accidents of my birth and breeding would have to be co-related to my intrinsic appetencies in order to arrive at a proper estimate of the use I have made of my extrinsic opportunities.

In other words, our aesthetic experiences are still subject to the ontological argument; and not only is our realization of beauty devoid of teleology but the very concepts of causality and continuity are so foreign to taste that, instead of developing serially from age to age, it seems to oscillate violently between logical opposites. Of course, notwithstanding such contradictions, a few ancient authors have remained enshrined in the affections of successive generations; and, misled by their comparative permanence that was seldom achieved at the expense of current appreciation, minor writers have not and again sought for immortality in contemptuous disregard of their particular times. But even when fathers and children worship at identical shrines, they justify their reverence by reasoning that is never the same; and, while Shakespeare, in the eyes of Symonds, is an anachronism of the purest blood, Caudwell sees him as the truest representative of the Elizabethan epoch. Viewed thus, the alternations of taste present an antinomy that is totally different from the synthetical dialectic of Hegel; and, despite the unity of field, the constant polarity of the old and the young is such as to preclude any possibility of their agreement on the denotation of an ambiguous term like "modern". For modernity has now lost its temporal aspect altogether, its moral implications, laudatory or blameworthy according to the personal predilection of the judge, having lately become obsessional with us; and, because in a disintegrating society, like ours, the various age-groups are naturally contentious, we are never in a position to decide whose contemporaries are designated by that equivocal epithet. In the circumstances, it is perhaps pardonable to share in the vulgar delusion that one's own superiority is beyond dispute; and, considering that the chief peculiarity of the self is its refusal to be delimited, one is permitted

thereafter to extend to one's own period the excellence one has arbitrarily arrogated for oneself. Moreover, all questions of chronology are outside the purview of the ego, since the past and the future are, at best, just static images in the specious present that shelters it; and, in consequence, everything belonging to it can be ever so outmoded, it is yet eternally modern.

No inordinate vanity is, therefore, involved in the claim that my formative years were ruled by the most adult intellectuals seen until now; and, because their deviation from what had gone before was extreme, their followers have been driven by atavistic recoil to a credulity so much more infantile than the assumptions they challenged that, by contrast, they seem even maturer than, in fact, they are and quite unnaturally modern. Of course, I attained my majority in the postwar epoch when circumstances, which no individual could control, would, in any case, have effected a revaluation of values; and if such impersonal forces are, for the moment, left out of consideration, with the resultant emphasis on the party played by will in the reversal of established order, then the leaders of my generation would deserve no greater credit than the post-Victorian nonconformists who, in their turn, had successfully questioned the authority of Ruskin and Carlyle. Yet, due probably to my identification of myself with those who repudiated alike the Shavian paradox and the Wellsian phantasy, I find a qualitative difference between the heresy of my time and the sectarianism of the nineteenth century which extended a decade into the eighteenth and appropriated a fifth of the present one; and the distinction, as I see it, is what separates the positive from the negative, tradition from treason, organization from freedom. For, however much they might have quarrelled among themselves and usurped one another's thrones, the succession of Victorian prophets all marched towards the self-same goal on similar feet of clay; and each, superbly unaware of his own Achilles' heel, contested the title of everyone else to lead the pageant of progress. But the fact of progress was never in dispute; and, Charles Darwin having proved definitively that somehow in the procession of aeons only the fittest survived to perform the miracle of turning monkeys into men, it was generally admitted that, at least posthumously, Leibnitz had the laugh of Voltaire who, in *Candide*,

had ridiculed the notion that everything is for the best in the best of all possible worlds.

Had I been a Marxist, instead of indulging in vague generalizations disproved by hundreds of exceptions, I would hereafter have passed the psychology of Victorian complacency to the economics of British imperialism; and my conclusion would have demonstrated once for all that English prosperity, derived mainly from the accidental monopolization of India, was not the ultimate link in a chain of fortuitous circumstances but the inevitable consequence of expanding capitalism. Being what I am, an uncritical believer in mere action and reaction, I suspect that the "scientific" determinism of the latest school of historians is, at least potentially, as conducive to slavery as the astrological predestination taught by theocratic tyrannies of old; and, whether or not my fears are rooted in the subsoil of class interests, it is, at any rate, conceivable that, the French Revolution happening a few decades earlier or later, England might no have become the first and foremost exploiter of the fabulous East, much to the detriment of her standard of living that, by virtue of its up-ward tendency maintained throughout the century, lent positive support to the cult of progress for one and all. Yet, certain though I am that economic interpretation of an entire civilization is impossible, I am convinced that no culture trait is wholly understandable except in relation to its material preconditions; and thus, while I remember between what extremes the pendulum of Victorian thought seesawed, even within the same denomination,—as, for instance, among the utilitarians who claimed the allegiance of both Bentham and the younger Mill, —I feel, at the same time, that because its objective sanctions were absolutely different, the postwar protest against the older order was in no way a simple relapse. For, in spite of its pretentious presumptions, the preceding age had no safeguard against the global conflagration that in 1918 reduced it to infertile ashes; and those, who somehow survived the holocaust, were left without the faith-compelling security that a maturing tradition alone can confer.

However we may adjudicate between the rival claims of mind and matter as the ultimate constituent of the universe, common sense compels us to recognize their compresence in every

experienced event, and although their causal connections is not yet beyond dispute, it would be foolhardy to deny their parallelism. Nevertheless, mind for all animation, can seldom keep step with material inertia; and in the case of group mind, the lack of synchronization is even greater, so much so that, by now, it would have become more obsolete than the appendix, had not its cumulative maladjustments, grown too obvious to be supported, precipitated periodic revolutions which again and again brought it up to-date. Thus every age has begun and ended in crisis; and, in between, the old dichotomy, given a new orientation by the change in the objective situation resulting from the initial harmony, has divided the community into a dwindling majority addicted to comfortable habits and a swelling minority of irreconcilables, who have been welded together to form an united people only at the recurrence of crisis. It would, therefore, seem that uniformity is no less true of society than of nature; and no doubt, thanks to it, generalized predictions are possible on both subjects. But, while conservation of social forces or energy is guaranteed thereby, social stability follows from full and free interaction of mind and matter; and, if for no other reason, at least because the motive power behind the Victorian dissenters was mainly mental, their relation to the intellectual nihilism of the 'twenties was that of precursors rather than of protagonists. At any rate, what were fears in the pre-war epoch having turned into post-war facts, there was no point in exercising oneself to prevent their realization; and, since life would have been factitious unless they were accepted wholly, they were no longer considered as possibilities admitting of alternatives but as actualities based on inexorable necessity.

Consequently, the 'twenties, as was to be expected, reacted against the domineering dogmatism of the nineteenth century by becoming uncompromisingly analytical; and since all the emphasis was placed on the logic of events, the good, like the bad, was mercilessly dissected in order to lay bare the anatomy of catastrophe. Thus the post-war bogey was no insecurity but illusion that had blinded our fathers to the imminence of the former; and, smugness being by common consent the only begetter of somnambulism, adventure, both intellectual and emotional,

was recommended for those who wanted their receptivities wakened and latencies manifested. Thereafter nobody had any further use for the sense of social cohesion so universal among Victorians who, however, were equally devoted to laissez-faire; and a closer examination of the paradox showed that discord had been frowned upon not because its opposite was self-evidently worthy of prodigious sacrifices but for the sake of prolonged prosperity that, in effect, had promoted concentration and conservation of power in a few incompetent and grasping hands. Of course, all clairvoyance notwithstanding, the new century could not dispense with conventions entirely; and with the passage of years its own creations were added to the residual ones. Yet virtue was not sought to be made out of the necessity of communal complaisance; and, as disintegration proceeded, dividing and subdividing groups into smaller and smaller coteries, the infinite regress of meaning stood fully revealed. For, in the meantime, Richards had become an influence at Cambridge whence Russell had already been expelled on account of his pacifist practice and sceptical theory; and just as the philosopher had proved that all metaphysics were equally prolific in error, so also the semasiologist now established, that, in view of the reader's constant readiness to suspend disbelief, the critic had no option except to be an ideological agnostic. Hence at the end of the last war ethics grew suddenly relative; and in the realm of art this relativity resulted in imitation yielding place to spontaneity.

Undoubtedly, this was romanticism of the correct brand; and it mattered little that a thinker like T.E. Hume, who in age and affiliation was nearer to the actual creators of modern literature was a self-styled classicist. For his sympathy with Bergson went counter to his professions; and, even when his denunciation of the nineteenth century temper was untainted by the least equivocation, what he found reprehensible in the revivalists of English romanticism was their subservience to unexamined shibboleths. As for Middleton Murry whose keeping of contemporary conscience lasted considerably longer than Hume's, not only has his repetitive Goddism been invariably solipsistic but his apostatical admiration for D.H. Lawrence has shown him to be an

incurable individualist; and Wyndham Lewis, the automatic enemy of his peers, has never yet made friends outside the world of Renaissance where lone lions endured the siege of gregarious foxes with splendid disdain. On the other hand, such instances of unquestionable self-assertion, all equally typical of the age, had this saving grace in common that normative behaviour was repudiated for fear of losing contact with the prodigality of life and not because exemplary conduct gave small scope to egotism. Indeed, science and its adjuncts had already robbed man of his former glory; and, not content with establishing that human experience was no guide to the universe, Einstein proved further that, as measures fluctuated with the observer's disposition, so one got no nearer to nature than the limiting constants that remained absolutely impartial to every possible approach. Here was an entirely new reason for trusting in Freud's insight; and Freud had demonstrated years ago that the psyche, while it enjoyed autonomy, was nine tenths unconscious, over-whelmingly instinctual, all past and had gone on delving deeper and deeper until personality was discovered to be thoroughly hypocritical, and, although, due to its lack of integrity, it was often capable of noble deeds, its motives, as he disclosed them, were of the basest.

Inevitably, self-confidence went on ebbing throughout the post-war years; and, if, in spite of it, the demand for spontaneity grew at the same time, the reason was that, models having exposed their vulgar flaws, imitation could only accentuate faults which, in any case, are too implicit in humanity to be eradicated altogether without serious maiming and worse distortion resulting therefrom. In the circumstances, the wisest course is to face them squarely for the purpose of determining their place and due, as, otherwise, they are bound to turn extortionate, ruining every activity by blackmail; and, provided authority can be made to see that its sole duty to children does not consist in forcing them to cultivate false respectability, adults may in time come to have enough spirit of acceptance to put Terrence himself to shame. But acceptance must not be confused with complicity that often follows from mental laziness, whereas the former requires coordination of different levels of existence; and this, according to D.H. Lawrence, is a matter of physical discipline, since the body is an organic whole

with all its parts attuned to achieve a definite end to any given moment. Yet he was an ascetic uncontaminated by the least touch of hedonism; and the salvation he preached is to be found in emotions emanating from unfeeling flesh in communion with the sublimities of nature enduring beyond good and evil. In fact, shorn of its messianic vehemence, his message is essentially similar to E.M. Forster's so-called "diabolism", and, although Forster is the older man with a literary reputation dating back to Edwardian days, he was the first, and, in my opinion, remains the best, exponent of the new austerity. At any rate, he has never shared the pathetic fallacy of Lawrence; and, instead of thinking nature's contact ennobling for man, he considers such commerce degrading for nature. Consequently, his ideal is absolute disinterestedness reminiscent of the *Gita*; and perhaps, because all love, being fundamentally sexual, is, in effect, possessive, he extols friendship above everything else. Needless to say, this minimal view of life is not an innovation but a conscious return to classic stoicism; and that is why the spontaneity that led to its rediscovery succeeded in avoiding the worst excesses of romanticism.

Perhaps the religious twist Marcus Aurelius imparted to stoicism was not an unnecessary aberration; it was the logical development of a philosophy that had begun by enjoining the virtuous to withdraw from the world in order to live in harmony with the laws of the universe; and, although, of late, civilization has so extended its frontiers that even an anchorite, secreted well within the wilderness, cannot hope to escape its doubtful blessings, detachment is still possible through blasphemy which, being the converse of reverence, subserves the same end. Thus the postwar generation, for all its inherent humility, was also superlatively iconoclastic; and no man better represented this impiety than Lylton Strachey who, convinced that what people call great is a vast conglomeration of mere vanities, was prepared, when it suited his purpose, to treat history as though its one function was to furnish examples of dramatic irony. Judged by the pragmatic prejudice in favour of facts as against fiction, he was, of course, wrong; and it cannot be denied that, despite a deep insight into human frailties his opinion about books were somehow more worthwhile than his estimates of men. Yet one

must acknowledge that the coherence theory of truth is as untenable as the correspondence theory; and if having pondered both and found both wanting, one felt a predisposition towards any one of them, then the choice should not cause another Troy to fall. Nor would a new crucifixion result from the playful identification effected by Aldous Huxley between himself and the jesting Pilate; and just as Strachey's faith in proportion and balance, had it been commonly shared, might have given stability to a rootless society, so also Huxley's pluralism, by becoming generally accepted, could have made of mankind an unity in diversity. Indeed, neither of them questioned the existence of truth, they only distrusted its ferocious exclusiveness; and, while the former thought that no varieties were eternal unless they complemented one another, the latter believed that, afforded equality of opportunity, truth was bound to prevail over falsehood. Hence privilege, however sacrosanct, was opposed wherever encountered; and, because progress cannot be conceived except in terms of a hierarchy, it was sought to be replaced by the stoic doctrine of recurrent cycles, each showing identical phases of development and decay.

Following the latest fashion, it is, no doubt, possible to call the above attitude retrograde, since it was, indeed, a reversion to an older mode of thought with a definitely religious bias; and if, as some sociologists suggest, faith in progress is the only distinguishing mark of a radical, then the neo-stoicism of the nineteenthcenties must also be termed reactionary. Even so, considering that a causal flight into a future without effect is not utopian but "scientific", I do not see why an analytical descent into the rock-bottom of human nature is escapist; and, apart from other arguments, should facing facts be the determining proof of a social conscience, the palm for realism must go to the post-war generation. For, whether or not its classicism was, as a critical approach, purely negative, as a creative force, this inversion of romanticism manifested itself fittingly in a thorough going rejection of the formal limitations imposed by more settled times; and, whatever be the secret of the hypothetical understanding between history and her communist votaries, I cannot agree with my juniors of that persuasion that a person, let us say, like Virginia

Wolf, who changed the whole technique of novel writing, because the traditional naturalism of Galsworthy and Bennett was no adequate vessel for the fluid complexity she knew as life, was an irresponsible denizen of the Ivory Tower with its magic casements tightly shut against the foam of perilous seas. As to Joyce, though his constant preoccupation with a private language turned him at last into a soliloquist, *Ulysses* still remains the most authentic and detailed picture of Everyman, in spite of the parallel drawn there between a feckless Jew of provincial Dublin and the mythic hero of epical Greece; and, for all his royalism and anglocatholic orthodoxy, Eliot alone has been revolutionary enough to lead English poetry out of the waste land frequented by Georgian shades. In any case, throughout the previous century, while people waxed eloquent about inspiration, in defence to which the very Victorians had to condone a modicum of moral laxity among men of letters, the successors of Wordsworth finally reduced the manner and matter of literature to a set of abstract formulae without the slightest correspondence to actual experience; and, whereas the modern authors named above demanded no especial indulgence, either divine or mundane, they tried, at least, to express their poetic vision in images floating along the stream of consciousness forced out of obstructive mind by the insistence of matter.

Looked at from this side and with greater penetration, it becomes, therefore obvious that the post-war era, for all its superficial anarchy, was neither modern nor iconoclastic in any antinomian sense of the word; and it ceased to be negative in reasserting man's abiding trust in man. For it was the great liberal tradition that, with its dying breath, inspired this attitude; and although, even then, the acuter intellects of the day realized that it could not be indefinitely maintained in the face of decadent capitalism, yet its roots, stretching beyond the beginnings of the economic man, were found to reach the age of Socrates who, assailed by similar doubts as ourselves, had proclaimed with quiet conviction that virtue is knowledge. That, however, did not impede the annihilation threatening him; nor has it prevented the extinction of the hopes and efforts of the nineteen-twenties. But for that reason to condemn them would be manifestly unfair; and,

possessing a mind prejudiced in their favour, I see in them the culmination of European culture. Unfortunately, in this view I am one of a shrinking minority; and, in any case, such a questionable conclusion, despite its apparent affinity with the Crocean interpretation of history as the fulfilment of liberalism, cannot be based on the meagre evidence I have assembled in this arbitrary survey which not only avoids all mention of continental authors but also excludes most English writers of the period because of their divergence for the type chosen for its dominance. Moreover, there is no generally accepted definition of liberalism; and many a scholar, not content with declaring that the gospel of progress is the core of this philosophy, contend further that, 'apart from the British version of the creed, the liberal outlook demarcated across the Channel never countenanced the individual, when his claims clashed with the needs of society. Perhaps my ignorance of the relevant facts hinders my agreement with them; and as in company with Whitehead, I believe that in every civilization each real advance has been invariably achieved through subordination of coercion to persuasion, so to me liberalism is an universal and timeless tendency, unaffected by the defection of the Utilitarians whose blind faith in mechanical uplift, resulting from enlightened self-interest, was a legacy of Malthusian fatalism.

Liberalism, on the contrary, elevates personality over character, and, whereas the latter is an unsolicited gift of nature passively received, the former is the reward actively won for acquired merit. In other words, the difference between the two is what, in theology, distinguishes works from grace; and the volitional self-determination, whereby the transformation is effected, is similar to the metaphorical death the mystics prescribe for the seekers after salvation. However, the analogy should not be pursued too far; and, while most romantics have been attracted to liberalism because of its seemingly fundamental unreason that allows all kinds of eccentric excesses to egotists, the true liberal is a confirmed rationalist who, realizing that instinctive behaviour is impersonal, bases his individuality on the integral logic he has taught himself. He is, therefore, unafraid of opposition which he welcomes as a corrective to his possible dogmatism, and, since his need is development and not progress, he tends to become a

solitary weighing pros and cons of questions wholly outside the scope of absolute answers. Consequently, liberals are much better guides than leaders; and, as they know how insufficient past doctrines have been when called upon to furnish concrete solutions to actual problems, they are comparatively loathe to advertise their particular panaceas, although they may be willing to recommend for trial the remedies they have themselves benefited from. Hence I can find no substance in the common charge against them that, understanding why humanity felt so hopelessly frustrated during the years dividing the two wars they still refused to point the one way out of the tragic impasse; and in justice to them we must remember that they themselves never claimed any especial revelation. Of course, even if such had been their pretension, they would have been no more culpable than the majority of prophets whose honour in foreign countries appears to grow in inverse ratio to the failure of their prognostications at home; but, in fact, it is to their credit that, instead of trying to mislead, they endeavoured to prevent deception by advocating the exercise of unfettered intellect as the only certain good in the midst of infinite uncertainties.

In the circumstances, the one available explanation of the disrepute, into which they have lately fallen, may be found in the view that there is no reality behind progress, advance and retreat cancelling each other completely in the two phases of full cycle; and yet, expected as is the rising reaction against them, it is surprising to discover that they are supposed to have betrayed their sacred trust, because, after having been expert dissectors all their lives, they were unprepared, on the instant, to accept collectivism at its face value. Even so their understanding was far from perfect; and the most deplorable of their blindspots was the incapacity to distinguish between the group and the individual. No doubt, the paradox of the one and the many has never been resolved in philosophy, notwithstanding Plato's airy assertion that the problem had ceased to exist long before his time; and, although, in his laudable attempt to bring the idea down to earth, Aristotle declared the individual to be the confluence of the general and the particular, his logic, at any rate affords no clue to the mystery of Hegel's concrete universal or of the Marxian transformation of

quantity into quality. This, however, does not mean that the conflict is an imaginary one; and no sooner we speculate on the history of human thought than we realize that the self-same contradiction, reappearing in every branch of knowledge, brings it at last to a standstill. Thus matter is simultaneously wave-like and corpuscular; and, whereas in his personal capacity man seeks to preserve himself and prays for immortality, at least through his offspring, as the member of a crowd he does not hesitate to welcome complete annihilation. Due perhaps to their sedentary attitude, the liberals were ill aware of the irrationality that motivates the masses; and, having themselves benefited greatly from education, they seldom recognized how dangerous a little learning can be. For, while established authority depends of ignorance, the usurper exploits the literacy of the uninformed to make propaganda on his own behalf; and the mere ability to read not only invests the written word with disproportionate significance but the effort involved also inhibits the unpractised reader's reasoning faculty, resulting in inordinate growth of self-confidence that fosters cynicism and not sceptical balance. Thereafter, on the plea that nobody, be he ever so wise, is above criticism, almost anybody with sufficient ruthlessness in him may demand our implicit obedience; and, since theirs was the gospel of equality, arrived at by introspection alone, the intellectuals of the nineteen-twenties wasted their splendid substance in freeing the individual in order that the group could accept totalitarianism without compunction. Alas, Voltaire was right after all; and not a few of those, who were firmest in their adherence to a purely anthropocentric world, have by their recent renegation proved once again that, if there is no God, one must be invented immediately. [Vol. I, No. 1, July-Sept. 1945]

Freedom of Expression

Sudhindranath Datta

Milton is no longer the god he used to be in my youth. Later iconoclasts have uncovered his feet of clay; and modern prosodists have laboured to prove that even his noble verse is full of metrical lapses. He is acknowledged to have been a sanctimonious egotist; and if the distinction Mr. Herbert Read draws between character and personality be valid, then, however much he might have possessed of the former, he shows total lack of the latter. His one aim in life was to excel; and this ceaseless effort made him so deliberate in everything he did that his lyrics are exercise in rhetoric rather than expression of seemingly spontaneous rapture. Nevertheless, *Areopagitica*, for all its Latinised diction and ulterior motivation, stated the case for a free press in undying terms; and, while the plea has been repeated, reinforced with new arguments from time to time, the amplifications continue to distract the mind, without superceding Milton's advocacy.

But the problem was simple in his days, when the economic man had still to win general recognition. Then, though the Renaissance with its glorification of individual liberty was sufficiently advanced to have disrupted beyond repair the social integration of the Middle Ages, there was yet no question that values were eternal as well as spiritual. Virtue was still knowledge; beauty had only to be disclosed to receive universal obeisance; and, where as absolute truth remained hidden behind an infinite regress, reason dispelled ignorance by degrees, bringing the final revelation nearer every day. Thus, to Milton who had identified himself with the progressive forces of Reformation, the need to unshackle the human mind seemed paramount; and, because the Roman Church, as a centralised institution, considered excessive wisdom inexpedient, he did not feel any contradiction in pleading simultaneously for the removal of censorship and persecution of the Catholics.

Fortunately, they were dwindling minority in England where freedom of expression could continue to grow, even though they remained voiceless until they were so few in number that the swelling chorus could no longer be spoiled by their discordant note. But conditions are very different to-day. Our world is compartmental without being regionally self-sufficient or homogeneous; and, while Nazidom has been destroyed at the cost of untold suffering, there is in Britain itself evidence of Hitler worship. As for France, within the same Government allegiance is divided between the Western and the Eastern blocs; and this polarity is ubiquitous in Europe, as also a threat to the unity of all other continents. In the circumstances, a man must be considerably more tolerant than Milton, if he is to fight for freedom of expression; and, should he be content with limited liberty, he would need God-like confidence in himself before he could enunciate his principle of exclusion.

For, arrogant as Milton was, he had the enviable advantage of belonging to the larger faction which very soon became an overwhelming majority; and so, despite its partiality, his judgment, which he understandably mistook for the Categorical Imperative, promoted the greatest good of the greatest number. But the majority of to-day is confused mass without any sense of mission; and, however introspective one may be, one can see neither virtue nor truth within, whereas without there is such ugliness as the greatest of modern artists cannot transmute into beauty. Those who are honest and informed know their motives to be intrinsically base; and the ignorant flock round the cynic who bends them to his ignoble will with noble words. Thus democracy is in decay; and, even a Jeffersonian like John Dewey, can suggest no better remedy than to recommend state control of propaganda. But as Professor Hayek has pointed out in another context, partial regimentation is a self-defeating ideal; and, unless spontaneous generation has become a biological reality in the meantime, a council of disinterested philosophers would be as difficult to form now as it was in Plato's age.

There is, however, an influential minority who are above such debilitating despair; and they claim that Marxist analysis is the surest guide to the true and the good. Generalising from the

empirically established parallelism between the body and the mind, they hold that spirit, whence values are supposed to emerge, is a reflection of matter; and, translated into terms of history, this means that in any given society the manifold of production and distribution is the sole determinant of culture. For, in the words of Marx, the "realm of freedom" only begins where the material production proper ends; and, whatever their social development and economic system, men must spend most of their energies in merely producing the goods and services they need in order to survive. In this "realm of necessity" no freedom is possible, unless manual labour is expended according to a rational plan, calculated to minimise the blind operation of economic forces; and it follows that spiritual values are enjoyed in so far as escape is possible from what Defoe described as "the daily circulation of sorrow, living but to work and working but to live, as if daily bread were the only end of a wearisome life, and a wearisome life the only occasion of daily bread".

Since history is a record of the slow liberation of man from this vicious circle, they alone merit freedom, who hasten the historical process by their conscious effort and concerted will. Others retard progress for the sake of vested interests, and must be put out of the way to clear the goal of successive generations. Thus Communists are entitled to the maximum civil liberty in the capitalist world; and yet, within the Communist order, capitalists have no right to corresponding privileges, because they represent reaction which vainly tries to perpetuate a mentality based on an outmoded economy. Unfortunately, the only collective society we know is based, if we are to believe the Webbs, on the concept of duty, as distinct from rights; and so its evidence cannot strengthen the Communist case which is considerably weakened by the opportunism of its advocates, when confronted with a situation that defies their dogmas. Nor is their faith in dialectics as an universal process founded on verifiable data. On the contrary, the closer we look at the geological past, the clearer become the breaks in evolution; and unspeculative prehistory is full of similar cataclysms which humanity survived at the cost of millenia of retrogression.

Nevertheless, the humanitarian appeal of the progressive

fallacy is great; and, whatever his ideological preoccupation, no man of good will can deny that the "realm of freedom" as now constituted, is a close preserve that excludes the toiling millions penned within the "realm of necessity". If spiritual values are to acquire general validity, leisure to contemplate them must be made available for the masses; and that requires reorganisation of the forces of production and distribution to ensure economic and spiritual values; and yet to postulate a casual relation between them would be a serious mistake. Even an invariable sequence of matter and mind is not discoverable in society. For, in the last analysis, the psyche is the repository of residues whose beginnings antedate homo sapiens; and our conscious behaviour, too, is frequently out of harmony with our environment, as, for instance, in an infantry attack on an entrenched enemy, when every reflex prompts us to seek cover and only our sense of duty keeps us going.

Moreover, the very same stimulus sets up contradictory responses in the group and its members; and the whole purpose of education is to inhibit our personal sensibility so that we can move from place to place and community to community, without exhausting ourselves in ceaseless adjustments. Conversely, we carry a minimum number of values within us; and unless we are corrected to do the opposite, we recognise certain archetypal patterns whenever they recur. In fact, it is this recurrence in experience, that imparts continuity to cultures; and since space and time are in eternal flux, there has to be some sort of subjective stability in order that communication can take place between men and men, generation and generation. It is, of course, difficult to separate this perantial factor within individuals from superimpositions of fashion and expediency; and yet its presence is presupposed by the indisputable fact that throughout the ages our saints and heroes have been cast in the same mould. Though biographical variations particularise their personalities, materialist interpretation of their uniqueness is manifestly impossible; and such failures of the Marxist method are not explained away by saying that economic forces drive classes, without affecting individuals.

In any case, freedom of expression is an individual need; and,

as a matter of history, economic inequality, instead of hampering self-consciousness, is often an aid to its development. This does not mean that the present maldistribution of wealth is justifiable; nor is economic enslavement a myth, because certain souls are unafraid of want. But they are also unresponsive to censorship; and provided they have a message, they get it across, despite proscriptions and prohibitions. Indeed, the creative artist has always to overcome the recalcitrance of the material he works in and in order to express his experience, he has to transform the original medium, as well as curtail its sensory supports. For example, a descriptive writer is obliged to use legible words to represent visible colour occurring in a manifold of sensations that lends it overtone; and a musician is even more circumscribed, since he demands instantaneous response that must, at the same time, cohere in an abiding pattern. Besides, resolution of difficulties is the essence of creative activity; and where nature offers no impediments, the artist invents them, so that the feeling of triumphant release may not be denied him in the end.

The audience, however, enjoys no such advantage, and is seldom called upon to get round real opposition. In the capitalist order, his consumption is restricted by his capacity to pay; and, within the collective dispensation, he has no opportunity of contact with nonconformists. There is no doubt about the iniquity of the former; and, although the latter claims as its principle—to each according to his needs, in practice, the priorities are arranged by a central authority with very definite moral predilections. Thus the necessity of freedom is equally urgent in both systems; and even if the Communists are right in believing that the exercise of absolute power will not corrupt the dictatorship of the proletariat, which will cease the moment wealth has been equitably distributed, the uniformity they seek to impose upon society may not produce the best art. For, in Marx's view, "with a communist organisation of society, the artist is not confined to the local national seclusion which ensures solely from the division of labour; nor is the individual confined to one specific art, so that he comes exclusively a painter, a sculptor, etc... In a communist society there are no painters but at most men who, among other things, also paint."

Those who would have us believe that Communism alone promotes the maximum individuation, should ponder on the above quotation; and, as Marxists abominate solipcism, they must be congenital utopians, if they maintain that each man is a repository of every possible appetency and aptitude. At any rate, the evidence of materialist psychology is definitely against such an assumption; and, though Pavlov obtained miraculous results from conditioning, he was too much of an empiricist to deny that temperamental differences are inexorable facts. Had things been otherwise, propaganda could have solved all our problems; and, because it takes all sorts to make a world even a coercive society does not last for ever. Besides unless some people could do certain jobs with especial competence and expedition, not only would excellence have never appeared on earth but huminity could not have progressed at all for sheer lack of leisure; and while that does not mean that many must labour, so that a few may grow fat, it does imply that the common weal is best served by allowing full scope to the individual's innate potentialities.

Of course, a poet is all the better for taking an intelligent interest in politics; and a complete personality commands a wide horizon. Yet a vocation for authorship is the only justification for a life-time of writing; and initial predilections apart, the freedom to choose subjects most congenial to oneself is the surest incentive to good art in large quantities. No doubt, there is danger in this as in all other forms of liberty; and we have learnt from bitter experience that those who are the least tolerant of any restraint when living in a democratic system, are the firmest supporters of rigid standardisation in totalitarian regimes. But rapture without risk is rarer than omelettes without eggs; and the only insurance I can suggest is to make the life of reason available to every one. In other words, universal education must begin by inculcating the scientific attitude which consists in recognising that facts and their inter-relations constitute the whole of reality; and this the child should be encouraged to discover for himself and not accept on the authority of his teachers.

At the same time, vigilance must be exercised to prevent science from taking the place of religion; and having in course of a century performed miracles, encouraged mysteries and evolved

a priestly hierarchy, science, since the advent of Einstein, has become abstract enough to sound oracular. Hence the future is supposed to be its sole monopoly; and so great is the reverence it inspires to-day that to deny it magical properties or to doubt that it possess specifics against every imaginable malady is to invite excommunication. In any case a determined attempt is afoot to turn science into an institution; and many scientists seem quite ready to put up with complete regimentation of their researches and abstractions. That such an idea should find even partial acceptance shows how insidious is the appeal of totalitarianism; and similar misconceptions about the function of science have helped to develop the anti-scientific attitude of certain intellectuals who claim that nothing short of a religious revival can save society from worse horrors than the atom bomb let loose on Hiroshima.

Obviously, these pessimists exaggerate; and yet science, unlike religion, has no direct connection with ethics. Such moral implications as it has acquired in its progress have been due to the accidental fact that it has grown in conjunction with democracy; and so the didacticism of the Communists is no less foreign to it than the diabolism of the Nazis. Thus, while scientists may feel justly proud of the burden of social service that has come to fall on them, they must always remember that intrinsically science is beyond good and evil; and if they continue to seek knowledge for its own sake, only then, and not otherwise, will the world's debt to them ever increase. Its detachment is precisely what imparts the highest value to science; and here again its affinity with democracy is great. For democracy, too, is non-authoritarian; it respects tradition so long as experience is not denied thereby; and rigid planning of its economic life may conceivably enhance its efficiency for the time being, but it cannot expect to remain alive by stifling individual enterprise indefinitely, any more than astronomy can afford to neglect planetary aberrations, because accepted laws are rendered incoherent by them.

Indeed, both science and democracy are vowed to truth; and truth, though ultimately immutable, is revealed to man, as Milton knew, in fits and starts which often contradict one another and invariably confuse. Therefore he must always keep an open mind, be willing to discard preconceptions when present facts demand a

revision of his premature conclusions. This freedom to make and correct mistakes is the especial privilege of the scientific spirit; and free societies would do well to promote it. No doubt, it would be misused now and again; and a few scientists would be perverted enough to go on concocting gases progressively more poisonous than the last. Yet a real democracy should have no call to utilize such commodities; and that, rather, than regimentation, should subserve the social implications of science. For good is superior to evil and beauty to ugliness; and given a free choice, man prefers the former. Otherwise, conflicting opinions, instead of stimulating our ratiocinative process, would have reduced us to the status of Buridan's ass; and since Marx, despite his cynicism, was ever faithful to the dialectic of progress, his thesis that our consciousness is determined by our being must mean, as Mr. M.N.Roy maintains it does, that the individual comes before the group. [Vol I. No. 3. March, 1946]

বাংলাদেশে রক্ষণশীলতা, প্রগতিবাদ ও ঐতিহ্যদূষণ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের স্থান হিসেবে আমার জন্মভূমিকে নির্বাচিত করা হয়েছে বলে আমি সঙ্গতভাবেই গর্ব অনুভব করছি এবং সঙ্গতভাবেই সম্মানিতও বোধ করছি। সম্ভবত তা পুরোপুরি অভাবিতও নয়। কোন গরিমার মধ্য দিয়ে নয় বরং অবক্ষয় ও অপদার্বতার জন্যই বাংলা অষ্টাদশ শতকের উইগপাই (রক্ষণশীল) এবং তাদের উত্তরসূরী ঊনবিংশ শতকের দার্শনিক প্রগতিবাদীদের প্রাচ্যদেশের প্রথম ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হয়; এবং যদিও কাপুরুষতা ও গৃহুতার জন্যই কোন খ্যাতিমান বাঙ্গালী একটা প্রাচীন জাতির সামুহিক ঐতিহ্য অপহরণের বিরুদ্ধে বিষয় প্রতিবাদেও অংশগ্রহণ করেনি, তথাপি সেই ক্ষুদ্রিশ্রম যা সেই দাবান্নিকে বিচ্ছুরিত করেছিল, যার অপনাম বিদ্রোহ, তা এই স্বার্থসোপী জনতা-অধ্যুষিত নগরী থেকে পনেরো মাইলের কম দূরবর্তী সুপ্ত গহুর ব্যারাকপুর থেকে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। যাই হোক, ইতিহাস কখনোই আকস্মিক নয় এবং সম্প্রতি যখন অপ্রত্যাশিত অনুর অনবচ্ছিন্ন জগৎ কার্যকারণতত্ত্বের নিয়মকে শুড়িয়ে দিয়েছে, মানুষের কর্মধারা সম্পর্কিত আমাদের দীর্ঘলব্ধ মুক্ত ইচ্ছাকে নস্যং করতে বাধ্য করেছে এবং তার প্রতিকল্প হিসেবে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সম্ভবত তা অদৃষ্টবাদ নয় বরং নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তা হল কোন পূর্বাপর অপরিবর্তনীয় ঘটনাপ্রবাহ মাত্র।

হেগেল সম্পর্কে অসমর্থিত সংবাদে বলা হয় যে বিশুদ্ধ যুক্তি তাঁকে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করে যে প্রতিটি সাময়িক ঘটনার চিরন্তন প্রতিভাস থাকে তো বটেই এমনকি প্রতিটি ঘটনা মানবেতিহাসে অন্তত দু'বার ঘটবেই, আমাদের মত সংশয়বাদীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হই যে কোন যুক্তিতেই পর্যবেক্ষিত সাধারণীকরণে সেই চূড়ান্ত সার্বভৌমকে স্থান দেওয়া যায় না, এবং এখন আর সেই সারল্যে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। আর যখন থেকে ক্যাসিবিাদীরা তাদের বিজাতীয় রক্তত্বা প্রশমিত করতে জাতিগত উন্মাদনা জাগরিত করার ফলে সংস্কৃতি শব্দটির সঙ্গে যে বিরক্তিকর অর্থহীনতা যুক্ত হল, তা ছাড়া রুশ্ বেনেডিক্টের সাংস্কৃতিক আদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য যতটা অতীন্দ্রিয়বাদী মনে হয় ততটা নৃতাত্ত্বিক মনে হয় না। এতদসত্ত্বেও 'যুক্তি'

কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সময়ের অংশমাত্র নয়, এবং সত্য হোক বা মিথ্যা হোক কবিরাজ জন্মগ্রহণ করে, তৈরী হয়না, অখন্তন মানুষেরা ইচ্ছে করেই বিপথগামী হয়না বা মহানুভব ব্যক্তির অকারণে সাহসী হয়না।

বাংলাদেশ কেবলমাত্র তার সন্তানদের আদ্য ও অর্থশিক্ষার জন্য ছইগপছা ও প্রগতিশীলতার উদ্ভূতভূমিতে পরিণত হয়নি বরং সাগরপার হতে আমদানীকৃত তার ঐতিহ্য ও মানসিকতার উপযোগী সেইসব অগ্রগণ্য আদর্শগুলিই তার জন্য দায়ী। সম্ভবত তার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া এবং পর্যায়ক্রমিক খরা ও বন্যার প্রকোপে যোগাযোগের পথগুলি দুর্গম থাকায় ঐতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষের এই প্রান্তটি দেশের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে, বিদ্রোহীদের গ্রহণ করেছে, রাজপ্রতাপে লালিত হয়েছে; তার বিশ্বাস শোষণের উদ্দেশ্য ছাড়া কেউই এখানে অনুপ্রবেশ করেনি, আর নিজস্ব প্রতিশ্রুতি ছাড়া সে কারো কাছে কিছু পায়নি। হিন্দুপুনরুজ্জীবনবাদ তার প্রতি খুব সুবিচার করেনি এবং অন্যান্য জাতির সঙ্গে মূলত সমতার আদর্শে বিশ্বাসী একটা সমাজে, সুদৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে না হলেও হয়তো বা অনীহাবশতই একটা কঠোর জাতিভেদ প্রথা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। মুসলমানরাও প্রকৃত অর্থে উন্নততর নয়, তারা শক্তিশালী না হলেও আত্মতরী, সাম্রাজ্য ছাড়াই প্রভু পরায়ণ এবং অশিক্ষিত হয়েও কেতাদুরস্ত। সুতরাং সংকীর্ণ অর্থে ধর্মীয় সাহিত্য বাংলায় কখনোই গড়ে ওঠেনি এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিও প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত থেকেই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই স্মরণাতীত মেলা ও বৌধ উৎসবগুলিতে অংশগ্রহণ করেছে যেখানে মানুষ মানুষের কাছে গ্রাম্যসূত্রে তার সম্প্রদায়ের গান গেয়েছে।

তার অর্থ এই নয় যে গাথাগুলি হিন্দুদের প্রধান পৌরাণিক কাহিনীগুলি অবলম্বনে রচিত হয়নি অথবা সাহিত্যে দেবদেবীদের অনুপ্রবেশ প্রতিহত হয়েছে। বিপরীতক্রমে ব্রিটিশরা সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও ধর্মবহির্ভূত বিবয়বস্তু কদাচিত বাঙ্গালী লেখক ও পাঠকদের অভিনিবেশ ঘটতে সক্ষম হয়েছে। একইভাবে আমাদের ইতিহাসে বাঙ্গালী সাহিত্য অদ্ভুতভাবে জাগতিক থেকে গেছে, আমাদের লেখকদের মধ্যে যাঁরা ধর্মপরায়ণ তাঁরাও ধর্মীয় বিষয়ের উপর এমন মনোভাব দেখিয়েছেন যা কখনও অবজ্ঞের না হলেও সর্বদাই সুপরিচিত। ফলত হিন্দুধর্মের প্রধান দেবতারাও আমাদের কাব্য গাথায় কখনোই মুখ্য ভূমিকার আসন পায়নি। তারা যখন আবির্ভূত হয়েছে, হয় তাদের দৈবী আসনচ্যুত হয়েছে কিংবা সহিষ্ণু বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে দেবপর্যায়ের উন্নীত অধিকতর শক্তিশালী লৌকিক শক্তির মুখোমুখি হয়েছে। কিংবা প্রাচীন দ্র্যাজেডিগুলিতে চিত্রিত রাজাদের

মতো তারাও মানবিক জ্ঞান বিচ্যুতির আধারে পরিণত হয়েছে।

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপীয় জনপ্রিয়তা ইংলণ্ডে কেন্দ্রীয় গোষ্ঠির প্রচেষ্টায়ত্তে শুরু হওয়া উচিত ছিল এবং বিধ্বস্ত জার্মানীতে অদ্ভুত দৈবী শক্তির অনুসন্ধানে অন্ধকারে আবৃত হয়ে বিকাশের চূড়ান্ত সীমায় পৌছানো উচিত ছিল। সুতরাং যে রোম্যান্টিকতা তাঁর নিজস্ব নয়, তিনি যা পেয়েছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছ থেকে, তাঁর মৌল রচনায় যে অতীন্দ্রিয়বাদের কোন ভিত্তি নেই, যা তাঁর গুণমুগ্ধদের মস্তিষ্ক প্রসূতই ছিল তা আমাদের নিজস্ব উদ্যোগ এবং আমাদের কুখ্যাত দাসমনোবৃত্তির মাধ্যমে অন্যান্য সব বিষয়ের মতো বিদেশীদের অনুকরণের মধ্য দিয়ে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এরকম মোড়কাবদ্ধ মিথ্যাকে নস্যাত করতে করতে অবশ্য বাক্যব্যয় কারো পক্ষে লাভজনক নয়, তা সত্ত্বেও যারা এরকম শোচনীয় ভ্রান্তির পশ্চাতে অবিরত অনুধাবন করেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, এমনকি বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবধর্মও বিশুদ্ধ আবেগের চেয়ে আত্মলিপিক, ভাষার নীরস শব্দাবলীতে অনেক বেশী সমৃদ্ধ এবং যখন আনন্দোচ্ছল গীতগুলি আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বড়জোর বিনোদনের বস্তু, কার্যত হিন্দুধর্মের নবতর ব্যাখ্যা প্রদান সেগুলির স্থায়ী সম্পদ।

অবশ্য তত্ত্বগুলির অনুপ্রবেশের প্রভাব তখনও সেখানে ছিল, এবং বাউলদের অনুপ্রেরণার মতোই তার প্রভাবও নিঃসন্দেহে অতীন্দ্রিয়বাদী। কিন্তু সাধারণভাবে এটা স্বীকৃত যে এই অতীন্দ্রিয়বাদ বৈদিক চিন্তার সাথে বৌদ্ধধর্মের মিলন ঘটিয়েছে, আমার বিশ্বাস এর উদ্ভব ভারত উপত্যকার প্রাক-আর্য সভ্যতার মধ্যেই নিহিত; আমার মত পাণ্ডিত্যহীন ব্যক্তির মতে সেই উদ্ভূত ধর্মের প্রাণশক্তিতে শ্রেষ্ঠতার চেয়ে ব্যাপকতা, গৌড়ামির চেয়ে সহনশীলতার গুরুত্বই বেশী। ঐক্য ও পবিত্রতার মধ্যেই এই বিশ্বাসের অস্তিত্ব আমার চিন্তার মধ্যে সর্বদাই বিরাজ করছে এবং পার্শ্ববর্তী জীবনের দায়বদ্ধতাই বুদ্ধের জন্ম দিয়েছে, তাঁর সর্বপ্রকার যুক্তির আঘাত সত্ত্বেও এই হতভাগ্য দেশে আগত হাজার হাজার প্রচারকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র অসীম করুণার উৎস এবং সম্ভবত যেহেতু এই বাংলায় অজানাকাল থেকেই প্রায়োগিক বৌদ্ধধর্ম নিরবচ্ছিন্নভাবে বহমান ছিল আমাদের প্রথম উদ্ভেদনীয় কবি চণ্ডীদাস পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধেই টেরেলের চেয়ে সুনির্দিষ্ট ভাষায় বলতে পেরেছিলেন যে মানুষের উপর আর কোন সত্য নাই।

আমার মতে যথোপযুক্ত যুক্তি ছাড়াই চণ্ডীদাসকে অতীন্দ্রিয়বাদী বা মরমীয়া আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কিছু কিছু ভাব্যকার তাঁর স্বতন্ত্রত্বের মধ্যে যে সুগভীর পাণ্ডিত্য আবিষ্কার করেছেন, আমরা যদি সে বস্তু অনুধাবন নাও করি তথাপি আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদ

একান্তভাবেই যুক্তিবাদী এবং তার প্রকাশ ঘটেছে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে গৃহীত সুসমঞ্জস প্রতীকের মাধ্যমে। মানবিক সম্পর্কের সমস্যাই তাঁর সব কবিতার বিষয়বস্তু এবং তাঁর সংগীতের মূল সুর হল ব্যক্তি জীবনের পারস্পরিক মিলনের ক্ষেত্রে মৃত সামাজিক প্রথাগুলি আরোপিত প্রতিবন্ধকতা এবং প্রয়োজনীয় এই মিলনের অভাবে জীবন অপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমার মতে এই দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবেই যুক্তিবাদী।

বাংলার শাক্ত কবিরাজ যখন তাঁদের দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত সংগীতে আরো কম রূপকের ব্যবহার করেছেন তখন তাঁরাও ভিন্নতর মানসিকতা প্রদর্শন করেন নি। তখন কেবল যৌনমিলনের প্রতীকগুলি পরিবর্তনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হল বা অন্যদিকে সমভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হৃদয়বৃত্তির ভিন্নতর অভিব্যক্তির প্রসঙ্গ বারংবার উপস্থাপনার মাধ্যমে আরো শক্তিশালী হল—তা হল সন্তানের প্রতি মায়ের বাৎসল্য ও মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা। এতদসত্ত্বেও অস্থিরতা ও নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস অব্যাহত থাকল এবং পূর্ববর্ণিত প্রধার মত ধর্মমতের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেতে থাকল। এসবই যুক্তিবাদের উপাদান এবং সেকারণেই ‘অতীন্দ্রিয়’ শব্দটি যার অর্থ অযৌক্তিক-বাউলদের উদ্দেশে আরোপ করা আমার মতে স্পষ্টতই অবিবেচনাপ্রসূত; এবং তাঁরা বৈষ্ণব বা শাক্ত, হিন্দু বা মুসলমান যাই হোন, সকলেই বাংলার নগরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্রচার করেছেন যে আধ্যাত্মিক বিষয়েও গৌড়ামি ও বংশবদ্ভতার চেয়ে স্বাধীনতা ও নিষ্ঠা অনেক বেশী নিরাপদ পথ।

ব্যক্তির উপর প্রগতিশীলতার ভাসাতাসা প্রভাব অর্ধহীন এবং স্বাভাবিকভাবেই বাঙালী প্রতিভার কাছে বিদেশী। আমাদের সমাজ অদ্যাপি শ্রেণীগতভাবে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়নি, এমনকি জনগণের সাংস্কৃতিক ঐক্যকে বিনষ্ট করতে সামন্তবাদও বেশী গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। রামমোহন রায়ের মতো ‘পণ্ডিতেরা এককভাবেই ব্রিটিশের আগমন সমর্থন করেননি, প্রায় সব সুস্থ চিন্তাসম্পন্ন মানুষই অন্তরে অনুভব করেছিলেন যে আপাত জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধ্বংস সাধনের ফলশ্রুতিই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাশিত পুনর্জন্মের প্রস্তাবনা। আমার অনুমান এই অন্য অন্যান্য অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের মতই ব্রিটিশেরাও তাদের পা রাখবার জায়গা না পেয়ে এদেশের সমস্ত বিদ্রোহী সত্তাগুলির সমর্থন আদায় করতে উদ্যোগী হয়েছে, যেমন করে ন্যায্য কিন্তু অব্যবহিত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজন্যবর্গ, মুসলমান হোক বা না হোক সকলেই হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলশ্রুতিকেই লাভন করতে বাধ্য হয়েছে।

সুতরাং যখন বিদ্রোহ প্রকাশ পেল, তখন সেইসব অসাধুপন্থায় অর্ধোপার্জনকালী অধ্যাত্মসম্পন্ন বাঙালীরাও ধ্বংসোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্য

রক্ষায় একটি অঙ্গুলিহেলনও করেনি, এবং মেক্সের অনুসরণে তাঁর কেরাঙ্গী। তৈরীর প্রক্রিয়া দেশীয় সংস্কৃতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করার ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করায় বাংলা মহাকাব্যের পুনরুজ্জীবনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রকৃত কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি, প্রাথমিক পর্যায়ে যার মধ্যে বিদেশী অনুকরণ প্রতিভাত হয়েছিল কিন্তু তার প্রতিফলন প্রকৃতপক্ষে স্বাদেশিক বলেই প্রমাণিত হল। সম্ভবত সেকারণেই যখন ঊনবিংশ শতকের রোমান্টিকতার উল্লেখ অপসৃত হল, তাঁর আবেগোচ্ছল প্রশংসান্য টেনিসন ও হগোর মতো বিরাট কবিরাজ ভাবপ্রবণ বলে পরিগণিত হলেন, তখনও মাইকেল তাঁর সমগ্র দুর্যোগময় প্রকারান্তরে বোহেমিয় জীবনব্যাপী ক্লাসিক নিষ্ঠাকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

ব্রিটিশভারতে মাইকেলই যে প্রথম প্রগতিবাদী এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। তাঁর সমকালীন ও উত্তরসূরীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই এই দুর্ভাগ্যজনক বিশেষণটির অর্থ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, যা আজ এই সমিতি নিজেকে গৌরবাধিত করতে ব্যবহার করছে। তিনি জানতেন যে প্রগতির ধারণাটি নিছক অস্থিরতা থেকে পৃথক কারণ প্রগতি সর্বদাই উদ্দেশ্যবাদী এবং অতীত যে ভবিষ্যতের চেয়ে কম মূল্যবান নয় এই ইঙ্গিতবাহী এবং আমাদের তাৎক্ষণিক অবস্থানটুকু নির্ধারণ ছাড়া বর্তমানের কোন অস্তিত্ব নাই। এতদসত্ত্বেও এই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী কবি নন, এবং এই জ্ঞান তাঁকে যেমন নকলনবিশী না করেও আহরণ করতে সাহায্য করেছে তেমনই চণ্ডীদাসের অনুগামীরা জাতীয় ঐতিহ্যের ঝাঁকটুকু উপলব্ধি করেই সমকালীন বাংলা কাব্যের প্রচলিত প্রভাবকে প্রতিহত করতে সুফি হৃদয়াবেগের আমদানী করেছিলেন।

বস্তুত মধ্যযুগব্যাপী এবং তৎপরবর্তীকালে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের পারস্পরিক বিক্রিয়ার এত গভীরতা ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও যে কেন আজ বাংলাই ভারতবর্ষের মূখ্য সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মূগ্মাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তার ব্যাখ্যা করতে ইতিহাসের দানবীয় পরিহাসের উপরই নির্ভর করতে হয়। বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবকে স্বাগত জানাতে অনেক মুসলমান রাজার কল্পনাপ্রবণ সহানুভূতি ছাড়াও দুই সাম্রাজ্য পরস্পরের জীবনধারাকে এতদূর গ্রহণ করেছিল যে মুসলিম উৎসবের দিনগুলিকে ধর্মপ্রাণ হিন্দুদেরও উদ্‌যাপন করতে উৎসাহিত করেছিল, মুসলমান গায়কদের হিন্দু গাথা অবলম্বনে সংগীত রচনা করতে আগ্রহী করে তুলেছিল এবং মুসলমান জনতাকে হিন্দু শোভাযাত্রায় অংশীদার করেছিল। বিপরীতক্রমে আমি ইতিমধ্যেই যা বলেছি তারই পুনরাবৃত্তি করে বলতে চাই যে বঙ্গ সংস্কৃতির শিকড় কখনোই ধর্মে ছিল না; এই কারণেই মাইকেল তাঁর স্বধর্ম ত্যাগ করলেও আতিগত

বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারটুকু পরিত্যাগ করতে পারেননি। যদিও এটা একটা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, সাধারণভাবেও এর ব্যতিক্রম নাই। তাঁর পূর্বে ভারতচন্দ্র সমতুল উল্লেখযোগ্যতায় সময় সচেতনতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কারণ, যখন অত্যধিক ভাবপ্রবণতার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে পুরোমাত্রায় শিথিল ও পঙ্কিল করে তুলেছিল, তখন তিনি তার মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মার্জিত আচার আচরণের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদের কাছে ঋণী হয়েছেন। এইসব পথিকৃৎদের উপর সাধারণ মানুষের অপরিণীত স্বীকৃতি এবং সাধারণভাবে যাদের এসবের প্রতি বিরূপ মনোভাবই পোষণ করা উচিত—সেইসব ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা বিবেচনা করে এটা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁরা প্রকৃতই জনগণের প্রতিনিধি ছিলেন, সাধারণ জীবনধারণের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার বাণীরূপ দিয়েছেন। এটাও অস্বীকার করা যায় না যে তাঁদের সৃষ্টিগুলি ছিল আত্মীয় চেতনা বিকাশের উপাদান, যেগুলি স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েছে।

মোটের উপর, শিল্পের অর্থ কেবলমাত্র খেয়াল চরিতার্থ নয়, এবং সে হিসেবে সাহিত্য, বিশেষত প্রগতিশীল সাহিত্য কেবলমাত্র রোগগ্রস্তের মনঃসমীক্ষণের বিষয় হতে পারে না। প্রত্যেক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লেখক যখনই ভবিষ্যতের মুখোমুখি হবেন, তখনই তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব অতীতকে স্মরণ করা এবং তখন তাঁর হাতের কাছে যা আছে তার অন্তর্বস্ত থেকে তাঁর প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যের অংশটুকু উপলব্ধি করা। আমার আশঙ্কা যে, মাইকেলের পর এই কর্তব্য ক্রমাগত অবহেলিত হয়েছে এবং আত্মকের সর্বাধুনিক লেখকের সঙ্গে পাঠকের অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে আমাদের সেই সৌন্দর্যপূনিক বিচ্যুতির মূল্য দিতে হচ্ছে। কারণ একজন স্বাভাবিক বাঙ্গালী, শত শত বৎসর ধরে যার বিনোদনের একমাত্র বিষয় ছিল, সীমাহীন সংগীতমূর্ছনা ও অক্লান্ত কাব্যপাঠ, বৈচিত্র্যহীন ব্রত পালন ও মীমাংসাহীন কূট তর্কে অংশগ্রহণ, তারা পূর্বকাল সবকিছুর তুলনায় প্রকরণগতভাবে উন্নত কাব্য সাহিত্যের প্রতি সহসা উদাসীন হয়ে পড়ল, এ আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের সাম্প্রতিক কীর্তিগুলির প্রতি সে যদি মুখ ফিরিয়েই থাকে তার কারণ, আমরাই বিস্মৃত হয়েছি যে, সমবর্গের অভ্যন্তরেই প্রগতির বিবর্তন ঘটেতে পারে, এই সাধারণ নিয়মের প্রতি অবজ্ঞাই বহুলাংশে বর্ষসঙ্করের জন্ম দেয়।

আমি বুঝি সাদৃশ্যসমূহ বিপজ্জনক, এবং জীববিজ্ঞানের ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত মানব প্রকৃতির যতটুকু জানা গেছে, তদনুযায়ী আমার সৃষ্টিশীল প্রয়াস সংযত করা উচিত—একথা বললে আমাকে হয়তো পশ্চাদমুখী প্রবণতার অপবাদ সুনতে হবে। এতদসত্ত্বেও আমি অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত করতে চাই যে,

সম্পূর্ণ অবস্থা নিরপেক্ষ ব্যক্তি 'বুরিদানে'র গাধার মতই অনড়তার অভিলাষপ্রাপ্ত। আমি পুনরায় ঘোষণা করতে চাই যে প্রগতির অর্থ অসীমের উদ্ভল চূড়াভিমুখে সরলরেখায় উত্তরণ নয়, বরং এক সর্পিলা পথ পরিক্রমা, সময় সচেতনতার অভাব থাকলে হয়ত গোলকখাঁধার অসংখ্য রঙ্কপথে বারংবার আবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা সেখানে অবধারিত। এইভাবে প্রতিটি দ্বন্দ্বমূলক সংশ্লেষণে অতীতের একটা বৃহৎ অংশই অবস্থান করে এবং ভবিষ্যতের যে অংশ অসীমীভূত হয়না—তাই পরবর্তী পর্যায়ে বিভেদের জন্ম দেয়। এই বিভেদ অবশ্যম্ভাবীও হতে পারে, কখনও বা বদ্ধ জগৎ দিয়ে আবদ্ধ জীবনশ্রোতকে মুক্তি দিয়ে উপকারও করে থাকে। কিন্তু কার্যত মানুষের ভূমিকা যখন পূর্ব নির্ধারিত এবং যে সভ্যতা সে গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছে সেখানেও তার স্বপ্ন যে অবশেষে তার ইচ্ছাই সর্বশক্তিমান হবে। সেই স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখা ও সর্বজনীন আনন্দহত্যার পথ থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র কল্পিত উপায় হল তার ইচ্ছার সাথে প্রকৃতির দ্বন্দ্বকে সদ্য জাগরাক রাখা।

সূত্রাং যে প্রগতিশীলদের নিরিখে সভ্যতার মান নির্ধারিত হয়, তাদের নিকট পরীক্ষণের চেয়ে ঐতিহ্যের মূল্য বেশী এবং যদিও সে পরীক্ষণকে শেষ না করে বাঁচতে পারেনা ততাপি এইভাবে আহৃত ফলগুলির উপর ঐতিহ্যকে নির্ভর করতে হয়। ঐতিহ্য কেবলমাত্র কথার কথা নয় কিংবা সর্বহারাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য কায়েমী স্বার্থ কর্তৃক সেখানে চীনের প্রাচীরও গড়ে তোলা হয়নি। এটা একটা নিত্যবর্ধমান বিষয়, যেমন কোন ব্যক্তির নিজ উদ্যোগে নির্মিত বস্তুতল বাড়ী, যে আপন সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ীটির উপর একটির পর একটি তল সংযোজিত করে যায়; এবং যখন সেই ক্রমোন্নত উপরিসৌধ বর্ধমান বাড়ীটির রূপের নিত্য পরিবর্তন ঘটায়, তখন কেবলমাত্র নিম্নতলের বাসিন্দারা ছাড়া সকলেই বিস্মৃত হয় যে মূল ভিত্তিই সমস্ত নূতন পরিবর্তনের চাবিকাঠি। অন্যভাবে বলা যায় যে অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধিজীবীরা নয়, সহনশীল জনগণই ঐতিহ্যের অভিভাবক ও প্রগতির নিয়ন্ত্রক এবং একজন গবেষকের যোগ্যতা যাই থাকনা কেন তা যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট জনগণের বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ততক্ষণ তার সাগ্রহে উপস্থাপিত ঘটনাগুলি জুরাফ্রাস্তের স্বপ্নে পর্যবসিত হয় এবং তার উচ্চস্বরে ঘোষিত সত্যগুলি পাগলের প্রলাপে পরিণত হয়।

প্রগতিশীল সাহিত্যের ভূমিকা বলতে আমি একথাই বুঝি এবং যেহেতু আমি অনুভব করি যে অদ্যাপি আমাদের বিখ্যাত লেখকেরা এই আদর্শ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি সে কারণেই আমি সানন্দচিত্তে এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের স্থান নির্বাচনের বিচারবুদ্ধিকে প্রশংসা করি। আহা! তাঁরা যদি সভাপতিমণ্ডলী গঠনেও সমচিন্তার পরিচয় দিতেন। কারণ আর যাঁরা আছেন,

যাঁদেরকে আমার সহকর্মী বলার সুযোগ আছে, তাঁদের উপর অর্পিত যে কোন রকমের সম্মান গ্রহণের উপযোগী যোগ্যতা তাঁদের আছে, কিন্তু আমার ইতিহাস প্রমাণ করে যে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি হ্রস্ব আবরণে, আমি কখনও অখ্যাতিযুক্ত প্রগতিশীলও নই কিংবা সাহিত্যিকও নই। আমি আপনাদের কাছে একথা বলতে চাই যে এটা আমার নিছক বিনয়মাত্র নয় এবং যদিও আমার নিজের সম্পর্কে এই ধারণা সত্ত্বেও আমি এই মঞ্চে ওঠার সম্মতি দিয়েছি, তার কারণ হল, আমার হতাশার কারণগুলি আমি পরিষ্কার বুঝি—বা আজ সর্বত্র বিদ্যমান, যাঁরা আজ সংস্কৃতির সংকটের মোকাবিলায় আগ্রহী, তাঁদের কাছে সেগুলি তুলে ধরা প্রয়োজন।

উপরে, আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করেছি, কিন্তু আমি স্বীকৃত মতামতই তুলে ধরেছি। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমি স্বীকার করছি যে, অসচেতনভাবেই তিনি যে প্রতিরোধ শক্তি দেখিয়েছেন তাতে এদেশে আমাদের মত কুসন্তানের উদ্ভব ঘট উচিত ছিল না। সোচ্ছা কথায় ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে প্রত্যাশিত পুনরুজ্জীবনের সুদ্রপাত ভেবে রামমোহন ফুল করেননি, তাঁর ভাবনায় এটাই ছিল যে, ব্রিটিশরা দেশীয় প্রগতির ধারাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে হঠাৎ কিছু করেনি, আমি পূর্বেই বলেছি, তা জনগণের মধ্যেই বর্তমান ছিল। দীর্ঘ মুসল সামন্ত শোষণের যীতাকলে নিপেষিত সুবিরতাপ্রাপ্ত সাধারণ মানুষকে এই আলোড়ন মুক্তি দিল—যদিও তারা ভারমুক্ত হলনা, সেই ভারের পুনর্বিন্যাস জীর্ণ সমাজ দেখে প্রাণ-সঙ্করের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সেই চিরন্তন শক্তির উৎস পুনর্বীর পূর্বের মত জীর্ণ প্রভাবলীতে নয় বিদেশী শাসনের যে আগাছায় বন্ধ হয়ে গেছে—তারা হল বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আপনারা যদি আপনাদের স্বস্ত প্রণোদিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহশীল হন, তাহলে আপনারা যদি আমাদের সমূলে উচ্ছেদ করতেও না পারেন, আপনাদের অবশ্যই নূতন কোন ছিন্নপথে সেই প্রাণধারাকে প্রবাহিত করতে হবে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে প্রাথমিক কিছু প্রয়াস জলের ঢেয়ে কর্মমই বেশী উৎপন্ন করবে এবং তারপর দীর্ঘকাল ধরে আঞ্চলিক পটভূমির উর্ধ্বতনবৃত্তিতে সাক্ষ্য লাভ করবে। কিন্তু নিরন্তর প্রয়াস আঞ্চলিক সংকীর্ণতাকে মুক্ত করবে এবং যথাসময়ে এই সংকীর্ণ জাতীয় পথ তার নিজের বীধ ভেঙ্গে ফেটে পড়বে, যেমন করে যামিনী রায়ের সুনিবিড় বঙ্গীয় পদ্ধতি আপনাকে গিওটো ও হলবেইন, ভ্যান গগ্ ও পিকাসো বা ভারত, আফ্রিকা ও মেক্সিকোর অজ্ঞাত ভাস্করদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা যারা তাঁর মতো সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরতা অর্জনে সাহসী নই, আমাদের গর্ব ব্যর্থ হলে আমরা ধুলোয় গুঁড়িয়ে যাবো, তার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে

সমকালীনদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই এই উপলব্ধি আছে যে, নিরীক্ষাবাদীদের চেয়ে ঐতিহ্যবাদী শিল্পীই বেশী স্বাভাবিক, বিপরীত ক্রমে প্রতিটি সম্ভাব্য শিল্পসভায় আন্তর্জাতিক মানুষের অস্তিত্ব, বাস্তবে তা থাক বা না থাক অন্তত কল্পনাতেও তার পুনরাবিষ্কার ও তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন প্রয়োজন। সেই জন্যই আমি আমার অর্থহীন বিশ্বাসের অসম্বন্ধ স্বীকৃতি শেষ করার পূর্বে যামিনী রায়ের নাম স্মরণ করতে চাই। নিজেকে মার্কসবাদী অভিধায় অভিহিত না করেও আমি উপলব্ধি করি যে আমাদের সংস্কৃতির সংকটের উৎস শ্রেণীগত এবং সেকারণেই সেই জনগণের পুনর্জাগরণেই আমার একান্ত প্রত্যাশা যারা স্থায়ীভাবেই শ্রেণীর উর্ধ্বে এবং সেকারণেই চিরকাল সংকটমুক্ত।

অনুবাদ : চিত্ত পান

প্রবন্ধটি প্রখ্যাত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'Whiggism Radicalism on Treason in Bengal' শীর্ষক ভাষণের অনুবাদ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-এর গ্রন্থপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য

“১৯৩০ থেকে ১৯৪০ এই দশ বৎসর তাঁর অধিকাংশ প্রধান রচনার অক্ষকাল : প্রায় সমগ্র ‘অর্কেস্ট্রা’, ‘ক্রন্দসী’ ও ‘উত্তরফাঙ্গুণী’, প্রায় সমগ্র ‘সংবর্ত’, সমগ্র কাব্য ও গদ্য অনুবাদ, ‘স্বগত’ ও ‘কুলায় ও কালপুরুষের’ প্রবন্ধাবলি—সব এই একটিমাত্র দশকের মধ্যে তিনি সমাপ্ত করেন।”

—বুদ্ধদেব বসু

কাব্যগ্রন্থ

১. তর্কী—১ম সংস্করণ, ১৩৩৭ (ইং, ১৯৩০)। পৃষ্ঠা—৭৩; কবিতা সংখ্যা—২৯। মূল্য—দেড় টাকা। প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা।

উৎসর্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে

অর্থ্য

ঋণশোধের জন্য নয় ঋণগ্রহীকারের জন্য

* ২ পৃষ্ঠা ব্যাপী মুখবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ সে-ঋণের কথা অকপটে স্বীকারও করেছেন। “রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বদাই জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ বলে ধরে নেওয়া প্রায় নিরাপদ।”

* ‘তর্কী’ কাব্যগ্রন্থটি ১৯৩০-এ প্রকাশিত হলেও এর “তর্কী সে যে” শিরোনাম কবিতাটি (৯ মার্চ, ১৯৩০) বাদ দিলে নবীন লেখনী, শ্রাবণ বন্যা, বর্ষার দিনে, বাৎসরিক, পলাতকা, উর্বশী, মৃত প্রেম, ভ্রষ্ট লগ্ন, শৃঙ্গার, কবি, অতস্রায়, অন্ধকার, অনাহৃত, পশ্চিমের ডাক, অস্তিম গীতিকা, প্রতিহিংসা, নিকষ, অপঙ্গাপ, হিমাশয়, চ্যুতকুসুম, উত্তমর্গ, মানবী, কৈফিয়ৎ, অবিনশ্বর, স্মরণ, অভিসার, অভিযান্ত্রি, চিরন্তনী—এই ২৮টি কবিতাই ১৯২৬-২৮-এর মধ্যে লেখা। “হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে” রক্ষিত সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় একুশ বছর বয়সে (১৯২২) তাঁর কাব্যরচনার সূত্রপাত। ১৯২২-২৮-এর মধ্যে সাতখানা খাতা বোঝাই করে সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে ৫, ৬, ৭ সংখ্যক খাতার কবিতাগুলি ‘তর্কী’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

‘তথী’ কাব্যগ্রন্থের ‘মুখবন্ধে’ সুধীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, “এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি মাসিকপত্রে বেরিয়েছিল।” কোনগুলি তা নির্দেশ করেননি। ‘অপলাপ’ (আশ্বিন, ১৩৩২) ও ‘মানবী’ (অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) এ-দুটি ‘সবুজপত্র’-এ প্রকাশিত হয়।

২. অর্কেষ্টা—১ম সংস্করণ, ১৩৪৩।। পৃষ্ঠা—৯৭; কবিতা সংখ্যা—২৫। মূল্য—এক টাকা বারো আনা। প্রকাশক—শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুরী, ভারতী ভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা।

উৎসর্গ : সত্যেন্দ্রনাথ বসুর করকমলে

২য় সংস্করণ (পরিবর্তিত), মার্চ ১৯৫৪ : বৈশাখ ১৩৬১। পৃষ্ঠা—৮২; কবিতা সংখ্যা—২৫। মূল্য—আড়াই টাকা। প্রকাশক—শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা। প্রচ্ছদ—সত্যজিৎ রায়।

* সুধীন্দ্রনাথের লেখা ৬ পৃষ্ঠার ভূমিকা। এই ভূমিকার এক আয়গায় তিনি লিখেছেন—“ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস যুটিয়ে তোলাই কবি জীবনের পরম সার্থকতা। কিন্তু আপন কালের স্বধর্ম ভুলেই, সে-সময় সহজ হয় না, যিনি উক্ত সংগমের দিকে এগোতে চান, নিজের অভিজ্ঞতাকে, তথা জাতিগত চৈতন্যকে, প্রতীক-রূপে দেখতে তিনি বাধ্য; এবং ওই দিব্য দৃষ্টি যাঁর অধিকারে, তাঁর কাছে আমার প্রিয়া আর কালিদাসের কান্তা এক বটে, তবু সে-অভেদের ভিত্তি ব্যতিহার্য হ্রস্ববেশে নয়, প্রেমানুভূতির নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপে। পক্ষান্তরে ‘অর্কেষ্টা’-র অভিজ্ঞতা নিষ্কর্মের ধার ধারে না; তার পুঙ্খানুপুঙ্খও যাতে স্মৃতিপটে চিরমুদ্রিত থাকে; সেই জন্যে তার চতুর্দিকে মনের এই অবিরাম পরিক্রমা; এবং তার প্রতি লেখকের মমতা অত্যন্তিক বলেই, সে-তিলোত্তমার স্বতন্ত্র সঙ্গ সে-দিন ধরা পড়েনি। অর্থাৎ ‘অর্কেষ্টা’য় উক্তি ও উপলব্ধির সাযুজ্য অনুপস্থিত এবং তাই, তীব্র ও সংক্ষিপ্ত আবেগের প্রণোদনা সত্ত্বেও, এ-বইয়ের মুক্তহৃদ প্রায়ই শিথিল।”

* ‘ভূমিকা’ ছাড়াও ‘অর্কেষ্টা’র প্রথম সংস্করণের জ্যাকেটে ছাপা বিজ্ঞাপনটিও সুধীন্দ্রনাথের লেখা। “সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে তার খসড়া দেখে সে-বিষয়ে নিঃসংশয়” হয়ে অধ্যাপক স্বপন মজুমদার সেটি তাঁর সম্পাদিত “সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ”-এ মুদ্রিত করেছেন। সেই বিজ্ঞাপনটির কিছুটা অংশ এখানে পুনরুদ্ধৃত হল—“গ্রন্থকার তাঁর প্রথম কাব্য-সংগ্রহ ‘তথী’র মুখবন্ধে নিজেকে পূর্বগামীদের ছায়ানুবর্তী বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতাগুলির মধ্যে অসামান্য স্বকীয়তার সন্ধান পান। ‘অর্কেষ্টা’ আরো মৌলিক; রূপে, রসে, হৃদে, অলঙ্কারে পুস্তকখানি এতই বিচित्र যে সকলেই বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সমস্বরে বলবেন, সুধীন্দ্রনাথ সত্যি বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম অগ্রণী। কারণ

‘অর্কেষ্ট্রা’র সনাতন ভাবাবেশের অভাব নেই বটে, কিন্তু তা সর্বত্রই সংযত, অধুনাতন মননশীলতাও বিদ্যমান, কিন্তু পরিমিত আকারে; এবং এই উভয় গুণের নিবিড় সম্মিশ্রণে কবির পরিণত জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতা যে অভিব্যক্তি খুঁজে নিয়েছে, তা যেমন উপযোগী, তেমনি উপভোগ্য।...গ্রন্থের নাম-কবিতাটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, এর সমকক্ষ, শুধু বঙ্গ-সাহিত্যে নয়, পশ্চিমী কাব্যেও দুর্লভ।”

অর্কেষ্ট্রার কবিতাবলী :

কবিতার নাম	রচনা কাল	প্রথম প্রকাশ
হেমঙ্গী	১ অক্টোবর, ১৯২৯, কুর হোটেল, রুমারবাদ, ডিসবাডেন	‘উত্তরা’ পত্রিকায়
চপলা	৮ অগাস্ট, ১৯২৯, কুর হোটেল, রুমার বাদ, ডিসবাডেন	‘অর্কেষ্ট্রা’, ১৩৪৩
অপচয়	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯, পাউলিনেনস্টিফ্ট, ডিসবাডেন	অর্কেষ্ট্রা, ১৩৪৩
কস্মে দেবায়	১১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯, পাউলিনেনস্টিফ্ট, ডিসবাডেন	‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় মে ১৩৩৯
পশুশ্রম	৩০ জুন, ১৯২৯, ১৩নং হাফমুন স্ট্রীট, লন্ডন	‘অর্কেষ্ট্রা’ ১৩৪৩
মূর্তিপূজা	৮ মে, ১৯২৯, এলিস্ এডিনিউ, শিকাগো	‘উত্তরা’-র
মহাসত্য	১৩ অগাস্ট, ১৯২৯, কুর হোটেল, রুমারবাদ, ডিসবাডেন	অর্কেষ্ট্রা ১৩৪৩
পুনর্জন্ম	১২ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯, কুর হোটেল, রুমারবাদ, ডিসবাডেন	অর্কেষ্ট্রা ১৩৪৩
ভবিতব্য বিফলতা	৯ ডিসেম্বর ১৯২৯, আরব সমুদ্র ১৪ জুন, ১৯২৯, এটলাণ্টিক মহাসাগর	‘পূর্বাশা’-র ‘পূর্বাশা’, কার্তিক ১৩৩৯
সঞ্চয়	১০ ডিসেম্বর, ১৯২৯, আরব সমুদ্র	অর্কেষ্ট্রা ১৩৪৩
অনুবন্ধ	১৪ এপ্রিল ১৯৩০	ঐ
মহাশেষতা	২১ এপ্রিল ১৯৩০	ঐ
প্রলাপ	১৮ এপ্রিল ১৯৩০	ঐ
উদ্ভাস্তি	৪ মার্চ ১৯৩১	ঐ
নাম	১৫ মে ১৯৩২	ঐ
জিজ্ঞাসা	২১ জানুয়ারি ১৯৩১	ঐ
সমাপ্তি	২০ মে ১৯৩১	ঐ

দৈন্য	১০ মার্চ ১৯৩১	ঐ
ধিকার	২৩ জানুয়ারি ১৯৩২	ঐ
সর্বনাশ	২৩ জানুয়ারি ১৯৩১	ঐ
মার্জনা	৯ মার্চ ১৯৩১	ঐ
শাস্তী	২৭ আগস্ট ১৯৩১	'পরিচয়'; কার্তিক ১৩৪০
বিস্মরণী	৩০ জানুয়ারি ১৯৩৩	'অর্কেষ্টা' ১৩৪৩
অর্কেষ্টা	১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২	'পরিচয়'; শ্রাবণ ১৩৩৯

৩. জ্বলন্তসী—১ম সংস্করণ, ১৩৪৪। পৃষ্ঠা—৭৮; কবিতা সংখ্যা—২৪, মূল্য—এক টাকা বারো আনা। প্রকাশক—শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী, ভারতী ভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা।

উৎসর্গ : হুমুসে হউস

বন্ধুবরেবু

* সুধীন্দ্রনাথ 'জ্বলন্তসী' কাব্য গ্রন্থের কোন ভূমিকা লেখেন নি। ভূমিকার বদলে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন।—“ওগো বনের অধিষ্ঠাতা আর তোমরা যত অন্য দেবতারা এখানে বিদ্যমান, আমার অন্তরঙ্গে সৌন্দর্য দাপ, আমার বাহ্য সম্পত্তিকে করো অন্তরের অনুকূল। যেন ভাষী জানী যে বিস্তারিত শুধু সেই; যেন আমার ভাগে ছোট্টে কেবল সেইটুকু সুবর্ণ যার ভার মিটাচারী ভিন্ন অপরের দুর্বল।”—ফীড্রাস, ২৭৯

জ্বলন্তসী কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের জ্যাকেটে ছাপা বিজ্ঞাপনটি সুধীন্দ্রনাথের লেখা বলেই অধ্যাপক স্বপন মজুমদার নির্দেশ করেছেন। সেই বিজ্ঞাপনের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল—“সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পাঠকসংখ্যা কত, তা বলা শক্ত। তবে তাঁর স্থান যে বাঙালী কবিদের প্রথম শ্রেণীতে, তাতে সন্দেহ মতদ্বৈত নেই।... আমাদের মতে বর্তমান পুস্তকে লেখকের গুণাবলী আরো পরিস্ফুট। সমগ্র গ্রন্থে বিষয় ও সুরের এক্য বজায় রাখতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথের বহুমুখী চিন্তবৃত্তির যে-সকল দিক 'অর্কেষ্টা' থেকে বাদ পড়েছিল, সেগুলির অভিব্যক্তিতে 'জ্বলন্তসী' সমৃদ্ধ। এখানকার কবিতাগুলিতে প্রকৃতি বা প্রেমসীর আবির্ভাব হয়তো বিরল; কিন্তু এতে যে-সব প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে, সেগুলির হৃদয়সংবেদ্য প্রকাশ অন্তত বাংলা কাব্যসাহিত্যে সুলভ নয়। অন্তর্গত অন্য ঐশ্বর্যের কথা না তুললেও, শুধু এইটুকুর জোরেই 'জ্বলন্তসী'র সমাদর হওয়া উচিত।”

'জ্বলন্তসী'র কবিতাবলী

কবিতার নাম রচনা কাল
উৎপাখী ২২ অক্টোবর ১৯৩৪

প্রথম প্রকাশ
পরিচয়ে; আঘাট ১৩৪৪

সন্ধান	১২ অক্টোবর ১৯৩৩	পরিচয়; শ্রাবণ ১৩৪১
সৃষ্টিরহস্য	১৫ নভেম্বর ১৯৩৩	পরিচয়; মাঘ ১৩৪০
প্রত্যাখ্যান	২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১	ক্রন্দসী, ১৩৪৪
জানুয়ার	২৭ জুলাই ১৯৩২	ক্রন্দসী, ১৩৪৪
বর্ষপঞ্চক	ফেব্রুয়ারি ১৯২৮	পরিচয়; কার্তিক ১৩৩৮
বর্ষশেষ	১৪ মার্চ ১৯৩১	ক্রন্দসী, ১৩৪৪
প্রতর্ক	১৪ জুন ১৯৩২	পরিচয়; শ্রাবণ ১৩৪০
কাল	১৯ জানুয়ারি ১৯৩২	ক্রন্দসী, ১৩৪৪
অকৃতজ্ঞ	২৩ জুন ১৯৩৩	কবিতা; চৈত্র ১৩৪৩
লখিমা	১৫ জুলাই ১৯৩৩	ক্রন্দসী, ১৩৪৪
বিরাম	৪ জুলাই ১৯৩২	ক্রন্দসী, ১৩৪৪
প্রশ্ন	১৮ জানুয়ারি ১৯৩২ প্রগতি (প্রগতি লেখক সংঘ),	১৩৪৪
প্রতীক	৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩	কবিতা; চৈত্র ১৩৪২
ছাতিস্বর	৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩	ক্রন্দসী, ১৩৪৪
নরক	৯ নভেম্বর ১৯৩৩	পরিচয়; কার্তিক ১৩৪১
কুকুট	অগাস্ট ১৯২৮	প্রবাসী; আশ্বিন ১৩৩৫
ভাগ্যগণনা	২৭ নভেম্বর ১৯৩৩	ক্রন্দসী, ১৩৪৪
মৃত্যু	২১ জুন ১৯৩১	ক্রন্দসী, ১৩৪৪
সিনেমায়	সেপ্টেম্বর ১৯২৮	পূর্বশা
সমাপ্তি	২০ জুন ১৯৩২	কবিতা; পৌষ ১৩৪৩
পর্যবর্ত	মে ১৯২৮	ক্রন্দসী ১৩৪৪
বাক্য	সেপ্টেম্বর ১৯২৮	ক্রন্দসী ১৩৪৪
প্রার্থনা	১৭ জুন ১৯৩২	কবিতা; আষাঢ় ১৩৪৪

৪. উত্তর ফানুসী—১ম সংস্করণ, ১৩৪৭।। পৃষ্ঠা—৬২; কবিতা-সংখ্যা—১৯। দাম উল্লেখ নেই। প্রকাশক—শ্রীকুম্ভভূষণ ভাদুড়ী, পরিচয় প্রেস, চবি, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা।

উৎসর্গ : সুমন্ত্র মহলানবিশের করকমলে

প্রচ্ছদ—যামিনী রায়

* কোন মুখবন্ধ বা ছমিকা নেই।

উত্তরফানুসী'র কবিতাবলী

কবিতার নাম	রচনাকাল	প্রথম প্রকাশ
শব্দরী	৮ এপ্রিল ১৯৩৭	নিরুত্তর; আশ্বিন ১৩৪৭
সংস্রম	৬ মার্চ ১৯৩৩	উত্তরফানুসী; ১৩৪৭
ব্যবধান	২ মে ১৯৩৩	কবিতা; পৌষ ১৩৪৬
প্রতিদান	২৮ জুলাই ১৯৩৩	উত্তরফানুসী; ১৩৪৭

মৌনব্রত	১৬ এপ্রিল ১৯৩৩	ঐ
নিরুপ্তি	৮ এপ্রিল ১৯৩৩	ঐ
অহৈতুকী	১২ জুলাই ১৯৩৩	ঐ
মরণতরী	৩০ জুলাই ১৯৩৩	ঐ
অননুতপ্ত	৫ নভেম্বর ১৯৩৩	পরিচয়; বৈশাখ ১৩৪১
প্রশ্ন	৪ অগাস্ট ১৯৩৩	উত্তরফাদুনী; ১৩৪৭
দুঃসময়	১ অগাস্ট ১৯৩৩	ঐ
জন্মান্তর	১ নভেম্বর ১৯৩৩	কবিতা; আশ্বিন ১৩৪২
বিলয়	১৩ নভেম্বর ১৯৩৩	উত্তরফাদুনী, ১৩৪৭
মহানিশা	৩ অগাস্ট ১৯৩৩	ঐ
আগরণ	১৭ নভেম্বর ১৯৩৩	কবিতা; আশ্বিন ১৩৪২
মাধবী পূর্ণিমা	২৮ জুন ১৯৩২	পরিচয়; কার্তিক ১৩৩৯
ডাক	২৩ নভেম্বর ১৯৩৩	কবিতা; চৈত্র ১৩৪২
বন্দন	৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২	পরিচয়; কার্তিক ১৩৩৯
প্রতিপদ	৫ এপ্রিল, ১৯৩৭	কবিতা; আশ্বিন ১৩৪৪

৫. সংকলিত—১ম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০; ২য় সংস্করণ, কার্তিক ১৩৬১।

পৃষ্ঠা—৭৪; কবিতা সংখ্যা—২৩। মূল্য—দুটাকা। প্রকাশক—শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা।

উৎসর্গ : আবু সয়ীদ আইয়ুব

বন্ধুবরের করকমলে—

নামপত্র—সত্যজিৎ রায়।

* সুধীক্ষনাধের লেখা ৩ পৃষ্ঠা মুখবন্ধ। নিচে মুখবন্ধের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল—“আমার কাব্য জিজ্ঞাসায় আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য; এবং জীব হিসাবে আমি বহির্জগতের অধীন বটে, কিন্তু এ-বইয়ে অসামান্য অনুভূতির অভাব শোচনীয়। এমন কি কোনও বিশিষ্ট স্রীতির ক্রমবিকাশ পর্যন্ত এ-পুস্তকে স্পিষ্ট নেই; এবং বিশ বৎসর যাবৎ আমি যদিও জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই, তবু এখনও আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরের বাধ সাধে। ফলত ছন্দোরসের খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ভাবার সংমিশ্রণ, নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তি বিপর্যয় ইত্যাদি বাংলা-কাব্যের অনেক অভ্যাসদোষ একাধিক কবিতায় রয়ে গেল...সে যাই হোক, মালামর্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অধিষ্ট : আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীকারূপেই বিবেচ্য।”

‘সংবর্ত’-এর কবিতাবলী

কবিতার নাম	রচনা কাল	প্রথম প্রকাশ
নান্দীমুখ	২৭ জুলাই ১৯৩৮	কবিতা; আশ্বিন ১৩৪৫
উপসংহার	২০ অক্টোবর ১৯৩৮	কবিতা; পৌষ ১৩৪৫
উজ্জীবন	২৬ অক্টোবর ১৯৩৮	পরিচয়; অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
জেনন	৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯	পরিচয়; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬
সংক্রাম	২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯	কবিতা; আষাঢ় ১৩৪৬
কান্তে	১১ মে ১৯৩৯	কবিতা; কার্তিক ১৩৪৬
জাতক-১	২২ জানুয়ারি ১৯৪০	কবিতা; আশ্বিন ১৩৪৭
জাতক-২	২২ মে ১৯৪০	সংবর্ত; জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০
সংবর্ত	৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০	ঐ
বিপ্লবাপ	২২ আগস্ট ১৯৪১	বৈশাখী (বার্ষিক) ১৩৫২
কঙ্করী	২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১	সংবর্ত; জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০
সোহংবাদ	২৬ এপ্রিল ১৯৪৫	পরিচয়; আষাঢ় ১৩৫২
১৯৪৫	১০ এপ্রিল ১৯৪৫	বৈশাখী (বার্ষিক) ১৩৫৩
বর্ষান্তি	১৮ মার্চ ১৯৫৩	কবিতা; চৈত্র ১৩৫৯
উন্মার্গ	১৪ এপ্রিল ১৯৫৩	সংবর্ত; জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০
প্রত্যাবর্তন	২৩ মে ১৯৫৩	ঐ

* প্রাক্তনী—পুনর্লিখিত কৈশোরিক কবিতা

পুনরাবৃত্তি	আদি রচনা : ১৭ মাঘ ১৩৩০	সাহিত্যপত্র; মাঘ ১৩৫৭
লগ্নহারা	আদি রচনা : ১৮ চৈত্র ১৩৩০	সাহিত্যপত্র; মাঘ ১৩৫৭
অসময়ে আহ্বান	আদি রচনা : ২৪ চৈত্র ১৩৩০	কবিতা; আষাঢ় ১৩৫৭
প্রত্যাখ্যান	আদি রচনা : ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১	সাহিত্যপত্র; বৈশাখ ১৩৫৮
প্রতিধ্বনি	আদি রচনা : ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩২	কবিতা; আষাঢ় ১৩৫৭
অনিকেত	আদি রচনা : ৪ আষাঢ় ১৩৩২	সাহিত্যপত্র; কার্তিক ১৩৫৭
পথ	আদি রচনা : ৫ চৈত্র ১৩৩৪	কবিতা; আশ্বিন ১৩৫৮

৬. প্রতিধ্বনি—১ম সংস্করণ; ফাল্গুন ১৩৬১।। পৃষ্ঠা—১০৬; কবিতা সংখ্যা—৫৫। মূল্য—আড়াই টাকা। প্রকাশক—শ্রীনিবাসীপট্টমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা।

উৎসর্গ : ইন্দিরা ও সুশীলকুমার দে-র

করকমলে—

* ‘প্রতিধ্বনি’ ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষা থেকে অনূদিত, ভূমিকা ও ভাব্য সম্বলিত ৫৫টি কবিতার সংকলন। ৩ পৃষ্ঠার উপর একটি ভূমিকায় সুশীলকুমার অনুবাদকর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেই ভূমিকা থেকে কিছু অংশ নিচে মুদ্রিত হল—

“আমার মতে কাব্য যোহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অন্বেষত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব; এবং ইংরেজীর ব্যাকরণস্বাচ্ছন্দ্য, গুণবাচক শব্দের প্রতি করাঙ্গীর মোহ, অথবা জার্মানের অম্বয়, তথা সমাসবাচ্ছন্দ্য, যদিচ বাংলাতে একেবারে দুর্লভ নয়, তবু ওই ভাষাশ্রয় আর বঙ্গবাহীর মধ্যে আকাশ পাতালের প্রভেদ বিদ্যমান।...ভাব ও ভাবার অবিচ্ছেদ্য সমীকরণই যে কবির একমাত্র কর্তব্য, এ-সত্যে পৌছিতে আমার অর্ধেক জীবন কেটে গেলেও, অপরিপক্কিত আত্মবিশ্বাসের প্রথম যুগেই আমি বুঝেছিলুম যে বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের বিধি-নিবেধ অকাট্য। অর্থাৎ বাংলা অনুবাদের ছন্দে ইংরেজী পঞ্চপার্বিকের একান্তর যৌক উপস্থিত কিনা, তা আপাতত বিবেচ্য নয় : আমাদের কানে ভালো না লাগলে, তার বৈচিত্র্য নিতান্ত অসার্থক; এবং চিত্রকল্পের বেলাতেও মাছি-মারা কেরাণী রসাতাস ঘটায়, অস্তীষ্ট আবেগ জাগিয়ে দর্শকের সাধুবাদ পায় না।...এবং যিনি চর্বিচর্বিপে সন্তুষ্ট নন, আপন মনের কথা মাতৃভাষায় ফুটিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর, তিনি যে-উপায়ে আত্মপ্রকাশের চাহিদা মেটান, অনুবাদের সাফল্য তারই ইতরবিশেষ।”

‘প্রতিশব্দ’-র কবিতাবলী

॥ ইংরেজী ॥

কবিতার নাম	মূল রচয়িতা	আদি রচনা ও পরিমার্জনা কাল	প্রথম প্রকাশ
প্রদীপ	হিউ মেনাই	১৯৩১ : ১৯৫০ কবিতা; আশ্বিন ১৩৬০	
মাকুরী	জন্ মেস্‌বীলড	১৩৯২ : ১৯৫৪ প্রতিশব্দ; ফাল্গুন ১৩৬১	
প্রদোষ	জন্ মেস্‌বীলড	১৩৯২ : ১৯৫৪	ঐ
স্বপ্নঘরাল	সীগ্‌ফ্রিড সসুন	১৯৩১ : ১৯৪৮	সাহিত্যপত্র; জ্যৈষ্ঠ
১৩৫৫			
কালতরী	ডি এইচ্‌ লরেন্স	১৯৩১ : ১৯৫০ প্রতিশব্দ; ফাল্গুন ১৩৬১	
উত্তর	সি-ফীল্ড-কৃত রুমির অনুবাদ	১৯৩১ : ১৯৫০	ঐ
পুন্ডেটি	উইলিয়াম শেক্সপীয়ার	১৯৩৪ : ১৯৫৪	ঐ
ফাঙ্কনী	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫২	ঐ
নিত্যসাক্ষী	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫২	ঐ
মিতাভাষী	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫২	ঐ
বিনিময়	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫৪	ঐ
শান্তিনিকেতন	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫২	কবিতা; পৌষ ১৩৪২
দুর্দিনের বন্ধু	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫২	কবিতা; পৌষ ১৩৪২
সাহসনা	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫২	কবিতা; চৈত্র ১৩৪৫
উত্তরাধিকারী	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫২	কবিতা; চৈত্র ১৩৪৫
সৌর ধর্ম	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫৪?	কবিতা; পৌষ ১৩৪৪
দুঃসময়	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫২	কবিতা; পৌষ ১৩৪৪

নির্বিকার	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫২	প্রতিধ্বনি; ফাঙ্কন ১৩৬১
তত্ত্বজ্ঞান	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫৪	প্রতিধ্বনি; ফাঙ্কন ১৩৬১
পূরষী	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫২	উত্তরসূরী; বৈশাখ ১৩৫৯
অবিনাশ	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫২	উত্তরসূরী; বৈশাখ ১৩৫৯
প্রশংসা	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫৪	প্রতিধ্বনি; ফাঙ্কন ১৩৬১
অনিবার্য	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫৪	প্রতিধ্বনি; ফাঙ্কন ১৩৬১
কলব্যাক্রা	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫৪	ঐ
অতিশয়	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫২	ঐ
কামরূপ	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫২	ঐ
মুম্বাই	ঐ	১ : ১৯৫৪	ঐ
জানপাণী	ঐ	১ : ১৯৫৪	ঐ
মৃত্যুঞ্জয়	ঐ	১৯৩৪ : ১৯৫৪	ঐ

॥ জার্মান ॥

জয়ন্তী	হান্স কারোসা	১৯৩১ : ১৯৫৩	ঐ
গোধূলী	হাইনরিখ হাইনে	১৯৪১ :	বৈশাখী (বার্বিক); ১৩৪৮
তত্ত্বকথা	ঐ	১৯৩১ : ১৯৫৪	বৈশাখী (বার্বিক); ১
মন্ত্রস্তি	ঐ	১৯৩১ : ১৯৪১	প্রতিধ্বনি; ফাঙ্কন ১৩৬১
অধঃপাত	ঐ	১৯৩১ : ১৯৪১	বৈশাখী (বার্বিক) ১৩৪৮
মায়ার বেলা	ঐ	১৯৩১ : ১৯৫৪	প্রতিধ্বনি; ফাঙ্কন ১৩৬১
অবিশ্বাসী	ঐ	১৯৩২ : ১৯৪১	সাহিত্যপত্র; কার্তিক ১৩৫৫
পরিবাদ	ঐ	১৯৩১ :	প্রতিধ্বনি; ফাঙ্কন ১৩৬১
প্রত্যাবর্তন	ঐ	১৯৩১ : ১৯৪১	কবিতা; আশ্বিন ১৩৪৮
আত্মপরিচয়	ঐ	১৯৩২ : ১৯৪১	নিরুক্ত; আশ্বিন ১৩৪৮
রোমহু	ঐ	১৯৩২ : ১৯৪১	কবিতা; চৈত্র ১৩৪৭
বর্ষশেষ	ঐ	১৯৩২ : ১৯৪১	কবিতা; চৈত্র ১৩৪৭
সূর্যাস্ত	ঐ	১৯৩২ : ১৯৪১	কবিতা; চৈত্র ১৩৪৭
স্মৃতিবিব	ঐ	১৯৩০ : ১৯৪১	নিরুক্ত; চৈত্র ১৩৪৭
মহাকাব্য	ঐ	১৯৩০ : ১৯৪১	প্রতিধ্বনি; ফাঙ্কন ১৩৬১
প্রমাদ	ঐ	১৯৩০ : ১৯৪১	ঐ
প্রারম্ভ	ঐ	১৯৩২ : ১৯৫৪	ঐ
বিদায় হোহান ভোল্ফ গাংগ কন্‌ গ্যেটে	ঐ	১৯৩২ : ১৯৫৪	ঐ
সুপ্রাতি	ঐ	১৯৩২ : ১৯৫৪	সাহিত্যপত্র; আষাঢ় ১৩৫৫

॥ ফরাসী ॥

আদিনাপ	পোল ভালেরি	১	কবিতা; আষাঢ় ১৩৬১
বাতসন	স্কেফান্‌ মালার্মে	১৯৩২ :	কবিতা; আশ্বিন ১৩৫৫
উচ্চীন	ঐ	১৯৩২ : ১৯৫৩	প্রতিধ্বনি; ফাঙ্কন ১৩৫৫
উৎকর্ষা	ঐ	১৯৩২ : ১৯৫৩	সেশ; ১৬ জুলাই ১৩৫৫
নীলিমা	ঐ	১৯৩২ : ১৯৫৪	নিরুক্ত; পৌষ ১৩৫৫
সমুদ্র সমীর	ঐ	১ : ১৯৫৩	প্রতিধ্বনি; ফাঙ্কন ১৩৫৫
কনের দিবাক্ষণ	ঐ	: ১৯৫৩	কবিতা; পৌষ ১৩৫৫

৭। দশমী—১ম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৩। পৃষ্ঠা—২৫; কবিতা সংখ্যা—
১০। মূল্য—একটাকা। প্রকাশক—শ্রীদিলীপকুমার শুণ্ড, সিগনেট প্রেস,
১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা।

উৎসর্গ : অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবরেবু—

*সুধীন্দ্রনাথ ‘দশমী’ কাব্যের কোন ভূমিকা লেখেন নি।

‘দশমী’-র কবিতাকালী.

কবিতার নাম	রচনাকাল	প্রথম প্রকাশ
প্রতীক্ষা	কলকাতা, ২৭ জুলাই ১৯৫৪	দশমী; বৈশাখ ১৩৬৩
নৌকাভূবি	কলকাতা, ১০ অক্টোবর ১৯৫৪	কবিতা; আশ্বিন ১৩৬১
অগ্রহারণ	কলকাতা, ২৬ জানুয়ারি ১৯৫৫	কবিতা; চৈত্র ১৩৬১
বটতরী	এস্. এস্. ব্লাইং ক্লাউড, লোহিত সাগর, ৩১ জানুয়ারি ১৯৫৬	দশমী; বৈশাখ ১৩৬৩
তীর্থ পরিক্রমা	ঐ, আরব্য সাগর, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬	কবিতা; চৈত্র ১৩৬২
ভূমা	কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬	কবিতা; চৈত্র ১৩৬২
উপহাণন	কলকাতা, ৬ মার্চ ১৯৫৪	দশমী; বৈশাখ ১৩৬৩
প্রত্যুত্তর	চিত্তরঞ্জন, ১১ মার্চ ১৯৫৬	দশমী; বৈশাখ ১৩৬৩
অসংগতি	কলকাতা, ১৮ মার্চ ১৯৫৬	ঐ
নষ্ট নীড়	কলকাতা, ৩১ মার্চ ১৯৫৬	ঐ

৮. ‘সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ’—১ম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৯ : মে
১৯৬২।

পৃষ্ঠা—৩৯৯; কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা—৭; কাব্য সংগ্রহে অর্কেষ্ট্রা, জন্মদাসী,
উত্তর ফাঙ্কনী, সংবর্ত, প্রতিধ্বনি, দশমী ও তর্কী এই ক্রমে গ্রন্থগুলি বিন্যস্ত
হয়েছে। দাম—বারো টাকা।

প্রকাশক—শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু, নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ,
কলকাতা ১৩। ভূমিকা—বুদ্ধদেব বসু।

*বুদ্ধদেব বসু লিখিত ১১ পৃষ্ঠার ভূমিকা ও ১৬ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট অংশ
কাব্য সংগ্রহের শুরুতে বাড়িয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে ‘পুরস্কার’ ‘অমৃত’, ‘মৃত্যুর
সময়’ ও টি. এস. এলিয়ট-এর বান্টি নটন—এই চারটি অগ্রহীত রচনা
সংযোজিত হয়েছে। “এর মধ্যে অর্কেষ্ট্রা পর্যায়ের ‘পুরস্কার’ কবিতাটি এবং
সুধীন্দ্রনাথের “সর্বশেষ সমাপ্ত অনুবাদ কবিতা, হান্স এগন্ হোলট্জেন-
এর ‘মৃত্যুর সময়’ ও টি. এস. এলিয়ট-এর বান্টি নটন-এর প্রথম অনুচ্ছেদের
দুটি অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল,
আর ‘অমৃত’ কবিতাটি ছাপা হয় অধুনালুপ্ত ‘চিম্বালী’ পত্রিকায়।

* সুধীন্দ্রনাথ ‘অর্কেষ্ট্রা’ তম সংস্করণের জন্য, ‘জন্মদাসী’ ২য় সংস্করণের
জন্য ও ‘সংবর্ত’ তম সংস্করণের জন্য যে সব পরিবর্তন বা পরিমার্জনা

করেছিলেন ‘কাব্য সংগ্রহ’ প্রথম সংস্করণে সেই সব পরিমার্জিত পাঠই গৃহীত হয়েছে।

* পরিশিষ্ট অংশে সুধীন্দ্রনাথের জীবন পঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া হয়েছে।

২য় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৭৩ : অক্টোবর ১৯৬৬। প্রকাশক—ভারতীয় প্রকাশ ভবন। ভূমিকা ও পরিশিষ্ট অংশ ১ম সংস্করণের অনুরূপ। ১ম ও ২য় সংস্করণে বুদ্ধদেব বসু নির্দেশিত পাঠ ও বানান সমতার নীতি মানা হয়েছে।

* ‘সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ’ ৩য় সংস্করণ অর্থাৎ “প্রথম দে’জ সংস্করণ : ১৩৮৩ শ্রাবণ, জুলাই ১৯৭৬।” প্রকাশক—সুধাংশু শেখর দে, দে’জ পাবলিশিং, ৩১/১ বি মহাশ্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। পৃষ্ঠা—৪৩৮। দাম : পঁচিশ টাকা। পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪। পৃষ্ঠা—৪৬০।

প্রথম দে’জ সংস্করণেও সম্পাদকের নাম বিজ্ঞাপিত হয় নি। “পূর্বতন সংস্করণের পাঠ অবিকৃত রেখে এই সংগ্রহে সংযোজিত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ পাঠভেদ, কবিতার নাম ও প্রথম পংক্তির সূচি, বিভিন্ন সংস্করণের প্রচ্ছদ চিত্র এবং সুধীন্দ্রনাথের লেখা ‘অর্কেস্ট্রা’ ও ‘জন্দসী’র বিজ্ঞাপন।” প্রথম দে’জ সংস্করণের ‘সংযোজন’ অংশ অধ্যাপক স্বপন মজুমদারের সংকলন; বস্তুত তিনিই এই সংস্করণের সম্পাদক।

প্রবন্ধগ্রন্থ

১. স্বপ্নত—প্রথম সংস্করণ ১৩৪৫। ভারতী ভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে শ্রী কুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—২২৯; প্রবন্ধ সংখ্যা—১৯। দাম—আড়াই টাকা। (২।।)।

উৎসর্গ : ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের করকমলে

* ‘সূচনা’ নামে ৯ পৃষ্ঠা ভূমিকা সম্বলিত :

প্রবন্ধের নাম (প্রথম প্রকাশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য) : *১. কাব্যের মুক্তি (পরিচয়; ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, শ্রাব ১৩৩৮; প্রবন্ধ)। ২. প্রপদ-খেয়াল (পরিচয়; ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৮; পুস্তক-পরিচয় : Edith Sitwell ও Robert Frost-এর Collected Poems)। ৩. ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ (পরিচয়; ২ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৯; প্রবন্ধ)। ৪. ডি-এইচ লরেল ও ভজিনিয়া উলফ (পরিচয়; ১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৯; পুস্তক-পরিচয় : ‘The Man Who Died’ ও ‘The Waves’)। ৫. ফরাসীর হার্দ্য পরিবর্তন (পরিচয়; ২ বর্ষ, ২ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৯; পুস্তক-পরিচয় : Paul Morand, Anre Mourois ও Francois Mauriac-এর তিনটি গ্রন্থ)। ৬. উইলিয়ম ফক্‌নর (পরিচয়; ৩ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, মাঘ ১৩৪০; পুস্তক-পরিচয় : ৪টি গ্রন্থের

আলোচনা)। ৭. উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য (পরিচয়; ২ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪০; পুস্তক-পরিচয় : Hermann Broch ও John Doss Passos-এর দুটি গ্রন্থ)। ৮. মাক্সিম গর্কি (পরিচয়; ৬ বর্ষ ৩ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৩; সম্পাদকী)। ৯. দোতানা (পরিচয়; ৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৪; পুস্তক-পরিচয় : 'Pie in the sky' ও 'The Wheel Turns')। ১০. বর্নার্ডশ (পরিচয়; ১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৩; সম্পাদকী)। ১১. লিটন স্ট্রেচি (পরিচয়; ৬ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৯; পুস্তক-পরিচয় : Portraits in Miniature)। ১২. উইলিয়াম শ্যুইস ও এল্লা পাউণ্ড (পরিচয়; ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪২; পুস্তক পরিচয় : Men Witjout Art ও make It New-দুটি গ্রন্থ)। ১৩. ঐতিহ্য ও টি-এস এলিয়ট (পরিচয়; ৪ বর্ষ ১ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪১; প্রবন্ধ)। ১৪. ডব্লু-বি গ্রেটস্ ও কঙ্গাক্বেল্যা (পরিচয়; ৬ বর্ষ ৫ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩; পুস্তক-পরিচয় : Dramatis Personae ও A Full Moon in March—২টি গ্রন্থ)। ১৫. জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স (পরিচয়, ৬ বর্ষ ৩ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৩; পুস্তক-পরিচয় : The Note book and Papers of Gerard Manley Hopkins—Humphry House)। ১৬. “বাংলা ছন্দের মূল সূত্র” (পরিচয়; ২ বর্ষ ৪ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪০; পুস্তক-পরিচয় : বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়)। ১৭. “অস্তঃশীলা” (বিচিত্রা; ৯ বর্ষ ১ খণ্ড ৩ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪২; পুস্তক আলোচনা : ধুজ্জটিপ্রসাদ ও অধিকারভেদ)। ১৮. ‘চোরাবালি’ (বিষ্ণু দে-র লেখা ‘চোরাবালি’ কাব্যগ্রন্থের সুধীন্দ্রনাথের লেখা ‘মুখবন্ধ’, ৬ আশ্বিন ১৩৪৪)। ১৯. সূর্যবর্ত (পরিচয়; ৬ বর্ষ ১ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৩; সম্পাদকী)।

* ‘স্বগত’-এর প্রথম প্রবন্ধ ‘কাব্যের মুক্তি’ পরিচয়-এ প্রকাশিত হওয়ার আগে, ১৯২৮-এ কবি বিষ্ণু দে-র উদ্যোগে একটি ছোট সাহিত্য সভায় পঠিত হয়। এ সম্পর্কে বিষ্ণু দে লিখেছেন—“১৯২৮-এ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে পরে যার নাম ছাপা হল কাব্যের মুক্তি পাঠ করাতে রাজি করাই। অতুল গুপ্তকে সভাপতি করে ঘরোয়া বৈঠকে (তেতুলার এক ঘরে সতরঞ্চিতে বসে) ৮/১০ জন নব যুবক শ্রোতা। ‘কাব্যের মুক্তি’র প্রথম প্রয়াস। পরে অনেক বদল করেন।” (অরুণ সেনের ‘এই মৈত্রী! এই মনান্তর’ গ্রন্থ থেকে পুনরুদ্ধৃত)। “Eliot-সম্বন্ধে একটা সারগর্ভ প্রবন্ধ” লেখার জন্য বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথকে যে-অনুরোধ করেছিলেন ‘কাব্যের মুক্তি’ প্রবন্ধটি মোটামুটি তারই ফলশ্রুতি। “বিষয় অবশ্য নিছক এলিয়ট নয়, সামগ্রিকভাবে এলিয়ট-অনুপ্রাণিত নতুন কাব্যনন্দনের সপক্ষে একটা জোরালো যুক্তি।”—(ঐ, পৃষ্ঠা ৪)।

-২. স্বগত : দ্বিতীয় (পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত) সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬৪। প্রকাশক : শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড,

কলকাতা ২০। ‘সূচনা’ ও ‘পুনশ্চ’ ছাড়া পনেরোটি প্রবন্ধ; প্রাসঙ্গিক মন্তব্য : “স্বগত”—এর প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুটো প্রবন্ধ এবং তিনখানা বাংলা বইয়ের সমালোচনা সমিবিষ্ট হয়েছিল। তারপর গ্রন্থকার কবিগুরু তথা বঙ্গসাহিত্য সম্পর্কে আরও কয়েকবার লিখেছেন; এবং সেগুলো “স্বগত”—এর অন্তর্গত রচনাবলীরই সংগোহ। কিন্তু “স্বগত” বর্তমানেও এমন অতিকায় যে, আবার তার কলেবর বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নয়; এবং সেই জন্যে নূতন সংস্করণ থেকে প্রাপ্ত পাঁচটা লেখা বাদ পড়ল। তৎপরিবর্তে অল্ডাস্ হাক্সলি ও ওমানির প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধ এখানে স্থান পেলে; এবং সেটার বিষয় যেহেতু বিদেশী সাহিত্য, তাই উপস্থিত সংগ্রহে তার প্রবেশ অনধিকার নয়। “পুনশ্চ”ও আগন্তুক; তবে তার আবির্ভাব উপলক্ষ্যটিত ব’লে, সে কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে না।’ সূচি : সূচনা, কাব্যের মুক্তি, প্রপদ-খ্যোদ, ডি. এইচ্ লরেন্স ও ভার্জিনিয়া উল্ফ, ফরাসীর হার্ম্য পরিবর্তন, উইলিয়ম্ ফক্নর, উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য, মাক্সিম্ গোর্কি, দোতানা, গুরুচণ্ডাল, বনার্ভ শ, সিয়ন্ স্ট্রেচি, ইউভাম্ লুইস্ ও এল্লা পাউণ্ড, ঐতিহ্য ও টি. এস্ এলিয়ট্, ডব্লু. বি. য়েট্‌স্ ও কলাকৈবল্য, জেরার্ড্ ম্যানলি হপকিন্স, পুনশ্চ। ‘স্বগত’ দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত নতুন প্রবন্ধ দুটি ‘গুরুচণ্ডাল’ ও ‘পুনশ্চ’। ‘গুরুচণ্ডাল’ প্রবন্ধটি আসলে ‘পরিচয়’ পত্রিকার ৯ বর্ষ, ২ খণ্ড ২ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৬ ও ৯ বর্ষ ২ খণ্ড ৫ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭-এর পুস্তক-পরিচয় বিভাগে প্রকাশিত Aldous Huxley-র After Many a Summer ও F. D. Ommamey-র North Cape নামের দুটি বই-এর আলোচনার মিশ্রিত রূপ।

‘পুনশ্চ’ রচনাটি আসলে “স্বগত” গ্রন্থের আলোচনা পদ্ধতি ও গদ্যরীতি সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের মতামত। “স্বগত-এর প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধ সত্য সত্যই নিজের সঙ্গে বাদানুবাদ; এবং আপন ভুল-ভ্রান্তির উচ্ছেদ সে-তর্কের মুখ্য অভিপ্রায় বলে, সেখানে বক্তার চেয়ে বক্তব্য বড়। ফলত আমার অল্পবয়স্ক গদ্যে, রূপের আভাস না থাক, রীতির ইঙ্গিত হয়তো আছে...।”

* ‘স্বগত’ দ্বিতীয় সংস্করণের মলাটের শেষে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে—“বাংলার মনীষা আসলে স্বভাব নির্গর্হ নয়।’ আদ্যোপান্ত সযত্নে মার্জিত এই নতুন সংস্করণে আলোচ্য বিষয় বিদেশী সাহিত্য; আলোচ্য লেখক এলিয়ট্, পাউণ্ড, য়েট্‌স্ থেকে শুরু করে শ, গোর্কি, ফক্নর এবং আরও অনেকে। এ-সব প্রবন্ধ লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ একলা লিখেছিলেন—‘তত্ত্বসাহিত্যে তাঁর জ্ঞান আছে তবু তিনি তত্ত্বজ্ঞানী নন, তিনি আর্টিস্ট।’ আধুনিক বাংলা প্রপদী গদ্য রচনার ক্ষেত্রে এক অসামান্য কীর্তি এই প্রবন্ধাবলী।”

৩. কুলায় ও কালপুরুষ : প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬৪। প্রকাশক—

দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা। পৃষ্ঠা—২৭১; প্রবন্ধ সংখ্যা—১৯। দাম ৫.৫০ টাকা। প্রচ্ছদ—সত্যজিৎ রায়।

উৎসর্গ : আমার প্রথম শ্রোতাদের মধ্যে যিনি সহযোগে ও অনুকম্পায় অধিতীয় সেই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রী করকমলে।

*‘কুলায় ও কালপুরুষ’-এ ১০ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি ‘মুখবন্ধ’ ও ১৯টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে ‘ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ’, ‘সূর্য্যবর্ত’, ‘অন্তঃশীলা’, ‘চোরাবালি’ ও ‘বাংলা ছন্দের মূল সূত্র’—এই ৫টি লেখা ‘স্বগত’ প্রথম সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। এগুলি আর ‘স্বগত’ দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এই ৫টি লেখার প্রথম প্রকাশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ গ্রন্থের বাকী ১৪টি প্রবন্ধের নাম, প্রথম প্রকাশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য নিচে দেওয়া হল—

১. রবীন্দ্র-প্রতিভার উপক্রমণিকা (পরিচয়; ৯ বর্ষ ১ খণ্ড ৪ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৬; পুস্তক-পরিচয় : রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড)। ২. রবিশস্য (পরিচয়; ১০ বর্ষ ১ খণ্ড ২ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৭; পুস্তকপরিচয় : রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্বিতীয় পর্যায়—রবীন্দ্ররচনাবলী ২য় ও ৩য় খণ্ড)। ৩. দিনান্ত (পরিচয়; ১১ বর্ষ ১ খণ্ড ২ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৮; প্রবন্ধ)। ৪. উক্তি ও উপলব্ধি (‘বৈশাখী’-বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৫৩, প্রবন্ধ)। ৫. শিল্প ও স্বাধীনতা (পরিচয়; ৭ বর্ষ ১ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৪; প্রবন্ধ)। ৬. মনুষ্য ধর্ম (পরিচয়; ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৯; প্রবন্ধ)। ৭. অদ্বৈতের অত্যাচার (পরিচয়; ৪ বর্ষ ২ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪১; পুস্তক-পরিচয় : Beauty ad other Forms of Value—S. Alexander)। ৮. বিজ্ঞানের আদর্শ (পরিচয়; ৫ বর্ষ ৪ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৩; সম্পাদকী)। ৯. উদয়াস্ত (পরিচয়; ৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা, মাঘ ১৩৪২; সম্পাদকী)। ১০. আঠারো শতকের আবহ (পরিচয়; ১০ বর্ষ ১ খণ্ড ১ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৭, পুস্তক-পরিচয় : The Grand Whiggery—Majorie Villiers)। ১১. ভিক্টোরীয় ইংলণ্ড (পরিচয়; ৭ বর্ষ ২ খণ্ড ৪ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৫, প্রবন্ধ)। ১২. অনার্য সভ্যতা (পরিচয়; ৯ বর্ষ ১ খণ্ড ৪ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৬; পুস্তক-পরিচয় : Moses and Monotheism—Sigmond Freud)। ১৪. প্রগতি ও পরিবর্তন (চতুরঙ্গ; ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৫; প্রবন্ধ)।

৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ—প্রথম সংস্করণ, কার্তিক ১৩৯০। প্রকাশ—ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশনের পক্ষে অরুণকুমার গুপ্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৩২। প্রচ্ছদপট—পূর্ণেন্দু পত্নী।

দাম—৪০.০০ টাকা।

সম্পাদক : অমিয় দেব।

* ‘সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধগ্রন্থ মাত্র দুটি, ‘স্বগত’ ও ‘কুলায় ও কালপুরুষ’। ‘স্বগত’ বেরোয় ১৯৫৭-তে। উভয় গ্রন্থই বহুদিন অমুদ্রিত; এই সংগ্রহ তাদেরই পুনর্মুদ্রণ। কেবল একটি নূতন প্রবন্ধ এতে যোগ হয়েছে, ‘স্বগত’ দ্বিতীয় সংস্করণ ও ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ প্রকাশের পরে লেখা, তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে।”—(ভূমিকা—অমিয় দেব)। প্রবন্ধ সংগ্রহে সংযোজিত এই রচনাটির নাম ‘বুড়োর চোখে রাগী ছোকরার দল’। রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘দেশ’ পত্রিকার ২৭ বর্ষ, ৭ মে ১৯৬০, ২৮ বৈশাখ ১৩৬৭ সাহিত্য সংখ্যায়।

* ‘সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ’-এ ‘স্বগত’ দ্বিতীয় সংস্করণের ও ‘কুলায় কালপুরুষ’-এর প্রথম সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে।

The World of Twilight

Essays and Poems by Sudhindranath Dutta

Publ. Indian Branch OXFORD UNIVERSITY PRESS

Bombay, Calcutta, Madras—1970

Foreword : Malcolm Muggeridge

Introduction : Edward Shils

Contents

Part One :

1. The World of Twilight : Early Chapters from an unfinished Autobiography; 2. Calcutta; 3. Jamini Roy and the Tradition of Painting in Bengal.

Part Two :

1. The Emancipation of Poetry (translated from Bengali by Edward Dimock and A.T.M. Anisuzzaman); 2. The Emancipation of Metre and Rabindranath (translated from Bengali by Ketaki Kushari Dyson); 3. The Bengali Novel : With special reference to Dhurjatiprasad Mukhopadhyaya's ‘Antahshila’ (translated from Bengali by Ketaki Kushari Dyson); 4. W. B. Yeats and Art for Art's Sake (translated from Bengali by Edward Dimock and A.T.M. Anisuzzaman); 5. A poet of Bengali—Bishnu Dey (translated from Bengali by Ketaki Kushari Dyson); 6. An Introduction to Rabindranath's Genius (translated from Bengali by Ketaki Kushari Dyson); 7. Utterance and Realization : The Tradition of Writing in Bengali (translated from Bengali by Ketaki Kushari Dyson); 8. Tagore as a Lyric Poet; 9. Hugo and others.



ପରିଚୟ ଓ ସୁସିଦ୍ଧିନାଥ

পরিচয়

শ্রী ১১১ নং, ১১১ নং
১১১, ১১১

স্বাধীন
স্বাধীন
স্বাধীন

স্বাধীন
স্বাধীন



স্বাধীন স্বাধীন

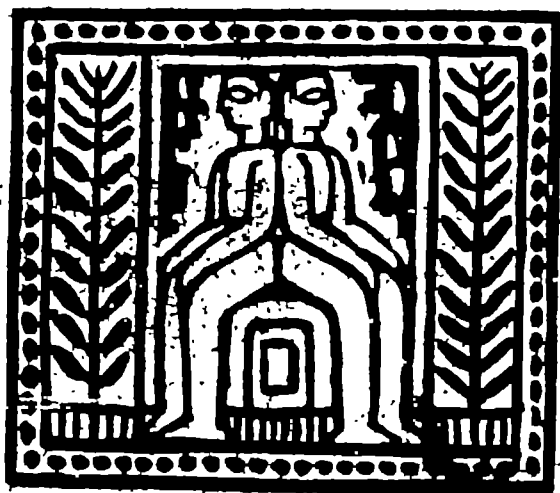
স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন
স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন
স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন
স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন

পঞ্চম বর্ষ
১ম বৃত্ত,
১ম সংখ্যা
আবণ, ১৩৪৫

পারিচয়

বার্ষিক
৬/-
প্রতি সংখ্যা।

সম্পাদক :- শ্রীমতী সুনীতা দেবী ।



বাংলায় নির্ভরযোগ্য—কীর্তিস্থল—সুশিক্ষিত
বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অ্যান্ড রিগ্রাল প্রপার্টি কোং লিমিটেড

কেন্দ্রীয়—আবদার প্রভিন্সের ১—হোল লাইক—১৩, ওয়াটসন—১৪,

নিম্নোক্ত পাঠ্যে স্থিতি—বীজবাহী কর্মপ্রকার অবিকার পান

যেত অবিল—২৫৫ চার্টার জেন্স, কলিকাতা।

ଶ୍ରୀ ଦ୍ଵାଦଶ

ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ

୨୨୩, ୨୨୪, ୨୨୫

ମାଲିକ-୨୫୫

-ବାସିକ ୧୦, ବାସିକ ୧୦-

ବିଷୟ ଗୁଣ

ବିଷୟର ଆଧିକାରୀ	...	ବିଷୟର ଆଧିକାରୀ
ଆଧାର କଥା	...	ବିଷୟର ଆଧାର
ଯୋଗ୍ୟତା (ଉପକ୍ରମ)	...	ବିଷୟର ଆଧାର
ଆଧାରର ନାମ-ନାମାଦି ଓ ପଦାଦି	...	ବିଷୟର ଆଧାର
ବିଷୟର ଆଧାର	...	ବିଷୟର ଆଧାର
ବିଷୟର ଆଧାର	...	ବିଷୟର ଆଧାର
ବିଷୟର ଆଧାର	...	ବିଷୟର ଆଧାର
ବିଷୟର ଆଧାର	...	ବିଷୟର ଆଧାର
ବିଷୟର ଆଧାର	...	ବିଷୟର ଆଧାର
ବିଷୟର ଆଧାର	...	ବିଷୟର ଆଧାର
ବିଷୟର ଆଧାର	...	ବିଷୟର ଆଧାର

ପୁସ୍ତକ-ପାଠିକ

ବିଷୟର ଆଧାର, ବିଷୟର ଆଧାର, ବିଷୟର ଆଧାର

ଆଧାରର ଆଧାର-ଆଧାର-ଆଧାର-ଆଧାର

ବିଷୟର ଆଧାର

ବିଷୟର ଆଧାର-ଆଧାର-ଆଧାର-ଆଧାର

ବିଷୟର ଆଧାର-ଆଧାର-ଆଧାର-ଆଧାର

পৰিচয়

ত্ৰৈমাসিক
পত্ৰিকা

গতি সংখ্যা

১২
বাৰ্ষিক
৪১০

শ্রবণ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮

বিষয় সূচী

পৰিচয়	
কাজৰক্ষণৰ অৰ্থেভাষা	.. ঐনুৱীয়েখনাৰ ৪৪
বৌদ্ধধৰ্মৰ মান:	... ঐনুৱীয়েখনাৰ ৪৫
কৰোণাৰ সূতি	.. ঐনুৱীয়েখনাৰ ৪৬
কৰ বিস্ময়েৰ পটভূমিকা	... ঐনুৱীয়েখনাৰ ৪৭
বিজ্ঞানৰ সৰ্ব	.. ঐনুৱীয়েখনাৰ ৪৮
শিৱীৰ বাধা	.. ঐনুৱীয়েখনাৰ ৪৯
শ্ৰেয়স	.. ঐনুৱীয়েখনাৰ ৫০
হিন্দুধৰ্মী ও বালাপান	... ঐনুৱীয়েখনাৰ ৫১
কবিতাওক	.. ঐনুৱীয়েখনাৰ ৫২
বিজ্ঞান (মাক্সিমেল গেল)	... ঐনুৱীয়েখনাৰ ৫৩
বীজবোৰ পৰ	.. ঐনুৱীয়েখনাৰ ৫৪

পুস্তক পৰিচয়

ঐনুৱীয়েখনাৰ বাৰ, ঐনুৱীয়েখনাৰ তট্টাচাৰ্য, ঐনুৱীয়েখনাৰ বেদান্ততীৰ্থ,
ঐনুৱীয়েখনাৰ সূত্ৰোপাখ্যান, ঐনুৱীয়েখনাৰ মৌলিক, ঐনুৱীয়েখনাৰ তট্টাচাৰ্য,
ঐনুৱীয়েখনাৰ বসু—ইত্যাদি।

সংগ্ৰহক—ঐনুৱীয়েখনাৰ বসু

পরিচয়

অভিনব ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী

“পরিচয়” চতুর্থ বর্ষ।

শ্রাবণ হইতে বর্ষ শুরু করিয়া প্রত্যেক তৃতীয় মাসের—
অর্থাৎ শ্রাবণ, কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখের—১লা তারিখে
“পরিচয়” বাহির হইবে। মূল্য বার্ষিক সভাক ৪।০, প্রতি
সংখ্যা ১, ডাকমাস্তুল স্বতন্ত্র। “পরিচয়ে” প্রকাশের জন্য রচনা
কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার। প্রাপ্ত
রচনা প্রকাশের, বা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায়
প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যতা থাকিবে না। ঠিকানা ও
ডাকটিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া
হইবে।

বিজ্ঞাপনের প্রতি সংখ্যার মূল্য

সাধারণ প্রতি পৃষ্ঠা ২০ টাকা

” অর্ধ পৃষ্ঠা ১১ ”

” সিকি পৃষ্ঠা ৬ ”

বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য
পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও
ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যিক।

প্রবন্ধাদি, বিনিময় পত্রিকাদি, চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, চেক ও বিজ্ঞাপন
ইত্যাদি পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা ঃ—

শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী

পরিচালক—“পরিচয়”

৭ নং আর. জি. কর রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

পরিচয়

Parichaya

ত্রৈমাসিক
পত্রিকা

STEPHEN HOUSE
ROOM NO. 17
4 & 5, DALHOUSIE SQ
CALCUTTA

সবিনয় নিবেদন,

আজ পরিচয়ের এক বৎসর পূর্ণ হইল। পরিচয় অর্থকরী পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয় নাই। বিশ্বের পরিশীলন-সম্পদের সহিত বাঙালী পাঠকের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন কল্পে তাহার জন্ম। এই উচ্চাদর্শ এখনও কতদূরে তাহা আমরা জানি; কিন্তু এই গন্তব্যে উপনীত হইতে হইলে আপনাদের মত বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগীর সহানুভূতি, সহযোগ ও সমর্থন অপরিহার্য। অতএব আমরা সর্বাত্মকরূপে আশা করি যে ১৩৩৯ সালে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া, বছরগুলির মধ্যে আমাদের আদর্শ প্রচার করিয়া এবং রচনা ও সুনির্দেশ দিয়া আপনারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

আগামী বৎসরে বাঁহারা গ্রাহক থাকিতে একাত্তাই অনিচ্ছক তাঁহারা দয়া করিয়া ১লা জ্যৈষ্ঠের পূর্বে তাঁহাদের মনোভাব জানাইলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব। বাঁহাদের নিকট হইতে এরূপ কোন পত্রাদি পাওয়া বাইবে না, তাঁহারা গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছক জানিয়া আগামী বর্ষের প্রথম সংখ্যা ডি-পি বোলে প্রেরিত হইবে। ডি পি ফেরৎ আসিলে আমরা কতদূর কৃতজ্ঞ হইব তাহা বলাই বাহুল্য।

গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্বক আগামী বর্ষের বার্ষিক মূল্য চারি টাকা চারি আনা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইয়া দিলে তাঁহাদেরও ব্যয়সংক্ষেপ হইবে এবং আমরাও উপকৃত হইব। মনিঅর্ডার কূপনে "পরিচয়" নাম ও ঠিকানা থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই সঙ্গে "পরিচয়" সম্বন্ধে সাময়িক পত্রের মতামত ও "পরিচয়"র উদ্দেশ্য আপনাদিগকে জ্ঞাত করাইতেছি।

হুতি—

বিনীত—

শ্রী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সম্পাদক

আমি এক বৎসরের জন্য "পরিচয়"র গ্রাহক হইতে সম্মত আছি। এ-অন্য মনিঅর্ডার ৪০ পাঠাইলাম।

আমাকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন। ডাকে ডি, পি, বোলে পত্রিকা পাঠাইয়া

নাম—

ঠিকানা—

অনাবশ্যক অংশ কাটিয়া দিবেন

পরিচয় ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সংকলন ও সম্পাদনা : অমিয় ধর

সংকল্প

স্বাস্থ্য-সংস্কারের জন্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৩৩৫ সনে (ইং ১৯২৯) রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন। “সুস্থ দেহে তিনি দেশে ফিরলেন বিদেশী ছাঁচে-ঢালা মনের ওপর বিদেশী সমাজ ও সংস্কৃতির পাণিশ লাগিয়ে ও মাতৃভাবকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাহিত্য-সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে”—(হিরণকুমার সান্যাল; ‘পরিচয়-এর কুড়ি বছর’/পৃ. ৩)। ইউরোপ থেকে ফেরার কিছুদিন পরে সুধীন্দ্রনাথের বাসনা হ’ল—ইংরাজী বা ফরাসী ‘রিভিউ’-এর আদলে একটি উচ্চাদর্শের সাময়িকপত্র প্রকাশের। উদ্দেশ্য—“বিশ্বের পরিশীলন-সম্পদের সহিত বাঙালী পাঠকের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন।”—(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রচারিত—‘সবিনয় নিবেদন’; ‘পরিচয়’, বৈশাখ ১৩৩৮)। সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুরা, তাঁর এই সংকল্পের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। এ বিষয়ে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, “এ যুগের আধুনিকতম চিন্তাধারার সঙ্গে এ দেশের চিন্তাশীলদের চিন্তা-সংযোগ” গড়ে তোলার জন্য “ফরাসীদের একখানি প্রসিদ্ধ রিভিউয়ের অনুরূপ” সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করে তিনিও সুধীন্দ্রনাথের পত্রিকা-প্রকাশের উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন।—(পরিচয়; মে-জুলাই, ১৯৮১/পৃ. ২৬)।

উদ্যোগ-আয়োজন

“মননশীল হলেও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত নন”; তাই পিতা ধীরেন্দ্রনাথ, অনুজ হরীন্দ্রনাথ, সমবয়সী নিকট আত্মীয় ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ও মেসোমশায় চরুচন্দ্র দত্তের কাজ থেকে আর্থিক ও আর্থিক সমর্থনের নিশ্চিত আশ্বাস পেয়েই পত্রিকা-প্রকাশে অগ্রসর হয়েছিলেন। তা-ছাড়া একথাও তিনি বিলম্বিত জানতেন যে, “প্রমাণ-সই একটি পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ লোকবল ছাড়া অসম্ভব।” বন্ধু গিরিজাপতি ভট্টাচার্য লোকবল সংগ্রহ করে দিলেন। “এই লোকবলের বলিষ্ঠতম লোক ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়।”

গিরিজাপতি তাঁর বাল্যবন্ধু শ্যামলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কেও যুক্ত করলেন এই উদ্যোগের সঙ্গে। নীরেঙ্গনাথের মধ্যস্থতায় পরিচয়ের প্রথম সংখ্যা থেকেই যুক্ত হলেন সুশোভন সরকার ও বিষ্ণু দে আর দ্বিতীয় সংখ্যার প্রস্তুতি পর্বে যোগ দিলেন শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ও হিরণকুমার সান্যাল।

সুশোভন সরকার লিখেছেন,—

“আমি তখন ঢাকায় কাজ করি, ছুটি কাটাই কলকাতাতে।...শুনলাম ‘পরিচয়’ নামে এক ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করা হচ্ছে। নীরেঙ্গনাথ রায় আমাকে ধরলেন একটা প্রবন্ধের জন্য, প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হবে। আড়ষ্ট শুদ্ধ বাংলায় লিখলাম ‘রূপ বিপ্লবের পটভূমিকা।’ চিঠি ছাড়া আগে কখনও বাংলাতে কিছু লিখিনি। আমার খুবই সংকোচ হয়েছিল, অবাক হলাম যখন শুনেতে পেলাম লেখাটি মনোনীত হয়েছে। একদিন সুধীন্দ্রনাথের বাড়িতে গেলাম, তিনি দেখালেন প্রথম সংখ্যার ‘ডামি’।...ছুটির পর ঢাকায় গিয়ে একদিন মুদ্রিত প্রথম সংখ্যা পেলাম।...এরপর যখনই ছুটিতে কলকাতায় আসতাম, তখনই পরিচয়ের শুক্রবাসরীয় বৈঠকে হাজির হতাম।”—(সুশোভন সরকার; পরিচয়; মে-জুলাই ১৯৮১)

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন—

“ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘পরিচয়’-এর প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়ে গেছে। বঙ্গ বাসী কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক নীরেঙ্গনাথ রায় আমাকে এক বুধবারে একটি পরামর্শ-চক্রে যোগ দিতে নিয়ে যান। তিনিও পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং প্রথম সংখ্যার ভূমিকাটি তাঁরই লেখা। তিনি ভেবেছিলেন যে বাংলা ভাষায় লেখার অভ্যাস সঙ্গেও আমি আমার প্রকৃতিগত উৎসাহে, নানাভাবে কাজে আসতে পারি। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সবটাই পূর্ব আফ্রিকার পর্বতাক্ষর ও উড়িষ্যার গহন বনে কাটিয়ে স্বভাবতই লাজুক ও স্বল্পভাষী ছিলাম এবং বোধকরি সেই একমাত্র মূলধন সম্বল করে হাজির হতে সুধীন্দ্র আকৃষ্ট হন। মিষ্টি হেসে বলেন, ‘নীরেনবাবু বলছিলেন আপনার বাংলায় লেখা অভ্যাস নাই। নাই বা লিখলেন। আমাদের অনেকরকম সাহায্যে আসতে পারেন। আপনি আমাদের শুক্রবাসী আসরে নিয়মিত আসুন। অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে’।...আমি সুধীন্দ্রর আমন্ত্রণ সাগ্রহে গ্রহণ করি।...আমাকে ‘পরিচয়’-এর মত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পত্রিকার লেখকে পরিণত করার অসাধ্যসাধনে তাঁর অবদান ছিলো বিস্ময়কর—অস্তুত আমার কাছে।”—(‘পরিচয় ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত’—শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ; ‘সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও সাহিত্য’ গ্রন্থে সংকলিত/পৃ.

পরিচালকমণ্ডলী

লোকবল সংগ্রহের পর উদ্যোক্তরা পত্রিকার একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠন করেছিলেন। পত্রিকা-প্রকাশের পরিকল্পনার সঙ্গে প্রথম থেকে যারা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে চারুচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, হুজুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও গিরিজাপতি ভট্টাচার্য—এই ‘আট জনকে নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল—“এই মণ্ডলীর কাজ হবে কাগজটির আকৃতি-প্রকৃতি নির্ধারণ ও বিশেষভাবে ছাপার জন্যে লেখা নির্বাচন। আরো ঠিক হ’ল সম্পাদকমণ্ডলীর নিয়মিত অধিবেশন হবে সপ্তাহের নির্দিষ্ট এক দিনে। ক্রমে এই অধিবেশনই পরিণত হল পরিচয়-গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক বৈঠকে।”—(‘পরিচয়-এর কুড়ি বছর’/পৃ. ১০)।

পরিচয়-এর আড্ডা

উদ্যোক্তরা বুঝেছিলেন যে, পিছনে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী থাকলে উচ্চমানের একটি সাহিত্য-সাময়িক নিয়মিত প্রকাশ করা বিড়ম্বনামাত্র। এই ১৯৩১ সালের মাঝামাঝি—পরিচয়-প্রকাশের কিছু আগে থেকে প্রতি শুক্রবারের সন্ধ্যায় পরিচয়-গোষ্ঠীর বৈঠক বসতে শুরু করে। “উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু আড্ডা নয়—কাজ। অর্থাৎ রচনার নির্বাচন, রচনা সংগ্রহের ব্যবস্থা ও এই উদ্দেশ্যে বিবিধ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ। সুধীন কিংবা জলযোগের ব্যবস্থা করত প্রত্যেক অধিবেশনে। কিন্তু এইভাবে সমিতির আকারে যার পত্তন, কিছুদিন যেতে-না-যেতে তা গিয়ে দাঁড়াল নিছক আড্ডায়...”।—(পরিচয়-এর কুড়ি বছর’/পৃ. ১৪৮)। তবে এই আড্ডায় উপস্থিত সাহিত্য রসিক-সুধীবর্গ ব্যক্তিগত মতামতের বিভিন্নতা উপেক্ষা না করে যে ‘সাবেগ সাহিত্যপ্রীতি ও অনাবেগ বিচার নিষ্ঠা’র পরিচয় দিতেন, তা সামগ্রিকভাবে পরিচয়ের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্যই করেছিল।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের ডায়েরী থেকে জানা যায় পরিচয়-এর আড্ডায় সম্পাদকমণ্ডলীর ‘অষ্টদিক্‌পাল’ তো থাকতেনই, তাছাড়াও হারীতকৃষ্ণ দেব, সুরেন মৈত্র, আবু সৈয়দ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত মহলানবীশ, বটকৃষ্ণ ঘোষ, হেমেন্দ্রলাল রায়, জীবনময় রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুধীরকুমার চৌধুরী প্রমুখও নিয়মিত আসতেন। প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বাড়ির সভায় প্রথম চৌধুরীও একাধিকবার উপস্থিত থেকেছেন। কত্রোল যুগের তরুণদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন মিত্র, মনীশ ঘটকও মাঝে মাঝে আড্ডায় হাজির হয়েছেন। এমন কি পরিচয়-এর

পৃষ্ঠায় যাদের রচনা প্রকাশিত হয়নি, এমন অনেক মননশীল ব্যক্তিও সাময়িকভাবে পরিচয় গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে তাকে নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে শায়েদ সোহরাওয়ার্দী, বসন্তকুমার মল্লিক, তুলসীচরণ গোস্বামী, অপূর্বকুমার চন্দ, মজিদ রহিম, অবনী বাঁড়ুজ্জ, হামফ্রে হাউস, ম্যালকলম্ ম্যাগারিজ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। শায়েদ বাংলা জ্ঞানতেন না, তবে তাঁর ইংরেজি রচনার বাংলা অনুবাদ ‘পরিচয়’ প্রকাশিত হয়েছে।

কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘আমার যৌবন’ গ্রন্থে এই আত্মজার একটি উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন,—“পরিচয়ের শুক্রবাসরীয় সম্মুখায় আমি উপস্থিত ছিলাম কয়েকবার—বিভিন্ন গৃহে, কিন্তু কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে সূর্যমুখ্যের পৈতৃক ভবনেই প্রধানত... বৈঠকখানাটি আয়তনে বড়ো নয়, কিন্তু দেখে মনে হয় সরস্বতী ও লক্ষ্মীঠাকুরনের ঝগড়া সেখানে মিটে গেছে। হলদে অথবা সবুজ রঙের নির্মল মেঝে, গভীর গদির অতি নমনীয় আসন, চায়ের বাসন, আলো ঠিকরানো, ভোজ্য তালিকা উচ্চাঙ্গের... আসেন একে একে বিদগ্ধজনেরা—জ্ঞানের বহু ভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞ, আধুনিকতম দর্শনে বিভাজন পরিব্রাজক—সব মিলিয়ে উজ্জ্বল এক অসবল, যার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হন—তাঁর কান্তি নিয়ে, চোখে-পড়ার মতো সাদাসজ্জা নিয়ে...—তাঁর সুখন কণ্ঠ ও সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি নিয়ে, তাঁর আলাপ দক্ষতা ও সামাজিক স্বচ্ছন্দ্য নিয়ে—গোষ্ঠীপতি সূর্যমুখ্য দস্ত।”—(‘আমার যৌবন’/পৃ. ৬৯-৭০)। বুদ্ধদেব বসু অবশ্য ‘পরিচয়’-এর আত্মজার কখনো স্বচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি; কারণ তাঁর মনে হয়েছে,—“যেন একটু অতিমাত্রায় সুচারু ও সমৃদ্ধ ও শোভমান, যেন আত্মা নয়, আয়োজিত একটি অধিবেশন।”—(ঐ/পৃ. ৭০)।

তাছাড়া “সকলেই যেন বড়ো বেশি বিদ্বান ও পরিপক্ব, তত্তালোচনায় এঁদের যতটা দক্ষতা সাহিত্য রচনায় ততটা নয়।” তবে ‘কম্বোজ-প্রগতি’র অনুরাগী বুদ্ধদেব সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে “আত্মপরীক্ষা ও নবমূল্যায়ণের” যে-প্রয়োজন ছিল, “সূর্যমুখ্য, তাঁর সমালোচনা প্রধান বুদ্ধিজীবী নির্ভর পরিচয় পত্রিকায় তা-ই সাধন করেছিলেন।” সূর্যমুখ্যের পরিচয়-এর অন্যতম সম্পাদক গোপাল হালদারেরও অভিমত—“কম্বোজ-যুগটাও কিন্তু ‘যুগ’ নয়, হুজুগ। আসলে বাংলা সাহিত্য-পক্ষে যুগ ষটিয়েছে দুটিপত্র—‘বঙ্গ দর্শন ও সবুজপত্র’। আরেকটিও যুগান্তর ষটিয়েছিল, কিন্তু সে ত্রৈমাসিক পত্র, ‘পরিচয়’।” “সূর্যমুখ্য যে আদর্শ ও পদ্ধতিতে ত্রৈমাসিক ‘পরিচয়’ পরিচালনা করেছিলেন তা বিশেষ কৃতিত্বসূচক। দেশের শিক্ষিত মানুষেরাও একবাক্যে তা অভিনন্দিত করে। আমরা জেলে ও জেলের বাইরে তা

সাপ্তাহে তখন পাঠ করতাম।”—(রূপনারায়নের কুলে, ২য় খণ্ড/পৃ. ২২৮ ও ৬৪)।

দ্বৈমাসিক কেন

সুধীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুগোষ্ঠী দ্বৈমাসিক পত্রিকা-প্রকাশের সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। কারণ, তাঁরা বুঝেছিলেন, উচ্চাদর্শ বজায় রেখে সত্যিকারের মর্যাদাবান একখানি সাহিত্য-সাময়িক অল্পসময়ের ব্যবধানে নিয়মিত প্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রবন্ধকারেরা ও ‘পুস্তক-পরিচয়’ বিভাগের লেখকেরা যাতে পড়ার ও লেখার জন্য উপযুক্ত অবসর পান সে-কথাও তাঁরা গুরুত্বসহ বিবেচনা করেছিলেন। তাই, স্থির হয়েছিল ‘পরিচয়’ হবে দ্বৈমাসিক। “উপযুক্ত পরিমাণ সময় নিয়ে লেখবার অবকাশ” যাতে লেখকেরা পান, সে বিষয়ে ‘পরিচয়’ সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, “আদর্শরক্ষা করতে গেলে প্রয়াসের দরকার, সাধনা না হলে চলে না।...সেই সাধনাপেশী সাহিত্যের জন্য সময়ও চাই বড়ো, ক্ষেত্রও চাই উদার।”—(পত্রিকা; পরিচয়; কার্তিক, ১৩৩৮)। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা মতো “সাধারণের মন না রেখে সাহিত্যের বিশিষ্টতা রাখবার দায়িত্ব” পরিচয় নির্ঠার সঙ্গেই পালন করেছিল।

পরিচয়-এর আত্মপ্রকাশ

অবশেষে, ‘পরিচয়’ দ্বৈমাসিকের আত্মপ্রকাশ ঘটল বাংলা ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। “প্রথম সংখ্যার মলাটে ছিল গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের সুন্দর হস্তলিপিতে ‘পরিচয়’ নামটি।”—(সুশোভন সরকার, পরিচয়, মে-জুলাই, ১৯৮১/পৃ. ২৮)। আর এই নামটি দেওয়া নীরেন্দ্রনাথ রায়ের। প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় এই নামকরণের বিশদ ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছিলেন। (পরিচয়-এর বর্তমান সংখ্যার পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। এ-সম্পর্কে হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন, “‘পরিচয়’ নামের তত্ক্ষণাৎ আঁটা শিরোপার নিচে ছাপা এই রচনাটিতে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না। কেননা, এটি প্রকাশ করা হয়েছিল নিছক সম্পাদকীয় মুখবন্ধ হিসাবে। লেখক নীরেন রায়ের নাম সম্পাদক হিসাবে মলাটে ছাপা না-হলেও পরিচয়-এর প্রারম্ভিক যুগে সুধীনের ও নীরেনের আর্থিক অভিজ্ঞতার নিদর্শন ভাবগঙ্গার এই অবতরণিকা।”—(পরিচয়-এর কুড়িবছর/পৃ. ১৫)।

পরিচয়-এর পরিসাঙ্গ ও প্রকাশনা

পাঁচ বছর (১৩৩৮-১৩৪৩) পরিচয় ছিল ত্রৈমাসিক পত্রিকা; তারপর এটি মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ত্রৈমাসিক পরিচয়-এর প্রথম দু'বছর (১৩৩৮-৪০) প্রকাশক ছিলেন জগদ্বন্ধু দত্ত। স্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং ১/২, দুর্গা পিতুড়ি লেনের মডার্ন আর্ট প্রেসে মুদ্রিত। আকারে রয়্যাল সাইজ (১০"x৬"/_২"), সাদামাঠা মলাটের উপর সূচিপত্র মুদ্রিত। ৭ম বর্ষ পর্যন্ত পরিচয়-এর মলাটের রঙের বদল ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে না। ৮ম বর্ষ (শ্রাবণ, ১৩৪৫) থেকে পর পর কয়েকটি সংখ্যায় যামিনী রায়ের আঁকা ছবি পরিচয়-এর প্রচ্ছদকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছিল। তাও বেশি দিনের জন্য নয়। সূচিপত্র-মুদ্রিত সাদামাঠা মলাট-ই আবার ফিরে এসেছিল। তবে দু-একটি সংখ্যার মলাটের চারদিকের কিনারে কিছু অলংকরণ দেখা যায়।

ত্রৈমাসিক পরিচয়-এর ১ম সংখ্যার মুখপত্রে পত্রিকার আদর্শ বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। আর নিয়মাবলী জানানো হয়েছিল—“শ্রাবণ হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেক তৃতীয় মাসের—শ্রাবণ, কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখের—১লা তারিখে পরিচয় বাহির হইবে। মূল্য বার্ষিক সডাক ৪।০, প্রতিসংখ্যা ১, ডাকমাস্তুল স্বতন্ত্র।” পরিচয়-এর মাসিক পর্যায়ে প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে পত্রিকা প্রকাশের কথা বলা হয় এবং মূল্য বার্ষিক ৫ (পাঁচ টাকা) ও মাসিক মূল্য প্রথমে ১/০ (ছ'আনা), পরে ১।০ (আট আনা) নির্ধারিত হয়। সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনা কালে এই ‘নিয়মাবলী’ বজায় থাকে।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ, ১৩৪০) থেকে পরিচয়-এর প্রকাশক সুরেশ চক্রবর্তী। ১৩৯-এ, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং ১৬৩ মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের রামকুমার মেশিন প্রেসে মুদ্রিত। ৪র্থ বর্ষে প্রকাশস্থলের ঠিকানা বদলে হয়েছে ৭ নং, আর. জি. কর রোড, শ্যামবাজার, কলকাতা। এতদিন ‘পরিচয়’ শুধু ‘ত্রৈমাসিক পত্রিকা’ হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে; কিন্তু ৪র্থ বর্ষে সুরেশ চক্রবর্তী প্রচারিত ‘পরিচয়-বিজ্ঞাপনে’ এটি ‘অভিনব ত্রৈমাসিক পত্রিকা’ রূপে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। সুরেশ চক্রবর্তী বেনারসের বাসিন্দা—পরবর্তীকালে ‘উত্তরা’ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সুদূর বেনারস থেকে কলকাতায় এসে পত্রিকা প্রকাশনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না, তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছিলেন। ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ, ১৩৪২) থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ‘পরিচয়’-এর প্রকাশনা ও পরিচালনার ভার কুন্দভূষণ ভাদুড়ীর হাতে দিয়ে দেন। পরিচয়-

এর কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় ২৪/৫-এ, কলেজ স্ট্রীট, ভারতী ভবনে এবং পত্রিকাটি ১নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটের শ্রী সরস্বতী প্রেস থেকে মুদ্রিত হতে থাকে। ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (বৈশাখ, ১৩৪৩) পর্যন্ত ‘পরিচয়’-এর ত্রৈমাসিক জীবন। ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৪৩) থেকে এটি মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কিছুদিন পর পরিচয় কার্যালয় ও ভারতী ভবন কলেজ স্ট্রীট থেকে কলেজ স্কোয়ার (বর্তমানে বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীট) সংস্কৃত কলেজের সামনে স্থানান্তরিত হয়। কুন্দভূষণ ভাদুড়ী দীনবন্ধু লেনে একটি প্রেস স্থাপন করেন। সুধীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে প্রেসের নাম দেন ‘পরিচয় প্রেস’। পরবর্তীকালে পরিচয় কার্যালয় ৮বি, দীনবন্ধু লেনে স্থানান্তরিত হয়। মাসিক হওয়ার ফলে পরিচয়-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে যায় এবং ‘পুস্তক সমালোচনায় সমারোহ’ কিছুটা হ্রাস পায়; কিন্তু প্রবন্ধের মান মোটামুটি বজায় থাকে।

পরিচয়—‘অভিজ্ঞাত’ না ‘অভিনব’

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পরিচয়-এর নাম-পৃষ্ঠায় ‘অভিজ্ঞাত’ বিশেষণটি যুক্ত ছিল না। তবে, পরিচয়-এর ৪র্থ বর্ষে সুরেশ চক্রবর্তী প্রচারিত বিজ্ঞাপনে এটি “অভিনব ত্রৈমাসিক পত্রিকা” নামে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। অথচ ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, “স্বর্গত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মশায় যখন ‘পরিচয়’-এর সূচনা করেন, তখন পত্রিকাটির পরিচয়-নাম-পৃষ্ঠায় ছাপা হত “অভিজ্ঞাত” পত্রিকা বলে। পরে কোনো এক সময়ে এই বিশেষণ-পরিচয়টি পরিত্যক্ত হয়।”—(পরিচয়; কার্তিক ১৩৮৩/পৃ. ৩৪৯)। ‘পরিচয়’ সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ও পরিচয়-গোষ্ঠীর অনেকে যেহেতু অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাই “অভিজ্ঞাত” বিশেষণটিও ‘পরিচয়’ পত্রিকারই প্রাপ্য—মনে হয় এ জাতীয় বিষয়ীগত (Subjective) ধারণা থেকেই অধ্যাপক রায় ঐ মন্তব্যটি করেছেন। প্রবীণ বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও এক জায়গায় লিখেছেন, “সুধীন্দ্রনাথ যখন ‘পরিচয়’-এর প্রধান পরিচালক তখন একে বর্ণিত হতে দেখেছি ‘অভিজ্ঞাত’ পত্রিকা বলে”—(শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের ‘পরিচয়-এর আড্ডা’ গ্রন্থের মুখবন্ধ)। শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায়ের এ মন্তব্যটি যে স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর, তথ্যভিত্তিক নয় তা বোঝা যায় যখন তিনি লেখেন, “সর্বজন শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার এবং তাঁর সঙ্গে মণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু প্রতিভাধর ‘পরিচয়’-এর ভার তুলে নিলেন সুধীন্দ্রনাথের হাত থেকে তখন দেখেছি পত্রিকার বর্ণনা হল ‘অভিনব’—(ঐ, মুখবন্ধ)। তথ্য প্রমাণ কিন্তু বলে, ত্রৈমাসিক পরিচয়-এর নাম-পৃষ্ঠায় বা বিজ্ঞাপনে “অভিজ্ঞাত”

বিশেষণটি যুক্ত ছিল না, বরং ‘অভিনব’ বিশেষণটি বিজ্ঞাপিত হয়েছিল সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনা কালেই (পাশের পাতায় দেখুন)।

প্রথম থেকেই বিশিষ্ট পত্রিকা

সুধীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থদের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলেই যে ‘পরিচয়’ ত্রৈমাসিকের ‘স্টার্শার্ড...উর্ধ্বমুখী’ রাখা সম্ভব হয়েছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ধীমান পাঠকেরা প্রথম সংখ্যাতেই তার যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছিলেন। “মোটো এ্যাণ্টিক কাগজে ছাপা রয়্যাল সাইজের ১৫৪ পাতা পত্রিকা ত্রৈমাসিকের পক্ষেও যথেষ্ট প্রশস্ত, একথা স্বীকার করতে হবে। এর মধ্যে প্রথম ১১৩ পাতা প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ছাপা হয়েছিল পাইকা টাইপে। বাকি ৪১ পাতার মধ্যে ‘পাঠক-গোষ্ঠী’ বিভাগের ৫ পাতা বীরবলের পত্র বাদে বাকি ৩৬ পাতা স্মল পাইকায় ছাপা ‘পুস্তক-পরিচয়’।

পরিচয় যে একেবারে প্রথম থেকে বিশিষ্ট পত্রিকা বলে খ্যাতির পেয়েছিল তা প্রধানত এই ‘পুস্তক-পরিচয়’ বিভাগের জন্যে। এর আগে বাংলা দেশের কোন পত্রিকা সমালোচনা-সাহিত্যকে এতটা সম্মানের আসন দেয়নি।”—(হিরণকুমার সান্যাল; ‘পরিচয়-এর কুড়ি বছর’/পৃ. ২৩)।

“প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার দানগুলির সঙ্গে” বাঙালি পাঠকের পরিচয় সাধন এবং “কুপমাতুল্য ও গ্রাম্যতামুজ্জ্বল” মননশীলতার চর্চাই পরিচয়-এর প্রথম দশ বছরের সংখ্যাগুলিকে সমসাময়িক অন্য সব পত্রিকা থেকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। “কবিতা, কথাসিদ্ধি, নাটক, কলানুশীলন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব-পরিশীলনের সকল বিভাগগুলিই” যাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে (পরিচয়, ১ম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৩৮)— সে বিষয়ে সম্পাদক ও তাঁর লেখক গোষ্ঠী সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। পরিচয়-এর বিশিষ্টতার কথা বলতে গিয়ে হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন, “পরিচয় প্রথম প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে যে গৌরব অর্জন করেছিল তা অক্ষুণ্ণ ছিল যতদিন এই পত্রিকা ছিল ত্রৈমাসিক।”। প্রথম পাঁচবছরের (শ্রাবণ, ১৩৩৮—আষাঢ়, ১৩৪৩) ত্রৈমাসিক পরিচয়-এর ২০টি সংখ্যায় বিষয়সূচী লক্ষ্য করলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে। ঐ ২০টি সংখ্যায় ৪০১টি গ্রন্থ আলোচিত হয়েছে; তার মধ্যে ১৪৩টি বাংলা গ্রন্থ এবং ২৫৮টি বিদেশী ভাষায় লেখা গ্রন্থ। উচ্চমানের প্রবন্ধেরও সংখ্যাও ১১১টি। অধ্যাপক সুশোভন সরকার অবশ্য পরিচয়-এর গৌরব-কালের সীমা প্রসারিত করে বলেছেন, “বাংলা পত্রিকার জগতে পরিচয় দুর্লভ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পেরেছিল প্রথম দশ বছরে।”

মাসিক পরিচয়-এর প্রথম পাঁচ বছরের (শ্রাবণ, ১৩৪৩—আষাঢ়, ১৩৪৮) ৬০টি সংখ্যার বিষয়সূচীও এই অভিমত সমর্থন করে। এই পর্বে আলোচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৪৯৬টি বাংলা গ্রন্থ এবং ২৪৭টি বিদেশী ভাষায় রচিত গ্রন্থ। আর মননশীল প্রবন্ধের সংখ্যা ২২৪টি। তাছাড়া ত্রৈমাসিক ও মাসিক পর্বের লেখকগোষ্ঠী অপরিবর্তিত থাকায় প্রথম পাঁচবছরে ত্রৈমাসিক ও মাসিক পর্বের লেখকগোষ্ঠী অপরিবর্তিত থাকায় প্রথম পাঁচবছরে ত্রৈমাসিক পরিচয় যে গৌরব অর্জন করেছিল, পরবর্তী পাঁচবছরে মাসিক পরিচয়ও তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথের অনুজপ্রতিম “বিশিষ্ট ভাবুক” অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ও পরিচয়-এর বিশিষ্টতা প্রসঙ্গে বলেছেন, “সূচনা থেকেই পরিচয়-এর প্রধান ঝোক ছিল বাঙালী পাঠকের চেতনায় তার সর্বমানবীয় এবং সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ উত্তরলব্ধিকে প্রবাহিত করার দিকে। গোষ্ঠীবদ্ধতা, গ্রাম্যতা, অল্প জ্ঞানের আশ্রয়ত্ব, আপন সমাজসংস্কৃতির সঙ্কীর্ণ গম্ভীর ভিতরে আবদ্ধ থাকা—এই প্রতিনি্যাস থেকে শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাকে মুক্ত করা ছিল পরিচয়-এর ঘোষিত অভীষ্ট। একাত্তে প্রধান সহায় মননের চর্চা—পরিচয় পত্রিকায় তাই প্রাধান্য পেয়েছিল প্রবন্ধ এবং পুস্তক পরিচয়।...প্রবন্ধে এবং বিশেষ করে গ্রন্থ সমালোচনায় পরিচয় ত্রিশের দশকের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হয়ে উঠেছিল।”—(দেশ-সাহিত্য; ১৩৯৭/পৃ. ১৭০-৭১)।

পরিচয় ও রবীন্দ্রনাথ

‘পরিচয়’-এর প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা ছিল না। কারণ, সম্পাদকশ্রী ঠিক করেছিলেন, কবির কাছে তাঁরা লেখা চাইতে যাবেন না। তবে ‘পরিচয়’-এর প্রথম সংখ্যা দেখেই রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, “যারা ওজন দরে বা গন্ধের মাপে সাহিত্য বিচার করে তাদের জন্য এ-কাগজ” নয়;—যারা মননশীল রুচিমান পাঠক তাদেরই উপযোগী এ-কাগজ। তাই ‘পরিচয়’ সম্পাদককে উৎসাহ দিয়ে কবি একটি চিঠিতে লিখলেন, “কল্যাণীয়েবু সুধীন্দ্র...তোমার কাগজখানি বেশ মর্যাদাবান হয়ে দেখা দিয়েছে—কালিদাস আষাঢ় সম্বন্ধে যে বর্ণনা করেছেন সেটা একে-মানায়—“সমাগতো রাজবদুম্নতধ্বনিঃ”। এই উন্নত ধ্বনিতে যাতে—সুর ঠিক থাকে চেষ্টা করতে হবে।”—(চিঠিপত্র, ষোড়শ খণ্ড; পৃ ৪০)। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে, সুধীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থরা বুঝলেন যে, “পরিচয় সম্পূর্ণ স্বকীয় শক্তিতে সমৃদ্ধ, অতএব রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা দাবি করতে আর কোন দ্বিধার কারণ থাকতে পারে না।” পরিচয়ের সে দাবি রবীন্দ্রনাথ

পূরণও করেছিলেন। দ্বিতীয় সংখ্যাতেই তাঁর দুটি চিঠি, একটি অনুবাদ আর একটি গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হয়। শুধু দ্বিতীয় সংখ্যাতে নয়, সুশীলানাথ সম্পাদিত ‘পরিচয়’-এর প্রথম দশ বছরে (কার্তিক, ১৩৩৮—শ্রাবণ, ১৩৪৮) রবীন্দ্রনাথের চিঠি, কবিতা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ-সমালোচনা নিয়ে ৩৬টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। নিচে পরিচয়ে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার কালানুক্রমিক তালিকাটি দেওয়া হল—

প্রকাশ কাল

রচনা

- কার্তিক, ১৩৩৮—পত্রিকা (‘নব প্রবন্ধ’, চিঠি, ‘লব্ধক’ প্রসঙ্গে (গ্রন্থ-আলোচনা)।
 মাঘ, ১৩৩৮—হৃদয়ের হসন্ত হলন্ত (প্রবন্ধ), মাঘের আশ্বাস (কবিতা)
 বৈশাখ, ১৩৩৯—আধুনিক কাব্য (প্রবন্ধ), শূন্যঘর (কবিতা), ভোজনবীর (কবিতা),
 গোষ্ঠী রীতি (কবিতা)
 শ্রাবণ, ১৩৩৯—হৃদ বিতর্ক (প্রবন্ধ)
 কার্তিক, ১৩৩৯—ফেলোটা (কবিতা), নবহৃদ (প্রবন্ধ)
 মাঘ, ১৩৩৯—চিররূপের বাণী (কবিতা), তীর্থরাত্রী (কবিতা), চিঠি
 বৈশাখ, ১৩৪০—পুনশ্চ (প্রবন্ধ)
 শ্রাবণ, ১৩৪০—দিনান্ত (কবিতা), কালান্তর (প্রবন্ধ), সাহিত্যের মাত্রা (প্রবন্ধ)
 বৈশাখ, ১৩৪১—মর্মবাপী (কবিতা), ‘রিমালিস্ট’ প্রসঙ্গে (গ্রন্থ-আলোচনা)
 মাঘ, ১৩৪১—অদিক (কবিতা), ছিন্নপত্র (প্রবন্ধ)
 শ্রাবণ, ১৩৪২—মিষ্টাঙ্কিতা (কবিতা)
 বৈশাখ, ১৩৪৩—পদ্মপাত্রী—চন্দ্রমাসিকা, অপরপক্ষ (কবিতা)
 ভাদ্র, ১৩৪৩—আমি (কবিতা)
 চৈত্র, ১৩৪৩—ঘর-ছাড়া (কবিতা)
 শ্রাবণ, ১৩৪৪—ভাগ্যরাজ্য (কবিতা)
 ফাল্গুন, ১৩৪৪—বুদ্ধভক্তি (কবিতা)
 শ্রাবণ, ১৩৪৫—মণু পাছড়ে (কবিতা)
 চৈত্র, ১৩৪৫—সম্পূর্ণ (কবিতা)
 বৈশাখ, ১৩৪৬—শেষ কথা (কবিতা)
 জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬—অত্যাঙ্কিত (কবিতা)
 শ্রাবণ, ১৩৪৬—ছিন্নস্থিতি (কবিতা)
 শ্রাবণ, ১৩৪৮—সৃষ্টির আশ্রয়ানি

সুশীলানাথ ও তাঁর সতীর্থরা “দুঃসাহসে ভর করে”ই পরিচয় ত্রৈমাসিক প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের এই “দুঃসাহসের স্বতে” রবীন্দ্রনাথ যে রীতিমতো উৎসাহ যুগিয়েছিলেন, সে-কথা প্রচার সঙ্গে স্মরণ করে হিরণকুমার সান্যাল লিখেছিলেন, “পরিচয়-এর প্রথম দশ বছর মিলে যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশকের সঙ্গে। কিন্তু এই দশ বছর শুধু পরিচয়-এর পাতাতেই তাঁর যে-কটি লেখা বেরিয়েছিল তাতে প্রমাণ হয় যে আয়ুব সীমান্তে পৌঁছেও তাঁর মন ছিল যেমন সতেজ, তেমনি সমর্থ ছিল তাঁর

কলম। এই কলমের জোরে পরিচয়-এর স্বকীয়তাতে আরো বৈশিষ্ট্য দেবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।—(‘পরিচয়-এর কুড়ি বছর’ পৃ. ৩৬)।

পরিচয়-এর ‘স্টাণ্ডার্ড’

জন্মলগ্ন থেকেই পরিচয় যে উচ্চাদর্শবিশিষ্ট ‘মর্যাদাবান’ সাহিত্য-পত্রিকা একথা সকলেই স্বীকার করেন। অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় এক জায়গায় লিখেছেন, “আমার তরুণ বয়সে বঙ্গীয় মননশীলতার সব চাইতে স্মরণীয় প্রকাশ ঘটেছিল ‘পরিচয়’ পত্রিকায়।” পরিচয়-এর এই উচ্চাদর্শ বা ‘স্টাণ্ডার্ড...উর্ধ্বমুখী’ রাখা কীভাবে সম্ভব হয়েছিল, সে-সম্পর্কে ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে—“পরিচয়-গোষ্ঠীর প্রত্যেকের স্টাণ্ডার্ড ছিল, কিন্তু গোষ্ঠী হিসেবে তার কোনো ইডিয়লজি ছিল না, যদিও প্রত্যেকে আইডিয়াল ব্যবসায়ী ছিল। ঐ সাধারণ স্টাণ্ডার্ড-এর ওপর ভর করেই কাজ চালানো গিয়েছিল। সুধীন্দ্রের স্টাণ্ডার্ডই ছিল সবচেয়ে উঁচু, আমাদের কারুরই স্টাণ্ডার্ড নিচু ছিল না; কিন্তু আমরা জ্ঞানত ও অজ্ঞানত সুধীন্দ্রের স্টাণ্ডার্ড বজায় রাখতে চেষ্টা করতাম। একদিনও সে সম্পাদকী কর্তৃত্ব ফলায়নি; আমরাও কোনদিন আচারে-ব্যবহারে তাকে জ্ঞানবার অবসর দিইনি যে সেই সম্পাদক। অথচ, বহু রচনার সম্পাদন সে করেছে।...মোন্দা কথা, পরিচয়ের স্টাণ্ডার্ড আমাদের সম্মিলিত স্টাণ্ডার্ড কিন্তু তার মধ্যে সুধীন্দ্রের স্টাণ্ডার্ড সবচেয়ে উঁচু ও যুক্তিসাপেক্ষ ছিল বলেই সেই সম্মিলিত স্টাণ্ডার্ড ছিল উর্ধ্বমুখী। এটা কেবল তার অধীত বিদ্যার জন্য নয়।...সুধীন্দ্রের মানদণ্ডটা ছিল তর্কবুদ্ধি ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া সে একটা সমন্বয় করতে পারত যেটা আমরা অনেকেই পারতাম না। এই আভ্যন্তরীণ প্রকরণেই পরিচয়-গোষ্ঠীর মানদণ্ড খাড়া ও উঁচু থাকে।”—(‘পরিচয়-এর কুড়ি বছর’/পৃ. ১৩৮-৩৯)

সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ

‘পরিচয়’ সম্পাদনা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অবিস্মরণীয় কীর্তি। পরিচয়ের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদনার সর্বস্ব দায়িত্ব পালন করেছেন। “নিজে সমস্ত লেখা কপি করে তবে ছাপাখানায় পাঠাতেন।” প্রতিটি লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়া, বাছাই করা, সাফানো, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন ইত্যাদি কাজ নিজেই করতেন, তবে নীরেদ্রনাথ, গিরিছাপতি প্রমুখ বনিষ্ঠ সতীর্থদের সহযোগিতা ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গ্রহণেও দ্বিধা করতেন না। আসলে “স্বভাবে শিক্ষায়

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন উদারতন্ত্রী, অনেকান্তবাদী”; “তার শীল, তার সংস্কৃতি ছিল সকল ক্ষুদ্রতার উল্লেখ”—সকল অর্থেই তিনি ছিলেন “liberal humanist”...। তাই তাঁকে কেন্দ্র করে পরিচয়গোষ্ঠীতে নানা মতের মানুষ যেমন মিলতে পেরেছিল, তেমনি পরিচয়-পত্রিকায় নানা মতের স্বেচ্ছা প্রকাশিত হতেও কোন বাধা হয়নি। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে সুধীন্দ্রনাথের এই উদার ‘মনুষ্যধর্ম’ ও বহুতসহিষ্ণুতার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন, “মার্কসীয় দর্শন নিয়ে তুমুল তর্ক অবশ্য করেছেন, কিন্তু প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীতে (১৯৩৮) বসতে কুষ্ঠিত হননি, লিখিত অভিভাষণ সংঘের পত্রিকায় মুদ্রিত হতে অনুমতি দিয়েছেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে কম্যুনিজম-এর বিশ্ববীক্ষা তিনি সম্পূর্ণ পরিহার করেছিলেন বটে, আর কোনো কালই কম্যুনিজমকে পুরোপুরি গ্রহণ তিনি করেননি, কিন্তু...বৈরীভাবে হলেও অভিবাদনে কুষ্ঠিত হতেন না।” অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় কৃতজ্ঞচিত্তে আরো স্বীকার করেছেন, “পরিচয়”—এর পরিচালন ভার সুধীনবাবু ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে তুলে দেন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখকসংঘের হাতে—এ থেকে অন্তত অনুমান অমূলক নয় যে কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপ তাঁর অপছন্দ হলেও নিজের সাধের পত্রিকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়াটা তাঁর উদার চিন্তাবৃত্তি এবং আমাদের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কণ্ঠস্থিত শ্রদ্ধারই নিদর্শন।”—(তরী হতে তীর; পৃ. ২৯৯ ও ৩৬৫)।

একথা ঠিক সুধীন্দ্রনাথ ব্যক্তিব্রাত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তাঁর এই অশ্রিতা কখনেই অহং সর্বত্র সংকীর্ণতায় দুষ্ট ছিল না; তা ছিল যুক্তিনিষ্ঠ, পরমতসহিষ্ণু, সুদ্রুতউদার ও পরিশীলিত। কারণ তিনি জানেন, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যে যিনি বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানুষের প্রতি তাঁকে শ্রদ্ধাশীল থাকতে হয় এবং প্রতিটি মানুষকে স্বতন্ত্র একটি সম্ভা হিসাবেই মর্যাদা দিতে হয়। এই মূল্যবোধে স্বস্থ থেকেই তিনি নিজেকে একজন উদারতন্ত্রী মানবতাবাদী বলে মনে করতেন এবং নিজেকে গোঁড়ামিমুক্ত রাখার জন্য বিরোধী মনোভাব প্রকাশে উৎসাহই দিতেন। ‘The Liberal Retrospect’ নিবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশও করেছেন—
the true liberal is a confirmed rationalist who, realizing that instinctive behaviour is impersonal, bases his individuality on the integral logic he has taught himself. He is, therefore, unafraid of opposition which he welcomes as a corrective to his possible dogmatism, and, since his need is development and not progress, he tends to become a solitary weighing pros and cons of questions wholly outside the scope of absolute answers.”—

(The Liberal Retrospect; The Marxian Way; Vol. I, No I, July-Sept. 1945).। এই জীবনবোধ-ই যে সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব-গঠনে শক্তি সঞ্চারিত করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বন্ধু হিরণকুমার সান্যাল সুধীন্দ্রনাথের এই ‘ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে’ মুগ্ধ হয়ে তাই লিখেছেন, “সুধীনের মায়াজালে জড়িয়েছে আরো বহু ব্যক্তি, স্বদেশবাসী ও বিদেশী, বিদ্যায় ও মননশীলতায় যারা আমার চাইতে অনেক উঁচু স্তরের। আশ্চর্য লেগেছে এই কথা ভেবে যে এত বিচিত্র ব্যক্তিকে কী বিচিত্র আকর্ষণ সে এত আপন করতে পারল... পরিচয়-মণ্ডলীতে সুধীন রস পেয়েছিল আর প্রভূত রস সঞ্চারিত করেছিল। মননশীলতায় ও ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে সুধীন ছিল এই মণ্ডলীর উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। দশ বছর ধরে এই মণ্ডলীর আলো বিকীর্ণ হয়েছিল বাংলা দেশে।”—(‘পরিচয়-এর কুড়ি বছর’/পৃ. ১৭৯-১৮২)।

সুধীন্দ্রনাথ বারো বছর (শ্রাবণ ১৩৩৮—আষাঢ় ১৩৫০) পরিচয়-এর সম্পাদক ছিলেন। প্রথম আট বছর পরিচয়-এর মলাটে সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম-ই মুদ্রিত হয়েছে। শেষ চার বছর সুধীন্দ্রনাথের নামের পাশে হিরণকুমার সান্যালের নামও সম্পাদক হিসাবে যুক্ত হয়। ‘পরিচয়’ পত্রিকার একাদশ বর্ষ (১৩৪৮), তার সংখ্যায় ‘রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক একটি প্রয়োগলেখ—‘পরিচয়’ পত্রিকার সুধীন্দ্রনাথের শেষ রচনা। এগারো বছরে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথের ১৪টি কবিতা, ১০টি প্রবন্ধ, ৮টি সম্পাদকীয় এবং ৩৮টি বিদেশী গ্রন্থ ও ৪টি বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৫০-এর শ্রাবণ মাস থেকে সুধীন্দ্রনাথ ‘পরিচয়’-এর সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। এবং কিছুদিন পরে প্রকাশক কুন্দভূষণ ভাদুড়ির পরামর্শে ও অধ্যাপক সুশোভন সরকারের মধ্যস্থতায় পরিচয়-এর স্বত্বাধিকার তিনি প্রগতিশীলদের কাছে বিক্রি করে দেন। পরিচয়-এর এই হস্তান্তর সম্পর্কে অধ্যাপক সরকার লিখেছেন, “সম্ভবত ১৯৪৩ সালে...ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশনা আমার মাধ্যমে ‘পরিচয়’ নিয়েছিল, ঠিক হল মাসে মাসে কিস্তিতে সুধীনকে দাম দিতে হবে, টাকাটাও যেত আমার হাত দিয়ে। ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিস্ট অনুরাগীদের প্রতিষ্ঠান, সুতরাং প্রকারান্তরে ‘পরিচয়’ এসে পড়ল পার্টির আয়ত্তে।”—(পরিচয়; কার্তিক ১৩৮৩)। এরপর আষাঢ়, ১৩৫২-তে লেখা ‘সোহাবাদ’ নামের কবিতাটি ছাড়া সুধীন্দ্রনাথ ‘পরিচয়’ পত্রিকায় আর কখনো লেখেন নি।

তবে ‘পরিচয়’-এর নবপর্যায়ে তার পরিচালকমণ্ডলী পরিচয়-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন—“সম্পাদকীয় যোগসূত্র ছিন্ন হলেও গত বারো বছরে শ্রীযুক্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে পরিচয়ের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে এই নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ত্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শুধু পরিচয়ের পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেননি, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ও সাহিত্যিক প্রেরণায় এমন এক লেখকসংঘ তিনি গড়ে তুলেছিলেন যাঁদের সহযোগিতার ফলে পরিচয় বাংলাদেশের পত্রিকা জগতে নতুন এক ধারার সঞ্চার করেছেন বলে দাবি করতে পারে।” — (সম্পাদকীয়; পরিচয়, আশ্বিন ১৩৫০)।

১৩৬৭ সালে, সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর, তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় লেখা হয়—“সুধীন্দ্রনাথ ‘পরিচয়’-এর প্রতিষ্ঠাতা, তার প্রথম সম্পাদক ও স্বহাধিকারী। ‘পরিচয়’ একাদশ বৎসর কাল শুধু তাঁর সৃষ্টি-শক্তিরই সাক্ষ্য বহন করেনি, বহন করেছে তাঁর সম্পাদকীয় দায়িত্ববোধের, অক্লান্ত পরিশ্রমের ও সুমার্জিত পরিশীলনেরও প্রমাণ। ত্রৈমাসিক ‘পরিচয়’ বাঙলা সাহিত্যপত্রের জগতে ও যুগ-ভাবনার বিকাশে এক অভূতপূর্ব প্রকাশ—মাসিক পত্রাকারেও সুধীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুগোষ্ঠী সে গৌরব অমান রাখতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সে ঐতিহ্য দীর্ঘদিন অব্যাহত রাখা কালের নিয়মেই হয়তো অসম্ভব। তথাপি সেই প্রথম যুগের ঐতিহ্যকে নতুন কালের ইতিহাসের বাহকরূপে লাভ করাই ‘পরিচয়’-এর প্রার্থিত। সেই ঐতিহ্যের যাঁরা স্রষ্টা, সুধীন্দ্রনাথ ও বন্ধুগোষ্ঠী, তাঁদের সঙ্গে ‘পরিচয়’-এর সম্পর্ক যেমন ঐতিহাসিক তাঁদের নিকট ‘পরিচয়’-এর কৃতজ্ঞতাও তেমনি অপরিশেষ। সুধীন্দ্রনাথের জীবন-শেষেও তাই ‘পরিচয়’-এর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ শেষ হয় না।”—(পরিচয়, ২৯ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৬৭)।

‘পরিচয়’-এর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ আজ-ও শেষ হবার নয়। যে-উদার মানবিকতা ও সাহিত্যবোধের ব্যাপক ও গভীর পটভূমিতে তিনি ‘পরিচয়’কে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তারই পুনরুজ্জীবনের বিনীত প্রয়াস—সুধীন্দ্র-শতবর্ষে ‘পরিচয়’-এর এর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

‘পরিচয়’-এর প্রথম সংখ্যার ভূমিকা

সত্যতাবুদ্ধির অনুপাতে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয় কি না, এ প্রশ্ন আজিও তর্কাতর্কিত, কিন্তু জটিলতা যে বাড়়ে, সে বিষয়ে পণ্ডিতেরাও একমত। পাণ্ডিত্য বাদ দিয়াও দেখা যায়, এক পরিচয়-প্রথাই সভ্যসমাজে কত রকম ছোট বড় জটিলতার সৃষ্টি করে। দু'বেলাই চোখাচোখি হয়, অথচ একজন সাধারণ বন্ধুর অভাবে আলাপ করার জো নাই—এমন কে আছেন যাঁহাকে এ অবস্থায় পড়িতে হয় নাই? পরিচয়ের অভাবে এক গাড়ি লোক পরস্পরের দৃষ্টি এড়াইয়া নিস্তরুভাবে চলিয়াছে—এ দৃশ্য এ দেশেও নিত্য বিরল নয়।

কিন্তু সভ্যতার আদব-কায়দায় কড়াকড়ি সত্ত্বেও মানুষের আদিম পরিচয়-স্পৃহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। হঠাৎ সিগারেটের জন্য দেশলাইয়ের দরকার হয়, পাশের সোফার রিস্টওয়াচ দেখিয়া সময় জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া ওঠে, ট্রেনে কে কোথায় নামিবে এ-বিষয়ে অদম্য কৌতূহলকে চাপিয়া রাখা চলে না—সভ্যতার বীধন কিছু আলপা হয়, আর এই ক্ষণিকের ফাঁক দিয়া অনেক সময় স্থায়ী বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইয়া যায়। সঙ্গসঙ্গী মানুষ অন্যের সংস্পর্শ পাইয়া নিজেকে সম্পূর্ণতর বোধ করে।

এই সঙ্গসঙ্গী মানুষকে দিয়া সমাজ গড়ায়, শিল্প রচনায়। সাহিত্য সৃষ্টি করায়। সুপ্রসিদ্ধ কবি অধ্যাপক মনমোহন ঘোষের স্মৃতিসভায় অভিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, তাহার মনে হয়, সাহিত্য কথাটির মূলে আছে ‘সহিতত্ব’। যে মানুষ কাহারও সহিত বাস করে না, সাহিত্য সৃষ্টির কোন তাগিদ সে অনুভব করে কিনা সন্দেহ। সাহিত্যের বাহন যে ভাষা, তাহা সমূহের সৃষ্টি। একা মানুষের ভাষার প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়। হয়তো এমন জ্ঞান আছে যাহা একান্ত নির্জন সাধনা সাপেক্ষ, সে জ্ঞান হয়তো এমন নিগূঢ় ও মৌলিক যে তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে অন্য সর্বপ্রকার জ্ঞানই সুনাম হইয়া আসে—সংলক্ষ্য চাপরং লাভং মন্যতে নাবিকং তথ্যম্—এমন ভাষা বা সাহিত্যের কোন প্রয়োজনবোধই থাকে না। কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ সে জ্ঞানের সাধক নয়। নিজেকে জানিবার, নিজের পরিচয় পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কম তীব্র নয়; সমস্ত কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়া, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, এই আত্মপরিচয় লাভই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষের একটাই অভিজ্ঞতা লব্ধ উপলব্ধি যে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া স্বরূপ জানা যায় না; স্বকে জানিবার জন্য অপরের প্রয়োজন, আত্ম

ও পর কুজ্জন্মের মতো অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। তাই সে অপরের সান্নিধ্য চায়, তাই সে সাহিত্য চায়। কারণ, সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে পরিচয়, তাহা চাক্ষুষ পরিচয়ের চেয়েও প্রত্যক্ষ। দেশ ও কালের বিস্তীর্ণ ব্যবধানের সমুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া এই সাহিত্য জগতেই সমধর্মী মন পরস্পরের সহিত করকম্পন করে, বিপরীতমুখী ঝটিকাবর্তের মধ্যেও তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে পারে। এমন একদিন আসা অসম্ভব নয় যখন এক বিশ্বজনীন ভাষা ও সাহিত্যে সম্মিলিত মহামানবের অন্তরের কাহিনী হৃদিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই শুভদিনের আবির্ভাবকে ত্বরিত করিতে হইলে আজ মানুষের প্রধান কাজ—ভাষা সম্বন্ধের দুর্গভ্রম্য বাঁধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগযুগ সঞ্চিত পরিশীলন সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া। এই পরিশীলন পরিচয়ই জাতিগত ঘেঁষ, হিংসা ও অবজ্ঞাকে সংকীর্ণ চিন্ততার—রক্তাক্ত শনিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থক।

এই বাংলাদেশে ‘পরিচয়’ আজ এই ভারই লইতে চায়। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাবগঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে ‘পরিচয়’ বাঙালি পাঠককে উপহার দিতে অভিলାষী। কখনো মূল ভাষার অনুসরণে আলোচনা করিয়া, কখনো বা ভাষান্তরের সাহায্য লইয়া, কখনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া, কখনো বা মূলানুগ অনুবাদ করিয়া। এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বস্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও পরিচয় তাহার দৃষ্টি সদাঙ্গাগ্রত করিয়া রাখিবে। কবিতা, কথাসিদ্ধ, নাটক, কল্পনাসীলন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব-পরিশীলনের সকল বিভাগগুলিই যাহাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে; এ বিষয়ে পরিচয় সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। পরিচয় জানে যে তার সাধ যত, সাধ্য তার বহু পশ্চাতে। কিন্তু তাহার একান্ত বিশ্বাস তাহার এই স্বীকৃত অক্ষমতাই দেশের সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ও তাহাদের স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতা তাহার রুদ্ধ বিঘ্ন বন্ধুর পথকে শ্যামশোভন ও সহজ চারণ করিয়া তুলিবে। এই বিশ্বাসই তাহার দুরারোহিনী আশার মূলে জ্বলসেচন করিয়া আজ অন্ধুরিত করিয়া তুলিয়াছে। এখন ইহাকে লালনের ভার পড়িল তাহাদের উপর—বাংলা ভাষার অতীতকে যাহারা সজ্ঞা করেন, বর্তমানকে দরদ দিয়া দেখেন ও ভবিষ্যতের আলোকিত প্রসার সম্বন্ধে যাহাদের বিশ্বাস অকুণ্ঠ।

সুধীন্দ্রনাথ ও ‘পরিচয়’-এর জন্মকথা

বর্তমান যুগের পুরশ্ৰেষ্ঠী কবি ও সাহিত্যিক সুধীন্দ্রনাথে দত্তের অকাল আকস্মিক মৃত্যুতে বাঙলার সাহিত্যজগৎ মুহ্যমান। তাঁর বয়স ষাটও হয় নি; এবং তাঁর দেহে ও মুখমণ্ডলে অটুট স্বাস্থ্যের দীপ্তি নিত্য বিরাজিত ছিল। যেমন কাব্যে ও সাহিত্যে তেমনি বহু বিষয়ে জ্ঞান ও চর্চা এবং বহু ভাষায় দখল তাঁকে বিদগ্ধ ও গুণীসমাজে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী করেছিল। তিনি ছিলেন আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর এরকম আকস্মিক অন্তর্ধানে আমি একান্ত বিমূঢ়। তাঁর কাব্য সম্বন্ধে সমূহ বলবার বা বিচার করবার যোগ্যতাও আমার নেই। রবীন্দ্রোত্তর যুগে কাব্যবীণায় তিনি নিজস্ব একটি তন্ত্রী যোজনা করেছিলেন : তৎসম ও সংস্কৃত শব্দ-সমৃদ্ধ, ভাব ও ছন্দের গাঢ়বদ্ধতার তন্ত্রী। এই সকল বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি নিশ্চয় আলোচনা করবেন। আমি একটি বিষয়ে যৎসামান্য বলতে ইচ্ছুক—সে ‘পরিচয়’-এর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে। একদিন আমারই কাছে, তিনি একটি নূতন ধরনের বাংলা পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প প্রথম ব্যক্ত করেন ও এই কাজে আমার সাহায্য চান। আমাদের উভয়ের একত্র চেষ্টার ফলে ‘পরিচয়’ জন্মলাভ করে। ‘পরিচয়’-এর এই জন্মকথা লিপিবদ্ধ করে আমার ও বহুলোকের প্রিয় কবির স্মৃতি-তর্পণ সমাধা করতে পারব, এই আশা।

১৯৩০, মে-জুন মাস। একদিন বন্ধুবর প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু ডালহৌসি স্কোয়ারে আমার কর্মস্থানের আপিসঘরে সুধীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন, তোমার সঙ্গে আলাপ করে দিই। যেমন তুমি একদিন কবিশুন্দের সঙ্গে একত্রে বিলাত যাত্রার ভাগ্যলাভ করেছিলে, সুধীন্দ্রও এবার তেমনি কবির সঙ্গে একত্রে ইংলণ্ড-আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। এছাড়া এর আপিস তোমার আপিসের সংলগ্ন। তোমাদের আলাপের খুব সুবিধা হবে। সানন্দে সুধীন্দ্রকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম, তাঁর পিতৃদেব ছিলেন আমার দাদামশায়ের বন্ধু।

সেই দিন থেকে আরম্ভ হল আপিস-ফেরত একত্রে গৃহপ্রত্যাবর্তন। সুধীন্দ্রের আপিস ছিল আমার আপিস কামরার একেবারে পাশেই। তিনি ছিলেন লাইট অফ এশিয়া ইন্সটিটিউট কোম্পানির সেক্রেটারি। আপিসের ছুটি হলে আমার কামরায় আসতেন ও অসীম ধৈর্য সহকারে

অপেক্ষা করতেন যতক্ষণ না আমি নিষ্কৃতি পেতাম। তারপর হত তাঁদের কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে কফি সেবন ও বিশ্রামলাপ। তাতে এসে যোগ দিতেন কবিপ্রিয়া—তাঁর প্রথম স্ত্রী। সুধীন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ হল ফটোগ্রাফিতে ও আমাদের আফিসের সর্বোচ্চমূল্যের এর্নেমান এফ/১.২ ক্যামেরা কিনে রঙীন ছবি তোলা আরম্ভ করলেন। আমার এ বিষয়ে যতটুকু বিদ্যা ও কারিগরী ছিল তা তিনি অনায়াসেই আয়ত্ত করলেন।

একদিন সন্ধ্যায় সুধীন্দ্র হঠাৎ ফটোগ্রাফির পরিবর্তে খাতা খুলে তাঁর রচিত একটি কবিতা পড়ে শোনালেন। মনে হল এক অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার। তাঁকে তা বলতে দ্বিধা করলাম না। সে সময়ে বাংলা কবিতা পড়তে যা সুযোগ পেতাম পড়ে মনে হত রবীন্দ্রবন্ধনী ছাড়িয়ে যায় নি। অবশ্য প্রথম চৌধুরী মশায়ের সনেটে নতুনত্বের রসোপলব্ধি হত; এবং মোহিতলাল মজুমদারের “বিশ্ময়গী” বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল প্রচুর। তখন বিষ্ণু দে-র কবিতা নিশ্চই দু-চারটি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু তা পড়ার আমার সৌভাগ্য হয়নি। সুধীন্দ্রের কবিতার গাঢ়বদ্ধতা ও কঠিন সৌন্দর্য সহজেই আমাকে বিমুগ্ধ করল। স্পষ্ট মনে হল রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথের অনুবর্তন করেও নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন—এ কবি। এরপর থেকে ফটোগ্রাফির সঙ্গে সমান পান্না দিল সুধীন্দ্রের স্বরচিত কবিতাপাঠ। কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপূর্ব ভঙ্গি তে পড়ে শোনাতেন। সুধীন্দ্রনাথকৃত কবিতাপাঠ অনেকেই ইদানীং শুনেছেন; নিশ্চয় তাঁরা আমার বক্তব্যের সাক্ষ্য দেবেন যে সুধীন্দ্রের কবিতাপাঠ—কলা অসামান্য।

এর আগেই তাঁর ‘তব্বী’ প্রকাশিত হয়েছিল ও তিনি তা কবিশুরুকে দিয়েছিলেন। বোধ হয় কিছু উপদেশ-মিশ্রিত প্রশংসা লাভ করেছিলেন। ‘তব্বী’-র কবিতাগুলি থেকে বাছাই করে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করে লিখলেন এই সময়ে, ও নতুন অনেকগুলি কবিতা লেখা হল যা পরে ‘অর্কেষ্ট্রা’য় প্রকাশিত হয়। একদিন তিনি আমাকে তাঁর ‘উটপাখী’ কবিতাটি পড়ে শোনালেন। আমার প্রশংসা বাক্য বোধহয় সেদিন এতই উচ্ছ্বসিত হয়েছিল যে তিনি স্বয়ং সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন। অতঃপর একদিন প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার লেখা ‘নৌকাডুবি’র প্রট পড়ে শোনালাম। জমে উঠল কাব্যালোকের মোহময় সন্ধ্যাগুলি।

১৯৩০-এর শেষের দিকে অথবা ১৯৩১-এর গোড়ায় এমনি এক সন্ধ্যায় সুধীন্দ্র বললেন, আমি এক পত্রিকা বার করতে চাই, যদি আপনি সাহায্য করেন। এর কিছুকাল আগে আমাদের একটি আসর বসত, নাম ছিল, সোসিয়েতে অ্যাঁদোঁ ল্যাঁর্তোঁ। প্রথম মহাসময়ের পরে ফ্রান্সের

শিল্পকলা-জ্ঞান-বিদ্যা ও ভাষা প্রভৃতির প্রতি বাঙলার যুবকদের একটা নেশা জন্মে। আনন্দ ১৯২৬ অব্দে ডক্টর প্রবোধ বাগচীর চেষ্ঠায় ফ্রেঞ্চ ভাষা ও শিল্পকলার অনুরক্ত ও ফ্রান্স প্রত্যগতদের নিয়ে উক্ত আসরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বয়ং প্রথম চৌধুরী। আসত বসত আশুতোষ বিন্দিং-এর একটি কামরায় ও শেষের দিকে ডক্টর প্রবোধ বাগচীর বাড়িতে; দু-একদিন আমাদের বাগবাছারের বাড়িতে। মনে পড়ে, অন্যান্যদের মধ্যে একদিন আমাদের বাড়ির আসরে হাজির হয়েছিলেন সদ্য নামকরা প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়। সদ্য অক্সফোর্ড প্রত্যগত হুমায়ুন কবীরও আমাদের আসরে যোগ দিয়েছিলেন।

সুধীক্ষনাথ আমায় অ্যার্টো ল্যাতোর সভ্যদের কাছে নতুন কাগজের জন্য আবেদন জানাতে পরামর্শ দিলেন। ও আসরের তখন সমাপ্তি হয়েছে। আর কিছুদিন জল্পনা-কল্পনার পর সুধীক্ষ বললেন, আপনার বন্ধু নীরেন রায়কে চাই, তাঁকে বলব কাগজ সম্পাদনার অংশীদার হতে। অচিরে নীরেনের কাছ সুধীক্ষকে আমি নিয়ে গেলাম। ডক্টর প্রবোধ বাগচী, ডক্টর সুবোধ মুখোপাধ্যায়কে ডেকে আনলাম। এ হল ১৯৩১-এর গ্রীষ্মাবশেষ সময়। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রফেসার ধূক্ষিটি মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন; তাঁকেও ডেকে আনলাম সুধীক্ষের বৈঠকস্থানায়। এই সময় সবচেয়ে উৎসাহী হয়েছিলেন পূজনীয় চার্লস দস্ত (I.C.S.) মহাশয়। তাঁর উৎসাহ ও উদ্যম বিনা ‘পরিচয়’ বার হত কিনা সন্দেহ। পরে পরিচয়-এ তাঁর অতুলনীয় “পুরানো কথা” প্রকাশিত হয় ও কৃষ্ণ রাও প্রভৃতি গল্পও লেখা হয়।

নীরেনের নামকরণ করলেন ‘পরিচয়’-এর ও তাঁরই পরামর্শে কাগজটি ত্রৈমাসিক হবে স্থির হল। কিন্তু তিনি সম্পাদকের নাম গ্রহণ করতে বিরত হলেন। সাক্ষাৎভাবে সম্পাদনার অংশগ্রহণ না করলেও কার্যতঃ নীরেনবাবু সম্পাদনার অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই নিয়ে এলেন হিরণকুমার সান্যালকে, বিষ্ণু দে কে, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষকে— ইত্যাদি। অবশেষে ১৩৩৮ সালের আষাঢ় মাসে ‘পরিচয়’ প্রথম প্রকাশিত হল, সুধীক্ষের সম্পাদনার স্বাক্ষরে, নীরেনের ‘সম্পাদকীয়’ যোগে ও আমার হাতে আঁকা ‘পরিচয়’ নামাঙ্কিত প্রচ্ছদপটে আবৃত হয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে আমি সে সময় শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম।

আজ ইহলোকে সুধীক্ষ নেই; কিন্তু যাঁরা যাঁরা ‘পরিচয়’ বৈঠকে যোগদান করেছেন তাঁদের কাছে ‘পরিচয়’র জন্য সুধীক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও নিষ্ঠা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নিরিজাপতি ভট্টাচার্য

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও পরিচয়

হিরণকুমার সান্যাল

গত শ্রাবণ মাস থেকে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে পরিচয়ের সম্পাদক-পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, মলাটে তাঁর নাম না দেখে পাঠকবর্গ তা নিশ্চয়ই অনুমান করে থাকবেন। সম্পাদকীয় যোগসূত্র ছিন্ন হলেও গত বারো বছরে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে পরিচয়ের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে, বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে এই নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শুধু পরিচয়ের পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন নি, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ও সাহিত্যিক প্রেরণায় এমন এক লেখকসংঘ তিনি গড়ে তুলেছিলেন যাঁদের সহযোগিতার ফলে পরিচয় বাংলাদেশের পত্রিকা জগতে নতুন এক ধারার সঞ্চার করেছে বলে দাবি করতে পারে।

পরিচয় যে ধারার প্রবর্তন করেছিল আজ কতদূর সেই ধারা অক্ষুণ্ণ আছে তা অনেকের সন্দেহের কারণ হতে পারে। এই রকম সন্দেহ হয়তো অমূলক নয় কিন্তু এর উপরে বর্তমান সম্পাদকের একটি কথা বলবার আছে। গত বারো বছরের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যার প্রভাবে অন্যান্য অগণিত সাধারণ মানুষের মতো বহু সাহিত্যিকেরও দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় আমূল বদলে গেছে, ফলে সাহিত্যসেবার উৎসাহে ও তাগিদে একদিকে যেমন তাঁটা পড়েছে অপরদিকে তেমনি দেখা যাচ্ছে সাহিত্য রচনার নতুন আদর্শের প্রভাব ও নতুন সৃষ্টির প্রয়াস। বারো বছর আগে পরিচয় যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিল তার মধ্যে দ্বিধা ছিল না, তাই প্রবল গতিতে তা প্রবাহিত হয়েছিল সংখ্যার পর সংখ্যায়। কিন্তু পরিচয়ের নতুনত্বের উপলব্ধি তখন ছিল মুষ্টিমেয় পাঠক ও লেখকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আজকের সাহিত্যে যে নবতর চেতনার সঞ্চার লক্ষ্য করা যায় তার জন্ম জনসাধারণের মর্মে। কিন্তু পেশাদারী সাহিত্যিকদের মন ও জনমন এখনো অন্তরঙ্গ যোগসূত্রে যুক্ত হয় নি, তাই সাহিত্যসৃষ্টিতে আজ দেখা যাচ্ছে দ্বিধা, নতুন চেতনা নতুন সৃষ্টিতে আজো সার্থক হয়ে উঠে নি। এই যুগসন্ধির লক্ষণ যদি আজ এই পত্রিকায় ফুটে ওঠে তা শুধু অনিবার্য নয়, তাতে প্রমাণ হয় পরিচয় এগিয়ে চলেছে, পেছিয়ে পড়েছেন শুধু তাঁরা যাঁরা ১৯৪৩ সালের পত্রিকায় খোঁজেন ১৯৩১ সালের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গি।

এই এগিয়ে চলার পথে পরিচয় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে এর প্রথম সম্পাদককে। সাহিত্যবোধের যে ব্যাপক পটভূমিতে তিনি এই পত্রিকাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারই ফলে আজ পরিচয় প্রশস্ততর পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে সাহসী হয়েছে। যদি এই প্রয়াস সার্থক না হয় তার কারণ হবে শুধু বর্তমান সম্পাদকের অক্ষমতা। কিন্তু তাতে এই পত্রিকার সম্পাদনে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে-সার্থকতা অর্জন করেছেন তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না।

বর্তমান সম্পাদকের আরো একটি কথা বলার আছে। পরিচয় সম্পাদনার ভার তিনি তাঁর জীবনের মহত্তম উত্তরাধিকারের মধ্যে গণ্য করেন—এই উত্তরাধিকারের সঙ্গে চিরদিন বিচ্ছিন্ন থাকবে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সাহিত্যিক সাহচর্যের অমূল্য স্মৃতি।

(সম্পাদকীয়)

‘পরিচয়’-এর কাহিনী

হিরণকুমার সান্যাল

ইংরেজি ১৯৩১ সালের শ্রাবণ মাসে ‘পরিচয়’-এর জন্ম। সূত্রাং ১৯৭৬ সালের শ্রাবণে ‘পরিচয়’-এর ৪৫ বছর পূর্ণ হল। প্রথম থেকে আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে ‘পরিচয়’-এর সঙ্গে যুক্ত থেকেছি। তাই ‘পরিচয়’-এর ৪৫তম জন্মদিন শুধু স্মরণীয় দিন নয়, গৌরবের দিন। ‘পরিচয়’ প্রথম প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে যে গৌরব অর্জন করেছিল তা অক্ষুণ্ণ ছিল যতদিন এই পত্রিকা ছিল ত্রৈমাসিক। কিন্তু একটি পুষ্ট-কলেবর ত্রৈমাসিক পত্রিকার দায় বহন করা বেশিদিন সম্ভব হয় নি প্রধানতঃ এই কারণে যে যে আদর্শ নিয়ে ‘পরিচয়’ শুরু হয়েছিল তাতে ব্যবসায় বুদ্ধির প্রভাব ছিল না বিন্দুমাত্র। কিন্তু ‘পরিচয়’-এর অৰ্ধশতক যখন ঘোরাগো হয়ে উঠল তখন ভাবতে হল ব্যবসার কথা। তারই ফল হল মাসিক ‘পরিচয়’।

‘পরিচয়ের কুড়ি বছর’ নাম দিয়ে আমি ১৯৫১ সালের শ্রাবণ মাস থেকে ‘পরিচয়’-এর যে ইতিহাস লিখতে শুরু করেছিলাম তাতে এতদূর পর্যন্ত পৌছানোর আগেই নানা কারণে লেখা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। তাই এই কথাটা এখানে বলে নিলাম, যাতে ইতিহাসের সূত্রটি একেবারে ফসকে না যায়। যাই হোক, ত্রৈমাসিক ‘পরিচয়’ যখন মাসিক হল তখনই এর কলেবরের সঙ্গে-সঙ্গে গৌরবও অনেকটা হ্রাস পেল। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও আরও দুই-একজনের মাধ্যমে এসেছিল যে মাসিক কাগজ, ব্যবসায়িক ভাবে চালাতে হলে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস দরকার। এই রকম বাংলা উপন্যাস লেখার মনোমতো লোক না পেয়ে তাঁরা ঠিক করলেন ফর্স্টার সাহেবের বিখ্যাত ইংরেজি উপন্যাস *A Passage to India* অনুবাদ করে ছাপালে ‘পরিচয়’-এর কাটতি বাড়বে। বড় উপন্যাস, সবটা অনুবাদ করা বেশ সময় সাপেক্ষ। তাই এমন একটা অংশ বেছে নেওয়া হল যাতে পুরো একটা গল্প দাঁড়ায়। কিন্তু প্রশ্ন হল লুকিয়ে-চুরিয়ে কাজটা ঠিক হবে না। এর জন্য লেখকের অনুমতি আনতে হবে। এই ভার নিলেন অধ্যাপক হামফ্রে হাউস, যিনি তখন ‘পরিচয়’-এর আসরে আমাদেরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন, যদিও বাংলা তিনি শিখে উঠতে পারেন নি। লেখকের কাছ থেকে অনুমতি তো এল।

কিন্তু অনুবাদ করে কে? সুধীন এবং হাউস দুজনেই আমাকে ছেকে ধরলেন যে এ কাজের ভার আমাকেই নিতে হবে। এই অভ্যুত্থানে যে, ইতিপূর্বে কয়েকটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ আমি ‘পরিচয়’-এর জন্য করেছি। সুতরাং অনুবাদ শুরু করলাম, আর অনেকেই এমন কি রবীন্দ্রনাথও, বললেন ‘চমৎকার’। মূল্যের সঙ্গে তো আর তাঁরা মিলিয়ে দেখেন নি। আমি যা লিখতাম তার কতটা ফর্সটারের আর কতটা আমার তা কে বুঝবে!

কিন্তু ‘পরিচয়’-এর অর্থ সংকট থেকেই গেল আর ‘পরিচয়’ এই ভাবেই চলল আরও ক-বছর। এই সময় ইশানকোণে শুরু হল শুরু শুরু কানাকানি। তারপর এল প্রলয়ঙ্করী ঝড়, সারা পৃথিবী ঝুড়ে।

কিন্তু ‘পরিচয়’-এর ব্যবসায়িক ভিত্তি যতই নড়বড়ে হোক না কেন সাম্প্রতিক আত্মা তখনও নিয়মিত চলেছে—সুধীন, প্রবোধ বাগচী বা চারু দত্ত মশাই-এর বাড়িতে; কখনো-কখনো আমার বাড়িতে। ‘পরিচয়ের কুড়ি বছর’ যীরা পড়েছেন তাঁদের হয়তো মনে আছে বনভূমার মন্ট্রিকের কথা, যাকে আমরা সবাই ডাকতাম ‘মন্ট্রিকা’ বলে। তিনি ছিলেন, চারুবাবুকে বাদ দিয়ে, আমাদের মধ্যে প্রবীণতম। যতদূর জানি তেমন পড়তেনও না, তবু পরিচয় সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। শুধু প্রমিত্রিকা নয়, আমাদের অনেকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয়েছিল অত্যন্ত নিবিড়। ১৯৩৭ সালে, কোন মাস মনে পড়ছে না—তিনি হাবার দিলেন সাগর পাড়ি পুরনো বন্ধুহের টানে। তিনি আর দেশে ফেরেন নি। যে কোনো বিষয়ে হোক না কেন মন্ট্রিকা ছিলেন একেবারে আক্ষরিক অর্থে সত্যক। আর, এই তর্কের জালে জড়িয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন আমাদের সকলকে। কিন্তু সুধীনকে তিনি সব সময় বাগ মানাতে পারতেন না।

মন্ট্রিকাকে, একদিন সকালে খিদিরপুর ডকে একটি মানবাহী জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে এলাম আমি, সুশোভন ও তার স্ত্রী বাবলি। তিনি ছিলেন বহু দূরের জগতের লোক। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি হয়েছিলেন আত্মীয়ের মতো। মন্ট্রিকার কথা ভোলা যায় না।

আত্মা তো চলল, কিন্তু ‘পরিচয়’-এর অবস্থা হয়ে উঠল আরো সন্তান। যুদ্ধ বাধার কিছুদিন পরেই ‘পরিচয়’ এর সম্পাদনায় সুধীনের সঙ্গে যুক্ত হলাম আমি। সুধীন তখন ‘পরিচয়’-এর কাজ দেখবার আর বিশেষ অবসর পেত না। নীরেন রায়ও প্রায় সরে পড়েছিলেন। কেননা যে রাজনৈতিক অদর্শে তাঁর তখন প্রবল ঝোঁক, তখনকার প্রায় নিষ্প্রভ ‘পরিচয়’-এ তার কোনো আভাসই প্রায় ছিল না।

প্রকাশক কুন্দভূষণ ভাদুড়ী তখন সেখা যোগাড় করতেন। অবশ্য

আমাকেই বাছাই করতে ও প্রফ দেখতে হতো। আর সুধীনের বাড়িতে হত মাঝে-মাঝে চা ও জনযোগ। একদিন ঐ আড্ডায় হারীতকৃষ্ণ দেব জিজ্ঞাসা করলেন—‘তোমরা কি দুজনেই সম্পাদনা করো?’ আমি বললাম—‘আসল কাজ যা করবার করেন কুন ভাদুড়ী। আমি হলাম প্রফ কারেকটিং এডিটর, আর সুধীন এন্টারটেইনিং এডিটর, এই ভাবেই কাগজ চলেছে।’ হারীতবাবু বললেন—‘But as the proof correcting editor you are sometimes more entertaining than the entertaining editor.’ কথাটা সত্যি, কেননা ‘পরিচয়’-এর তখন যদি কোনো স্বকীয়তা থাকে তা হল মূদ্রণপ্রমাদ। প্রফ দেখায় আমার কুণ্ঠিত চিরকাল একই রকম। একদা যখন সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র ‘ভাণ্ডার’ কাগজ সম্পাদনা করতাম (১৯২৭-৩৭) তখন ঐ কাগজের পাতায় একবার ‘সমবায় প্রচেষ্টার আন্তর্জাতিক যোগসূত্র’ ঐ বাক্যে ‘যোগসূত্র’ কথাটির বদলে ‘মোষসূত্র’ ছাপা হয়েছিল।

১৯৪১ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথের ৮০ বছর পূর্ণ হল। একান্ত দুর্দিনেও ‘পরিচয়’ এই স্মরণীয় ঘটনাকে একটি স্মরণীয় সংখ্যা প্রকাশ করে পালন করেছিল। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্রের লেখা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়ে রবীন্দ্রনাথ এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে হরপ্রসাদ-বাবুকে ও আমাকে আলাদা-আলাদা চিঠি লিখে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই সংখ্যাটির জন্যে সুধীনের কাছেও আমি বাহবা পেয়েছি।

তিনমাস পরে রবীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। দেশ জুড়ে উঠল হাহাকার। নিমন্তলা ঘাটের উদ্ভাস্ত জনতার মাঝখানে দেখা হল সুধীন দত্তর সঙ্গে। আমাদের অনেকেরই মতন সে বেড়াচ্ছিল দিশাহারা হয়ে। তার তখনকার কথা এখনও আমার কানে বাজে : ‘Habul, its going to make a difference.’

সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন জার্মানির সঙ্গে মরণ-বাঁচন লড়াই করছে। মনে আছে ঐ সময় আমি বন্ধুমহলে একদিন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম—সোভিয়েত যখন ফ্যাসিস্ট শক্তির মোকাবিলা শুরু করেছে, তখন আমরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে কি তা থেকে নির্লিপ্ত থাকতে পারি?

আমার মার্কসবাদী বন্ধু সেদিন এজন্য আমাকে কঠোর তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু কয়মাসের মধ্যেই এই মার্কসবাদের আলোতেই একথা পরিষ্কার হল যে নির্লিপ্ত থাকা চলে না, কারণ এ যুদ্ধ ‘জনযুদ্ধ।’

ইতিমধ্যে ‘পরিচয়’-এর সভায় হীরেনবাবু সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে একটি ইস্তেহার লিখে নিয়ে গিয়ে তাতে স্বাক্ষর আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু সুধীন রাজি হয় নি।

আরও ক-মাস গেল। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ মিছিল করে একটি ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে ঢাকার রাজপথে নৃশংসভাবে নিহত হল সোমেন চন্দ। ‘পরিচয়’-এ এই ঘটনাকে উল্লেখ যে ক্ষুদ্র নিবন্ধটি ছাপা হয়েছিল, নীচে তা তুলে দিলাম :

‘লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর পটভূমিকায় একটি মাত্র লোকের মৃত্যু অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বিশেষ পরিবেশে একজনের মৃত্যু বহু মৃত্যুর চাইতে বেশি অর্থবহ হতে পারে। সোমেন চন্দ্রের মৃত্যু এই জাতীয়। সোমেনের বয়স বেশি হয় নি, কিন্তু এই অল্প বয়সেই মূল্যবান কাজ করে সে তার তরুণ জীবনকে বিরল সম্পদে ঐশ্বর্যবান করেছিল। এই পত্রিকায় গত সংখ্যায় ‘ইদুর’ নামে যে গল্পটি প্রকাশিত হয়, তাতে তার জীবনের একটিমাত্র দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সে পরিচয় আমাদের আশ্চর্য করে দেয়, কিন্তু এই তার পুরো পরিচয় নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব জীবনের বিদ্যুততর ক্ষেত্রে তাঁর অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার প্রতিভাস মাত্র। এই অভিজ্ঞতাকে সজীব ও গভীর করেছিল বিশেষ একটি আদর্শ। সোমেন মার্কসবাদী ছিল। এই মার্কসবাদের প্রেরণাতেই সে ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নিষ্ঠীকভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে প্রাণ বলি দিতে হল এই বর্বরতারই যুগকাঠে। সব থেকে শোচনীয় ব্যাপার এই যে সোমেনকে যারা হত্যা করেছে তারা জার্মান, ইটালীয় বা জাপানী নয়, তারা আমাদেরই দেশের লোক। ফ্যাসিস্ট বর্বরতার প্রভাব কী রকম ব্যাপক ও তার বিরুদ্ধে আমাদের কতখানি সতর্ক হওয়ার দরকার আছে এই ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আশার কথা এই যে সোমেনের মৃত্যু ব্যর্থ হয় নি। তার প্রমাণ পেলাম তার নামে উৎসর্গীকৃত ‘প্রাচীর’ নামে যে কবিতা সংগ্রহ দক্ষিণ কলকাতার ছাত্র সঙ্ঘ প্রকাশ করেছেন তার থেকে। দেশের আবালবৃদ্ধবণিতার উচিত যে পথে সোমেন অগ্রণী হয়ে প্রাণ দিল সেই পথে তার অনুসরণ করা। সমগ্র দেশের সামনে আজ এই একমাত্র পথ।’

এই রচনাটি পড়ে নীরেন আমাকে বলেছিল : ‘পরিচয়’ এতদিনে মোড় ফিরল।’

আমার সেদিন মনে হয়েছিল ইংরেজ কবি Dylan Thomas-এর একটি কবিতার লাইন :

After the first death,
there is no other.

‘পরিচয়’-এর ৪৫ বৎসরে

গোপাল হালদার

‘পরিচয়’-এর ৪৫ বৎসরের শেষের দিককার প্রায় ২৫ বৎসর আমি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলাম, কিছু সময় বাদ দিলে সম্পাদনার দায়িত্বও অনেকটা ছিল আমার উপরে—অবশ্য তার ভার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অন্যেরাও বহন করেছেন। প্রথম দিককার ২০ বৎসর ‘পরিচয়’-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল নিঃসম্পর্কিত সুদূর পাঠকের। সশ্রদ্ধ ছিলাম, কিন্তু নিজে সগোত্র বলে অনুভব করতে পারিনি। তথাপি এখনো মনে হয়, সেই সময়েই গিয়েছে ‘পরিচয়’-এর সর্বাধিক গৌরবের কাল—বিশেষ করে ত্রৈমাসিক ‘পরিচয়’-এর সেই পর্ব। সেই সময়টার কথা বলবার অধিকারী আমি নই। বলবার অধিকারী শ্রদ্ধেয় গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল (হাবলবাবু), শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, সুশোভন সরকার প্রমুখ ‘পরিচয়’-এর আগেকার পরিচালকরা। হাবলবাবু সে অধ্যায় বলতে বসেও শেষ করেন নি—এ জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ দূর হবে না। কারণ, তা শুধু ‘পরিচয়’-এর বা বাঙলা মাসিকপত্রের ইতিহাসের প্রতি তাঁর অবিচার নয়, বাঙলা পাঠকের প্রতিও বিশেষ নিষ্ঠুরতা—বাঙলা গদ্যের এমন সরস একটি বস্তু পাঠকের মুখে ছুঁইয়ে যিনি সর্বোচ্চ সরিয়ে নিয়ে যান, তিনি কারও কাছেই ক্ষমার নন। অন্তত আমার কাছে নন।

আমরা—অন্তত আমি—শেষ ২৫ বৎসরের কথাই শুধু বলতে পারি।

আমাদের এই ২৫ বৎসরেও ‘পরিচয়’-এর একটা নতুন রকমের প্রতিশ্রুতি দেখা না গিয়েছে তা নয়। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি কর্মে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছিল, আমি তা মনে করি না। নিশ্চয়ই তার কারণও ছিল। আশাউদ্যোগে ভরা সেই ২৫ বৎসরে আমাদের আত্মীয় জীবন বিজ্ঞাপ্তিতে ও কুয়াশায় যেমনভাবে আপনাকে পেতে পেতে হারিয়ে ফেলেছে, আর মানুষের মুক্তিসংগ্রামের এই ঐতিহাসিক ২৫ বৎসর যেমন করে বিপুল জটিলতার মধ্য দিয়ে কুয়াশা কাটিয়ে আলোকের তীরে উদ্ভীর্ণ হয়ে গিয়েছে, ‘পরিচয়’-এর সংকল্প ছিল সেদিনের সেই পঞ্চটিকে বাঙালি পাঠকের সমুখে বাস্তব দৃষ্টিতে আলোকিত করে তোলা এবং বাঙালি সংস্কৃতি জীবনকেও মানব-সংস্কৃতির সমাগত অভ্যুদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু এত বিরাট

ও জটিল দায়িত্বকে বহন করার মতো যথেষ্ট শক্তি ‘পরিচয়’-এর তখন হয় নি। কারণ সফল যতই থাকুক, ‘পরিচয়’-এর পক্ষে সেই জাতীয় বিদ্রোহী বিদূরিত করে জাতীয় জীবনকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করাও অসাধ্য ছিল, বিদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিজ সাধনায় আত্মস্থ হওয়াও সম্ভব হয় নি। এই মূল সত্যটা স্বীকার, তাই ‘পরিচয়’-এর এই ক্রটির অন্য দেশ ও কালকে দায়ী না করে অকপটভাবেই স্বীকার্য—ক্রটি স্পষ্টত ‘পরিচয়’-এর কর্তৃপক্ষের, এবং সর্বাধিক স্বভাবতই তার— যে এই প্রায়-সমস্ত সময়টা ছুড়ে তাঁদের পক্ষ থেকে নিয়েছিল সম্পাদনার দায়িত্ব। ‘পরিচয়’-এর এই শেষ পঁচিশ বৎসরের কথা মনে করতে গেলে সবিস্ময়ে এই ব্যক্তিগত ক্রটি ও অযোগ্যতার কথাটাই আমার প্রথম মনে আগে।

এর পরে এই পঁচিশ বৎসরের কথা যা যথোচিত সংযত বিনয়ে বলা যায়, তাও এখন বলা যেতে পারে।

‘পরিচয়’-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘পরিচয়’ প্রচুর সাহস নিয়েই যাত্রারম্ভ করতে পেরেছিল—তখনকার তার যুদ্ধকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের অভাব ছিল না, উৎসাহেরও না। কারণ, ভারতের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন বাঙালি সাংস্কৃতিক জীবনে তখন প্রবল প্রবাহের সঞ্চার করেছে। ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলন (‘আই-পি-টি-এ’) তখন যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, এখনকার ভারতীয় চলচ্চিত্র ও নাট্য জগতের সৃষ্টি ও বস্তুদের মধ্যে—তিনিশ বৎসর পরেও—তার দান সুস্পষ্ট। বাঙলাই ছিল তার পীঠস্থান। শত বিবর্তনের মধ্যেও আমরা জানি বাঙালার চলচ্চিত্রে বা বাঙালার রঙ্গমঞ্চের আজও সেই প্রগতিবাদী নাট্যশিল্পীদের দান অম্লান। তার প্রেরণাতে নতুন নতুন শিল্পীরা পরেও অগ্রসর হয়ে এসেছেন। শিল্পে-সঙ্গীতেও তখন দেখা দিয়েছে আকস্মিক জোয়ার। প্রগতি শিল্প ও সাহিত্য আন্দোলন তখন সমস্ত বাঙালি জীবনকে—শহরে-গ্রামে, শত শত ক্ষেত্রে—আন্দোলিত ও উদ্ভুদ্ধ করে তুলেছে। এই পরিবেশেই দ্বিতীয় পর্বের ‘পরিচয়’-এর জন্ম। নিশ্চয়ই বহুমুখী এই প্রগতি আন্দোলন প্রধানত রাজনৈতিক বামশক্তির দ্বারাই পুষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে সংগঠিত হয়েছিল তখনকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে, সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সি. সি. জোশীর দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তিতে। সুধীক্ষনাথ যথোচিত নগদ মূল্যে ‘পরিচয়’ যখন হস্তান্তরিত করেন তখন ‘পরিচয়’-গোষ্ঠীর প্রধান সুহৃদদেরও সন্দেহ ছিল না—পরিবর্তিত কালের মধ্যে ‘পরিচয়’-এরও জন্মান্তরের দিন এসেছে। এবং সেই জন্ম ও জীবন কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সুহৃদদের শুভোদ্যোগ ও সহায়তাকে সক্রিয় চিত্তে গ্রহণ করেছিল। এবং ‘পরিচয়’-এর প্রগতি ঐতিহ্যকে স্বীকার করে সে ঐতিহ্যের যুগোচিত রূপায়ণে তাঁদের

অকুণ্ঠিত সহযোগিতা অর্জন করেছিল। হিরণ সান্যাল ও নীরেন রায় শুধু নন—তারা তো যুগ্মসম্পাদকই ছিলেন। ‘পরিচয়’-এর উপদেশকমণ্ডলীতে আজও প্রবীণদের নাম দেখা যায়, তাঁদের লেখা ও সহযোগিতা থেকে ‘পরিচয়’কে তাঁরা কখনো বিমুখ করেন নি। অথচ ‘পরিচয়’-এর ভুলত্রান্তির জন্য তাঁদের বন্ধুসমাজে সময়ে সময়ে কম অন্ধুশাঘাত সইতে হয় নি। তবু ‘পরিচয়’ তাঁদের আপনার থেকে গিয়েছে, পঁচিশ বৎসর ব্যাপী সহযোগিতায় ও সহমর্মিতায় লালিত হয়েছে।

এই পঁচিশ বৎসরের আরও এক-আধটুকু কথা হয়তো এই প্রসঙ্গে আমারই জ্ঞানাতে উচিত। কমিউনিস্ট পার্টি ‘পরিচয়’কে কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা করতে চায় নি। তাঁদের উপদেশ বুঝেই আমরা লিখতে সাহসী হয়েছিলাম : নতুন যুগের নতুন দৃষ্টি ও নতুন যুগের নতুন সৃষ্টির পরিচয় বহন করবে ‘পরিচয়’, ‘পরিচয়’-এর মত আছে কিন্তু মতবাদ নেই। এই নীতি বৎসর কয় পরে পালনের পক্ষে বাধা হয়, তা সত্য। দু-রকমের বাধা দেখা দিয়েছিল—(ক) পার্টির মধ্যে গৌড়ামির প্রবলতা, (খ) পার্টির বন্ধুহানীয়াদের মধ্যে ‘পরিচয়’-এর ভূমিকা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অসহিষ্ণুতা। ‘পরিচয়’ পার্টির কাগজ মাত্র—এই আশ্রয় ধারণার জন্য বন্ধুদের হাতেই সম্পাদকদের গঞ্জন সইতে হয়েছে বেশি—পার্টিনেতৃত্বের হাতে নয়। নেতৃত্ব যখন বিরূপ হয়েছেন, তখন কার্যতই তা প্রকাশ করেছেন—তদনুরূপ ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন। তবে একথা তো এখন সর্বস্বীকৃত—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভুল করলেও প্রায়শ সে ভুল ছিল অপরিণত মার্কসবাসী চেতনার ভুল, ক্ষুদ্র কোনো ক্ষমতার স্বল্পজনিত ভুল নয়। ‘পরিচয়’-এর পাতায় তার প্রমাণ সঞ্চিত হয়ে আছে। তবে, সে ভুলের সঙ্গেই অবশ্য এসে ছুটত অপরিণত শিল্প ও সাহিত্যবোধেরও ভুল। আর ভুল সংশোধিত না হলে দৃষ্টিবিকৃতি অনিবার্য হতে বাধ্য, তার চিহ্নও ‘পরিচয়’-এ কিছু না কিছু এখনো জমা হয়ে আছে। সম্পাদকের ব্যক্তিগত মত যাই হোক, এ দায়িত্ব তারই—তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

এত সঙ্কেও দ্বিতীয় পর্বের পঁচিশ বৎসরের ‘পরিচয়’ কি তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে পেরেছে? এর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন ‘পরিচয়’-এর তৎকালীন ও একাঙ্গীন পাঠকসমাজ, আমরা নই—অন্তত আমি নই। কারণ তাঁদের অপেক্ষাও আমি তার ক্রটির—ও নিজের অক্ষমতার—দিকই বেশি দেখি।

ব্যক্তিগতভাবে তবু আমার কিছু গোপন গর্বও আছে। যত অক্ষমই আমরা হই—একবার অর্থাভাবে যখন ‘পরিচয়’-এর প্রকাশ দুর্ঘট হয়, একজন রাজনৈতিক অগ্রজ (কংগ্রেসপন্থী) লিখে পাঠালেন—“‘পরিচয়’ কি বেরুবে

না? মাসে মাসে দু-একটি ভালো প্রবন্ধ পড়বার সুযোগ থেকেও কি বঞ্চিত থাকব?" কিন্তু শুধু প্রবন্ধই বা কেন? বিষ্ণু দে, বিমল ঘোষ, অরুণ মিত্র, সুভাষ-সুকাশ প্রমুখই কি 'পরিচয়'-এর কম গর্বস্থানীয়? মঙ্গলাচরণ, গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতির? কিংবা তারাশঙ্কর-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়? আমার তো মনের গোপন গর্ব তাঁদের নিয়ে 'পরিচয়' সাহিত্য-জীবনের সূচনায় যাদের স্বাগত করেছিল। হঠাৎ নাম করতে গেলে নিশ্চয় অনেক নাম বাদ পড়ে যাবে—তবু 'পরিচয়'-কে এ সম্মান থেকে বাদ দেবেন না বোধ হয় সমরেশ বসু, অসীম রায়, দেবেশ রায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

'পরিচয়'-এর ৪৫ বৎসরে আমাদের মতোই তার লেখকরাও কামনা করবেন—'পরিচয়' চিরায়ু হোক, মাসিকপত্র হিসেবে তার সংগঠন সুস্থির হোক এবং অক্ষ-অম্মান্তরের ঐতিহ্য নিয়ে দেশ ও কালের সঙ্গে স্থিরতর আলোকের যুগে উজ্জীর্ণ হোক।

পরিচয়ের দিনগুলি

কুন্দভূষণ ভাদুড়ী

পরিচয় পত্রিকা সুবর্ণ-জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশ করছেন শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু যখন সম্পাদক মহাশয় আমাকে পত্রিকার সেকাল সম্পর্কে কিছু লিখতে অনুরোধ করলেন তখন অত্যন্ত বিরত বোধ করলাম। সেই সময়ের কথা ভাবতে গিয়ে দেখি অনেক কিছুই ঝাপসা হয়ে গিয়েছে এবং লিখতে গিয়ে কিছু ক্ষেত্রে হয়ত উদোর পিণ্ডি বুখোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেব। সেই সময়ের পরিচয় পত্রিকাগুলিও আজ আর আমার কাছে নেই। কলকাতার পাট চুকিয়ে চাকরি নিয়ে বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে আসবার সময় সেগুলি একজনের কাছে রেখে এসেছিলাম। পরে তা আর উদ্ধার করতে পারি নি। তাই তথ্যগত ভুল বিশেষ না থাকলেও সময়, সন, তারিখ ও সংখ্যা সম্পর্কে কিছু ভুল ত্রুটি থাকতেও পারে।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, তখনও আমি প্রকাশনার রাজ্যে প্রবেশ করিনি। কৃষ্ণগরে নিজেই বাড়িতে থাকি। আমার নিকট আত্মীয় ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী পরিচয়ের প্রথম সংখ্যা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই পরিচয়ের সঙ্গে যে অদূর ভবিষ্যতে জড়িয়ে পড়তে হবে তা তখন ভাবতেও পারি নি। এর প্রায় বছর খানেক পরে আমি বালিগঞ্জ প্রবোধদার বাড়িতে চলে আসি। প্রকাশনার বিষয়ে উৎসাহ দেখে তিনি আমাকে বাড়িতে থেকে কিছু বই ছেপে দোকানে-দোকানে বিক্রির জন্যে জমা দিয়ে ছোট ভাবে প্রকাশনার কাজ আরম্ভ করতে পরামর্শ দিলেন। ব্যবসায় উন্নতি হলে দোকান করা যাবে এই ভেবে কাজ শুরু করে দিলাম। প্রবোধদার খরচে তাঁর 'ভারত ও ইন্দোচীন' বইটি প্রকাশ করি। দ্বিতীয় বই ধূসরটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'চিন্তামসি।' এর পর প্রমথ চৌধুরীর 'নীল লোহিতের আদিপ্রেম।' এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে। বই প্রকাশিত হলে চৌধুরী মহাশয়কে পাঁচখানা বই দিতে গেলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। আর-বই লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাঁর স্বভাবলিঙ্গ ভদ্রিতে বললেন, 'আর একখানাও লাগবে না। যারা পয়সা দিয়ে বই কিনতে পারে তাদের বিনে পয়সায় বই দিতে যাব কেন।' এর পর আরও অনেক লেখক আমাকে দিয়ে তাঁদের বই প্রকাশ করালেন। কোনটা আমার খরচায় কোনটা বা তাদের খরচায়। তবে বেশির ভাগ বই ছিল কবিতা

ও প্রবন্ধের।

এতদিন দোকানে-দোকানে বই জমা দিয়ে চলছি। কিন্তু তাতে দেখা দিল নানা অসুবিধে। তাই একটা দোকান খোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর সাহায্যে ২৪/৫এ, কলেজ স্ট্রিট, মেডিকেল কলেজের সামনে, ‘ভারতী ভবন’ খোলা হল। তবে ঐ স্থানটি বই-এর দোকানের উপযুক্ত ছিল না।

এইবার পরিচয় প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রবোধদার বাড়িতে থাকার সময় একটা বিষয় লক্ষ্য করেছিলাম যে মাসের একটা শুক্রবার, বোধহয় প্রথম শুক্রবার, একটা বৈঠক হয়। সন্ধ্যার সময়ে কয়েকজন আসতেন, চা, সিঙ্গাড়া ইত্যাদি খাওয়া হত ও সেই সময় নানা বিষয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক ও গল্পগুচ্ছ হত। এইটাই সেই পরিচয়ের বিখ্যাত বৈঠক। মাসের অন্য তিনটি শুক্রবার বৈঠক হত সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বা অন্য কোন সভ্যদের বাসগৃহে। পরিচয়ের এই আড্ডা বা বৈঠকে অন্যদেশের সাহিত্য এবং পরিচয়ের পরিচালনা বিষয়েও আলোচনা হত। এই বৈঠকে যাদের দেখেছি তাদের মধ্যে ছিলেন—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুশোভন সরকার, হিরণকুমার সান্যাল, হারীতকৃষ্ণ দেব, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ধুজ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কলকাতায় থাকলে), সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, কসন্তকুমার মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং আরও অনেকে।

এই সময়ে একদিন ধুজ্জটিবাবু জানালেন যে তাঁর ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিঠির মাধ্যমে সঙ্গীত বিষয়ে একটা আলোচনা চলছিল। তিনি আমাকে কবিগুরুর অনুমতি নিয়ে এই পত্রগুচ্ছগুলি প্রকাশের প্রস্তাব দিলেন। আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ধুজ্জটিবাবুর চিঠি নিয়ে জোড়াসাঁকোর উপস্থিত হয়ে কবির অনুমতি চাইলাম। কবিগুরু সানন্দে অনুমতি দিলেন। পত্র-সংকলনটি ‘সুর ও সঙ্গীত’ নামে প্রকাশিত হয়। সেদিন রবীন্দ্রনাথের সামনে গৌরবর্ণ, উন্নতনাসা, দীর্ঘদেহী, প্রসন্নমুখ এক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন যাকে দেখলেই মনে একটা ছাপ থেকে যায়। বাড়িতে এসে প্রবোধদাকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিচ্ছিলাম এবং কথা-প্রসঙ্গে কবির সামনে উপস্থিত ঐ ভদ্রলোকের কথাও বললাম। চেহারার বিবরণ শুনে প্রবোধদা বললেন যে উনি নিশ্চয়ই পরিচয়-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবোধদার এই উক্তি যে ঠিক তা ক-দিন পরেই জানতে পারলাম। ১০/১৫ দিন পরে প্রবোধদার বাড়ির পরিচয়ের বৈঠকে যোগ দেবার জন্যে আমি আমন্ত্রিত হলাম। উক্ত বৈঠকে সুধীনবাবুর সঙ্গে পরিচিত হলাম এবং তিনি আমাকে পরিচয় পরিচালনার ভার দেবার জন্যে এক প্রস্তাব দিলেন। প্রথম দু-বছর উনি নিজেই সব কিছু দেখাশোনা করতেন। পরবর্তী দু-বছর পরিচালনার দায়িত্ব

নেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (পরে 'উত্তরা' সম্পাদক)। সুরেশবাবু বেনারসের বাসিন্দা। সুদূর বেনারস থেকে কলকাতায় এসে পত্রিকা পরিচালনা করতে তিনি অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। তাই তিনি এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছিলেন। সুধীনবাবু পঞ্চমবর্ষ থেকে পরিচয়ের পরিচালক ও প্রকাশক হতে আমাকে অনুরোধ করেন। সেই সঙ্গে আশ্বাস দিলেন যে তিনি নিজে এবং গোষ্ঠির অন্যান্যরা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ও অন্য ব্যাপারে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। আমার অমত না থাকলে পরের দিন কথাবার্তা পাকা করার জন্যে তাঁর বাড়িতে আসতে অনুরোধ করলেন। তখন আশ্রাট মাস, শ্রাবণ সংখ্যা প্রেসে দেওয়া দরকার। সেই জন্যে এই ব্যস্ততা।

পরের দিন সুধীনবাবুর হাতিবাগানের বাড়িতে খোলাখুলি সব কথাবার্তা হল। স্থির হল যে পরিচয়ের লাভ বা ক্ষতি সব আমার, তবে প্রথম দু-বছরের মধ্যে কোন ক্ষতি হলে সুধীনবাবু বছরে পাঁচশ টাকা পর্যন্ত আমাকে দেবেন। যতদূর মনে পড়ছে, প্রথম বছর তাঁর কাছ থেকে দুশ টাকা নিতে হয়েছিল। তারপর পরিচয় আমার পরিচালনাধীন যতদিন ছিল তার মধ্যে আর কোন টাকা নিতে হয় নি। তবে লাভও বিশেষ হয় নি। প্রায়-না-লাভ-লোকসানের ভিত্তিতেই চলেছে।

পরিচয় কার্যালয় স্থাপিত হল ২৪/৫এ, কলেজ স্ট্রিট, ভারতী ভবনে। আমার পরিচালনায় পরিচয়ের প্রথম সংখ্যা, অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষ, ১ম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৪২ প্রকাশিত হল। ছাপা হয়েছিল শ্রীসরস্বতী প্রেসে।

আমার হাতে পরিচালনার ভার আসার পর পরিচয় গোষ্ঠি-বহির্ভূত লেখকেরা তাঁদের লেখা প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি পরিচয় কার্যালয়ে নিয়ে আসতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই কবি ও প্রবন্ধকাররূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই সব লেখা নিয়ে আমি সুধীনবাবুর কাছে প্রায়ই যেতাম। তিনি নতুন লেখাগুলি পড়ে দেখবার জন্যে রেখে দিয়ে মনোনিীত লেখাগুলি পরিচয়ে ছাপবার জন্যে দিতেন। পরিচয় গোষ্ঠির লেখকদের রচনা মূলতঃ স্থান পেলেও গোষ্ঠিবহির্ভূত লেখকদের রচনা, বিশেষ করে কবিতা, পরিচয়ে প্রকাশিত হতে লাগল। গোষ্ঠির লেখকেরা তাঁদের রচনা সরাসরি সুধীনবাবুর কাছে দিতেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রতি সংখ্যার জন্যেই লেখা দিতেন।

কিছুদিন পর পরিচয় কার্যালয় ও ভারতী ভবন কলেজ স্ট্রিট থেকে কলেজ স্কোয়ার (বর্তমানে বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রিট) সংস্কৃত কলেজের সামনে স্থানান্তরিত হল। এই সময় আমি পরিচয়কে ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত করার এক প্রস্তাব দিলাম। আমার তখন ধারণা হয়েছিল যে ত্রৈমাসিক হওয়ার দরুন পরিচয় ব্যবসায়িক দিক থেকে তেমন সাফল্যলাভ করছে না। অনেক আলোচনা-আলোচনার পর অবশেষে আমার প্রস্তাব গৃহীত হল। আমাকে

নভেম্বর ২০০০—জানুয়ারী ২০০১] পরিচয়ের দিনগুলি

জানানো হল যে এ বিষয়ে সব দায়িত্বই আমার তবে তাঁরা আগেকার মতো আমার সঙ্গে সব বিষয়ে সহযোগিতা করবেন। তাঁদের কথা তাঁরা রেখেছিলেন। বিশেষ করে, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ও গিরিজাপতি ভট্টাচার্য বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছেন। সেই সময়ে বিজ্ঞাপনের দর ছিল—সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ২০ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২ টাকা, মজাট ৪র্থ পৃষ্ঠা ৪০ টাকা।

যতদূর মনে পড়ছে পরিচয় ৫০০ কপি করে ছাপা হচ্ছিল। স্থানীয় গ্রাহক ছিল ১০০, স্টলে বিক্রি প্রায় ১০০ কপি, complimentary ইত্যাদি প্রায় ১০০ কপি। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে সব যুবক ভারত-মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ রাজের রোযানলে পড়ে রাজবন্দী হয়ে বন্দীনিবাসে দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁদের অনেকে পরিচয়ের গ্রাহক ছিলেন। ওপরের হিসেব সম্পূর্ণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে দিলাম। তাই ভুলত্রুটি থাকতে পারে।

যাই হোক, পরিচয় মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হল। এবার কিছু বেশি ছাপা হল। বার্ষিক চাঁদা ও প্রতি সংখ্যার মূল্য পূর্বে ছিল যথাক্রমে ৪ টাকা ও ২ টাকা। এবার হল যথাক্রমে ৫ টাকা ও আট আনা।

এই প্রসঙ্গে একজনের নাম আমার আগেই করা উচিত ছিল। তিনি হলেন অমৃত বাগচী। ইনি বিজ্ঞাপন ও লেখা আদায় ইত্যাদি ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

পূর্বে লেখা সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ ভাবে হত না কারণ গোষ্ঠির লেখকদের মধ্যে থেকেই যথেষ্ট লেখা পাওয়া যেত কিন্তু এখন মাসিক হবার পর প্রচুর লেখার প্রয়োজন দেখা দিল। আমরা প্রস্তাবে স্থির হল যে এখন থেকে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের একটা করে গল্প ও ধারাবাহিক উপন্যাসের এক কিস্তি প্রতি মাসে ছাপা হবে এবং এইসব লেখকদের লেখার জন্যে কিছু টাকাও দেওয়া হবে। ফলে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যুবনাথ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ও আরও অনেকের লেখা গল্প ছাপা হতে লাগল।

এদিকে পরিচয় কার্যালয় কলেজ স্কোয়ারে আসার পর এখানেও একটা আড্ডা গড়ে উঠল। এখানে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, রজত সেন, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অমিয় গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ নীরদ ভট্টাচার্য, আশানন্দ নাগ এবং আরও অনেকে যাঁরা তখনই সাহিত্য জগতে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এখানেই একদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি উপন্যাস দিতে বললে তিনি সম্মত হন এবং মাসখানেকের মধ্যেই

উপন্যাসের প্রথম কিস্তি দিয়ে যান। এই উপন্যাসটি পরিচয়ে ‘অহিংসা’ নামে প্রকাশিত হয়। এরপর যে-সব ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে ছিল—ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী অনুদিত একটি ফরাসী রচনা (নাম মনে পড়ছে না), হিরণকুমার সান্যাল অনুদিত E.M. Forster- এর A Passage to India অসম্পূর্ণ) এবং বিত্ত মুখোপাধ্যায় অনুদিত Alphonse Datdet-এর Sapho।

একটা কথা বলা হয়নি। এতদিন পরিচয় অন্য প্রেসে ছাপা হচ্ছিল। আমি ভাবলাম যে পরিচয় থেকে তো বিশেষ কিছু আয় হয় না—সেইজন্যে একটা ছাপাখানা যদি করা যায় তাহলে সেখানে থেকে পরিচয় ছাপা হবে এবং বাইরের অন্য ছাপার কাজও করা যাবে। অতএব অনেক চেষ্টায় কিছু টাকা সংগ্রহ করে একটা ছোট প্রেস দীনবন্ধু লেন-এ স্থাপন করলাম। সুধীনবাবুর অনুমতি নিয়ে প্রেস-এর নাম দিলাম ‘পরিচয় প্রেস।’ পরিচয় কার্যালয় ৮বি, দীনবন্ধু লেন-এ স্থানান্তরিত হল।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। সুধীনবাবু আগেই পরিচয় সম্পাদনার ভার হিরণকুমার সান্যালের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং কিছু সময় পর পরিচয় বর্তমান পরিচালকদের হাতে পরিচালনার ভার হস্তান্তরিত হয়। যতদূর মনে হয়, পরিচয় চতুর্দশ বর্ষ পর্যন্ত আমার পরিচালনায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই দশ বছর যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি বা যাদের সংস্পর্শে এসেছি আমার প্রতি তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা বা অযাচিত সাহায্য আমার জীবনের সম্পদ এবং এই দিনগুলিকে আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণযোগ্য দিন বলে এখনও গণ্য করি।

১. ‘পরিচয়’ প্রসঙ্গে

অমলদাশকর রায়

ইউরোপ থেকে ১৯২৯ সালের শেষভাগে ফিরে এসে বাংলাভাষায় নতুন একখানি মাসিক বা ত্রৈমাসিকপত্রের প্রয়োজন অনুভব করি। তাতে থাকবে এ যুগের আধুনিকতম চিন্তাধারার সঙ্গে এ দেশের চিন্তাশীলদের চিন্তা সংযোগ। এ রকম সাময়িকপত্রকে ও দেশে বলা হয় রিভিউ। সাধারণত আমরা যা দেখি তা ম্যাগাজিন। তবে বাংলা সাহিত্যে যে এর দৃষ্টান্ত নেই তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ ত আদতে একটি রিভিউ। রবীন্দ্রনাথের ‘সাধনা’ ও তাই। প্রথম চৌধুরীর ‘সবুজপত্র’-ও সেই জাতীয়। সুতরাং ‘পরিচয়’ প্রকাশের উদ্যোগেরা যখন আমাকে চিঠি লেখেন আমি সুধীন্দ্রনাথকে লিখি যে ওটি হবে ফরাসীদের একখানি প্রসিদ্ধ রিভিউয়ের অনুরূপ। তিনি বিনীতভাবে উত্তর দেন যে অত বড় দুরূহা তাঁর নেই।

বস্তুত সেরকম লেখকদল তাঁর ছিল না। যাঁদের নিয়ে তিনি তাঁর মহৎ প্রচেষ্টায় ধন ও মন নিয়োগ করেছিলেন তাঁরা সকলেই যদিও উচ্চশিক্ষিত ইনটেলেকচুয়াল তবু তাঁদের অধিকাংশই তাঁর বন্ধুবান্ধব বা শুভানুধ্যায়ী। যেমন রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ। কে যেন আমাকে বলেছিলেন যে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে বাইরে রাখতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু কবি যখন স্বতঃপ্রসূত হয়ে ভিতরে আসতে চাইলেন তখন তাঁকে ঠেকাবে কে? কার এত সাহস? তেমনি হীরেন্দ্রনাথের বাড়িতে বসে তাঁকে এড়ানো অসম্ভব। ফলে যা হল তা সম্পাদকের সমবয়সী বা সমসাময়িক নবীনদের মুখপত্র নয়।

তবে ‘পরিচয়’কে কেন্দ্র করে একটি সালোঁ জাতীয় মিলনস্থর প্রবর্তিত হয়। সেটা তাঁর বাড়ির শুক্রবারের আসর। ওটা ঠিক বাঙালির আড্ডা নয়। অস্তিত্ব গোড়ার দিকে ছিল না। সুধীন্দ্রনাথের আর্থিক সম্বল যথেষ্ট হলেও কলকাতা প্যারিস নয়, এখানে সদ্যপ্রকাশিত বিদেশী বই আমদানি করা সম্ভব হলেও বিভিন্ন ইনটেলেকচুয়াল মহলের সঙ্গে ভাববিনিময় নেই। অধিকন্তু নেই বিভিন্ন আর্টিস্টগোষ্ঠির সঙ্গে যোগাযোগ। প্যারিসকে যা তাজা রেখেছে কলকাতাতে তা নেই। এখানে সবই চলতি। সুধীন্দ্রনাথের ও তাঁর বন্ধু বান্ধবদের আর্থিক সম্বল যথেষ্ট ছিল না। যামিনী রায়ের দ্বারা সে অসম্ভব কতদূর পূরণ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথের অন্তর্ধানের পরেই

তিনি নবকল্লেখের ধারণা করেন। মূর্তিমান সাহেব বাস করতে যান সাহেবপাড়ায়। সেখানে তাঁকে সঙ্গ দেন বহু বাঙালি ও অবাঙালি সাহেব-মেমসাহেব।

জীবনের এই নবপর্যায়ের সঙ্গে ‘পরিচয়’ বন্ধুমণ্ডলী কী করে খাপ খাবে? আর বন্ধুমণ্ডলী না থাকলে ‘পরিচয়’ থাকে কী করে। এটা একপ্রকার আশ্মিক সঙ্কট আর্থিক সঙ্কট নয়।

স্থানান্তরে পূর্বেই তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে ‘পরিচয়’ তিনি আর চালাতে পারছেন না, তেমন মনের জোর আর তাঁর নেই। পরে শুনতে পাই ‘পরিচয়’ উঠে যায় নি, তার হস্তান্তর হয়েছে। যাদের হাতে গেছে তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন মার্গের লেখক। তাঁরা আমার কাছে লেখা চান না, আমাকে পত্রিকা পাঠান না। সুতরাং সম্পর্ক ছিন্ন হয়। দীর্ঘ ব্যবধানের পর ‘পরিচয়’ অপেক্ষাকৃত মুক্ত। সুতরাং আমার পক্ষেও আর কোনো বাধা থাকে না। একবার তো আমার একটি প্রবন্ধ সর্বত্র প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেখানেই ঠাঁই পায়। ‘পরিচয়’ শতং জীবতু।

পরিচয়ের সুবর্ণ-জয়ন্তী

সুশোভন সরকার

পরিচয়ের প্রথম সংখ্যা পাতা উলটিয়ে দেখিলাম। আমার মতে প্রথম সংখ্যার লেখকদের মধ্যে আত্মও যীরা জীবিত আছেন তাঁদের সকলের কাছ থেকেই এই জয়ন্তী উপলক্ষে কয়েক লাইন সংগ্রহ করে বিশেষ সংখ্যাটিতে প্রকাশ করা উচিত। উপদেষ্টা মণ্ডলীতে রয়েছে আমরা তিনজন (গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে আর আমি)। অন্য লেখকদের মধ্যে রয়েছেন অন্নদাশংকর রায়, সুধীরকুমার চৌধুরী, মণীন্দ্রলাল বসু, ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য। পরিচয়ের প্রথম সংখ্যার মলাটে ছিল গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের সুন্দর হস্তলিপিতে ‘পরিচয়’ নামটি। কি দোবে সেটা বর্জিত হয়েছে জানি না। বিশেষ সংখ্যার ঐ অংকিত নামটি কি আবার দেওয়া অনস্বয়? বিশেষ আমরা খুশি হই।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে আমার আলাপ হয় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সৌজন্যে। আমি তখন ঢাকায় কাজ করি, ছুটি কাটাই কলকাতাতে। খুব সম্ভব ১৯৩১-এর গরমের ছুটিতে এই প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

তখনলাম ‘পরিচয়’ নামে এক ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করা হচ্ছে। নীরেন্দ্রনাথ রায় আমাকে ধরলেন একটা প্রবন্ধের জন্য, প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হবে। আড়ষ্ট শুদ্ধ বাংলায় লিখলাম ‘রূপ বিপ্লবের পটভূমিকা’। চিঠি ছাড়া আগে তখনও বাংলাতে কিছু লিখি নি। আমার খুবই সংকোচ হয়েছিল, অবাক হলাম যখন তখনতে পেলাম লেখাটি মনোনীত হয়েছে। একদিন সুধীন্দ্রনাথের বাড়িতে গেলাম, তিনি দেখালেন প্রথম সংখ্যার ‘ডামি’ খান ইন্টের মতন মোটা।

ছুটির পর ঢাকায় গিয়ে একদিন মুদ্রিত প্রথম সংখ্যা পেলাম। সেদিন পরীক্ষার হলে বইটি হাতে নিয়ে ঘোরা-ফেরা করছিলাম। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি এই ঘটনা তাঁর এক স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন। এরপর যখনই ছুটিতে কলকাতায় আসতাম, তখনই পরিচয়ের শুক্রবাসরীয় বৈঠকে হাজির হতাম। পরিচয়ের বৈঠকের কথা বর্ণিত হয়েছে হিরণকুমার সান্যালের ‘পরিচয়ের কুড়ি বছর’ গ্রন্থ খানিতে আর শ্যামলকৃষ্ণ বোসের ইংরাজি দিনপঞ্জিকায়।



১৯৩০ সালে আমি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আসি। তখন থেকে প্রায় প্রতি শুক্রবার বৈঠকে আসার আর বাধা রইল না।

সুধীন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট-বিরোধী বলেও liberal humanist ছিলেন। তাই তাঁর পত্রিকায় নানা মতের লেখা-বের হত। আমি প্রচুর লিখেছিলাম। আমার লেখাও সহজ সরল হয়ে এল।

১৯৪১-এর পর সুধীন্দ্রনাথ নানা কারণে পরিচয় থেকে সরে যান। তবে তখনও তিনি পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। সম্ভবত ১৯৪৩-এ তিনি কিছু royalty-র বিনিময়ে কাগজটি বেচে দিতে চাইলেন। শুনেছি হুমায়ুন কবীর, আর বিমলচন্দ্র সিংহ কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিচালক কুন্দ ভূষণ ভাদুড়ির পরামর্শে সুধীন্দ্রনাথ আমার কাছেই পত্রিকা হস্তান্তর করলেন। পার্টি-সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে কাগজটি এল আমার মাধ্যমে। আর দেয় royalty যেত আমারই হাত দিয়ে।

পরিচয়ের গৌরব ছিল পুস্তক-সমালোচনা। আমরা সেই আদর্শ বজায় রাখতে পেরেছি বলে মনে হয় না। তবে অর্ধশতাব্দীর পর হাতগৌরব আবার অনেকখানি পুনরুদ্ধার করা হয়তো অসম্ভব নাও হতে পারে।

সৃষ্টির আত্মগান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আদিম অন্ধকারের পথহারা গহ্বরের ভিতর থেকে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে অপরিসীম অনিদ্রা, অস্বাভ্যে আবিল। তাঁর অতলস্পর্শ পঙ্কশয্যা থেকে ক্ষণে-ক্ষণে দেখা দিচ্ছে অতিকায় কুণ্ডলিত অর্ধগঠিত জলহস্তীর দল। এই অসমাপ্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রী নেই, শৃঙ্খলা নেই। নিজের লেশনীর প্রতি নিত্য অসন্তুষ্ট আর্টিষ্ট কেবলই কাটাকুটিতে ছড়াছড়ি করছেন। অসংলগ্নতার অসম্পূর্ণতার কুরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে; তাদের ডানা হয়েছে—পাখা হয় নি, তাদের দাঁত দেখা যাচ্ছে—চঞ্চু দেখা যায় না। শব্দ বের হচ্ছে—ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে সুরের অভাবে। হয়নি-হচ্ছে না-য় বেদনায় ক্রিষ্ট সমস্ত আকাশ। বর্বর বিধাতার অনুষ্ঠান—অর্থহীন অসংলগ্নতায় আকীর্ণ করছে আদিকালের অরণ্যচ্ছায়া। সুপরিণত হয় নি কিছুই। সুগঠিত সুন্দর হবার চেষ্টা জীবজন্তুর দেহে বারবার ব্যর্থ হয়ে নিজের প্রতি ষিকার ঘোষণা করছে। পিশাচ তারা—বুদ্ধিহীন কিছুত কিমাকার। চারিদিকে পঙ্গুতা ব্যঙ্গ করছে আপন সৃষ্টিকর্তাকে। জঙ্গ-জল-অস্তরীক্ষে অন্তরে-অন্তরে এমন অসহ্য বেদনার আর কিছু হতে পারেন না যে হতে হচ্ছে—হতে পাচ্ছে না। এই অসম্পূর্ণতায় নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে সমস্ত সৃষ্টি। অন্ধ কবছোর দল বিচিত্র বিকৃতির বাহন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অজুত ভঙ্গিতে, অসহ্য এই অকৃতার্থ সৃষ্টির আত্মগান। উদয়াচলের উর্ধ্বলোক হতে আহ্বান আসছে—আলোক, অলোক। কদম্বের অপসারণ বিশ্বজগতের সুসামঞ্জস্য—সেই আলোকচিত্রকরের রথ, কত যুগ-যুগান্তরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে আসছে বিশ্বশৃঙ্খলার সুসঙ্গতির পথে; অর্থহীন নিষ্ঠুর দুঃস্বপ্নকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিতে। আলোকে বিস্তীর্ণ করেছিল তার রাজত্ব—বুদ্ধি রূপ নিয়েছিল। শান্ত সুন্দরের; কিন্তু অসমাপ্তির বিকৃতি লুকিয়ে ছিল কোথায়—সমস্ত শৃঙ্খলা ছিন্ন করে সেই কদম্ব বেরিয়ে এসে আবার তাম্র নৃত্য করতে লাগল। জ্ঞানান দিলে যে বিশ্বসৃষ্টিতে এখনও সম্পূর্ণের আগমন হয় নি। এখনও তাকে বাধা দেবার জন্য উঠে পড়ছে আদিম অরণ্যচ্ছায়ার পিশাচের দল। যতদিন না অন্তরের মধ্য থেকে দূরীকৃত হয় বর্বর ততদিন কিছুতেই শান্তির আশা নেই। এর থেকে দেখতে পাওয়া

যায় পীড়িত জগৎ হাত বাড়ালে আলোকের উৎসের দিকে—নাগাল পেয়েও নাগাল পাচ্ছে না। বিধাতার নিষ্পত্তা দুঃখে আকীর্ণ করছে তাঁর আপন রচনাকে। দিচ্ছে তাঁর উপরে কালী ঢেলে। সেই আদিম—সেই ভয়ঙ্কর—সেই আত্মহিংস্রক—নেই নরঘাতী তার-চিরকালের গহরের থেকে ইঠাৎ কখন আবার দেখা দেয়—বলে যে, বর্বর এখনও মরে নি, কদর্য এখনও তার রাজ্যের জন্য লড়াই করছে।

উদয়ন

২ জুলাই, ১৯৪১

এটি সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদিত পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখা। তাই বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনা করে লেখাটি পুনঃমুদ্রিত হলো।



সম্পূর্ণ রচনা-পঞ্জি

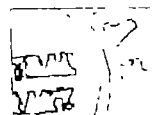
প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে দ্বাদশ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা
প্রাবণ ১৩৩৮ (আগস্ট ১৯৩১) থেকে আষাঢ় ১৩৫০ (জুলাই ১৯৪৩)

(সংক্ষেপসূচী—প্র>প্রবন্ধ, প>পদ্য, উ/উপ>উপন্যাস, ধারা>ধারাবাহিক, বি>বিবিধ
অনু>অনুবাদ, না>নাটক)

পুস্তক পরিচয়—আলোচক—আলোচ্যগ্রন্থ—লেখক

সংকলক

অমিয় দেব ও অমিয় ধর



সূচীপত্র

পরিচয় (ত্রেমাসিক) : প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৮ (পৃষ্ঠা ১—১৫৪)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)। ২. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্মের দাস (প্র.)। ৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কাব্যের মুক্তি (প্র.)। ৪. সুশোভন সরকার : রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা (প্র.)। ৫. সত্যেন্দ্রনাথ বসু : বিজ্ঞানের সঙ্কট (প্র.)। ৬. সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : শিল্পীর ব্যাধি (প্র.)। ৭. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : প্রেমপত্র (গল্প)। ৮. হেমেন্দ্রলাল রায় : হিন্দুস্তানী ও বাংলা গান (প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ :

১. সুধীরকুমার চৌধুরী : ভিন্কা উৎসব। ২. অন্নদাশঙ্কর রায় : বাণীরূপ Credo। ৩. বিষ্ণু দে : (ক) অর্থনায়ীশ্বর, (খ) বহুপাণি। ৪. বুদ্ধদেব বসু : কবিতা (ড্যান্টে গেব্রিয়েল রসেটির 'Troy Town'-এর অনুসরণে)।

অনুবাদ : বিষ্ণু দে : বিচ্ছেদ (মারসেল প্রুস্ত)

পুস্তক পরিচয় :

১. নীরেন্দ্রনাথ রায় : শেষ প্রশ্ন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য (ক) অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প, (খ) বন্দীর বন্দনা—বুদ্ধদেব বসু। ৩. অশোকনাথ বেদান্ততীর্থ : অদ্বৈত সিদ্ধি (যোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্তৃক অনুদিত)—পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী (ষোড়শ শতাব্দী)। ৪. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) রাশিয়ার চিঠি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) Impressions of Soviet Russia and the Revolutionary world—Dewey, (গ) Dreiser looks at Russia—Dreiser, (ঘ) One looks at Russia—Barbusse। ৫. সুধীরকুমার চৌধুরী : পথে প্রবাসে—অন্নদাশঙ্কর রায়। ৬. পশুপতি ভট্টাচার্য : Grand Hotel—Vicki Baum। ৭. মণীন্দ্রলাল বসু : Karl und Anna—Leonard Franck। ৮. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : (ক) Malaisie Henri Fauconnier, (খ) La Voi Royal—André Malraux, (গ) Philippine—Maurice Bedel, (ঘ) Le Peseur d'Ame—André Maurois, (ঙ) Confidence Africaine—Roger Martin du Gard, (চ) Cecile de la Folie—Marc Chadourne; (ছ) L'Illustre

Cheval Blanc—Georges Limbour, (জ) Oedipe—André Gide; ৯. নীরেন্দ্রনাথ রায় : (ক) Sunflower and Elm—Gertrude Woodthorpe, (খ) Poems (1926-1930)—Robert Graves, (গ) Vale and other Poems—A.E.

পাঠকশোচী : বীরবলের পত্র

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৮ (পৃ. ১৫৫-৩৭৫)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পত্রিকা—শ্রীমান সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু (চিঠি)।
২. অতুলচন্দ্র গুপ্ত : স্রীতি-বিচার (প্র.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বাজবজ্ঞের ব্রহ্মবাদ (প্র.)। ৪. প্রমথ চৌধুরী : নীললোহিতের স্বয়ম্বর (গ.)। ৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : ফরাসী জীবন (প্র.)। ৬. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : প্রাচীন ভারতের নাগরক জীবন (প্র.)। ৭. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি.)। ৮. সুশোভন সরকার : রুশবিপ্লবের ইতিবৃত্ত (প্র.)। ৯. অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় : ভারতের ভাস্কর্য (প্র.)। ১০. নীরেন্দ্রনাথ রায় : বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত (প্র.)। ১১. স্বয়ম্ভু চক্রবর্তী : অকৃতজ্ঞ (গ.)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. দিলীপকুমার রায় : (ক) এইটুকু? (শ্রীমুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের Credo নামক কবিতা পাঠান্তে) (খ) শিখর-দূরারী। ২. নিশিকান্ত রায়চৌধুরী : কবি পরিচয়। ৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : বর্ষপঞ্চক। ৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'One word is too often profaned' কবিতার অনুবাদ। ৫. বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ : (ক) কলহ (একটি অজ্ঞাত ইংরেজ কবির ছায়া অবলম্বনে), (খ) অশেষ (শেলি হইতে)। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) রাত্রির প্রতি (শেলি হইতে), (খ) বিস্মৃতি (এ-ই হইতে)। ৭. দিলীপকুমার রায় : উভুঙ্গ (বোদলেয়ের হইতে)।

পুস্তক পরিচয় :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লঘু-শুরু—জগদীশ গুপ্ত। ২. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (বৈদিক ও লৌকিক)—আহুতীচরণ ভৌমিক। ৩. বিক্স দে : Son of Woman—The story of D. H. Lawrence—John Middleton Murray. ৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : (ক) The collected poems of Edith Sitwell; (খ) The collected Poems of Robert Frost. ৫. মণীন্দ্রলাল বসু : Erstes Erlebris Von Stefan Zweig. ৬. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : (ক) মরুমায়্যা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; (খ) বালুচর—জসীমুদ্দিন। ৭. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : Sur les Traces du Bouddha—Rene Grousset. ৮. হিরণকুমার সান্যাল : কাক্যে রবীন্দ্রনাথ—

বিশ্বপতি চৌধুরী। ৯. ধ্বংসটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) Philosophy of a Biologist—Sir Leonard Hill; (খ) The Nature of Living Matter—L. Hogben. (গ) Mind at the Crossway—C. Lloyd Morgan; (ঘ) The Biological Basis of Human Nature—H. S. Jennings. (ঙ) Science and Religion—B. B. C. Talks. (চ) The Making of Man—An outline of Anthropology—ed. by V. F. Calverton; (ছ) Life—Outline of General Biology—Sir J. A. Thompson and Prof. Patrick Geddes. ১০. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : (ক) The Sound and the Fury—William Faulkner; (খ) All Passions Spent—V. Sackville West; (গ) The Grasshoppers Come—David Garnett? ১১. পদ্মপতি ভট্টাচার্য : মেঘ মল্লার—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২. সুহৃৎচন্দ্র মিত্র : The Foundations of Experimental Psychology—International University Series in Psychology—ed. by Clark Murchison.

পাঠকগোষ্ঠী :

১. 'পরিচয়'—নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সম্পাদক মহাশয় সমীপেবু। ২. দিলীপকুমার রায় : শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রীতিভাজনেবু।

১ম বর্ষ, ত্রয় সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৮ (পূ. ৩৭৭-৫৪৩)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হৃন্দের হসন্ত হলন্ত (প্র.)। ২. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ (প্র.)। ৩. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (ধারাবাহিক স্মৃতিকথা)। ৪. দিলীপকুমার রায় : পথের পাঁচালী (প্র.)। ৫. নলিনীকান্ত গুপ্ত : প্রগতি (প্র.)। ৬. সুশোভন সরকার : রূপ-বিপ্লবের ইতিবৃত্ত (ধারাবাহিক প্র.)। ৭. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্মের দান (প্র.)। ৮. ধীরেন্দ্রকুমার হালদার : তিন রাত্রি (গ.)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মাঘের আশ্বাস। ২. জীবনানন্দ দাস : ক্যাম্পে। ৩. শ্যামাপদ চক্রবর্তী : মুন্সীরী। ৪. বিষ্ণু দে : উবশী। ৫. সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী : সন্ধ্যায়। ৬. দিসদার হুসেন : (ক) লীলা-প্রেম। (খ) তবু তোমারেই ভালোবাসি মোর সর্বনাশ। ৭. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৃষ্টি পাইনের বনে (গ্যাব্রিয়েলে ডানুন্ডসিওর মূল ইটালীয়ান কবিতা হইতে)।

পুস্তক পরিচয় :

১. চারুচন্দ্র দত্ত : ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা—অনিলবরণ রায়। ২.

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : (ক) বিবাহের চেয়ে বড়ো—অচিন্ত্যকুমার সেন; (খ) অসমাপিকা—অম্বদাশঙ্কর রায়; (গ) অকর্মণ্য—বুদ্ধদেব বসু। ৩. বিষ্ণু দে : Music at Night; The World of Light; The Cicadas—Aldous Huxley. ৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : (ক) Portraits in Miniature—Lyttton Strachey; (খ) Dawn—Theodore Dreiser. ৫. বুদ্ধদেব বসু : আমরা ও তাঁহারা—ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) The Road Back—Erich Maria Remarque; (খ) Guests of the Nation—Frank O' Connor. ৭. নির্মলচন্দ্র দত্ত : ঝড়ের রাতে—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৮. নীরেদ্রনাথ রায় : (ক) Regards Sur Le Monde Actuel—Paul Valery; (খ) Paul Valery—Valery Larbaud. ৯. পশুপতি ভট্টাচার্য : (ক) দুলালের দোলা—জগদীশ গুপ্ত; (খ) বড় মা—ফণীন্দ্রনাথ পাল। ১০. নীরেদ্রনাথ রায় : পাঁচমিশেলী—অবনীনাথ রায়। ১১. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : (ক) কারার ফুল, সন্ধ্যামালতী, রক্তজ্বা—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; (খ) সান-ইয়াং-সেন—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১২. বুদ্ধদেব বসু : (ক) The Yellow Placard—Sylvia Lynd; (খ) Dear Judas—Robinson Jeffers; (গ) Deserted House—Dorathey Wellesley; (ঘ) The Frozen Ocean—Vicia Meynell. ১৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : শেলী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৯ (পৃ. ৫৪৫-৭২০)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. নীরেদ্রনাথ দত্ত : যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ (প্র.)। ২. প্রবোধচন্দ্র সেন : বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ (প্র.)। ৩. সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী : হসন্তের পত্র (সরস নিবন্ধ)। ৪. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : বিশ্ব (প্র.)। ৫. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)। ৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : মনুষ্য দম। ৭. পদ্মা বসু : বিবাহ ও নীতি (প্র.)। ৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আধুনিক কাব্য (প্র.)। ৯. সুধীরকুমার চৌধুরী : ভাসান (গা.)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : (ক) শূন্যঘর, (খ) ভোজন-বীর, (গ) গৌড়ী রীতি। ২. বুদ্ধদেব বসু : স্বপ্নদূত। ৩. সাঙ্ঘনা শুহ : দুটো কাজল আঁখি। ৪. বিষ্ণু দে : (ক) সন্ধ্যা, (খ) মেঘার্ভ অমাবস্যা। ৫. শামসুল জদা : কপিকা। ৬. শ্যামাপদ চক্রবর্তী : তিলোত্তমা। ৭. নীরেদ্রনাথ রায় : অনুবাদ কবিতা।

পুস্তক পরিচয় :

১. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) কবি পরিচিতি; (খ) জয়ন্তী-উৎসর্গ। ২.

সুধীক্ষনাধ দত্ত : আধুনিকী—নঙ্গিনীকান্ত শুভ। ৩. চারুচন্দ্র দত্ত : India's Mission in the World—Anilbaran Roy. ৪. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : Africa View—Julian Huxley. ৫. সুধীরকুমার চৌধুরী : (ক) রেখা চিত্র—বুদ্ধদেব বসু; (খ) ইতি—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত; (গ) পুতুল ও প্রতিমা—প্রেমেন্দ্র মিত্র; (ঘ) বধুবরণ—শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৬. ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : Parade of the Living—J. H. Bradley. ৭. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : নানা চর্চা—প্রমথ চৌধুরী। ৮. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য : (ক) The Universe in the Light of Modern Physics—Max Plank; (খ) The New Conceptions of Matter—C. G. Darwin. ৯. সরোজকুমার দাস : Cosmic Problems—An Essay in Speculative Philosophy—J. S. Mackenzie. ১০. সুধীক্ষনাধ দত্ত : (ক) The Man Who Died—D. H. Lawrence. (খ) The Waves—Virginia Woolf. ১১. নীরেন্দ্রনাথ রায় : সঙ্কল্পিত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২. নির্মলচন্দ্র দত্ত : (ক) বাস্তবিক—দিবাকর শর্মা; (খ) মানস সরোবর ও কৈলাস—সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; (গ) চৈতালী ঘূর্ণি—তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠকসঙ্গীতি :

১. অনিন্দিতা দেবী ও ২. দিলীপকুমার রায় : পরিচয় সম্পর্দে কেবু।

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৯ (পৃষ্ঠা ১—১৭৪)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. কাজী আব্দুল ওদুদ : পথ ও পাথের (প্রবন্ধ)। ২. প্রিয়রঞ্জন সেন : বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমের হাওয়া (প্রবন্ধ)। ৩. সুশোভন সরকার : স্যোশ্যালিজম—এর মূলসূত্র (প্রবন্ধ)। ৪. শাহেদ সুরহবর্দি : আধুনিক নাট্য প্রসঙ্গ (অপ্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ; অনুবাদকের নাম নেই)। ৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হৃদয়বিতর্ক (প্রবন্ধ)। ৬. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (ধারাবাহিক স্মৃতিকথা)। ৭. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্মের দান (প্রবন্ধ)। ৮. স্বয়ম্ভু চন্দ্রবর্তী : নাই বা হোল চেরীফুল (রোমানফের গল্পের অনুবাদ)

কবিতাগুচ্ছ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অব্যক্ত। ২. সুধীক্ষনাধ দত্ত : অর্কেষ্ট্রা।

পুস্তক পরিচয় :

১. নীরেন্দ্রনাথ রায় : অপরাধিত ১ম ও ২য় খণ্ড—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২. দিলীপকুমার রায় : On Forsythe 'Change—John Galsworthy; A Maid in Waiting—John Galsworthy. ৩. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায় : (ক) পত্রাবলী—ধর্ম ও বিজ্ঞান—দিলীপকুমার রায়, বীরবল ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত; (খ) Science and human experience—Herbert Dingle; The Scientific Outlook—Bertrand Russell; Brave new World—Aldous Huxley. ৪. মণীন্দ্রলাল বসু : (ক) The Hero—Alfred Newman. (খ) The Hidden child—Franz Werfel. ৫. লীলা রায় : Song and Its Fountains—A. E (George William Russell). ৬. যশোদ্রনাথ সেন : From Punishment to Prevention—Prasanto Kr. Sen. ৭. লীলা রায় : (ক) Rhymes of Darby to Joan—H. W. Fowler; (খ) Selected Poems—L. A. G. Strong. ৮. হরিশ্চন্দ্র সিংহ : Essays on Persuasion—J. M. Keynes. ৯. শ্যামাপদ চক্রবর্তী : কাব্য-পরিমিতি—যতীন্দ্রনাথ সেন। ১০. বিষ্ণু দে : The Loosening and other Poems—Ronald Bottrall. ১১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : (ক) A Letter from India—Edward Thompson; (খ) Hindoo-Holiday—J. R. Ackerley. ১২. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : প্রথম—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৩. হিরণকুমার সান্যাল : বেদুইন—পীযুষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৯ (পৃষ্ঠা ১৭৫—৩৫০)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবহৃদয় (প্রবন্ধ)। ২. হুমায়ুন কবির : সাহিত্যে বাস্তবতা (প্রবন্ধ)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : মোক্ষ ও নির্বাণ (প্রবন্ধ)। ৪. চারুচন্দ্র দত্ত : হাওয়া-বদল (গল্প)। ৫. অতুলচন্দ্র গুপ্ত : রীতি-বিচার (প্রসাদ—প্রবন্ধ)। ৬. সীতাময় রায় : সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য (প্রবন্ধ)। ৭. পল মোরী : সায়ামের মন্দির (মোরীর Rein que la Terre) নামক ভ্রমণ কাহিনীর 'Les Temple' নামক অধ্যায়ের অনুবাদ)। ৮. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : সমষ্টি-বিজ্ঞান ও বসুর সমষ্টি গণিত (প্রবন্ধ)। ৯. হিরণকুমার সান্যাল : রুটির দেশ (গল্প-নেভেরফ থেকে)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছেলোট। ২. সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : বাসস্তিকা। ৩. হেমচন্দ্র বাগচী : হাঁসপাতালে (জে, ই. ফ্রেন্সারের অনুভবে); পতঙ্গ (ওয়াল্টার ডিলা মেয়ারের অনুভবে)। ৪. সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র : রায়ে (ম্যাসিস মেনেল থেকে)। ৫. ক্ষিতীশচন্দ্র সেন : বৈদান্তিকের প্রার্থনা (শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি রচনা থেকে)। ৬. হুমায়ুন কবির : উপহার। ৭. সুমন্ত সেন : অন্ধ-পথিক। ৮. নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আগমন (হার্বার্ট ট্রেস থেকে)। ৯. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : মাধবী পূর্ণিমা; দ্বন্দ্ব।

পুস্তক পরিচয় :

১. চারুচন্দ্র দত্ত : যার যেথা দেশ—অমদাশঙ্কর রায়। ২. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : কামরূপ শাসনাবলী (পদ্মনাভ ভট্টাচার্য সংকলিত)। ৩. অবনীনাথ রায় : বনমর্ষর—মনোজ বসু। ৪. শাহেদ সূরাহবর্দি : Poems—Humayun Kabir (ইংরেজি থেকে অনূদিত) ৫. চারুচন্দ্র দত্ত : Akbar—Laurence Binyon. ৬. শাহেদ সূরাহবর্দি : The Fountain—Charles Morgan (ইংরেজি থেকে অনূদিত)। ৭. নীরেন্দ্রনাথ রায় : The Essential Shakespeare—J. Dover Wilson. ৮. সূধীন্দ্রনাথ দত্ত : (ক) The Literary Mind—Max Eastman; (খ) The Physiology of Beauty—Arthur Sewell. ৯. মোহিতকুমার সেনগুপ্ত ও হরিশচন্দ্র সিংহ : (ক) Recovery—Sir Arthur Salter; (খ) The World's Economic crisis and the Way of Escape—a symposium—Sir Arthur Salter and others. ১০. বিষ্ণু দে : (ক) The Triumphal March—T. S. Eliot; (খ) The Orators—W. H. Auden; (গ) Rooming house—Horace Gregory; (ঘ) Poems—Clere Parsons (ঙ) New Signatures. ১১. সূধীন্দ্রনাথ দত্ত : (ক) Fleche d'Orient—Paul Morand; (খ) Le Cercle de Famelle—Andre Maurice; (গ) Le Noeud de Vipères—Francois Mauriac. ১২. দিলদার হুসেন : একটি বসন্ত—অমদাশঙ্কর রায়। ১৩. হিরণকুমার সান্যাল : সমাজতন্ত্র—গোপাললাল সান্যাল। ১৪. জীবনময় রায় : তীর্থপথে (কবিতা—১৩৩১-৩৮)—হেমচন্দ্র বাগচী। ১৫. হিরণকুমার সান্যাল : But for the Grace of God—S. W. N. Sullivan। ১৬. সম্পাদকীয় : মন্তব্য : পরিশেষ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৯ (পৃ. ৩৫১-৫১২)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিহ্নবিশ্রাট (সূধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠি)। ২. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (ধারা. স্মৃতি.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : মুন্সের অবস্থা (প্র.)। ৪. হেমেন্দ্রলাল রায় : হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও বর্তমান জগৎ (প্র.)। ৫. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : গদ্যের ছন্দ (প্র.)। ৬. বিজয়চন্দ্র মজুমদার : বিবাহবিধি (প্র.) ৭. সূধীন্দ্রনাথ দত্ত : ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ (প্র.)। ৮. হিরণকুমার সান্যাল : 'কারস্টা' (কাইজার লিউ থেকে)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তীর্থবাত্রী (এলিয়টের Journey of the Magi-এর অনুবাদ), রূপবাণী। ২. ক্ষিতীশচন্দ্র সেন : সনেট। ৩. সঞ্জয় ভট্টাচার্য :

ছোয়ায়। ৪. বিহারীলাল বড়ুয়া : নব আবাহন। ৫. সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র : রবীন্দ্রনাথের প্রতি (Stuge Moore-এর 'To Rabindranathi 'agore'-এর অনুবাদ)।

পুস্তক পরিচয় :

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : (ক) মৌরীফুল—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়; (খ) এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে—বুদ্ধদেব বসু; (গ) মুক্তিকা—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ২. সুশোভন সরকার : (ক) Necessity of Communism—Jhon Middleton Murray; (খ) On Marxism today—Maurice Dobb; (গ) The Teachings of Karl Marx—V. I. Lenin. ৩. মনীন্দ্রলাল বসু : (ক) Alexanderplatz—Alfred Doblin; (খ) Etzel Andergast—Jacob Wassermann. ৪. শ্যামাপদ চক্রবর্তী : (ক) Western Influence in Bengali Novel—Priyaranjan Sen; (খ) Western Influence in Bengali Novel—Priyaranjan Sen. ৫. চারুচন্দ্র দত্ত : নীললোহিত—প্রমথ চৌধুরী। ৬. প্রিয়রঞ্জন সেন : Shakespeare Through Eastern Eyes—Ranjee G. Shahani. ৭. বিষ্ণু দে : The Meaning of Modern Sculpture—R. H. Wilensky. ৮. নীরেন্দ্রনাথ রায় : (ক) Texts and Pretexts—Aldous Huxley; (খ) Poems and Translations—Robin Flower; (গ) Thirty Poems—Nora Nisbet; (ঘ) A Tale of Troy—John Masefield. ৯. বিষ্ণু দে : (ক) The Letters of D. H. Lawrence; (খ) Apocalypses—D. H. Lawrence. ১০. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : The Secret of Golden Flower (a Chinese book of Life Tr. by Richard Wilhelm.) ১১. বিষ্ণু দে : (ক) আমরা—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত; (খ) একটি কথা—বুদ্ধদেব বসু। ১২. প্রতাপকুমার বসু ; Hitler—Emil Lengyel.

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কৈশাখ ১৩৪০ (পৃ. ৫১৩-৬৬৬)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : মুক্ত বা 'অন্তঃগত' : (প্র.)। ২. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (ধারা. স্মৃতি.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ও সম্পত্তির স্বরূপ (প্র.)। ৪. শ্যামাপদ চক্রবর্তী : অমর-শতক (প্র.)। ৫. ধৃষ্ণটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ইতিহাস (প্র.) ৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পুনশ্চ (ধৃষ্ণটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি) ৭. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : স্বপ্ন ও সুবৃষ্টি (প্র.)। ৮. সুশোভন সরকার : মাধুকুয়ো (প্র.) ৯. দিলীপ কুমার সান্যাল : ঝড় (গল্প : এল. এ. জি. ষ্ট্রং থেকে)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. সুরেশ্বর শর্মা : ভীকর। ২. বিষ্ণু দে : যাত্রা। ৩. সঞ্জয় ভট্টাচার্য : ভোর। ৪. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : আমরা কবিতা লিখি (কার্ল ম্যাক্সবার্গ-এর 'We write' থেকে)। ৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জয়ন্তী (হান্স কারোসা কৃত 'রুমেনিয়ান ডায়রি-র' অন্তর্ভুক্ত কবিতার ভাবানুবাদ)।

পুস্তক-পরিচয় :

১. রবীন্দ্রনাথ : 'কৃষ্ণরাও'—চারুচন্দ্র দত্ত। ২. জীবনময় রায় : (ক) 'তরুণের বিদ্রোহ', (খ) 'স্বদেশ ও সাহিত্য'—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৩. চারুচন্দ্র দত্ত : Telleyrand—Duff Cooper। ৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : বাঙলা ছন্দের মূলসূত্র—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। ৫. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : The Adventures of the Black Girl in Her Search for God—Bernard Shaw. ৬. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : Where is Science Going? ed. by James Murphy. ৭. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : (ক) The Sleepwalkers—Herman Broch; (খ) The Fortysecond Parallel—John Dos Passos. ৮. সরোজকুমার দাস : Freedom in the Modern World—John Macmurray. ৯. বিষ্ণু দে : (ক) The Common Reader—Virginia Woolf; (খ) Criticism—Desmond MacCarthy. ১০. সরোজকুমার দাস : The Revolt of the Masses—Jose Ortega Y Gasset. ১১. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) If the Blind Lead—A realist surveys modern culture; (খ) The Coming struggle for Power—John Strachy.

তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪০ (পৃষ্ঠা ১—১৭২)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কালান্তর (প্র.)। ২. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ইতিহাস-২ (প্র.)। ৩. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি.)। ৪. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : নিসর্গের অনুবর্তন (প্র.)। ৫. সুশোভন সরকার : জার্মানির দূরবস্থা (প্র.)। ৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যের মাত্রা (প্র.)। ৭. সরোজকুমার দাস : আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রসঙ্গে (প্র.)। ৮. বিমানবিহারী মজুমদার : রাজা রামমোহন রায়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিভা (প্র.)। ৯. হিরণকুমার সান্যাল : শরৎ প্রভাতে (গল্প—গ্রন্থাঙ্ক ও' কোন্-এর 'সেপ্টেম্বর ডন' অবলম্বনে)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দিনান্ত। ২. জীবনময় রায় : জার্নাল। ৩. অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী : প্রাণমুক্তিকা। ৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : প্রতর্ক।

পুস্তক-পরিচয় :

১. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : ভবানন্দের হরিবংশ (সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত)।
২. চারুচন্দ্র দত্ত : Life and Experiences of a Bengali Chemist—Prafulla Chandra Roy.
৩. মণীন্দ্রলাল বসু : (ক) Pocahontas—David Garret; (খ) Josephus—Lion Feucht Wagner.
৪. সোমনাথ মৈত্র : Dangerous Corner—J. B. Priestley.
৫. নীরেদ্রনাথ রায় : (ক) Family History—V. Sackville West, (খ) They were Defeated—Rose Macaulay.
৬. প্রবোধকুমার মজুমদার : Famous Plays of 1932-1933.
৭. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : শিরণী-সরজার শাস্তর—মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন।
৮. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : Memories of a British Agent—R. H. Bruce Lackhart.
৯. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : The History of the Russian Revolution, 3 Vols—Leon Trotsky.
১০. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : লহ প্রণাম—শৈলজ্ঞানপ্রদ মুখোপাধ্যায়।
১১. ছায়া দেবী : বঙ্গের মহিলা কবি—যোগেন্দ্রনাথ শুভ।
১২. নীরেদ্রনাথ রায় : (ক) মানময়ী গার্লস স্কুল—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র; (খ) শুভযাত্রা—প্রবোধকুমার-মজুমদার।

তৃতীয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪০ (পৃষ্ঠা ১৭৩-৩১৮)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : নয় মাত্রার ছন্দ (প্র.)।
২. বিমানবিহারী মজুমদার : রাজা রামমোহনের রাজনৈতিক শিবদল (প্র.)।
৩. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)।
৪. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ইতিহাস-৩ (প্র.)।
৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : যৌনাতীত (প্র.)।
৬. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মাছি (গল্প—ক্যাথরিন্ ম্যান্সফিল্ড-এর 'দি ফ্লাই' থেকে)।

কবিতাশুদ্ধ :

১. লীলাময় রায় : শোক ও সাধুনা।
২. শ্যামাপদ চন্দ্রবর্তী : শাস্ত্রের কথা।
৩. দিলীপকুমার সান্যাল : (ক) সনেট (রুপার্ট ব্রকের অনুসরণে), (খ) সনেট (ইনফ্রিড গিবসন থেকে)।
৪. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : বুদ্ধকা (এরিসা কেনেল-এর 'I angel Infinite' অবলম্বনে)।
৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : শাস্ত্রী।

পুস্তক পরিচয় :

১. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) প্রিয়া ও পৃথিবী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (খ) পৃথিবীর পথে—বুদ্ধদেব বসু, (গ) উর্বশী ও আর্টেমিস—বিষ্ণু দে, (ঘ) কোজাগরী—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত।
২. শোভা সরকার : (ক) Collected Poems—Herbert Palmer, (খ) News from Mountain—Richard

Church. ৩. পশুপতি ভট্টাচার্য : Psychology of Sex—Havlock Ellis.
৪. ছায়া দেবী : মহাপ্রস্থানের পথে—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৫. পশুপতি
ভট্টাচার্য : Interpretation of Atom. ৬. গঙ্গাচরণ কর : Odyssey of
Homer (tr.) by T.E. Shaw. ৭. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ভারত ও
ইন্দোচীন—প্রবোধচন্দ্র বাগচী। ৮. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : The Great Offen-
sive—Mourice Hindus. ৯. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : Acharya Roy
Commemoration Volume, ed. by Hirendranath Dutt, Meghnad
Saha, Satyacharan Law and others. ১০. স্বর্ণপ্রভা সেন : What I
owe to Christ—C. F. Andrews. ১১. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : কণাশঙ্কর—
সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত। ১২. বিমানবিহারী মজুমদার : Nationalism
in the Soviet Union—Hans Kohn.

তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ ১৩৪০ (পৃ. ৩১৯-৪৭১)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা (প্র.) ২. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো
কথা (স্মৃতি)। ৩. রাসবিহারী দাস : হোয়াইটহেডের দর্শন (প্র.)। ৪. প্রভাসচন্দ্র
ঘোষ : রবীন্দ্রকাব্যে তত্ত্ববিচার (প্র.)। ৫. অনাথনাথ বসু : শিক্ষা ও সমাজ
(প্র. Bertrand Russell-এর 'Education and the social order'
প্রসঙ্গে)। ৬. লীলাময় রায় : 'ফাউন্ট' (প্র. পরিকল্পিত পুস্তক ইউরোপের
বাণী' থেকে)। ৭. যুগিষ্ঠির দাস : এই জীবন (গল্প)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী : সঙ্গতি। ২. সঞ্জয় ভট্টাচার্য : সাগর-তীরে। ৩.
হুমায়ুন কবির : সনেট-(ক) অনুরোধ, (খ) অবিনাশী। ৪. সুফী মোতাহার
হোসেন : বসন্ত বিদায়। ৫. দিলীপকুমার রায় : তরুর উদ্বোধন। ৬. সুধীন্দ্রনাথ
দত্ত : সৃষ্টিরহস্য।

পুস্তক-পরিচয় :

১. প্রভাসচন্দ্র ঘোষ : বিচিহ্নিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. দর্শন শর্মা :
'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি'—প্রিয়নাথ সেন। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : আদি শূর ও
ভট্টনারায়ণ—ক্ষীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪. বিমানবিহারী মজুমদার : (ক) World
Revolution and the U.S.S.R—M.T. Florinsky, (খ) Problems of
a Socialist Government—Stafford Cripps and Others, (গ) Prob-
lems of Peace—G.P. Gooch and others. ৫. নীরেন্দ্রনাথ রায় : (ক)
The Name and nature of Poetry—A.E. Housman; (খ) Form in

modern poetry—Herbert Read. ৬. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : No Time like the Present—Storm Jameson. ৭. হুমায়ূন কবির : (ক) An Idealist View of Life—S. Radhakrishnan; (খ) Religion in the East and West—S. Radhakrishnan; (গ) Counter attack from the East—C.E.M. Joad; (ঘ) Some turns of thought in modern Philosophy—George Santayana. ৮. সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র : Better think twice about it—Luigi Pirandello (tr.) by Arthur and Henrie Mayne. ৯. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : (ক) Sanctuary; (খ) Sartories; (গ) Light in August; (ঘ) These Thirteen—William Faulkner. ১০. সুরেশ চন্দ্রবর্তী : বিজয়িনী—শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়।

তৃতীয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কৈশাখ ১৩৪১ (পৃ. ৪৭৩-৬৩২)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রিয়ালিস্ট (ধৃচ্ছটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি)। ২. লীলাময় রায় : 'সমর ও শান্তি' (প্র.) ৩. সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : শিল্পের সুন্দর (প্র.)। ৪. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি.)। ৫. শ্যামাপদ চন্দ্রবর্তী : কামিনী রায় (প্র.)। ৬. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা' (প্র.)। ৭. ধৃচ্ছটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা (প্র.) ৮. বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত : নব্য বাংলার শক্তিকেদ্র (প্র.)। ৯. দিলীপকুমার সান্যাল : সিঙ্গ হামের পথে (গল্প)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: মর্মবাণী। ২. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : কবিতা ও কবি (D.H. Lawrence-এর কবিতার ছায়ায়)। ৩. সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র : জরদগব। ৪. হুমায়ূন কবির : 'নিবিড় কেশের জালে তোমার রবির আলো জড়াও'। ৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : অননুতপ্ত।

পুস্তক পরিচয় :

১। প্রমথনাথ তর্কভূষণ : ন্যায় পরিচয়—ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। ২. শ্রীকৃষ্ণপ্রেম (রোনাল্ড নিজেন) : A modern yoga—the riddle of this world—Sri Aurabindo. ৩. নীরেন্দ্রনাথ রায় : (ক) Recent Poetry (1923-1933) ed. by Alida Monro (খ) Strange Battalion—Mary Lang. ৪. হুমায়ূন কবির : (ক) New Introductory Lecture on Psycho Analysis—Sigmund Freud. (খ) Modern Man in search of a soul—C. I. Jung ৫. দর্শন শর্মা : So a Poor Ghost—Edward Thompson.

৬. হিরণকুমার সান্যাস্ : 'এষার কবি রবীন্দ্রনাথ'—প্রিয়লাল দাস। ৭. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : (ক) Komos—Willem De Sitter; (খ) Exploring the Upper Atmosphere—Dorotheý Fisk। ৮. দর্শন শর্মা Peter Abelard—Helen Waddell। ৯. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : The Unexpected—Frank Penn—Smith। ১০. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : (ক) আগামী—দিলীপকুমার রায়, (খ) মোপাসাঁর গল্প—অনুবাদক—ননীমাধব চৌধুরী, (গ) ছিন্ন পাপড়ি—নবগোপাল দাস, (ঘ) সুরা ও শোগিত—পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, (ঙ) মাধুকরী—পীযুষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, (চ) অষ্টাদশী—জগদীশ ভট্টাচার্য। ১১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : ওপারে ঢেউ—কমলকৃষ্ণ ঘোষ (অনুবাদ)। ১২. নির্মলচন্দ্র দত্ত : (ক) 'বন্ধুর স্মৃতি', 'নারীর পূজা'—প্রভাসচন্দ্র ঘোষ; (খ) ব্যোমকেশের ডায়ারী—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠকগোষ্ঠী :

প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও মনসুরউদ্দীন : শিরণী ও পাবনা জেলার গ্রাম্য ভাষা (শিরণী দরজার শাস্তর গ্রন্থের প্রবোধচন্দ্র বাগচী কৃত আলোচনা বিষয়ে চিঠি)

চতুর্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ (পৃ. ১-১৮০)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা' (প্র.)। ২. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)। ৩. অনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : আদি-স্মার্য পিতৃভূমি (প্র.)। ৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : ঐতিহ্য ও টি. এস. এলিয়ট (প্র.) ৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্মের দান (প্র.)। ৬. হরিশ্চন্দ্র সিংহ : বিদেশে অর্থনীতি ও সংখ্যালব্ধের গবেষণা পদ্ধতি (প্র.)। ৭. নীরেন্দ্রনাথ রায় : বিভাবরী (গ.)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. নীরেন্দ্রনাথ রায় : অনুবাদ (ইংরেজি থেকে)। ২. লীলাময় রায় : 'লীলাসসিনী'র একটি কবিতা। ৩. সঞ্জয় ভট্টাচার্য : বন। ৪. সুরেশ্বর শর্মা : মুক। ৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : সন্ধান। ৬. জীবনময় রায় : শাস্ত্র নবীন। ৭. সুফী মোতাহার হোসেন : বিলম্ব। ৮. নিশিকান্ত রায়চৌধুরী : পূর্ণিমা ও অমাবস্যা; হিমাদ্রী-পূর্ণিমা।

পুস্তক-পরিচয় :

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : The Supernormal : A Critical Introduction to Psychic Science—C. B. Bernard। ২. লীলা যজ্ঞমদার : (ক) The

Use of Poetry and the Use of criticism—T. S. Eliot; (খ) After Strange Gods—T. S. Eliot. ৩. বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী : চিন্তয়সি—ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৪. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) Science Today (ed.) by J. G. Crowther; (খ) The Universe of Our Experience—L. M. Parson. ৫. মণিভূষণ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ৬. অনাথনাথ বসু : On the Meaning of Life (ed.) by Will Durant. ৭. চারুচন্দ্র দত্ত : Bengal Vaishnavism—Bipin Ch. Pal. ৮. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : ‘অভিমান’, ‘অমিতার প্রেম’—আশালতা দেবী ৯. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : English Journey—J. B. Priestley. ১০. প্রিয়রঞ্জন সেন : My life as German and Jew—Jacob Wassermann. ১১. হিরণকুমার সান্যাল : Flush, A Biography—Virginia Woolf. ১২. সমালোচকের নাম নেই (সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয় : (ক) The Idea in Fiction—Leggett; (খ) Property or Peace—He. N. Brailsford, (গ) Post War France—Paul Vaucher; (ঘ) Indian Constitution A Survey—Lahiri and Banerjee. (ঙ) Atlas of Current Affairs—Horabin (চ) চলতি পথের বাঁশী—নবগোপাল দাস, (ছ) তুমি আর আমি—সুধীর মিত্র।

চতুর্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪১ (পৃ. ১৮১-৩৪৪)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. আবুসরীদ আইয়ুব : বুদ্ধিবিশ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি (প্র.)। ২. বিমানবিহারী মজুমদার : গোষ্ঠী বিবাহ (প্র.)। ৩. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি) ৪. বীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বুদ্ধদেবের ‘নাস্তিকতা’ (প্র.) ৫. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : প্রতারক (বিদেশী গল্প অবলম্বনে)। ৬. মণিভূষণ রায় : ‘বুদ্ধচরিতম’ ও কালিদাসের কাব্য (প্র.)। ৭. রাখালচন্দ্র সেন : (গ.)

কবিতাশুদ্ধি :

১. অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী : পথের কবিতা। ২. বিষ্ণু দে : ওফেলিয়া। ৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : নরক।

পুস্তক পরিচয় :

১. বীরেন্দ্রনাথ দত্ত : (ক) ব্রহ্মসূত্রম—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত; (খ) ভক্তি রসায়নম্—মধুসূদন সরস্বতী (দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত)। ২. কাজী আবদুল ওদুদ : দিলরুবা (কাব্যগ্রন্থ)—আবদুল কাদির। ৩. বিষ্ণু দে : (ক) Towards Standards of Criticism—F. R. Leavis;

(খ) ABC of Reading—Ezra Pound; (গ) Active Anthology—Ezra Pound; (ঘ) Soviet Literature—George Reavey and Marc Slonim.

৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : Beauty and Other Forms of Value—S. Alexander & নীরেদ্রনাথ রায় : (ক) The Collected Poems of Harold

Monro, (খ) Poems Nineteen Thirty to Nineteen Thirty Three—Robert Graves; (গ) Winter Harvest—Andrew Young ৬. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : (ক) নীললোহিতের আদিপ্রেম—প্রথম চৌধুরী, (খ) প্রকৃতির পরিহাস—অমলদাশরায় রায়, (গ) আগামীবারে সমাপ্য—মোহাম্মদ কাসেম, (ঘ) দেবারু—চারুচন্দ্র দত্ত; (ঙ) সোনার কাঠি—মণীন্দ্রলাল বসু। ৭.

হিরণকুমার সান্যাল : Goldsworthy Lowes Dickinson—E. M. Froster.

৮. আবদুল কাদির : সোজান বাদিয়ার ঘাট—জসীমউদ্দিন। ৯. ধূম্রটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) The Reconstruction of Religious Thought In

Islam—M. Iqbal, (খ) The Mystical Life—Roger Bastide, (গ) An Examination of the Mystic Tendencies of Islam in Light of the Quran and Traditions—M.M. Zukruddin Ahmad Andhori, (ঘ) The Transformation of Nature in Art : A. K. Coomerswamy.

১০. হুমায়ুন কবির : An Essay on Philosophical Method—R. G.

Collingwood. ১১. অদিতি দেবী : (ক) 'বুকের বীণা', (খ) 'আঙিনার ফুল'—অপরাজিতা দেবী।

চতুর্থ বর্ষ, ত্রয় সংখ্যা, মাঘ ১৩৪১ (পূ. ৩৪৫-৫০৯)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. হিরণকুমার সান্যাল : সমৃদ্ধি, সঙ্কট ও সঙ্কল্প (প্র.)। ২. আবু সয়ীদ আইয়ুব : সুন্দর ও বাস্তব (প্র.)। ৩. ধূম্রটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মৃত্যুর পূর্বে ও পরে (গ.)। ৪. হীরেদ্রনাথ দত্ত : বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা' (প্র.)। ৫. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)। ৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ছিন্নপত্র (অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি)। ৭. সুমন্ত্র মহলানবিশ : দুই দিন (গ.)

কবিতাগুচ্ছ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কলিক ২. সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র : মানস সরোবর (Yeats-এর 'Wild Swans at Cool' থেকে)। ৩. দিলীপকুমার সান্যাল : তিনটি কবিতা। ৪. সুনীলকুমার ঘোষ : প্রাচীর পত্র। ৫. বিষ্ণু দে : শিখণ্ডীর গান।

পুস্তক-পরিচয় :

১. লীলাময় রায় : Encyclopaedia of Sexual knowledge—A.

Willy, A. Costler and others. ২. নীরেঙ্গনাথ রায় : Chinese Testament—S. Tretiakov. ৩. ছমায়ুন কবির (ক) : Characters and Commentaries—Lytton Strachy (খ) Message of Asia—Paul Cohen Portheim ৪. লীলা মজুমদার : (ক) Education of Shakespeare—G. A. Plimpton; (খ) Companion to Shakespeare Studies (ed.) by H. Granville Barker and G. B. Harrison. ৫. জ্যোৎস্নাকান্ত বসু : Adam's Encestors—L.S.B. ৬. মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় : The Well of Days—Iven Bunin, (tr.) by Glab Struve and Hamish Miles. ৭. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : Eastward from Paris—Edouard Heriot. ৮. চারুচন্দ্র দত্ত : History of Political Thought—Rammohun to Dayananda (Vol-I. Bengal)—B. B. Majumdar. ৯. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : Gerald, A Portrait—Daphne du Maurier. ১০. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : (ক) ব্যোমকেশের কাহিনী—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, (খ) প্রবাসী বাঙালী—অবনীনাথ রায়; (গ) মানসী—আশালতা দেবী; (ঘ) যাত্রাবদল—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১. সুশোভন সরকার : (ক) Moscow Dialogues—Julius F. Hecker; (গ) What Marx Really Meant—G.D. H. Cole; (ঘ) Aspects of Dialectical Materialism—H. Levy and others; (ঙ) The State of the Soviet Union—Joseph Stalin. ১২. ছায়া দেবী : সাগরিকা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ১৩. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) নীটশের বাগী—নলিনীকান্ত গুপ্ত, (খ) দেবী কিশোরী—মনোজ বসু।

চতুর্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪২ (পৃ. ৫১১-৬৭৮)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. ছমায়ুন কবির : ইমানুয়েল কান্ট (প্র.)। ২. কালীপদ মিত্র : প্রাচীন বারন্তের উৎসব ও ব্যসন (প্র.)। ৩. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি.) ৪. হীরেঙ্গনাথ দত্ত : মানবের নিয়তি (প্র.)। ৫. অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী : দুটি ইংরেজি কবিতা (অনুবাদ ও ভূমিকা) : ৬. পশুপতি ভট্টাচার্য : সমগোত্র (গ. ইভান বুনিন থেকে)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. নীরেঙ্গনাথ রায় : (ক) ঝিল্লীস্বর, (খ) টিনা, (গ) দ্বন্দ্ব

পুষ্পক পরিচয় :

১. নির্মলচন্দ্র মৈত্র : রবীন্দ্রীপিতা—সুরেঙ্গনাথ দাশগুপ্ত। ২. চারুচন্দ্র

দস্ত : Rise And Fulfilment of British Rule in India—Edward Thompson and G. T. Garratt. ৩. সুশোভন সরকার : (ক) Freedom and Organisation (1814-1914) : Bertrand Russell; (খ) History of Europe in the Nineteenth Century—Benedetto Croce; (গ) The Growth of Philosophic Radicalism—Elie Halevy. ৪. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) রাগনির্ণয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; (খ) নবগীতি, মঞ্জরী—সাহানা-দেবী ও দিলীপকুমার রায়। ৫. দিলীপকুমার সান্যাল : (ক) A Hope For Poetry—Cecil Day Lewis; (খ) Aspects of Modern Poetry—Edith Sitwell. ৬. ত্রিদিবনাথ রায় : (ক) I Claudius—Robert Graves; (খ) Claudius the God—Robert Graves. ৭. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : Nature and Life—A. N. Whitehead. ৮. হুমায়ুন কবির : চার অধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) Constance Markievicz—Sean O'Faolain, (খ) Prison Letters of Countess Markievicz. ১০. গিরিচ্ছাপতি ভট্টাচার্য : কল্পলতা—মণীন্দ্রলাল বসু। ১১. অতুলচন্দ্র গুপ্ত : সেতু ও অন্যান্য কবিতা—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ১২. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : A study of Yoga—Jajneswar Ghosh.

পঞ্চম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জীবন ১৩৪২ (পৃ. ১-১৬৪)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. সূর্যেন্দ্রনাথ দস্ত : সম্পাদকী ২. সত্যেন্দ্রনাথ বসু : আইনস্টাইন (প্র.)। ৩. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে দু-চারটি কথা (প্র.)। ৪. সুশোভন সরকার : আন্তর্জাতিক সঙ্কট (প্র.)। ৫. চারুচন্দ্র দস্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)। ৬. আবুসরীদ আইয়ুব : বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি ও দর্শন (প্র.)। ৭. বটকৃষ্ণ ঘোষ : ভাব ও ভাষা (প্র.)। ৮. হীরেন্দ্রনাথ দস্ত : সংগম ও বিরহ (প্র.)। ৯. মার্সেল আরলী : অভিসার (অনু. গ.)

কবিতাগুচ্ছ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মিষ্টাঙ্কিতা। ২. সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত : রাত্রি। ৩. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : রাত্রির কবিতা। ৪. নীরেন্দ্রনাথ রায় : মায়াবিনী। ৫. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র : বিয়োগান্ত। ৬. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : কান্ট।

পুস্তক পরিচয় :

১. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : শেষ সপ্তক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : Anti-Duhring—F. Engels (tr.) by Emilie Burns. ৩. বিষ্ণু দে : (ক) Coleridge on Imagination—I. A. Richards,

(খ) Poetic Experience—Thomas Gilby. ৪. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : Retreat From Glory—R. H. Bruce-Lockart. ৫. নীরেঙ্গনাথ রায় : (ক) The Letters of Gerald Menley Hopkins to Robert Bridges; (খ) The Correspondence of G.M. Hopkins and Richard Watson Dixon 2 Vols. ৬. সীতেশচন্দ্র কর : The Nature of Mathematics—Max Black. ৭. লীলাময় রায় : Prefaces—Bernard Shaw. ৮. গিরীন্দ্রাপতি ভট্টাচার্য : অন্তঃশীল—ধৃষ্টিটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৯. হারীতকৃষ্ণ দেব The Indus Civilisation—Ernest Mackay. ১০. হুমায়ুন কবির : (ক) Wheels and Butterflies—W.B. Yeats (খ) The House of Titans—A. E. ১১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : (ক) Men without Art—Wyndham Lewis; (খ) Make It New—Ezra Pound. ১২. দেবেশ শর্মা : মানবত্ব কি? প্রকাশক—পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। ১৩. হিরণকুমার সান্যাল : East and West—Gilbert Murray and Rabindranath Tagore.

পঞ্চম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শারদীয় (কার্তিক) ১৩৪২ (পৃ. ১৬৫-৩৩৬)
প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. হুমায়ুন কবির : কাণ্ট ও বিজ্ঞানবাদ (প্র.)। ২. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : প্রাচীন শিলালিপি ও কাব্য (প্র.)। ৩. হীরেঙ্গনাথ দত্ত : মান লজ্জা ভয় (প্র.)। ৪. রাখালচন্দ্র সেন : সারথি (গ.)। ৫. সুশোভন সরকার : ফাসিস্মো (প্র.) ৬. বটকৃষ্ণ ঘোষ : শব্দ ও অর্থ (প্র.)। ৭. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি.) ৮. সম্পাদকী (ডব্লু. বি. য়েট্‌স) : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

কবিতাগুচ্ছ :

স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় : যাত্রিনী। ২. নীরেঙ্গনাথ রায় : (ক) চল্লিশ ; (খ) আবির্ভাব।

পুস্তক-পরিচয় :

১. হীরেঙ্গনাথ দত্ত : (ক) কৌলজ্ঞান নির্ণয় and some minor Texts of the school of Matsyendra Natha' (ed.) by Prabodh Ch. Bagchi (খ) An Introduction to Adhyatma Ramayana—Prabodh Ch. Bagchi. ২. ধৃষ্টিটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : The Chinese Renaissance—Hu Shih. ৩. বিষ্ণু দে : (ক) The Rock—T.S. Eliot; (খ) Murder in the Cathedral—T.S. Eliot. ৪. বিমানবিহারী মজুমদার : পুরাণ প্রবেশ—গিরীন্দ্রশেখর বসু। ৫. ছায়া দেবী : (ক) যুদ্ধবেগী—মতিলাল রায়; (খ) বাঙালিবঙ্গ—বুদ্ধদেব বসু, (গ) অন্তরঙ্গ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। (ঘ)

মুদ্রপ্রণ—বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য; (ঙ) অদৃশ্য সঙ্কেত—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ৬. জ্যোৎস্নাকান্ত বসু : Patterns of Culture—Ruth Bonedict ৭ মণিভূষণ ভট্টাচার্য : (ক) Selected Poems—R.C. Trevelyan; (খ) Selected Poems—Elizabeth Daryush; (গ) Selected Poems—Hugh Macdiarmid। ৮. চারুচন্দ্র দত্ত : সমাজ ও সাহিত্য—কাজী আবদুল ওদুদ। ৯. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : Little Man, What Now—Hans Fallada. ১০. রবীন্দ্রলাল রায় : সুর ও সঙ্গতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ধৃষ্ণটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১১. ধৃষ্ণটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা (৩য় খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২. অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র : (ক) Fascism, Doctrine and Institutions—Mussolini; (খ) Fascism and the Social Revolution—R. P. Dutt. ১৩. স্বর্ণনন্দন শর্মা : (ক) 'লীলায়িতা', 'প্রাক্তনী'—সুশীলকুমার দে; (খ) প্রেম ও বিরহ—শিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

পঞ্চম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ ১৩৪২ (পৃ. ৩৩৭-৫০৩)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : রাসলীলা (প্র.)। ২. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (প্র.)। ৩. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ আত্মকায় খেত-কৃষ্ণ (প্র.)। ৪. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)। ৫. চারুচন্দ্র দাসগুপ্ত : প্রাচীন ভারতবর্ষীয় মূদ্রার শিব-মূর্তি (প্র.)। ৬. লীলাময় রায় : ডিক্টেটরশিপ (প্র.)। ৭. রূপকথা (গং. E. M. Forster-এর 'The Story of the Siren'-এর অনুবাদ। অনুবাদকের নাম নেই)। ৮. সম্পাদকী (সুধােন্দ্রনাথ দত্তের লেখা)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র : ওহারু (নোঙরি 'From the Eastern Sea' থেকে)। ২. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : সুরু ও শেষ। ৩. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : কবিতার মৃত্যু। ৪. বিষ্ণু দে : কবি কিশোর : প্রিয়ারায়েলাইট, হেসেনাইট, মোনাসিসা, প্রলাপকম্পন, ব্রাহ্মমুহূর্তের স্বপ্ন। ৫. অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী : বৃষ্টি।

পুস্তক-পরিচয় :

১. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : বীথিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. নীরেন্দ্রনাথ রায় : Seven Pillars of Wisdom—T.E. Lawrence. ৩. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : (ক) The State in Theory and Parctice—Harold J. Laski; (খ) The Nature of Capitalist Crisis—John Strachy. ৪. জ্যোতিরেন্দ্রনাথ মৈত্র : দৃষ্টিপ্রদীপ—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫. ধৃষ্ণটিপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায় : (ক) Voltaire—H. N. Brailsford, (খ) Religion and Science—Bertrand Russell, (গ) We Europeans—Julian Huxley and others. ৬. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : (ক) The Serial Univers—J. W. Dunne; (খ) Problems of Mind and Matter—John Wisdom. ৭. চারুচন্দ্র দত্ত : The Root and the Flower : L. H. Myers. ৮. সুশোভন সরকার : A Study of History (Vols I, II, III)—Arnold J. Toynbee.

সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয় :

৯. ধৃষ্ণটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : সপ্তপর্ণ—কিরণশঙ্কর রায়। ১০. শিবনাথ অধিকারী : From Wrong Angles—Gaganvihari Mehta. ১১. হিরণকুমার সান্যাল : দোলা—দিলীপকুমার রায়। ১২. নির্মলচন্দ্র দত্ত : (ক) আই হ্যাড—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (খ) নিরালায়—প্রমথনাথ রায়, (গ) সমর্পণ; অন্তর্যামী—আশালতা সিংহ। ১৩. প্রেমেন্দ্র মিত্র : অর্কেস্ট্রা—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

পঞ্চম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কৈশাখ ১৩৪৩ (পৃ. ৫০৫-৬৬০)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ :

১. রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ : প্রাচীন ও আধুনিক (প্র.) ২. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : বাংসা কাব্য সংকলন (প্র.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : রাসলীলা (প্র.)। ৪. আবু সয়ীদ আইয়ুব : সৌন্দর্যের মূল্য কি স্বাভাবিক? (প্র.)। ৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : সিলভা সেভি (প্র.)। ৬. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)। ৭. সুশীলকুমার মৈত্র : ধর্ম, যাদুবিদ্যা ও আর. আর. ম্যারেট (প্র.)। ৮. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : সংস্কৃতি সংকট (প্র.)। ৯. সম্পাদকী (সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখা)।

কবিতাশুদ্ধি :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পাত্র ও পাত্রী—চন্দ্রমল্লিকা, অপরাপক্ষ। ২. যুবনাথ : একমাত্র। ৩. সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত : দ্বিপ্রহরে। ৪. বিষ্ণু দে : জিজীবিষা। ৫. অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী : মেঘদূত।

পুস্তক-পরিচয় :

১. ধৃষ্ণটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : Rajmohan's wife—Bankim Chandra Chattapadhyay. ২. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : Experiments in Autobiography (Vols I, II.)—H. G. Wells. ৩. হারীতকৃষ্ণ দেব : The Ancient World—T. R. Glover. ৪. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : (ক) সাগর ও অন্যান্য কবিতা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য, (খ) পুরবাসিনী—অপরাজিতা দেবী। ৫. পণ্ডপতি

ভট্টাচার্য : Everyman in Health and Sickness (ed.) by Dr. Harry Roberts. ৬. হিরণকুমার সান্যাল : The Asiatics—Frederic Prousch. ৭. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র : Storm in Shanghai (La Condition Humaine)—Andre Malraux. ৮. বিষ্ণু দে : (ক) Poems—William Empson; (খ) Poems—George Barker; (গ) Selected Poems—Marianne Meore; (ঘ) A Time to Dance—Cecil Day Lewis. ৯. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : Hunger and Love—Lionell Britton. ১০. হারীতকৃষ্ণ দেব : Progress of Archaeology—Stenly Carson. ১১. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : Principles of Gestalt Psychology—K. Koffka. ১২. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : A Handbook of Marxism (ed.) by Emile Burns.

পরিচয় (মাসিক)

ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৩ (পৃ. ১-১০০)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : রাসলীলা (প্র.)। ২. বটকৃষ্ণ ঘোষ : শব্দ ও বাক্য (প্র.)। ৩. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)। ৪. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস (প্র.)। ৫. ধৃজ্জিৎপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আবর্ত (উপ.)। ৬. প্রমথ চৌধুরী : মার্কস-এর ডায়ালেক্টিক (প্র.)। ৭. অনুবাদকের নাম নেই : ভাসোবাসা (Thomas Mann-এর গল্প Tobias Mindernickel-এর অনুবাদ)। ৮. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : সম্পাদকী।

কবিতাশুচ্ছ :

১. বিষ্ণু দে : ঘোড়সওয়ার। ২. নীরেন্দ্রনাথ রায় : বিরোধ। ৩. যুবনাথ : শরীর নৈরাশ্য। ৪. সুমন্ত মহলানবিশ : রাজকন্যা।

পুস্তক-পরিচয় :

১. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : (ক) পঞ্চভূত, (খ) বিচিত্র প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. সুশোভন সরকার : History of Europe, Voll-3—H. A. Fisher. ৩. হুমায়ুন কবির : Shakespeare—John Middleton Murrey. ৪. ধৃজ্জিৎপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) Studies in the land economics of Bengal—Sachin Sen; (খ) Land Problem in India—Radhakamal Mukherjee. ৫. বিষ্ণু দে : (ক) Poet's tongue—W. H. Auden & J. T. Garrett, (খ) Faber Book of modern verse—ed. by Michael

Roberts, (গ) Progress of Poetry—ed. by J. M. Parsons. (ঘ) Years Poetry 1935. ৬. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : (ক) দাদু—ক্ষিতিমোহন সেন, (খ) মীরাবাই—স্বামী ভূমানন্দ। ৭. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র : Tale of Ganji-Lady Murashki. ৮. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : (ক) হঠাৎ আলোর ঝলকানি, (খ) বাসরঘর—বুদ্ধদেব বসু।

ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৩ (পৃ. ১০১-২২৪)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ : কেন? (প্র.)। ২. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : রাসলীলা (প্র.)। ৪. ধৃষ্ণটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আবর্ত (উপ.)। ৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : অধ্যাপক পল পেলিও (Paul Pelliot) (বিবিধ)। ৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : পুনরুজ্জীবন W. B. Yeats-এর The Resurrection নামক (ইয়েট্‌স্ রচিত নাটিকার অনুবাদ) ৭. সুশীলকুমার দেব : সাহিত্য ও সমাজ (প্র.)। ৮. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : সম্পাদকী

কবিতাগুচ্ছ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমি

পুস্তক পরিচয়

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : Dohakosa (দোহাকোষ) with notes and introduction—tr. by Prabodh Ch. Bagchi. ২. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) We have been warned—Naomi Mitehison, (খ) Nothing like leather—V. S. Prichett. ৩. সুশোভন সরকার : Thomas More—R. W. Chambers. ৪. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র : Byron : the years of fame—Pater Quennell. ৫. নীরেন্দ্রনাথ রায় : Shakespear's imagery and what it tells us—Caroline F. E. Spurgeon.

ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৩ (পৃ. ২০৫-৩০৮)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস (প্র.)। ২. ধৃষ্ণটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আবর্ত (উ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : রাসলীলা (প্র.)। ৪. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)। ৫. সুশোভন সরকার : স্পেনে অস্ত্রবিরোধ (প্র.)। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : বসুধৈব কুটুম্বকম্ (রুশ গল্পের ইংরেজি অনুবাদ থেকে অনূদিত)। ৭. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : সম্পাদকী

কবিতাশুদ্ধ

১. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : নিশীথ সঙ্গীত (নেসফিন্ড কৃত স্প্যানিশ কবিতার অনুবাদ থেকে)। ২. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ক্ষয়তী (জোসেফ ক্যাম্পাবেলের কবিতা থেকে)। ৩. বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : আছ রজনীতে।

পুস্তক-পরিচয়

১. ধুম্ভটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : Soviet Communism, a new Civilisation?—Sidney and Beatrice Webb. ২. হুমায়ুন কবির : Civilisation and the growth of law—W. A. Robson. ৩. চারুচন্দ্র দত্ত : Untouchable—Muluk Raj Anand. ৪. প্রিয়রঞ্জন সেন : Ancient versus modern scientific socialism—Bhagavan Das. ৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : বেদান্তসিদ্ধান্ত সূক্তি মঞ্জরী—নরেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ, সম্পাদিত। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : টাকাকড়ি—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম পত্র, ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক (শারদীয়া) ১৩৪৩ (পূ. ৩০৯-৪২১)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. বটকৃষ্ণ ঘোষ : মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি (প্র.)। ২. ধুম্ভটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আবর্ষ (উ.)। ৩. নীরেন্দ্রনাথ দত্ত : রাসলীলা (প্র.)। ৪. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)। ৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যের স্বরূপ (প্র.)। ৬. যুবনাথ : স্বাহা (গ.)। ৭. সূর্যেন্দ্রনাথ দত্ত : সম্পাদকী।

কবিতাশুদ্ধ :

১. সমর সেন : নাগরিক। ২. নীরেন্দ্রনাথ রায় : কোজাগরী। ৩. সুরেশ্বর শর্মা : অঙ্গরা। ৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্র : সঙ্গ।

পুস্তক পরিচয় :

১. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) পত্রপুট, (খ) শ্যামলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. পঞ্চানন চক্রবর্তী : General theory of employment, interest and money—J. M. Keynes. ৩. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : The Life and Letters of John Galsworthy—H. V. Marrot. ৪. হুমায়ুন কবির : Joseph Conrad—Edward Crankshaw. ৫. সুশোভন সরকার : Rise of European Liberalism—H. J. Laski. ৬. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : Extra sensory perception—J. B. Rhine. ৭. চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় : (ক)

কাকনতলার মেয়ে—শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়, (খ) ছমছাড়া—প্রভাতী দেবী সরস্বতী।

পাঠকগোষ্ঠী

‘মার্কস-এর ডায়ালেকটিকস’ বিষয়ে পত্রোত্তর :

(ক) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী শ্রীচরণেশু : দেবকুমার চৌধুরী

(খ) কৈফিয়ৎ : প্রমথ চৌধুরী।

ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৩৪৩ (পৃ. ৪২৩-৫২৫)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : ডব্লু. বি. ইয়েটস্ ও কলেক্‌বল্য (প্র.)। ২. বীণাপানি
রায় : দুটি চিঠি (লিওনিদ আদ্রিয়েভ থেকে) (গ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত :
রাসলীলা (প্র.)। ৪. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)। ৫. রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর : আধুনিক বাংলা কাব্য (প্র.)। ৬. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আবর্ত
(উপ.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : কোথা শেষ? ২. ছায়া দেবী : আনমনা।
৩. রমেশচন্দ্র রায় : ‘দেহের দাবীর তীরে’। ৪. সুশীলকুমার ঘোষ : রাত্রির
কবিতা। ৫. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ট্রায়াল্ডস্ (Srestha-র ইংরেজি
কবিতা থেকে)।

পুস্তক পরিচয়

১. সুশোভন সরকার : (ক) A History of the German Republic—
Arthur Rosenberg, (খ) The Fall of the German Republic—R.
T. Clark. ২. চারুচন্দ্র দত্ত : প্রাণীবিজ্ঞানের পরিভাষা—জ্ঞানেন্দ্রলাল চৌধুরী।
৩. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় : ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা (১ম খণ্ড)
—ড. পশুপতি ভট্টাচার্য। ৪. হিরণকুমার সান্যাল : রাজহংস—সজ্জনীকান্ত
দাস। ৫. পশুপতি ভট্টাচার্য : যৌনবিজ্ঞান—আবুল হাসানাৎ। ৬. নন্দগোপাল
সেনগুপ্ত : (ক) অপরিচিতা—রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, (খ) মজনু—বাসুদেব
ঠাকুর, (গ) প্রেম—তুলসী দেব, পারুল দেবী, পীযুষকান্তি, (ঘ) নতুন
কবিতা—হরপ্রসাদ মিত্র, বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও অমিয় গঙ্গোপাধ্যায়। ৭.
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : The Letters of John Keats—ed. by
Maurice Buxton.

পাঠকগোষ্ঠী

১. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (* শ্রাবণ সংখ্যায় নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদে সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন; তার উত্তরে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত উক্ত প্রবন্ধটি লিখেছেন)।

ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৩ (পৃ. ৫২৭-৬২৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ : সৌন্দর্য্যাতত্ত্ব (প্র.)। ২. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আবর্ত (উ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : রাসলীলা (প্র.)। ৪. পশুপতি ভট্টাচার্য : বিধাতার বিচার (গ.)। ৫. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)। ৬. প্রবোধচন্দ্র বাগসী : অধ্যাপক আতোয়ান মেইয়ে ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব (প্র.)। ৭. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : দীপ্তির মোহ (গ.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. যুবনাথ : চিনি। ২. শেলী দত্ত : সেদিনো এমনি রাতে। ৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : অধ্যায়।

পুস্তক পরিচয়

১. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : পাশ্চাত্য ভ্রমণ, জাপানে পারস্যে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) Seven Red Sunday—Raman J. Sender, (খ) Day's of Contempt—Andre Malraux. ৩. সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র : (ক) পুতুলনাচের ইতিকথা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, (খ) দিবারাত্রির কাব্য—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪. পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী : France Today and the people's Front—Maurice Thorez tr. by Emilie Burns. ৫. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : (ক) From Hegel to Marx—Sidney Hook, (খ) Dialectics—T. A. Jackson.

ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৩ (পৃ. ১-১০০)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : প্রেমের প্রগতি (প্র.)। ২. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আবর্ত (উ.)। ৩. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : শেব সপ্তকের ছন্দ (প্র.)। ৪. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)। ৫. পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী : ভবিষ্যতের শিল্প ও সাহিত্য (প্র.)। ৬. রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় : হরিণভাসার পাবতী সামন্ত (গা.)। ৭. যোগানন্দ দাস : রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্ববোধ (প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ

১. অরুণচন্দ্র চন্দ্রবর্তী : রত্ননীর কবিতা। ২. হেমচন্দ্র বাগচী : সুন্দরী পৃথিবী। ৩. মণীন্দ্রনাথ রায় : 'দাদুরী'।

পুস্তক পরিচয়

১. ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : The Future in marriage of Western Civilisation—E. Westermarck. ২. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : Revolt of the Clyde—William Gallacher. ৩. চারুচন্দ্র দত্ত : Lancer at large—F. Yeats-Brown. ৪. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : (ক) যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (খ) বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা—(এ)। ৫. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : (ক) Coming World War—T. H. Wintringham, (খ) Under the axe of Fascism—Gaetano Salvemini.

ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৩ (পৃ. ১১০-১৯৮)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. সশীলকুমার মৈত্র : অবিশ্বাস (গ.)। ২. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আবর্ষ (উ.)। ৩. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : দীনবন্ধুর নাটক (প্র.)। ৪. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি)। ৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : অভিসার ও সম্রম (প্র.)। ৬. অমলা দেবী : নিশান (গ.)। ৭. মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত : ১৯৩৬-৩৭।

কবিতাশুদ্ধ

১. বিষ্ণু দে : ফাঁপা মানুষ (বুড়ো মোড়লকে কাণা কড়ি)*
*টি. এস. এলিয়ট-এর The Hollow Men কবিতার অনুবাদ।

পুস্তক পরিচয়

১. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : (ক) Introduction to the contemporary German Philosophy—Werner Brock. (খ) Recent Philosophy—John Laird. ২. যুধিষ্ঠির দাস : ঘরে বাইরে—প্রমথ চৌধুরী। ৩. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : জীবনসঙ্গিনী—মতিলাল রায়। ৪. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : (ক) The Big Money—John Dos Passos, (খ) May day—John Sommerfield. ৫. পশুপতি ভট্টাচার্য : অভিজ্ঞান—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৬. নীরদকুমার ভট্টাচার্য : (ক) The Ottawa Agreement, a study of imperial preference—D. Ghosh, (খ) Revision of Ottawa, a study in political economy—D. Ghosh. ৭. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) পুরানো কথা, (খ) দুনিয়াদারী—চারুচন্দ্র দত্ত। ৮. প্রবোধচন্দ্র

বাগচী : Linguistic introduction to Sanskrit—Batakrishna Ghosh.

৯. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : Economics and sociology—Adolf-Lowe. ১০. পাঠকগোষ্ঠী : প্রমথ চৌধুরী : (ক) মহাভাষ্যকার পতঞ্জলী, (খ) From Hegel to Marx গ্রন্থের সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী কৃত সমালোচনা পোষ ১৯৪৩ সংখ্যা, বিষয়ে চিঠি।

ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৩ (পৃ. ১৯৯-২৯৯)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জেরা ম্যানলি হপকিন্স * (The Note books and Papers of Gerard Manley Hopkins) (প্র.)। ২. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আবর্ত (উপ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : মান ও মানাস্ত (প্র.)। ৪. হিরণকুমার সান্যাল : পাটির শেষ (বি.)। ৫. আবু সয়ীদ আয়ুব : ইংলণ্ডে স্বাধীনতা (প্র.)। ৬. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (স্মৃতি.)। ৭. অপরাপ মুখোপাধ্যায় : স্পেইনের ছবি (প্র.)।

কবিতাশুচ্ছ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘর-ছাড়া

পুস্তক-পরিচয়

১. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : (ক) ছন্দ, (খ) সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) World population—A. M. Carr-Saunders, (খ) Population movement—Robert R. Kuczynski, (গ) The Struggle for population—B. V. Glass, (ঘ) Population theory and their application with special reference to Japan—E. F. Penrose, (ঙ) Migrant Asia—Radhakamal Mukherjee. ৩. সমর সেন : (ক) Look stranger—W. H. Auden, (খ) Ascent to F6—Christopher Isherwood and A. W. Auden, (গ) More poems—A. E. Housman. ৪. বিষ্ণু দে : Eycless in Gaza—Aldous Huseley. ৫. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : (ক) Memoirs of a Foxhunting man, (খ) Memoir of a Infantry man, (গ) Sherston's progress—Siegfried Sasoon. ৬. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : (ক) Reporters in Spain—Frank Pitcairn, (খ) Spain in revolt—Harry Gannes and Theodore Repard, (গ) Spanish Front—Carlos Prieto, (ঘ) Behind the Spanish Barricade—John Longden Davies, (ঙ) The Nazi

conspiracy in Spain—by the Editor of the Brown book of the Hitler Terror.

ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৪ (পৃ. ৩০১-৪০২)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. বটকৃষ্ণ ঘোষ : হিন্দু ও বৌদ্ধ (প্র.)। ২. ধৃজ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আবর্ষ (ধারা. উ.)। ৩. অপরূপ মুখোপাধ্যায় : স্পেইনের ছবি (ধারা. প্র.)। ৪. চারুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (ধারা. স্মৃতি)। ৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : মাধুর (প্র.)। ৬. অ. মি—গোলাপ বাগানে ছায়া (অনু. গ.)। ৭. বিনয় ঘোষ—ভাষা ও হৃদ (প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ

১. যুবনাথ : চিলে কোঠা। ২. নীরেন্দ্রনাথ রায় : শুকতারা। ৩. লীলাময় রায় : কয়েকটি ক্লেরিহিউ (Clerihew)।

পুস্তক পরিচয়

১. প্রমথ চৌধুরী : ভারত ও মধ্য-এশিয়া—প্রবোধচন্দ্র বাগচী। ২. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : (ক) The Decline and Fall of the Romantic Ideal—F. L. Lucas; (খ) Revelation, Tradition and Development in English poetry—F. R. Leavis. ৩. সুশোভন সরকার : European Civilisation, its origin and Development—by Various Contributors under the direction of Edward Eyre. Vol. IV. The Reformation. ৪. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : (ক) ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা—সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। (খ) Dambaru—The Futurist Publishing House. (গ) মনোমুকুর—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়; ৫. ধৃজ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : Hindu Civilisation—Dr. Radha Kumud Mookherjee. ৬. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : (ক) খাপছাড়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; (ঘ) ধূসর পাণ্ডুলিপি—জীবনানন্দ দাশ; ৭. চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় : (ক) পশ্চিম-যাত্রিকী—দুর্গাবতী ঘোষ; (খ) আবিষ্কার-যাত্রী—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ (পৃ. ৪০৩-৫০২)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হেমেন্দ্রলাল রায় : বাংলা ও হিন্দি গান (প্র.)। ২. ধৃজ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আবর্ষ (ধারা. উপ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : মাধুরের পর মিলন (প্র.)। ৪. নুটবিহারী মুখোপাধ্যায় : কেশব ভট্টাচার্যের কন্যাদান (গ.)। ৫.

ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : জাপানের শিল্পসঙ্কট (প্র.)। ৬. মঞ্জু ঘোষ : বাংলা শব্দের নূতন বানান (প্র.) ৭. চরুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (ধারা. স্মৃতি.)। ৮. অপরাধ মুখোপাধ্যায় : ডাচ্ ছবি (ধারা. প্র.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. নিশিকান্ত : বৃষমুণ্ড। ২. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : শাড়ী। ৩. আবদুল কাদির : রাত্রির রহস্য।

পুস্তক পরিচয়

১. প্রবোধ ঘোষ : Obiter Scripta—George Santayana—ed. by Justus Buchler and Benjamin Schwartz. ২. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : (ক) ব্রিহস্পতি রবীন্দ্রনাথ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়; (খ) বঙ্গ-প্রতিভা—অবনীনাথ রায়। ৩. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : The Stories of Three Decades—Ezra Pound. ৫. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : Inhibitions, Symptoms and Anxiety—Sigmund Freud. ৬. হিরণকুমার সান্যাল : The Years—Virginia Woolf. ৭. সুশোভন সরকার : (ক) Retour de l' U. R. S. S.—Andre Gide; (খ) Theory and Practice of Socialism—John Strachey. ৮. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : The Letters of Lenin—Translated and edited by Elizabeth Hill and Doris Mudie.

ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৪ (পৃ. ৫০৩-৬০১)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : শ্মশান ঘাট (গ.)। ২. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : মহা-মিলন (প্র.)। ৩. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আবর্ষ (ধারা. উ.)। ৪. অপরাধ মুখোপাধ্যায় : ডাচ্ ছবি (প্র.)। ৫. অমলা দেবী : সুটকেস্ (ব্রুনো ব্রাক্সের 'সুটকেস্' গল্পের অনুবাদ)। ৬. চরুচন্দ্র দত্ত : পুরানো কথা (ধারা. স্মৃতি.)। ৭. নীরদকুমার ভট্টাচার্য : ইউরোপে সমর-সঙ্কট (প্র.)। ৮. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : আবেল বেরগেন্স ও বেদানুশীলন (প্র.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. হায়া দেবী : দেবদাক। ২. সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত : সনেট। ৩. সুশীলকুমার ঘোষ : জোয়ার। ৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : উটপাখী।

পুস্তক পরিচয়

১. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : Autobiography—G. K. Chesterton, *২. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : The Dangers of Being Human—Edward

Glover. ৩. যুধিষ্ঠির দাস : A Tribe in Transition, A Study in Culture pattern—Dr. Dharendra Nath Majumdar. ৪. নীরদকুমার ভট্টাচার্য : (ক) The Indian Sugar Industry 1936 Annual—M. P. Gandhi; (খ) The Indian Sugar Industry—Its Past, Present and Future—M. P. Gandhi; (গ) The Indian Sugar Industry—Its Present and Future—M. P. Gandhi; ৫. ধৃজ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : The Legacy of India—G. T. Garrat—With an introduction by the Marquess of Zetland. ৬. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : (ক) চন্দ্রমল্লিকা-হরপ্রসাদ মিত্র; (খ) কাব্যপ্রদীপ—সুধীরকুমার দাস; (গ) সে মিআরেবল্—পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ৭. হিরণকুমার সান্যাল : The Tenure of Agricultural Land—Sachin Sen. ৮. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : Indian Thought and its Development—Albert Schweitzer, translated from German by Mrs. Charles E. B. Russel.

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৪ (পৃ. ১-১৪০)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : সোমলতা (ধারা. উপ.)। ২. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : মহামিলন (ধারা. প্র.)। ৩. প্রমথ চৌধুরী : খোট্টন ও সোট্টন (গ.)। ৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : শিল্প ও স্বাধীনতা (প্র.)। ৫. ধৃজ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আবর্ত (উপ. সমাপ্ত.)। ৬. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : চীনদেশের ভাষা (প্র.)। ৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : টিকটিকি (গ.)। ৮. ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : প্যালেস্টাইনের সমস্যা (প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভাগ্যরাজ্য। ২. সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : আমি ত পেয়েছি স্বর্গ। ৩. নীরেন্দ্রনাথ রায় : প্রোটন। ৪. যুবনাথ : বিরহ।

পুস্তক-পরিচয় :

১. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. নুশোভন সরকার : Ideology and Utopia—Karl Mannheim, tr. by Louis Wirth and Edward Shils. ৩. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : (ক) জীবন ও সাহিত্য—মহেন্দ্রনাথ রায়; (খ) এ ও তা—প্রভু শুভঠাকুরতা। ৮. নীরেন্দ্রনাথ রায় : Philosophy of Rhetoric—L. A. Richards. ৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বেদান্ত প্রবেশ—রামপদ চট্টোপাধ্যায়।

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৪ (পৃ. ১০৫-২০৪)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : পরকীয়া-তত্ত্ব (প্র.)। ২. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : সোমলতা (ধারা. উপ.)। ৩. নীরদকুমার ভট্টাচার্য : চীন-জাপান সমস্যা (প্র.)
৪. সুশীল জানা : কীট (গ)। ৫. বিভূতিপ্রসাদ বসু (প্র.* রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব দিনে সরিষা বিবেক ভারতী সাহিত্যচক্রের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত)। ৬. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ইতিহাসের কাল (প্র. আগামী বারে সমাপ্য)।

কবিতাশুচ্ছ :

১. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ঝড় (ডেভিস্ অনুসরণে) ২. স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় : নবযুগ ৩. অরুণচন্দ্র চক্রবর্তী : স্মরণ।

পুস্তক-পরিচয় :

১. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : Freud and Marx—R. Osbera. ২. সমর সেন : Forward from Liberation—Stephen Spender. ৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : (ক) Pie In The Sky—Arthur Calder-Marshall; (খ) Wheel Turns—Gian Dauli. ৪. বিষ্ণু দে : কয়েকটি কবিতা—সমর সেন। ৫. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) সজ্ঞান—বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য; (খ) পিনাকী রায়—ফ্রেডমোহন পুরকায়স্থ।

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৪ (পৃ. ২০৫-৩০৫)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : পরকীয়া-তত্ত্ব (ধারা. প্র.)। ২. প্রমথ চৌধুরী : মেরি ক্রিস্মাস্ (গ.)। ৩. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ইতিহাসের কাল (প্র.—সমাপ্ত)। ৪. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : সোমলতা (ধারা. উপ.)। ৫. রণেন মজুমদার : আর্টের সৃষ্টি না আর্ট-সৃষ্টি (প্র.)। ৬. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : কীট-তর (গ.)। ৭. শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : জয়দেব ও গীতগোবিন্দ (প্র.)।

কবিতাশুচ্ছ :

১. নরেন্দ্রনাথ মিত্র : ভালোবাসা। ২. যুবনাথ : রাতচরা পাখীরা। ৩. ব্রজকান্ত ঘোষ : সুপ্তা (Roy Campbell-এর অনুসরণে)।

পুস্তক-পরিচয় :

১. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : Book of Mergery Kempe (1436)—A Modern Version—W. Butler Brown. ২. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় :

Flowering New England (1815-1865)—Von Wyck Brooks. ৩. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : Life of Thomas Moore—Joseph Hone. ৪. গিরিদ্ধাপতি ভট্টাচার্য : Science Front 1936—Gerald Heard. ৫. হিরণকুমার সান্যাল : আত্মচরিত—জগৎহরলাল নেহরু। ৬. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : (ক) শতপর্বা—সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র; (খ) গীতগোবিন্দ—শ্রীশ্রীজয়দেব (বিমলাশঙ্কর দাস অনুদিত)।

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক (শারদীয়া) ১৩৪৪ (পৃ. ৩০৭-৪০৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ -

১. বটকৃষ্ণ ঘোষ : সংকার্যবাদ (সমর্থন) (প্র.)। ২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : কিম্বদন্তি (গ)। ৩. সুশোভন সরকার : স্পেন ও বৃটিশ বৈদেশিক নীতি (প্র.)। ৪. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : ভক্তি ও প্রেম (প্র.)। ৫. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : সোমলতা (ধারা. উপ.)। ৬. আশালতা সিংহ : বাস্তব ও কল্পনা (গ)।

কবিতাওচ্ছ :

১. জীবনানন্দ দাস : সমুদ্রচিহ্ন। ২. সমর সেন : একটি বুদ্ধিজীবী।

পুস্তক-পরিচয় :

১. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : As I was going down Sackville street—Oliver J. Gogarty. ২. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : কঙ্কাবতী—বুদ্ধদেব বসু। ৩. ধৃজ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : Salavin—Georges Duhamel. ৪. সমর সেন : Complete Works of Isaac Rosenberg; ed. by D. H. Hording and Gordon Bottomley. ৫. বিষ্ণু দে : আবর্ত—ধৃজ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) সুচরিতাসু—মণীন্দ্র বসু ও সুশীল রায়, (খ) সংক্রান্তি—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ (পৃ. ৪০৭-৫০৫)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : ভক্তি ও প্রেম (প্র.)। ২. বুদ্ধদেব বসু : ফিরিঙলা (গ)। ৩. অচ্যুতানন্দ গোস্বামী : শরৎচন্দ্র ও বঙ্গতাত্ত্বিক সাহিত্য (প্র.)। ৪. ই. এম. ফর্স্টার : ভারতপথে ('A Passage to India' উপ./হিরণকুমার সান্যালের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)। ৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : ভিক্টর জ্যাকমৌ (প্র.)। ৬.

সরোজকুমার রায়চৌধুরী : সোমলতা (ধারা. উপ.)। ৭. বটকৃষ্ণ ঘোষ :
হের্মান য়াকোবি (প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ :

১. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : সার্ববাহ। ২. দ্বিজেন্দ্র মৈত্র : দ্বীপান্তিতা।

পুস্তক-পরিচয় :

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : Ten printed Upanisads, put into English by Shree Purahit Swami and W. B. Yeats. ২. হেমেন্দ্রলাল রায় : চামেলী—হিমাংশুকুমার দত্ত। ৩. সুশোভন সরকার : Mind in chains—Cecil Day Lewis. ৪. সমর সেন : জ্বলন্ত—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ৫. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : Phoneix—D. H. Lawrence. ৬. হিরণ্যকুমার সান্যাল : নদীপথে—অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ৭. সরসী সরস্বতী : বৃহত্তর ভরাতে পূজাপার্বন—স্বামী সদানন্দ।

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৪ (পৃ. ৫০৭-৬০৪)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : রতির তারতম্য (প্র.)। ২. ই. এম. ফর্স্টার : ভারতপথে (অনু. উপ.)। ৩. অমিয়নাথ সান্যাল : গানের সমালোচনা (প্র.)। ৪. বিনয় ঘোষ : ডাস্টবিন (গ.)। ৫. হুমফ্রে হাউস : শ্যামা (প্র. ইংরেজিতে প্রদত্ত রেডিও বক্তৃতার ভাবানুবাদ)। ৬. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : সোমলতা (ধারা. উপ.)। ৭. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : ভিক্টর জ্যাকমৌ ও মহারাজা রণজিৎ সিংহ (প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ :

১. নিশিকান্ত : রূপান্তরিতা। ২. চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় : দুই বোন। ৩. সুকুমার মৈত্র : অঙ্ককার আর কবিতা।

পুস্তক-পরিচয় :

১. প্রবীরচন্দ্র বসুমন্ডিক : Empire of the Nababs—Lester Hut Chinson. ২. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : (ক) সমুদ্র তীর—বুদ্ধদেব বসু, (খ) আমি চঞ্চল হে—বুদ্ধদেব বসু। ৩. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : Novel and the People—Ralph Fox. ৪. পূর্ণেন্দু গুহ : পঞ্চমী ও অন্যান্য গল্প—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৫. অমলাদেবী : Two Leaves and a Bud—Muluk Raj Anand. ৬. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : বিশ্ব পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৪ (পৃ. ৬০৫-৭০৪)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ

১। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : মধুরা রত্তি (প্র.)। ২. শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : লক্ষ্মীছাড়া (গ.)। ৩. অমিয়নাথ সান্যাল : গানের সুমালোচনা (প্র.)। ৪. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : সোমলতা (ধারা. উপ.)। ৫. বটকৃষ্ণ ঘোষ : সংকার্যবাদ—খণ্ডন (প্র.)। ৬. ই. এম. ফর্স্টার : ভারত পথে (উপ.—হিরণকুমার সান্যাল অনূদিত)। ৭. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : চীনের প্রতিরোধ (প্র.)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. মণীশ ঘটক : ঝড়কে ডানায় পুষে। ২. নীরেন্দ্রনাথ রায় : (ক) তুমি ত আমি, (খ) বিচ্ছেদ।

পুস্তক-পরিচয় :

১. প্রথম চৌধুরী : বাঙলা কাদম্বরী—প্রবোধেন্দু ঠাকুর। ২. নীরদকুমার ভট্টাচার্য : Hitler's drive to the East—F. Elwin Jones. ৩. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : মানুষের মন—জীবনময় রায়। ৪. সমর সেন : A date with a Duchess—Arthur Caldar-Marshall।

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৪ (পৃ. ৭০৫-৮০৪)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : সাংখ্যের সাংপরায় (প্র.)। ২. সমীর রায় : হসিগান্ (গ.)। ৩. রবীন্দ্রনাথ : কথা ও সুর (ধৃষ্টিপ্রসাদকে লেখা চিঠি)। ৪. ই. এম. ফর্স্টার : ভারতপথে (অনু. উপ.)। ৫. হেমেন্দ্রলাল রায় : সমালোচনার আলোচনা (প্র.)। ৬. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : সোমলতা (উপ.)। ৭. ভোলানাথ ঘোষ : শিবের গীত (রম্য)। ৮. প্রমথ চৌধুরী : শরৎচন্দ্র (শ্রদ্ধা)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বুদ্ধভক্তি। ২. সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : নিতুই নব। ৩. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : অব্যক্ত। ৪. সমর সেন : বর্ষশেষ।

পুস্তক-পরিচয় :

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : Mystic philosophy of Upanisads—Sris Chandra Sen. ২. বিশ্বতোষ দত্ত : Plato today—R. H. S. Crossman. ৩. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : (ক) চক্রবাড়—রাধাচরণ চক্রবর্তী, (খ) জহরির

জ্বর—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৪. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : (ক) Book of songs—tr. from the chinese by Arthur Waley, (খ) ন্যায় দর্শনের ইতিহাস—নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, (গ) শান্তিপুর পরিচয়—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। ৫. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : (ক) বৃন্দাবন—অসিতকুমার হালদার, (খ) শবরী—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) সে, (খ) ছড়ার ছবি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭. পূর্ণেন্দু শেখর : ঘোষালের ত্রিকথা—প্রমথ চৌধুরী।

* (গত মাঘ সংখ্যায় শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লক্ষ্মীছাড়া’ নামক একটি গল্প ‘পরিচয়ে’ প্রকাশিত হইয়াছিল সম্প্রতি আমরা জানিতে পারিয়াছি যে উক্ত গল্পটি শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত ‘লক্ষ্মীছাড়া’ নামক গল্পের চব্বি প্রতিলিপি। আমরা শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্লজ্জতায় ও দুঃসাহসিকতায় স্তম্ভিত হইয়াছি। আশা করি আমাদের পাঠকবর্গ উপলব্ধি করিবেন যে এ ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায় কারণ সম্পাদকের পক্ষে প্রত্যেক রচনা যাচাই করিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব।—পরিচয় সম্পাদক)

! ৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৪ (পৃ. ৮০৫-৯০৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : সাংখ্যের সাংপরায় (প্র.)। ২. সুকুমার দে সরকার : মানুষ (গ.)। ৩. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : সঙ্গীত-তরঙ্গ ও গানের প্রাচীন ধারা (প্র.)। ৪. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : সোমলতা (ধারা. উপ.)। ৫. সুশোভন সরকার : সাম্যবাদের সঙ্কট (প্র.)। ৬. আশানন্দ নাগ : বৈষ্ণব ধর্ম ও স্বদেশসেবা (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের একবিংশ অধিবেশনে পদাবলীশাখার এবং প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে সঙ্গীতশাখার অভিভাষণ)। ৭. ই. এম. ফর্স্টার : ভারত পথে (ধারা. অনু. উপ.)।

কবিতাশুদ্ধি :

১. হুমায়ুন কবির : ভারতবর্ষ। ২. গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় : প্রান্তর। ৩. কানাই সামন্ত : নিরুদ্দেশ কামনা। ৪. হীরাজাল দাসগুপ্ত : কসাইখানা।

পুস্তক-পরিচয় :

১. বটকৃষ্ণ ঘোষ : The Evolution of the Rigvedic Pantheon—Srimati Akshaya Kumari Devi. ২. নীরেন্দ্রনাথ রায় : Lucretius, De Rerum Natura—Translated into English by R. C. Trevelyan. ৩. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : প্রান্তিক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪. অমিয়কুমার

গঙ্গোপাধ্যায় : 'I Will Not Rest'—Romain Rolland. ৫. আলোচকের নাম নেই : বাঙলায় ভ্রমণ—প্রকাশক ই. বি. রেলওয়ে।

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৫ (পৃ. ৯০৭-১০০৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : ভিক্টোরিয় ইংলণ্ড (প্র.)। ২. রাধাচরণ চক্রবর্তী : নিম্মজ্ঞা (গ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : সাংখ্যের সাংপরায় (প্র.)। ৪. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : সোমলতা (উপ.)। ৫. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : ট্রাজেডি ও তাহার বিবর্তন (প্র.)। ৬. ই. এম. ফর্স্টার : ভারতপথে (অনু. উপ.)।

কবিতাশুচ্ছ :

১. দিলীপকুমার রায় : বিশ্বরণ। ২. নিশিকান্ত : গরুর গাড়ি।

পুস্তক-পরিচয় :

১. প্রবীরচন্দ্র বসুমতীক : From Lenin to Stalin—Victor Serze। ২. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : চোরাবালি—বিষ্ণু দে। ৩. চারুচন্দ্র দত্ত : Inside India—Halide Edile। ৪. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : Moscow 1937—Lion Feuctwanger. ৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১৮১৮—১৮৩০) ১ম খণ্ড পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত।

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ (পৃ. ১০০৭-১১০৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের 'দৃষ্টি' (প্র.)। ২. রজত সেন : শেষ-রাত্রির চাঁদ (গ.)। ৩. নীরদকুমার ভট্টাচার্য : ইউরোপ ও অস্টিয়ার স্বাধীনতা (প্র.)। ৪. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : সোমলতা (ধারা. উপ.)। ৫. হিরণকুমার সান্যাল : ভারতপথে (ধারা. উপ. ই. এম. ফর্স্টারের অনুবাদ)।

কবিতাশুচ্ছ :

১. মণীশ ঘটক : (ক) শুভ্রা, (খ) তার পরে। ২. সঞ্জয় ভট্টাচার্য : ওরা। ৩. আব্দুল কাদির : সহচরী।

পুস্তক-পরিচয় :

১. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : A Vision—W. B. Yeats. ২. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু সমাজে—চারুচন্দ্র মিত্র। ৩. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : Blasting and Bombardiering—Wyndham Lewis. ৪. দর্শন

শর্মা : Pepita—V. Sackville-West. ৫. নবেন্দু বসু : কল্যাণিকা—
অসিতকুমার হালদার। ৬. বিষ্ণু দে : Letters from Iceland—W. H.
Auden and Louis. ৭. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : ডাকের চিঠি—পশুপতি
ভট্টাচার্য। ৮. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) তপ ও তাপ—রাধাচরণ
চক্রবর্তী; (খ) আলো আর আশুন—প্রবোধকুমার সান্যাল; (গ) হংসবলাকা—
সরোজকুমার রায়চৌধুরী।

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ডিষ্ট সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৫ (পৃ. ১১০৭-১২০৬)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. শীরেন্দ্রনাথ দত্ত : দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র (বিবৃতি ও সংপৃতি/প্র.) ২.
সরোজকুমার রায়চৌধুরী : সোমলতা (ধারা. উপ.)। ৩. অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ :
বাংলা ও ইংরাজী : (এ প্রবন্ধ প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল।
কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ইহার বিষয়বস্তু আজও পুরাতন হয় নাই, বরং বাংলা
ভাষা প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীর শিক্ষার বাহনরূপে নির্বাচিত হওয়ায় প্রসঙ্গটির
আবেদন সম্ভ্রান্তি আরো বাড়িয়াছে—পরি. সম্পাদক)। ৪. তারাকান্ত
বন্দ্যোপাধ্যায় : মা (গ.)। ৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : বাংলাদেশে বৈদিক সভ্যতা
(প্র.)। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : ভারতপথে (ধারা. অনু. উপ.)। ৭.
নলিনীকান্ত গুপ্ত : কাব্যের মহত্ব (প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ :

১. বিষ্ণু দে : বিভীষণের গান। ২. শীরেন্দ্রনাথ রায় : পূর্ণিমা। ৩.
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : জাতিস্মরণ। ৪. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : মুহূর্তের
রিক্ত হাহাকার।

পুস্তক-পরিচয় :

১. প্রবীরচন্দ্র বসুমন্ডিক : Heredity and Politics—J. B. S. Haldane.
২. শীরেন্দ্রনাথ রায় : সপ্তপর্ণ—রাখালচন্দ্র সেন। ৩. পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী
: A Philosophy For A Modern Man—H. Levy. ৪. বিমলাপ্রসাদ
মুখোপাধ্যায় : (ক) রস-সাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী; (খ) ভর্তুহরী কৃতম্
বৈরাগ্যশতকম্; (গ) স্তব-সমুদ্রঃ—প্রথম প্রবাহঃ; (ঘ) উদ্ভট-ক্লো-মালা—
কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত। ৫. দর্শন
শর্মা : The Rains Came—Louis Bromfield. ৬. অমিয়কুমার
গঙ্গোপাধ্যায় : (ক) অষ্টাদশী—হুমায়ুন কবির; (খ) এলোমেলো—মুরারি দে।
৬. শীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : The Russian Revolution—M. N. Roy.

৭. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : তত্ত্বচন্দ্রিকা—মাহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব কর্তৃক প্রণীত।

অষ্টমবর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৫ (পৃ. ১-১০০)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. বটকুঞ্চ ঘোষ : বিজ্ঞানবাদের ক্রমবিকাশ (প্রঃ)। ২. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : সোমলতা (ধারা. উ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র (ধারা. প্র.) ৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : প্যাক (গ.)। ৫. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : ভারতীয় জাতীয়তার জন্ম (নিখিল বঙ্গ ছাত্রছাত্রী সাহিত্য সম্মেলনে ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ)। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : ভারতপথে. (E. M. Forster-এর A Passage To India উপন্যাসের ধারাবাহিক সংক্ষেপিত অনুবাদ)।

কবিতা

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মৎপু পাহাড়ে

পুস্তক-পরিচয় :

১. চারুচন্দ্র দত্ত : Trials in Burma—Maurice Collis. ২. দর্শন শর্মা : Lions and Shadows—Christopher Isherwood. ৩. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : Punjabi Sufi Poets—Lajwanti Rama Krishna. ৪. হিরণকুমার সান্যাল : Lament for Economics—Barbara Wootton. ৫. বিষ্ণু দে : (ক) Essays in Verse, (খ) Prefaces—Sjahid Suhrawardy. ৬. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : (ক) অরণ্যপথে—প্রবোধকুমার সান্যাল; (খ) ককটেল কনফেশন্—মণি বাগচী; (গ) রাজধানীতে ঝড়—আবু রুশদ। ৭. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত—(ক) চণ্ডালিকা, (খ) ক্ষণিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অষ্টমবর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৫ (পৃ. ১০১-২০০)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র (ধারা. প্র.)। ২. অমূল্য চট্টোপাধ্যায় : সেতুবন্ধ (গ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : জাপানী কবিতা (প্র.)। ৪. নীরেন্দ্রনাথ রায় : দাবী (ধারা. উ.)। ৫. প্রবীরচন্দ্র মসুমন্সিক : ফ্যাশিঅন্ড ও সমর (Mussalini's Roman Empire—by G. T. Garratt ও Blackmail or War—by Genevieve Tobouis-এর গ্রন্থ অবলম্বনে আলোচনাধর্মী প্রবন্ধ)। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : ভারতপথে (ধারা.

উ./অনুবাদ)। ৭. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : দেশে-বিদেশে (প্র)। ৮. ভোলানাথ ঘোষ : বাংলা বানানের নিয়ম (প্র)।

কবিতাগুচ্ছ

১. জীবনময় রায় : বিদায়ের গান। ২. পূর্ণেন্দু গুহ : ঘূর্ণি হাওয়া। ৩. অরুণকুমার মিত্র : আমরা চেয়েছি শান্তি।

পুস্তক পরিচয়

১. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : South Latitude—D. Ommanney. ২. সৌরেন্দ্রনাথ বসু : The Civil War in Spain—Frank Jellinek. ৩. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : বঙ্কিম-পরিচয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪. নীরদকুমার ভট্টাচার্য : The Future of Parliamentary Democracy—Sir Charles Grant Robertson. ৫. হেমেন্দ্রলাল রায় : (ক) স্বরবিতান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; (খ) স্বরলিপি—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদনা—শৈলজারঞ্জন মজুমদার। ৬. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : (ক) সমাজ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; (খ) আধুনিক শ্রেষ্ঠ গল্প—রমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত; (গ) না—হীরালাল দাশগুপ্ত।

অষ্টমবর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, শারদীয়া ১৩৪৫ (পৃ. ২০১-৩০০)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. বটকৃষ্ণ ঘোষ : বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা (প্র)। ২. নীরেন্দ্রনাথ রায় : দাবী (ধারা. উ)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র (ধারা. প্র)। ৪. প্রেমেন্দ্র মিত্র : ধার্মোন্মাদ ও চীনের যুদ্ধ (গ)। ৫. লীলাময় রায় : দম্পতী (নাটিকা)। ৬. বিজয় রায় (সুশোভন সরকার) : দেশবিদেশ (প্র)। ৭. হিরণকুমার সান্যাল : ভারত পথে (ধারা. উ./অনুবাদ)।

কবিতাগুচ্ছ

১. বিষ্ণু দে : সর্ব জি, পি-র গান। ২. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : নবজন্ম। ৩. মণীশ ঘটক : বঙ্কিমচন্দ্র। ৪. সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : আশ্ব-নির্বাসিত।

পুস্তক পরিচয়

১. প্রবীরচন্দ্র বসুমন্টিক : Social Interest—A Challenge to Mankind—Alfred Adler. ২. দর্শন শর্মা : The Writings of E. M. Forster—Rose Macaulay. ৩. সমর সেন : Josesh in Egypt—Thomas Mapn. ৪. পূর্ণেন্দু গুহ : (ক) ছিন্নপত্র, (খ) ভানুসিংহের পত্রাবলী, (গ) পথে ও পথের প্রান্তে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫. সৌরেন্দ্রনাথ বসু : Peace with the Dictators—Sir Norman Angell.

অষ্টমবর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৫ (পৃ. ৩০১-৩৯৬)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র (ধারা. প্র.)। ২. নীরেন্দ্রনাথ রায় : দাবী (ধারা. উ.)। ৩. ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : মানুষের মন, মগজ ও আত্মা (প্র.)। ৪. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : নদী ও নারী (গ.)। ৫. বিজ্ঞান রায় (সুশোভন সরকার) : দেশ-বিদেশ (প্র.)। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : ভারত পথে (ধারা. উ./অনুবাদ)।

কবিতাগুচ্ছ

১. গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় : রজনীগন্ধা। ২. শোভা মহলানবিশ : বিচ্ছেদ। ৩. সুকুমার দে সরকার : আসার আগে। ৪. মণীন্দ্র রায় : স্বর্গ হইতে বিদায়।

পুস্তক পরিচয়

১. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : Social and Cultural Dynamics—Pitrim Sorokin. ২. সুমত্ৰ মহলানবিশ : Three Guineas—Virginia Woolf. ৩. দর্শন শর্মা : The Unvanquished—William Faulkner. ৪. প্রবীরচন্দ্র বসুমত্ৰিক : Psychology and Religion—Carl Gustav Jung. ৫. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : Japan over Asia—William Henry Chamberlain. ৬. হারীতকৃষ্ণ দেব : সাসীতিকী—দিসীপকুমার রায়। ৭. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : (ক) বাংলাসাহিত্যে নবযুগ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত; (খ) তপনকুমারের অভিযান—হেমচন্দ্র বাগচী; (গ) কিশোর সঙ্ঘ—মণীন্দ্র দত্ত; (ঘ) সাহসীর জয়যাত্রা—যোগেশচন্দ্র বাগল।

অষ্টমবর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ (পৃ. ৩৯৭-৪৯৪)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. বটকৃষ্ণ ঘোষ : বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা (প্র.)। ২. নীরেন্দ্রনাথ রায় : দাবী (ধারা. উ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র (ধারা. প্র.)। ৪. সমীর রায় : মাদননা (গ.)। ৫. সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : দিগ্গজের সাহিত্যচর্চা (প্র.)। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : ভারত পথে (ধারা. উ./অনুবাদ)। ৭. নলিনীকান্ত গুপ্ত : কবি ও যোগী (প্র.)। ৮. নীরদকুমার ভট্টাচার্য : দেশবিদেশ (প্র.)

কবিতাগুচ্ছ

১. সুভাষ মুখোপাধ্যায় : এখানে। ২. হরপ্রসাদ মিত্র : পাতাল কন্যা। ৩. জীবনময় রায় : মছর। ৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : উজ্জীবন।

পুস্তক পরিচয়

১. সুশোভন সরকার : The Communist International—F. Borkenau. ২. দর্শন শর্মা : Kilvart's Diary—ed. by Jonathan Cape. ৩. হারীতকৃষ্ণ দেব : Art and Archaeology Abroad—Research Work of Kalidas nag. ৪. অমিয় কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : (ক) হেগেল ও মার্কস—রেবতীমোহন বর্মন; (খ) সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কট—রেবতীমোহন বর্মন; (গ) মার্কসের অর্থনীতি—পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী; (ঘ) রাশিয়ার রূপান্তর—সুকুমার মিত্র; (ঙ) জাগৃতি—রেজাউল করিম। ৫. পূর্ণেন্দু গুহ : কুরুপাণ্ডব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : In Hazard—Richard Hughes. ৭. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : (ক) রাসলীলা—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; (খ) মেঘদূত (মূল ও পদ্যানুবাদ)—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

অষ্টমবর্ষ, ১ম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৫ (পৃ. ৪৯৫-৫৯৩)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : নতুন ও পুরাতন (প্র.)। ২. মণীন্দ্র রায় : আগন্তুক (গ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র (ধারা. প্র.)। ৪. পরিমল গোস্বামী : শব্দ-সঙ্ঘাত (গ.)। ৫. সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : দ্বিগুণের সাহিত্যচর্চা (প্র.)। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : ভারত পথে (ধারা. উ./অনুবাদ)। ৭. বটকৃষ্ণ ঘোষ : স্থিরমতির ত্রিংশিকাভাষ্য (প্র.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. বিপ্লব মুখোপাধ্যায় : প্রত্যয়। ২. সুনীলরঞ্জন ঘোষ : ছবি। ৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : যাত্রাশেষ। ৪. সুকৃৎকুমার মিত্র : বঙ্ক্যা-জমি। ৫. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : দিন চলে যায়।

পুস্তকপরিচয়

১. সুধাময় ভট্টাচার্য : Czechs and Germans—Elizabeth Wiskemann. ২. হেমেন্দ্রলাল রায় : কথা ও সুর—ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৩. সুশোভন সরকার : The Common People (1746-1938)—G. D. H. Cole and Raymond Postgate. ৪. প্রিয়রঞ্জন সেন : গল্প-সংসার-মালা—সাধারণ সম্পাদক—শ্রীশ্রীপত রায়। তৃতীয় ভাগ, বাংলা—সম্পাদক—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ৫. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : (ক) সোমলতা—সরোজকুমার রায়চৌধুরী; (খ) রসকলি—তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬. হরপ্রসাদ মিত্র : গিরিশচন্দ্র—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

অষ্টমবর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৫ (পৃ. ১-১০০)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র (ধারা. প্র.)
২. রজত সেন : স্বপ্ন-শেষ (গ.)।
৩. বটকৃষ্ণ ঘোষ : য্যাকব্ হুকারনাগেল্ (প্র.)।
৪. হিরণকুমার সান্যাল : ভারত পথে (ধারা. উ./অনুবাদ)।
৫. পূর্ণেন্দু গুহ : গল্প সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী (প্র.)।
৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)।
৭. সন্তোষকুমার প্রতীহার : রোহিনী ('কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণী চরিত্রের আলোচনা)।
৮. নীরদকুমার ভট্টাচার্য : দেশ-বিদেশ (প্র.)

কবিতাগুচ্ছ

১. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভোরে।
২. বিমলাপ্রসাদ চক্রবর্তী : জোনাকি।
৩. অরুণচন্দ্র চক্রবর্তী : ভিনাসের জন্ম।

পুস্তক পরিচয়

১. চারুচন্দ্র দত্ত : British Social Life in India—Denis Kincaid.
২. সুধাময় ভট্টাচার্য : Secret Agent of Japan (A hand book to Japanese Imperialism)—Amlets Vespa.
৩. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : Fascism—M. N. Roy.
৪. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : সৈজুতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : (ক) পরিক্রমা—বুদ্ধদেব বসু; (খ) শ্মশানে বসন্ত—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
৬. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : (ক) জলের লিখন—সুধীর রায়চৌধুরী; (খ) খসড়া—অমিয় চক্রবর্তী।
৭. দর্শন শর্মা : The Tyranny of Words—Stuart chase.

অষ্টমবর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৫ (পৃ. ১০১-১৯৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. বটকৃষ্ণ ঘোষ : হিরমতির ত্রিংশিকাভাষ্য (প্র.)।
২. সুশীল জ্ঞানা : খেয়াঘাট (গ.)।
৩. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : ইউরোপে সংস্কৃতানুশীলনের সূত্রপাত ও ইউজেন বুনুফ (প্র.)।
৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)।
৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র (ধারা. প্র.)।
৬. হিরণকুমার সান্যাল : ভারত পথে (ধারা. উ./অনুবাদ)।
৭. প্রবীরচন্দ্র বসুমন্টিক : দেশ-বিদেশ (প্র.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. বিষ্ণু দে : প্রার্থনা—কুমারকে, কাজলার জন্য।
২. হরপ্রসাদ মিত্র : শতাব্দী।
৩. অরুণকুমার মিত্র : আরস্ত।

পুস্তক-পরিচয়

১. দর্শন শর্ম্মা : Unforgotten years—Logan Pearsall Smith. ২. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : The Deat of the Heart—Elizabeth Bowen. ৩. সমর সেন : (ক) On the Frontier—W. H. Auden and Christopher Isherwood; (খ) The Trial of a Judge, a tragic statement—Stephen Spender. ৪. সুশোভন সরকার : Parliamentary Government in England—A Commentary—Harold J. Laski ৫. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : The Political and Social Doctrine of Communism—R. Palme Dut. ৬. হরপ্রসাদ মিত্র : (ক) স্বপ্ন-কামনা—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত; (খ) কাশবনের কন্যা—ফাছুনী মুখোপাধ্যায়; (গ) কাব্যগুচ্ছ—কুমুদনাথ দাস; (ঘ) ত্রিশঙ্কু-মদন—মণীন্দ্র রায়।

অষ্টমবর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৫ (পূ. ১৯৭-২৯৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র (ধারা. প্র.)। ২. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)। ৩. আশানন্দ নাগ : অহিন্দুর দৃষ্টিতে হিন্দুসমাজ (প্র.)। ৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্র : রসিক দাস (গ.)। ৫. বটকৃষ্ণ-ঘোষ : শব্দব্রহ্মবাদ (প্র.)। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : ভারত পথে (ধারা. উ./অনুবাদ)। ৭. সুধাংশু দাশগুপ্ত : মহাত্মা গান্ধী ও সুন ইয়াং সেন (প্র.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সম্পূর্ণ। ২. জীবনানন্দ দাস : তিনটি কবিতা—(ক) গোখলিসন্ধির নৃত্য, (খ) যেই সব শেয়ালেরা, (গ) সপ্তক।

পুস্তক পরিচয়

১. বিষ্ণু দে : The Oxford Book of Light Verse—Chosen by W. H. Auden. ২. সুশোভন সরকার : Power—a new social analysis—Bertrand Russell. ৩. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : Italian Fascism—Cactano Salvemini. ৪. কামাঙ্কীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : তাসের দেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অষ্টমবর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৬ (পূ. ২৯৭-৩৯৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বঙ্কিম ও গীতার ধর্ম্ম (প্র.)। ২. সুধাময় ভট্টাচার্য :

শরৎ সাহিত্যের গোড়ার কথা (প্র.)। ৩. বটকৃষ্ণ ঘোষ : আধুনিক ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি (প্র.)। ৪. নবেন্দুভূষণ ঘোষ : অস্ত্র (গ.)। ৫. মণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)। ৬. মোহিত বসু : দেশ-বিদেশ (প্র.)। ৭. হিরণকুমার সান্যাল : ভারতপথে (ধারা. উ./অনুবাদ)।

কবিতাশুচ্ছ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ কথা। ২. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : চন্দ্রলোক।

পুস্তক পরিচয়

১. প্রিয়রঞ্জন সেন : বাংলা ভাষা পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. সমর সেন : Studies in a dying culture—Christopher Caudwell. ৩. আশানন্দ নাগ : Individual and the group—B. K. Mallik. ৪. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : Days of hope—Andre Malraux.

অষ্টমবর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫৬ (পৃ. ৩৯৭-৪৯৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বিজ্ঞানের ব্যর্থতা মোক্ষণ (ধারা. প্র.)। ২. মণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)। ৩. বটকৃষ্ণ ঘোষ : ন্যায়মতে আত্মবাদ (ধারা. প্র.)। ৪. জগদীশচন্দ্র পালচৌধুরী : বয়োমধ্যাহ্ন (গ.)। ৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : হিন্দুর দৃষ্টিতে অহিন্দু সমাজ (প্র.)। ৬. কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : সিংহ সম্রাট ও সতীর শাপ (ধারা. প্র.)। ৭. বিজ্ঞান-রায় (সুশোভন সরকার : দেশ-বিদেশ (প্র.)।

কবিতাশুচ্ছ

১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জেসন্। ২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অত্যাঙ্কি। ৩. মণীশ ঘটক : ভুল।

পুস্তক পরিচয়

১. মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত : (ক) Fallen Bastions—G. E. R. Gedye; (খ) Shadow of the Swastika—G. T. Garrat ২. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : The Wild Palm—William Faulkner. ৩. বিষ্ণু দে : Christmas Holiday—Somerset Maugham. ৪. হরপ্রসাদ মিত্র : (ক) অজানিতার চিঠি—বিধায়ক ভট্টাচার্য; (খ) স্ট্যাগলিন-সুভাঙ্ক সাক্ষাৎকার—অমিয় সেনগুপ্ত; (গ) আত্ম—সুধাংশুকুমার গুপ্ত; (ঘ) লালপথে—সত্যেন্দ্র দত্তমজুমদার; (ঙ) অন্ধের দৃষ্টি—গিরিশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ; চ) সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়—বিশ্ব মুখোপাধ্যায়।

অষ্টমবর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৬ (পৃ. ৪৯৭-৫৯৬)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বিজ্ঞানের ব্যর্থতা-মোক্ষণ (ধারা. প্র.)। ২. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : মদনগোপালের বিরহ (গ.)। ৩. বটকৃষ্ণ ঘোষ : ন্যায়মতে আত্মবাদ (প্র.)। ৪. মালিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)। ৫. আশানন্দ নাগ : সুদূরপ্রাচ্যে ষ্টুটধর্ম (প্র.) ৬. কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : সিংহ সম্রাট ও সতীর শাপ (ধারা. প্র.)। ৭. আদিত্য আচার্য : দেশ-বিদেশ (প্র.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : পাশা। ২. অরুণকুমার মিত্র : বন্ধনী।
৩. নীরেন্দ্রনাথ রায় : আশ্রয়।

পুস্তক পরিচয়

১. বটকৃষ্ণ ঘোষ : সাংখ্য পরিচয়—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ২. আশানন্দ নাগ : Principles of art—R. G. CollingWood. ৩. দর্শন শর্মা : Tumbling in the hay—Oliver St. John Gogarty. ৪. গেব্রিয়েল লামন্ট/অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : Present condition of India—Leonard M. Schiff. ৫. প্রমথ চৌধুরী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য—প্রবোধচন্দ্র বাগচী।

নবমবর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৬ (পৃ. ১-১০০)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বিজ্ঞানের ব্যর্থতা-মোক্ষম (ধারা. প্র.)। ২. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : একটি সত্যকার প্রেমের গল্প (গ.)। ৩. বটকৃষ্ণ ঘোষ : মীমাংসা মতে আত্মবাদ (ধারা. প্র.)। ৪. কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : সিংহ সম্রাট ও সতীর শাপ (ধারা. প্র.)। ৫. সত্যেন্দ্রকুমার প্রতিহার : গোরা (প্র.)। ৬. মালিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)। ৭. হিরণকুমার সান্যাল : দেশ-বিদেশ (সংবাদ ভাষ্য)।

কবিতাগুচ্ছ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হিম্মতুতি। ২. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : গলিত নখ।
৩. হরপ্রসাদ মিত্র : বিরহ।

পুস্তক পরিচয়

১. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : The Village—Muluk Raj Anand. ২. সমর সেন : Family Reunion—T. S. Elliot. ৩. বসুধা চক্রবর্তী : Our

Differences—M. N. Roy. ৪. সুশোভন সরকার : (ক) মার্কস প্রবেশিকা—রেবতীমোহন বর্মণ; (খ) মার্কসীয় দর্শন—রবি রায়; (গ) বিপ্লবী চীন—সুধাংশু দাশগুপ্ত। ৫. অতুলচন্দ্র গুপ্ত : অনুকথা সপ্তক—প্রমথ চৌধুরী। ৬. দর্শন শর্মা : Road to Damascus—August Strindberg.

নবমবর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৬ (পৃ. ১০১-২০০)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. বটকুম্ভ ঘোষ : মীমাংসা মতে আত্মবাদ (প্র.)। ২. কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : সিংহ সম্রাট ও সতীর শাপ (ধারা. প্র.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বিজ্ঞানের ব্যর্থতা-মোক্শ (ধারা. প্র.)। ৪. রমাকৃষ্ণ মৈত্র : প্রতিপক্ষ (গ.)। ৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : সুদূর প্রাচ্যে জাতীয়তাবাদ ও শৃঙ্খল (প্র.)। ৬. মাসিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)। ৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী : রেণে গ্রন্থের ভারতবর্ষ (ধারা. প্র.)। ৮. হিরণকুমার সান্যাল : দেশ-বিদেশ (সংবাদ ভাষ্য)।

কবিতাশুচ্ছ

১. মণীন্দ্র রায় : পরম্পর। ২. হেমচন্দ্র বাগচী : হারানো সুর।

পুস্তক পরিচয়

১. খুজ্জিটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : Beware of Pity—Stephen Zweig. ২. প্রমথ চৌধুরী : চৈতন্য চরিতামৃতের উপাদান—বিমানবিহারী মজুমদার। ৩. প্রিয়রঞ্জন সেন : প্রেমধর্ম—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ৪. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : (ক) শ্রীমৎসুদন (নাটক)—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়; (খ) মানসবিরহ (কবিতাগ্রন্থ)—হেমচন্দ্র বাগচী; (গ) বুঝা (উপন্যাস)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়; (ঘ) 'জন্মেয় দায়'; 'পথের বোঝা'—ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ। ৫. হরপ্রসাদ মিত্র : উপমা কালিদাসস্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

নবমবর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৬ (পৃ. ২০১-৩০০)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. সরসীলাল সরকার : বঙ্গসাহিত্যের মন : সমীক্ষণ (* সাহিত্য পরিষদে পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ)। ২. সুধাংশুকুমার ঘোষ : মানুষের মন (গ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বিজ্ঞানের ব্যর্থতা-মোক্শ (প্র.)। ৪. কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : সিংহ সম্রাট ও সতীর শাপ (ধারা. প্র.)। ৫. মাসিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উপ.)। ৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরাদেবী : রেণে গ্রন্থের ভারতবর্ষ (ধারা. প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ

১. গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় : নির্বাণ। ২. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : সনেট।
৩. সৌরীন্দ্র মিত্র : চারটি বিচ্ছেদের কবিতা (হিরাকুর তর্জমা)। ৪. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : সোনার সিঁড়ি।

পুস্তক পরিচয়

১. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : Testament of Asia—Ela Sen. ২. ধূম্রাটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : Germany's Revolution of Destruction—Herman Ranschning. ৩. সৌরীন্দ্র মিত্র : পাষণ কন্যা—অঙ্কিত বসু। ৪. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : A Journey Round my Skull—Frigyes Karinthy. ৫. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : (ক) মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ—সুশোভনচন্দ্র সরকার; (খ) Inside Asia—John Gunther. ৬. সমর সেন : (ক) The Collected Poems of Hart Cane; (খ) The Still Cetre—Stephen Spender. ৭. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : আঁকাবাঁকা—প্রবোধকুমার সান্যাল।

নবমবর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৬ (পূ. ৩০১-৪০০)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জীবতত্ত্ব (ধারা. প্র.)। ২. কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : সিংহ সম্রাট ও সতীর শাপ (ধারা. প্র.)। ৩. বটকৃষ্ণ ঘোষ : জৈন ও বাৎসীপুত্রীয় মতে আত্মবাদ (প্র.)। ৪. প্রবোধকুমার সান্যাল : তরঙ্গ (গ.)। ৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী : রেনে গ্রন্থের ভারতবর্ষ (ধারা. প্র.)। ৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)।

কবিতাশুদ্ধ

১. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : আত্মকের এই মুহূর্ত। ২. শোভা মহলানবিশ : কণিকা। ৩. সুকৃতকুমার মৈত্র : ওরা। ৪. হরপ্রসাদ মিত্র : চার অধ্যায়।

পুস্তক পরিচয়

১. সুহীন্দ্রনাথ দত্ত : Moses and Monotheism—Sigmund Freud.
২. জিতেন্দ্রনাথ বসু : মৈত্র্যপনিষৎ ও বহুসূতিকোপনিষৎ—হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাখ্যাত। ৩. হিরণ্যকুমার সান্যাল : (ক) স্বগত—সুহীন্দ্রনাথ দত্ত; (খ) বর্বশেষ—চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৪. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : মরুযাত্রা—বিমল সেন। ৫। অমিয় গঙ্গোপাধ্যায় : ১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা—রমাপদ বসু সম্পাদিত।

নবমবর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৩৪৬ (পৃ. ৪০১-৪৯৬)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : জীবের সাংপরায় (প্র.)। ২. ধরিত্রী দেবী : ও বাড়ির বৌ (গ.)। ৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী : রেনে গ্রন্থের ভারতবর্ষ (ধারা. প্র.)। ৪. কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : সিংহ সম্রাট ও সতীর শাপ (ধারা. প্র.)। ৫. সরসীলাল সরকার : মনস্তত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব (প্র.)। ৬. মণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. প্র.)। ৭. বটকৃষ্ণ ঘোষ : কণিকাবাদ (প্র.)।

কবিতা

১. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : মহাপ্রস্থান।

পুস্তক পরিচয়

১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। ২. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : The vision of Asia an interpretation of Chinese Art and Culture—L. Cranmer-Byng. ৩. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : Science Marches On—Walter Shepherd. ৪. রাসবিহারী দাস : Introduction to Indian Philosophy—S. C. Chatterjee. ৫. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : The Man Behind the plough—M. Azizul Haque. ৬. মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত : (ক) বলশেভিক পার্টির ইতিহাস—আবদুল হালিম; (খ) সেনিন ও বলশেভিক পার্টি—রেবন্তী বর্মণ; (গ) কৃষকের সংগ্রাম ও আন্দোলন—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা। ৭. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : (ক) আরতি (গ.)—প্রবোধ ঘোষ; (খ) বৃহত্তর সম্ভাবনা (গ.)—বরেন্দ্রনাথ বসু; (গ) বকধর্মিক (না.)—যামিনীমোহন কর। ৮. মণীন্দ্র রায় : কুমুদনাথ (জীবনচরিত)—সরলাবালা সরকার।

নবমবর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৬ (পৃ. ৪৯৭-৫৯২)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : গ্রীক সমাজব্যবস্থার ভূমিকা (প্র.)। ২. মণীন্দ্র রায় : শেবরক্ষা (গ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : পরলোকে 'তর-তম' (প্র.)। ৪. মঞ্জু আচার্য : পরিচ্ছদ (নাটক, Clifford Bax-এর Cloak নাটক অনুসরণে)। ৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী : রেনে গ্রন্থের ভারতবর্ষ (প্র.)। ৬. মণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)।

কবিতাশুদ্ধ

১. সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : আমার হয়েছে মৃত্যু। ২. গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় : মৃগতৃণা।

পুস্তক পরিচয়

১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : Buried Empires—Patrick Carlton. ২. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : Chateaubriand a Biography—John Evans. ৩. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : Boundaries of Science—John Macmurry. ৪. মণীন্দ্রনাথ শুভ : (ক) Memorandum on the Permanent Settlement—Bengal Provincial Kisan Sabha; (খ) Society and its Development—Rebati Burman. ৫. হিরণকুমার সান্যাল : রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়—শচীন সেন।

নবমবর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মার্চ ১৩৪৬ (পৃ. ১-৯৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : পিতৃযান ও দেবযান (প্র.)। ২. সমীর রায় : ইমিয়েনীনী (রুশ গল্পের অনুসরণে)। ৩. বটকৃষ্ণ ঘোষ : ক্ষণিকবাদ (ধারা. প্র.)। ৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : গ্রীক সমাজ-ব্যবস্থার ভূমিকা (প্র.)। ৫. ইন্দিরা দেবী (লিখিত) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদিত) : রেণে গ্রন্থের ভারতবর্ষ (ধারা. প্র.)। ৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উপ.).

কবিতাশুদ্ধ

১. অশোক মৈত্র : তৃতীয়া। ২. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : স্পিনোজা।

পুস্তক পরিচয়

১. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : Will to Civilisation—John Kalz. ২. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : (ক) Democracy To Day and Tomorrow—Edward Benes; (খ) The Defence of Democracy—John Middleton Murray. ৩. বিশু মুখোপাধ্যায় : রাপুর দ্বিতীয় ভাগ—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ৪. হরপ্রসাদ মিত্র : (ক) বৌ—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়; (খ) বিদ্রোহিনী : শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : শ্রীমন্তগবদগীতা (১ম ও ২য় খণ্ড)—অনিলবরণ রায়।

নবমবর্ষ, ২য় খণ্ড; ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৬ (পৃ. ৯৭-১৯২)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : পঞ্চাঙ্গি বিদ্যা (প্র.)। ২. সুশীল রায় : নাটক

(গ.)। ৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী : রেণে গ্রন্থের ভারতবর্ষ (প্র.)। ৪. বটকুষ্ণ ঘোষ : ক্ষণিকবাদ (প্র.)। ৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)। ৬. পুলকেশ দে সরকার : ভারতীয় মূর্তিবাদ (প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ

১. জীবনানন্দ দাস : নাবিক। ২. অরুণকুমার মিত্র : প্রান্তবর্তী। ৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : প্রস্তাবনা।

পুস্তক পরিচয়

১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : After Many A Summer—Aldous Huxley.
২. চারুচন্দ্র দত্ত : শ্রীঅরবিন্দ (জীবন ও যোগ)—প্রমোদকুমার সেন। ৩. সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : Language And Reality—Wilbur Marshall Urban. ৪. সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের সঙ্কল্প—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) শিলালিপি—মণীশ ঘটক; (খ) নতুন খাতা—কিরণধন চট্টোপাধ্যায়; (গ) বিজয়িনী—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত; (ঘ) চিত্রলেখা—খগেন্দ্রনাথ ঘোষ (কবিতার বই)।

নবমবর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৬ (পৃ. ১৯৩-২৮৮)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : আবৃত্তি বা পুনর্জন্ম (প্র.)। ২. জ্যোতির্ময় রায় : বঞ্চনা (গ.)। ৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদিত) ও ইন্দিরা দেবী (লিখিত) : রেণে গ্রন্থের ভারতবর্ষ (ধারা. প্র.)। ৪. মুজ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মহাত্মা গান্ধী *(Mahatma Gandhi—Ed. by S. Radhakrishnan)। ৫. বীরেন্দ্র বিশ্বাস : একটি রূপক কাহিনী (*ডে লুইস-এর Thomas—A Fairy Tale গল্পের অনুবাদ)। ৬. অমূল্যচন্দ্র সেন : সম্রাট অশোকের শিলালিপি (প্র.)। ৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উপ.)।

কবিতাশুদ্ধ

১. নিশিকান্ত : শঙ্খচিল ও রাজহংস। ২. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : বিংশোত্তরী। ৩. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : 'অবসর'।

পুস্তক পরিচয়

১. সত্যরত্ন সেন : An Essay On Indian National Income (1925-29)—U. K. R. V. Rao. ২. ক্ষিতিকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : Step By Step—Winston Churchill. ৩. বিনয় ঘোষ : Journey Through Life—

Amedee Ozenfant; tr. by Helen Beauclerk and Violet Macdonald.
৪. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : Observation on 'The Man Behind The Plough'—Probhanath Sing Rey and Sachin Sen. ৫. মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত : Dialectical and Historical Materialism—J. Stalin. ৬. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : The Patriot—Pearl Buck.

নবমবর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৭ (পৃ. ২৮৯-৩৮৪)
(সম্পাদক : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হিরণকুমার সান্যাল)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. শূঙ্খটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য (প্র.)। ২. নবেন্দ্রভূষণ ঘোষ : পোস্ট-মর্টেম (গ.)। ৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী : রেণে গ্রন্থের ভারতবর্ষ (প্র.)। ৪. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)। ৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বা পুনর্জন্ম (প্র.)। ৬. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : ভুল করেছিল (অনুবাদ গ.)। ৭. অমূল্যচন্দ্র সেন : সম্রাট অশোকের শিলালিপি (প্র.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় : প্রলয়। ২. সুশীল ছানা : রূপকথা।
৩. মণীন্দ্র রায় : আমরা ও তাহারা।

পুস্তক পরিচয়

১. খগেন্দ্রনাথ মিত্র : দক্ষিণ ভারত পথে—জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। ২. মণীন্দ্র রায় : (ক) একদা—গোপাল হালদার; (খ) মুমূর্ষু পৃথিবী—হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ৩. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : Some Sayings of Buddha—tr by F. L. Woodward. ৪. নীরদকুমার ভট্টাচার্য : বাংলার ব্যাক্তি—হরিশচন্দ্র সিংহ। ৫. হিরণকুমার সান্যাল (ক) India's Teeming Millions—Gyan Chand; (খ) Living Space And Population Problems—R. K. Kuczynshi. ৬. বিত্ত মুখোপাধ্যায় : তথাপি—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।

নবমবর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ (পৃ. ৩৮৫-৪৮০)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : অনাবৃষ্টি (প্র.)। ২. রজত সেন : প্যানথার (গ.)।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী : রেণে গ্রন্থের ভারতবর্ষ (প্র.)। ৪.

সুশীলকুমার দেব : সাগরিকা (ইবসেনের নাটকের অনুবাদ)। ৫. অমূল্যচন্দ্র সেন : সম্রাট অশোকের শিলালিপি (প্র.)। ৬. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)।

কবিতাশুচ্ছ

১. বিষ্ণু দে : চতুর্দশপদী। ২. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ইউলিসিস। ৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : শেবমুক্তি।

পুস্তক পরিচয়

১. সুধীন্দ্রনাথ : North Cape : F. D. Ommanney. ২. সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : (ক) The Field of The Embroiderd Quilt—tr. by E. M. Milford (জসীমউদ্দিনের 'নকশীকাঁধার মাঠ'-এর অনুবাদ); (খ) অবশ্যভাবী—পণ্ডপতি ভট্টাচার্য। ৩. বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় : দেবী—তারিণীকমল পণ্ডিত। ৪. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) দাবী—নীরেন্দ্রনাথ রায়; (খ) মহানগরীর উপন্যাস—করুণাকণা গুপ্তা।

নবমবর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৭ (পৃ. ৪৮১-৫৭৪)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : অমৃতত্ব-সিদ্ধি (প্র.)। ২. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : টি. বি. (গ.)। ৩. শচীন সেন : ফ্লাউড কমিশন ও জমিদারী প্রথা (প্র.)। ৪. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)। ৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধ সাধনার ধারা (প্র.)। ৬. সুশীলকুমার দেব : সাগরিকা (ইবসেনের নাটকের অনুবাদ)। ৭. রণেন মজুমদার : ব্লাভ রিয়ালিজম্ (প্র.)।

কবিতা

১. মণীন্দ্র রায় : রাহি ও রেবা।

পুস্তক-পরিচয়

১. চারুচন্দ্র দত্ত : উপনিষদের আলো—মহেন্দ্রনাথ সরকার। ২. সমর সেন : Last Poems And Plays—W. B. Yeats. ৩. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) নবজাতক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; (খ) পদাতিক—সুভাষ মুখোপাধ্যায়; (গ) জোনাকি—সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। ৪. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : (ক) বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ—সুরেন ঠাকুর; (খ) মেক্সিকোভেলির রাজনীতি—মনোরঞ্জন গুপ্ত। ৫. সরসী সরস্বতী : প্রাচীন হিন্দুস্থান—প্রমথ চৌধুরী।

দশম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৭ (পৃ. ১-৯৮)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : অমৃতত্ব-সিদ্ধির উপায় (প্র.)। ২. সুশীলকুমার দেব : সাগরিকা (ইবসেনের নাটকের অনুবাদ)। ৩. প্রমথ চৌধুরী : ছুড়ি-দুশ্য (গ.)। ৪. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)। ৫. নিখিল চক্রবর্তী : ক্লাউড কমিশন রিপোর্ট (প্র.)। ৬. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : একখানি প্রাচীন নাটক (প্র.)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় : নেপথ্য। ২. সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : মর্মবাণী। ৩. হরপ্রসাদ মিত্র : শান্তি।

পুস্তক-পরিচয় :

১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : The Grand Whiggery—Majorie Villiers. ২. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : Goodbye to Berlin—Cristopher Isherwood. ৩. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : How Green was My Valley—Richard Llewellyn. ৪. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : দৈনন্দিন—জ্যোতির্ময় রায়। ৫. প্রিয়রঞ্জন সেন : ছান্দসিকী—দিলীপকুমার রায়। ৬. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) ভোরের আলো—বিজ্ঞানকুমার চট্টোপাধ্যায় : (খ) স্বর্গ হইতে বিদায়—ভবানী মুখোপাধ্যায়; (গ) প্রথম প্রশ্ন—রাইমোহন সাহা।

পত্রিকা-প্রসঙ্গ :

১. 'ভারতবর্ষ' ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; ২. 'চতুরঙ্গ' (আলোচকের নাম নেই)

দশম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৭ (পৃ. ৯৯-১৯৪)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : জীবনযুক্তি (প্র.)। ২. প্রতিভা কসু : পরিশেষ (গ.)। ৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্বিতীয় পর্যায় (প্র. * রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড/বিশ্বভারতী)। ৪. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)। ৫. সুশীলকুমার দেব : সাগরিকা (ইবসেনের 'The Lady from the Sea' নাটকের অনুবাদ)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : একটি কথা। ২. সঞ্জয় ভট্টাচার্য : সমতল।

পুস্তক-পরিচয় :

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : পৃথিবী—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। ২. জগদীশ

ভট্টাচার্য : (ক) রক্তগোলাপ—জ্যোতির্মালা দেবী; (খ) সবার সাথে—
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। ৩. সঞ্জয় ভট্টাচার্য : This War—Thomas Mann. ৪.
শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : The Yearling—Marjorie Kinnan Rawlings. ৫.
(আলোচকের নাম নেই) : বাংলায় ভ্রমণ (১ম ও ২য় খণ্ড)—অমিয় বসু
সম্পাদিত এবং ই. বি. রেলওয়ে প্রকাশিত।

পত্রিকা-প্রসঙ্গ :

হ. (হিরণকুমার সান্যাল?) : 'সমসাময়িক' ত্রৈমাসিক পত্রিকা

দশম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৭ (পৃ. ১৯৫-২৮৮)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : জীবনযুদ্ধের পরে (প্র.)। ২. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় :
অহিংসা (ধারা. উপ.)। ৩. পুলকেশ দে সরকার : ভাষা ও আচরণ-তত্ত্ব
(প্র.)। ৪. রম্ভত সেন : রাজকন্যা (গ.)। ৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয়
সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৬. সুশীলকুমার
দেব : সাগরিকা (অনুবাদ নটক)।

কবিতাশুদ্ধ :

১. বিষ্ণু দে : একটি ছবি (শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের সৌজন্যে)। ২.
জীবনানন্দ দাশ : প্যারাডিম। ৩. গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় : অলকা।

পুস্তক-পরিচয় :

১. হরপ্রসাদ মিত্র : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন। ২. অজিত
দত্ত : মৈনাক—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ৩. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : Parole
D'honneur—Martin Freud. ৪. বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় : The Problem
of India—K. S. Shelvankar. ৫. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) ইউরোপের
চিঠি—মহেন্দ্রনাথ সরকার; (খ) লেখা—জ্যোতির্ময় ঘোষ।

পত্রিকা-প্রসঙ্গ :

হ. (হিরণকুমার সান্যাল?) : পত্রিকা প্রসঙ্গ ('অগ্রণী' পত্রিকায় প্রকাশিত
'ফসিল' গল্পের আলোচনা)।

দশম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৭ (পৃ. ২৮৯-৩৮২)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : জীবনযুদ্ধের দশা (প্র.)। ২. সুশীলকুমার দেব :

সাগরিকা (ইবসেনের Lady from the Sea নাটকের অনুবাদ)। ৩. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কালিম্পঙের চিঠি (অমিয় চন্দ্রবর্তীকে লেখা)। ৫. মণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উপ.)। ৬. ধৃষ্ণটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (প্র.)। ৭. আশাপূর্ণা দেবী : জ্বালাতন (গ.)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. মণীন্দ্র রায় : চাঁদ। ২. রবীন্দ্রনাথ সরকার : অবসর। ৩. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : শিবির।

পুস্তক-পরিচয় :

১. প্রবীরচন্দ্র বসুমন্টিক : Inside the Whale—George Orwell. ২. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : সম্রাট—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৩. গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : (ক) সপ্তপর্গা—পারুল দেবী, তুষার দেবী, অজয় গুপ্ত; (খ) দেহলী—হেমলতা দেবী। ৪. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : (ক) ঘুম পাড়ানি গান—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়; (খ) যে নদী মরুপথে—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। ৫. হিরণকুমার সান্যাল : হেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দশম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ (পৃ. ৩৮৩-৪৭৮)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : জীবনমুহুরের দশা (প্র.)। ২. সুশীলকুমার দেব : সাগরিকা (অনু. না.)। ৩. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৪. মণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উপ.)। ৫. শচীন সেন : বাঙালীর রাজনীতি (প্র.) * (এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণভাবে সম্পাদকীয় সংশ্লিষ্টবর্জিত। পাঠকবর্গের পক্ষ হইতে লেখকের মতামত সংক্ষেপে কোনো আপত্তি থাকিলে আমরা প্রবন্ধাকারে কিম্বা পত্রাকারে তাহা ছাপিতে প্রস্তুত আছি—অবশ্য সুলিখিত হইলে।—সম্পাদক, পরিচয়)। ৬. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : মাটি (গ.)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. অমিয় চন্দ্রবর্তী : অ্যাক্সিডেন্ট। ২. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : বিবর্তন। ৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : সম্ভ্রতি।

পুস্তক-পরিচয় :

১. ধৃষ্ণটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) The Power and The Glory—

Graham Greene; (খ) To a God Unknown—J. Steinbeck. ২. রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ : আধুনিক বাংলা কবিতা—আবুসম্মাদ আহম্মদ ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৩. বিত্ত মুখোপাধ্যায় : পলায়ন—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪. হিরণকুমার সান্যাল : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : নোঙরহীন নৌকা—মনোরঞ্জন হাজারা। ৬. সঞ্জয় ভট্টাচার্য : পাছপাদপ—জ্যোতি সেন।

* পত্রিকা প্রসঙ্গ : হ (হিরণকুমার সান্যাল?) : 'কবিতা' পত্রিকা।

দশম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৭ (পৃ. ৪৭৯-৫৭৪)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : স্বাধীন-সিদ্ধি (প্র.)। ২. বিত্ত মুখোপাধ্যায় : সাফো (আলফোনস দোদের উপন্যাসের অনুবাদ)। ৩. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৪. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : পরাভূত (গ.)। ৫. অমূল্যচন্দ্র সেন : সষাট অশোকের শিলাসিপি (প্র.)। ৬. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অহিংসা (ধারা. উ.)।

কবিতাশুচ্ছ :

১. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : চতুষ্পদী। ২. গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় : মৃত্যুৎসর্গ।

পুস্তক-পরিচয় :

১. ধৃষ্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : Roger Fry, A biography—Virginia Woolf. ২. শচীন সেন : (ক) Co-operative Farming—S. K. Dey; (খ) Italian Economy and Culture—Manindra Mohan Moulik. ৩. চিন্ময় সেহানবীশ : (ক) পথ ও বিপথ (একাক্ষ নাটিকা)—কাজী আবদুল ওদুদ; (খ) Communal Harmony—Percival Spear. ৪. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : হে কিশোর চিত্ত—বিমলাংশুপ্রকাশ রায়। ৫. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : স্বামীজীর জীবনকথা—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড।

পত্রিকা-প্রসঙ্গ :

হ. (হিরণকুমার সান্যাল?) : বাঙলা কথাসাহিত্য ও বাঙলা গদ্য (ক) 'দেশ' পত্রিকায় দুটি গল্প ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত 'শক-ধেরাপী' (সুবোধচন্দ্র ঘোষের) গল্পের আলোচনা। (খ) 'নিরুদ্ভ'

(সম্পাদক—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য) ত্রৈমাসিক পত্র। (গ) 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা।

দশম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৭ (পৃ. ৫৭৫-৬৭০)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : স্বারাজ্য-সিক্তি (প্র.)। ২. বিত্ত মুখোপাধ্যায় : সাফো (আলফ্রাস সোদে-র উপন্যাসের অনুবাদ)। ৩. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৪. নবেন্দু বসু : ভাব, রস ও রূপ (প্র.)। মণীন্দ্র রায় : পথ (গ.)। ৬. বীরেন দাশ : গণ-সাহিত্য, শ্রেণী-সাহিত্য ও নিম্নশ্রেণীর সাহিত্য (প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ :

১. বিষ্ণু দে : রসায়ন। ২. নীরেন্দ্রনাথ রায় : ভ্রমণ।

পুস্তক-পরিচয় :

১. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : Dutch Vet—A. Roothaert. ২. বিমানবিহারী মজুমদার : মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল। ৩. অন্নদাচরণ রক্ষিত : (ক) আলালের ঘরের দুলাল—টেকচাঁদ ঠাকুর (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত); (খ) সাহিত্য সাধক চরিতমালা (কালীপ্রসন্ন সিংহ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৪. রমেন্দ্রনাথ মজুমদার : (ক) সানাই, (খ) রোগশয্যা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাঠকগোষ্ঠী : নরেন্দ্রনাথ নাগ : 'বাঙালীর রাজনীতি'।

দশম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৭ (পৃ. ৬৭১-৭৬৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বিদেহ-কৈবল্য (প্র.)। ২. বিত্ত মুখোপাধ্যায় : সাফো (অনু. উপ.)। ৩. অমূল্যচন্দ্র সেন : সম্রাট অশোকের শিলালিপি (প্র.)। ৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৫. নরেশচন্দ্র রায় : আমেরিকার শাসনব্যবস্থা (প্র.)। ৬. সরোজকুমার নন্দী : দ্বিতীয় প্রকৃতি (গ.)। ৭. নবেন্দু বসু : হৃদ (প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ :

১. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : পটভূমি। ২. সুধীরচন্দ্র কর : কালীপূজা। ৩. গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় : ফাল্গুনী।

পুস্তক-পরিচয় :

১. শচীন সেন : (ক) Living Space and Population Problems—R. R. Ruczynski; (খ) Encirclement—J. L. Brierly; (গ) The Refuge Question—John Hope Simpson; (ঘ) Czecho-Slovakia—R. Birley; (ঙ) The Clockade 1914-1919—W. Arnold Forster; (চ) National Socialism and Christianity—N. Micklem; (ছ) The Nazi Conception of Law—J. Walter-Jones; (জ) Who Hitler is—R. C. K. Eusor; (ঝ) Was Germany Defeated in 1918—Cyril Falls (Oxford Pamphlets on World affairs). ২. মণীন্দ্র রায় : বেদেনী—তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. অজিত দত্ত : নতুন পাতা—বুদ্ধদেব বসু।

দশম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৭ (পৃ. ৭৬৭-৮৬০)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বিদেহ-কৈবল্য (প্র.)। ২. বিশ্ব মুখোপাধ্যায় : সাফো (অনু. উপ.)। ৩. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৪. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : ভারতবর্ষ ও কার্ল মার্ক্স (প্র.)। ৫. অমৃতাচন্দ্র সেন : সফট অশোকের শিলালিপি (প্র.)। ৬. সরোজকুমার রায়চৌধুরী : বসন্ত-অভিযান (গ.)।

কবিতাগুচ্ছ :

১. হরপ্রসাদ মিত্র : ইন্দ্রপ্রস্থ। ২. কৃষ্ণকুমার দত্ত : প্রমথ। ৩. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : স্তম্ভ।

পুস্তক-পরিচয় :

১. অতুলচন্দ্র গুপ্ত : কাব্যবিচার—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ২. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : Twilight in Delhi—Ahamed Ali. ৩. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : তিনসঙ্গী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব—প্রমথনাথ বিশী।

পত্রিকা-প্রসঙ্গ : আলোচকের নাম নেই : 'কবিতা', 'চতুরঙ্গ', 'প্রবাসী', 'পত্রিকা' ও 'প্রভাতী'।

দশম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৮ (পৃ. ৮৬১-৯৫২)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : প্রমথ চৌধুরীর গল্প (প্র.)। ২. হীরেন্দ্রনাথ

দস্ত : সু-যোগ ও কু-যোগ (প্র.)। ৩. বিত্ত মুখোপাধ্যায় : সাফো (আলফাস দোদে-র উপন্যাসের অনুবাদ)। ৪. ভূপেন্দ্রনাথ দস্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৫. প্রবোধচন্দ্র বাগচী : স্যার জর্জ গ্রিনারসন্ (প্র.)। ৬. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ঘটক (গ.)। ৭. রামেন্দ্র দেশমুখ্য : প্রাচীন সিংহলীয় সংস্কৃতির এক অধ্যায়। (প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাঙালী মেয়ে। ২. জীবনানন্দ দাস : তোমাকে। ৩. পরিতোষ খাঁ : সময়। ৪. গোপাল ভৌমিক : পরিক্রমা।

পুস্তক-পরিচয় :

১. অজয় সেন : দল ও নেতা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ—অনিলচন্দ্র রায়। ২. লীলা মজুমদার : The Thibaults—Roger Martin du Gard; tr. by Stuart Gilbert. শচীন সেন : (ক) The prospects of Civilisation—Alfred Zimmern; (খ) Mein Kampf—R. C. K. Ensor; (গ) Race in Europe—Julian Huxley; (ঘ) The Dual Policy—Arthur Salter. ৪. বিশ্বমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় : মৈত্রী সাধনা—সুমিতকুমার মুখোপাধ্যায়। ৫. হরপ্রসাদ মিত্র : আমাদের সাহিত্য—প্রিয়রঞ্জন সেন। ৬. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : বর্ষায়—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ৭. প্রিয়রঞ্জন সেন : কালিন্দী—তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্রিকা-প্রসঙ্গ :

১. প্রবাসী (চল্লিশ বর্ষ পূর্তি), ২. নাচঘর, ৩. শতদল * ঘোষণা—আগামী সংখ্যা রবীন্দ্র-সংখ্যা।

দশম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, (রবীন্দ্রসংখ্যা) জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ (পূ. ১৯৫৩-১০৫১)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দস্ত : রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ (প্র.)। ২. শচীন সেন : রবীন্দ্রকাব্য আধুনিক কেন? (প্র.)। ৩. হরপ্রসাদ মিত্র : গল্পশুদ্ধের রবীন্দ্রনাথ (প্র.)। ৪. জীবনময় রায় : শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের স্মৃতি (স্মৃতিমূলক রচনা)। ৫. ধুব্বটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি (লঙ্কো বেসলী ক্লাবে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে বক্তৃতার অনুলিখন। ২৮ এপ্রিল, ১৯৪০) ৬. জ্যোতির্ময় রায় : রবীন্দ্রনাথে ছবি (প্র.)। ৭. বিত্ত মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা (প্র.)। ৮. বসুধা চন্দ্রবর্তী : মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে

রবীন্দ্রনাথ (প্র.)। ৯. হেমেন্দ্রলাল রায় : রবীন্দ্রনাথ ও গান (প্র.)। ১০. কবির চিঠি (ক) হারীতকৃষ্ণ দেবকে লেখা, ৩০শে বৈশাখ ১৩৪০; (খ) উমা মিত্র-এর লেখা চিঠি; (গ) হারীতকৃষ্ণ দেবের লেখা চিঠি; (ঘ) উমাকে লেখা কবির চিঠি, ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫, (ঙ) হারীতকৃষ্ণ দেবকে লেখা কবির চিঠি—২৮ বৈশাখ ১৩৪৫)। ১১. এজরা পাউণ্ড : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (এজরা পাউণ্ডের ১৯১৩ সালের মার্চের Fortnightly Review-র সমালোচনার আংশিক অনুবাদ। অনুবাদক—বিষ্ণু দে)। ১২. হিরণকুমার সান্যাল : সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ (প্র.)। ১৩. সম্পাদকীয় : লেখকের নাম নেই।

পুস্তক-পরিচয় :

১. ধৃজ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) 'গল্পসল্প'; (খ) 'আরোগ্য'; (গ) 'জন্মদিনে'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. ক. খ. গ—কবিতা—রবীন্দ্র সংখ্যা (সম্পাদক—বুদ্ধদেব বসু)।

দশম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৮ (পৃ. ১০৫২-১১৪২)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. নবেন্দু বসু : কবিতার প্রকার (প্র.)। ২. আশাপূর্ণা দেবী : প্রহসন (গ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : সু-যোগ ও কু-যোগ (ধারা. প্র.)। ৪. বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় : সাফো (অনু. উ.)। ৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৬. নরেশচন্দ্র রায় : রুশিয়াতে দিন কয়েক (বি.)।

কবিতাশুদ্ধি :

১. বিষ্ণু দে : একটি প্রেমের কবিতা। ২. বিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায় : রাজকন্যা অঘোরে ঘুমায়। ৩. বিমলচন্দ্র ঘোষ : বিদ্যাসাগরের ঘ (J) ফলা।

পুস্তক-পরিচয় :

১. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : (ক) পাঠ প্রচয়, (খ) সহজ পাঠ—সম্পা. ক্রিষ্টিয়ান
২. শচীন সেন : (ক) Propaganda—E. H. Carr, (খ) The Fourteen Points and the Treaty of Versailles—G. M. Gathorne Hardy, (গ) The British Empire—H. V. Hodson, (ঘ) Economic Self-Sufficiency—A. G. B. Fisher, (ঙ) Can Germany Stand the Strain?—L. P. Thompson. (চ) Russian Foreign Policy—Barbara Ward. ৩. হরপ্রসাদ মিত্র : (ক) নির্জন গৃহকোণে—ভবানী মুখোপাধ্যায়, (খ) পৃথিবীর বড় মানুষ—গোপাল ভৌমিক, (গ) ছুটির চিঠি—খ্রিডস রায়,

(ঘ) গ্রামে ও পথে—রতনমণি চট্টোপাধ্যায়। ৪. সমরেন্দ্রনাথ সিংহ : রণ ও রাষ্ট্র—দিগম্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫. মধুসূদন গ্রন্থাবলী—প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

একাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, জীবন ১৩৪৮ (পৃ. ১-৯৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. ধৃষ্ণটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মোহনা (উ. ক্রমশ)। ২. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৩. বিত্ত মুখোপাধ্যায় : ক্লুফো (ধারা. গ./আলফোর্স দোদের 'সাফো' হইতে অনূদিত)। ৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সৃষ্টির আত্মগোচর (প্র.)। ৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : প্রকৃত 'যোগ' কি? (প্র.)। ৬. মণীন্দ্র রায় : স্তরভেদ (গ.)। ৭. জ্যোতির্ময় রায় : বিজ্ঞাপনযুগ (প্র.)। ৮. পুলকেশ দে সরকার : ভারতীয় রাজনীতি ও বাংলার নেতৃত্ব (প্র.)

কবিতা

১. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : ওডিসিউস।

পুস্তক পরিচয়

১. ধৃষ্ণটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : The Background of Art—Talbot Rice. ২. জ্যোতির্ময় রায় : শুভংশী—জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)।

পত্রিকা প্রসঙ্গে

১. ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট (রবীন্দ্র সংখ্যা)। ২. বৈশাখী (বার্ষিক ১ম সংখ্যা, ১৩৪৮। সম্পাদক—বুদ্ধদেব বসু)। ৩. হালখাতা—ছোটদের বাবিকী (১ম বর্ষ, ১৩৪৮। যুগ্ম সম্পাদক—অসীম দত্ত ও রমাপ্রসাদ মিত্র)।

একাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, জীবন ১৩৪৮ (পৃ. ৯৭-১৮৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : প্রকৃত 'যোগ' কি? (ধারা. প্র.)। ২. ধৃষ্ণটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মোহনা (ধারা. উ.)। ৩. নবেন্দু বসু : কবিতার প্রকার (প্র.)। ৪. বিত্ত মুখোপাধ্যায় : সাফো (গ. পূর্বানুবর্তি/অনুবাদ)। ৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৬. ভাস্কর (জ্যোতির্ময় ঘোষ) : পছন্দ (গ.)। ৭. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : রবীন্দ্রনাথ (প্র.)।

কবিতাশুচ্ছ

১. অমিয় চন্দ্রবর্তী : হরেকৃষ্ণের যুক্তি (মাথা বুজোতে বুজোতে)। ২. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : শূন্য ঘর। ৩. কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায় : হাওয়া।

পুস্তক পরিচয়

১. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) বদ্যিনাথের বাড়ি—লীলা মজুমদার; (খ) পাগলা মহেশ্বর—শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ; (গ) ভারতের দেব-দেউল—জ্যোতিষচন্দ্র বোষ। ২. মণীন্দ্র রায় : হারানো সুর—তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. Self-Taught Bengali Primer (প্রকাশক—Dasgupta and Co.)—আলোচকের নাম নেই।

একাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন (শারদীয়) ১৩৪৮ (পৃ. ১৮৭-২৮২)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী (প্র.)। ২. লীলাময় রায় : আশার কথা (মন্তব্য)। ৩. ধৃজ্জিৎপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মোহনা (ধারাবাহিক উপন্যাস)। ৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (প্র.)। ৫. রজত সেন : ধূলিধূসর (গ.) ৬. বসুধা চন্দ্রবর্তী : সাহিত্যের দিগ্নির্দেশ (প্র.)।

কবিতাশুচ্ছ

১. দিলদার হুসেন : ইনসমনিয়া। ২. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : আমন্ত্রণ। ৩. অশোক গুহ : অহল্যা।

পুস্তক পরিচয়

১. অতুলচন্দ্র গুপ্ত : দৃষ্টিকোণ—জ্যোতির্ময় রায়। ২. শ্যামলকৃষ্ণ বোষ : আঙ্গকের রাশিয়া—ব্রজবিহারী বর্মণ। ৩. হিরণকুমার সান্যাল : Oxford Pamphlets On World Affairs (Nos. 22-39)।

একাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৮ (পৃ. ২৮৩-৩৭২)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী (ধারা. প্র.)। ২. ধৃজ্জিৎপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মোহনা (ধারা. উ.)। ৩. বিমলচন্দ্র সিংহ : “ভারতীয় রাজনীতি ও বাংলার নেতৃত্ব” (পুলকেশ দে সরকারের প্রবন্ধের বিষয় নিয়ে আলোচনা)। ৪. সুধাংশুকুমার গুপ্ত : বন্ধু (গ./জুইসি পিরাণেলো হইতে)। ৫.

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. বিষ্ণু দে : মধ্যবিস্ত পুঙ্খার ছুটি। ২. সুধীরকুমার রায়চৌধুরী : স্বর্ণ-রচনা।

পুস্তক পরিচয়

১. ধ্বংসটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) দক্ষিণায়ন—বিমলচন্দ্র ঘোষ; (খ) পৌত্তলিক—হরপ্রসাদ মিত্র; (গ) ডিহাং নদীর বাঁকে ও অন্যান্য কবিতা—অশোকবিজয় রাহা (ঘ) রুদ্র বসন্ত—অশোকবিজয় রাহা। ২. নিখিল চক্রবর্তী : Scorched Earth—Edgar Snow. ৩. অজিত দত্ত : সঙ্কলিত—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৪. হরিদাস হালদার : ভারতবর্ষ (প্রকাশনা—অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)।

পাঠকগোষ্ঠী

১. সরোজকুমার দত্ত : পরিচয়-সম্পাদক মহাশয় সমীপে
পরবর্তী সংখ্যার ঘোষণা : 'পরিচয়ে'র অগ্রহায়ণ-সংখ্যা রবীন্দ্রস্মৃতি-সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইবে।

একাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮—রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা (পৃ. ৩৭৩-৪৭৬)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. লীলাময় রায় : রবীন্দ্রনাথ—বিনুর সাক্ষ্য (প্র.)। ২. ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ : বাঙ্গালার সংস্কৃতি ধারায় (প্র.)। ৩. অমিত সেন (সুশোভন সরকার) : রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি (প্র.)। ৪. রাণী মহলানবিশ : তমসো মা জ্যোতির্গময় (প্র.)। ৫. শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রনাথের গানের তাল (প্র./সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ)। ৬. নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : অশীতিবর্ষের রবীন্দ্রনাথ (প্র.)। ৭. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : শান্তিনিকেতনের স্মৃতি (প্র.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. বিমলচন্দ্র ঘোষ : রবি সূক্ত। ২. জীবনানন্দ দাশ : রবীন্দ্রনাথ। ৩. সুধীরকুমার চৌধুরী : কবির মৃত্যু।

পুস্তক পরিচয়

১. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়; (খ) রবীন্দ্ররচনাবলী; (গ) 'সব পেয়েছির দেশ'—বুদ্ধদেব বসু। ২. ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : (ক) ছড়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; (খ) শেষ সেখা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রচ্ছদ চিত্র—শঙ্কু সাহার তোলা ফোটোগ্রাফ।

একাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৮ (পৃ. ৪৭৭-৫৬৪)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী (প্র.)। ২. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মোহনা (ধারা. উ.)। ৩. সৈয়দ আলী আহসান : কবি সত্যেন্দ্রনাথ (প্র.)। ৪. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : সহমরণ (গ.)। ৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (প্র.)।

কবিতা

১. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : নায়ক। ২. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : মধ্যবর্তী।
৩. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ক্লাস্তি।

পুস্তক পরিচয়

১. হরপ্রসাদ মিত্র : (ক) এপারে ওপারে—শশিভূষণ দাশগুপ্ত; (খ) ব্রাক বোর্ড—কলেজ বয় (জগদীশ ভট্টাচার্য)। ২. রাধাকান্ত চৌধুরী : মিথ্যার সাথে মিতালি বা বর্তমান যুদ্ধে হিটলার—ভাই কাউন্ট মহম (অনুবাদ—বিশ্ব মুখোপাধ্যায়)। ৩. ক. খ. গ. : (ক) আমাদের গল্প—অবিনাশ সাহা; (খ) Rabindranath Tagore : Two Portraits—Rani Chanda. ৪. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) কোপবর্তী—প্রমথনাথ বিশী; (খ) A Woman of India—G. S. Dutt; (গ) সায়ম—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; (ঘ) শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপে—সুশীল রায়; (ঙ) মজ্জসিল : জ্যোতির্ময় ঘোষ।

একাদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৮ (পৃ. ১-৮৩)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী : রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' ও তাহার সমালোচনা (প্র.)। ২. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৩. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মোহনা (ধারা. উপ.)। ৪. আশাপূর্ণা দেবী : স্বপ্নভঙ্গ (গ.)। ৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী (ধারা. প্র.)।

কবিতাওচ্ছ

১. হরপ্রসাদ মিত্র : সুবর্ণগ্রাম। ২. অমল ঘোষ : আফিছ। ৩. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার : দুর্মদ।

পুস্তক পরিচয়

১. শচীন সেন : হেমন্ত-গোধূলি—মোহিতলাল মজুমদার। ২. বিশ্ব মুখোপাধ্যায় : দুই নৌকা—পশুপতি ভট্টাচার্য। ৩. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) পৃথ্বী-পরিচয়—প্রমথনাথ সেনগুপ্ত; (খ) প্রাণতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; (গ) মনোবিজ্ঞান ও শিশুশিক্ষা—রেণুকা বসু (সঙ্কলন—অধ্যক্ষ যতীন্দ্রনাথ কসু)।

পত্রিকা-প্রসঙ্গ ('বসুমতী', 'দ্য বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি', 'কারেন্ট থট', 'দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট')—সংক্ষিপ্ত আলোচনা। লেখকের নাম নেই।

একাদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৮ (পৃ. ৮৪-১৭৫)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. প্রবোধচন্দ্র সেন : বাংলা হৃদয়ের নূতন সম্ভাবনা (প্র.)। ২. শুভেন্দু ঘোষ : 'ব্যাংকাক্রমের উপন্যাস' (কাউন্ট ইন হোহেনস্টাইন)-এর অনুবাদ। ৩. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মোহনা (ধারা. উ.)। ৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (প্র.)। ৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী (প্র.)। ৬. জিতেন্দ্রনাথ বসু : প্রাচীন গীতা (প্র.)।

কবিতা

১. অমিয় চক্রবর্তী : লক্ষণ

পুস্তক পরিচয়

১. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : ফসিল—সুবোধ ঘোষ। ২. হরপ্রসাদ মিত্র : (ক) ডাঃ সেন—সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী; (খ) জীবন-মৃত্যু—সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী ও বিজ্ঞেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়। ৩. বিত্ত মুখোপাধ্যায় : মর্ডান কবিতা—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

একাদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৮ (পৃ. ১৭৬-২৬২)
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী (ধারা. প্র.)। ২. শান্তিপ্রিয় বসু ও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় : মানুষ কেন কাপড় পরে (প্র.)। ৩. নিখিল সেন : বুর্জোয়া (গ.)। ৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৫. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মোহনা (ধারা. উপ.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : এ্যারোপ্লেন। ২. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : কুমকুম। ৩. বিমলচন্দ্র ঘোষ : নির্বাণ চতুর্দশী। ৪. অশোক শুহ : মুখিক।

পুস্তক পরিচয়

১. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ। ২. স্বর্ণপ্রভা সেন : রাজঘোটক—জ্যোতির্ময়ী দেবী। ৩. হরপ্রসাদ মিত্র : যোসেফ স্টালিন—বীরেন দাশ। ৪. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : ফসল ও অন্যান্য

গল্প—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। ৫. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : প্রজ্ঞাপত্রে—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) America faces the War—Mr. Roosevelt Speaks; (খ) An American looks at the British Empire, The Faith of an American, The Monroe Doctrine—Oxford University Press. (গ) এক পয়সায় একটি—কবিতা ভবন প্রকাশিত; (ঘ) সোভিয়েট দেশ—গোপাল হাসদার ও সুকুমার মিত্র।

একাদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৯ (পৃ. ২৬৩-৩৪৮)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জড়তত্ত্ব (ধারা. প্র.)। ২. সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় : বৌদ্ধ শূন্যবাদ (প্র.)। ৩. এ. এয়ারনসন্ : রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরস্কার (প্র.) Rabindranath through Western Eyes' নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপির একটি অংশ সমর সিংহ ও সুভাষ সেন অনুদিত)। ৪. সোমেন চন্দ : ইদুর (গ.)। ৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। * সম্পাদকের বিচ্ছিন্নি থেকে জানা যায়—ধারাবাহিক প্রকাশিত 'মোহনা' উপন্যাস বিশেষ কারণে ছাপা হয়নি।

কবিতাগুচ্ছ

১. রামেন্দ্র দেশমুখ্য : ক্রিয়ারা। ২. হরপ্রসাদ মিত্র : একটি প্রেমের কবিতা। ৩. বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় : দশা।

পুস্তক-পরিচয়

১. ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—রমাপতি দত্ত। ২. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : To Hell with Culture—Herbert Read. ৩. বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ—দেবজ্যোতি বর্মণ। ৪. হিরণকুমার সান্যাল : ক্ষয়িকু হিন্দু—প্রবুলকুমার সরকার।

একাদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ (পৃ. ৩৪৯-৪৩৮)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জড়তত্ত্ব (ধারা. প্র.)। ২. মণীন্দ্র রায় : ধাঁধা (গ.)। ৩. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৪. শান্তিপিয় বসু ও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় : পোষাক ছাড়া সভ্যতা (প্র.)। ৫. অন্নপূর্ণা গোস্বামী : বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎ-সাহিত্যে নারীচরিত্রের ক্রমবিকাশ (প্র.)। ৬. রবীন্দ্র মজুমদার : আধুনিক বিজ্ঞান ও জনগণ (প্র.)। ধৃষ্ণুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মোহনা (ধারা. উপ.)। ৮. সম্পাদকীয় : সোমেন চন্দ (* বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে এটি হিরণকুমার সান্যালের রচনা)।

কবিতাগুচ্ছ

১. বিষ্ণু দে : (ক) ছড়া; (খ) হে ভারতী, খোলো। ২. শুদ্ধসত্ত্ব বসু : সত্যতা।

পুস্তক পরিচয়

১. বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী : উত্তর ফান্সী—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ২. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : জীবন মৃত্যু—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৩. সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড।

একাদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৯ (পৃ. ৪৪১-৫২৮)

প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জড়তত্ত্ব (ধারা. প্র.)। ২. সুনীলকমল চট্টোপাধ্যায় : নববিধান (গ.), (Pearl Buck-এর The New Road গল্পের অনুবাদ।) ৩. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৪. ধৃজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মোহনা (ধারা. উপ.)। ৫. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : সাহিত্যের পরিচয় (প্র.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : (ক) কাসান্ত্রা; (খ) মিডিয়া। ২. সাকিন্দ্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : কাল-বৈশাখী। ৩. জীবনময় রায় : প্রাণের আগুন ছালো, ওগো রবি।

পুস্তক-পরিচয়

১. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : তন্দ্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। ২. হরিহর হালদার : (ক) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, (খ) সাহিত্যসাধক-চরিত্রমালা (৫-১০ খণ্ড), (গ) মোগল-বিদূষী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : একদিন যারা মানুষ ছিল—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ৪. সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় : (ক) ধর্ম ও নীতি—অমিয়কৃষ্ণ সিংহ, (খ) ভারতীয় সমাজ ও নারী সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

দ্বাদশবর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৯ (পৃ. ১-৮৬)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জড়তত্ত্ব—রয়ি ও প্রাণ (ধারা. প্র.)। ২. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৩. রাণী চন্দ : পথের বোন (আলেখ্য)। ৪. ব্রজবিহারী বর্মণ : সোভিয়েট রাশিয়ায় আর্ট (প্র.)। ৫. ধৃজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মোহনা (উ/সমাপ্ত)। ৬. বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী : নব-পঞ্চভূতের সাহিত্য আলোচনা (প্র.)। ৭. গোবর্দ্ধন গোস্বামী : রবিবারের কফিচক্র (গ.)।

কবিতাগুচ্ছ : ১. মণীন্দ্র রায় : ব্রহ্ম-প্রত্যাগতের বিবৃতি। ২. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : অভিব্যক্তি।

পুস্তক পরিচয় :

১. হিরণকুমার সান্যাল : নির্বাণ—প্রতিমা ঠাকুর। ২. হরিদাস নিয়োগী : রবীন্দ্রকাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা—সরসীলাল সরকার।

দ্বাদশবর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৯ (পৃ. ৮৭-১৬৬)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ

১. বিমলচন্দ্র সিংহ : ভারতীয় রাজনীতি ও বাংলার নেতৃত্ব (প্র.)। ২. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জড়তত্ত্ব (প্র.)। ৩. বাণী রায় : মিডিয়া (গ.)। ৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৫. হরপ্রসাদ মিত্র : ঈশ্বর শুভের কবিতা (প্র.)।

কবিতা :

১. বিষ্ণু দে : এক সভার সনেট। ২. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার : ফলাফল।

পুস্তক-পরিচয় :

১. হিরণকুমার সান্যাল : Oxford University Pamphlets No. 40-50 (সমসাময়িক পৃথিবী)। ২. নীরেন্দ্রনাথ রায় : Joseph Stalin (মহাসমর ও মহাপুরুষ)—David J. Cole. ৩. মণীন্দ্র রায় : (ক) ২২ আবেগ—বুদ্ধদেব বসু; (খ) ওপারেতে কালো রং—সুধীরচন্দ্র কর; (গ) ভানুমতীর মাঠ—অশোকবিজয় রাহা (বি. দ্র. সুলভ কবিতা—এক পয়সায় একটি)। ৪. পশুপতি ভট্টাচার্য : নরনারীর যৌনজীবন (প্রেম ও প্রজনন)—গিরিজাকুমার বসু।

দ্বাদশবর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৯ (পৃ. ১৬৭-২৪৩)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ

১. রবীন্দ্রনাথ সরকার : শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ (প্র.)। ২. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জড়তত্ত্ব (প্র.)। ৩. নবেন্দুভূষণ ঘোষ : রাত্রি (গ.)। ৪. বসুধা চক্রবর্তী : প্রশ্ন (প্র.) * (সম্পাদকীয় মন্তব্য : 'একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা—এই দৃষ্টিভঙ্গী দেশবাসী সকলের নয়। কিন্তু বিষয়টি গুরুতর, এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। এই বিষয়ে একাধিক ভিন্ন মতপ্রসূত আলোচনা পেলে আমরা সুখী হব।) ৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৬. হিরণকুমার সান্যাল : সম্পাদকীয় (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণে)। * হীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২।

কবিতা

১. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : দুর্যোগে। ২. সুধীরকুমার চৌধুরী : ভীষ্মোপদেশ।

পুস্তক-পরিচয়

১. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : (ক) Moment in Pekin—Lin Yutang; (খ) A Leaf in the Storm—Lin Yutang. ২. বিণ্ড মুখোপাধ্যায় : (ক) পদ্মনাভ—জ্যোতির্ময় রায়; (খ) ছুটির ঘন্টা—সুধাংশুকুমার গুপ্ত।

দ্বাদশবর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক (শারদীয়) ১৩৪৯ (পৃ. ২৪৪-৩২৫)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ

১. হিরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে ক্ষুদ্রতত্ত্ব (ধারা. প্র.)। ২. হিরন্ময় ঘোষাল : দুই বোন (লেখকের অপ্রকাশিত গ্রন্থ—‘কুলটুর কাম্পস’-এর একটি আখ্যায়িকা। জার্মান অধিকারে পোলদেশের একটি খণ্ডচিত্র)। ৩. ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ : রবীন্দ্রনাথের নারী-কবিতা (প্র.)। ৪. মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : হলুদ পোড়া (গ.)। ৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৬. হরপ্রসাদ মিত্র : আলালের ঘরের দুলাল (প্র.)। ৭. সম্পাদকীয় (লেখকের নাম নেই)।

কবিতা

১. অমল ঘোষ : কং প্রধাবন্তি। ২. মণীন্দ্র রায় : শশিকান্তের পত্র। ৩. রবীন্দ্রনাথ সরকার : নবযুগ।

পুস্তক পরিচয়

১. ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : সাধারণী (* নতুন ও পুরাতন সব রকম পুস্তকের আলোচনার জন্য এই নতুন বিভাগটি খোলা হল—সম্পাদক)—(ক) Something of a Hero—Capslin; (খ) Timeless Land—Elenor Duck. ২. মণীন্দ্র রায় : (ক) জাপানী শাসনের আসল রূপ—বিজ্ঞান রায়; (খ) সভ্যতা ও ফ্যাসিজম—বুদ্ধদেব বসু; (গ) ২২শে জুন—বিশ্ব দে; (ঘ) প্রাচীর (কবিতা সংগ্রহ)—দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক প্রকাশিত। ৩. বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : Oxford Pamphlets on Indian affairs (ভারত প্রবাহ)—(ক) Cultural Problem—Appasamy, Adair, Masani, Radhakrishnan, Jogendra Sing; (খ) Economic Background—Shah, Thomas Kumarappa, Datar Singh, Coyjee; (গ) Indian States—K. M. Pannikkar; (ঘ) Democracy in India—Appadorai. ৪. বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : Economic Problem of India—T. N. Ramaswamy.

পাঠকগোষ্ঠী

১. বিনয়েন্দ্রনাথ দত্ত : ‘ভারতীয় রাজনীতি ও বাংলার নেতৃত্ব’ (পূর্বপ্রকাশিত

প্রবন্ধের উপর আলোচনা)। ২. শচীন সেন : 'প্রশ্ন' (পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা)।

দ্বাদশবর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ (পৃ. ৩২৩-৪০৪)
প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ .

১. ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (প্র.) ২. বটকুণ্ড ঘোষ : প্রজ্ঞাপারমিতা (প্রবোধ বসুমন্ডিক ফেলোশিপ লেকচার)। ৩. মণীন্দ্র রায় : জীবনের পটভূমি (ধারা. নাটক)। ৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৫. গোবর্দ্ধন গোস্বামী : শিবনাথের কুণ্ডু ভিক্ষণ (গ.)। ৬. জ্যোতির্ময় রায় : অন্নলীলা (প্র.)। ৭. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জড়তত্ত্ব—অব্যাকৃতি (প্র.)।

কবিতা

১. অমিয় চক্রবর্তী : সঙ্কল্প।

পুস্তক পরিচয়

১. নবেন্দু বসু : সাধারণী (বাংলা গদ্যের চার যুগ—মনোমোহন ঘোষ)। ২. নীরেন্দ্রনাথ রায় : Karl Marx In His Earlier Writings—H. P. Adams. ৩. বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী : গল্পসংগ্রহ—প্রমথ চৌধুরী। ৪. জ্যোতির্ময় রায় : মাধবীর জন্য—প্রতিভা বসু। ৫. বিষ্ণু দে : একচক্ষু—মণীন্দ্র রায়।

দ্বাদশবর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৯ (পৃ. ৪০৫-৪৭৭)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ

১. নীরেন্দ্রনাথ রায় : দ্বাত্তিক বস্তুবাদ (প্র.)। ২. মণীন্দ্র রায় : জীবনের পটভূমি (ধারা. নাটক)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জড়তত্ত্ব (প্র.)। ৪. অ. মি. : পুশকিন (Michael Zoshchenko-র The Wonderful Doe বই-এর Pushkin গল্পের অনুবাদ)। ৫. শান্তিপ্রিয় বসু : সংহত কৃষি ও কৃষকের আর্থিক উন্নতি (প্র.)। ৬. বুদ্ধদেব বসু : ফ্যাসিবাদ, শিল্প ও বিশ্বমানব (১৯ ও ২০ ডিসেম্বর ১৯৪২, কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলনে সহযোগী সভাপতির অভিভাষণ)। ৭. হিরণকুমার সান্যাল : ফ্যাসিবাদ, সমাজ ও শিল্প (উক্ত ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ)।

কবিতা

১. হরপ্রসাদ মিত্র : গ্রীষ্মীয়। ২. পরিতোষ ঠা : সংবাদ। ৩. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : গোখলি।

পুস্তক পরিচয়

১. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রকথা—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত। ২. জ্যোতির্ময় রায় : 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ'—রানী চন্দ।

পাঠকগোষ্ঠী

১. বুদ্ধদেব বসু : চিঠি (কার্তিক ১৩৪৯-এর 'পুস্তক পরিচয়ে' শচীন সেন-এর আলোচনায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর অভিমত বিষয়ে বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ)।

ছাদশবর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৯ (পৃ. ৪৭৮-৫৪৮)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ

১. করালীকান্ত বিশ্বাস : 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' ('শনিবারের চিঠি'তে মোহিতলাল মজুমদার লিখিত প্রবন্ধের সমালোচনা)। ২. ভাস্কর () : পরশ্মৈপদী (রম্য রচনা)। ৩. মণীন্দ্র রায় : জীবনের পটভূমি (ধারাবাহিক নাটক)। ৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জড়তত্ত্ব (ধারা. প্র.)। ৬. সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় : গৃহযুদ্ধ (লিআম ও' ফ্রেস্‌হার্টের ইংরেজি গল্প থেকে)।

কবিতা

১. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : 'A Penny For Your Thoughts, My Love'.

পুস্তক পরিচয়

১. ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ : (ক) বাংলা সাহিত্য/Bengali Literature—Annada Sankar Roy and Lila Roy; (খ) বাংলা গদ্য—হুমায়ুন কবির। ২. বিপুল মুখোপাধ্যায় : (ক) কৃষ্ণদ্বীপের রানী—পশুপতি ভট্টাচার্য; (খ) নিশিগঙ্গা—অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ৩. হরপ্রসাদ মিত্র : হে রূপ সম্মাসী—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

পাঠকগোষ্ঠী

বিমলচন্দ্র সিংহ : 'ভারতীয় রাজনীতি ও বাংলার নেতৃত্ব'।

ছাদশবর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৯ (পৃ. ৫৪৯-৬২৪)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদের জড়তত্ত্ব (ধারা. প্র.)। ২. মণীন্দ্র রায় : জীবনের পটভূমি (ধারা. না.)। ৩. শিবনারায়ণ রায় : কবি স্টিফেন স্পেন্ডার (প্র.)। ৪. গোপাল ভৌমিক : ভ্রমণ-পথে (গ.)। ৫. সত্যব্রত সেন : কাগজের টাকা (প্র.)। ৬. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)।

কবিতা

১. বিষ্ণু দে : এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতিকে। ২. সুকান্ত ভট্টাচার্য : প্রস্তুত।

পুস্তক পরিচয়

১. ধুঙ্কটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) বসুন্ধরা—চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়; (খ) নানা কথা—সমর সেন; (গ) শিবির—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়; (ঘ) সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার; (ঙ) World Revolution and the Future of the West—W. Friedman; (চ) Freedom, Its Meaning—R.N. Anschen; (ছ) অস্ত্রশীলা—রসময় দাশ; (জ) চিত্রভানু—সুধীর কর। ২. যদুনাথ সরকার : রবীন্দ্র-গ্রন্থ পরিচয়—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. হিরণকুমার সান্যাল : (ক) হাতের কাছ (গল্প)—হিরণ্ময় ঘোষাল; (খ) শাকাম (গল্প)—হিরণ্ময় ঘোষাল।

পাঠকগোষ্ঠী

অন্নদাশঙ্কর রায় (দ্বাদশ বর্ষের মাঘ ১৩৪৯ সংখ্যায় ক্ষেত্রমোহন পুরস্কারস্থের Bengali Literture—Annada Sankar Roy and Lila Roy—এর গ্রন্থের সমালোচনা বিষয়ে চিঠি)।

সম্পাদকীয় : হিরণকুমার সান্যাল।

দ্বাদশবর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৯ (পৃ. ৬২৫-৬৯৬)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জড়তত্ত্ব (প্র.)। ২. মণীন্দ্র রায় : জীবনের পটভূমি (নাটক)। ৩. পুলকেশ দে সরকার : আমাদের সাহিত্য (প্র.)। ৪. জ্যোতির্মাল দেবী : হৃদয়ের রঙ (গ.)। ৫. হিরণ্ময় ঘোষাল : পোল কবি আদাম আসনিয়িকের একখানি অপ্রকাশিত পত্র (বি.)। ৬. “ভাস্কর” : মত (গ.)। ৭. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)।

কবিতাগুচ্ছ

১. বিষ্ণু দে : এক টিকেটহীন সহযাত্রী। ২. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : শুক্লপক্ষ।

পুস্তক পরিচয়

১. বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : (ক) A People's History of Germany—A. Ramos Oliveira, tr. by Eileen Brooke, (খ) Essays in Political Philosophy—Vidya Dhar Mahajan. ২. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : বাংলা সাহিত্যের কথা—নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। ৩. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ত্রিশঙ্কু—কৃষ্ণদাস গুপ্ত। ৪. করালীকান্ত বিশ্বাস : কালো

হাওয়া—বুদ্ধদেব বসু। ৫. মিনতি দেবী : বৃত্ত—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। ৬. প্রমথনাথ বিনী : জনম অবশি—বিমলেশ দে। ৭. হরপ্রসাদ মিত্র : An introduction on the philosophy of Sri Aurobindo—S. K. Maitra. ৮. আলোচকের নাম নেই : চীনরাষ্ট্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঁচ বৎসর। ৯. আলোচকের নাম নেই : What to eat and why—N. Gangulee.

ষাদশবর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫০ (পৃ. ৬৯৭-৭৬৮)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জড়তত্ত্ব (ধারা. প্র.)। ২. মণীন্দ্র রায় : জীবনের পটভূমি (না.)। ৩. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৪. শান্তি দেবী : “কিউ” (গ.)। * ৫. সতীশচন্দ্র পাকড়াশী : সোমেন চন্দ্র (বি.)। ৬. হরপ্রসাদ মিত্র : মাইকেল মধুসূদন দত্ত (প্র.)। ৭. বিমলচন্দ্র সিংহ : সামরিক—সমর ও সঙ্গতি (বি.)। ৮. সম্পাদকীয়—নববর্ষ। * —কলিকাতা ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিক্ষা-সঙ্ঘের উদ্যোগে আদৃত সোমেন—স্মৃতি সভার বক্তৃতা।

কবিতাশুচ্ছ

১. সুকান্ত ভট্টাচার্য : শিরদ্বাগ। ২. সুধীরকুমার চৌধুরী : চিরকালের। ৩. মণুরাশী মিত্র : তে হি নো দিবসা গতঃ। ৪. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : ক্ষণিক।

পুস্তক-পরিচয়

১. ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ : আধুনিক বাংলা সাহিত্য : মোহিতলাল মজুমদার। ২. শান্তিপ্রিয় বসু : (ক) The land and its problems—Sir T. Vijayraghavacharya; (খ) Industrialisation—P. S. Lokanathan. ৩. নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : মার্ক্সীয় দর্শন—সরোজ আচার্য। ৪. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : মহত্তর বুদ্ধের প্রথম অধ্যায়—হিরণ্ময় ঘোষাল। ৫. অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র : এ যুগের যুদ্ধ—গোপাল হালদার। ৬. জ্যোতির্মাল্লা দেবী : বিস্মাতে বঙ্গনারী।

ষাদশবর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ (পৃ. ৭৭৯-৮৩৮)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জড়তত্ত্ব (ধারা. প্র.)। ২. মণীন্দ্র রায় : জীবনের পটভূমি (না.)। ৩. সুশান্তকুমার সেন : হিন্দু নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদ সমস্যা (প্র.)। ৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৫. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : মৃতদেহে (গ.)। ৬. প্রফুল্লকুমার দাস : কাব্যে শব্দ-চিত্র ও রবীন্দ্রনাথ (প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ

১. বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় : আবির্ভাব। ২. হরপ্রসাদ মিত্র : ২৫-এ বৈশাখ, ১৩৫০।

পুস্তক পরিচয়

১. ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ : (ক) আত্মপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; (খ) সাহিত্যের স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র : চন্দ্রকলা—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৩. মিনতি দেবী : (ক) সোভিয়েট নারী—অনিলকুমার সিংহ; (খ) সোভিয়েটের ষষ্ঠ বাহিনী—জাতীয় যুদ্ধ ফ্রন্ট থেকে প্রকাশিত।

দ্বাদশবর্ষ, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫০ (পৃ. ৮৩৯-৯১২)

প্রবন্ধ, গল্প ও বিবিধ

১. ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ : বাংলার পঞ্চায়েতি জীবনের গতি-পরিণতি (প্র.)। ২. বিজ্ঞান ভট্টাচার্য : কসাইপাড়ার মুখটায় (গ.)। ৩. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : উপনিষদে জড়তত্ত্ব (ধারা. প্র.)। ৪. শিবনারায়ণ রায় : কবি সিসিল ডে লুইস (প্র.)। ৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (ধারা. প্র.)। ৬. প্রফুল্লকুমার দাস : কাব্যে শব্দ-চিত্র ও রবীন্দ্রনাথ (প্র.)।

কবিতাশুদ্ধ

১. অমিয় চক্রবর্তী : অন্ত রৌদ্র। ২. বিষ্ণু দে : চায়ের টেবিলে।

পুস্তক পরিচয়

১. অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র : ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খড়সা—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ২. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : পরশুরামের কুঠার—সুবোধ ঘোষ।